Reg. No. C. 523] ৩৬শ বর্ষ

বৈশাখ ১৩১৯



শ্রী[illegible] দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

[illegible]রতী কার্য্যালয়

২২, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলি[illegible]

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০

[illegible] বাহিরে [illegible] টাকা।

Reg. No. C. 523] ৩৬শ বর্ষ

বৈশাখ ১৩১৯



শ্রী[illegible]দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

ভারতী কার্য্যালয়

২২, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] । প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০

[illegible] ৩।০ টাকা।





Three Colour Block by
Indian Photo-Engraving Works

গোধূলি

Printed at the
Kantik Press

ভারতী

৩৬শ বর্ষ]　　বৈশাখ, ১৩১৯　　[১ম সংখ্যা

নববর্ষ

বন্দনা।

ওহে কাল সনাতন, চির পুরাতন,—
দিনে, ক্ষণে, বর্ষযুগে, তব কি নূতন!
অখণ্ড অজ্ঞেয় তুমি অনন্ত মহান্,
অতি ক্ষুদ্রে তব কর স্পর্শ সুখদান।
কোটি লোক কোটি বিশ্ব চন্দ্রসূর্য্যজ্যোতি—
তব বক্ষে ঘূর্ণমান দুর্নিবার গতি!
ত্রাসে ভয়ে বিকম্পিত বিশ্ববাসী যত;
বৃথা ভয়! তব স্থিতি নিত্য নিয়ত।
তোমাতে পতন নাই! নাই অবনতি!
নাই উর্দ্ধ নিম্ন দিক, তবুও উন্নতি!
ওহে দেব মহাকর্ম্মা না জান বিশ্রাম,—
কার্য্য কারণ ধ্রুব তব শুদ্ধ নাম!
ভাবিতে স্তম্ভিত বুদ্ধি বিস্মিত হৃদয়,
মর-মত তোমাতেই অমর অক্ষয়।
হে অমূর্ত্তি, নববর্ষে হও মূর্ত্তিমান,
দুর্ব্বলে সবল কর, অজ্ঞানে সজ্ঞান।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

আহ্বান।

হে নূতন বর্ষ, তুমি যূথিকার কোরকের প্রায়
কোন সুকুমার সুখ, সঙ্গোপনে নিরুদ্ধ হিয়ায়
রাখিয়াছ নাহি জানি, দিগন্তের দূরান্ত সীমায়
অভিনব জলদ সঞ্চার সম কোন ঝটিকায়,
কোন বজ্র বিদ্যুৎ দহন, কোন দুরন্ত বর্ষণ,
গম্ভীর নিঃশব্দ হৃদে অন্ধকারে করিছ পোষণ
নাহি জানি। তবু এসো হে অজ্ঞাত, হে রুদ্রভীষণ
এসো দেবতার দূত, সমাদরে তোমার আসন
পাতিয়াছি হৃদয় মন্দিরে, আজিকে উন্মুক্ত দ্বার
মঙ্গল রচনা মালা কিশলয় আশার সম্ভার,
স্মৃতি ধূপে সুধাগন্ধ, আলিম্পন মুগ্ধ বাসনার,
শোভে পূর্ণোদক, অভিষেক আনন্দ আধার!
অতিথি প্রসন্ন হও, শুভদৃষ্টি তোমার নয়নে
সুদূর অতীত সুখ ফিরাইয়া আনুক জীবনে!

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

বাগ্‌দত্তা

(উপন্যাস)

নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে চিলের অশ্রান্ত স্বর লহরী ভাসিয়া আসিতেছে। দুপুর বেলার রোদের হাওয়ায় ছোট ছোট চারা গাছগুলি ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া ছিল। ঝোপের মধ্যে নীল কাপড়পরা কচি মেয়েটির মতন অপরাজিতাফুল কয়টি তাহাদের সবুজ বিছানার উপরে শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিয়াছে, বাতাস আসিয়া মধ্যে মধ্যে খেলার সাথীর মত তাহাদেব উঠাইবার জন্য নাড়া দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু নিদ্রাতুর ক্লান্ত চিত্ত তাহারা সে আহ্বানে সাড়া ত দিতেই ছিল না, বরং তাহার তপ্তশ্বাসে আরও শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া উঠিতেছিল।

মধ্যে শানবাঁধানো বৃহৎ পুষ্করিণী; চারিদিকে পুকুর ঘেরিয়া কলমের আমগাছ। গাছ গুলায় এ বছর বেজায় বকুল ধরিয়াছে। স্ফুটনোন্মুখ মুকুলদলে সৌরভমত্ত মধুপিপাসু মৌমাছিগুলার আর আনাগোনার শেষ নাই। তাহার গুণগুণানি যেন দূরশ্রুত সঙ্গীতের তানের মত উচ্ছ্বাসমত্ত বাতাসের সঙ্গে মাতিয়া ভাসিতেছিল।

সমস্ত সকাল হইতে বলয়ঝঙ্কৃত কোমল কঠিন হস্তের আলোড়নের পর এই কিছুক্ষণ হইল পুষ্করিণীর জল একটুখানি স্থির হইয়াছে। সমস্ত উদ্যান প্রকৃতিও সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠোচ্চারিত হাস্যরহস্য ও কোন্দলকোলাহল প্রতিধ্বনিত চঞ্চল দৃশ্য পটখানাকে অপসৃত করিয়া দিয়া একখানি শান্তির পতাকা তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন। প্রভাতের কর্ম্মোদ্দীপনার পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মধ্যাহ্নের বিশ্রাম লক্ষ্মী সমস্ত জগতের উপরেই তাঁহার প্রশান্তি ঢালিয়া দিয়াছেন।

পুষ্করিণীর দক্ষিণ ধারে কেয়াবনের ঝোপের পরেই একখণ্ড পাথরের উপরে বসিয়া একটি বালক কেবল বসুন্ধরার এই বিশ্রামনীতি অগ্রাহ্য করিয়া একটা নিরীহ জীবরাজ্যের মধ্যে একটা আকস্মিক বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল। একগাছা বঁড়শিবাঁধা ছিপ ফেলিয়া সে জলরাজ্যের অধিবাসী মৎস্যকুলকে ময়দা টোপটুকু দ্বারা প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ মৎস্যগণের নিকট বিমান-বিক্ষিপ্ত লৌহ গোলক, বা মেঘান্তরালস্থিত মেঘনাদের অস্ত্র জালের মতই তাহা সাংঘাতিক বস্তুরূপে পরিচিত; কেবল মূঢ়বুদ্ধি শিশুগুলাই তাহাকে চিনে না। তাহারা না জানিয়া, অর্জ্জুনরক্ষিত যুধিষ্ঠিরের অশ্বরোহী অশ্বকে ধরার মত সেই মৎস্য দুর্ল্লভ খাদ্য আহরণ করিতে গিয়া একে একে প্রতিদিন অনেকেই ধৃত হয়।

আজ কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বালকের উৎসুক দৃষ্টি ফাৎনার স্পন্দন পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু একটি চুনা-পুঁটিও এ পর্য্যন্ত তাহার সহিষ্ণুতার পুরস্কার দিতে আসিল না। কি মুস্কিল মাছগুলাও সব সাধু হইয়া উঠিল যে!

ঐ বুঝি ফাৎনাটা নড়িয়া উঠিল! ঐ— ঐযে মাছটা টোপ গিলিতেছে!—ঐ যাঃ ছাড়িয়া পালাইল!

বিরক্ত বালক মাটিতে ছিপগাছা আছড়াইয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। মৎস্যজাতির অকৃতজ্ঞতায় তাহার মনে তাহাদের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছিল

খাবারটুকু খাইবার বেলায় বেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন তারপর কিনা গলাধঃকরণ করিয়াই পলায়ন! নেমকহালাল সিপাহীর সৎ দৃষ্টান্ত ইহারা কি দেখিয়াও শিখিতে পারে নাই!

গরম বাতাসে একবার পুষ্করিণীর সমুদয় জলটার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থিত সকমল শৈবাল দল কাঁপিয়া উঠিল। ছায়াময় জলের স্থানে স্থানে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিয়া ঝিক্‌মিক করিতেছিল, চূর্ণ তরঙ্গে সেই রৌপ্য কিরণ আরও ঝকমক করিয়া রূপা ছড়াইয়া দিল। গাছের ডাল হইতে একটা সদ্যোনিদ্রোত্থিত পাপিয়া অলস-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "পি পি পিউ কাঁহা?"

এমন সময় পশ্চাৎদিক হইতে একটা ডাক আসিল "সত্য!" ছিপধৃত হাতটার সঙ্গে ছিপটাও নড়িয়া উঠিল, টোপ গিলিতে উদ্যত মৃগেল-শাবক চকিত হইয়া পলাইল, টোপ গিলিল না। বিরক্তিপূর্ণ ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া ছিপধারী ছিপগাছা ভূমে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল, দিনটা নেহাৎ বৃথায় গেল! যে তাহাকে দূর হইতে ডাকিয়াছিল সে ব্যক্তি বৃক্ষচ্ছায়াঘন তীর হইতে সাবধানে নামিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া একবার তাহার বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর ইতস্তত চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "মাছ ধরে যে সুখে খাবে, তারও ত কোন লক্ষণ দেখিনে! সমস্তদিন বসে বসে হলো কি?" অপমানের উপর অপমান! সত্যেন্দ্র এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া একবার কুঞ্চিত ভ্রূমধ্য হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

প্রশান্ত ভাবে পবনসঞ্চালিত সলিলোপরিস্থ একখানা পদ্মপত্র পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিল।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া আগন্তুক ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "এত ক'রে তোমায় বুঝিয়েও কিছু করতে পারলাম না! ছি ছি সত্য তুমি নিজের ভবিষ্যৎটা একবারও ভেবে দেখচো না? চিরকাল কি এমন ছেলেখেলা করে কাটানো সাজে?"

ভর্ৎসিত হইয়া সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ ক্লান্তির সহিত গা ভাঙ্গিয়া আলস্যের স্বরে কহিল "কেন সকালে ত পড়েছি কত আর পড়ব? ঐ যাঃ মোটে একটা বাটামাছ পে-ছিলুম, তাও দেখচি চিলে না কিসে নিয়ে গেছে! আহা হা—"

"বেশ করেছে আমি ভারী খুসী হয়েচি! এখন আয় দেখি গোটাকতক অঙ্ক কষবি, চল, —ঐ কারা আসছেন আমি যাই—দেরি করিসনে আসিস—"

বেলা পড়িয়া আসাতে গ্রাম্য রমণীর দল কেহ কলসী কক্ষে কেহবা শূন্য কক্ষে—দল বাঁধিয়া পুষ্করিণীতে গা ধুইতে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাদের চাবির, চুড়ির ও হাসির সাড়া পাইয়া মণীশ শশব্যস্তে এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি অন্যপথ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সত্যেন্দ্রকে তাহার উপদেশপালনের জন্য কিছুমাত্র ত্বরা করিতে দেখা গেল না। সে ছিপ প্রভৃতি মাছ ধরার সরঞ্জামগুলা নিকটস্থ কেয়াবনের ভিতরে লুকাইয়া ফেলি-বার চেষ্টা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রত্যাশিত নেত্রে আগন্তুকা নারীদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে

মেয়েও তাহারই মত উৎসুক দৃষ্টি বহুদূর হইতেই তাহার দিকে প্রেরণ করিতেছিল। সে হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার কালো আঙ্গুরগুচ্ছের মত থাটো কোঁকড়া চুলের থর নাচাইয়া চঞ্চল মৃগ-শিশুর মত সহর্ষধ্বনি করিয়া ছুটিয়া আসিল "সত্যদা আজ কটা মাছ পেলেগা।"

"ঐরে পোড়ামুখী ছিপ দেখতে পেয়েছে!" মেয়েটি একটু কাছে আসিলে সে মুখ ভার করিয়া কহিল, "তুই সারাদিনের মধ্যে একবারও এলিনি কেনরে বাঁদরি! যা মাছ ধরেছিলুম সব চিলে নিয়ে গেল। আমি মাছ ধরবো না চিল তাড়াব? আবার জিজ্ঞেস করছেন কটা মাছ পেলেগা!"

মেয়েটির নাম গৌরী, গৌরী এই উচিত তিরস্কারে লজ্জিত হইল না বরং সে ইহাতে একটুখানি বেশ কৌতুক অনুভব করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল, "আচ্ছা বল দেখিন্ কটা মাছ চিলে নিয়েছে?" এই অবজ্ঞার হাসি ও প্রশ্নটা আজিকার সমস্তদিনের জলযুদ্ধে পরাজিত নায়কের ভাল লাগিল না সে তৎক্ষণাৎ রুষ্ট তর্জ্জনের সহিত খিঁচাইয়া উঠিল। "তবু বলোইনা শুনি?" "দশটা।" "দশটা ইঃ! দশথেকে ১টা বাদ দিলে যা থাকে তাই বুঝি, ঠিক বলো দেখি সত্যদা?" সত্য ছিপটাকে শূন্যে আস্ফালন করিয়া বেশ একটু জোরের সহিতই তাহা বিদ্রূপকারিণীর পিঠে ছপাৎ করিয়া বসাইয়া দিল, "এই যে দেখাচ্চি কটা! আর চাই?"

গৌরীকে যদিও এই কৃত্রিম কষা বেশ একটু জানাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু নিজের গৌরব রক্ষার খাতিরে তবুও বেশ প্রফুল্লভাবে অম্লান স্বরে হাসিয়া উঠিয়া সে কহিতে লাগিল, "বেশ বেশ মারোনা যতখুসী, আমার তো আর হাত নেই? আমি তা শোধ নিতে জানিনে! এক, দুই, তিন চার—আচ্ছা তোলা রইলো!"

এতক্ষণ অন্য রমণীগণ ঘাটের উত্তর পাড়ের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলে সকলেই প্রায় প্রবীণা বা প্রৌঢ়া, যে দু একটি যুবতী ও বালিকা ছিল তাহারা সকলেই দেশের 'ঝিউড়ি-ছেলে।' বসনের কোন অংশের সহিত মস্তকের কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনে তাহাদের প্রয়াসের আবশ্যকই হইত না। যে দু একটি বধূ ছিল তাহারাও এই কিশোর বালক সত্যকে দেখিয়া বক্ষলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনের মাত্রা বর্দ্ধিত করিল না। কারণ গাঙ্গুলীদের 'পাগ্‌লা সতু' পাড়ার এমন কোন বধূ ছিল না যাহার জন্য একদিন না একদিন ফলসাটা আস্‌টা সওগাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একখানা লেবিডোর মাথা ময়দা, বা একটা পানের খিলি এম্‌নি কোন কিছু না কিছু সামগ্রী আদায় করিয়া আনিয়াছে। এই দলের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা ও বধূ ছিলেন। গৌরীর মাতুলাণী তাঁহার ননদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ওলো দেখ মেয়েটাকে চাবুক পেটা করে দিলে। যেমন দস্যি মেয়ে, তা হবে না তো কি!"

কথাটা সত্য এবং গৌরী দুজনকার কানে গেল। ফস্ করিয়া ছিপটা সত্যর হাত হইতে টানিয়া লইয়া, গৌরী তাহার ডগটা দিয়া তৎক্ষণাৎ ধাঁ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর পৃষ্ঠে একটা গুরু-রকম আঘাত করিয়া হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে

ছুটিল। "কেমন মজা এখন! আমায় চাবুক পেটা করা অমনি মুখের কথা কি না!"

ছেঁড়া গেঞ্জির ভিতর দিয়া পিঠের উপরে আঘাতটা বেশ ভাল রকমই পৌঁছাইয়া ছিল। আচম্‌কা আক্রমিত হওয়ায় আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ সত্য নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া চটিয়া গেল। পিঠে একবার হাতটা বুলাইয়াই সেও তাহার দিকে ছুটিল, "রসো তো বাঁদরমুখী দেখাচ্চি তোকে, এতো জোরে আমি কি তোকে মেরেছিলুম! কক্ষণো না।"

ছুটিতে ছুটিতে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া গৌরী তর্জ্জন করিয়া উঠিল "না বই কি! নিজের ব্যালায় কিছু দোষ হয় না বা-রে ছেলে!"

বাগানটাকে চক্র দিয়া দিয়া দুজনে যতক্ষণ পারিল ছুটিল, তারপর গৌরী স্বেচ্ছাতেই শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া বলিল "আচ্ছা বাবু না হয় তুমিও আমাকে তেমনি জোরেই মার তাহলে তো শোধ যাবে।" সত্য কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি আলেকজন্দরের চেয়ে কিছুমাত্র অল্প মহত্ত্ব প্রদর্শন করিল না। একটুখানি পরে দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে যখন পুকুর ধারে ফিরিয়া আসিল, তখন ছায়ানিবিড় বনবীথির উপর হইতে সশঙ্কিত সান্ধ্য অন্ধকার মৃদু চরণে জলের উপর নামিয়া আসিতেছিল। পল্লীকামিনীগণ ভরাকুম্ভে যে যার গৃহপথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কেবল আর্দ্র বসনে ও কুম্ভকক্ষে দাঁড়াইয়া একটি রমণী চারিদিকে উৎকণ্ঠাদিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছেন "রাণী!" গৌরী সত্যর হাত ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল "তুমি এখনও বাড়ী যাওনি মাসিমা! গেলেই হতো, সত্যদা আমায় না হয় পৌঁছে দিত।"

মাসিমা একটিও তিরস্কারের ভাষা প্রয়োগ না করিয়া সেই মৃগশিশু চঞ্চলাকে কাছেরদিকে টানিয়া লইয়া শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন "চলো মা বাড়ী যাই।"

(২)

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গ্রামের 'মেরুদণ্ড' বলিয়া পাঁচজনে যে আখ্যা দিয়াছিল তাহার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি ছিল না। বিদ্যাবুদ্ধিতে তো বটেই, তাছাড়া সহৃদয়তার জন্যই তাঁহার খ্যাতিটা দেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম এবং গ্রামান্তরের যে কোন বিবাহ সভায় এবং রোগশয্যার পার্শ্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্ভুল নিমন্ত্রণ হইত। সন্তানবিয়োগ-কাতরা জননীর সান্ত্বনার ভারটাও একসঙ্গে তাঁহারি ইজারা করা ছিল। দুঃখের কারণ ভুলাইয়া দুঃখকে দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া আশার দ্বারা দুঃখকে সহনীয় করিয়া তিনি দুঃখের মূল চিত্তটাকে শুদ্ধ উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় কতকটা যে সফল না হইতেন এমনও নহে।

আশ্রম নিয়ম যাহা ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই বিদায় লইয়া কাল সমুদ্রের তরঙ্গে মিলিয়া লোপ পাইয়াছে, তাহারই পুনরাবর্ত্তন প্রয়াস করিয়া উমাকান্ত অধ্যয়ন কালটা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে কাটাইয়া অধ্যাপকের পদগ্রহণ করিবার পর দূর পল্লীগ্রামের হরিকিঙ্কর ন্যায়তীর্থের কন্যা গঙ্গামণিকে বিবাহ করিয়া যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন তখন সরস্বতীর পাশে গৃহ-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করাই হইল মাত্র, গৃহ যে [illegible]

গৃহলক্ষ্মীর দ্বারা ইহার কোন অভাব পূর্ণ হইল না বরং কিছু কিছু বাড়িল।

তখনও দেশ হইতে পাণ্ডিত্যের আদর এতখানি কমিয়া যায় নাই। বিবাহে উপনয়নে আদ্য ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়টা তখন গৃহস্থগণ বিশেষ কল্যাণকর মনে করিতেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেইজন্য অর্থাভাব ছিল না বরং নূতন বস্ত্র ও পিতলের ঘড়ায় ছোট কুঠরিটি সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়াই থাকিত। কিন্তু যখনি কোন গরীব পিতার কন্যাদায়ের সংবাদ অথবা পুত্রের পিতৃকর্ত্তব্য পালনের অনাটনের খপর তাঁহার কর্ণগোচর হইত তখনি টোল বাড়ির ছেলেদের ভাতেভাত খাইয়া দিন গুজর করিতে হইত এবং পাককারিণী গঙ্গামণির জন্য হাঁড়িতে একটি ভাতের দানাও অবশিষ্ট থাকিত না।

রাজগৃহ হইতে সভাপণ্ডিতের পদ, ও বিদ্যালয় হইতে অধ্যাপকত্ব গ্রহণ জন্য বার কয়েক আহবান আসিয়া শেষটায় থামিয়া গিয়াছিল। সে সব পূর্ব্বের ইতিহাস। এখন উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রবীণ হইয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মতেজে দীপ্ত শরীর এখনো জরার হস্তস্পর্শে হীনতেজ হয় নাই, শরীরের মত মনের উপরেও অবসাদ বা ক্লান্তি তাহার সর্ব্বনাশিনী ছায়াপাত করিতে সাহসী না হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি উপযুক্ত পুত্রের হস্তেই এখন তিনি অধ্যাপনার ভার প্রদান করিয়া পরহিত সাধনের অবসর বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। সকালের দিকটা ছাড়া দ্বিপ্রহরের পর হইতেই তাঁহাকে শুভ্র উত্তরীয়খানি কাঁধে ফেলিয়া লাঠিগাছি হাতে গভীর চিন্তাপূর্ণ অথচ প্রশান্ত মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া দুইক্রোশের মধ্যে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ঘুরিতে দেখা যাইত। সূর্য্যকে শীতের দেশের লোকেরা যেমন আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লয় তেমনি করিয়া পথের দুইধারের কুটীর ও অট্টালিকাবাসীগণ তাঁহাকে দেখিয়া দ্বারের নিকট বাহির হইয়া আসিত।

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভক্তিনাথ পিতৃনির্দ্দেশানুসারে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ৺কাশীধাম হইতে ন্যায়ের প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও পিতৃ প্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত-সমাজে বরণীয় হইয়াও উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ছোট ছেলে শচীকান্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়াই জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম লইলে যে ভাগ্য বহন করা এদেশের ঋষিগঠিত আইনের আদেশ এবং যে বিলাস-বর্জ্জিত জ্ঞানমার্জ্জিত সহজ সরলতার বলে ব্রাহ্মণ-জাতি সর্ব্বশ্রেণীর ঊর্দ্ধে আসন বিস্তৃত করিয়াছিলেন, শচীকান্তের স্বভাবের মধ্যে সেই জিনিষটারই সবচেয়ে অভাব ছিল। ভোগ সুখটাকেই পরমার্থ বোধ থাকাতে উচ্চপদে ও উত্তম আহার বিহারে যে একটা প্রবল স্পৃহার আবির্ভাব হয়, সেইটুকু জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াই সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ছোটবেলা হইতে ভক্তিনাথ বিনীত স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতি এবং দুঃখসহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু শচী কোন মতেই দারিদ্র্যক্লেশ সহ্য করিতে পারিত না। সে মোটা চাল চলনে চলিতে একেবারেই নারাজ। এই লইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইতে কোন দিনই কুণ্ঠিত ছিল না। যদিও ইহার ফলে জীবন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহে তাহাকে যে উদ্যমশীল করিয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে।

গঙ্গামণির চক্ষের জল তাঁহার থাট রাঙ্গাপেড়ে সাড়ির অঞ্চলে নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলা ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইত না। শচীর জন্য অতৃপ্তির একটা খুঁৎ খুঁতানি তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগিয়াই থাকিত। বড় হইয়া শচী বলিল সংস্কৃত পড়িবেনা, ইংরাজী পড়িবে এবং ইহার সপক্ষে এমনি জেদ ধরিয়া পড়িয়া রহিল, যে শেষটায় মনের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেও পিতাকে মত করিতে হইল। প্রসন্নমুখ ঈষৎ চিন্তিত করিয়া তিনি কহিলেন "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে অনাচারী অব্রাহ্মণ হয়েই যখন জন্মেছে তখন তাকে বাধা দেবে কে? যাক্ ওর প্রারব্ধের পথেই ও যাক্।"

ইংরেজি পড়া চলিল। গ্রামের পর নিকটবর্ত্তী সহরে, এবং পরে কলিকাতায় সে বিদ্যা ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। সে এখন কলিকাতা সহরে মেসে কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী ইতি মধ্যে তাঁহার প্রবেশদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া এই পিপাসুকে তাঁহার মন্দিরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। চোখে সোনাবাঁধান চশমা এবং ঘরের মধ্যে একটি বাক্স হারমোনিয়মই তাহার সৌখীনত্বের যথেষ্ট পরিচয় নহে, মরক্কো-'লেদারে' বাঁধা সোনারজলে নাম ছাপানো ছোট্ট খাতাখানির প্রতি পৃষ্ঠা নূতন ছন্দে ও পুরাতন ভাব-ভাষায় পূর্ণ হইয়া একদিকে তাঁহার সুভব্যরুচির ও অপরদিকে তাহার কবিযশ-প্রার্থী হৃদয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেছিল। শচীকান্ত আধুনিক হরি, মধু ও বিপিনের মত নিতান্ত হতাশ কবিও নয়; বন্ধুমহলে তাহার কাব্য উচ্চপ্রশংসার সহিতই সমালোচিত হইত। এবং তাহার মত একজন ক্ষমতাশালী বন্ধু লাভে তাহারা যে গৌরবান্বিত একথাও সদাসর্ব্বদা তাহারা উচ্ছসিত চিত্তে ব্যক্ত করিত।

তাহার স্বভাবগুণে গঙ্গামণি বা তাঁহার কন্যারাও তাহাকে একটু বিশেষভাবে দেখিতেন। ঘরের ছেলেটি'র সহিত তাহাকে অনেকখানি তফাৎ করিয়া ফেলিতেন। "ভক্তি 'দুধ চেটে' আছে —গাই দুধ দেয়নি, 'পলারত্তি' দুধ ও শচিকেই দাও, ওর আর কাজ নেই কো'।" মাও এই কথা বলিতেন মার দেখাদেখি দিদিরাও বলেন "ছেঁড়া নেপখান্ দাদার থাক শচীর কষ্ট হয় নূতনটা ওকেই দিই।" কাজেই সে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া বসিয়াছিল যে বংশের মধ্যে সেই একমাত্র মঙ্গলজ্যোতি বা দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ বিশেষ। সুখ এবং সৌভাগ্য-যাহাকিছু সব তাহারি পাওয়ানা, যদি তাহার কোনটা পাইবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা ঘটে তবে তাহা লোকের দোষ। পিতা কথনও তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয়েই তদগদ ছিলেন না, আজও নয়। ছেলে ভাবিত, সংস্কৃতজানা-লোকের চিত্ত পৃথিবীর উচ্চভাব সমূহ ধারণায় অক্ষমতাহেতু সঙ্কীর্ণ, এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার উচ্চশিক্ষিত পুত্রকে কুণ্ঠার সহিত অবলোকন করিয়া থাকেন, কাছে ঘেঁসিতে সাহস করেন না। সেও যতখানি পারিত তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিত।

গ্রীষ্মের ছুটীতে মণীশ বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু শচীকান্ত এবার ছুটীর প্রথমে তাহার সৌখীন বাসা-ঘরখানির মায়া ছাড়িতে পারে নাই। মণীশ আসিয়া খপর লইল, সে তখনও

কলিকাতায়। সে ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল ; আসিবার সময় তাহার একবার খপর লওয়া উচিত ছিল তো।

মনীশ লোকটি সকল বিষয়েই তাহার বন্ধুটির বিপরীত। সে যদিও শিক্ষাদীক্ষায় শচীকান্তের অপেক্ষা হীন ছিলনা, কিন্তু নিজের সেই সাধারণ দুর্লভ শক্তিকে সে তাহার মত সগর্ব্ব বিস্ময়ে বরণ করিয়া লইতে কোনদিনই পারগ হয় নাই। বরং নিজের সহস্র ছোট খাট অক্ষমতার খুঁৎ টানিয়া বাহির করিয়া তাহা ধরিয়া লজ্জাক্ষীণ হইতে থাকিত। একদিকে যেমন সে পরোপকারী সহৃদয় অন্যদিকে তেমনি মুখচোরা ও লাজুক। তাহার এই নারীপ্রকৃতি তাহার সঙ্গী সহচরদিগের নিকট তাহাকে পদে পদে হাস্যাস্পদ করিবার বেশ একটু সঙ্গীণরকম উপাদান দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের অনেকের নিকট হইতে সে যে পত্র পাইত তাহাতে সম্বোধন পদে তাহার নামের ঈষৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া মণীশের পরিবর্ত্তে মণীষা এই নারীজনোচিত পাঠ দেওয়া থাকিত। মণীশ ইহার বিরুদ্ধে দু একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ মাত্র তুলিয়াই নিরুপায়ে আরক্তগণ্ডে চুপ করিয়া গিয়াছিল। তাহাদের বিদ্রূপকুশল লিপিযুদ্ধে সে নিরস্ত্র নিরীহ—পারিয়া উঠিত না। কাজেই নামটা ক্রমশঃ বন্ধুমহলে বিস্তৃতি লাভই করিতেছিল। বলাবাহুল্য এই কলির শিখণ্ডিপদে তাহাকে আরূঢ় করাইয়াছিল আশৈশব-বন্ধু কবি শচীকান্তই।

দ্বিপ্রহরের খরতীব্র রৌদ্রতেজে ঘরের ভিতরটা শুদ্ধ যেন তাতিয়া উঠিয়াছিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া রুদ্র আগুনে হাওয়া মধ্যে মধ্যে বকুল ফুলের ক্ষীণ গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। দেওয়ালের একটা বড় ফাটালের ভিতর হইতে কপোত-বিশ্রাম-কুজন স্বপ্নলোকের পার হইতে ভাসিয়া-আসা ধ্বনির মত শুনাইতেছিল। এমন সময় ছাতা মুড়িয়া কোঁচার কাপড় লইয়াই ঘাম মুছিতে মুছিতে শচীকান্ত মণীশের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "মণীশ আছিস ?"

মণীশ ঘরেই ছিল, জানালার দিকে মুখ করিয়া সে টেবিলের সম্মুখে চৌকি লইয়া বসিয়া, গোলাপি রংয়ের আফিসের ফিতা দিয়া বাঁধা কাগজের তাড়া কয়টার বাঁধা খুলিয়া কি লিখিতেছিল ও পরস্পরের সহিত মিলাইয়া নম্বর দিয়া আবার বাঁধিতেছিল, মুখ ফিরাইয়া প্রফুল্ল ভাবে উত্তর দিল, বলিল "এসো, কবে এলে ?

"আজই। কি করচিস্ ? দপ্তরখানার দলিলের মত কি ও গুলো ?"

মণীশ উঠিয়া ঘরের একমাত্র চৌকিখানা বন্ধুরদিকে সরাইয়া দিয়া মৃদু সলজ্জহাসির সহিত তাহার প্রশ্নের জবাব দিল, "ওগুলো দলীলই বটে, কাকা মেলাতে দিয়েছেন।"

শচী আসন গ্রহণ করিয়াছিল, অপ্রসন্ন স্বরে শ্লেষের হাসির সহিত কহিল "তোমার কাকা সুবিধে পেলেই তোমায় খাটিয়ে নিতে ছাড়েন না। কলকাতা গিয়ে তুই তবু বেঁচেছিস।"

মণীশের সঙ্গে বন্ধুর এই খানেই বিরোধ। শচীকান্ত যে সমস্ত বিনয়-বাধাতার গণ্ডীর সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া নিজের প্রতি সাহঙ্কার সহানুভূতিতে চাহিয়া দেখিত তাহা



জলমধ্যে বারুণীর কেশরচনা

মণীশকে শুধু আঘাত করিত এমন নহে আতঙ্কিত করিয়া তুলিত। সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইত না যে,—তাহার হৃদয় যেমন স্নেহময় খুল্লতাত ও মাতৃপ্রতিমা খুড়িমার উপর অকপট ভক্তি ভালবাসা প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে, শচীন্ কেমন করিয়াই তাহার পূতচরিত্র পিতার প্রতি সেইরূপ ভক্তিপ্রীতিসম্পন্নচিত্ত না হইয়া থাকিতে পারে! সে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত, ভাবিত, মুখে শচীন যাই বলুক, আসলে তাহার মনে মনে নিশ্চয়ই সে তাহার পিতাকে ভক্তি করিয়া থাকে। না করিয়া থাকিবে কি করিয়া? এখন বন্ধুর সমালোচনায় ঈষৎ ব্যথিত হইল এবং সেই জন্যই তৎক্ষণাৎ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ভালটা কি হয়েচে? আমি থাকি না, সত্য ছেলে মানুষ, কাকার নিজেই সব করতে হয়। তুমি এতদিন সেখানে বসে বসে কি করছিলে?"

শচীকান্ত কহিল "ছিপ ধরে দেখছিলুম বঁড়সিতে মাছটা গাঁথে কিনা!"

"সত্যর মতন! তারপর কি হলো? গাঁথলো? না বসে থাকাই সার হলো?"

"গাঁথে গাঁথে এমনি সময় দাদার জোর তলব গেল। আর গাঁথলো না।"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল "সত্যও ঠিক এই কথা বলেছিল! না না সত্যি ব্যাপারটা কি খুলেই বলোনা। ছুটিতে বাড়ী আসতে ইচ্ছে হয় না? এ বড় আশ্চর্য্য!"

"আচ্ছা বলছি শোন; কিন্তু দেখো এখন কাউকে কিছু বলে ফেলোনা যেন। আমাদের মেসের দুটো বাড়ী উত্তরে একটা হলদে বাড়ী আছে দেখেছিস!"

"হ্যাঁ। কোন্ নতুন ডাক্তারের বাড়ী শুনেছি। নামটা কি মনে নেই, কি যেন মুখুয্যে—?"

"নিখিল মুখুয্যে ডাক্তারের। তার একটি বোন আছে, মধ্যে মধ্যে জানলায়, বারান্দায় কাপড় তুলতে বা রাস্তার কোন হুজুক দেখতে দাঁড়ায় দেখেছিস?"

মণীশ সহসা আরক্ত উঠিল। কোন্ গৃহবাতায়নে কোন কুতূহলী ভদ্রমহিলা অবস্থিতি করিতেছেন, সে সকল খপর সে কি দরকারে রাখিতে যাইবে?

"তবে তুই বুঝতেই পারবি নে।"

এই বলিয়া শচীকান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। "সে এক আইডিয়াল বিউটি! কাব্যলক্ষ্মী বিশ্বের সমস্ত কবিকুঞ্জ পরিত্যাগ করে সেই ছোট্ট বাড়ীখানার মধ্যে তাদের কি পুণ্যে যে আবির্ভূতা হয়েছেন তা ভেবেই পাইনে। এখন খুব মজা হয়েচে; সেই কথাই বলছিলুম;—তার ভাই আমার সঙ্গে তাদের সেই কোহিনুরকে বদল করতে চায়। আর বুঝতেই পারছ এমন হস্তিমুর্খ কেউ পৃথিবীতে নেই যে করতলাগত রত্নকে ত্যাগ করে দূরে সরে।"

মণীশ সবিস্ময়ে তাহার স্বপ্ন বিভোর মুখের দিকে চাহিল, কহিল "সে কি তারা যে মুখুয্যে! নিশ্চয়ই রাঢ়িশ্রেণী হবে?"

"ধরে ফেলেছ? ঐত ঐখানেই ত হচ্চে মজা! আমি চাটুয্যে লিখি কি না ওরা সবাই জানে আমি রাঢ়িশ্রেণী। তা হোক না তাতে

ক্ষতিটা কি? কেন রাঢ়ি বারেন্দ্রে বিয়ে চলে এটা কি সমাজের পক্ষে শুভ নয়?"

মণীশের মুখ অসাধারণ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সে কম্পিত অধরে উত্তর করিল, "শুভ বই কি? কিন্তু এ কি তাই? মিথ্যা দিয়ে এত বড় কাজটা করতে চাচ্ছ! যখন তারা জানতে পারবে যে তুমি তাদের ঠকিয়েছ!—উঃ কি সর্ব্বনাশ! নানা তুমি ঠাট্টা করচ বোধ হয়? এতবড় জুয়াচুরি কি করতে আছে?"

শচীকান্ত এবার ঈষৎ বিরক্ত হইল, মণীশের এতটা বাড়াবাড়ি তাহার কোনদিনই ভাল লাগিত না, আজও লাগিল না। বিদ্রূপ ভাবে বিরক্তি ঢাকিয়া বলিল, "জুয়াচুরি কি? জাহাঙ্গীর নুরজাহানের জন্য কি করেছিলেন?"

"সেই কি সাধুতার উদাহরণ?"

"না হোক, এতে ধর্ম্মতঃ কোন পাপ হয়না।"

মণীশ একথা কিন্তু কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে ভাবিয়া বলিল, "তোমার বাবা মত করবেন কি? তিনি ত কিছুই লুকোবেন না তার চেয়ে তাঁকেই কেন সব বল না? তিনি জ্ঞানী লোক হয়ত তাদের বুঝিয়ে মত করাতে পারেন, তাতে সমাজের মঙ্গল বটে।"

শচীকান্ত আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কোঁচাটা ঠিক করিতে করিতে বিরক্তির সহিত হাসিয়া উত্তর করিল "ক্ষেপেচ! তিনি কোন মতেই এতে মত দেবেন না। বিয়ের পর তাঁকে বলব, এখন ঘুণাক্ষরেও না। তাদের বলেছি আমার কেউ নেই। এখন চল্লাম।"

মণীশ তাহার বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত দুই চক্ষু তীব্র ভৎর্সনায় পরিপূর্ণ করিয়া বন্ধুর দিকে চাহিল, ধিক্কারের সহিত কহিল, "ছি শচীন্!"

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা

আমি এ জীবনে এই বঙ্গদেশে যত মহাজনের সংস্রবে আসিয়াছি, এবং যাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হইয়াছি, তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। আমার চক্ষের সমক্ষে তাঁহার চরিত্র উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় সর্ব্বদা রহিয়াছে; আমি দিন দিন, সেই পথানুগামী হইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু পরাস্ত হইয়া যাইতেছি। সেই পরমাত্মজ্ঞান, সেই ব্রত-নিষ্ঠা, সেই একাগ্রমতি, সেই কর্ত্তব্যপ্রিয়তা, সেই চিত্তের অনাময়তা, সেই স্থিত-প্রজ্ঞতা, সেই ভাবগ্রাহিতা, সেই সৌন্দর্য্যবোধ, সেই হৃদয় মনের উচ্চ ভাব প্রভৃতি যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করি, সকল বিষয়ে তিনি যেন কোন এক দূরারোহ স্থানে আছেন বলিয়া মনে হয়।

দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মেরা মহর্ষি আখ্যা দিয়াছেন বলিয়া, কোন কোনও বাহিরের লোককে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে বর্ত্তমান সময়ে যে কতিপয় ব্যক্তি ঋষি নামে আখ্যাত হইবার উপযুক্ত তন্মধ্যে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। পরমাত্মার

সাক্ষাৎকার হইতে ধর্ম্মের তত্ত্ব যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারাই ঋষি? ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরস পানে যাঁহারা মগ্ন তাঁহারাই ঋষি; ইহাদের ধর্ম্ম লোকাচারে নহে, শাস্ত্রাদেশে নহে, গুরূপদেশে নহে, কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে। ধর্ম্ম তাঁহাদের আত্মার পক্ষে স্বাধীন বিহারের ভূমি! মৎস্যের পক্ষে যেমন সাগরের জলরাশি, পক্ষীর পক্ষে যেমন প্রমুক্ত বাতাস, ধর্ম্ম তেমনি তাঁহাদের আত্মার পক্ষে স্বাধীনতা ও বিহারের ক্ষেত্র; তাঁহারা চিন্তা করিতে গেলেই ধর্ম্ম, কাজ করিতে গেলেই ধর্ম্ম; যাহা অপরের পক্ষে বিচারাধীন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে এমন একজন ঋষি বঙ্গদেশে জন্মিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। কেহ যদি আমার উক্তিকে অত্যুক্তি বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি যে তিনি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত আত্মচরিত, বিশেষতঃ তাহার দ্বাদশ অধ্যায়, পাঠ করুন।

আজ আমি তাঁর ঋষিত্ব বিষয়ে অধিক কিছু বলিব না; তাঁর জীবনে যে আশ্চর্য্য মৌলিকতা দেখা গিয়াছে, যে মৌলিকতা তাঁর ঋষিত্বের অপর প্রমাণ, সেই বিষয়ে কিছু বলিব।

তাঁর ধর্ম্ম জীবনের স্ফূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—তিনি অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ বৎসর বয়সে তাঁর পিতামহীর মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে গিয়াছিলেন। সেই শ্মশানে দেখিলেন যাঁহারা অট্টালিকাতে রাজভোগে থাকেন, তাঁহারা ধরাসনে সামান্য মাদুরে বসিয়া ডাবা হুঁকাতে তামাক খাইতেছেন; যে দেহ রাজভোগে ছিল হইতেছে। দেখিয়া তাঁহার চিত্ত চমকিয়া উঠিল! তিনি যে রাজভোগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন তাহা কোথায়, আর সেদিন যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা কোথায়। অনেকে হয়ত বলিবেন এরূপ শ্মশান-বৈরাগ্য ত অনেকের মনে উদয় হয়; এবং অনেকের জীবনে পরিবর্ত্তন আনে, ইহাতে আবার নূতন কি? নূতন কিছু আছে শুনুন। তাঁহার মনে যে কেবল বিষয়ের অসারতা ও অনিত্যতা জাগিয়া উঠিল তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আরও কিছু প্রতীত হইল! তিনি তৎপরক্ষণেই এই সংসারের অসারতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আর কি যেন দেখিলেন, আর কি বাণী যেন শুনিলেন, যাহাতে তাঁর মন আনন্দে প্লাবিত হইল! এই অভূতপূর্ব্ব মন-আনন্দ যখন পাইলেন, তখন তার সঙ্গে তুলনায় প্রতিদিন যে কিছু সুখভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল! তিনি সেই ধ্যানে মগ্ন হইলেন! কোথা দিয়া দিন রাত্রি যাইতে লাগিল বুঝিতে পারেন না। সেই ধ্যানে পড়িয়া আছেন, আহার করিতে ডাকিয়াছে, আহার করিয়া আসিয়াছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইতেছে, পরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কৈ আমাকে খেতে ডাকল না?" আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই মন-আনন্দ দেখা দিয়া কিছু দিন পরে যেন লুকাইল, কেন লুকাইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না! তখন ধন জন, সম্পদ চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল! গৃহ শ্মশান-সমান হইল! পলাইয়া কোম্পানির বাগানে গেলেন,—দেখেন যে রৌদ্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া

উৎকট মানসিক বিষাদ হইলে রৌদ্র কৃষ্ণবর্ণ দেখায় সকলে একবার চিন্তা করুন! শ্মশান-বৈরাগ্যের সঙ্গে এই অদ্ভুত মন-আনন্দের সমাবেশ ও সেই আনন্দের অন্তর্ধানে অদ্ভুত বিষাদ ইহা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম মৌলিকতা। শ্মশান-বৈরাগ্য অনেক দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহার সহিত এরূপ মন-আনন্দের সমাচার অগ্রে পাই নাই; এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও বিষাদের মুহূর্ত্তে রৌদ্র কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ইহাও পূর্ব্বে শুনি নাই।

তৎপরে যখন তিনি হৃদয়ের ছবি হারাইয়া ব্যাকুল চিত্তে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ হইল। এই ধর্ম্ম সাধনের অবস্থাতে এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা গেল যে, তিনি কোনও গুরু বা পথ-প্রদর্শকের শরণাপন্ন হইলেন না; কিন্তু একাগ্রচিত্তে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষের প্রতি নির্ভর রাখিয়া জলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পদ্মার তরঙ্গ বক্ষে, ঘুষকরার আম্রকাননে, দিল্লীর নির্জ্জন প্রান্তরে, অমৃত সহরের নির্জ্জন উদ্যানে, শিমলা শৈলের জনমানববিহীন শৃঙ্গে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন! তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া কত সন্ন্যাসী, সাধু, যোগী ও ভক্ত দেখিলেন; সাধনার্থী হইয়া কাহারও শরণাপন্ন হইলেন না। যাহা কিছু দেখিলেন বা শুনিলেন, তাহার কিছুতেই তাঁহার চিত্তের পরিতৃপ্তি হইল না; কেহই তাঁহাকে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষের তত্ত্ব সমুচিতরূপে করতলস্থ আমলকবৎ করিয়া দিতে পারিল না। সুতরাং তিনি ধর্ম্মসাধনে উন্নত-শিরা হিমালয়ের ন্যায় একাকী দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সাধন-নিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন তাঁর দ্বিতীয় মৌলিকতা।

তাঁর তৃতীয় মৌলিকতাও এইরূপ বিস্ময়-জনক। তিনি যে যুগে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগ প্রাচ্যের প্রভাবের মধ্যে প্রতীচ্যের নবাভ্যুদয়ের যুগ। সে যুগে এক দিকে ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার ও নবভাবের আবির্ভাবের জন্য কার্য্য করিতেছেন, অপর দিকে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, ও মেকলে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংরাজী শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাব তখন সাংক্রামিক ব্যাধির ন্যায় শিক্ষিতদিগের হৃদয় মন অধিকার করিতেছে! শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রামায়ণ ফেলিয়া দিয়া হোমারের অনুবাদ হস্তে লইতেছে; গুরুজন ক্রোধ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য ঘরে পুরিয়া দিলে নব্য বালক গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে হোমারের কবিতা মুখস্থ বলিতেছে; বালকগণ রাজপথে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে জ্বালাতন করিবার জন্য "আমরা গরু খাই গো" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; লোক দেখাইয়া মুসলমান রুটীওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটী কিনিয়া আনিতেছে; এবং হাব ভাব চাল চলনে, হিন্দুদের যাহা আছে সব নিকৃষ্ট, পশ্চিম হইতে যাহা আসিতেছে সব উৎকৃষ্ট, এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। তখন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের অগ্রসর সহাধ্যায়ীগণ সকলেই পাশ্চাত্য-প্রীতিতে নিমগ্ন; অপর দিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের

নবাভ্যুদয় ; প্রতিভাশালী বক্তা ও স্বধর্ম্মানুরাগী ডাক্তার ডফ্ বঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত ; তাঁর প্রভাবে নব্য শিক্ষিতদিগের মধ্যে নবভাবের বিকাশ ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত দলের অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন ; চারিদিকে ধর ধর ঠেকা ঠেকা রব উঠিয়াছে ! কি আশ্চর্য্য এই ক্ষেত্রে, ও এই উত্তেজনার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ যখন ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পাশ্চাত্য-জগতের দিকে গেল না ; কিন্তু তিনি উপনিষদ-কার ঋষিগণের শরণাপন্ন হইলেন ; যখন সকলের মুখ পশ্চিমের দিকে ফিরিয়া আছে, তখন তাঁহার মুখ প্রাচীর দিকে ফিরিল। এ কি অদ্ভুত মৌলিকতা।

এ বিষয়েও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। তিনি ভারতীয় ঋষিদের শরণাপন্ন হইলেন বটে, উপনিষদের উক্তি সকল তাঁর ধ্যানে জ্ঞানে, অস্থি মজ্জাতে প্রবেশ করিল বটে, তিনি উপনিষদুক্ত জ্ঞানমার্গের মধ্যে গভীররূপে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু উপনিষদের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেন না ; জ্ঞানানুগা ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেন। লোকে দেখিতে লাগিল একদিকে উপনিষদের "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" প্রভৃতি বচনগুলি পাঠ করিতে তাঁর অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, মস্তকের কেশরাজি দণ্ডায়মান হইয়া উঠে, অপর দিকে ভক্ত কবি হাফেজ ও বাবা নানক প্রভৃতির উক্তি আবৃত্তি করিতে তিনি ভাবাবেশে যেন আত্মহারা হইয়া যান ; যেন অজ্ঞাতসারে আপনার বসিবার আসন ছাড়িয়া উঠেন।

তৎপরে তাঁহাতে আর একটী বিশেষত্ব দেখা গেল। সমাজ-বিমুখতা আমাদের দেশের প্রাচীন জ্ঞান-মার্গের একটী প্রধান লক্ষণ। তাহা মানবকে বলে :—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয় মতীব বিচিত্রঃ ;

হে মানব, তোমার আবার স্ত্রী কে ? তোমার আবার পুত্র কে ? এ সংসার ধোঁকার খেলা।

এইরূপে জ্ঞানমার্গ এদেশে সন্ন্যাসীর মার্গ হইয়াছে ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঋষিগণের জ্ঞান মার্গের পক্ষপাতী হইয়াও তাঁহাদের সমাজ-বিমুখতা লইলেন না। হায় ! গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এরূপে কয়জন পালন করিয়াছে ! মুক্ত হস্তে সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের সাহায্য এরূপ কতজনে করিয়াছে ! তাঁহার অসাধারণ মৌলিকতার এই এক নিদর্শন দেখা গেল, যে তাঁর জীবনে ও চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় দৃষ্ট হইল।

কিন্তু তাঁহাতে যে ভক্তি ছিল তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। তাহা ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র ছিল না ; কিন্তু ভাগবতোক্ত সাগরগামিনী নদীর ন্যায় ঈশ্বরাভিমুখে হৃদয় মনের অবিশ্রান্ত গতিরূপে বিদ্যমান ছিল। এতদ্দেশে ভক্তিপথের সাধকগণ অনেক সময় ভাবুকতাকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভাবুকতা ভক্তি নহে। ভাবোচ্ছ্বাস ক্ষণিক—সাময়িক, তাহা মানব-চরিত্রের উপরে থাকে, বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহার জোয়ার ও ভাঁটা আছে। ভক্তির জোয়ার ভাঁটা নাই ; তাহা অবিশ্রান্ত গতিতে আত্মার অন্তস্তম তলে প্রবাহিত থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তির নামে ভাবুকতাকে দেখিতেছে, ভাবোচ্ছ্বাসের উপরে তাহার দৃষ্টি ; ভক্তির

গম্য ও আরাধ্য কে ও কি প্রকার, তাহার সহিত তাহার তত সম্পর্ক নাই। আজ একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লইয়া যে প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস হইতেছে, কল্য যদি ধড়াচূড়াধারী কৃষ্ণমূর্ত্তিকে লইয়া বা কালীমূর্ত্তিকে লইয়া সেরূপ হইতে পারে, তবে ঈশ্বরের বদলে ধড়াচূড়াধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি লইতে তার আপত্তি নাই। মনে কর, একজন মাতাল সে নেশা চায়, সুরার মাদকতার প্রতি তার দৃষ্টি, সেই জন্যই সে সুরাকে চায়, তুমি যদি সুরার পরিবর্ত্তে অডিকলোঁ খাওয়াইয়া সেইরূপ মত্ততা উৎপন্ন করিতে পার, তবে যাক সুরা আসুক অডিকলোঁ, তাহাতে আপত্তি কি? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি ছিল, কিন্তু ভাবুকতাত্মক ভক্তি নহে, তাহা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রসার, ও প্রীতি-জনিত একাগ্রতার আকারে ছিল। তাঁহার জ্ঞান ভক্তিকে প্রসব করিয়াছিল; তাঁহার ভক্তি নীতিকে উৎপন্ন করিয়াছিল। এই তাঁর আর এক মৌলিকতা।

তাঁহার এই নীতির মধ্যেও আবার একটু বিশেষত্ব ছিল। এ জগতে সচরাচর যে নীতি দেখা যায়, তাহা লৌকিক নীতি। জনসমাজের সুখ অসুখের প্রতি,মানবের স্তুতি নিন্দার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে নীতির নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। "ওরে অমন কাজ করিস না, লোকে বল্‌বে কি?" এই ভাব সে নীতির মূলে প্রবল থাকে; সুতরাং সে নীতিতে উত্থান পতন আছে; এবং সামাজিক ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত সে নীতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নীতি এরূপ লৌকিক নীতি ছিল না। তাঁহার নীতি পারমার্থিক নীতি ছিল। তিনি পরমাত্মার সহিত বিশুদ্ধ প্রীতি যোগে যুক্ত হইয়া অধ্যাত্ম-যোগের সাহায্যে নীতির ব্যবস্থা সকল নির্দ্ধারণ করিতেন। যে কার্য্যে বা যে আচরণে বা যে কথনে তাঁর অধ্যাত্ম যোগের ব্যাঘাত ঘটিত, তাহা তিনি বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিতেন। আর যাহাতে সেই যোগকে ঘনীভূত করিত, তাহাকে বরণীয় মনে করিতেন। তিনি দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলি, সেই পরমাত্মা পরম পুরুষের চরণে বসিয়া স্থির করিতেন। এই তাঁহার এক মহত্ত্ব ও মৌলিকতা।

দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানানুরাগ ও ভক্তি যে কেবল সুনীতিকে উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা নহে; তাঁহার আর এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি দেখা গিয়াছিল। এদেশে ও অপর দেশে সচরাচর দেখিতে পাই, ধার্ম্মিকগণ, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সাধনে নিমগ্ন ব্যক্তিগণ, আধ্যাত্মিক চিন্তায় এমনি নিমগ্ন থাকেন যে, জগতের সৌন্দর্য্যের প্রতি বা মানব-জীবনের সুখ সৌভাগ্যের প্রতি যেন তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। যিনি ধর্ম্ম-সাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য তাঁর মুখ বিরস ও বিষণ্ণ, দৃষ্টি ঔদাসীন্যপূর্ণ, মন পার্থিব বা সামাজিক সৌন্দর্য্যাদির প্রতি অন্ধপ্রায়—এই মানবের সাধারণ ধারণা। অন্ততঃ ধর্ম্মসাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য শব্দ ব্যবহার করিলে লোকের মনে এইরূপ একটা ছবি আসিয়া উদিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তি জগতকে ও মানব-সংসারকে তাঁহার নিকট সুন্দর ও মনোরম করিয়া দিয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আর কোনও মানুষকে এরূপ মগ্ন হইতে দেখিয়াছি কি না মনে হয় না। তিনি সুন্দর ফুলের গুচ্ছটী দেখিলে আনন্দে প্রফুল্ল

হইয়া উঠিতেন; পূর্ণচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাপন করিতেন; গিরিপৃষ্ঠে সুন্দর বনরাজির মধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিতেন; সুন্দর গিরি-নির্ঝরিণীর নৃত্য দেখিবার জন্য বহু বহু যোজন পথ অতিক্রম করিতেন; এবং ঘন মেঘরাজির পশ্চাতে নবোদীয়মান বা অস্তগমনোন্মুখ রবির আভা দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অন্তরালে তিনি সেই পরম সুন্দরকে লক্ষ্য করিতেন। দার্জ্জিলিং গিরিশৃঙ্গে বাসকালে একদিন দেখা গেল, তিনি তাঁর গৃহের বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইয়া অদূরে মেঘমালামণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কি বলিতেছেন; কাণ পাতিয়া শোনা গেল, তিনি মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "এত লজ্জা কেন, ঘোমটা দিয়েছ কেন, মুখটা খোলো একবার দেখি।" ইহা শুনিলে কে না হাস্য করিবেন? ইহা কি অশীতিপর বৃদ্ধের কথা। কিন্তু হাস আর চিন্তা কর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে হৃদয় মনের এই নিজস্ব ভাব কি দর্শনীয় বিষয়! অধিক কি তিনি অসুন্দর বা অশোভন কিছু সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সে দিন লিখিয়াছেন যে বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে কাপড় পরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলে, তিনি খোঁপাতে হাত দিয়া কিছু অসুন্দর দেখিলে বলিতেন, "খোঁপা ভাল করে বেঁধে এস।"

মানব সমাজের সুখ ও সৌন্দর্য্যের সহিতও তাঁর হৃদয়ের আশ্চর্য্য যোগ ছিল। মানব জীবনের সমুদয় নির্ম্মল সুখ ও পবিত্র ভোগের মধ্যে তিনি ভোক্তাদের সঙ্গে একহৃদয় হইতেন। তাঁহার কলিকাতার ভবনে অবস্থিতি কালে প্রায় প্রতিদিন অন্তঃপুরের নারীগণ, তাঁহার শিশু পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী, প্রপৌত্র প্রপৌত্রী, বা প্রদৌহিত্র প্রদৌহিত্রীদিগকে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বসন ভূষণ পরাইয়া বেড়াইতে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইতেন। একদিন আমি এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম, যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণন করিতেছি।

আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, মহর্ষি ধর্ম্ম প্রসঙ্গে মগ্ন হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন; নয়ন মুদ্রিত করিয়া সেই রসাস্বাদ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আট দশটি শিশু বসন ভূষণ পরিয়া আসিয়া উপস্থিত, সর্ব্ব কনিষ্ঠটীর বয়ঃক্রম দুই তিন বৎসরের অধিক হইবে না। তাহারা আসিয়া দেখিল মহর্ষি ধ্যানস্থ আছেন, আর নড়া চড়া নাই; চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার বাম দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমরা ত গুরুদেবকে ধ্যানস্থ দেখিয়া মৌনী ছিলাম, তাহাদের মৌনভাব যেন তাহারও অধিক বোধ হইল। যেন নড়ে কি নড়ে না, নিশ্বাস ফেলে কি ফেলে না! কতক্ষণ পরে মহর্ষি চক্ষু মেলিলেন। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র হাসিয়া," কি তোমরা এসেছ?" বলিয়া প্রত্যেকের দাড়িতে হাত দিয়া আদর করিলেন এবং প্রত্যেকের বসন ও ভূষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। তৎপরে একটি শিশুর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম পড়তে শিখেছ?" সে মস্তক নাড়িয়া জানাইল,—হাঁ। তখন তাহাকে তাহা পাঠ করিতে বলিলেন, এবং তার ক্ষুদ্র ক্ষীণস্বরের

সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর একটি শিশুর দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। —তুমি কি "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলোনারে তাঁয়—এটা গাইতে শিখেছ?" সে মাথা নাড়িয়া বলিল হাঁ। "তবে গাও দেখি।" অমনি তার সঙ্গে গলা মিলাইয়া "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলোনারে তাঁয়" গাইতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তাহারা একে একে তাঁর চরণে প্রণত হইয়া বেড়াইতে গেল। সেদিন সে দৃশ্য যে কি সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহা বলিবার নয়, চিরদিন স্মৃতিতে জাগিতেছে।

অল্প দিন হইল সার হেনরি কটনের প্রণীত "ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় স্মৃতি" পড়িতে পড়িতে একস্থানে দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন যে একদিন তিনি ভারতপূজ্য সুপ্রসিদ্ধ লর্ড রিপনের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন যে লর্ড রিপন তাঁহার গৃহসংলগ্ন উদ্যান মধ্যে তাঁহার শিশু পৌত্র পৌত্রীগণের সহিত একপায়ে লাফাইয়া খেলা করিতেছেন। কটন লিখিয়াছেন "দেখিয়া বড় ভাল লাগিল।" আমরা পড়িয়া বলিলাম শুনিয়া আমাদেরও ভাল লাগিল। আর একটি সুন্দর দৃশ্যের কথা আর একবার পাঠ করিয়াছিলাম। একজন মার্কিন দেশীয় ভদ্রলোক একবার মহামতি রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁর প্রসিদ্ধ হাওয়ার্ডেন কাসেল নামক ভবনে গেলেন। নীচের ঘরে গিয়া চাকরাণীর হাতে নিজের নামাঙ্কিত পত্র উপরে পাঠাইলেন। তিনি নীচে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে উপর হইতে ওদিকে আদেশ আসিয়া উপস্থিত যে তাঁহাকে উপরে যাইতে হইবে। তিনি উপরে গিয়া বৈঠকখানা ঘরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াই দেখেন যে গ্লাডষ্টোন দুই জানু ও দুই হাতের উপরে ভর করিয়া ঘোড়া হইয়া চলিতেছেন, আর তাঁর একটি পৌত্র পৃষ্ঠোপরে বসিয়া তাঁকে চালাইতেছে এবং চাবুক মারিয়া বলিতেছে, "ঘোড়াটা কোনও কর্ম্মের নয়" তাই গৃহস্থ রমণীদিগের এত হাস্য! তৎপরক্ষণেই গ্লাডষ্টোন উঠিয়া সমাগত বন্ধুর সহিত গভীর রাজনীতি চর্চ্চায় নিমগ্ন হইলেন। এক দিকে গভীর রাজনীতি চর্চ্চা অপরদিকে শিশুর সহিত এই ক্রীড়া এই উভয়ের সম্মিলন কি সুন্দর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও সর্ব্ববিধ গার্হস্থ্য সামাজিক কর্ত্তব্য সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ করা—উভয় একত্র মিলিয়াছিল, তাহাও তাহার জীবনের এক অপূর্ব্ব মৌলিকতা।

আর একটি বিষয় স্মরণ হইতেছে যাহাও উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি কাব্যরসগ্রাহী লোক ছিলেন। সুন্দর কবিতা পড়িতে ও শুনিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার নিকটে গেলেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের ও কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের প্রণীত সঙ্গীত ও কবিতা হইতে অংশবিশেষ মুখস্থ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেন। "শোন শোন রবি কেমন গান বেঁধেছে।" এ সম্বন্ধে একদিনকার ঘটনা ভুলিব না। সেদিন তাঁর ভবনে ব্রাহ্মদের এক সভাতে আমি স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করিলাম। সে কবিতাটী আমার সম্পূর্ণ মনঃপুত হয় নাই। কিন্তু উপরে গেলে মহর্ষি আমাকে বুকে জড়াইয়া

আমি ত তার গোলাম।" তিনি এমনি কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইহা তাঁহার মৌলিকতা।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার জীবনের প্রধান মৌলিকতা এই যে, ধর্ম্ম তাঁর সাধনের বস্তু ছিল, প্রদর্শনের বস্তু ছিল না। লোকে কি হইলে ধার্ম্মিক বলিবে এ চিন্তা একদিনও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। ঈশ্বর-চরণে বসিয়া ধর্ম্মের যে তত্ত্ব হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহা কিরূপে জীবনে সাধন করিব, ইহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এজন্য গেরুয়া বসন ধারণ করা, পোষাক পরিচ্ছদে ধার্ম্মিক দেখান, এদিকে কখনই তাঁর গতি দেখা যায় নাই। আমাদের চক্ষের উপরে কত ধর্ম্মসাধক দেখা দিলেন এবং অন্তর্হিত হইলেন, যাঁহারা গৈরিক বসন, জপের মালা, দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করিলেন, বৈরাগ্যের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অনাসক্তির পরিচয় দিলেন; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কখনই সে পথে পদার্পণ করেন নাই। আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে চিরদিন সুশৃঙ্খল, সংযত, স্বাভাবিক ও শোভন থাকিতেন। প্রাতে স্নানান্তে সুপরিষ্কৃত, শোভন পরিচ্ছদাদি পরিয়া বাহির হইতেন, যেন কোনও দরবারে যাইতেছেন এবং সমস্ত দিন সেইভাবেই যাপন করিতেন। ভিতরকার কথাটা এই ছিল, যেমন কবিদের মধ্যে দুই শ্রেণীর কবি দেখা যায়; এক শ্রেণীর কবির দৃষ্টি থাকে পাঠকদিগের শ্রুতিসুখের উপরে অর্থাৎ কোন শব্দটী কিরূপে প্রযুক্ত হইলে ভাল লাগিবে, এবং ভাবোদয় করিবে তাহার উপরে; আর মনের উপরে অর্থাৎ কোন শব্দটী ঠিক হৃদয় নিহিত ভাবটীকে ব্যক্ত করিবে, তাহার উপরে। তেমনি ধর্ম্ম জগতের সাধকগণের মধ্যেও দুই শ্রেণীর সাধক দেখা যায়। এক শ্রেণীর সাধক পরের দৃষ্টি ভুলিতে পারেন না; যে পথে অপরের প্রশংসা সেই পথেই তাঁহাদের গতি হয়; যে সাধনে, যে পোষাকপরিচ্ছদে লোকে ধন্য ধন্য করিবার সম্ভাবনা তাহাই তাঁহারা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকগণ অপরের স্তুতি নিন্দার উপরে উঠিয়া নিজের হৃদয়নিহিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর সাধক ছিলেন। অধ্যাত্ম-যোগের মুহূর্ত্তে তিনি যে সাধন পথ দেখিতে পাইতেন, ফলাফল বিচারবিহীন হইয়া তাহারই অনুসরণ করিতেন। লোকে কি চায়, ইহা না দেখিয়া ঈশ্বর কি চাহিতেন, ইহাই তিনি দেখিতেন। তাঁহার জীবনের সকল প্রকার মৌলিকতার মূল এইখানে ছিল।

এইরূপে যেদিক দিয়াই দেখি, সেইদিকেই দেখিতে পাই যে তিনি আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতার বিষয়ে চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে যেন তল পাই না। যেমন ডুবুরি সাগর গর্ভে অতল জলে কিরূপে যায়, কোথায় যায়, তাহার তত্ত্ব আমরা জানি না, কেবল যে মুক্তা তুলিয়া আনে তাহাই আমরা দেখি; সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের এই ডুবুরি কোন গভীর জলে কিরূপে যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন বলিতে পারি না, কেবল যাহা তুলিয়াছেন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। অধিক আর কি লিখিব।

মহাকবি দণ্ডী

অসংখ্য সংস্কৃত গদ্যগ্রন্থ কালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র বাণভট্ট-প্রণীত "কাদম্বরী" ও "হর্ষচরিত", সুবন্ধু-কৃত "বাসবদত্তা" ও দণ্ডী-প্রণীত "দশকুমার চরিত" বিদ্যমান। অপরাপর দুই চারিখানি গদ্যগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও কাব্য-রস-ঘটিত সুনিপুণ রচনালঙ্কৃত উপাখ্যান পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলিতেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং গদ্য-কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থগুলি সকলেরই আদরণীয়। আমরা এই প্রবন্ধে দশকুমারচরিত-রচয়িতা দণ্ডীর বিষয় আলোচনা করিব।

কবি দণ্ডীর প্রশংসা প্রাচীন শ্লোকাদিতে প্রসিদ্ধ। বাল্মীকি, ব্যাসের পরই দণ্ডীর নাম উল্লেখ করিতে যে অনেকে কুণ্ঠিত হন নাই, নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার প্রমাণ ঃ—

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবং।
কবীতি তু ততো ব্যাসে কবয়-স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

অর্থাৎ বাল্মীকি যখন জন্মগ্রহণ করিলেন তখন 'কবি' এই শব্দটির উৎপত্তি হইল। কিন্তু কবি-শব্দ একবচন হইয়াই রহিল। আর একজন কবি না হইলে ত আর দ্বিবচন হইবে না। ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে কবি শব্দের দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ হইল এবং দণ্ডী জন্মগ্রহণ করিলে কবি-শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগ হইল।

কবি দণ্ডী কোন্ কোন্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বিচার্য্য। রাজশেখরকৃত শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ঃ—

"ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥"

অর্থাৎ যেমন তিন অগ্নি, তিন বেদ, তিন দেব, ও তিন গুণ পৃথিবীতে প্রথিত, সেইরূপ দণ্ডীর তিনটি রচনাও ত্রিভুবন-বিদিত। আমরা দণ্ডীকৃত "কাব্যাদর্শ" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ ও "দশ-কুমার চরিত" নামক গদ্যকাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তৃতীয় গ্রন্থ কি তাহা নির্ণেয়। পিস্‌কেল (Pischel) মত প্রকাশ ক[illegible] যে "মৃচ্ছকটিক" গ্রন্থ দণ্ডী-কৃত। এ [illegible] আমাদের মতে ভিত্তিহীন। পিস্‌কেল [illegible] যুক্তির সমর্থনস্বরূপ দেখাইয়াছেন যে মৃচ্ছকটি[illegible] এই শ্লোক বিদ্যমান।

"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎ-পুরুষ-সেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা॥"

প্রথম অঙ্ক।

অন্ধকারে অঙ্গ লিপ্ত
অঞ্জন বরিষে নভস্থল।
অসাধুর সেবা সম
দৃষ্টি মোর এবে গো নিষ্ফল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শে এই শ্লোকটি আছে—

"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
ইতীদমপি ভূয়িষ্ঠমুৎপ্রেক্ষালক্ষণান্বিতম্॥"

এই দুই শ্লোকের প্রথম চরণটি এক ব[illegible] যে উভয় গ্রন্থই এক ব্যক্তির রচনা ইহা [illegible] যায় না। কারণ কাব্যাদর্শ অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহাতে অলঙ্কার-বিশেষের উদাহরণস্বরূপ অন্য গ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে দণ্ডী বলিতেছেন "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" ইত্যাদি স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ইহার

দ্বারা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে কাব্যাদর্শ মৃচ্ছকটিকের পর রচিত। মৃচ্ছকটিক শূদ্রক-রচিত বলিয়া প্রথিত। দণ্ডীর রচনায় ও শূদ্রকের রচনায় কোন সাদৃশ্য নাই। সুতরাং পিদ্‌কেলের যুক্তির কোন ভিত্তি নাই।

আমরা দণ্ডীর কাব্যাদর্শে "ছন্দোবিচিতি" ও "কলাপরিচ্ছেদ" নামক দুইখানি গ্রন্থের নাম পাই। কাব্যাদর্শে তিনি যে সকল বিষয় সম্যক্ আলোচনা করেন নাই, তাহা ছন্দোবিচিতি-গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, এ কথা দণ্ডী নিজেই লিখিয়াছেন। যথা—

"ছন্দোবিচিত্যাং সকলস্তৎপ্রপঞ্চো নিদর্শিতঃ।
সা বিদ্যা নৌস্তিতীর্ষূণাং গম্ভীরং কাব্য-সাগরম্॥"

কাব্যাদর্শ ৫।১১

অর্থাৎ ছন্দোবিচিতিতে সে সকল বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। কাব্য-সাগর পার হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সেই বিদ্যা নৌকাস্বরূপ।

আমাদের মতে এই ছন্দোবিচিতিই দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত। তবে সুবন্ধুকৃত 'বাসব-দত্তা' নামক গদ্য-গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে যথা—"ছন্দোবিচিতিরিব মালিনী সনাথা।" ইহা দ্ব্যর্থ। এক অর্থ এই 'যেমন ছন্দোবিচিতিগ্রন্থে মালিনী ছন্দের উল্লেখ আছে সেইরূপ।' জেকোবি (Jacobi) তাঁহার Indische Studien XVII গ্রন্থে ৪৪ পৃষ্ঠায় ছন্দোবিচিতি দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান আমাদের মতে সমীচীন।

কলাপরিচ্ছেদ নামক যে গ্রন্থ দণ্ডী লিখিবেন বলিয়া কাব্যাদর্শে উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস সে গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে শ্লোকটি এই—

"ইত্থং কলাচতুঃষষ্টিবিরোধঃ সাধু নীয়তাম্।
তস্যাঃ কলা-পরিচ্ছেদে রূপমাবির্ভবিষ্যতি॥"

কাব্যাদর্শ ৩।১৭১

ইহাতে বলা হইয়াছে চতুঃষষ্টিকলার বিবরণ কলা-পরিচ্ছেদে আবির্ভূত হইবে। এই ভবিষ্যৎকাল প্রয়োগে বুঝা যায় যে এই গ্রন্থ তখনও রচিত হয় নাই। পিটারসন্ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ছন্দোবিচিতি ও কলা-পরিচ্ছেদ কাব্যাদর্শেরই অংশবিশেষ। ইহাদের পৃথক্ গ্রন্থ বলা যায় না। কিন্তু আমরা সুবন্ধুর বাসবদত্তায় ছন্দোবিচিতির পৃথক্ উল্লেখ পাইয়াছি। খুব সম্ভব এই দুইখানি পৃথক্ গ্রন্থ। কিন্তু কলা-পরিচ্ছেদ বোধ হয় দণ্ডী রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারিলেও সে গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি আমরা ধরি যে কলা-পরিচ্ছেদ রচিত হয় নাই, তাহা হইলে দণ্ডীর তিন প্রবন্ধের নাম কাব্যাদর্শ, দশকুমারচরিত ও ছন্দোবিচিতি।

এক্ষণে আমরা দণ্ডীর কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। দণ্ডী একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন উইল্‌সন্ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পিটারসন্‌ও নিজ-সম্পাদিত দশকুমারচরিতের প্রস্তাবনায় (Part II.) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে উইল্‌সনের মত আদরণীয়। কিন্তু যদিও এই দুইজন বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র তথাপি বাধ্য হইয়া ইহা বলিতে হইতেছে যে ইহাদের এই যুক্তির কোন মূল নাই। আমরা পিটারসনের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনের চেষ্টা করিব।

পিটারসনের প্রথম যুক্তি এই যে দণ্ডী বামন অপেক্ষা আধুনিক। বামন কাব্যালঙ্কার-

সূত্রবৃত্তিতে লিখিয়াছেন –"হীনত্বাধিকত্বলিঙ্গবচনভেদাসাদৃশ্যাসম্ভবাস্তদ্দোষাঃ।" (৪।২।৮)।

কাব্যাদর্শে আছে—

"ন লিঙ্গবচনে ভিন্নে ন হীনাধিকতাপি বা।
উপমা-দূষণায়ালং যত্রোদ্বেগো ন ধীমতাম্॥"
২।৫১

এতদ্ব্যতীত বামন অনন্বয়, সন্দেহ, উপমারূপক ও উৎপ্রেক্ষাবয়ব এই চার প্রকার অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডী কাব্যাদর্শে লিখিয়াছেন ঃ—

"অনন্বয়সন্দেহাবুপমাস্বেব দর্শিতৌ।
উপমা-রূপকং চাপি রূপকেষ্বেব দর্শিতম্॥
উৎপ্রেক্ষাভেদ এবাসাবুৎপ্রেক্ষাবয়বোপি চ।"
২।৩৫৮ ও ৩৫৯

পিটারসনের বক্তব্য এই, দণ্ডী বামনের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বলিয়াছেন দণ্ডী দুই প্রকার রীতির (গৌড়ী ও বৈদর্ভীর) উল্লেখ করিয়াছেন। (কাব্যাদর্শ ১।৪০—৩৩) বামন তিন প্রকার রীতির (বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালীর) উল্লেখ করিয়াছেন। (কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি ১।২ ও ৯–১৩)

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন দণ্ডী অপেক্ষা বামন প্রাচীন। (Proceedings of the Bengal Asiatic Society for 1887, p. 193) বামনের গ্রন্থে ভবভূতির শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বীরচরিতের "দোর্দণ্ডাঞ্চিত চন্দ্রশেখরধনুঃ" ইত্যাদি শ্লোক বামন উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাজেই বামন তাহার পরবর্ত্তী। পিটারসন্ বামনের সময় ৮ম শতাব্দী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে দণ্ডী তাহারও পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন আমরা এই যুক্তির বিচার করিব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা চন্দ্রালোক, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্য-দর্পণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, একাবলী, ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রদীপ, রসগঙ্গাধর, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, সাহিত্যকৌমুদী, কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় একইরূপ দেখিতে পাই। অলঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পৃথক্ ভাগে নির্দ্দেশ এক এক গ্রন্থকার এক এক রূপে করিয়াছেন। কেবল ইহা দেখিয়া কোন গ্রন্থকারকে কোন গ্রন্থকারের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা পরবর্ত্তী বলা যায় না। কেবল রীতির ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিয়া বামন পূর্ব্ববর্ত্তী, এ কথা বলা যায় না। পূর্ব্বের অন্য কোন আলঙ্কারিকের গ্রন্থও থাকিতে পারে। অতএব কেবল এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন মত স্থির করা অনুচিত।

আমরা এখন নিশ্চিত প্রমাণের অনুসন্ধান করিব। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে দণ্ডী স্বীয় কাব্যাদর্শে ছন্দোবিচিতি নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। সুবন্ধু কবি স্বীয় বাসবদত্তায় এই ছন্দোবিচিতির উল্লেখ করিয়াছেন ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। দণ্ডী নিশ্চয়ই এই সুবন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক ছিলেন। বাণভট্ট স্বীয় হর্ষচরিতে এই সুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্॥"

এই শ্লোকটি দ্ব্যর্থ। যেমন বাসবদত্ত (ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত) শক্তি (নামক অস্ত্র) কর্ণগোচর হওয়াতে (বীরবর কর্ণ প্রাপ্ত হওয়াতে) পাণ্ডুর পুত্রগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ কর্ণগোচর (শ্রবণগোচর) হওয়াতে বাসবদত্তা (সুবন্ধুকৃত আখ্যায়িকা) কবিগণের দর্পচূর্ণ করিয়াছিল। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সময় বিদ্যমান ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং সুবন্ধু ইহার পূর্ব্বে। সুবন্ধুরও পূর্ব্বে দণ্ডী বিদ্যমান ছিলেন।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দণ্ডী কিছুতেই বামনের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। সুতরাং উইলসন্ বা পিটারসনের যুক্তি সমীচীন নহে।

আরও এক কথা এই, কাদম্বরী ও কাব্যাদর্শে একভাবের রচনা দেখিয়া পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বাণভট্টের গ্রন্থের ভাব দণ্ডী লইয়াছেন এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রমাণ করিয়াছি দণ্ডী তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং বাণভট্টই বরং দণ্ডীর অনুকরণ করিয়াছেন। সে স্থলটি এই—

"অরত্নালোকসংহার্য্যমবার্য্যং সূর্য্যরশ্মিভিঃ।
দৃষ্টিরোধকরং যূনাং যৌবন-প্রভবং তমঃ॥"

কাব্যাদর্শ ২।১৯৭

অর্থাৎ যুবকদিগের যৌবনসুলভ তমঃ সদসদ্ বিচার করিতে দেয় না। এই তমঃ (অন্ধকার) রত্নালোকে বা সূর্য্যকিরণে দূরীভূত হয় না। কাদম্বরীতে আছে—

"কেবলঞ্চ নিসর্গত এব অভানুভেদ্যম্ অরত্নালোকোচ্ছেদ্যম্ অপ্রদীপ প্রভাপনেয়ম্ অতিগহনং তমো যৌবন-প্রভবম্।"

অর্থাৎ যৌবনোৎপন্ন তমঃ **স্বভাবতঃই** সূর্য্যকিরণ, রত্নালোক বা প্রদীপশিখার দ্বারা দূরপনেয় ও ইহা গাঢ়।

পিটারসন্ আর একটি কথা লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। তিনি বলিয়াছেন মৃচ্ছকটিক প্রাচীন গ্রন্থ নহে। যখন লোকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা করিতে ভুলিয়া যাইতেছিল সেই সময়ে ইহা রচিত হয়। সুতরাং কাব্যাদর্শে যখন মৃচ্ছকটিকের শ্লোক পাওয়া যায় তখন কাব্যাদর্শও বহু প্রাচীন নহে। মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনতা সকলেই স্বীকার করেন। আমরা পিটারসন্ যাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন সেই উইল্‌সনের মত উদ্ধৃত করিলাম—

"From the considerations thus stated we cannot but regard the "Mrichchakati" as a work of considerable antiquity, and from internal evidence may very safely attribute it to the period when sudraka the sovereign reigned, whether that be reduced to the end of the second century after Christ or whether we admit the traditional chronology, and place him about a century before our era."

[Wilson's Theatre of the Hindus.]

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। (প্রবাসী)

এখন আমরা দণ্ডীর দশকুমারচরিত হইতে তাঁহার কাল সম্বন্ধে কি আভাস পাওয়া যায় তাহা দেখিব। কবি প্রথম শ্লোকে আটবার 'দণ্ড' শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজের দণ্ডী নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। সে শ্লোকটি এই—

"ব্রহ্মাণ্ডচ্ছত্রদণ্ডঃ শতধৃতিভবনাম্ভোরুহো নালদণ্ডঃ
ক্ষৌণীনৌকূপদণ্ডঃ ক্ষরদমরসরিৎ পট্টিকাকেতুদণ্ডঃ
জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডস্ত্রিভুবনবিজয়স্তম্ভ
দণ্ডোহঙ্ঘ্রিদণ্ডঃ
শ্রেয়স্ত্রৈবিক্রমস্তে বিতরতু বিবুধদ্বেষিণাং
কালদণ্ডঃ ॥"

[পূর্ব্বপীঠিকা, প্রথমোচ্ছ্বাস]

দশকুমারচরিতে মগধরাজ ও মালব-রাজের শত্রুতার পরিচয় পাই। পুষ্পপুরী (পাটলিপুত্র) মগধের ও উজ্জয়িনী বা অবন্তী মালবের রাজধানী। বিন্ধ্য পর্ব্বত, কাবেরী নদী, অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পা (বর্ত্তমান ভাগলপুর); কাশী, গঙ্গা, বিদেহ-রাজধানী। মিথিলা, সুহ্মদেশ, বারাণসীর মণিকর্ণিকা, সুহ্মরাজধানী দামলিপ্ত (তাম্র-লিপ্ত), ত্রিগর্ত্তজনপদ (বর্ত্তমান পাতিয়ালা) দ্রবিড়দেশস্থ কাঞ্চীনগরী (বর্ত্তমান Conjeve-ram), সৌরাষ্ট্রে বলভীনগরী (বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশ) লাট, শ্রাবস্তী, শূরসেন প্রদেশে মথুরানগরী ও কলিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবও তখন ছিল। বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকার কথাও পাওয়া যায়। "অর্হন্তিকা", "শ্রমণিকা" (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস) প্রভৃতি শব্দও রহিয়াছে। চাণক্যের নামও উল্লিখিত হইয়াছে যথা "সত্যমাহ চাণক্যঃ—চিত্তজ্ঞানানুবর্ত্তিনোঽনর্থা অপি প্রিয়াঃ স্যুঃ।" যবনদিগের জাহাজের কথাও বর্ণিত হইয়াছে। সেই জাহাজের কাপ্তেনের নাম রামেষু। যথা—"প্রত্যুষস্যদৃশ্যত কিমপি বহিত্রম্। অমুত্রাসন্ যবনাঃ। তে মামুজ্জ্য রামেষু নাম্নে নাবিক নায়কায় কথিতবন্তঃ।" ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত রচনাপ্রণালীও দ্রষ্টব্য। দণ্ডী যে সকল উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে স্থলে স্থলে দীর্ঘ সমাস ও লিপিচাতুরী দেখাইয়াছেন। অনুপ্রাসের উপরই তাঁহার লক্ষ্য অধিক। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতি লেখকগণ রচনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও উপাখ্যানের সৌন্দর্য্যে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। দীর্ঘ সমাস, শ্লেষপ্রয়োগ প্রভৃতি সুবন্ধু ও বাণভট্টের অতি প্রিয়। দণ্ডী কখনও গল্পের মাধুর্য্যের বিনিময়ে এ সকল প্রয়োগ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে দণ্ডীর সরল গদ্যই পরে বিবিধ অলঙ্কারভূষিত হইয়া পড়িয়াছে।

দণ্ডীর দশকুমারচরিতে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই বাৎস্যায়নের কালনির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর "প্রাচীন ভারতে লোকবৃত্ত ও সমাজ স্থিতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য [সাহিত্য-সংহিতা, ২য় বর্ষ]। ইনিই যদি চাণক্য হন তাহা হইলে ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পর নিশ্চয়ই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শেষ পরিচয় উপাখ্যানগুলিতে। মন্ত্রের অলৌকিক শক্তির প্রতি লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এমন কি মন্ত্রবলে এক ব্যক্তি অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে একথা বিশ্বাস করিতেও লোক কুণ্ঠিত হইত না। ইন্দ্রজালবিদ্যাও এই সময়ে উন্নতির সোপানে উঠিয়াছিল।

ইন্দ্রজালের দ্বারা অনেক অসম্ভব বিষয়ও প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত হইত। লোকের ধর্ম্মজ্ঞান তত প্রখর ছিল না। কার্য্যসিদ্ধির জন্য নীতিবিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে রাজপুত্রগণও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজপ্রাসাদে বহু ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হইত। বণিক্‌গণ পোতারোহণে সমুদ্রে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিতেন। রাজপুত্রগণ বাল্যে বিবিধ ভাষা, ষড়ঙ্গসহিত বেদ, কাব্য, নাটক, আখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিহাস, পুরাণ, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা, চাণক্য ও কামন্দকীর নীতিশাস্ত্র, গীত, বাদ্য, অশ্ব, গজ প্রভৃতিতে আরোহণ ও অস্ত্রশিক্ষায়, এমন কি চৌর্য্য ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতেও অভিজ্ঞ হইতেন। ব্রাহ্মণগণকে রাজসরকার হইতে ভূমি দান করা হইত। স্থলে স্থলে গুপ্তধন প্রথিত হইত। এই প্রসঙ্গে 'দীনার' মুদ্রারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

দণ্ডীর প্রতিভা অসাধারণ ছিল। সরল অথচ তেজস্বী ভাষার স্রোত তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তিনি বিবিধ কৌশলে স্বীয় রচনার উৎকর্ষতা সাধন করিতেন, কিন্তু তিনি যে অলঙ্কারগুলি ব্যবহার করিতেন তাহা যথাস্থানেই প্রযুক্ত হইত। বাণভট্ট প্রভৃতি লেখকও স্থলে স্থলে অলঙ্কারের ভারে বক্তব্যকে নিপীড়িত করিয়াছেন। আমরা এমন বলি না যে তাঁহার সমস্ত উপাখ্যানগুলিই মৌলিক। হইতে পারে পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পগ্রন্থ হইতে দণ্ডী বহু সাহায্য পাইয়াছেন। কিন্তু যেরূপ সুনিপুণ কৌশলে তিনি সেগুলিকে সজ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা সংস্কৃত সাহিত্যে কবির নাম চির-নূতন করিয়া রাখিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ।

পল্লীবালিকাদের উৎসব

আমাদের দেশের লোক এখন দেশের লুপ্ত প্রায় উৎসব-চলিত গাথা ছড়া, ব্রতকথা প্রভৃতি সংরক্ষণের দিকে মন দিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখন বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সকলও এ বিষয়ের যথেষ্ট আদর করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে উৎসব ও গাথাকথার সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত সংগ্রহেও আমরা সংগ্রহ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সেকালে আমাদের কিরূপ শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের আদর্শ প্রাপ্ত হইত তাহাই যৎসামান্য ভাবে কথিত হইবে।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা বালিকা পদবাচ্যা ছিলেন, সেরূপ হিন্দু বালিকাদের বাল্য জীবনের স্মৃতির সহিত নানা ব্রত নিয়মের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এখন তাঁহারা গৃহিণী হইয়াছেন কিন্তু নিজেদের শৈশবের কথা বলিতে গেলে সেই সব কাহিনীতেই সে কথার অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া তোলেন। বালিকাদের ব্রত নিয়ম সহরাঞ্চলে এখন প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে, কেবল পল্লীগ্রামে এখনো সে সব ব্রতের লুপ্তাবশেষ

পল্লীগ্রামের বালিকারা নানা ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু নববর্ষের প্রারম্ভে পুণ্য বৈশাখেই তাহার ধূমটা কিছু অধিক। বৈশাখ মাসটা তাহাদের পক্ষে একটা উৎসবের মতই। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা হইতে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরীরা পর্য্যন্ত বৈশাখের প্রভাতে গঙ্গাতীরে রাশি রাশি চম্পক, আকন্দ, মল্লিকা পুষ্পপূর্ণ সাজি হস্তে ব্রত করিতে একত্র হয়। কেহ "চাঁপা চন্দন", কেহ "হরির চরণ" কেহ "শিবপূজা", কেহ "সম্পদ নারায়ণ", কেহ "অশ্বত্থ নারায়ণ" এইরূপে নানা জনে নানা ব্রতের ব্রতিনী। ব্রতের মন্ত্রগুলিও তাহাদের শিশু হৃদয়ের মতই সহজ সরল। "আকন্দের ফুল, বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গার জল, এই পেলে তুষ্ট হন্ ভোলা মহেশ্বর" কুমারীর শিবপূজার মন্ত্র এই পর্য্যন্ত। কিন্তু যাহারা ব্রতের পাঠশালায় কেবল অ আ মাত্র শিখিতেছে তাহাদের ব্রতের মন্ত্রগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। তাহাদের মধ্যে কাহারো—কাহারো ভাষার আধ আধ ভাব পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। কার্ত্তিকে শিউলিফুলে যমপুকুর, অঘ্রাণে সেঁজুতি। এ ব্রতটির নাম সপত্নী নিবারণী দেওয়াই উচিত ছিল। কেননা সপত্নী ভীতি নিবারণোদ্দেশেই ইহার অধিকাংশ মন্ত্র রচিত, এবং রাঢ়িশ্রেণীর কুলীন কন্যাদের মধ্যেই এ ব্রতের বেশী প্রসার। পৌষে "তুষতুষলা" ব্রত করিয়া তাহারা বৈশাখে "পুণ্যি পুকুর" ও "দশ পুতুল" পূজা করিতে বসে। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের কল্পনা, আশা ও আদর্শ এই ব্রত মন্ত্রগুলিতে অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।

"এবার ম'রে মনিষ্যি হব ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নেব
সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব,
লক্ষ্মণের মত দেওর পাব, দশরথ শ্বশুর পাব,
কৌশল্যা শাশুড়ী পাব, লব কুশ পুত্র পাব।
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হব,
দূর্ব্বার মত লজ্জাশীলা হব,
দুর্গার মত সোহাগী হব,
ষষ্ঠীর মত জেওছ (অ-মৃত পুত্রা) হব,
গঙ্গার মত শীতলা হব, পৃথিবীর মত ভার সব'।"

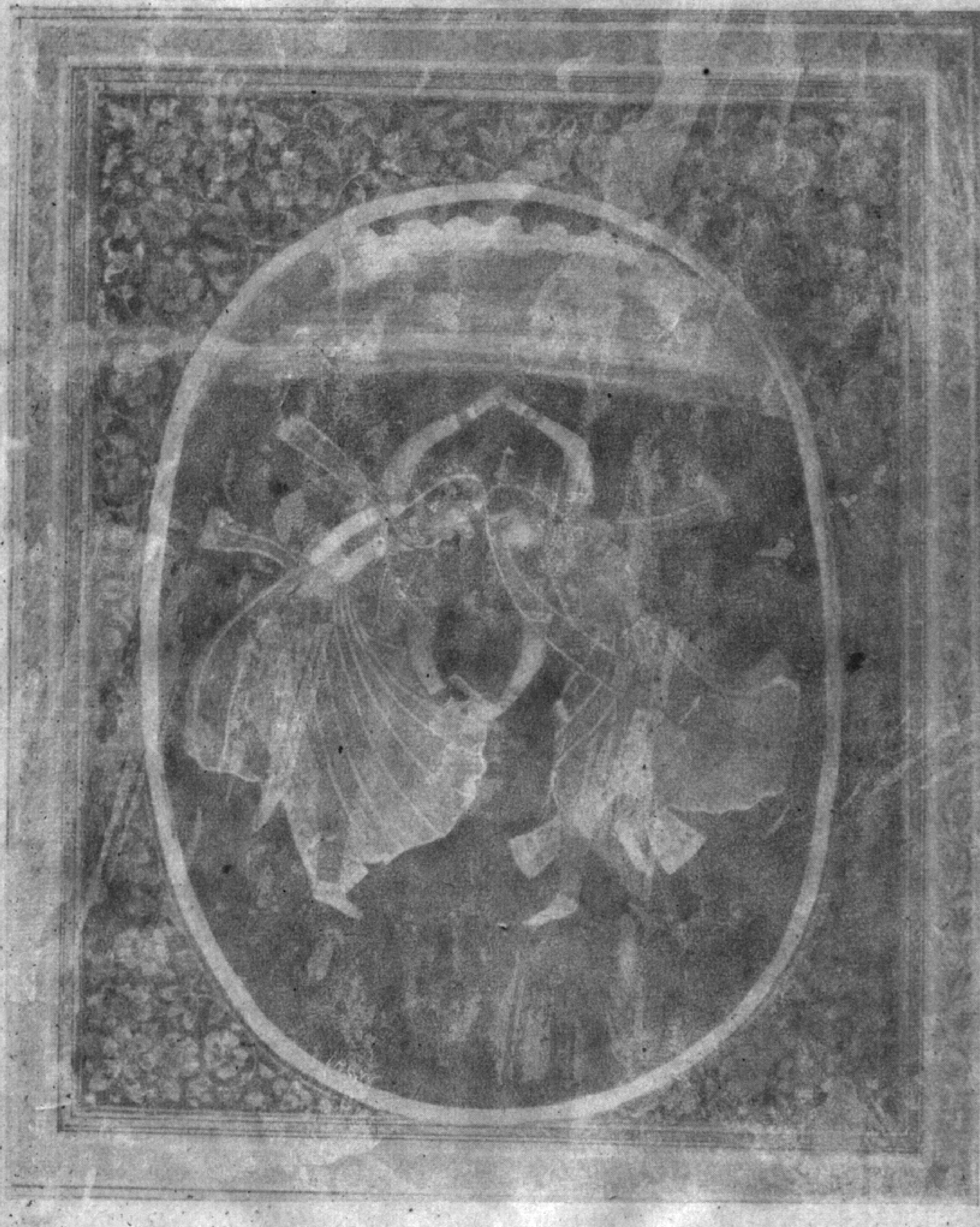
সেকাল বলিয়া তখনকার বালিকারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে বড় কম করিত বড় স্বল্পে সন্তুষ্টা হইত তা নয়। তাহাদের কামনাগুলি বড় ছোট খাটো ছিল না। পুণ্যি পুকুরের মন্ত্র কয় ছত্রেই তাহার প্রমাণ।

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাইয়ের বোন্ পুত্রবতী;
হবে পুত্র মর্‌বেনা, পৃথিবীতে ধর্‌বেনা,
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে
মরণ হয় যেন এক গলা গঙ্গার জলে।"

"চাঁপা চন্দন" ও "হরির চরণ" কিশোরী বালিকারা করিয়া থাকে। চন্দনে হরির চরণ অঙ্কিত করিয়া ততোধিক শুভ্র মল্লিকা ও স্বর্ণ বর্ণ চম্পক দ্বারা বিবাহিতা বালিকারা হরিহরের পূজা করে।

"চাঁপা চন্দনে পূজলে হরি
শোকদুঃখ না পায় নারী!
জন্মিয়ে না দেখি যেন বন্ধুর মরণ,
জন্মিয়ে না দেখি যেন গুরুর মরণ,
জন্মিয়ে না দেখি যেন স্বামীর মরণ!
স্বতন্ত্রশয্যা নিঃসতা ঘর, শঙ্খ সিন্দুর অক্ষয় অমর।
বৈশাখের চাঁপা গঙ্গার জল, এই পেলে তুষ্ট হন্
ভোলা মহেশ্বর।"

"হরির চরণ" পূজাবশেষ মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য।



নৃত্য

প্রাচীন চিত্র হইতে

"হরি বলেন ওগো মা,
আজ কেন ছুখানি শীতল পা,
কোন্ যুবতী পূজে পা !
সে যুবতী কি চায় ?"—
"রাজ্যের রাজা স্বামী চায়,
দরবারের শোভা পুত্র চায়,
সভাউজ্জ্বল জামাই চায়, রূপবতী ঝি চায়,
গুণবতী বৌ চায় ! রাজা বাপ চায়,
রাণী মা চায়, কার্ত্তিক গণেশ ভাই চায়,
লক্ষ্মী স্বরস্বতী বোন্ চায় !
আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্ করে,
মেঝেয় ঘটী ঝক্‌মক্ করে,
গোয়ালে গরু মরাইয়ে ধান,
বৎসর বৎসর পুত্র চান্ !
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে
মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাজলে ;
রেথ' হরি চরণ তলে।"

এতক্ষণে হরিকে দরকার হইল। গ্রাম্য বালিকাদের উৎসব বলিতে এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠানই বুঝায়। বালকদের মত হুড়াহুড়ির আমোদ প্রমোদ বা থাওয়া দাওয়ার ধুমধাম তাহাদের মধ্যে বিরল। শৈশব হইতেই ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্যকামনায় এবং পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ার্থ তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই নানা ব্রত পালন ব্যপদেশে তাহারা নিয়ম ও অল্প বিস্তর কৃচ্ছ্র শিক্ষাতেও অভ্যস্থ হয়। তাহাদের ব্রতসংখ্যাও অগণ্য তাই তাহাদের উৎসবও অফুরন্ত !

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(Personal Hygiene)

[গত ১লা নভেম্বর তারিখে রাঁচি লিটারারি সোসাইটীর একটী অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে "স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা" নামক একটী প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাহার অংশ মাত্র। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রবন্ধের যথাস্থানে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত কতিপয় বিধির সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি এবং যে পাশ্চাত্য বিধিগুলি এদেশের উপযোগী নহে, যুক্তিসঙ্গত বিচার-পূর্ব্বক সেগুলির পরিহার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা অনেকানেক স্বাস্থ্যবিধি, সংস্কার ও অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক প্রথারূপে বহুকাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে এক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল বিধি অনেক স্থলেই বিজ্ঞানসম্মত, সুতরাং অবহেলার বিষয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে আমি ঋণী। তাঁহার প্রদত্ত Personal Hygieneএর বাঙ্গালা সংজ্ঞা "শারীর স্বাস্থ্য-বিধান" অর্থবোধক ও শ্রুতিসুখকর হইয়াছে।]

(১)

মুখবন্ধ।

স্বাস্থ্য-নীতি যথাবিধি পালন করিলে দেহের উৎকর্ষ সাধন ও অযথা ক্ষয় নিবারণ, জীবনী-শক্তির সংবর্দ্ধন এবং অকাল মৃত্যুর নিবারণ সংসাধিত হইয়া থাকে।

দেহ অনিত্য, সুতরাং যত্ন-সহকারে ইহা রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই, এই মহানিষ্ট-

মূলক সংস্কার এ দেশের লোকের অস্থি-মজ্জার মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা শয়নে, স্বপ্নে, চিন্তায়, কার্য্যে, এই অবসাদময় ভাবের অধিকার অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না। আমাদের জাতীয় জীবনে যে উৎসাহ, উদ্যম ও জীবনীশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে জগৎ ও দেহের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় সংস্কার পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র-বচনের যথার্থ মর্ম্ম যদি আমরা অবগত হইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেহ যে একেবারেই অবহেলার পদার্থ নহে, তাহা বুঝিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন —

"ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতি হেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং॥"

শরীর থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়; শরীর নষ্ট হইলে সকলই নষ্ট হয়।

অবশ্য, ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া শরীর রক্ষা করা কোন দেশের কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যদি শরীর-পাত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নহে, ইহা সকল দেশের ধর্ম্মোপদেশকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে কতদেশে কত লোক অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের তুলনায় প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। একটী সামান্য কথায় এই তত্ত্বটী সহজেই বোধগম্য হইবে। মনে করুন কোনও ব্যক্তি ভয়ানক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। যিনি তাঁহার শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার, এমন কি তদ্দ্বারা তাঁহার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে প্রাণের ভয় না করিয়া যখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহারা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়ান্ বিবেচনা করেন। কিন্তু যে সকল স্বাস্থ্যবিধি পালন করিলে এইরূপ বিপদের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তাঁহারা আপনাদিগকে সংক্রামকতার আক্রমণ হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যদি তাঁহারা তাহার অনুসরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্য আত্মত্যাগ হইলেও বিশেষভাবে অজ্ঞতার পরিচায়ক। এরূপ সাবধানতার অভাব আমাদের গৃহে গৃহে প্রতিদিন নয়ন গোচর হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা সংক্রামক রোগ প্রসার লাভ করিয়া কত লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে! কিন্তু ইহা যে মহা অনিষ্টমূলক এবং ঐ সকল স্বাস্থ্যবিধির পালন যে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেহ অনিত্য অতএব উহার নাশে শোচনা অকর্ত্তব্য, বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি "স্বধর্ম্মপালন" ও "দেহ-রক্ষা," এই দুইটী বিষয় তৌলে ওজন করিয়া, ধর্ম্ম-পালন শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অযথা দেহনাশ বা দেহের প্রতি অবহেলা করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই।

চরক বলিয়াছেন —

"ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগা তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥"

নীরোগ শরীর দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অসুস্থ শরীরে ইহাদিগের মধ্যে কোনটীকেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি বিদ্যা, কি সুখ, শরীর সুস্থ না থাকিলে ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর উপার্জ্জনের জন্য যে আয়াসের প্রয়োজন, তাহার সাধন ঐ ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যাঁহারা মনে করেন যে শরীরকে কষ্ট না দিলে ধর্ম্মসাধন হয় না, তাঁহারা নিতান্ত একদেশদর্শী। তাঁহারা মঙ্গলময় জগদীশ্বরের সৃষ্ট প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন না। শাস্ত্রকারেরা কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর নষ্ট করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করা শ্রেয়স্কর মনে করেন না। শাস্ত্রে যে তপস্যার কথার উল্লেখ আছে, তাহা দেহের শোষণ বা দেহ নাশের জন্য ব্যবস্থিত হয় নাই, যথা—

"যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্ম-বুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং॥"
"মন বাক্যে কর্ম্মে যাঁহারা না করেন পাপ আচরণ।
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে দেহের শোষণ॥"
(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)

যাহার শরীর সুস্থ নহে, তাহার প্রবৃত্তি সংযমের জন্য যে পরিমাণ মানসিক শক্তির প্রয়োজন, সে তাহা কখনই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। অসুস্থ ব্যক্তির সামান্য কারণে ক্রোধের উদয় হয়, অহিতকর খাদ্যে তাহার লোভ উপস্থিত হয় এবং অপরকে সুস্থ দেহে সুখভোগ করিতে দেখিয়া তাহার মন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে। প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, দয়া, পরার্থপরতা প্রভৃতি মানবমনের ঈশ্বরদত্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর পূর্ণবিকাশ সুস্থ দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

গীতায় যে যোগ-সাধন মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উপবাস, অনিদ্রা প্রভৃতি দেহক্ষয়কারী কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা লভ্য নহে। এই মহাবাক্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়া গিয়াছেন—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবার্জ্জুন॥১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"১৭॥
(ভগবদ্গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অতিভোজন বা উপবাস, অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা, ইহাদিগের মধ্যে কোনটীই যোগ-সমাধির পক্ষে অনুকূল নহে। যাঁহার আহার বিহার নিয়মিত, যিনি পরিমিত রূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন এবং যিনি সতত কর্ম্মশীল ও যাঁহার কর্ম্ম-চেষ্টা সংযত, তিনিই সর্ব্বদুঃখ-নাশক যোগ-সমাধির অধিকারী।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ আহার, বিহার, নিদ্রা, কর্ম্মচেষ্টা প্রভৃতি শরীর-রক্ষার উপযোগী কার্য্যগুলি অবশ্য পালনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং ইহাদের অপব্যবহারই নিন্দার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবৃত্তির সংযত ব্যবহারই প্রকৃত সংযম, উহাদিগের উচ্ছেদ সংযম নহে। আমাদের এই মহাসত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল বিধি পালনীয়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(২)

প্রাতরুত্থান।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কতকগুলি সু-অভ্যাস আমাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সকল নিয়ম পালন করা প্রথমে কষ্টসাধ্য হইলেও কিছুদিন পরে ইহারা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে; তখন আমরা বিনা আয়াসে ইহাদিগের সুফল ভোগ করিয়া শরীর ও মনের সচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকি। এই সকল সু-অভ্যাসের মধ্যে প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। বাল্যকালে আমরা ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছি—

"Early to bed and early to rise,
Makes a man healthy, wealthy and wise."

আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্ব্ব সময়কে "ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সময়ে ভগবানের উপাসনা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই আলোক অন্ধকারের সন্ধিস্থলে, সংসার কোলাহল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বক্ষণে, গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, সুষুপ্তি-লব্ধ-শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের যেরূপ সুবিধা হয়, বোধ হয় আর কোনও সময়ে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

অনেকে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিলেও আলস্যবশতঃ শয্যাত্যাগ করেন না। এটী অতি কদভ্যাস। ইহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। দুই চারি দিন জোর করিয়া উঠিলেই এই অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে। তখন ঘুম ভাঙ্গিবার পর শয্যাত্যাগ না করা একটা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

প্রকৃতির উষাকালীন সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় ও মনোমোহকর। ইহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি প্রকৃতিদত্ত একটী অনির্ব্বচনীয় অনায়াস-লভ্য সুখভোগে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি যথারীতি সম্পাদনপূর্ব্বক কিয়ৎ পরিমাণে শীতল জল পান করিয়া মুক্তবায়ুতে অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য ভ্রমণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে সবিশেষ হিতকর। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রত্যুষে শীতল জল পান আয়ুর্ব্বর্দ্ধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ একটী বচন প্রচলিত আছে—

"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনং॥"

দিবাবসানে দুগ্ধ, নিশান্তে জল, আহারের পর ঘোল যথারীতি পান করিলে বৈদ্য ডাকিবার প্রয়োজন হয় না।

যাঁহাদের সহজে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। শীতল জলের পরিবর্ত্তে অনেকে ইদানীং উষ্ণ জল পানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে উহা হিতকর হইলেও সাধারণের পক্ষে শীতল জল পান করাই প্রশস্ত। চা পান করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা জলের পরিবর্ত্তে খুব পাতলা চা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু চায়ের আয়োজন করিতে করিতে বেলা হইয়া পড়ে, সুতরাং চা খাইবার জন্য প্রধান কার্য্য যে প্রাতর্ভ্রমণ, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। যদি প্রত্যুষে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তবে সামান্য জলযোগ করিয়া শীতল জল পান করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইলে শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শরৎকালের হিম ও রৌদ্র-সেবন স্বাস্থ্যানুকূল নহে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন মাস শরৎকাল বলিয়া গণ্য। কেহ বা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসকে শরৎ ঋতুর অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ মতে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ নিষিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কেহই প্রাতর্ভ্রমণ সুখকর ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন না; সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্রের মতানুযায়ী কার্য্যই আমরা করিয়া থাকি। শাস্ত্রে শরদ্-ব্যতীত অপর কোনও ঋতুতেই প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শীতল বায়ু সেবন করা নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া উক্ত হয় নাই।

প্রাতঃকালে আমাদিগের (বাঙ্গালীর) পক্ষে সাধারণতঃ পদব্রজে ভ্রমণই প্রশস্ত ব্যায়াম। অবশ্য আজকাল কেহ কেহ সাইকল করেন—ইহা অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। অশ্বারোহণ সুন্দর ব্যায়াম হইলেও আমাদিগের মধ্যে ইহার অভ্যাস নিতান্ত বিরল। অশ্বারোহণ আমাদিগের মধ্যে যাহাতে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হয়, তাহার সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ইহাদ্বারা আমাদিগের সাহস ও কার্য্যকুশলতার প্রসার বাড়িয়া যাইবে। দেশের স্থানে স্থানে অশ্বারোহণ-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ইস্কুল্ স্থাপিত হইলে অনেক বাঙ্গালী যুবক শীঘ্র এ বিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রাতে অন্ততঃ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয় বলিয়া কোষ্ঠ-বদ্ধতা (Constipation) দূর হয়। প্রাতে জনতা থাকে না বলিয়া রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত থাকে, বায়ু নির্ম্মল ও শীতল সুতরাং সুখসেব্য হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির সামর্থ্যানুসারে ভ্রমণ করাই কর্ত্তব্য। অনেকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে প্রাতর্ভ্রমণ প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন না, ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। সমস্ত দেহ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলে ঠাণ্ডা লাগিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রাতঃ-সমীরণ মন ও শরীর উভয়েরই পক্ষে স্ফূর্ত্তিজনক ও শক্তিসঞ্চারক। যখনই ভ্রমণ করিয়া ক্লান্তিবোধ হইবে, তখনই ভ্রমণে ক্ষান্ত হওয়া উচিত। সহর বা গ্রামের ভিতর না বেড়াইয়া বাহিরের ময়দানে বা নদীর ধারে ভ্রমণই প্রশস্ত। তবে সুবিধা না হইলে সহরের যে স্থানে রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পরিষ্কার এবং যেখানে লোকের বসতি অল্প, তথায় ভ্রমণ করিলে ভাল হয়। কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চল ও গড়ের মাঠ পদব্রজে ভ্রমণের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। আজকাল কলিকাতা সহরে মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী পার্ক (Park) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এগুলি ভ্রমণের পক্ষে সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর।

যাঁহারা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, তাঁহারা, যাঁহারা বেলায় উঠেন তাঁহাদের অপেক্ষা, এক হিসাবে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলিয়া যে তাঁহারা

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতিদিন প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা কাল অতিরিক্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা হয়। এইরূপে প্রতি মাসে দুই দিন এবং প্রতি বৎসরে আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাতঃপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি ২৪ দিন অধিক বাঁচিয়া থাকেন। যদি ৭০ বৎসরকাল মানুষের জীবনের সীমা হয়, তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে প্রথম ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ৫ বৎসর অধিক জীবন ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং এইভাবে দেখিলেও প্রাতরুত্থান অবহেলার বিষয় নহে। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু।

গণনাপদ্ধতির মূলসংখ্যা *

সংখ্যাগণনার জন্য নানাদেশে নানারূপ পদ্ধতি প্রচলিত। প্রত্যেক গণনা পদ্ধতিতে একটী সংখ্যা মূলসংখ্যারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশ ও জাতিভেদে বিভিন্ন গণনা-পদ্ধতিতে যে সকল সংখ্যা মূলসংখ্যারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে কেবল মাত্র দশমিক গণনারীতিই প্রচলিত। মনস্বী আরিষ্টট্ল্ একটীমাত্র নগণ্য থ্রেসীয় (Thracian) জাতির উল্লেখ করিয়াছিলেন যাহাদের মধ্যে দশমিক গণনারীতির প্রচলন ছিল না। প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমটীও "Exception proves the rule" এই ইংরাজী প্রবচনের সার্থকতায় উল্লেখিত হইত। এই সকল পণ্ডিতগণের মতে মানবের পক্ষে দশক-গণনা অবলম্বন করা স্বাভাবিক। প্রকৃতিদেবী মানবকে যে দশ অঙ্গুলি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন সেই অঙ্গুলি নিদর্শনে দশ সংখ্যাকে গণনার মূলসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা স্বাভাবিক। পিকক্ সাহেব 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া মেট্রোপোলিটানা' পুস্তকে তাঁহার 'পাটিগণিত' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, যদি হস্তের দশ অঙ্গুলির নিদর্শনে দশকে মূলসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা স্বাভাবিক হয়, তবে হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির নিদর্শনে '৫' কে মূলসংখ্যা এবং হস্তপদাদির অঙ্গুলির সমষ্টি নিদর্শনে '২০' কে গণনার মূলসংখ্যা নির্দ্ধারণ করাও স্বাভাবিক হইতে পারে; এবং প্রকৃত পক্ষে এরূপ গণনাপদ্ধতিও বিরল নহে। গত কয়েক শতাব্দীতে এরূপ অনেকগুলি জাতির বিষয় জানা গিয়াছে যাহাদের মধ্যে দশমিক গণনারীতির আদৌ প্রচলন নাই। কোন জাতির গণনাপদ্ধতিতে কোন্ সংখ্যা মূল-সংখ্যারূপে অবলম্বিত হইয়াছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মূলসংখ্যা ১২—এই দ্বাদশক গণনা-পদ্ধতি অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত। অনেকে এই দ্বাদশক গণনাপ্রথার নানা সুবিধা

নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে একটী এই যে, সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে যে কয়েকটী ভগ্নাংশ সুপ্রচলিত, যথা ;—১/২, ১/৩, ১/৪ এবং ২/৩, ৩/৪ সব কয়েকটী দ্বাদশ সংখ্যা দ্বারা সুবিভাজ্য। এ বিষয়ে দশকে মূলসংখ্যা করা বড় সুবিধা-জনক নহে। সভ্যজগতে দ্বাদশক গণনারীতির নানা সুবিধা হেতু ব্যবসাকার্য্যে অনেক সময় ইহা ব্যবহৃত হয়। এইজন্য মূলসংখ্যা দ্বাদশ এক কথায় ব্যক্ত করার জন্য dozen কথার সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং অনেক পরিমাপ কার্য্যেই এই dozen, gross ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে এই দ্বাদশক গণনা-রীতির এতই পক্ষপাতী যে দশক গণনাপদ্ধতির মূলোচ্ছেদ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। শুনিয়াছি সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস্ তাঁহার রাজ্যে এই পরিবর্ত্তন করার সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন। কিন্তু দশক গণনারীতি সভ্যজগতে এরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে যে সহসা একটা নূতন পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য নহে। আশা করা যায় ব্যবসাকার্য্যে dozen ইত্যাদির প্রচলন বোধ হয় চিরদিনই থাকিবে। পূর্ব্বে রোমবাসীরা ব্যবহার করিতেন এবং আজ পর্য্যন্ত সমস্ত টিউটন (Teutonic) জাতির মধ্যে ব্যবহৃত। বোধ হয় কোন জাতি গণনাকার্য্যে কেবলমাত্র দ্বাদশক-রীতি অবলম্বন করে নাই। কিন্তু রবার্ট ফ্রেজেল বেন্যু (Benue) আফোস্ জাতির মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছেন। এই জাতির দ্বাদশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যার জন্য একটি সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, এবং তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে দ্বাদশকে মূলসংখ্যা করিয়া অন্যান্য সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করিয়া থাকে ; যথা দ্বাদশোর্দ্ধ কোন সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে ১২, ১ ; ১২, ২ ; ১২, ৩ ; ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকে।

মূলসংখ্যা ২—এই দ্বিমূলক গণনা পদ্ধতিও অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়, থিরিয়ন বলেন যে, মিশর দেশে জরিপকার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইত।(১) ইংরাজী ভাষায় 'pair', 'brace', 'couple' ইত্যাদি কথায় এই গণনারীতির আভাষ পাওয়া যায়। আমাদের ভাষাতেও 'এক জোড়া' 'জুড়ি' ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীন-দেশের অনেক স্মৃতিস্তম্ভে এই দ্বিমূলক গণনার একটু আধটু চিহ্ন পাওয়া যায় ; কিন্তু চীন-বাসীরা কখনও এই গণনাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। দক্ষিণ আমেরিকাস্থ জিঙ্গু (xingu) প্রদেশে বাক্কারাইবি নামক একটি জাতি আছে যাহারা মাত্র ছয় পর্য্যন্ত গণিতে পারে ; কিন্তু তাহারা ৪—২, ২ ; ৫—২, ২, ১ এবং ৬—২, ২, ২ এই ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক অসভ্য জাতিও ঐ প্রকারে গণনা করিয়া থাকে।(২) 'আরিকারা' সংখ্যাঙ্কের গঠন দেখিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে পূর্ব্বে ইহারা জোড়া জোড়া করিয়া গণনা করিত, এবং বিজোড় সংখ্যাঙ্কগুলি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।(৩)

---

(১) Histoire de l'arith metique, p. 5.

(২) Letonrneaux, Bull. Soc. Authropol Paris, 1886.

(৩) J. H. Trumbull, Proc. ...

মূলসংখ্যা ৩—কলোরেডোর কুচাউন্ জাতির মধ্যে এইরূপ গণনার প্রচলন দেখা যায়, ইহারা ৬—২×৩, ৯—৩×৩ এই ভাবে ব্যক্ত করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে চতুর্মূলক গণনারও প্রচলন দেখা যায়, যথা—৮ এই সংখ্যা ব্যক্ত করিতে হইলে ২, ৪ দ্বারা প্রকাশ করে।(৪)

মূলসংখ্যা ৪, ৬, ৮ অথবা ৯—এই সংখ্যাগুলি অন্যরূপ গণনাপদ্ধতির সহিত কখনও ক্বচিৎ মূলসংখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার লুলো জাতি, ট্রিটন বে জাতি, এণ্ডি পলিনেশীয় জাতি '৪' পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে; তদূর্দ্ধ সংখ্যা ৪-১, ৪-২, ইত্যাদিরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকে। এ, মার (A. Marre) বলেন এণ্ডি পলিনেশীয় জাতি '৮' সংখ্যাদ্যোতক একটি শব্দ ব্যবহার করে যাহার অর্থ '২×৪'। ওয়ালাসীয়ান জাতি '১৮' "দিউ-ন" (অর্থাৎ ২-৯) এইরূপ শব্দোচ্চারণে প্রকাশ করে। ব্রেটানেরা (Bretagnes) '১৮' "ট্রায়নসে" (অর্থাৎ ৩-৬) এইরূপ শব্দোচ্চারণ করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য কোন সংখ্যা এরূপভাবে প্রকাশিত হয় না। পট্ বলেন পশ্চিম আফ্রিকার বোলান জাতির মধ্যে '৬' মূলসংখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়। এ কয়েকটী দৃষ্টান্ত ব্যতীত এরূপ কোন জাতির বিষয় জানা যায় নাই যাহাদের মধ্যে ৬, ৭, ৮ অথবা ৯ মূলসংখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়।

মূলসংখ্যা ১১—নব জিল্যাণ্ডের মাওরিস্ জাতির মধ্যে একাদশক গণনাপদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ১১ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যার জন্য তাহাদের সংখ্যাবাচক শব্দ আছে; তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা ১১-১—১২; ১১-২=১৩ ইত্যাদিরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

অনেক জাতির মধ্যে আবার এরূপ গণনা-পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায় যাহাতে কোন মূলসংখ্যা নাই। সংখ্যাগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক সংখ্যাই আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। কিন্তু এরূপ গণনারীতি অতি বিরল।

মূলসংখ্যা ৬০—বাবীলোনীয়দিগের মধ্যে এই '৬০'—মূলক গণনারীতি প্রচলিত। অন্য কোন গণনাপদ্ধতিতে এত উচ্চসংখ্যা মূল-সংখ্যারূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বোধ হয় এই বাবীলোনীয়দিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই গণনা-পদ্ধতি প্রচলিত।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে যে সকল জাতির গণনার সংখ্যা পাঁচের বেশী তাহারা গণনা-পদ্ধতিতে প্রায়ই ৫, ১০, অথবা ২০ গণনার মূলসংখ্যারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

মূলসংখ্যা ৫—হস্তের অঙ্গুলির সহিত সংখ্যাগণনার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অসভ্য জাতিরা এই অঙ্গুলি সঙ্কেতে গণনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমরাও অঙ্গুলি পর্ব্বে অনেক সময় গণনাকার্য্য সমাধা করিয়া থাকি। অনেক অসভ্য জাতিই '৫' সংখ্যা 'এক হাত' 'হাতের শেষ' অথবা কেবল 'হাত' ইত্যাদি অর্থবোধক কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। সেইরূপ ৬, ৭, ৮ ইত্যাদি সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে যথাক্রমে 'হাত এক' 'হাত দুই'

(৪) J. H. Trumbull, Trans. Am. Phil. Ass'n, 1874.



[শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত রঙিন চিত্র হইতে]

রঙ্গালয়ের মহাদেব

হস্তে টিনের ত্রিশূল, ভালে 'পঞ্চ-বর্ত্তিকা-শক্তিবিশিষ্ট' 'ইলেক্‌ট্রিক বল্‌ব' সহযোগে মদনভস্ম করিলেন।

'হাত তিন' ইত্যাদি কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। '১০' ইহাদের নিকট 'দুই হাত'। দশ গণনা করিয়া যখন হাতের অঙ্গুলি শেষ হইয়া যায় তখন পায়ের অঙ্গুলির অথবা অপর ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা '১১' 'পায়ের এক' এই কথার দ্বারা ব্যক্ত করে এবং '২০' 'এক মানুষ' (অর্থাৎ একটি মানবের হস্তপদাদির অঙ্গুলির সমষ্টি) এই কথার দ্বারা প্রকাশ করে। এরূপ জাতিরও অস্তিত্ব আছে যাহারা এই ভাবে '১০০' পর্য্যন্ত গণনা করিয়া থাকে। যথা '৪০' '৬০' '৮০' '১০০' ইত্যাদি যথাক্রমে '২ মানুষ' '৩ মানুষ' '৪ মানুষ' '৫ মানুষ' এই সকল বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকে।

এই পঞ্চমূলক গণনা পৃথিবীর অনেক স্থলেই অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায়। মুলর এবং পট্ সাহেব বলেন উত্তর সাইবিরিয়াবাসীদিগের মধ্যে, কামস্কাট্কাবাসী, আলিউটজাতি এবং নব হেব্রিডিসবাসী কয়েকটী জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত। আফ্রিকাদেশে ওলোফজাতি, কান্নুরি, টেমনি, আইফিক এবং কি-ইয়াউ ও কি-নায়াসা জাতিদিগের মধ্যে এই পঞ্চক গণনারীতি দেখা যায়। (৫) দিঙ্কু, ফুলবি ও পিগ্‌মি জাতির মধ্যে দশক ও পঞ্চক উভয় গণনারীতিই প্রচলিত। অষ্ট্রেলেসীয় ও পলিনেসীয় দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে পঞ্চক গণনাপদ্ধতির অনেক আভাস পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে দশকপ্রথাই সুপ্রচলিত। এস্কিমো এবং আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যে এই গণনারীতির প্রচলন দৃষ্ট হয়। অনেক জাতির ভাষার ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এক সময়ে ইহাদের মধ্যে পঞ্চক গণনারীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, কিন্তু সভ্যতার উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া ইহারা দশক গণনাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। হোমরের সময় গ্রীকদিগের মধ্যে যে গণনা প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে পঞ্চক গণনারীতির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ রোমান সংখ্যাঙ্ক দেখিলে বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে '৫' মূলসংখ্যারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

প্রায়ই দেখা যায় যে বিশুদ্ধ পঞ্চক গণনাপদ্ধতি কোন জাতির মধ্যে অবলম্বিত হয় নাই। ইহার সহিত দশক অথবা বিংশক গণনারীতি সংমিশ্রিত।

মূল সংখ্যা ২০—বিংশক গণনাপদ্ধতি তত সুপ্রচলিত নহে কারণ '২০'র ন্যায় একটি বৃহৎ সংখ্যাকে মূলসংখ্যারূপে ব্যবহার করা তত সুবিধাজনক নহে। কিন্তু অনেক জাতির মধ্যে ইহা এখনও প্রচলিত; তবে ইহা পঞ্চক অথবা দশক প্রথার সহিত ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক জাতির মধ্যে অন্য গণনারীতির সহিত ইহা প্রচলিত। আজটেক গণনারীতিতে দেখা যায় বিংশক গণনাপদ্ধতিই সুপ্রচলিত, তবে এই সঙ্গে কিঞ্চিৎপরিমাণে পঞ্চক ও দশক রীতিও প্রচলিত। বোগোটের মুইস্কাস্‌জাতি এবং উত্তর স্পেনের বাস্ক জাতির মধ্যে দশক প্রথার সহিত বিংশকপ্রথা প্রচলিত। উত্তর সাইবিরিয়ার আইনাস্‌জাতি এবং

(৫) Stanley, Through the Dark Continent.

অনেক ককেসীয়জাতি এই বিংশ পর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকে। আমেরিকায় এই গণনাপদ্ধতির প্রচলন আছে। আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বে য়ুরোপের অনেকস্থলে বিংশক গণনারীতির প্রচলন ছিল। ফিনিসীয়েরা এবং বোধহয় কার্থেজবাসীরা এবং ইহাদের সংসর্গে য়ুরোপের পশ্চিমখণ্ডের অনেক Celtic জাতি এই গণনারীতির সহিত পরিচিত ছিল। Caltic জাতির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্রেটনেরা (Bretons) আজও "Unnek ha tringent" বলিয়া থাকে, যাহার অর্থ এগার এবং তিন কুড়ি—৭১। ফরাসীরা Quatre Vignt—৮০ বলিয়া থাকে। ওয়েলশ্, আর্স্, গেলিক, মান্স্ক, এবং অন্যান্য Celtic জাতির ভাষাতে এই বিংশক গণনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে আজও 'কুড়ি' পর্য্যায়ে গণনার প্রচলন আছে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগের বয়স জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা 'এক কুড়ি' 'দু'কুড়ি' 'দু'কুড়ি সাত' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেক দ্রব্যাদিও "কুড়ি ধরণে" বিক্রয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেকস্থলে দেখা যায় যে অনেক দ্রব্য পাঁচকুড়ি অথবা "শ' ধরণে" বিক্রয় হয়। আবার অনেক স্থলে এই "শ'" ১০০তে "বাঁধে" না; ১২০তে "শ' বাঁধে"; অর্থাৎ কোন বিশেষ দ্রব্য কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্যে এক শ' চাহিলে ১২০ মিলিয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এককালে এইরূপ গণনার প্রচলন ছিল। ১২০তে যে "শ' বাঁধিত" তাহাকে ইংলণ্ডে long hundred বা great hundred বলা হইত। ডিম্ব বা অন্য দ্রব্য এইরূপে বিক্রয় হইত। পূর্ব্বে যেএরূপ গণনা প্রচলিত ছিল তাহা পিকক্ সাহেবের উদ্ধৃত একটি প্রবাদ বাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়। (৬) প্রবাদ বাক্যটি এই—

Five score of men, money and pins
Six score of all other thing."

অর্থাৎ মানুষ, টাকাকড়ি এবং আলপিনের গণনায় পাঁচ কুড়িতে একশত হয় এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষের গণনায় ছয় কুড়িতে একশত হয়। ইংরাজী ভাষার 'score', "three score and ten" ইত্যাদি কথায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে ইংলণ্ডে এককালে বিংশক গণনারীতি কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল।

দশমিক গণনাপদ্ধতি—এই গণনারীতি সভ্যতার সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত। যে সকল দেশ সভ্যতালোকরশ্মিপাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে সে সকল দেশে এই প্রথা সুপ্রচলিত। য়ুরোপের সর্ব্বত্র, আফ্রিকায়, পলিনেশীয়ায় এবং আসিয়ার সর্ব্বত্রেই এই দশমিকপ্রথা প্রচলিত। উত্তর আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও অনেক স্থলে পঞ্চক গণনারীতির সহিত এই প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। এমন কি অনেক অসভ্য জাতির মধ্যেও ইহার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এই সার্ব্বভৌমিক দশমিক

(৬) Vide Encyclopœdia Metropolitan vol. I.

প্রথার প্রবর্ত্তক কে? যে ভারতবর্ষ একদা জ্ঞানগরিমায়, বিত্তায়, বুদ্ধিতে পৃথিবীর শীর্ষস্থানে অবিষ্ঠিত ছিল; যথায় জ্ঞানের অপূর্ব্ব আলোক প্রজ্বলিত হইয়া এবং সমস্ত দিগেদশ প্রোদ্ভাসিত করিয়া পৃথিবীর অজ্ঞান তিমিরনাশে সমর্থ হইয়াছিল; যে ভারতবর্ষ বহুযুগ ধরিয়া স্বুবর্ণ পদ্মাসীনা সভ্যতা লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন ছিল, সেই ভারতবর্ষই এই সর্ব্বদেশব্যাপী দশমিকপ্রথার প্রবর্ত্তক। কিছুদিন পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতার "The Web of Indian Life" পুস্তক পাঠকালে এই কথাই দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন—

"And the antiquity of the Sanskrit word S*hunyo* for *nought*, together with the immemorial distribution of the system all over the country, conclusively proves that our decimal notation is Indian and not Arabic in origin."

শ্রীশচন্দ্র সিংহ এম এ।

নীল ভূধর

নীলভূধর, একটী ছোট পাহাড়ের নাম। ঠিক্ পাহাড় নয়, বালুকারচিত একটি জাঙ্গাল—উচ্চতায় ২০ ফুট;—পুরীসহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। নীলাদ্রিমহোদয় নামক সংস্কৃত পুস্তকে, তাহাকেই নীলভূধর বলা হইয়াছে।(১) আমরাও, সেই নামে প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম। এই নীলভূধরোপরি জগন্নাথের মহামন্দির আকাশ স্পর্শ করিতে উঠিয়াছে।

"জগন্নাথ" ও "শ্রীক্ষেত্র" নামক পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধদ্বয়ে আমরা এখানকার অন্যান্য কথা বলিয়াছি। এবারে মূলমন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে এবং অন্যান্য কয়েকটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

রাজা অনঙ্গ ভীমদেবকর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। জগন্নাথের রত্নবেদীর পশ্চাদ্ভাগে একটি খোদিত লিপি আছে। লিপি এই:—

"শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদংকারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

অর্থাৎ, ১১১৯ শকাব্দে অনঙ্গভীম এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রাজা অনঙ্গভীমদেব, আপনার রাজ্যসীমায় অনেক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ-মোচনের জন্য, কথিত আছে, তৎকর্ত্তৃক ৬০টী মন্দির, এককোটি পুষ্করিণী ও ৪০টী বাপী নির্ম্মিত ও খাত হইয়াছিল। অনঙ্গভীমের মন্ত্রী পরমহংস বাজপাইএর তত্ত্বাবধানে,

---

(১) "যৎক্ষেত্রস্পর্শতো বিপ্রাঃ সমুদ্রস্তীর্থরাট্ স্মৃতঃ
ক্রোশত্রয়োন্নতিযুতে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
শঙ্খাকারেঽপি তন্মধ্যে রাজতে নীলভূধরঃ॥" নীলাদ্রিমহোদয়।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ১১৯৮খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়।(২) কারিগরেরা পরিশ্রম করিয়াছিল চতুর্দ্দশ বৎসর, (৩) এবং মন্দির-নির্ম্মাণের খরচ পড়িয়াছিল ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু, এই ব্যয়সম্বন্ধে সকলে ঐকমত্য নন। মন্দিরের নির্ম্মাতা লইয়াও গোলমাল আছে। পরে সেকথা বলিতেছি।

ভুবনেশ্বরের মতন, জগন্নাথের মন্দিরের চারিদিকেও প্রস্তরপ্রাচীর আছে। প্রাচীর প্রায় সমচতুরস্র;—পরিমাপ, প্রস্থে ৬৩০, দৈর্ঘ্যে ৬৫২ এবং উচ্চে ২০ ফুট। প্রাচীর-বেষ্টনীর ভিতরে প্রায় ১২০টী ছোটবড় মন্দির আছে।(৪) বৃহত্তম মন্দির, জগন্নাথের। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী তোরণ। সকল তোরণের আদর্শ এক। উত্তর তোরণে, দুটি হস্তিমূর্ত্তি আছে। তাহাদের পৃষ্ঠে মাহুত। আকার, পাঁচ ফুট। উৎকলের শিল্পিগণ, সাধারণত হস্তিমূর্ত্তিগঠনে পটু। তাহাদের খোদিত হাতিগুলি বেশ নধর নধর গড়নের। ভাস্কর্য্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে, উৎকলশিল্পীর এবংবিধ কারুকৌশল দেখা যায় না। তোরণের হাতিদুটিও চমৎকার। এই তোরণের নাম হস্তিদ্বার। দক্ষিণ তোরণে দুটি ঘোড়ার মূর্ত্তি আছে,—তাই তাহার নাম, অশ্বদ্বার। পূর্ব্ব তোরণটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই তোরণে দুটি উৎকল-শিল্পসুলভ সিংহমূর্ত্তি আছে। ইহার নাম, সিংহদ্বার। দরজা, শাল কাঠের। তোরণটীর আপাদমস্তক কারুকার্য্যকম। পশ্চিম তোরণে কোন মূর্ত্তি নাই। ইহার নাম খাঞ্জাদ্বার। মন্দিরের বেষ্টনী দুটি;—একটী বাহিরে ও একটি ভিতরে। বিধর্ম্মী বিপক্ষগণের অনাহূত আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখিবার জন্যই এই বেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফারগুসনের মতে, এই দুটি বেষ্টনী এবং অন্যান্য দুএকটী খুঁটিনাটির কথা ছাড়িয়া দিলে, ভুবনেশ্বরের ও শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের ভিতরে অনেকটা আকারগত সারূপ্য দেখা যায়।(৫)

ভিতরের প্রাকারে দুটি প্রাচীর। প্রাচীর দুটি সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে। (৪০০ × ২৭৮) প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান মৃৎপূর্ণ হওয়াতে সমগ্র প্রাকারটি বজ্রবৎ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রাকারগাত্রে ছয়টি দ্বার আছে। ইহার পরেই জগন্নাথদেবের প্রধান মন্দির।

মূল-মন্দির এবং চাঁদনীর নির্ম্মাণ-তারিখ এক। নাট-মন্দির, আরও আধুনিক। প্রধান মন্দিরের ভূমি-পরিমাপ ৬৬ ফুট—সমচতুরস্র। চাঁদনীটিও চৌকোনা—৮০ ফুট এবং উচ্চে প্রায় ১২০ ফুট। মন্দিরদ্বয়ের নিম্ন-গাঁথনি (plinth) উচ্চতায় সমান,—৬ ফুট। ভোগমণ্ডপ পর্য্যন্ত ধরিয়া, সমস্ত মন্দিরের অখণ্ড বিস্তার, প্রায় ৩০০ ফুটে গিয়া দাঁড়ায়। ভুবনেশ্বরের বিস্তারও প্রায়এইরূপ।

মূল-মন্দিরে, তিনটি প্রকাণ্ড কুলঙ্গী আছে। পশ্চিমদিকের কুলঙ্গীতে নৃসিংহ, উত্তরে

---

(২) Asiatic Researches. Vol XV.

(৩) List of Ancient Monuments of Bengal.

(৪) A statistical Accounts of Bengal. Vol. XIX. Puri.

(৫) History of Indian and Eastern Architecture.

বামন এবং দক্ষিণে বরাহদেবের বৃহৎ মূর্ত্তি। ক্লোরাইট্ পাথরে তৈয়ারি। এতদ্ভিন্ন মন্দির-গাত্রে ছোট ছোট গণনাতীত তাক্ আছে—প্রত্যেক তাকে ছোটবড় অসংখ্য মূর্ত্তি,—কেহ পুরুষ, কেহ স্ত্রী, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কাহারও মুখে হাসি, কাহারও মুখে লালসা,—পরন্তু বেশীর ভাগ মূর্ত্তিই কথনঅযোগ্য অশ্লীলতায় কলঙ্কিত—এমন কি চক্ষুলজ্জা থাকিলে কেহ যে মুখ তুলিয়া একবার উপরদিকে চাহিয়া দেখিবেন,—তার যো নাই; পিতামাতার সঙ্গে সেদিকে আসা ত দূরের কথা।

শুনিতে পাই, এই জঘন্য অশ্লীলতার নাকি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। এই কদর্য্য মূর্ত্তিগুলিকে দেখিয়া তোমার মনে যদি কোন রকম বিকৃতি না হয়,—তাহা হইলে তোমার উদ্ধারের আর বড় বেশী দেরি নাই! এমনি ধরনের কি একটা কথা আমার কাণে চুপি চুপি কেহ বলিয়া দিলেন। কিন্তু হা রে পাপ মন!—টীকা থাকিলেও সব যায়গায় সে অর্থ বুঝিতে পারে না,—বিশেষ ব্যাখ্যা যেখানে শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা বৈ অন্য কিছু না!

এই কদর্য্য মূর্ত্তিগুলার সার্থকতা কোন দিকে, তার কিছুই বুঝিলাম না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও এমনি দু একটা অশ্লীল মূর্ত্তি আছে, কিন্তু সেগুলি শিল্পবিচিত্র। আর এ মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পত্ব অল্প—একেবারে নাই বলিলেও বড় দোষ হয় না।'

প্রধান মন্দিরের দরজা একটী। (১৪–৪×৮–১০) দরজাটি জগমোহনের দিকে। দরজার ঠিক সম্মুখেই প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি;—অনতিনিবিড় অন্ধকারের ভিতরে তাঁহারা অটল মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

মূল-মন্দিরের উচ্চতা ২০০ ফুট। ঠাকুরেরা যে সিংহাসনখানি পাইয়াছেন, তাহার নাম, রত্নবেদী। (বা রত্নসিংহাসন) এই বেদীটি মার্ব্বেলগঠিত। (৬)

নাটমন্দিরটি চতুষ্কোণ। ভিতরের মাপ ৬৯×৬৭। বাহিরে, সকলদিকেই ৮০ ফুট। ঘরটি চার-সার থাম দিয়া ভাগ করা। থামগুলিও চার-কোণা। তাহাদের গায়ে কারুকার্য্য একেবারেই নাই। স্তম্ভগুলি একমাপের নয়। ঘরের দেওয়ালেও কোন কাজ নাই—তা কি বাহিরে আর কি ভিতরে! কক্ষমধ্যে মূর্ত্তি আছে দু' তিনটি। মন্দির বেশ বড়সড়—লম্বে, প্রস্থে, উচ্চে, সকলদিকেই ইহা ভোগমণ্ডপকে পিছনে রাখিয়াছে।

নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভোগমণ্ডপ। ইহাও চতুষ্কোণ—(৫৮×৫৬ ফুট) নিম্নগাথনি শিল্পালঙ্কৃত, উচ্চে ৭–৬। গাঁথনির উপরে যে দেওয়াল উঠিয়াছে, তাহা ৫৬ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চ। ঘনকৃষ্ণ বালু-প্রস্তরে মণ্ডপটি নির্ম্মিত। এখানে যে সকল মূর্ত্তি আছে, আকারে সেগুলি ছোট কিন্তু কাজ খুব ভাল। দরজার উপরেই নবগ্রহমূর্ত্তি,—দেখিতে চমৎকার। এককালে কণারকের সূর্য্যমন্দিরের অংশবিশেষ ছিল, পরে মারাঁটিরা সেখান হইতে এখানে তুলিয়া আনিয়াছে। (৭)

(৬) Calcutta Christian Observer. September, 1849.
(৭) Antiquities of Orissa. By Dr. Rajendralal Mitra.

এই মন্দির, অনেকবার মেরামত করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রসাধন, রাজ প্রতাপ রুদ্রের রাজত্বকালে ; (১৫০৪ -১৫৩২ খৃঃ অঃ) তাহাতে প্রলেপ ব্যবহৃত হয়। ১৬৪৭ খৃঃ অব্দে, নৃসিংহদেব আবার আর একবার মেরামত করেন। কিছুদিন পরে মুসলমান আক্রমণকারীরা মন্দিরের উপরে অত্যাচার করে। ফলে, কৃষ্ণদেব (১৭১৬—১৭১৮ খৃঃ অঃ) কর্তৃক দেবালয় আবার নবীকৃত হয়। বীরকিশোর দেবের পত্নী, পঞ্চাশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার মন্দির মেরামত করেন। তাহার পর বিধর্ম্মীর দ্বারা যতবার মন্দির দুরবস্থাগ্রস্ত এবং অপবিত্র হয়, ততবারই ভিন্ন ভিন্ন রাজার সাহায্যে শ্রীমন্দিরের প্রসাধন হয়।

এইরূপে, মন্দিরের পূর্ব্বাবস্থা কতবার যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। সাদা কলি দেওয়াতে মন্দিরনির্ম্মাণে ব্যবহৃত পাথরের স্বাভাবিক-শ্রীপর্য্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল ভোগ-মণ্ডপে চূণকাম নাই। তার কারণ, ইহার অনেক অংশ কণারক হইতে মাহাট্টিরা এখানে আনিয়াছিল। (এ কথা আগেই বলিয়াছি।) এই নূতন প্রতিষ্ঠার পরে বিধর্ম্মীর কবলে মন্দিরের আর কোন দুর্দশা হয় নাই—কাজেই মেরামতেরও কোন দরকার হয় নাই।

কিন্তু মেরামতের ফলে, হিতে বিপরীত হইয়াছে। এই নবীকরণ-চেষ্টায় শিল্পীর কোন নিপুণতা যদি থাকিত,—তবে কতকটা রক্ষা ছিল! কিন্তু নিপুণতা বা শিল্পজ্ঞানের যথা-প্রয়োগ ত' দূরের কথা, প্রসাধনের—প্রলেপ-ব্যবহারের ফলে আগেকার যা কিছু কারুকার্য্য ছিল তা'ও দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছে। জগন্নাথের মন্দির আছে—কিন্তু তাহার শিল্প, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই ব্যাপারে কি বোঝা যাইতেছে? উৎকলের শিল্প, ক্রমেই অবনতির দিকে নামিয়া আসিয়াছে। আর, সে অবনতি এতদূর শোচনীয় যে, উড়িষ্যার পরবর্ত্তী শিল্পিগণ, একটা নূতন মন্দির-গঠন ত' দূরের কথা, পূর্ব্ব পুরুষের ভাব-দ্যোতক শিল্পের মহিমাটুকু বাঁচাইয়াও কাজ করিতে পারে নাই।

এখন, জগন্নাথের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর কিছু বলা দরকার—আগে বিস্তৃতভাবে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিয়াছি।

ফারগুসন্ সাহেব লিখিয়াছেন "যবনদিগের আক্রমণকালে জঙ্গলের ভিতরে যাহা লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধদন্ত। পরে, তাহাই সিংহলে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা বৌদ্ধমত। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মতে, তাহা বুদ্ধদন্ত নয়, তাহা জগন্নাথের মূর্ত্তি। যবনগণের প্রস্থানের পরে মূর্ত্তিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া বালুকা-বিতানের উপরে এক নব মন্দিরের ভিতরে স্থাপন করা হয়।"

আমাদের বোধ হয়, দু'মতেই সত্য আছে। ইহা সম্ভব, যবন-আক্রমণে অপবিত্র হইবার ভয়ে, বুদ্ধদন্তকেই জঙ্গলের ভিতরে লুকাইয়া রাখা হয়। তারপর, কোন লব্ধ-সুযোগে, বুদ্ধদন্তের বদলে জগন্নাথকে আনিয়া মন্দিরে রাখা হইয়াছিল। অবশ্য, আমরা এখানে কোন সিদ্ধান্ত করিতেছি না। আমাদের অনুমানের কথা বলিলাম মাত্র। কারণ, আর কিছু বলিবার উপায় নাই।

আগেই লিখিয়াছি, মন্দিরের নির্ম্মাতা লইয়াও গোলমাল আছে। একমতে—

"The temple was restored in its present form in A. D. 1198 by Raja Bhim Deo of Orissa."(৮)

এখানে, "restored কথাটি কেন ব্যবহার করা হইয়াছে আগে তাহা বলা দরকার। জগন্নাথ, পূর্ব্বে অন্য একটী মন্দিরে বাস করিতেন। কিন্তু কাল-বশে, তাহার উপরে বালুকা-প্রচ্ছাদনী পড়ে। মন্দিরের উক্ত অবস্থার কথা অনঙ্গভীম-দেবকে জানানো হয়। তিনি তখনই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ফলে, মন্দির আবিষ্কৃত হয়। তখন, বালুকা-রাশি সরাইয়া, ভীমদেব সেখানে আর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহাই বিদ্যমান মন্দির।

কিন্তু আর একজনের মতে; "An inscription gives the date of Saka 1119 A.D. 1197, and distinctly states that temple was caused to be erected and not restored by Anaga Bhima Deva."

আবার, কেহ কেহ বলেন, পুরীর মন্দির, ভীমদেবের পূর্ব্বপুরুষ অনন্ত বর্ম্মণ চোড় গঙ্গাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। (১১৮৫—১১৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে)।

আরও নানামত আছে; মতের এক অসীম পাথার! অতএব পাঠকগণকে পাথারে না ভাসাইয়া আভাস দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

অতঃপর, অরুণস্তম্ভের কথা। "কণারক" প্রবন্ধেই বলিয়াছি, ইহাকে সূর্য্যমন্দির হইতে তুলিয়া এখানে আনা হইয়াছে। মূলের কাছে ইহার পরিমাপ সকল দিকেই ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। সমগ্র স্তম্ভটি ৩৩ ফিট ৮ ইঞ্চি উচ্চ। অবশ্য স্তম্ভোপরি যে বানরের মূর্ত্তি আছে, তাহা এই মাপের ভিতরে ধরা হইল না। স্তম্ভের গায়ে যে খুব বেশী কারুকার্য্য আছে, তা মনে করিও না। স্তম্ভটি খুব সাদাসিদা। কিন্তু ইহার কৌশলসংস্কৃত সুগঠনে এমনি এক মৃণাল-পেলব সুকুমার-শ্রী আছে, যে সহজে সেদিক হইতে চোখ ফিরানো যায় না—সে যেন এক নিরলঙ্কারা সুন্দরীর স্বভাব-মোহন সৌন্দর্য্য!

নরেন্দ্র তলাও পুরীর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। ভুবনেশ্বরে যেমন বিন্দুসরোবর, পুরীতে তেমনি নরেন্দ্র তলাও। ইহার চারিদিকেই বাঁধাঘাট, সকলদিক দিয়াই সুনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী বিমল জলের ভিতরে নামিয়া গিয়াছে। সিঁড়িগুলি পাথরের।

সরোবরের বুকে একটী কৃত্রিম দ্বীপ, আকারে খুব ছোট। ইহা মন্ত্রী নরেন্দ্র মহাপাত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার অপর নাম, চন্দন-সরোবর। বৈশাখ মাসে এইখানে এক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

পুরীতে আরও দুটি বৃহৎ সরোবর আছে। তাহাদের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয় সরোবর। এ দুটীরও চারিদিকে বাঁধাঘাট। প্রথমটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে, যথাক্রমে ৪৮৬ ও ৩৯৬ ফুট। দ্বিতীয়টি, জগন্নাথের মন্দির-অপেক্ষাও প্রাচীন; (৯) নির্ম্মাণ তারিখ ৮২০ খৃঃ অব্দ; নির্ম্মাতা,

(৮) Cyclopædia of India.

(৯) List of Ancient Monuments in Bengal. p. 486.

কুণ্ডল-কেশরী। দক্ষিণে, মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

"আঠারো-নালা" একটী সেতুর নাম,— পুরীযাত্রিগণের সকলেরই দেখা উচিত। কারণ, প্রাচীন উৎকলীয়গণের স্থাপত্য কিরূপ ছিল, এই সেতু তাহার নিদর্শনস্থল। ইহাতে আঠারোটিনালা আছে। প্রত্যেক নালার উপরে, স্তম্ভচূড়ে তির্য্যকভাবে পাথরের সারি সাজান; তদুপরি সেতু। সুতরাং বোঝা যায়— ইহার নির্ম্মাতৃগণ, খিলানের ব্যবহার আদৌ জানিতেন না। একজন সাহেব, তাই লিখিয়াছেন :—

"The Hindus being ignorant how to turn an arch, substituted in line of it the method often adverted to above, of laying horizontal tiers of stones on the piers"— এই মত ঠিক্ নয়। হিন্দুরা যে উক্ত সময়ে খিলান তৈয়ারি করিবার কৌশল জানিতেন না তাহার কোন প্রমাণ নাই। এমন কি ফারগুসান সাহেব, স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, খিলানের প্রথম উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই। সুতরাং সমগ্র হিন্দুজাতিকে এখানে এক পর্য্যায়ে না ফেলিয়া, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন উৎকলবাসিগণ খিলানের নির্ম্মাণ পদ্ধতি জানিতেন না। সে কথা যাক।

সেতুর উচ্চতা ১৮ ফুট। বিস্তার, ২৯০ ফুট। প্রাচীর, ৬ ফুট—ইহা আধুনিক সংযোগ। সেতুর প্রস্থের মাপ, ১৪ ফুট। ইহা রাজা কবীর নরসিংহ দেবকর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ভিন্ন মতে, ইহার নির্ম্মাণকাল ১০৩৫—১০৪০ খৃঃ অঃ। নির্ম্মাতা মৎস্যকেশরী।

জগন্নাথের গ্রীষ্মাবাসকে উড়িষ্যাবাসীগণ, "গুণ্ডোবাড়ী" বলে। ইহার চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা। প্রাচীর, উচ্চে প্রায় ২১ ও প্রস্থে ৫॥০ ফুট। ভিতরে, প্রশস্ত আঙ্গিনা, পরিমাপ, ৪৩০ × ৩২০ ফুট। মধ্যস্থ মন্দির ৭৫ ফুট উচ্চ। মন্দিরের ভিতরে একটী বেদী। উচ্চে ৪ ও দৈর্ঘ্যে ১৯ ফুট। ইহার নাম মহাবেদী। রথযাত্রাকালে তদুপরে ত্রিমূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়। মন্দিরটি দুর্গানুকারী, তাই তাহার নাম "গুণ্ডিচাগড়।"

আমরা, এখানে পুরীর আর একটি শিল্প সম্পদের পরিচয় দিব। কোন পুস্তকে, আজ পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ দেখি নাই—কিন্তু ইহার পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকার যোগ্য।

এটি একটি মঠ; অবশ্য, খুব প্রাচীন নয়। নাম—বেংকটাচারীর মঠ। মঠবাসিগণ, ধর্ম্মে বৈষ্ণব। কটকে বালুবাজার নামে একটী যায়গা আছে—সেখানেও "শঙ্করাচারীর মঠ" নামে একটী মঠ দেখা যায়। সে মঠও এই সম্প্রদায়ের কিনা বলিতে পারি না।

পুরীর যে মঠের কথা বলিতেছি, তাহার নির্ম্মাতার নাম, চিন্তামণি মহাপাত্র। পথ হইতে একটু উঁচুতে উঠিয়া দরজা। দ্বার-পথের দুদিকে শিল্পসুন্দর নানা মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। যে স্থান ব্যাপিয়া কারুকার্য্য আছে, তাহার পরিমাপ বড় বেশী নয়। উচ্চে ৭ হাত ও প্রস্থে ৯ হাত। শুনিলাম, এইটুকু ক্ষোদন করিতে, ব্যয় পড়িয়াছে দু' হাজার টাকা।

বামদিকে ১৬টি থাক্ আছে। তাহার সর্ব্বশেষ স্তম্ভের খোদিত-চিত্রের কথা বলিতেছি।

প্রথমে যমুনা-মূর্ত্তি, মাপ ১।।০ ফুট ১ ইঞ্চি। কূর্ম্মবাহন মূর্ত্তি,—বাম করে স-মৃণালকমল। ডান হাতে একটী পাত্র। কণ্ঠধৃত পুষ্পমালা শ্রোণীনিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে। শিরে মণিমুকুট, শ্রবণে কুণ্ডল, নাসাও অলঙ্কৃত, বক্ষে রত্নহার, বাহুতে উৎকলদেশসুলভ ভূষণ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক এবং চরণেও অনেক গহনা। পরনে কোঁচা-দেওয়া কাপড়।

যমুনা-মূর্ত্তির উপরে পদ্মানুকারী কারুকার্য্য। তদুপরে আরও নানা আদর্শের কাজ। তদূর্দ্ধে সরস্বতী-মূর্ত্তি। (১ ফুট ৮ ইঞ্চি) দুদিকে দুজন সঙ্গিনী চামর ঢুলাইতেছে। সঙ্গিনীদের আকার খুব ছোট—৬ ইঞ্চি। বাগ্বাদিনীর করে বীণা,—মূর্ত্তি বিহসিতাস্য। দুদিক দিয়া বিস্রস্ত অঞ্চল, শ্রোণি-ফলক চুম্বন করিতেছে। অলঙ্কারাদি যমুনামূর্ত্তির মতন। এ মূর্ত্তির উপরেও উল্লেখযোগ্য কারুকার্য্য আছে।

ডানদিকের শেষস্তম্ভেও অনেক মূর্ত্তি। সর্ব্বনিম্নে বীণাবাদক নারদ। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, জগন্নাথ, বলরাম, সমরমত্ত শ্রীরামচন্দ্র। সর্ব্বোপরে পরশুরাম। প্রত্যেক মূর্ত্তি এক একটি ছোট কুলঙ্গীর ভিতরে আশ্রয়লাভ করিয়াছে এবং প্রত্যেকের পরিমাপও এক—৬ ইঞ্চি।

প্রবেশপথের দুপাশেই অপূর্ব্ব ক্ষোদনকার্য্য। এক একটী অঙ্গুলি-পরিমিত মূর্ত্তির পরিকল্পনাতেও শিল্পীর যে অসাধারণী বিভাবনার পরিচয়লাভ করা যায়, তাহাতে চমকিত হইতে হয়। এক জায়গায় একটী মঞ্জুপেলব সুবঙ্কিম বল্লরী ঊর্দ্ধমুখে বিসর্পিত হইয়া গিয়াছে। লতাটি যেখানে যেখানে বেঁকিয়াছে, সেইখানেই এক একটী ছোট মূর্ত্তি। কেহ ঢোল, কেহ করতাল, কেহ ভেরী এবং কেহবা শাঁখ বাজাইতেছে। কেহ মনোরঞ্জন ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া,—কাহারও হাতে বা একটী ফোটা ফুল। এমনি কত মূর্ত্তি,—আর সকলগুলিই প্রাণরঞ্জক।

দরজার বামপার্শ্বে যে সকল খোদিত চিত্র আছে, তাহা অবিকল দক্ষিণপার্শ্বের (ইতিপূর্ব্বেই যেদিকের পরিচয় দিয়াছি) মতন। দুটি স্তম্ভ আছে। প্রথম স্তম্ভে গঙ্গামূর্ত্তি—মকরবাহিনী। ডানহাতে একটী সপত্র-মৃণালে মুক্তদল শতদল মুকুলিত। বামহাতে পাত্র। অলঙ্কার, বসন ও পরিমাপ, পূর্ব্বকথিত যমুনামূর্ত্তির মত।

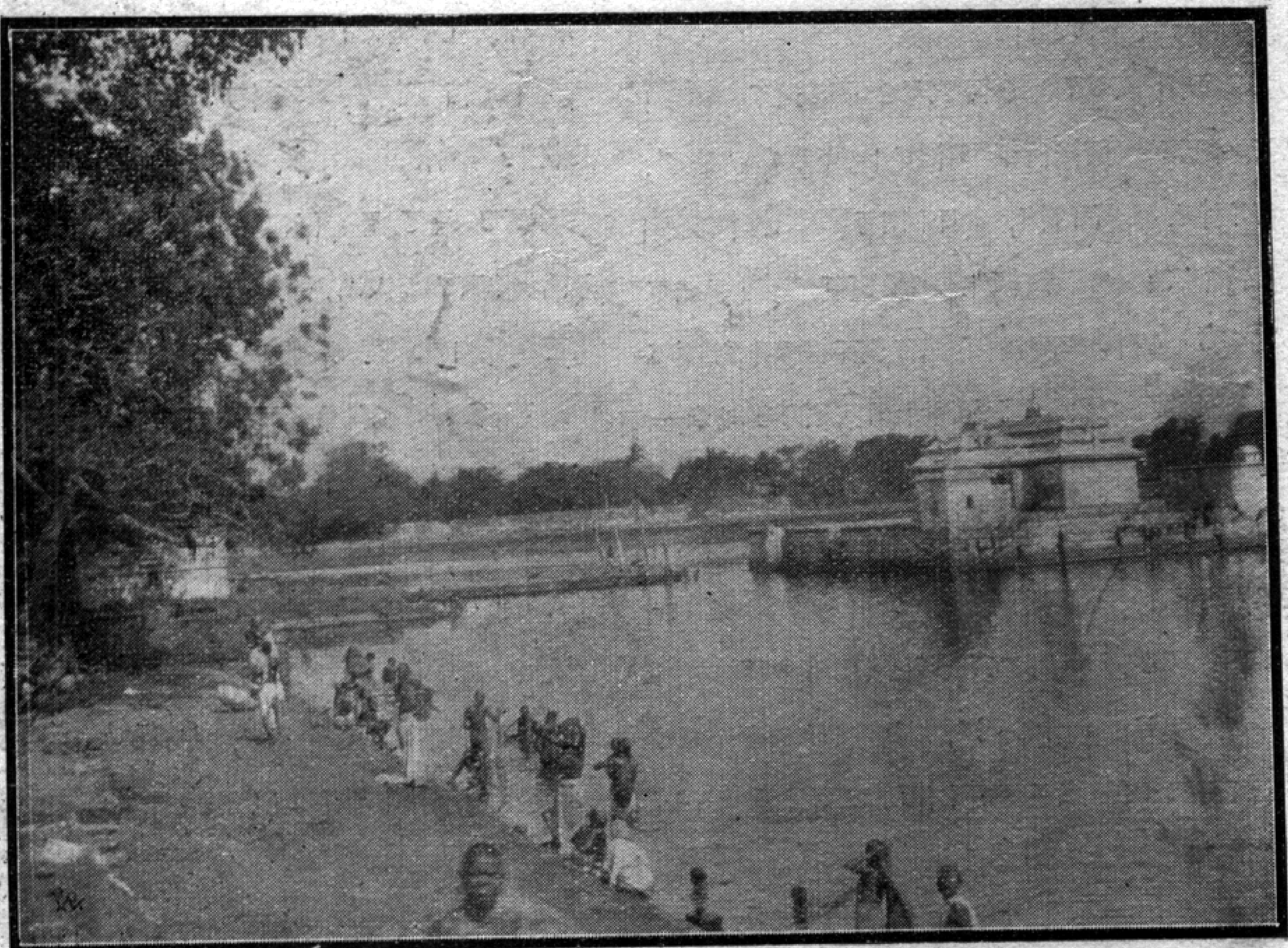
তদুপরে গায়ত্রীমূর্ত্তি। দু'পাশে দু'জন সখী। একটী রত্নরম্য কণ্ঠহার জানুসন্ধির উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। মুখ হাসিমাখা। বামহাতে সেতার।

দ্বিতীয় স্তম্ভে, অন্যান্য মূর্ত্তির সঙ্গে দশমাবতারের পাঁচটি মূর্ত্তি আছে। দ্বারপথের উপরেও কত রকম কাজ! মধ্যস্থলে ভগবান নৃসিংহদেব উপবিষ্ট,—বক্ষে লক্ষ্মীদেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি।

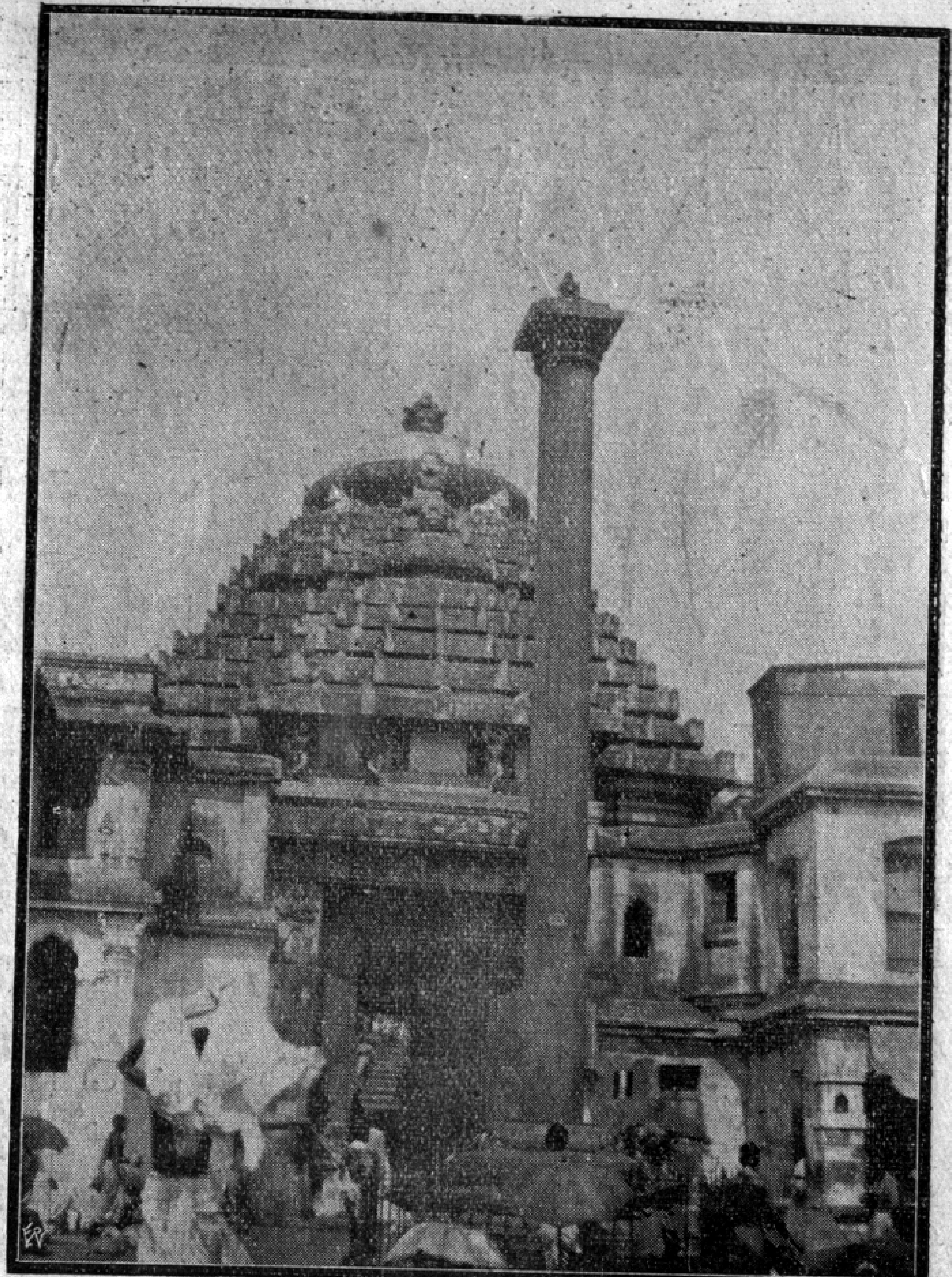
সমস্ত মূর্ত্তির ভিতরে প্রধান চারিটি—গঙ্গা, যমুনা, বীণাপাণি ও গায়ত্রী। মূর্ত্তিগুলিতে, প্রাচ্য শিল্পকলাহিসাবে কোন খুঁৎ নাই। এমন কি আঙ্গুলের নখটি পর্য্যন্ত শিল্পীর চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। রমণীগণের সুঠাম অঙ্গ, ভাবতরল চক্ষু, পীবর বক্ষ, ক্ষীণ মধ্য এবং রত্নভূষিত পাদরন্ধ্র—কিছুই ত্রুটিলাঞ্ছিত নয়; পরন্তু সেই সজীব মূর্ত্তিগুলির ভিতরে এমন একটী দীপ্তমঙ্গলশ্রী



আঠারো নালা



চন্দন সরোবর



জগন্নাথের মন্দির



গুণ্ডিচাবাড়ী

দেখিয়াছিলাম যে, আজ এতদিন পরে দূরদেশে বসিয়াও সমস্তই যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি! মূর্ত্তিগুলির পরস্পরের বিশ্লেষাবকাশে যে পুষ্পিত চারুশিল্প আছে, তাহাও মানসমরালকে কাব্যাকাশে উড়াইয়া লইয়া যায়। এই চিত্রকলকটিকে দূর হইতে হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, কে যেন একরাশি মুক্তা এখানে ছড়াইয়া দিয়াছে!

জগন্নাথের রথযাত্রাও, এখানকার একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। তখন বঙ্গোপসাগরের তট-বিসারী জলদগর্জ্জনের সঙ্গে, জনসাগরের ভৈরব কোলাহল একতানে ধ্বনিয়া ওঠে। আধুনিক উৎসব, অনেকেই দেখিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিস্তৃত বর্ণনা, বাহুল্যমাত্র।

জগন্নাথ দেবের রথের পরিমাপ, প্রস্থে ৩৫ ও উচ্চতায় ৪৮ ফুট। চাকা গুলি লোহার—ব্যাস ৭ ফুট। সংখ্যায় ১৬ খানি। সুভদ্রার রথ আরও ছোট। তাহার উচ্চতা ৪২ ও প্রস্থ ৩২ ফুট। চাকা ১২ খানি। তাহাদের ব্যাস ৬ ফুট। বলদেবের রথের উচ্চতা ৪৫ ও প্রস্থ ৩৪ ফুট। চক্রসংখ্যা চতুর্দ্দশ, তাহাদের ব্যাস ৬৷৷০ ফুট।

ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে এখানে কিরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, তাহা লিখিত আছে। আমরা তাহার স্থল বিশেষের কিছু কিছু পরিচয় এখানে দিলাম।

আষাঢ় মাসে, যখন বর্ষাকণশীতল পথ ঘাট সিক্তস্নিগ্ধ, সেই সময়ে শুক্লপক্ষে নগর ধ্বজপুষ্পসজ্জায় মোহনীয় হইয়া উঠিত। রাজা ও রাণী প্রভৃতি তখন বৌদ্ধযতিগণের সহিত পবিত্র পুঁথি পাঠ করিতেন।

যথাস্থলে একখানি রথ সজ্জিত থাকিত। তাহার উচ্চতা ৩০ ফুট। স্যন্দনের আকার গৃহতুল্য। তাহাতে উর্ণাসূত্ররচিতা তিরস্করিণী বিলম্বিত। তাহা সপ্তরত্ন এবং পুষ্পাদির দ্বারা বিভূষিত।

রথমধ্যস্থ দেবতার দুইপাশে দুই বুদ্ধ মূর্ত্তি। যানের চতুঃপার্শ্বে আরও অনেক মূর্ত্তি—কোনটী স্বর্ণ, কোনটী রৌপ্য এবং কোনটী বা মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত। শুদ্ধদেহ, নববস্ত্রপরিবৃত রাজা এখানে আসেন। এবং মুকুট ও পাদুকা খুলিয়া রাখিয়া দেবতাকে প্রণাম করেন—তাঁহার চরণে ফুল দিয়া পূজা করেন। রথ চলিতে থাকে। যখন তাহা রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে আসে, তখন শুদ্ধান্তঃবাসিনিগণের পদ্মহস্তবৃষ্ট অজস্র পুষ্পদলে স্যন্দনদৃশ্য সুচারু হইয়া ওঠে। (১০)

সাগর, এখানকার জাগ্রৎ ঠাকুর। তীরে বসিয়া তাহার অগাধ সলিলবিস্তার দেখিলে মন আপনার ক্ষুদ্রতা পরিহার করে এবং সেই নিখিলশরণ্য অনাদি অনন্ত জগন্নাথকে না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক; ঊর্দ্ধে সেই মেঘমৌলি নীলাকাশ, দিগন্ত তটে গগন ও সাগরের সেই প্রেমালিঙ্গন, চরণে সেই শুক্তিদীপ্ত দুগ্ধশুভ্র শিকতা-শয়ন এবং সম্মুখে সেই জলধি, সেই নিবিড় নীলিমা, সেই ক্ষীর-ধবল ফেনমালা ও সেই অবিরাম নটনসহ মহাসঙ্গীত; সমস্তই অপূর্ব্ব এবং ভাষায় প্রকাশাতীত।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(১০) Pilgrirmage of Fahian.

নরনারীর নামনির্ব্বাচনে অনুপ্রাস

কিছুকাল অবধি অনুপ্রাস অবলম্বনে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন আছি। নরনারীর নাম-নির্ব্বাচনে অনুপ্রাসের অনুরোধ কত অধিক, অদ্য তাহাই দেখাইব।

কবিকুল মানসসন্তানদিগের নামনির্দ্দেশে অনুপ্রাসের অবতারণা করেন, তাহা অন্যত্র(১) দেখাইয়াছি। কিন্তু সকলেই কিছু কবি নহে, অথচ কবিত্বকণ্ডূয়ন সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। অনেক মাতাপিতা সেই সখ সন্তানসন্ততির মিলমাফিক নাম রাখিয়া মিটাইয়া লয়েন। তবে এটুকু কবিত্বও অনেক সময় অরসিক বিধাতার সহে না, এইরূপ একটা মেয়েলি সংস্কার আছে। বিধাতা যমযাতনা দিয়া দু' একটি টানিয়া লইয়া প্রক্রমভঙ্গ করিয়া দেন। বর্ত্তমান লেখক এ বিষয়ে ভুক্তভোগী।

১। মিলের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, নামের দ্বিতীয় অংশটি(২) বংশপরম্পরায় সাধারণ রাখা, অর্থাৎ মা ও মেয়ের বা ভগিনীগণের নামে কামিনী, মোহিনী, মালা, বালা, মতী (যথা হরিমতী, মধুমতী), মণি (যথা হরমণি, রামমণি), দাসী (যথা হরিদাসী, কৃষ্ণদাসী) প্রভৃতি যোজনা করা এবং পিতাপুত্রের বা ভ্রাতৃবর্গের নামে নাথ, চন্দ্র, কান্ত, মোহন, কুমার, দাস, প্রভৃতি যোজনা করা। (প্রয়োজন হইলে, নামাংশের বিচিত্র বিবরণ অপর প্রবন্ধে দিব।) চন্দ্র, মোহন, কুমার প্রভৃতি সাধারণতঃ নামের দ্বিতীয় অংশ হইলেও কখন কখন প্রথম অংশও হয়, (যথা চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকুমার, মোহনলাল, মোহনচন্দ্র, কুমারনাথ, কুমারকৃষ্ণ)। কতকগুলি স্থলে আলাদা অংশ না হইলেও শেষটায় মিল থাকে। যথা কুমুদিনী, প্রমোদিনী, বিনোদিনী; মৃণালিনী, নলিনী; সরলা, কমলা; সরোজিনী, পঙ্কজিনী; অনুজ্ঞা, প্রজ্ঞা; বিভা, প্রতিভা; ইত্যাদি।

২। কখন কখন নামের প্রথম অংশটির আবার দুইটি ভাগ (৩) থাকে (যথা দেবেন্দ্র)। তাহার দ্বিতীয় ভাগটি (ইন্দ্র ও ঈশ খুব প্রচলিত) এবং নামের দ্বিতীয় অংশটি দুইই বংশপরম্পরা-ক্রমে সাধারণ থাকে। এইরূপ ডবল মিল অধিকন্তু ন দোষায়। বিখ্যাত যোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে ইন্দ্র (নামের প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগ) ও নাথ (নামের দ্বিতীয় ভাগ) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ (যথা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, ৺বীরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি ভ্রাতৃবৃন্দ)। শোভাবাজারের রাজ-পরিবারে ইন্দ্র ও কৃষ্ণ এইভাবে যুগপৎ বিরাজিত (যথা নরেন্দ্রকৃষ্ণ)। খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের নামের প্রথমাংশের দ্বিতীয়ভাগ ইন্দ্র, তবে দ্বিতীয় অংশে নাথ না দিয়া লাল লাগান হইয়াছে। কৃষ্ণনগর রাজবংশে শ্রীশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র প্রভৃতি নামে, ঈশ ও চন্দ্র যুগপৎ

(১) প্রতিভা, ফাল্গুন ১৩১৮। বঙ্গদর্শন চৈত্র ১৩১৮।

(২) ব্যাকরণের নিয়মে অবশ্য দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশটির সঙ্গে সমাস হইয়া একপদ।

(৩) ব্যাকরণের নিয়মে অবশ্য এটি প্রথমভাগের সঙ্গে সমাস হইয়া একপদ।

বিরাজিত। সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত ৺শ্রীশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র (মজুমদার) তথা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র (সমাজপতি) ভ্রাতৃযুগলের নামেও এই বৈচিত্র্য বিরাজিত। অমূল্যধন, অতুল্যধন প্রভৃতি যোড়ে যোড়ে নামেও এই ডবল মিল আছে।

৩। আবার কোন কোন বংশে নামের প্রথম অংশটিই সাধারণ সম্পত্তি। যথা ভূকৈলাস রাজবাটীতে 'সত্য'——সত্যবাদী, সত্যশ্রী ইত্যাদি। রাধাকুমুদ, রাধাকমল, রাধারমণ, রাধাবিনোদ প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দও ইহার সাক্ষী।

৪। কোন কোন বংশে পিতার নামের আদ্যক্ষর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের আদ্যক্ষর হয়—এই রীতি প্রচলিত, অর্থাৎ আদ্যক্ষরে জ্যেষ্ঠাধিকারবিধি বলবান্ থাকে। এ ক্ষেত্রেও যোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে ইহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। যথা ৺দ্বারকানাথ, ৺দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ, এই পাঁচ পুরুষ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, ৺বীরেন্দ্রনাথের পুত্র ৺বলেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ। ঠাকুরপরিবারের বাহিরেও এই প্রথার প্রসার আছে। যথা ৺কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র করুণাচন্দ্র, শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার। 'কৃষ্ণনগরাধিপ ৺ক্ষিতীশচন্দ্রের পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র। কাঁকিনাধিপতি ৺মহিমারঞ্জনের পুত্র রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত মহীন্দ্ররঞ্জন। তাজহাটের ৺গোবিন্দলাল রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ময়মনসিংহের ৺সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য।

মা ও মেয়ের নামেও কখন কখন এইরূপ আদ্যক্ষরে মিল দেখা যায়। তবে সকল সময়ে জ্যেষ্ঠাধিকারবিধি বলবান্ থাকে না। যথা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, দেবী স্বর্ণকুমারীর কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী। এই প্রসঙ্গে Walt Whitman এর ধরণে দুই ছত্র কবিতা লিখিলাম :—

কল্পনাকাননে শ্বাশুড়ী সরলা আর স্বর্ণলতা স্নুষা।
বাস্তবব্যাপারে দেবী স্বর্ণকুমারী মাতা,
সরলা দেবী দুহিতা।

৫। দেবনামে সন্তানসন্ততির নাম রাখা হিন্দুর সাধ। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়। ইহার ফলেও বহুস্থলে অনুপ্রাসের অবসর ঘটে। যথা ভগিনীগণের নামে জয়া বিজয়া, গায়ত্রী সাবিত্রী। ভ্রাতৃবর্গের নামে কানাই বলাই, শ্রীদাম সুদাম, নিতাই নিমাই, রাখাল গোপাল, গোপাল গোবিন্দ, হরি হর, কৃষ্ণ কালী, রাম শ্যাম (সাধারণ উচ্চারণে রাম শাম), উপেন্দ্র দেবেন্দ্র, জয় বিজয়, ইন্দ্র চন্দ্র, উমা শ্যামা, গুরু গঙ্গা; ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় ৺গোবিন্দদেব ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব।

৬। দেবনাম ছাড়িয়াও যোড়ে নাম রাখিয়া অনুপ্রাসের অবতারণা করা হয়। যথা হেমন্ত বসন্ত, বিজয় বসন্ত, রূপ রঘু, অরবিন্দ শরদিন্দু (সাধারণ উচ্চারণ অরবিন্দু শরবিন্দু); লেখকের জনৈক বন্ধুর পুত্রগণ নির্ম্মল বিমল অমল কমল। লেখকের কবিত্বপ্রবণতার

ফল শিশির ও সুধা, অনিল ও সলিল, ভজহরি ও সাতকড়ি ! ভজহরির পুত্র গজহরিকে যথাকালে দেখিতে পাইবেন, লেখক এ আশাও হৃদয়ে পোষণ করেন !!

৭। স্বামিস্ত্রীর নামে নামে মিল হইলে সোণায় সোহাগা হয়। ইহাই প্রকৃত রাজ-যোটক মিল ! কিন্তু ইহা বিরল, কেন না বর-কন্যার জনকজননী ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কায করেন না। কল্পনার রাজ্যে, সংস্কৃত সাহিত্যে মালতী ও মাধব, মদয়ন্তিকা ও মকরন্দ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎসরোজিনী ও ললিত-লীলাবতী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবজগতে কই ? সুখের কথা, হিন্দুর আদর্শ-দম্পতী সুরলোকে শিবসতী (রোম-রাজ্যে জুপিটার ও জুনো !) ও নরলোকে সাবিত্রী-সত্যবান্।

৮। এক্ষণে নামের ভিতরে অনুপ্রাসের অনুসন্ধান করি। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীতে অনুপ্রাস, আত্রেয়ী-মৈত্রেয়ীতে যুগলে অনুপ্রাস, উভয়ভারতীতে অনুপ্রাস (মণ্ডনমিশ্রেও অনু-প্রাস)। রাণী কৈকেয়ী ও রাণী মন্দোদরীতে, রাণী সত্যবতী ও রাণী ময়নামতীতে অনুপ্রাস, বিদুষী লী-লা-বতীতে অনুপ্রাস। শুনঃশেফ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বৈদিক নামে, বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ, না-নক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকের নামে, কুল্লূক, ভবদেবভট্ট, মুরারিমিশ্র, নীলকণ্ঠের পুত্র শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি প্রভৃতি গ্রন্থকারের নামে, সুদাস, দিবোদাস, কুশিক, কৌশিক, হৈহয়, কেকয়, হাহাহুহু, যুযুৎসু, সুষেণ, বিশ্বাবসু, বভ্রুবাহন, বিচিত্র-বীর্য্য, কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, সত্যব্রত, জনমেজয়, প্রভৃতি পৌরাণিক নামে, প্রতাপাদিত্য, ললিতাদিত্য, বল্লাল, বনবীর, বীরবল, দুর্গাদাস, দেবপালদেব, দেবীবর, শক্তসিংহ, সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, কাছাড়রাজ নির্ভর-নারায়ণ, কুচবিহাররাজ নরনারায়ণ নৃপেন্দ্র-নারায়ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নামে অনুপ্রাসের অবসর যথেষ্ট ঘুটিয়াছে। আধুনিক নামের বিরাট্ ফর্দ্দ পরিশিষ্টে দেখুন। আমাদের সমাজে নারীর নাম জানা সহজ নহে, সেইজন্য নারীর নাম ধরিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবন্ধের পূর্ণতার জন্য ইহার প্রয়োজন। পুরুষের নামে আকার ঈকার দিলে অনেক স্থলে নারীর নাম হয়, সেগুলি নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। দেবনামে মানুষের নাম রাখিয়াও বিস্তর অনুপ্রাসের আমদানী হয়, সেগুলি সব এখানে দিই নাই। 'ধর্ম্মকর্ম্মে অনুপ্রাস' প্রবন্ধে সেগুলি বিবৃত হইবে (অন্য পত্রিকায়)।

৯। সংসারাশ্রম ছাড়িয়া সাধুসন্ন্যাসী হইয়াও অনেকে অনুপ্রাসের মায়া কাটাইতে পারেন না। যথা ত্রিগুণাতীত, মণ্ডনমিশ্র, বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, শঙ্করস্বামী, সোঽহং-স্বামী, শিবানন্দস্বামী, সেবানন্দস্বামী, শিব-নারায়ণস্বামী, রামস্বামী, ব্রহ্মানন্দভারতী (লাট), দয়ানন্দ সরস্বতী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

১০। কতকগুলি স্থলে নামের তিন ভাগেই (উপাধি ধরিয়া) অনুপ্রাসের সর্ব্বগ্রাস দেখা যায়। কল্পনা বা আন্দাজের আশ্রয় না লইয়া যে সমস্ত নাম পরিচিত তাহাই দিতেছি। যথা - শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী, শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা নায়ক, ৺গোপালগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী

(সেরপুর), শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে, মৃত মোহিনীমোহন মিত্র এম্-এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত রামরাম সংযমী, শ্রীযুক্ত অরবিন্দবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসাক, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসু, শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন, শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র (কাব্যকণ্ঠ), শ্রীযুক্ত সর্ব্বসুখ সান্যাল, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর শর্ম্মা।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ও বাঙ্গালার বাহিরে শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য। (জামসেটজী জিজিভয়, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, রায় বদ্রিদাস বাহাদুর, ত্রিম্বক তেলাঙ্গ প্রভৃতি নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

পরিশিষ্ট

নারীর নাম।

মমতা, লীলা, ষোড়শী, সরস্বতী এই কয়টি নামে প্রথম অংশেই অনুপ্রাস।

অন্নপূর্ণা।

কমলকুমারী কমলেকামিনী, কাননকুমারী, কুন্দনন্দিনী, কুসুমকামিনী, কুসুমকুমারী, কৃষ্ণকুমারী, কৈলাসবাসিনী, (ক্ষেত্রকালী)।

তিলোত্তমা, ত্রৈলোক্যতারিণী।

দিনমণি।

নগনন্দিনী, নগনলিনী, নবনলিনী, নলিনীবালা, নিভাননী।

প্রমীলাবালা।

মণিমালা, মণিমালিনী, মধুমতী, মনোমোহিনী, মনোরমা, মহামায়া, মালতীমালা।

রাজরাজেশ্বরী, রাণী মৃণালিনী, রাধারাণী, রামমণি।

বিজলীবালা, বিন্দুবাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, বিভুবালা বীণাপাণি।

শরৎশশী, শ্যামাসুন্দরী, শ্রীসুন্দরী।

সিদ্ধেশ্বরী, সুরেশ্বরী, সুভাষিণী, সুবাসিনী, সুহাসিনী।

সুশীলাবালা, সুশীলাসুন্দরী।

পুরুষের নাম।

নন্দ, নবীন, নারায়ণ, ললিত, লাডলী, লাল, গগন, দুলাল, কালিকা, গঙ্গা প্রভৃতি নামের প্রথম অংশেই অনুপ্রাস।

অচ্যুতচরণ, অতুলগোপাল, অনাথনাথ, অমরকুমার, অমূল্যগোপাল।

আনন্দসুন্দর, আশুতোষ।

এককড়ি।

কমলকুমার, কমলকৃষ্ণ, কমলেশ, করুণাকান্ত, করুণাকুমার, কামদাকিঙ্কর, কালিকেশ, কালীকমল, কালীকান্ত, কালীকিঙ্কর, কালীকিশোর, কালীকুমার, কালীকৃষ্ণ, কাশীকান্ত, কাশীকিঙ্কর, কাশীবাসী, কিরণকুমার, কুমারকৃষ্ণ, কুমুদকুমার, কুমুদিনীকান্ত, কুলদাকান্ত, কুলদাকিঙ্কর, কুসুমকুমার, কৃতান্তকুমার, কৃষ্ণকমল, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণকালী, কৃষ্ণকিঙ্কর, কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণকুমার।

ক্ষিতিপতি, ক্ষীরোদকান্ত, ক্ষীরোদকুমার, ক্ষেমদাকিঙ্কর।

গঙ্গাগোবিন্দ, গুরুগোবিন্দ, গোপালগোবিন্দ, গোপাললাল, গোবিন্দগোপাল, গোবিন্দচন্দ্র, গৌরগোপাল, গৌরগোবিন্দ, গৌরহরি।

চণ্ডীচরণ, চন্দ্রচূড়, চারুচন্দ্র।

জগৎজীবন, জনমেজয়, জ্ঞানরঞ্জন, জ্ঞানাঞ্জন।

দয়ালদাস, দামোদর, দীনদয়াল, দীননাথ, দুর্গাগতি, দুর্গাদাস, দেবীবর, দ্বিজরাজ।

ধনুকধারী, ধরণীধর।

নগেন্দ্রনাথ, ননীন্দ্রনাথ, ননীলাল, নন্দদুলাল, নন্দলাল, নরনাথ, নরনারায়ণ, নরহরি, নরেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রলাল, নলিনাক্ষ, নলিনীনাথ, নয়নাঞ্জন, নিত্যানন্দ, নিশিভূষণ, নীলকমল, নীললোহিত, নৃপেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

পতিতপাবন, পরমেশপ্রসন্ন, পশুপতি, প্রাণধন।

ভববিভূতি, ভবভূতি, ভবভূষণ, ভবানীভূষণ ভুজঙ্গভূষণ, ভুবনমোহন, ভূপেন্দ্রভূষণ।

মণিমোহন, মণীন্দ্রচন্দ্র, মণীন্দ্রমোহন, মথুরামোহন, মদনমোহন, মহেন্দ্রমোহন, মনোজমোহন, মনোমোহন, মন্মথনাথ, মন্মথমোহন, মুকুন্দমাধব, মোহমোহন, মোহিতমোহন, মোহিনীমোহন।

যোগজীবন।

রঘুরাম, রঘুবীর, রঞ্জনীরঞ্জন, রতনমণি, রতিপতি, রতিরাম, রমণীরঞ্জন, রবিরাম, রাকেশরঞ্জন, রাখালরাজ, রাজারাম, রাধামাধব, রাধারমণ রাধিকারঞ্জন, রাধিকারমণ, রাধেশরঞ্জন, রামকমল, রামনারায়ণ, রামমাণিক্য, রামরঞ্জন, রামরতন, রামরত্ন, রামরাখাল, রামরাম, রামরূপ, রামহরি, রুদ্ররাম, রূপরাম, রেবতীরঞ্জন, রেবতীরমণ।

লালগোপাল।

বংশীবদন, বঙ্কবিহারী, বঙ্কুবিহারী, বশংবদ, বহুবল্লভ, বাঁকেবিহারী, বাণীনাথ, বিজনবিহারী, বিপিনবিহারী, বিমানবিহারী, বিজয়বসন্ত, বিধুভূষণ, বিধুবর, বিভুবিলাস, বিভূতিভূষণ, বিশ্বেশ্বর, বীরেশ্বর, ব্রজরাজ, ব্রজবল্লভ, ব্রজবান্ধব, ব্রজবাসী।

শবশিবা, শশাঙ্কশেখর, শশিভূষণ, শশিশেখর, শান্তশীল, শিবশঙ্কর, শৈলেশ্বর, শ্যামসুন্দর, শ্যামাপ্রসন্ন, শ্রীশ্বর।

সতীন্দ্রসেবক, সত্যব্রত, সত্যতারণ, সত্যশরণ, সত্যসখা, সত্যসিন্ধু, সদানন্দ, সদাশিব, সন্তোষশীল, সর্বসুখ, সর্বেশ্বর, সনাতন, সারদানন্দ, সিদ্ধেশ্বর, সুধাংশুশেখর, সুরেশ্বর, সুশীল, সুশীলগোপাল।

হরিরাজ, হরিহর।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

অবতরণিকা।

[বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এখনও গঠিত হইয়া উঠে নাই। সুকুমার সাহিত্য সম্পদে এখন বঙ্গভাষা দীনা নহেন। যে ভাষার পদ্য-সাহিত্য ভারতচন্দ্র মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত এবং যাহার গদ্য-সাহিত্য ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি বাণীর সুসন্তানগণের হস্তরচিত তাহা জগতের যে কোন জাতির ভাষায় সমকক্ষ হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞান বা অন্য কোন বিভাগীয় সাহিত্যসম্পদে বঙ্গভাষা এখনও নিতান্ত দীনা কাঙ্গালিনী। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরে কয়েকজন মহোদয় ব্যক্তি মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আজ কাল মাসিক পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখনও বিজ্ঞান জাতীয় সাহিত্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই বিভাগীয় সাহিত্য-গঠনের ভার আমাদিগের ও ভবিষ্যৎবংশীয় বৈজ্ঞানিকগণের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে—আমরা ইহাকে যে ভাবে গঠন করিয়া

তুলিব সেইভাবে উহা গঠিত হইবে। মাতৃভাষা সেবার এরূপ একটা মঙ্গলময় সুযোগ আমরা যেন হেলায় নষ্ট না করি।

অনেকে বলেন যে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ফল মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার এখনও সময় আসে নাই। তাহার দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য মাতৃভাষায় ব্যক্ত করা অতীব কঠিন, দ্বিতীয় আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজের অভাব। ভারতে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবত ইউরোপের বিশাল বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গবেষণার ফল ভারতে আদৃত না হইলেও ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। তাঁহাদের গবেষণা ইউরোপের ঐ সকল সমাজের পত্রিকায় ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হয়। ইউরোপের এক ভাষায় কোনও নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইলে অনুবাদের সাহায্যে অপর ভাষাতেও তাহা প্রচারিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইংলণ্ডের কেমিকেল সোসাইটিতে কোন মৌলিক রাসায়নিক প্রবন্ধ পঠিত হইলে তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে ফরাসী, জার্ম্মাণী, এমন কি সুদূর আমেরিকার রাসায়নিক সমিতি গুলির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে সুদূর প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়েন। বঙ্গভাষা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে তাদৃশ উন্নত না হওয়াতে এখনও তাহা বৈজ্ঞানিক সমাজের অন্যতম ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন এই বঙ্গভাষা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যেও গরীয়সী হইয়া উঠিবে, তখন মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে আমাদিগকে ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। এবিষয়ে কতকটা কাজ আমরা এখনই আরম্ভ করিতে পারি। এখনই আমরা আয়ুর্ব্বেদ, ভারতের প্রাচীন রসায়ন, চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক গবেষণার ফল বঙ্গভাষায় অনায়াসে প্রকাশিত করিতে পারি। একটু চেষ্টা করিলেই ঐ সকল বিষয় বাঙ্গালায় লেখা যাইতে পারে এবং এরূপ বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য ও আগ্রহ আমাদের দেশে অনেকেরই আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গভাষাকে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার উপযুক্ত করিতে হইলে প্রথমে তাহার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক নানা বিষয় লিখিতে লিখিতে পরিভাষার সৃষ্টি হইবে। আজ কাল প্রত্যেক বিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন ও গঠনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী লিখিতে আরম্ভ না করিলে পরিভাষা গড়িয়া উঠিবে না। আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন নামক প্রবন্ধগুলি লিখিতে আমি পরিভাষার জন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অধিকাংশ স্থানে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী প্রতিশব্দ না দিলে অর্থবোধ হইবে না বলিয়া বন্ধনী দিতে বাধ্য হইয়াছি। মনে হয় ক্রমে অভ্যাসের সহিত বন্ধনীর আর প্রয়োজন হইবে না। আসল কথা হইতেছে, লিখিতে হইবে। যাঁহারা মৌলিক গবেষণায় ব্যস্ত আছেন, তাঁহাদিগকেও এদিকে মনোযোগ দিতে হইবে।

কাব্য বুঝিতে হইলে যেমন অগ্রে কবিকে বুঝিতে হয় সেইরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্য বুঝিতে হইলে অগ্রে বৈজ্ঞানিককে বুঝিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তকে আমরা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সুসম্বদ্ধ ভাবে একস্থানে দেখিতে পাই, কিন্তু কিরূপে এক একজন বৈজ্ঞানিক পরে পরে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহার আলোচনা না করিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পন্থা ধরিতে পারা যায় না। প্রত্যেক সাধনার এক একটি নির্দ্দিষ্ট মার্গ আছে, বিজ্ঞানপন্থীকেও আপনার সাধনার মার্গ নির্ণয় করিবার জন্য পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে কতকগুলি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া মহাপুরুষ চরিত কথনের পুণ্য উপার্জ্জন করিবার বাসনা আছে।]

ল্যাভোয়াসিয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একজন ফরাসী রাসায়নিক বলিয়া গিয়াছেন "রসায়ন শাস্ত্র ফরাসীদেশীয় শাস্ত্র; ইহার জন্মদাতা অমরকীর্ত্তিসম্পন্ন ল্যাভোয়াসিয়ে"। এই উক্তিটি অযথা স্বদেশহিতৈষণা প্রেরিত বা অতিরঞ্জিত নহে। বাস্তবিক পক্ষে যদি নব্যরসায়নের জন্মদাতা বলিয়া কোন একজন মহাপুরুষকে নির্দ্দেশ করিতে হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় সে ব্যক্তি ফরাসীদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ল্যাভোয়াসিয়ে। তিনি প্রাচীন রসায়ন জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেরূপভাবে তমসাবৃত ভ্রান্তধারণার মধ্যে সত্যের বিমল আলোক আনয়ন করিয়া সমগ্র ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজকে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নব্যরসায়নের জন্মদাতা না বলিয়া থাকা যায় না। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষকে উন্মত্ত ফরাসী বিপ্লবের সময় অকালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ঘাতকের হস্তে দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। একজন দর্শক সেই সময় বলিয়াছিলেন "এইরূপ একজনের মস্তক কাটিয়া ফেলিতে এক মুহূর্ত্তও লাগে না, কিন্তু এইরূপ আর একটি মস্তিষ্ক একশত বৎসরেও জন্মিবে কি না সন্দেহের বিষয়।"



ল্যাভোয়াসিয়ে

এণ্টয়েন লোঁরা ল্যাভোয়াসিয়ে (Antoin Laurent Lavoisier) ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে ২৬এ আগষ্ট তারিখে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী প্যারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রবেত্তা, মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা নিউটনের ঠিক একশত বৎসর পরে ল্যাভোয়াসিয়ের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং

পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক, অনেক বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষের বাল্যে এই সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, অনেকেরই অর্থাভাবে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় নাই, পরে তাঁহারা স্বকীয় সাধনার বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অমর হইয়া গিয়াছেন। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট গণিতশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রসায়নের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ রাউলের অধ্যাপনায় তাঁহার দৃষ্টি রসায়নশাস্ত্রের উপর সমধিক পতিত হয়। অধ্যাপক রাউলের অধ্যাপনা সমগ্র ফরাসীদেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ল্যাভোয়াসিয়ের সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্র আইনশিক্ষা করেন এবং বাস্তবিক একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ল্যাভোয়াসিয়ে আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকাতে তিনি আইনব্যবসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হইল। বাইশ বৎসর কালে তিনি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পরবৎসর "বৃহৎ নগর আলোকিত করিবার উপায়" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-পরিষদ ফরাসী একাডেমী হইতে একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এবং সেই বৎসরই ঐ পরিষদের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। এই ফরাসী একাডেমী ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীদেশে জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাত্রেই এই পরিষদের সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া যুবক ল্যাভোয়াসিয়ের মৌলিক অনুসন্ধানের আগ্রহ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। মৌলিক গবেষণার প্রবৃত্তি ঠিক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ক্রিয়াশীল। যেমন কোন সংক্রামক ব্যাধি এক শরীর হইতে অপর শরীরে স্বতই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসর্গ গুণে নবাগত সাধকের সাধনার প্রবৃত্তি স্বতই উত্তেজিত হইয়া ওঠে। এই আকাঙ্ক্ষা যাঁহার হৃদয়ে একেবার স্থান পাইয়াছে তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেমন একদিকে বহু উচ্চ উপাধিধারী যুবক এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রাণিত হইতে না পারিয়া সাধনার মন্দির হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে অনেক ভাগ্যবান যুবক অল্প শিক্ষিত হইয়াও সংসর্গগুণে জ্ঞানার্জ্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

ফরাসী একাডেমীর সভ্যগণ বৎসর বৎসর নানাবিষয়ে বিবরণী প্রকাশ করিতেন। ল্যাভোয়াসিয়ের অসামান্য প্রতিভা ও নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শনে একাডেমীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল বিবরণী প্রকাশের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তিনি [illegible] বৎসরে দুই শত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী লিখিয়াছিলেন। এইরূপে ফরাসী একাডেমীর সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, সে

সম্বন্ধ তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোর ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন সমস্ত বিদ্বৎসমাজ বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছিল, তখনও তিনি একাডেমীকে পিতৃবৎ রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। আপনার অর্থব্যয় করিয়া প্রাচীন জরাজীর্ণ বৈজ্ঞানিকগণকে মাসিক বৃত্তি দিয়া একাডেমীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই রাজাজ্ঞায় ফরাসী একাডেমীর অস্তিত্ব লোপ পাইল।

ল্যাভোয়াসিয়ের অর্থের কোনদিন অভাব ছিল না। মাতার মৃত্যুর পর তিনি বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে তিনি অর্থাগমের অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়া অনন্যমনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু ভবিতব্যতা তাহা ঘটিতে দিল না। তিনি যখন বিজ্ঞানের মন্দিরে এক পদ স্থাপন করিলেন, তখনই অজ্ঞাতসারে ফাঁসিকাষ্ঠের প্রথম সোপানে তাঁহার অপর পদ স্থাপিত হইল। তিনি ফারমিয়ে-জেনারল (Frmeir-General) হইলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসীদেশে যাঁহারা রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিতেন তাঁহারা ঐ নামে অভিভাষিত হইতেন। তাঁহারা খানিকটা তালুক ইজারা করিয়া লইতেন এবং রাজসরকারের সহিত ছয় বৎসরের রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্ক আগাম দিবার বন্দোবস্ত করিতেন। নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের উপর আরও অধিক মুদ্রা গোপনে রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে উপহার দিতে হইত। ফলে দরিদ্র প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন হইত। ঘুষ, জুয়াচুরি, জুলুম ফারমিয়ের নিত্য সহচর ছিল। অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও দরিদ্র প্রজাবর্গ সুবিচার প্রাপ্ত হইত না, উপরন্তু নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে সমর্থ না হইলে তাহাদিগকে বিষম শাস্তিভোগ করিতে হইত। ফরাসীদেশের সর্ব্বত্রই উৎপীড়িত প্রজাবর্গ এই প্রথাকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণার চক্ষে দেখিত। ইহাদের মধ্যে সৎব্যক্তিও ছিলেন। ল্যাভোয়াসিয়ে জমীদারির ভার গ্রহণ করিয়া নিজের এলেকার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুবিচারের বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ভিন্নদেশ হইতে মেষাদি পশু আনয়ন করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও উৎপীড়িত জনসাধারণের ঘৃণার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পান নাই। শেষের দিনে তাঁহার অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণই লোকে ভুলিয়াছিল—সে দিন ফারমিয়ে বলিয়াই সকলে তাঁহাকে মনে রাখিয়াছিল।

ল্যাভোয়াসিয়ের জীবন দুই প্রকার কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল—প্রথম বিজ্ঞানের সেবা, দ্বিতীয় দেশের সেবা। দেশের নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, রাজকীয় বিবিধ কার্য্যে তিনি রাজকীয় শক্তির সহায়তা করিতেন। বিশেষতঃ রাজসরকারে বারুদের কারখানার তিনি এক সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি বারুদ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি করিয়াছিলেন। যদি তিনি অনন্যমনে বিজ্ঞানের সেবা করিতেন, তাঁহার সমগ্র শক্তি বিজ্ঞানের চর্চ্চার নিয়োগ

করিতেন তাহা হইলে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি করিতে পারিতেন কে বলিতে পারে! যখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন তিনি রাজনীতির কোলাহল-মুখরিত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানাগারের চিরশীতল শ্যামল স্নিগ্ধ চ্ছায়ায় সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহাকে অব্যাহতি দেয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি এবং আরও সাতাইশ জন ফারমিয়ে-জেনারাল রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার আজুহাতে অভিযুক্ত হন। ল্যাভোয়াসিয়ে যে সকল অপরাধের জন্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তামাকে জল ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করা তাহার অন্যতম। যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় পিতা পুত্রকে ভুলিয়াছিল, বন্ধু বন্ধুর মস্তক ছেদন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, সে সময়ে তামাকে জল দেওয়াও যে একটা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? বিচারপতি কফিনালের নিকট এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তির বিচার হইতেছিল। সেই সময়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দেশহিতৈষিকর কার্য্যের জন্য তাঁহার মুক্তি ভিক্ষা করিয়া বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র বিচারপতিকে প্রদান করা হয়। তাঁহার পক্ষের উকিল তাঁহার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে ল্যাভোয়াসিয়ে তাঁহার আরব্ধ একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ করিবার সে সকল আবেদনপত্র ঠেলিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন "ফরাসী সাধারণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নাই, ন্যায়বিচার হইলেই যথেষ্ট হইল।" তিনি ন্যায়বিচারে আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাড়াতাড়িতে জুরির মন্তব্য পর্য্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভবিতব্যের এমনই বিড়ম্বনা যে কয়েকমাস পরে যখন এই কফিনাল আবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন তখন তাঁহার নিজকৃত ভ্রম অনুযায়ী জুরির মন্তব্য না লইয়াই তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে এই আটাইশ জন ব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। ল্যাভোয়াসিয়ে তাঁহার শ্বশুরের মস্তক কর্ত্তিত হইতে দেখিলেন। তাঁহারা সকলে এমনই স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত জনসংঘ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনও অপমানসূচক বাক্য অন্তিমকালে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই।

এইরূপে একান্নবৎসর বয়সে আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা ল্যাভোয়াসিয়ে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ইউরোপের বিদ্বৎসমাজ লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রোবেস্পিয়ারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-দেশের জনসাধারণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। পর বৎসর লাভোয়াসিয়ের পুণ্য-স্মৃতির সম্মান করিবার জন্য রাজসরকারের পক্ষ হইতে বিপুল আয়োজন সহকারে তাঁহার

সিয়ের পত্নী তাঁহার মৃত্যুর পর কাউণ্ট রমফর্ড নামক আর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে বিবাহ করেন।

এই প্রবন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। আমাদের দেশেও ল্যাভোয়াসিয়ের মত অনন্যমনে বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবার সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় ভারত সভ্য জগতে অতি নিম্নস্তরে রহিয়াছে। সেই স্তর হইতে ভারতকে উঠাইতে হইলে বিজ্ঞানের উচ্চ উপাধিকারী কতকগুলি যুবককে বিশেষরূপে ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। ল্যাভোয়াসিয়ের মত আইন ব্যবসায় বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের আশা ত্যাগ করিয়া সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া অনন্যমনে বিজ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ল্যাভোয়াসিয়ে কিরূপে নব্যরসায়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বে রসায়ন শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং তাঁহার সমসাময়িক অন্য অন্য রাসায়নিকগণের কার্য্যাবলীর আলোচনা করা আবশ্যক। ইউরোপে গ্রীক ও আরবীয়গণই বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতের অতীত গৌরবের যুগে হিন্দু আচার্য্যগণ যে সকল বিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় সভ্যজগৎ ক্রমে ক্রমে পাইতেছেন। এবিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এখনও অনেক পড়িয়া রহিয়াছে। এই অনুসন্ধানের গুরুভার এতদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর ন্যস্ত ছিল, সেই ভার ক্রমে আমাদিগের নিজেদের স্কন্ধে আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফল ভাল বই মন্দ হইতেছে না, কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে যতই ব্যুৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি, স্বাভাবিক গ্রীকপ্রীতি এবং ভারতবর্ষের ভাষা ও আচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রায়ই ব্যাহত হইতেছে দেখা যায়। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে ল্যাভোয়াসিয়ের প্রতিষ্ঠিত নব্যরসায়নের জন্মের পূর্ব্বে এক প্রাচীনতম রসায়ন যেমন ইউরোপ ও মিসরদেশে বর্ত্তমান ছিল সেইরূপ ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্রেও উহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালক্রমে বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলশালী হইয়া উত্তরকালে শুকাইয়া গিয়াছিল। এমন কি, অনেক বিষয়ে ভারতের রসায়ন জ্ঞান তাৎকালিক গ্রীক ও আরবীয় রসায়নজ্ঞান অপেক্ষা উন্নতিশালী ছিল। ভারতের নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি ইউরোপের পারাসেল্‌সসের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই প্রাচীন রসায়নের উন্নতি দুইটি প্রধান বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া সাধিত হইয়াছিল—একটি, চিকিৎসার জন্য ঔষধ সংগ্রহ কার্য্য; অপরটি কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা। ভারতে ও ইউরোপে উভয় স্থানেই এইরূপে রসায়ন শাস্ত্রের পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল—তবে ভারতে চিকিৎসাই রসায়ন শাস্ত্রের মুখ্য অবলম্বন ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের উন্নতি কল্পে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ না হইয়াছিল ততদিন উহার উন্নতি দ্রুত হইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট বয়েল সর্ব্বপ্রথমে রসায়ন

শাস্ত্রকে কৃত্রিম স্বর্ণপ্রস্তুতকারীদিগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় রসায়ন শাস্ত্র রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি কল্পে অধীত ও আলোচিত হইতে থাকে। স্বাধীন চিন্তায় উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহার ফলে মৌলিক গবেষণায় উহার কলেবর দিনদিন পুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে প্রাচীন রসায়ন হইতে নব্যরসায়নের জন্মের সম্ভাবনা সূচিত হয়।

প্রাচীন রসায়নের দ্বিতীয় ত্রুটি ছিল যে উহা পরিমাণাত্মক (quantitative) শাস্ত্র ছিল না। এই দ্রব্যের সহিত এই এই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে অমুক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কত পরিমাণ অপরাপর দ্রব্যের কত অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া কত ওজনের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ণিত হইত না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলাদণ্ডের প্রচলন প্রাচীন রসায়নে বড় একটা ছিল না। ল্যাভোয়াসিয়ে যে এক নব্যতর রসায়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার প্রধান রহস্য হইতেছে যে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পদে পদে তুলাদণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহা কেবল বস্তুগত শাস্ত্র ছিল তাহা পরিমাণাত্মক হইয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

(প্রোফেসর) শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

নব বসন্ত

কার মহা অভিশাপে হে মধু তোমায়
কালের সাগর গর্ভে হিমাংশুর ন্যায়
লুকাইতে হ'য়েছিল আপনার কায়া?
আজি একি হেরি! কোন সঞ্জীবনী মায়া
জরা জীর্ণ ধরণীরে প্রদানে যৌবন!
পুনঃ অভিনীত সেই আদিম মন্থন
সুনীল আকাশ সিন্ধু রঙ্গভূমি মাঝে!
দিগন্তের প্রান্ত হ'তে ফাল্গুনের সাঁঝে
উঠিতেছ ধীরে আজি, ললাট মণ্ডন
সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র, রঞ্জিত বসন
কোমল রক্তিম মেঘ, গন্ধে পুলকিত,
ঝঙ্কারে, গুঞ্জনে, গানে, দিক্ মুখরিত!
অমৃত আধার হস্তে উঠ ধন্বন্তরী
বাঁচাও ধরারে আজ ও সুধা বিতরি!

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

পরিণতি

জীবনটি ত নয়কো শুধু
ফুলের মত ফোটা,
ফলের সঙ্গে নিত্য তাহার
যুক্ত থাকে বোঁটা।
গন্ধে তাহার ভুবন ভরে
মুগ্ধ করে প্রাণ,
রসে জীবন সিক্ত করে
তৃপ্তি করে দান।
গন্ধ রসের সমাবেশে
ভুবন ভরা রয়,
কে জানে এই ফুলের ফলের
গোপন পরিচয়।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

দিনান্ত

আমি চেয়ে দেখি মনের মধ্যে
অনেক দূরে !
আমার ঘোরাফেরা গেল ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে
কনকচাঁপা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে কোন্ বিজন পুরে—
মনের মধ্যে, অনেক দূরে !

দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন্ নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে
উদাস ধ্বনি ভেসে আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানো
তান তুলেছে কোন্ নূপুরে,—
মনের মাঝে অনেক দূরে !

নিথর জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,—
পারাপারের সময় গেল
খেয়া তরী যায় না দেখা।
পশ্চিমেতে সৌধ-ছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা মানুষ বাজায় বাঁশি
বেদনভরা বেহাগ সুরে—
মনের মাঝে অনেক দূরে।

সারাটা দিন দিনের কাজে
হয়নি কিছুই দেখাশোনা।
কেবল মাথার বোঝা বহে'
হাটের বাটে আনাগোনা।
এখন আমায় দিল আনি
কাজ ছাড়ানো চিঠিখানি ;
সন্ধ্যাদীপের আলোয় বসে
ওগো কাহার নয়ন ঝুরে—
মনের মাঝে অনেক দূরে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টাকার থলি

(গল্প)

শ্রীকণ্ঠ বয়সকালে ভারি আমুদে লোক ছিল। যাত্রা, কবি পাঁচালির গন্ধ পাইলেই সে রৌদ্র বৃষ্টি দূর দুর্গমতা মানিত না। আর মানুষের সঙ্গ তাহার অহোরাত্রিই দরকার। রাস্তার ধারে বড় পাকুড় গাছের তলায় তাহার তাস খেলার এক আড্ডা ছিল। সেখানে বসিয়া বহুদিনের করস্পর্শ-চিহ্নিত অত্যন্ত মলিন তাস লইয়া সময়ে অসময়ে তাহাদের খেলা চলিত।

যতদিন বাপখুড়া ছিল ততদিন এই ভাবে এক রকম করিয়া কাটিয়াছিল। তাঁহারা বাহির হইতে শ্রীকণ্ঠকে যতই শাসন করুন

জঠরদহনের আন্তরিক শাসনটা তখনো সুরু হয় নাই। হঠাৎ গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রবল হইয়া একবার যখন বয়স্কের দলকে প্রায় নিঃশেষ করিল এবং অল্পবয়স্কদের প্লীহাযকৃতের উন্নতি সাধন করিয়া দিল তখনই শ্রীকণ্ঠের ভাবনার দিন উপস্থিত হইল। কারণ প্লীহা যকৃতে পেট ভরিয়াও পেট ভরে না।

তাহাকে এবার তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ে মন দিতে হইল। উহারা জাতিতে মালাকর। প্রতিমার সাজ, বরের টোপর, এবং নানা প্রকার সোলার ফুল, পুতুল ইত্যাদি গড়িয়া এতকাল তাহাদের কষ্টে দিন চলিয়াছে এখনো সেই পন্থা ছাড়া তাহার আর উপায় ছিল না।

কিন্তু আর কাজ ফাঁকি দিলে চলে না। তাহার তাসের সভার সভাপতির পদ অন্য অকর্ম্মণ্য আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল, এবং যাত্রা পাঁচালির আসরে তাহার গতিবিধি এত বিরল হইয়া আসিল যে পূর্ব্বতন লক্ষ্মীছাড়া দলের শ্রদ্ধা সে একেবারেই হারাইল।

শ্রীকণ্ঠ যখন কাজে ভিড়িয়াছিল তখন পেটের দায় ছাড়া তাহার আর কোনো তাগিদ ছিল না; কিন্তু কাজ করিতে করিতে ক্রমশই সঞ্চয়ের নেশা তাহাকে এমনি পাইয়া বসিল যে শ্রীকণ্ঠ পাকা বিষয়ী হইয়া উঠিতে লাগিল। কস্মিন্ কালে সে জমাখরচের কোনো হিসাবই রাখিত না, কিন্তু এখন জমা কিম্বা খরচের কোনো দিকে অঙ্কপাতের সম্ভাবনা হইলে সে রীতিমত বিবেচনা করিয়া কাজ করে;—এবং জমার দিকের অঙ্কটা যাহাতে ক্রমেই পুষ্ট হয় সে দিকে খর দৃষ্টি রাখে।

সমস্ত দিন কাজের মধ্যে বসিয়া শ্রীকণ্ঠের মনটা যে উড়ু উড়ু করিত না তাহা নহে;—তাহার কেবলই মনে হইত যে এখনই ছুটিয়া গিয়া সে তাসের আড্ডা জমাইয়া বসে। কিন্তু সেই দুর্দ্দমনীয় চঞ্চলতাকে সে প্রাণপণ আয়াসে দাবিয়া রাখিত। সে মনকে বুঝাইত—বেশি দিন নয়; এমনি করিয়া কিছুদিন কষিয়া হাত চালাইলে তাহার সকল ক্ষোভ মিটিতে পারিবে। পেটে ক্ষুধা লইয়া তো আমোদ করা চলে না;—যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাকে আর পেটের ভাবনা ভাবিতে না হয় এখন হইতে সেই বন্দোবস্ত করা চাই। কাজ ফাঁকি দিলে তো তাহা হইবে না, অতএব কেবল কাজ করাই এখন তাহার কর্ত্তব্য। এখন যেমন চলিতেছে এমনি করিয়া কিছু কিছু জমাইয়া বিঘাকতক জমী এবং একটা পুকুর কিনিয়া লইতে পারিলেই ব্যস! সে আর কিছু চাহে না। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া দিব্য আরামে তাস পাশা যাত্রা পাঁচালি যাহা খুসি তাহা লইয়াই সে আমোদে থাকিবে! সেই জন্য এখন যদি কেহ তাহার ঘরে গল্পগুজব করিতে আসে সে তাহাকে হাঁকাইয়া দেয়। সকলে অবাক হইয়া ভাবে সেই শ্রীকণ্ঠের এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল!

কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও একটি লোককে সে কিছুতেই তাড়াইতে পারিত না;—সে কৈলাস। পনেরো বছরের ছেলে;—শ্রীকণ্ঠের কাছে সে গান শিখিত। শ্রীকণ্ঠ যখন সোলার ফুল কাটিতে ব্যস্ত আছে এমন সময়েও কাছে আসিলে শ্রীকণ্ঠ হাতের কাজ ফেলিয়া তাহার সহিত দুটো কথা না কহিয়া থাকিতে পারিত না। কৈলাসের মুখের উপর কেমন-একটা ভাব মাখানো ছিল যাহার জন্য তাহাকে অবহেলা করা শ্রীকণ্ঠের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিত।

কৈলাস কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া যখন-তখন সময়ে-অসময়ে শ্রীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া হাজির হইত। শ্রীকণ্ঠ প্রথম প্রথম কিছু বলিত না। কিন্তু শেষে যখন দেখিল তাহাতে কাজ পূরা না হইয়া আধা হইতেছে তখন সে একদিন স্পষ্টই বলিয়া দিল যে কৈলাস যেন যখন-তখন তাহার কাছে না আসে। কৈলাস সে দিন মুখ মলিন করিয়া উঠিয়া গেল। শ্রীকণ্ঠের মনে হইতে লাগিল আহা বেচারাকে ডাকিয়া আনি;—কিন্তু সে ইচ্ছা সে রোধ করিয়া রহিল। কৈলাসকে তাড়াইয়া শ্রীকণ্ঠ যে সেদিন পূরা কাজ করিতে পারিয়াছিল এমন নহে।

পরদিন সকালে দেখা গেল কৈলাস ঘরে না উঠিয়া বিষণ্ণ মুখে দাওয়ার নীচে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। শ্রীকণ্ঠ তখন তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া কাছে বসাইল; এবং গানের সুরগুলা তাহার ঠিক মনে আছে কি, না তাহা হঠাৎ পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেল। কৈলাস গান ধরিল। এমনি করিয়া সেদিন সমস্ত সকালটা শ্রীকণ্ঠের মাটি হইয়া গেল।

ইহার পর অনেকবার এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যে শ্রীকণ্ঠ কৈলাসকে মারিয়া ঘর হইতে তাড়াইয়াছে কিন্তু কৈলাস পরক্ষণেই সেই দাওয়ার নীচে চুপ করিয়া মলিন মুখে আসিয়া বসিয়াছে। শেষে হার মানিয়া শ্রীকণ্ঠ কৈলাসকে আর কিছু বলিত না। কৈলাসের জন্য দিনের বেলায় তাহার যে ক্ষতি হইত রাত্রি জাগিয়া সে তাহা পোষাইয়া লইত। এমনও দেখা গিয়াছে এক একদিন পিতা-মাতার কাছে লাঞ্ছিত হইয়া কৈলাস যখন অনাহার-মলিন শুষ্ক মুখে শ্রীকণ্ঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শ্রীকণ্ঠ নিজের বাড়া ভাত কৈলাসকে ধরিয়া দিয়াছে।

শ্রীকণ্ঠ যাহা রোজগার করিত তাহা বড় বেশি নয়। কাজেই দুবেলা দুমুঠা আহার চালাইয়া কিছু উদ্বৃত্ত রাখা বড়ই শক্ত হইত। কিন্তু তবুও সে ছাড়িল না; অনশন, অর্দ্ধাশন প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করিয়া অসাধ্য সাধনে নিযুক্ত হইল। এতটা দুঃখ সে যে সহ্য করিতে পারিত সে কেবল ভবিষ্যতের প্রলোভন তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া। সে মনকে বুঝাইত—এ দুঃখ তো বেশি দিন নয়—এই দুঃখের বিনিময়ে তাহার অনন্ত সুখ!

গ্রামের ধারে যত সব ফসলের জমী আছে তাহার মধ্য হইতে একখণ্ড জমী সে মনে মনে পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যে পুকুরটি ভবিষ্যতে তাহারই দখলে আসিবে সে পুকুরটির কিরূপ উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহাও সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। যাহাদের জমীজমা আছে এমন লোকের সহিত দেখা হইলে শ্রীকণ্ঠ পাঁচ সাত কথার মধ্যে জমীর দর কিরূপ তাহা ধাঁ করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইত;—এবং মনে মনে নিজের সঞ্চিত টাকার অঙ্কটা কতদিনে সেইখানে পৌঁছিতে পারে তাহাও হিসাব করিয়া দেখিত। হিসাব করিতে গিয়া সে যে আশান্বিত হইতে পারিত তাহা নহে। যখন দেখিত প্রয়োজনের তুলনায় তাহার সঞ্চয় অতি সামান্য তখন তাহার বুকটা দমিয়া যাইত। এক একবার মনে হইত না জানি

কত যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহাকে এমনি দুঃখ সহিয়া তিলে তিলে সঞ্চয় করিতে হইবে। কতদিনে সে যে এই সঞ্চয়-সমুদ্রের কূলে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহা কে জানে! মনটা তখন বলিয়া উঠিত—দূর হউক ছাই, এ পাপে কাজ নাই! কিন্তু চোখের সামনে আবার যখন সেই ভাবনাবিহীন আরামপূর্ণ স্বচ্ছল দিনের ছবি ফুটিয়া উঠিত তখন সে বুকের মধ্যে বল পাইত। তখন সে মনে মনে উৎসাহের সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে বসিয়া যাইত।—যে জমীটি তাহার হইবে তাহাতে সে কি কি ফসল ফলাইবে—সে ফসল কোথায় সঞ্চিত রাখিবে, উঠানের মধ্যে কোন্ জায়গাটায় মরাই বাঁধিলে ভালো দেখায়; পুকুরে কোন্ কোন্ মাছ ফেলা চাই এবং কোন্ সময় কি প্রয়োজনে সে মাছ উঠাইতে হইবে—এই সব কথা ভালো করিয়া সে ভাবিয়া দেখিত। সে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিতে পাইত—বেশ একখানি তকতকে ঝরঝরে ঘর, সামনে উঠানে ধানে ভরা মরাই—সোনার পাহাড়ের মতো গড়ন; বাড়ির পাশে পুকুর, বাগান! কোনো ভাবনা নাই—সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার উপকরণ হাতের কাছে পড়িয়া আছে; সংসারটি দিব্য আরাম, স্বচ্ছন্দতা ও স্বচ্ছলতায় ভরিয়া আছে। এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আর একটি দৃশ্য তাহার চোখের সামনে দিয়া চকিতের মতো খেলিয়া যাইত—একটি কর্ম্ম-চঞ্চল অবগুণ্ঠনবতী বধূর ঘুরিয়া ফিরিয়া আসা যাওয়া! কিন্তু থাক্ সে কথা এখন!

প্রতিদিন রক্তবিন্দুর বিনিময়ে কড়ির পর কড়ি জমাইয়া সেগুলিকে পয়সা আনা সিকি, তার পর টাকায় রূপান্তরিত করিয়া একটির পর একটি করিয়া যখন গুটিকয়েকমাত্র টাকা জমিয়া উঠিল তখন শ্রীকণ্ঠের আর এক বিপদ উপস্থিত। এত কষ্টের ধনকে সে রাখে কোথায়? ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে সে থাকে—যে কেহ আসিয়া তাহার মাথায় লাঠি মারিয়া টাকাগুলি অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। পাছে কেহ তাহার টাকার সন্ধান পায় এই ভয়ে সেগুলিকে সে অতি গোপনে রাখিতে লাগিল;—এমন সতর্ক হইয়া রহিল যে তাহার ঘরের মধ্য হইতে যেন একটু ঠুং শব্দ না উঠে। একদিন হাট হইতে সে ভালো দেখিয়া কিছু কাপড় ও সূতা কিনিয়া আনিল এবং তাহা লইয়া অতি যত্নে ধরিয়া ধরিয়া নানা কারুকার্য্য করিয়া একটি লম্বা থলি প্রস্তুত করিল। তাহার মধ্যে টাকাগুলি একটির পর একটি রাখিয়া মাঝে এমন করিয়া সেলাই দিল যে উপর হইতে কিছুতেই যেন বোঝা না যায় যে ভিতরে টাকা আছে;—এবং সেলাইয়ের সূতাগুলি এমনি সুন্দর করিয়া আঁকাইয়া বাঁকাইয়া বসাইল যাহাতে থলির শোভা বাড়িয়া গেল। এমনি করিয়া যতই টাকা জমে থলির শোভা ভিতরে বাহিরে ততই বাড়িতে থাকে।

থলি প্রস্তুত করিয়াই যে শ্রীকণ্ঠ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল তাহা নহে। থলিটিও তো চুরি যাইতে পারে। সেই জন্য থলিটির উপর তাহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত। কোনো স্থানই তাহার নিরাপদ মনে হইত না। প্রথম কয়েকদিন কাপড়ের সঙ্গে কোমরে ভালো করিয়া গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। শেষে ভয় হইল লোকচক্ষুর সম্মুখে ফস্ করিয়া পড়িয়া যাইতে পারে। তখন শিকার উপর তুলিল। কিন্তু না, সে

জায়গাও যে তেমন নিরাপদ বোধ হইতেছে না। এমনি করিয়া প্রায় প্রতিদিন স্থান বদলাইয়া রাখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না।

শ্রীকণ্ঠ দাওয়ায় বসিয়া কাজ করে থাকিয়া থাকিয়া উঠিয়া যায়; ঘরের ভিতর গিয়া দেখিয়া আসে থলিটি যথাস্থানে আছে কি না। কৈলাসের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ তাহাকে বলিয়া বসে একবার তুমি ঘর হইতে সর। কৈলাস চলিয়া গেলে সে সত্যই গিয়াছে কি না আগে ভালো করিয়া দেখিয়া তবে থলিটির সন্ধান লয়।

শ্রীকণ্ঠ বাড়ি হইতে লোক হাঁকাইয়া দিয়াছিল কিন্তু কৈলাস একটি একটি করিয়া লোক ডাকিয়া অল্পে অল্পে শ্রীকণ্ঠের দাওয়ায় আবার মজলিস জমাইয়া তুলিতেছিল। কৈলাসের সঙ্গে পারিয়া উঠা শক্ত। তাহাকে মারিলে ধরিলে বকিলে সে গায়ে মাখেনা—কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, বেশি বেদনা পাইলে ফোঁপাইয়া কাঁদে, কোনো কথা কহেনা। দাওয়ায় লোক ডাকিয়া আনার জন্য কৈলাস শ্রীকণ্ঠের নিকট হইতে গোপনে একদিন মার খাইল, কাঁদিল কিন্তু আবার পরদিন সেই সব লোক লইয়া হাজির। তবে শ্রীকণ্ঠ কি করে? কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে মজলিসে বসিতে হইত; কিন্তু মন পড়িয়া থাকিত সেই থলিটির উপরে। গান যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে তখন মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত শ্রীকণ্ঠ ফস্ করিয়া ঘরের মধ্য হইতে একবার ঘুরিয়া আসিল। আসরের মাঝখানে সে কিছুতেই বসিতনা—ঠিক দরজার সামনে চৌকাট ঘেঁসিয়া বসিত। বন্ধুরা ডাকাডাকি করিলে উদাস ভাবে বলিত—"আমি এইখানে বেশ আছি, তোমরা গাওন কর আমি দূর থেকেই শুনি।"

শ্রীকণ্ঠের এখন কেবলই সন্দেহ। কেহ যদি তাহার দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতে আসে অমনি তাহার মন বলিয়া উঠে—সাবধান! কেহ যদি দুইটা সুখদুঃখের কথা কহিতে আসে তাহার মনে হয় সেটা অছিলামাত্র—আসলে সে টাকার সন্ধান লইতে আসিয়াছে। এমনি করিয়া চারিদিকেই সে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। এমন কি কেহ তাহাকে কাজের বায়না দিতে আসিলে জুয়াচোর আসিয়াছে মনে করিয়া সময়ে সময়ে সে তাহাকে হাঁকাইয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলার গানের মজলিসটা ভাঙিয়া দিবার কথা শ্রীকণ্ঠের প্রায়ই মনে হইত। এত লোক-সমাগম ভালো নয়—কি জানি কাহার মনে কি আছে! কিন্তু সে কাজটা সে চট্ করিয়া করিতে পারিল না। একে কৈলাস আছে তাহার উপর মজলিসের দিকে তাহার ভিতর হইতে একটা প্রবল আকর্ষণও ছিল। সন্ধ্যাবেলা যখন সে মজলিসে বসিত তখন যে সে সময়ে সময়ে বিভোর হইয়া পড়িত না এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই বিভোর হইয়া পড়াটাকে একদিকে যেমন তাহার ভালো লাগিত আবার অন্য দিকে সেটা ভয়েরই কারণ হইয়া উঠিয়াছিল;—কারণ এই অন্যমনস্ক অবস্থায় তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে যে! এই ভাবিয়া তাহার মন আকুল হইয়া উঠিত—এবং মানুষ মাত্রকেই তাহার এমন একটা ভয় হইত যে মানুষের মূর্ত্তি মনের মধ্যে আনিতে সে সাহস করিত না। এই জন্য কোন্ ছুতা করিয়া সে মজলিস ভাঙিবে তাহাই ভাবিতে

লাগিল। একদিন সে বলিল "ভাই সব, আমার শরীর ভালো নেই; রোজ সন্ধ্যার সময় জর আসে, তোমরা যদি গানবাজনা বন্ধ কর তো ভালো হয়।" গানবাজনা বন্ধ হইল কিন্তু লোকসমাগম কমিল না। সবাই খোঁজ লইতে আসে শ্রীকণ্ঠ কেমন আছে। সকালে, সন্ধ্যায় দুপুরে লোকের অন্ত নাই। শ্রীকণ্ঠ দেখিল বিপদ! আগে বরং একই সময়ে লোক আসিত এখন অহোরাত্রই আসে! কাজেই তাহাকে শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইল। জ্বরের ভাণ করিয়া সন্ধ্যাবেলা যে কয়েকদিন সে পড়িয়াছিল সে কয়েকদিনের গীতবাদ্যহীন নীরব মুহূর্ত্তগুলা তাহার মনকে কেমন উদাস করিয়া তুলিয়াছিল। সে জোর করিয়া মনকে বারম্বার বলিয়াছে যে সে লোকজন গানবাজানা এসব কিছুই চাহেনা কিন্তু তবুও মনের কোণ্ হইতে কুয়াশার মতো একটা বিষণ্ণতা উঠিয়া তাহার চারিদিকটা আঁধার করিয়া তুলিয়াছিল। কাজে সে তেমন উৎসাহের সহিত মন দিতে পারে নাই; —কৈলাসের অমন স্নেহের করস্পর্শ, অমন যত্নের সেবা পাইয়াও তাহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। তার পর যে দিন সে সুস্থ হইয়াছে শুনিয়া গায়কের দল আবার তাহার দাওয়ায় মজলিস জমাইয়া বসিল সে দিন সে ভীত হইয়া পড়িলেও চারি পাশের বিষণ্ণতাটা যে কাটিয়া গেছে তাহা সে বেশ উপলব্ধি করিয়াছিল।

আমোদ তো সে ঢের করিয়াছে এখন না হয় বিরাম দিক। এত দুঃখের যে ধন—যাহার আবরণের উপর নিজের বুকের শিরা দিয়া সে যেটি বাঁধিয়াছে হৃদয়ের মমতার আচ্ছাদন দিয়া যাহাকে জড়াইয়াছে সেই ধন তো হেলাফেলায় হারানো যায় না। কাজেই তাহাকে একদিন কঠোর হস্তে মজলিস ভাঙিতে হইল। সকলের মুখের উপর এমন কথা সে শুনাইয়া দিল যে তাহার মুখদর্শন করিবার প্রবৃত্তি আর কাহারো রহিল না। কৈলাস বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আর লোক জড়ো করিতে পারিল না—এবার তাহাকে হার মানিতে হইল!

শ্রীকণ্ঠ এখন নিশ্চিন্ত। তাহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত জঞ্জাল যেন দূর হইয়া গেছে। বহুদিন সে টাকার থলিটি লোকচক্ষুর ভয়ে ভালো করিয়া দেখিতে পারে নাই। এখন সেটিকে সে হাতে তুলিয়া বুকে তুলিয়া মাথায় তুলিয়া—সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একেলা দাওয়ায় বসিয়া মৌতাত অভাবে আফিং খোরের মতো যখন কেবলই হাই উঠে এবং মনটা ফস্ ফস্ করে তখন সে ছুটিয়া গিয়া টাকার থলিটি কোলে করিয়া বসে—সেটাকে নাড়ে চাড়ে, তাহার গায়ে সন্তর্পণে হাত বুলাইতে থাকে!

এমনি করিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীকণ্ঠ টাকার থলি লইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে কৈলাস আসিয়া বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। শ্রীকণ্ঠ তাড়াতাড়ি থলিটি লুকাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু কৈলাস যখন ঘরের মধ্যে আসিয়া শ্রীকণ্ঠের পাশে চুপ করিয়া বসিল তখন শ্রীকণ্ঠ তাহাকে লইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। কৈলাস কোনো কথা না বলিয়া শ্রীকণ্ঠের জন্য তামাক সাজিতে বসিয়া গেল কলিকায় ফুঁ দিয়া হুঁকাটা তাহার হাতে

তুলিয়া দিয়া শ্রীকণ্ঠের কোলের কাছে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। কৈলাস প্রায়ই এইরূপ করিত—শ্রীকণ্ঠের নিকট হইতে সে কোনো হুকুমের আবশ্যক মনে করিত না;—শ্রীকণ্ঠের যাহা প্রয়োজন বলিয়া তাহার মনে হইত সে আপনা হইতেই তাহা সাধন করিতে লাগিয়া যাইত। ইহাতে শ্রীকণ্ঠ দিন দিন যেন কৈলাসের নিকট বাঁধা পড়িয়া যাইতেছিল। এমনি করিয়া অযাচিত সেবায় শ্রীকণ্ঠের হৃদয় কৈলাসের প্রতি আপনা হইতে স্নেহ-ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সে যে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে ভালোবাসিত তাহা নহে; ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। আজ হুঁকা গ্রহণ করিতে যাইয়া শ্রীকণ্ঠ স্থির থাকিতে পারিল না—তাহার সমস্ত হৃদয়টা চঞ্চল হইয়া উঠিল—একটা সরল প্রীতিপ্রকাশের ব্যস্ততা সমস্ত শরীরের মধ্যে খেলিতে লাগিল। শ্রীকণ্ঠ আর কিছু করিতে না পারিয়া কৈলাসের গায়ে মুখে প্রগাঢ় স্নেহের সহিত হাত বুলাইতে লাগিল—কৈলাস চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে শ্রীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল—"দেখ্ কৈলেশ, তোকে একটা জিনিস দেখাব।" কৈলাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—সোৎসুক দৃষ্টিতে শ্রীকণ্ঠের পানে চাহিয়া রহিল। শ্রীকণ্ঠ প্রায়ই কৈলাসকে নিজের হাতে গড়া জিনিস দেখাইত। কৈলাস সেই সমস্ত কারুকার্য্য দেখিয়া ভারি তারিফ্ করিত;—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কত রকম করিয়া যে দেখিত এবং কতবার যে প্রশংসা করিত তাহার ঠিক নাই।

আজ শ্রীকণ্ঠ সোলার ফুল বাহির না করিয়া টাকার থলিটি অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে কম্পিত হস্তে কৈলাসের সম্মুখে ধরিল। কৈলাস একেবারে অবাক হইয়া গেল। লাল নীল সবুজ হলুদ নানা রকমের লতা, পাতা, ফুল চোখের সম্মুখে ঝক ঝক করিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারের উপর থলিটির বিচিত্রতা রঙিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কৈলাস বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তার পর শ্রীকণ্ঠ যখন থলিটি সরাইয়া লইল তখন কৈলাস সেই শূন্য স্থান হইতে অনেকক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিল না। কৈলাস আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মিনতির স্বরে বলিয়া উঠিল—"শ্রীকণ্ঠ দা, আর একবার দেখাও না।" শ্রীকণ্ঠ 'না না' করিয়া হাঁকিয়া উঠিল। কৈলাস মুখ মলিন করিয়া বসিল। শ্রীকণ্ঠ কিছুক্ষণ কৈলাসের মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল তাহার পর আবার ধীরে ধীরে থলিটি বাহির করিল—কৈলাস এবার আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া থলিটি হাতে করিয়া ধরিয়া দেখিতে গেল; শ্রীকণ্ঠ কৈলাসের পানে ভ্রূকুটি করিয়া তাড়াতাড়ি থলি সরাইয়া লইল।

সম্পূর্ণ গোপনতার আবরণ যখন একবার সরিয়া গেল তখন কৈলাসকে মধ্যে মধ্যে থলিটি দেখানো শ্রীকণ্ঠের পক্ষে সহজ হইয়া আসিল। বারম্বার দেখিয়াও কৈলাসের সাধ কিছুতেই মিটিতেছিল না;—থলিটি যেন তাহাকে মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়াছিল। কাকুতি মিনতি করিয়া কৈলাস বারবার সেটি হাতে করিয়া দেখিতে চায় কিন্তু

শ্রীকণ্ঠ কিছুতেই তাহাকে স্পর্শ করিতে দেয় না।

শ্রীকণ্ঠ হাটে সোলার জিনিস বিক্রয় করিতে যাইত। টাকার থলি অরক্ষিত অবস্থায় ঘরে ফেলিয়া রাখা যায় না কাজেই সেটিকে সঙ্গে লইতে হইত। তাহার জন্য যতরকম সাবধানতা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার কোনো ত্রুটি সে করিত না। পথে যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে মাথার বোঝা নামাইয়া সে দেখিত থলিটি যথাস্থানে আছে কি না। তাহার দোকানের সামনে খরিদ্দাররা যখন ভিড় করিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার বুক শুকাইয়া যাইত;—দুইটি মাত্র চোখ কত দিকেই বা নজর রাখা যায়! কোন্ দিক হইতে কে কখন জিনিস দেখিবার অছিলায় থলিটি ফস্ করিয়া টানিয়া লয় এই ভয়ে বেচারা ভালো করিয়া বেচাকেনায় মন দিতে পারিত না। যতদূর সাধ্য সে কেবল চারিদিকে নজর রাখিত। খরিদ্দার জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সময় কোনো জবাব পাইত না। বেশি ভিড় দেখিলে সে খরিদ্দার হাঁকাইয়া দিত, বলিত—"যাও জিনিস বেচিব না।"

কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। একদিন থলিটি এত পাহারার ভিতর হইতেও কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে অন্তর্দ্ধান করিল তাহা শ্রীকণ্ঠ বিস্তর ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না। প্রায় প্রতিদিন স্থান বদলাইয়া রাখিত বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল বোধ হয় ঘরের মধ্যে এমন কোন গোপন স্থানে সেটাকে সে রাখিয়াছে যেখানটা তাহার ঠিক মনে পড়িতেছে না। সে তখন সমস্ত ঘর উলট পালট করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল কিন্তু কোনো সন্ধান মিলিল না। তবে বোধ হয় পথে পড়িয়া গেছে। বাড়ী হইতে হাট পর্য্যন্ত যে পথ সেই পথ ক্রমান্বয়ে সে খুঁজিতে লাগিল। একবার যায় একবার আসে এমনি করিয়া বারম্বার যাতায়াতে যখন একেবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল তখন সেদিনকার মতো ক্ষান্ত হইল বটে কিন্তু খোঁজা শেষ হইল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় বটতলার কাছে সে একবার বসিয়াছিল, অমনি ছুটিয়া যায় সেই বটতলায়—মনে করে থলিটা নিশ্চয় সেইখানে কোথাও কোনো ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছে। সেখানে না পাইয়া ছোটে তাল-পুকুরের ধারে; তালপুকুর হইতে পঞ্চাননতলা, পঞ্চাননতলা হইতে বামুনপাড়া এমনি করিয়া সমস্ত গ্রামটা সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ঘরে সে একদণ্ড থাকিতে পারে না—কৈলাস আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায়।

যতদিন খোঁজার উৎসাহ ছিল ততদিন একটা আশাও ছিল। সেইজন্য টাকার শোকটা প্রথম ধাক্কায় তেমন করিয়া লাগিতে পারে নাই। পরে যে খুব লাগিল তাহাও বলা যায় না। কারণ একথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারে না, যে সেই থলিটা যাহাকে সে প্রাণের চেয়ে অধিক যত্নে সমস্ত দেহ দিয়া আগলাইয়া আসিয়াছে তাহা এককথায় ফস্ করিয়া হারাইয়া যাইবে। ইহাও কি কখনো হয়? সে যে তাহার পরম আত্মীয়ের মতো—বলিলেই হইল পর হইয়া গেছে। যতই দিন যাইতে লাগিল এবং যতই টাকা ফিরিয়া পাইবার আশা কম হইতে লাগিল ততই টাকার উপর

শ্রীকণ্ঠের একটা অভিমান বাড়িতে লাগিল। যাহাদের সে বুকের রক্ত দিয়া যত্ন করিয়া আসিয়াছে একমুহূর্ত্তে তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। টাকার থলিকে সে ঠিক নির্জীব থলির মতো তো দেখিত না। বাৎসল্যে স্নেহে মণ্ডিত করিয়া তাহাকে সে সজীব সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল। সেটা এমন একটা কিছু হইয়া উঠিয়াছিল যাহাকে ভালোবাসা যায়—যাহার উপর অভিমান করা চলে। কৈলাসের কাছে শ্রীকণ্ঠ থলিটার উপর অভিমান করিয়া অনেক কথা বলিত—কৈলাস ইহাতে কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিত না;—কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত।

শ্রীকণ্ঠ টাকাগুলার জন্য অনুতাপ করিয়া কৈলাসকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত—"আচ্ছা, বল দেখি কৈলেস, কি করি? টাকাগুলো না হক্ যাবে!" কৈলাস ইহার কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিত না;—সে চোখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকিত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল গ্রামে পরেশ পরামণিকের বাড়িতে চুরি হওয়ায় থানায় লোক তল্লাস করিতে আসিয়াছে। কৈলাস ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্রীকণ্ঠকে বলিল—"শ্রীকণ্ঠদা তুমি থলির খবর পুলিশে দিয়েছিলে না কি? পুলিশ আসছে!" শ্রীকণ্ঠ বলিল—"না, তাতো দিই নি।" বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। তার পর একসময় সে থলির খবর গোপনে থানায় গিয়া দিয়া আসিল—এ বুদ্ধিটা তাহার এতদিন জোগায় নাই বলিয়া তাহার মনে মনে আপশোষ হইতে লাগিল।

কিছুদিন ধরিয়া শ্রীকণ্ঠ আবার অর্থ সঞ্চয়ে মন দিল। কিন্তু আগেকার মতো তেমন জেদ রাখিতে পারিল না। বিশ্বাসঘাতক টাকাগুলাকে সে বুকের রক্ত দিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিবে তারপর একদিন তাহারা হুট্ করিয়া চলিয়া যাক্—এই কথা মনে হইলে তাহার আর টাকা জমাইবার উৎসাহ থাকে না। সে তো একবার তাহাদের ধাত বুঝিয়া লইয়াছে; তবে আর কেন? আহা! যাহা ছিল তাহা ত আর হইবে না! দিনের পর দিন সে যে কড়ি জমায় আগেকার সঞ্চিত সমস্ত টাকার তুলনায় তাহা কী সামান্য! তেমনি আর একটি থলি কি আর হইবে? দূর হউক! তবে কেন? এই বলিয়া সে যাহা জমাইয়াছিল তাহা দিয়া একদিন মাছ তরকারি কিনিয়া তাহার গায়ক বন্ধুদের কাছে পূর্ব্বকৃত কঠোর ব্যবহারের জন্য হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। শ্রীকণ্ঠ সেদিন ভারি স্ফূর্ত্তিতে ছিল; কেবল সকাল হইতে কৈলাসের দেখা নাই বলিয়া তাহার উপর ক্ষণে ক্ষণে অভিমান হইতেছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গানের মজলিস জমিল ভালো। শ্রীকণ্ঠের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! আজ তাহার মনে কোনো জঞ্জাল নাই—সে আজ প্রাণ খুলিয়া মাতিয়াছে। সে এখান হইতে ওখান পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া শ্রোতাদের মুখের সামনে হাত মুখ নাড়িয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেছে। আজ তাহার বুক হাল্কা, তাই সে প্রাণপণে তান ছাড়িতে পারিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, এতদিন কে যেন তাহাকে কারাগারে বন্ধ রাখিয়াছিল—আজ সে ছাড়া পাইয়া যাহা খুসি তাহাই করিতে পারিতেছে। মুক্তির আনন্দে সে নৃত্য করিতে লাগিল।

গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে—আকাশ, বাতাস কাঁপাইয়া সুরের লহরী চারিদিকে ছুটিয়াছে, শ্রীকণ্ঠ তন্ময়; এমন সময় হঠাৎ গান বাজনা থামিয়া গেল, সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল; থানার এক পাহারাওয়ালা কৈলাসকে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির! সম্মুখে টাকার থলি ধরিয়া শ্রীকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ থলি তোমার?" চোখের সম্মুখে থলি দেখিয়া শ্রীকণ্ঠের সমস্ত হৃদয়টা একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল—তাহার মনে হইল এখনই সেটাকে কাড়িয়া লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে। পাশে কৈলাস; তাহার হাত দুইটি পিছামোড়া করিয়া কঠিন রজ্জু দিয়া বাঁধা,—বন্ধন-বেদনায় কাতর আঁখি দুটি লজ্জায় নত করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত দিনের অনাহারের শুষ্কতা তাহার কোমল মুখের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কৈলাসের সেই শুষ্ক মলিন মুখের পানে চাহিয়া শ্রীকণ্ঠের চোখ দিয়া টন্ টন্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—কৈলাসের আজ এ কী নিদারুণ অবস্থা! তাহার সমস্ত অঙ্গ নিষ্ঠুর প্রহারে ও বন্ধন-ব্যথায় জর্জ্জরিত! এ যে চোখে দেখা যায় না। শ্রীকণ্ঠের হৃদয় বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল—কোনো প্রতীকার করিতে না পারিয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যাকুলতায় সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল! এমন সময় আবার পাহারাওয়ালা থলিটি শ্রীকণ্ঠের চোখের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ থলি তোমার?"

—"না, না"—শ্রীকণ্ঠ থলির পানে না চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"না, না ও থলি আমার নয়! ও আমি কৈলেসকে দিয়েছি!" বলিয়া সে ছুটিয়া কৈলাসের বন্ধন খুলিতে গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মহিলা-মজলিস

আজকাল ইংরাজমহিলাগণ অনেকেই বঙ্গরমণীগণের সহিত মিশিতে সমুৎসুক। পরস্পর মেলামেশায় যে মঙ্গল হয়, ইহা তাঁহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজবাঙ্গালীর মিলন-উদ্দেশ্যে মিশ মেরি কার্পেণ্টার ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পুরুষদের যেমন ক্যালকাটা ক্লব—কলিকাতার উক্ত শাখাসমিতি সেইরূপ এখন ইঙ্গবঙ্গরমণীর মিলনস্থল। বড়লাট ছোটলাটের পত্নী হইতে এখানকার অধিকাংশ উচ্চপদস্থ ইংরাজ-গৃহিণী এবং সম্ভ্রান্ত বঙ্গ রমণী, পারসী রমণী, দুই একজন মুসলমান রমণীও এই সমিতির সদস্যা। মর্য্যাদাসম্পন্ন সদস্যাগণ, এমন কি বড়লাট ছোটলাটপত্নীও সময়ে সময়ে নিজগৃহে সমিতির সমস্ত মেম্বরদিগকে আহ্বান করিয়া আদর আপ্যায়িত করেন। এইরূপ নিমন্ত্রণে সর্ব্বস্থলেই পরদার সুবন্দোবস্ত থাকে। একবার লেডি মিণ্টোর এইরূপ একটি পার্টিতে লর্ড মিণ্টোকে বাধ্য হইয়া বাগানে তাম্বুর মধ্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পার্টির সময় লর্ড মিণ্টো বাড়ী ছিলেন না; গভর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—তখনো তাঁহার ভিতরে প্রবেশ নিষেধ; মেয়েরা তখন

গাড়ীতে উঠিতেছেন। তাঁহার আর বাড়ীতে ঢোকা হইল না; বাগানেই রহিয়া গেলেন।

অল্পদিন হইল, আমাদের লোকপ্রিয় চিফজষ্টিস্ জেন্‌কিন্স সাহেবের পত্নী এইরূপ একটি পার্টি দিয়াছিলেন—জাহাজে। গঙ্গার উপর রোডাস নামক জাহাজে জেনানা পার্টি; পরদার কড়াক্কর বন্দোবস্ত; গঙ্গার কিনারায় যেখানে গাড়ী থামে সেইখান হইতে সুরু করিয়া জাহাজ পর্য্যন্ত জেটির দুইদিক কানাতে ঘেরা। কেবল তাহাই নহে, গঙ্গা হইতে অন্য কোন জাহাজ-নৌকার বা এ জাহাজেরই দাঁড়িমাজিখালাসীর দৃষ্টি পাছে রোডাসের অন্দরমহলে পৌঁছে এই বিপদ নিবারণ জন্য তাহার চারিদিকে কাপড়ের পরদা ফেলা। বাঙ্গালী সমাজে অবশ্য এরূপ পরদার চলন কোন কালেই নাই, তবে ইহা নবাবী আদপ কায়দা বটে! জজের মেম জেনানা বলিতে এইরূপ জেনানাই বুঝেন। তাই বহু কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া বিলাতী জাহাজকেও এইরূপ জেনানা করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে যাঁহারা কোন জন্মে পরদার ধার ধারেন না তাঁহারাও আজ অসূর্য্যম্পশ্যা। এক হিসাবে ভালই হইয়াছিল দিনটা সেদিন বেশ একটু গরম ছিল, জাহাজ পরদাঢাকা থাকাতে পড়ন্ত রৌদ্রতাপ কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। রোডাসে উঠিবার নিমন্ত্রণ ছিল,৩টা ১৫ মিনিটের সময়। তবু সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিতাগণ আসিয়া ফেরেন নাই। কিন্তু ইহারও পরে প্রায় চারিটার কাছাকাছি দুইটি ইংরাজমহিলা নদীতীরে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। আমাদের লজ্জা নিবারণ হইল যে তাঁহারা বঙ্গ রমণী নহেন।

নিমন্ত্রিতাগণের মধ্যে লাট সাহেবের পত্নী হইতে বড় বড় ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের মেম, ভুপালের বেগম, হাতুয়ার মহারাণী এবং অন্যান্য



ভুপালের বেগম

রাণী মহারাণী হইতে আমাদের মত নগণ্য লোকেরও অভাব ছিল না। এইরূপ কোন নিমন্ত্রণে ইংরাজ রমণীর আতিথ্য সমাদরে মন মুগ্ধ হইয়া যায়,লেডি জেন্‌কিন্স আবার আতিথ্য কার্য্যে তাঁহাদেরও আদর্শস্থানীয়া। প্রকাণ্ড জাহাজের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত নিমন্ত্রিতা মহিলাগণে পূর্ণ, তিনি বায়ুগতিতে যেন সর্ব্বত্র বিরাজিত হইয়া সকলকেই আদর আপ্যায়িত করিতেছেন। বড়লাটপত্নী হইতে বিধবাশ্রমের দরিদ্র বিধবারমণীটি পর্য্যন্ত তাঁহার সমাদরে পরম পরিতৃপ্ত। কি ক্ষিপ্রগতি! কি অশ্রান্ত

উৎসাহ-উগ্যম! দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়,—যেন অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোটকী। আমরা আজন্মকাল গজেন্দ্রগতিতেই অভ্যস্ত, ইহার জন্যই প্রশংসাপ্রাপ্ত; আমাদের পক্ষে এরূপ দৃশ্য একেবারেই তাজ্জব ব্যাপার!

সেদিন অনেক গুলি পাখোলা বঙ্গযুবতীর সুন্দর নূতন মুখ দেখিলাম, দুই একটি কজ্জলাঙ্কিতাক্ষী মুসলমানরমণীর সহিতও প্রথম পরিচিত হইলাম। ভূপালের বেগম সাহেবের পৌত্রীকে দেখিতে বড়ই সুন্দর! ইংরাজ মেয়েরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, বেগম যে এক সময়ে ঐরূপ সুন্দরী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়, পৌত্রী অনেকটা তাঁহারই অনুরূপ। সম্ভবতঃ একথা সত্য, কিন্তু আমি তাহা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। হাতুয়ার রাজকন্যা কাশীকুমারী সুন্দর বাঙ্গলা বলিতে পারেন; শুনিয়া বড় প্রীত হইলাম।

অনেক মেমই অন্তঃপুরিকাগণের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে কেহ বা শ্রুতিসুখকর উচ্চারণে কথিত অবোধ্য বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

আমরা ইংরাজী কহিবার সময়—পাছে একটা ভুল হইয়া যায় সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠি, একটা ভুল করিয়া ফেলিলে কত লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা যখন আমাদের ভাষায় অজস্র ভুল করেন তখন ত তাহাতে তাঁহাদের লজ্জার কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। বিদেশী ভাষা ভুল হইবারই ত কথা, এই ভুল ভ্রান্তি উপেক্ষা করিয়াও আমাদের সহিত কথা কহিবার তাঁহাদের যে প্রয়াস—ইহাতে মনে মনে তাঁহাদের সুখ্যাতিই করি। ইংরাজউচ্চারিত এই অপূর্ব্ব বাঙ্গালা বুলি শুনিয়া যে আমরা হাসি না তাহা নহে; কিন্তু সে হাসি ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপজনক নহে। সত্য কথা বলিতে হইলে,—বালকের আধ আধ বুলি শুনিতে যেরূপ ভাল লাগে, আমার ত ইংরাজদের মুখে দেশী-বুলি শুনিতে সেইরূপ বেশ একটা প্রীতির উদ্রেক হয়।

অনেক ইংরাজমহিলা আজকাল বুঝিয়াছেন বাঙ্গলা না জানিলে অন্তঃপুরিকাগণের সহিত প্রকৃতভাবে মেলামেশা একরূপ অসম্ভব। কেহ কেহ উৎসাহের প্রথম মাত্রায় শিখিতেও আরম্ভ করেন, অর্থাৎ কিছুদিন পণ্ডিতকে মাহিয়ানা দেন। অবশেষে শিক্ষার কষ্ট শেষ পর্য্যন্ত স্বীকারে অসমর্থ হইয়া শিক্ষা বন্ধ করেন। এসম্বন্ধে কথা উঠিলে প্রায়ই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—

"ওঃ বাঙ্গালা ভাষা কি কঠিন!" আমরা বলি "ইংরেজি ভাষা আরও কঠিন, তবুও ত আমরা শিখি।" ইহার আসল উত্তর, ইংরাজি না শিখিলে আমাদের চলে না; তাঁহাদের পক্ষে যদি বাঙ্গালা শিক্ষা আমাদেরই মত প্রয়োজনীয় হইত তবে এজন্য কোন কষ্ট স্বীকারেই তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না। কিন্তু এরূপ স্পষ্ট উত্তর ভদ্রতার কথোপকথনে চলেনা; তাঁহারা আমাদের বুদ্ধির অপরিমিত প্রশংসা করিয়াই এরূপ স্থলে আমাদিগকে নিরুত্তর করিতে চান।

"তোমরা কি clever! কি করিয়া এমন ইংরাজি শেখো! আমরা এত কষ্ট করিয়াও ত বাঙ্গালা শিখিতে পারি না।" ইত্যাদি

"এত কষ্টের" অর্থ অবশ্য, ক্লাইবের বঙ্গবিজয়ের ন্যায় কিছু কষ্ট না করিয়াই তাঁহারা

বাঙ্গালা ভাষাটাকেও মারিয়া লইতে যান,—আর আমরা ইংরাজী শিক্ষার জন্য আজীবন প্রাণপাত করি। যাহা হউক প্রশংসা সর্ব্বস্থলেই উপভোগ্য, ঝুটা হইলেও খোস খবরের আদর সর্ব্বত্র। তবে এই প্রসঙ্গে সময় সময় যে সকল কৌতুকজনক গল্প জমে, তাহা যে অধিকতর উপভোগ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নিম্নে তাহার একটু নিদর্শন দিলাম।

মিশেষ অ একজন সিভিলিয়ানের মেম, এদেশে আসিয়া, চাকরদিগের সহিত কথা কহিবার সুবিধার জন্য হিন্দুস্থানী শিখিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই মুন্সি মহাশয়ের সার্টিফিকেট লাভে গর্ব্বিত হইয়া ভৃত্যদিগকে বিদ্যার পরিচয় দানের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন মুন্সি পড়াইয়া চলিয়া যাইবার পর নিয়মিত সময়ে ভৃত্য খানার হুকুম লইতে আসিল। মেম সাহেব আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন আজ তাহার সহিত হিন্দুস্থানীতে কথা কহিয়া তাহাকে তাজ্জব করিয়া দিবেন। ভৃত্য প্রতিদিনকার মত ভাঙ্গা ইংরাজীতে তাঁহার হুকুম ভিক্ষা করিবা মাত্র তিনি হিন্দুস্থানীতে বলিলেন,—

"আজ—টু—মাটাকো—হুম—কা—বাব—বানাও—" শুনিয়া সে বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া রহিল,—মেমসাহেব পুনরায় সেই কথাই আওড়াইলেন, তখন হাসিতে তাহার পাঁজরা কাঁপিতে লাগিল, তথাপি কোন রকমে হাস্য সম্বরণ করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। মেমসাহেব ত ভৃত্যের বে-আদপীতে রাগিয়া আগুন।—কিন্তু পরে সাহেবের তদন্তে প্রকাশ পাইল, ভৃত্য তাঁহার কথার অর্থ এই বুঝিয়াছিল—"মাতার ল্যাজের বাপ বানাও।" সেই হইতে মেমসাহেব আর চাকরদের সহিত হিন্দুস্থানীতে কথা কহিবার চেষ্টা করেন নাই।—এই গল্পটী গল্পকর্ত্রী যেমন রসান দিয়া গল্প করেন, আমি তেমন পারিলাম না।

একজন ফ্রেঞ্চ মেম—আমাদের পরিচিত একটি বাঙ্গালী-ব্যারিষ্টারের পত্নী—এইরূপ প্রসঙ্গ উঠিলেই মজা করিয়া বলিতেন—"জাহাজ হইতে এদেশের মাটীতে পা দিয়াই আমি যে দুইটি দেশী কথা শিখিয়াছি—তাহাতেই চাকরদের সঙ্গে কথা কহিবার কাজ আমার বেশ চলে,—আর বেশী কিছু শিখিবার প্রয়োজন দেখি না।"—কথা দুইটি হইতেছে "শূয়ারকি বাচ্ছা" আর "জাহান্নম্ যাও"।

মিশেষ বি—একজন জজের মেম; তিনি একদিন বলিতেছিলেন, তিনি ঠিক দুটি বাঙ্গালা কথা জানেন—"জল আন।"

আমি বলিলাম,—"তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না, অসময়ে এই দুটি কথাই আপনাকে কোনদিন রক্ষা করিতে পারে। আমাদের দেশের একটি লোক বহুপূর্ব্বে তিনটি কথায় কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিল।"

জজের মেম জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে তিনটি কথা কি?"

"Yes, No, very well. সেকালে একজন এই তিনটি কথা শিখিয়া পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্টেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এমন বিদ্যার পরিচয় পাইবামাত্র সাহেব যে তাহাকে তাঁহার সেরেস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। লোকটাকে

অনেকে গুলিখোর বলিয়াই সন্দেহ করিত। একদিন নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, তাহার বহুদিনের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে; স্বয়ং ম্যাজিষ্টেট সাহেবের এজলাসে সে হাজির। এখানে কে আনিল; কেন আসিল, সে কথা জিজ্ঞাসার সে আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। সে বেশ জানে,—ম্যাজিষ্টেট সাহেব তাহার বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্যই চৌকিদার তাহাকে এখানে আনিয়াছে। সে যে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত একথা তাহার মনের ত্রিসীমাতেও আসে নাই। পরীক্ষাপাশের পর চাকরী পাইলে মাহিনাটা লইয়া সে কিরূপ ব্যয় করিবে তাহার কল্পনাতেই সে তখন নিমগ্ন,—এমন সময় ম্যাজিষ্টেট সাহেব ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি চুরি করিয়াছ?"

সে অমনি বুক ঠুকিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল,—"Yes." সে ভাবিল জজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি চাকরী লইবে?

জজ কহিলেন,—"তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

"No"—

"তবে তোমার জেল হোক—"

"Very well."

খুব একটা হাসির উচ্ছ্বাস জমিল—জজের মেম বলিলেন—"দুইটি বাঙ্গালা কথা শিক্ষার ফল আমার পক্ষেও এইরূপ শোচনীয় দাঁড়াইবে নাকি!"

এই সময় লেডি জেনকিন্স আসিয়া চাপানের জন্য আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

নীচের ক্যাবিনে জলযোগের বন্দবস্ত, ইংরাজিবাঙ্গালা নানারূপ মিষ্টান্নের সমাবেশ,—মেমরা স্বয়ং পরিবেষণ করিতেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—কিছুরই অভাব নাই, পানটি পর্য্যন্ত আছে।

তখন ৫টা, জাহাজ তীরাভিমুখে চলিয়াছে; পশ্চিমের বায়ুবিক্ষিপ্ত পরদার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে সূর্য্যকিরণ অন্দরে প্রবেশ করিতেছে, বাসনের ঠুং ঠাং ও মহিলাগণের আনন্দ হাস্যের সহিত জাহাজে প্রতিহত জলের ঝলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠিতেছে। পরদার আড়ালে দিগন্ত আবরিত; ক্যাবিনের তক্তায় বসিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্বল্প প্রসর স্থানের মধ্যে গঙ্গার জলস্রোত কেবল চোখে পড়ে।

একটুকরা কেক হাতে লইয়া আমি নিম্নমুখ হইয়া সেই উচ্ছলিত জলস্রোতের দিকেই চাহিয়া ছিলাম। সহসা একটি কৌতুক নাট্যের আখ্যানউপাদান সেই জলস্রোতের মতই ছলাৎ ঝলাৎ শব্দে আমার মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়া আমাকে সচকিত করিয়া তুলিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, আহারগৃহ হইতে সকলে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—কেকখণ্ড জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম জাহাজ জেটিতে লাগিয়াছে, লেডি জেঙ্কিন্স—লেডি হার্ডিংকে লইয়া তীরের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও সকলে তাঁহাদের অনুগমন করিলাম। পরে পরে যথারীতিতে সকলকে বিদায় অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। আমি গাড়ীতে উঠিয়া সেই হেঁয়ালি নাট্যটিরই ধ্যানে

নিমগ্ন হইলাম। বাড়ীতে আসিয়া কাগজ কলমে তাহার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছি—যে সকল পাঠিকা সেদিন জাহাজে যাইতে পারেন নাই,—তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ তাহা ভারতীতে প্রকাশিত হইল।

হেঁয়ালি নাট্য

শিক্ষা-বিভ্রাট।

(১)

[তালপুকুরের মিশন্ হাউসের বড় মেম মিশ নেলসন তিনকড়ি তালপাত্রের নিকট বাঙ্গলা শিখিতেছেন। মেমসাহেব বই খুলিয়া পড়িয়া যাইতেছেন; পণ্ডিত মহাশয় উচ্চারণের ঘোরফের এবং বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছেন।]

পণ্ডিত। বাঙ্গলায় অকারান্ত শব্দে প্রায়ই অকার উচ্চারিত হয় না—যেমন, সুর অসুর, দেব নর, ঘর বর,—ইত্যাদি।—

মিশ। বুঝিল—আমি ঠিক বুঝিল।

প। 'বুঝিল'—না—বুঝিলাম।

মেম। ওঃ কেবলি ভুলিয়া যাইলাম! তিনি আবার পড়িতে লাগিলেন,

"সুরাসুর মিলিয়া সাগর মন্থন করিল, দেবগণ অমৃৎ লাভ করিলেন, আর—

পণ্ডিত। অমৃৎ নহে অমৃত। কতকগুলি অকারান্ত শব্দে অকার উচ্চারিত হয়,— যেমন অমৃত, অজ, গজ, প্রবাহ, শুভ —

মিশ। বর্ (বড়) কঠিন; বর্ কঠিন! বলিতে বলিতে খাতায় কথাগুলি টুকিয়া লইয়া মুখস্থ করিতে লাগিলেন—

"সুর অসুর,—ঘর বর,—অমৃত অজ, গজ। ভাল্ হইল পণ্ডিত মহাশয়?"

প। ভাল্ নহে ভাল-অ। ভাল্ অর্থে, কপাল।

মি। আমার ভাল্ বর্ (বড়) মন্দ আছে,—শিখিতে না পারিলাম। ঠিক হইলাম?

প। ঠিকই হইয়াছে—কেবল বড়্ না বলিয়া বড় বলিলে আরও ঠিক হইত— আর—

মিশ। Ah! I am getting despondent—Oh Pundit, save me!

প। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই— বাঙ্গলা শিক্ষার একটি সহজ উপায় বলিয়া দিই শুনুন।

মিশ। বলুন—বলুন।—

প। আপনার দেখিয়াছি একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান ঝি আছে—

মিশ। ঝি কাহাকে বলে?

পণ্ডিত। মেড সার্ভেণ্টকে আমরা ঝি বলি। হিন্দুস্থানীর বদলে তার সঙ্গে বাঙ্গলা বলিলে শীঘ্র বাঙ্গলা শিখিয়া ফেলিবেন।

মেমসাহেব আনন্দ সহকারে বলিলেন—

"Good idea! আমি শিখিল, ও—ঠিক শিখিলাম? Thank you পণ্ডিত।"

পণ্ডিত মহাশয় ধন্যবাদ লইয়া চলিয়া গেলেন—মেমসাহেব ডাকিলেন—"মেরিয়া।" মেরিয়া হাজির হইয়া সেলামপূর্ব্বক বলিল—"বরা মেমসাহেব, ক্যা হুকুম?" মেরিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের লোক, সেও মেমসাহেবের মত—ড় কে র উচ্চারণ করে।

মিশ। মেরিয়া, জি,—টুমি যাও—শীগর শীগর যান আন।

ঝি করযোড়ে বলিল—বরা মেমসাহেব আপনি আমাকে জি বলেন কেন? আমি আপনাকে জি বলিব—আপনি আমাকে জি বলিবেন না।

বড় মেম অবাক হইয়া গেলেন, পণ্ডিতের কথা ভুল হইবার নহে—মেরিয়া যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বোঝে না—এই কথা তাহারই প্রমাণ,—তাহার সহিত কথা কহিলে তবে ত ভুল শিক্ষাই হইবে! তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া রহিলেন,—মেরিয়া ইতিমধ্যে ঘরের বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হাতে একটি কাগজের বাক্স প্রদান করিল। তিনি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ কি আছে?"

"শিগার!"

"কেন?"

"আপনি যে আনিতে হুকুম করিলেন!"

"Oh my God" বলিয়া মেমসাহেব মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ওঃ বাঙ্গলা শিক্ষার প্রাইজটা আর পাইলাম না—পাইলাম না। তারপর দাসীকে বলিলেন "যাও মেরিয়া, গাড়ী বোলাও—" মেরিয়া চলিয়া গেল; তিনি স্থির করিলেন—গাড়ী আনিলেই প্রথমে পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়ী যাত্রা করিবেন। তালপাত্রের বাড়ীর মেয়েদের সহিত প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহাই তিনি প্রাইজ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

(২)

[তিনকড়ি বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা চারুলতা মেমসাহেবকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে আনিয়া বসাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত।]

চারু। মা বাড়ী নাই—মামার বাড়ী গেছেন, ঠাকুরমা রান্নাঘরে। তিনি এখনি আসবেন, আপনি বসুন।

মিশ। তোমার বাবা কোটায়?

চারু। জানি না।

মিশ। তুমি কি পরিল? (কি পড়?)

চারু। সাড়ী—দেখিতেছেন না?

মিশ। কি বই পরিল?

চারু। কি বই? দুর্গেশনন্দিনী!

মিশ। দুর্গেশ-ননডিনী! আমিও পরিলাম—ভুল হইলায় কি!—

এই সময় ঠাকুরমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চারু। "ঠাকুরমা মিশ নেলশন এসেছেন--বাবা এঁকে পড়ান।

"কেমন আপনি কেমন?" (How do you do) বলিয়া মেমসাহেব সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে হস্ত বাড়াইলেন। ঠাকুরমা শুচিবাতিকগ্রস্ত লোক—তিনি দুই পা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

"সেলাম মেমসাহেব! এই রান্নাঘরের কাপড়খানা পরেছি,—ছোঁব না আর; বস' তুমি,—মেমসাহেব তোমার কটি ছেলে?

এই সময় পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রবেশ করায় মেমসাহেবকে এই অপ্রীতিকর কথার আর উত্তর দিতে হইল না। কিন্তু ঠাকুরমা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেমসাহেব তোমার কটি ছেলে? ছেলেদের আননি কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় আস্তে আস্তে বলিলেন, "মা উনি মিশ—"

—"তা ত জানি—নাম ত মেয়ে বলেছে!"

"উনি অবিবাহিত!"

"এত বড় মেম এখনো বিয়ে হয়নি! সর্ব্বনাশ! বুঝেছি—এই সব দেখেশুনে তোরও আর মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় মন নেই! তাই ত বলি! ১৩ পেরিয়ে গেল—এখনও তিনকড়ে বর দেখেনা কেন!"

মিশ। ছোট কালো বিয়ে ভাল না আছে।"

"কেন আমরা ত বরাবর ছোট কালেই বিয়ে দিয়ে আসছি কি মন্দ হয়েছে?"

মিশ। "মন্দ বহু আছে, বর্ কালো বিবাহ কর।"

"তা আমাদের কালো বরই ভাল, সুন্দর বর নেই হোল। ওকথা শুনিসনে তিনকড়ে তাহলে আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব। বাপপিতাম বরাবর যা করেছে তাই কর বলছি,—নাম ডোবাসনে। আর তোমাকেও বলছি মেমসাহেব, অমন মন্ত্রণা তিনকড়েকে দিও না, তাহলে আমি ওকে তোমার কাছে আর যেতে দেব না!"

ঠাকুরমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মেমসাহেবও প্রাইজ লাভটা নিতান্তই অদৃষ্টে নাই এই ভাবিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পাঠিকাগণ এখন ইহার ভিতরকার হেঁয়ালিটি বাহির করুন।

চয়ন

ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীসীয় প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১। অঙ্ক-বিভাগ।—ভারতীয় নাটকগুলি অঙ্কে বিভক্ত; সংস্কৃত শব্দ "অঙ্ক"—ধাপ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। একটি সূক্ষ্ম ধরণের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, ভরত এই অর্থেই উহার পারিভাষিক অর্থ দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু অঙ্কের আর এক অর্থ—"চিহ্ন" ও "সংখ্যা", এবং এই দুই অর্থের দ্বারাই এই নাটকীয় শব্দটীর বিশেষ-প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও ভাল রকম ব্যাখ্যা হয়। নাটকের প্রত্যেক অঙ্ক, একটা বিশেষ অংশরূপে পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত। তা ছাড়া অনেক স্থলে,

আমাদের নাটকের ন্যায়, উহার দ্বারা পর্য্যায়ের সংখ্যা সূচিত হয়। অঙ্কগুলি নাটকের কৃত্রিম বিভাগ নহে। নাট্যকার্য্যের স্বাভাবিক বিভাগের সহিত অঙ্কগুলির বেশ ঐক্য আছে। "নাটকে"র অন্তত পাঁচ অঙ্ক হওয়া উচিত। কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ-ফল পর্য্যন্ত, নাটকীয় নায়কের পঞ্চ "অবস্থা"র সহিত, কার্য্যের পঞ্চ "অর্থ-প্রকৃতি"র সহিত, পঞ্চ "সন্ধি"র সহিত, এই পঞ্চ সংখ্যার সম্পূর্ণ মিল আছে। দৃশ্য কাব্যের মুখ্য নিয়মগুলি সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তবে এই সংখ্যাটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ল্যাটিন্ "কমেডি"ও পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু ইহার প্রয়োগ নিতান্তই প্রথানুগত,—কোন হেতুগর্ভ শাস্ত্রীয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। "নূতন গ্রীক্-কমেডি" এত অল্প বিদিত যে, উহার কিরূপ প্রকৃতি, উহা কত অঙ্কে বিভক্ত তাহা কেহই জানে না। উহার নাটকীয় ভাষায় এমন একটি শব্দ নাই যাহার দ্বারা "act" বা অঙ্ক বুঝায়। তা ছাড়া, এই পঞ্চ সংখ্যা - যাহা ল্যাটিনেরা কখন অতিক্রম করে নাই—ভারতবাসীদিগের নিকট ইহা নিম্নতম সীমা; মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব দশ অঙ্কে বিভক্ত। বীর-চরিত, উত্তর-চরিত এবং অন্যান্য পরবর্ত্তী অধিকাংশ নাটকের ন্যায় শকুন্তলা সাত অঙ্কে বিভক্ত।

২। প্রবেশ নিষ্ক্রমণাদি অভিনয় সংক্রান্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা।—এই অভিনয় সংক্রান্ত নির্দ্দেশগুলি উভয় নাট্যসাহিত্যেই সমান;—যথা, "উচ্চৈঃস্বরে", "মৃদুস্বরে", "স্বগত", "নেপথ্যে" ইত্যাদি। এই সাদৃশ্য

সাহেব দৃষ্টান্তস্বরূপ "মালবিকাগ্নিমিত্রের" দ্বিতীয় অঙ্ক ও "Ennuque"-এর দ্বিতীয় অঙ্ক পাশাপাশি আনিয়াছেন। কিন্তু এ প্রমাণ অনাবশ্যক; অভিনয়ের জন্য এই সকল পারিভাষিক নির্দ্দেশবাক্য একান্তই আবশ্যক; সকল নাট্য-সাহিত্যেই ইহা অপরিহার্য্য। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্ব্বেই, কে প্রবেশ করিবে জানিবার জন্য দর্শকমাত্রেরই কৌতূহল হয়। দর্শককে বেশীক্ষণ কিংবা বারংবার অনিশ্চিততার মধ্যে রাখিলে দর্শকের শীঘ্রই ক্লান্তি উপস্থিত হয়। তাই এই প্রণালী সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইয়া থাকে।

৩।—যবনিকা।—রঙ্গপীঠের পশ্চাৎভাগ একটা পর্দ্দার দ্বারা রুদ্ধ করা হয়। ইহাকেই সাধারণতঃ "যবনিকা" বলে। (বা "জবনিকা", প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃত রূপান্তরিত)। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় নাই; ইহা "যবন" শব্দ হইতে উৎপন্ন। পাশ্চাত্যদেশে অবস্থিত যে-কোন বৈদেশিকের প্রতি ভারতবাসীরা যবন নাম প্রয়োগ করিয়া থাকে। M. Windisch এই নাম গ্রীকদিগেরই নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন বিচার নিষ্পত্তিসত্বেও, আমরা উইন্‌ডিস্ সাহেবের কথাটিই মানিয়া লইলাম। ইহাও মানিয়া লইলাম, তাঁহার মতটিই কতকটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভূগোলসম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের কতকগুলা অস্পষ্ট ধারণা থাকায়, কি গ্রীক্, কি গ্রীক্ ভাবাপন্ন জাতি—উভয়কেই তাহারা যবন-নামের অন্তর্ভূত করিত। টলেমির ইজিপ্ট্, সেলিউসিড্ দিগের

(বাহ্লিক)—এ সমস্তই খাস-গ্রীসেরই ন্যায় যবন-দেশ। "যবন" ও "যবনিকা" এই দুই শব্দের মধ্যে যে যোগ তাহা এরূপ অস্পষ্ট যে, এই বিষয় সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিষ্কর্ষণ করা দুঃসাহসের কর্ম্ম। যে সকল "চিত্র-জবনিকায়"(১) ভারতীয় নাট্যমঞ্চ বিভূষিত হইত, সম্ভবত উহা গ্রীক্‌দেশের শিল্প। (Tapestry) চিত্র-যবনিকার জন্য পারস্যের যেরূপ প্রাচীন খ্যাতি, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, খৃষ্টাব্দের আরম্ভভাগে, ঐ সকল চিত্র-যবনিকা ভারতে আনীত ও সমাদৃত হইত। ঐ সকল সামগ্রী তখন বণিকেরা গ্রীক্‌ জাহাজে করিয়া ভারতে লইয়া আসিত।

ভারতীয় থিয়েটারের সাজসজ্জা গ্রীক্‌ থিয়েটারের সাজসজ্জা হইতে এত তফাৎ যে, গ্রীসের নিকট হইতে ভারত নাট্য-যবনিকা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল,—এ অনুমানটি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেবল যবনিকা নামটির দ্বারা এই অনুমান সিদ্ধ হয় না। যবনিকা বলিতে শুধু থিয়েটারের পর্দ্দা বুঝায় না, এই নামে সকল প্রকার পর্দ্দাই বুঝায়। ভারতীয় সাহিত্য হইতে আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হই—তাছাড়া সংস্কৃত অভিধান হইতেও ইহা বিধিমতে সপ্রমাণ হয়। নাট্য-সাহিত্যেও পর্দ্দার একমাত্র নাম যবনিকা নহে। অনেক স্থলে পর্দ্দা অর্থে "অপটী" শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। "অপটী"ও পর্দ্দার একটা সাধারণ নাম। (২)

একটি মাত্র শব্দের সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন তর্ক কতটা দুর্ব্বল,—ভারতীয় নাটকে যবনীদের উল্লেখে ও যবনী শব্দের প্রয়োগেও তাহা সপ্রমাণ হয়। ধনুর্ব্বাণ হস্তে যবনীরা শরীর-রক্ষিণীরূপে রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। যবনী এই নামে সম্ভবত গ্রীক্‌ রমণীই সূচিত হয়। কিন্তু এই নামের প্রয়োগ নাট্য-সাহিত্যের বাহিরে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাট্য-সাহিত্যে ইহা কেবল পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সংস্রব হইতে তবে কি এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ভারতীয় কবিরা যবনীদিগকে গ্রীক্‌ কমেডি হইতে ধার করিয়াছিল? যে অনুকরণে Menanderএর প্রেমাসক্তা তরুণীরা ভারতীয় নাটকে বীরাঙ্গনায় রূপান্তরিত হয়, তাহা অপূর্ব্ব অনুকরণ বলিতে হইবে! বস্তুত যবনিকার ন্যায় যবনী শব্দও ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। যবনী নামে এই মাত্র সূচিত হয় যে, রাজারা যবনিকার ন্যায় যবনীদিগকেও পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট হইতে যুদ্ধে লুটিয়া আনিতেন কিংবা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেন। গ্রীক্‌ গ্রন্থসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পারস্য-উপসাগরে বন্দরগুলি নব যুবতী বিক্রয়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল; সেখানে এই ব্যবসায় খুব সজোরে চলিত। গ্রীক্‌ বণিকেরা প্রকৃত পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় গ্রীক্‌ রূপসীদিগকেও ভারতে চালান করিত।

"যবনিকা" ও "যবনী" এই দুই শব্দ হইতে যে একমাত্র সিদ্ধান্ত বৈধরূপে নিষ্কর্ষণ করা যাইতে পারে তাহাও কম কৌতূহলজনক

(১) "চিত্র-যবনিকা" মালতীমাধব। ৬ষ্ঠ অঙ্ক।

নহে। আমরা ঐ দুই শব্দ হইতে এই তথ্যটী অবগত হই, যে যুগে গ্রীক্-জগতের সহিত ভারত ঘনিষ্ঠভাবে বাণিজ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুগেই নাটকের পারিভাষিক শাস্ত্র ভারতে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বিরচিত হয়। খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ-শতাব্দী পর্য্যন্ত, রোম-সাম্রাজ্যের শেষভাগে, হিন্দু-গ্রীক বাণিজ্য চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন্ সময়ে ভারতীয় নাট্যকথা সংগঠিত ও রীতিমত সূত্রবদ্ধ হয় তাহার একটা কাছাকাছি কাল নির্ণয় করিতে এইরূপে আমরা সমর্থ হই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃঋণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসংযম।

তখনও ঘড়িতে ছয়টা বাজে নাই। ইদ্রের পথঘাট তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুই একটা রুটি ও মদের দোকানের সার্শি ভেদ করিয়া ক্ষীণ আলোকচ্ছটা পথে পড়িয়াছিল। একটা সরাইয়ে টেবিলের সম্মুখে রুডিকের ভ্রাতা নান্তেঁ ও জ্যাক বসিয়াছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর মদের বোতল ও একটা গ্লাস।

নান্তেঁ কহিল, "এস জ্যাক, এক গ্লাস নাও, খাও।"

জ্যাক সসঙ্কোচে কহিল, "আমায় ক্ষমা করো, মসুঁ, মদ, আমি খাই না। ছুঁতেও ভয় হয়।"

হাসিয়া নান্তেঁ কহিল, "আরে বাঃ! এমন ছেলেমানুষ দেখিনে ত! সহুরে ছেলে তুমি,মদ ছোঁও না! না, না, এক গ্লাস খাও! ওরে, এখানে আর একটা গ্লাস দিয়ে যা।"

... গেল। গ্লাসটা কাণায় কাণায় মদ্যে পূর্ণ করিয়া নান্তেঁ, কহিল, "নাও, খেয়ে ফেল।"

জ্যাক অসম্মতি জানাইতে সাহস করিল না। নান্তেঁর মত একজন মাতব্বর লোকের অনুরোধ সে বারবার কি বলিয়া এড়াইবে? নান্তেঁকে জ্যাক একটু যে সম্ভ্রমের চক্ষে না দেখিত, এমন নহে! এই শিল্পীটি পূর্ব্বে যখন রুডিকগৃহে থাকিত, তখন, জ্যাককে ডাকিয়া একদিনের জন্যও সে তাহার সহিত কথা কহে নাই! নান্তেঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রুডিক পরিবারের সকলেই কতখানি ব্যস্ত থাকিত, ম্যানেজারও নান্তেঁর মঙ্গলের জন্য কতটা সচেষ্ট ছিল, জ্যাক তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিল। সেই নান্তেঁ আদর করিয়া তাহাকে বারবার এতখানি অনুরোধ করিতেছে—সে অনুরোধ রক্ষা না করাটা ভাল দেখায় না! অগত্যা জ্যাক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্লাসটি নিঃশেষ করিল।

... পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া নান্তেঁ

কহিল, "এই ত মানুষের মত! কেমন লাগল বল দেখি! আর একটু নাও।"

জ্যাক আবার নান্তেঁর অনুরোধ রক্ষা করিল। নান্তেঁকে তাহার মন্দ লাগিল না! বেশ আমোদপ্রিয় লোকটি! বেচারা নান্তেঁ। সে জুয়া খেলা ছাড়িয়া সৎপথে আসিলে কি ভালই হয়! জ্যাক ভাবিল, সে একবার অনুরোধ করিবে—নান্তেঁ যাহাতে জুয়াখেলা ছাড়ে।

আবার গ্লাস আসিল—নান্তেঁর প্রাণ স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল। জ্যাক কহিল, "আমার একটা অনুরোধ আছে, মস্যুঁ নান্তেঁ, —সে অনুরোধ রাখতে হবে।"

"অনুরোধ? বল, তোমার কি অনুরোধ? রাখব, বৈ কি,—কেন রাখব না?"

"তোমায় জুয়াখেলা ছাড়তে হবে! এতে ক্রমাগতই ত তোমার লোকসান হচ্ছে, এবার থেকে সাবধান হও।"

"এই কথা! খাসা বলেছ, মাষ্টার জ্যাক!" নান্তেঁ আবার জ্যাকের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিল।

"আর একট কথা—"

এমন সময় সরাইয়ের অধ্যক্ষ আসিয়া কহিল, "কারখানার ঘণ্টা বাজছে!"

জ্যাক কহিল, "তাহলে আজ আসি, মস্যুঁ —"

জ্যাক পকেট হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া অধ্যক্ষের হাতে দিল। নান্তেঁ কহিল, "সেকি তুমি দাম দিচ্ছ কি?"

"এবারকার দামটা আমিই দিই, মস্যুঁ— তুমি এত খরচ করলে!"

স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া অধ্যক্ষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কারখানার একটা সামান্য শিক্ষানবীশ ছোকরা—সে স্বর্ণমুদ্রা বাহির করে! নান্তেঁও বিস্মিত হইল। তবে কি জ্যাকও জেনেদার যৌতুকের টাকা কিছু আত্মসাৎ করিয়াছে? তাহদিগের বিস্ময় বুঝিয়া জ্যাকের আনন্দ হইল। সে কহিল, "অবাক হয়ে যাচ্ছ! এই দেখ, আরও কত মোহর আছে!" বলিয়া সে চারিপাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিল। পকেটে সেগুলা রাখিয়া সে আবার কহিল, "জেনেদার জন্য একটা কিছু উপহার কিনে দিতে হবে।"

মৃদু হাসিয়া নান্তেঁ কহিল, "বটে!"

অধ্যক্ষ মুদ্রাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

জ্যাক কহিল, "চট পট বিদায় কর! আমার কারখানায় যেতে হবে এখনি! ঘণ্টা বাজছে ওদিকে।"

যথার্থই কারখানার ঘণ্টা বাজিতেছিল। কর্ম্মচারীদিগকে সচকিত করিয়া ডাকিবার ঘণ্টা।

সরাইয়ের বাহিরে আসিয়া নান্তেঁ কহিল, "তাইত জ্যাক, এখনি তোমায় যেতে হবে! দুটো কথা কওয়া হল না! তোমায় চমৎকার লাগছিল, আমার। তোমার অনুরোধ রাখব আমি—দেখে নিও, ঠিক বলছি।" ক্রমে কথায় কথায় নান্তেঁ জ্যাককে নদীর তীর অবধি আকর্ষণ করিয়া আনিল। জ্যাক কোন আপত্তি করিল না, বা বাধা দিল না। সরাইয়ের সেই বদ্ধ উষ্ণ বায়ুর মধ্যে বসিয়া কেমন ক্লান্তি ধরিয়াছিল, বাহিরের ঈষৎ শীতল বায়ুর স্পর্শটুকু দিব্য সুন্দর লাগিতেছিল! চলিতে চলিতে জ্যাকের গতি মন্থর হইয়া পড়িতেছিল, পা জড়াইয়া আসিতেছিল! নান্তেঁর হাত ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল!

কিয়দ্দূর আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, "একি, ঘণ্টা থেমে গেছে!"

"না।"

উভয়েই পশ্চাতে ফিরিল। রাত্রের অন্ধকার দুই হাতে সরাইয়া তখন দিনের আলো নামিতেছে! চিমনিগুলার মাথার উপর তপ্তকাঞ্চন বর্ণের একটা তরঙ্গ খেলিতেছিল! কারখানার নিশান, কৈ দেখা যায় না ত! আজ এই প্রথম জ্যাক কারখানায় পৌঁছিতে পারিল না! ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু নান্তেঁ যখন দুঃখিত স্বরে কহিল, "আমার দোষ! আমার দোষ! আমারই দোষে শুধু এটা ঘটল, জ্যাক! আমি ম্যানেজারের কাছে যাব—তাঁকে বলব যে আমারই জন্য তুমি সময়ে কারখানায় পৌঁছুতে পারনি!" তখন জ্যাক কহিল, "বয়ে গেল! একদিন কামাইয়ে—আর কি এসে যাবে? লীবসামের সঙ্গে আমি বোঝা-পড়া করে নেব'খন। চল, যখন যাওয়া হল না, তখন তোমায় ষ্টীমারে তুলে দিয়ে আসি।"

এই লীবসামের সহিত বুঝাপড়া করা-টাকেই জ্যাক সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিত। কিন্তু আজিকার এই সদ্য লব্ধ আনন্দোল্লাসে সে ভয়ের বিকটতা সে ভুলিয়া গেল!

দুই জনে গল্প করিতে করিতে নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল। তীরে তখন কে যেন কুয়াশার পর্দা বিছাইয়া রাখিয়াছে। পরপারের কোন চিহ্ন দেখা যায় না! ষ্টীমার-ঘাটের ক্ষুদ্র বিশ্রামকক্ষে দুইজনে আসিয়া বসিল। প্রাণটাকে আজ জ্যাকের একান্ত লঘু মনে

জেনেদার বিবাহ, সাধু ও সরল-হৃদয় বৃদ্ধ রুডিকের অগাধ স্নেহ, কোমল-হৃদয়া ক্লারিসা—কি এক বিষাদের ঘনছায়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে!

জ্যাক কহিল, "আজ সকালে ক্লারিসার মুখ এমন ফেঁকাসে হয়ে গেছে! মড়ার মত সাদা মুখ! আসবার সময় দেখলাম—"

কথাটা বলিবার সময় জ্যাক লক্ষ্য করিল, নান্তেঁর দৃষ্টিটা সহসা কেমন স্থির হইয়া উঠিল! নান্তেঁ কহিল, "তোমায় ক্লারিসা কিছু বলেছে আজ?"

"না।"

"কিছু না?"

"না। জেনেদা তাকে কি বলছিল, সে কোন জবাব দেয়নি কিন্তু! তার বোধ হয় কোন অসুখ করেছে—তার মুখ দেখে ত এই রকম মনে হল।"

"আহা, বেচারী ক্লারিসা!" বলিয়া নান্তেঁ একটি সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জ্যাকের মনে হইল, একবার সে বেলি-সারের কথা তুলিবে! কিন্তু নান্তেঁর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার কেমন অনুকম্পা হইল। সে ভাবিল, "আজ থাক্, আর একদিন বলব।" নান্তেঁর মুখে একটা দুঃখের ছায়া পড়িয়াছিল।

সহসা নান্তেঁ কহিল, "জ্যাক, তোমার কথা রাখব আমি। জুয়াখেলা ছেড়ে দেব।"

এমন সময় কুয়াশা ভেদ করিয়া বংশীর ধ্বনি উঠিল। সেণ্টনাজারের ষ্টীমার আসিতেছে। এবার বিদায় লইতে হইবে।

করকম্পন করিয়া নান্তেঁ বিদায় গ্রহণ

করিল। কারখানায় যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আনন্দের উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিল, আজ যখন একটা দিন অবসর মিলিয়াছে, তখন জেনেদার উপহারটা কিনিয়া আনাই সঙ্গত!

নৌকায় নদী পার হইয়া জ্যাক ষ্টেসনে আসিল। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ট্রেন নাই। কি করিয়া এতখানি সময় কাটান যায়? ওয়েটিং রুমে কেহ ছিল না। বাহিরে বায়ুর প্রকোপ বাড়িয়াছিল, শীতল বায়ু বহিতে ছিল। পথের পার্শ্বে একটা ছোট হোটেল ছিল, জ্যাক তথায় গিয়া বসিল।

এই প্রভাতেই হোটেলে কারিকরও কুলি-দিগের ভিড় জমিয়াছিল। মদ্যের উৎস ছুটিয়াছিল। উল্লাস চীৎকারের বিরাম ছিল না। ভিতরে ঢুকিয়া জ্যাকের বিরক্তি ধরিল। সে বাহিরে আসিবে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "কি, জ্যাক যে!"

জ্যাক কহিল, "কে? গ্যাসকন!"

গ্যাসকন ইন্দ্রেঁর কারখানায় কাজ করিত। অতিরিক্ত পানদোষের জন্য পূর্ব্বদিন সে কারখানা হইতে বরখাস্ত হইয়াছিল। একটা টেবিলের ধারে বসিয়া তিন চারিটা সঙ্গীর সহিত সে মদ্যপান করিতেছিল।

গ্যাসকন কহিল, "মাষ্টার জ্যাক—পালাচ্ছ কোথা? দু' এক গ্লাস আমাদের সঙ্গে খাবে, এস!"

এই পিশাচগুলার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় ছিল না। তাহারা সাগ্রহে সরবে জ্যাককে আপনাদিগের দলে টানিয়া মদ্যের প্রবাহ ছুটিল। পরে সকলে কহিল, "কিছু খাওয়াও, মাষ্টার জ্যাক!"

আহারাদির পর একজন সঙ্গী কহিল, "নৌকা চড়ে একটু বেড়ানো যাক—ঠাণ্ডা হবে প্রাণটা। মাথা বেজায় গরম হয়ে উঠেছে।"

মৃদুগতিতে নৌকা চলিয়াছিল। উভয় তীরে অস্পষ্ট গ্রামসীমা ভাসিয়া উঠিয়াছিল। তীরে ধীবরদিগের ক্ষুদ্র কুটীর, রজক ও মেষপালক দলের মেলা,—চিরপরিচিত শান্ত পল্লীশ্রীতে মণ্ডিত তটভূমি! জ্যাকের কল্পনাকাতর চিত্ত কাব্য ও সৌন্দর্য্যের আবেশে ভরিয়া আসিয়াছিল। মাথার উপর আকাশ কোথাও সুন্দর নীলিম, কোথাও বা চিমনির ধূমে গাঢ় কৃষ্ণ! দুই চারিটা পাখী বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার মনে পড়িতেছিল, কাহিনীশ্রুত রবিন্সন ক্রুসোর গল্প! সেও যেন জগতের সহিত, পরিচিতের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন্ অপরিচিত অজ্ঞাত নবীন সৌন্দর্য্য-লোকের উদ্দেশ্যে ক্রুসোর মত তরী বাহিয়া চলিয়াছে! পানোন্মত্ত সঙ্গীগুলা তখন বীভৎস কণ্ঠে চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছে, সেদিকে জ্যাকের মনোযোগ এতটুকু আকৃষ্ট হয় নাই। দূরে অদূরে প্রকাণ্ড জাহাজগুলার গগনস্পর্শী মাস্তুলের চূড়া দেখিয়া কোন্ স্বপ্নদৃষ্ট সুদূর মায়ালোকের কল্পনায় তাহার লুব্ধ চিত্ত বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল।

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, নৌকা তীরে লাগিয়াছে। সে কোথায় আসি-

অল্পে অল্পে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল! জেনেদার পরিণয়-উপহার কিনিতে হইবে, তাহারই জন্য সে সহরে আসিতেছিল! তারপর—? একটা বিরাট অনুশোচনায় তাহার মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইল। এই নীচ সঙ্গীগুলার সহিত এমন নির্লজ্জভাবে মিশিয়া হীন আমোদে মাতিয়া সে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে বসিয়াছে! সঙ্গীগুলার উপর পৈশাচিক ক্রোধে তাহার দেহ জলিয়া উঠিল! কেমন করিয়া ইহাদিগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে!

সঙ্গীর দল তীরে উঠিল। জ্যাকও তাহাদিগের অনুসরণ করিল। সঙ্গীগুলা তীরে বসিয়া নূতন আমোদের পরামর্শে মন দিল! কেহ বলিল, আর একটু মদ্য চাই, কেহ প্রতিবাদ করিল। এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যে জ্যাক সতর্কভাবে নিঃশব্দে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল। তাহার পা টলিতেছিল, মাথা দপ দপ করিতেছিল। দেহটাকে টানিয়া বেড়াইবার এতটুকু শক্তি ছিল না। একটু শুইতে পাইলে যেন সে বাঁচিয়া যায়! কিন্তু এমন স্থান কোথায় মিলিবে? যে দিকে দৃষ্টি যায়, পা দুইখানা টানিয়া টানিয়া সেই দিকেই সে নিতান্ত লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিল।

কিয়দ্দূর সে আসিয়াছে, এমন সময় পাশ দিয়া কে ছুটিয়া গেল—লোকটা জ্যাকের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল! সহসা আর একজন ছুটিয়া আসিল। সে গ্যাসকন।

গ্যাসকন কহিল, "কে? মাষ্টার জ্যাক! সর্ব্বনাশ হয়েছে—ওরা ঝগড়া মারামারি করে একটা লোককে জলে ফেলে দিয়েছে, পুলিশ আমাদের পাছু নিয়েছে—এখন কোথায় পলাই! তুমি পুলিশকে কোন পরিচয় দিও না আমাদের, যদি তারা তোমায় জিজ্ঞাসা করে!"

গ্যাসকন ছুটিয়া পলাইল।

জ্যাক আবার চলিল। সহসা সে শুনিল, কে হাঁকিতেছে, "টুপি? টুপি চাই?" একটা সম্ভাবিত আশায় জ্যাকের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "বেলিসার"—

"কে? মাষ্টার জ্যাক! তুমি এখানে!"

বেলিসারের দেহে ভর দিয়া জ্যাক কহিল, "আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, বেলিসার! আমায় ইন্দ্রেয় রুডিকদের বাড়ী কোন মতে পৌছে দাও, তুমি।"

"তাইত! তা এস, মাষ্টার জ্যাক—ষ্টেশন কাছেই। ভাগ্যে আমি এ পথে এসেছিলাম, না হলে কি হত, বল দেখি!"

জ্যাককে লইয়া বেলিসার ষ্টেশনে আসিল। সন্ধ্যায় ট্রেন মিলিবে। অবসন্ন শরীরটাকে ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে জ্যাক লুটাইয়া দিল। ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসিয়াছিল।

সহসা প্রবল ধাক্কায় জ্যাকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া সে দেখে, পুলিশের লোক আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিতেছে! জ্যাক সভয়ে উঠিয়া বসিল, কহিল, "কি হয়েছে? কি চাই তোমাদের?"

পুলিশের লোক কহিল, "চাই তোমাদের দুজনকে। ভারী চালাক হয়েছ! পুলিশের চোখে ধূলো দেবে? ওঠ—"

বেলিসার পার্শ্বেই ছিল। সে কহিল, "কোথায় যেতে হবে?"

"ইদ্রেঁতে আপাততঃ—তারপর জেলের ঘরে পাকা বন্দোবস্ত করে দেব।"

বেলিসার কাঁদিয়া ফেলিল। জ্যাকের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার প্রাণের স্পন্দনটুকু থামিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল! এ কি, এ ব্যাপার? কি করিয়াছে সে, যে পুলিশ আসিয়া এমন ভাবে লাঞ্ছনা করিতেছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুঃসংবাদ।

পরদিন প্রভাতে যখন জ্যাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও তাহার শরীরের অবসাদ ঘুচে নাই। মদ্যপানের পরিণাম এমনই ভয়ঙ্কর! তীব্র তৃষ্ণায় জ্যাকের বক্ষ অবধি পুড়িয়া যাইতেছিল, শরীরের সর্ব্বাঙ্গে একটা বেদনা, মাথায় কে যেন গুরুভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর একটা দারুন লজ্জা, মর্ম্মভেদী অনুতাপ! মানুষ হইয়া পশুর মত ব্যবহার করা,—কি ঘৃণা, কি পরিতাপের কথা!

অন্ধকারময় কক্ষে জ্যাকের রাত্রি কাটিয়াছে। প্রভাতের আলোকরশ্মি ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথ দিয়া ক্ষীণভাবে কক্ষমধ্যে বিস্ফুরিত হইতেছিল। পার্শ্বে আর একজন কে পড়িয়া আছে! জ্যাকের মনে পড়িল, সে বেলিসার!

জ্যাক ডাকিল, "কে? বেলিসার?"

গাঢ়স্বরে উত্তর হইল, "হাঁ, আমি!" সুগভীর হতাশাপূর্ণ সে স্বর!

জ্যাক কহিল, "আমরা কি অপরাধ করেছি বেলিসার যে, এমন করে চোরের মত আমাদের আটকে রেখেছে!"

"অপরে কি করেছে, না করেছে, তা আমি বলতে পারি না,—তবে আমি ত কিছুই করিনি—শুধু টুপি বিক্রী কচ্ছিলাম! সেটা কি করে দোষের হল, তা বুঝতে পাচ্ছি না!" ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বেলিসার আবার কহিল, "টুপিগুলা কি আছে? সব নষ্ট হয়ে গেছে! তার দাম দেবে কে? গরিব আমি, আমার রোজগারের সর্ব্বনাশ করে দিলে! তুমি ওদের বলবে ত জ্যাক, আমার কোন দোষ নেই? তোমার এতটুকু সাহায্য করিনি আমি?"

"আমার সাহায্য করা? আমি কি করেছি?"

"কেন, ওরা যে বলছিল, তুমি শোন নি মোটে? সে কি? তুমি নিজে ত জানছ—"

"কিছু জানি না আমি, বেলিসার, যথার্থ বলছি। ওরা কি বলছিল, বল—"

"ওরা বলছিল, তুমি চুরি করেছ—"

"চুরি করেছি? কি চুরি করেছি?"

"জেনেদার বিয়ের টাকা।"

"কি ভয়ানক কথা বেলিসার! তুমি—" জ্যাকের কথা বাধিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বেলিসার কোন উত্তর দিল না। সারা ইদ্রেঁতে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জ্যাক চোর! চুরি করিয়া সে ইদ্রেঁ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। কনষ্টেবলও চারিধারে সন্ধান করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে তাহাকে ধরিতে সক্ষম হইয়াছে। চুরির কথা প্রাতেই জেনেদা জানিতে পারে। তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। চুরির রাত্রে জ্যাক গৃহে ছিল, ঠিক চুরির পর হইতেই সে অদৃশ্য হইয়াছে। সকালে কারখানাতেও তাহাকে কেহ দেখে নাই। সমস্ত ঘটনা জ্যাকের বিরুদ্ধে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতেছিল।

তাহার পর ইদ্রেঁর দুই চারিজন কারিকর তাহাকে সরাইয়ে মদ্যপান করিতে দেখিয়াছে, অধ্যক্ষের হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছে, সে! তাহার মত অবস্থার ছোকরা স্বর্ণমুদ্রা পাইবে কোথায়? তাহার পর কতকগুলা বদসঙ্গী লইয়া নৌকায় সে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছে! জ্যাক যদি চুরি করে নাই, তবে কে করিল? টাকার সন্ধান অপরে পাইবে কিরূপে? জ্যাক জানিত, জেনেদার বিবাহের টাকা কোথায় থাকে! সে রাত্রে জেনেদা স্বয়ং তাহাকে আলমারি খুলিয়া টাকার বাক্স দেখাইয়াছে!

সে যে চুরি করিয়াছে, এ বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবে একটা বিষয় ঠিক বুঝা যাইতেছিল না। সাড়ে তিন হাজার টাকা একরাত্রে অদৃশ্য হইল, তাহার মধ্যে জ্যাকের পকেটে কয়টারই বা সন্ধান মিলিয়াছে, বক্রী সে কোথায় লুকাইল? বেলিসারের নিকটেও তাহার বিক্রীত টুপির মূল্য বাবদ সামান্য অর্থ পাওয়া গিয়াছে! এই অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা তাহারা কোথায় রাখিয়া আসিল!

যেখানে রাখিয়া আসুক এই টাকাটা সন্ধান করিয়া আদায় করিতেই হইবে।

ম্যানেজারের নিকট অপরাধীদ্বয়ের ডাক পড়িল। জ্যাকের তরুণ বয়স, ভদ্র বংশ ও নম্র শান্ত প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ম্যানেজার অনুরোধ করিয়াছিল, আসামীকে আদালতের হাতে না দিয়া তাহার নিকট আনিয়া দিলে সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিবে! জেলে কয়েদীদিগের দলে পড়িলে জ্যাকের সংশোধনের আর কোন উপায় থাকিবে না। সমগ্র

জ্যাক ও বেলিসার ম্যানেজারের সম্মুখে নতমস্তকে আসিয়া দাঁড়াইল। সে কক্ষে ম্যানেজার, রুডিক ও পুলিশের দুইজন কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ ছিল না।

ম্যানেজার কহিল, "শোন, জ্যাক। তোমার বয়স অল্প, ভদ্র বংশের ছেলে তুমি, আর তোমার শান্ত নম্র প্রকৃতির জন্য তোমায় ভাল বাসতায় বলে আমিই অনুরোধ করে তোমায় আদালতের হাতে না দিইয়ে এখানে আনিয়েছি। এখানে নিঃসঙ্কোচে তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করতে পার, বাহিরের লোক সে কথা জানবে না—বেশী কথার দরকারও নাই—শুধু বাকি টাকাটা—"

জ্যাক মাথা তুলিয়া কহিল, "এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, আপনি কি—"

"চুপ কর, বাধা দিও না, জ্যাক! সাড়ে তিন হাজার টাকা তুমি নিয়েছ, জানা যাচ্ছে। এত টাকা একদিনে, তুমি খরচ করনি অবশ্য, কিছু করেছ, তা যাক্! আপাততঃ, বাকী যা আছে, ফিরিয়ে দাও। তোমাকে সকলেই ক্ষমা করব, কিন্তু এখানে আর তোমার থাকা হবে না—বাড়ীতে তোমার মার কাছে তোমায় পাঠিয়ে দেব।"

"আমি কিছু জানিনা, মশায়—" বলিয়া বেলিসার কাঁদিয়া উঠিল।

"চুপ কর্ পাজী—" ম্যানেজার পরুষকণ্ঠে কহিল, "তুই যত নষ্টের মূল! এই ভাল মানুষ ছোকরা যে এই নোঙরা কাজ করেছে, সে তোরই পরামর্শে, এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই!"

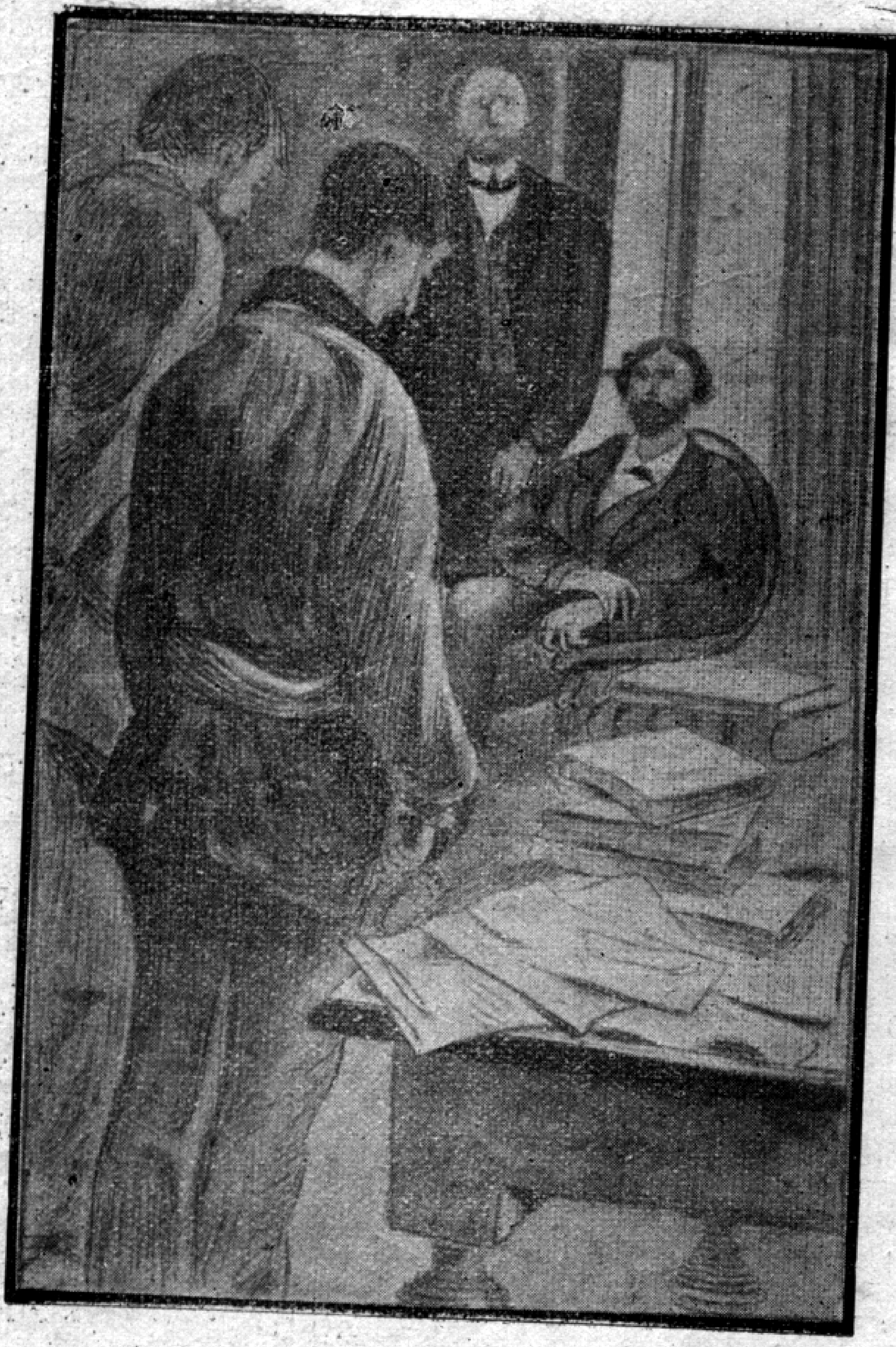
বেলিসার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বলেছেন, মশায়। এরই সঙ্গে মিশে জ্যাক খারাপ হয়ে গেছে। না হলে জ্যাকের মত শান্ত ছোকরা কারখানায় এর পূর্ব্বে আমি দেখিনি। আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, বাড়ীতে সকলেই ওকে ভালবাসে! জ্যাককে আমি নিজের ছেলের মত মনে করতাম—শুধু এরই সঙ্গে মিশে যে জ্যাক এই কাজ করেছে, এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"

বেলিসার ভাবিল, তাহার আর কোন আশা নাই! কি অশুভক্ষণেই সে পূর্ব্বদিন টুপি বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছিল! সে যদি ঘুণাক্ষরেও ইহার সন্ধান পাইত!

জ্যাক কহিল, "মস্যুঁ রুডিক, এই গরীব টুপি ওয়ালার কোন দোষ নাই। কাল যখন পুলিশ আমায় ধরে, তারই একটু পূর্ব্বে পথে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিল বলে ওরই সাহায্যে ইভ্রেঁ ফিরব মনে করেছিলাম, ও শুধু আমার সাহায্য করতে এসেছিল! ও কোন অপরাধ করে নি।"

ম্যানেজার কহিল, "তবে তোমার একলারই কাজ, এ?"



জ্যাক ও বেলিসার ম্যানেজারের সম্মুখে নত মস্তকে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কিন্তু আমি কিছু করিনি, মশায় চুরি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি চোর নই।"

ম্যানেজার কহিল, "সাবধান, জ্যাক! এখনও স্বীকার কর! বাকি টাকা ফিরিয়ে দাও, আমরাও তোমায় ছেড়ে দেব। তোমার দোষ এত স্পষ্ট যে প্রমাণের অপেক্ষা করে না। সে রাত্রে শুতে যাবার সময় জেনেদা তোমায় তার টাকা দেখায় নি? সে কোথায় টাকা রাখে, তা বলেনি? তুমি দেখনি? তার পর বেশী রাত্রে তুমি তার ঘরে ঢুকে যখন আলমারি খোল, তখন জেনেদা জানতে পেরে

তোমায় ডেকেছিল। তুমি কোন সাড়া দাওনি। বল,এ কথা সত্য কিনা! তুমি ছাড়া বাড়ীতে অন্য লোকও সেদিন আসে নি!"

জ্যাক কহিল, "আমি বেশী রাত্রে ও ঘরে যাই নি—আমি চুরি করি নি।"

"চুরি কর নি! তবে রাস্তায় অত বড়-মানুষি করে যে বেড়িয়েছ, তার দরুণ টাকা, কোথায় পেলে তুমি?"

জ্যাক বলিতে যাইতেছিল, সে টাকা মা পাঠাইয়াছিল,—কিন্তু সহসা তাহার মাতার নিষেধবাণী মনে পড়িয়া গেল! মা লিখিয়াছিল, যদি কেহ টাকার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে সে যেন সত্য কথাটা না বলে! শুধু বলে, যে এ টাকা তাহার সঞ্চয়ের! জ্যাক তাহাই বলিল। মা যদি বলিত, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ টাকা কোথায় পাইলে, তবে বলিও, চুরি করিয়াছি, তাহা হইলে জ্যাক নিঃসন্দেহ সেই কথাই বলিত। বালকের এমনই প্রকৃতি! মাতার প্রতি বালকের অনুরাগ এতই প্রবল! ম্যানেজার কহিল, "জ্যাক, এই কথা বিশ্বাস করতে বল তুমি, আমাদের? পাঁচপেণী তোমার দিনের মাহিনা, তুমি এই অল্প সময়ে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছ যে মদের দাম দিতে মোহর বার কর! জ্যাক, চালাকি করো না, মিথ্যা বলো না, তাতে তোমারই বিপদ হবে! মুক্তকণ্ঠে দোষ স্বীকার কর, তোমায় যথার্থই ক্ষমা করব!"

জ্যাক কোন কথা বলিল না, শুধু নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

রুডিক অগ্রসর হইয়া জ্যাকের মস্তকে কম্পিত শীর্ণ হস্ত রক্ষা করিল, কম্পিত স্বরে কহিল, "জ্যাক, বল, টাকা কোথায়, কার কাছে তুমি রেখেছ! কোন ভয় নাই! জেনেদার কথা ভাব একবার! তার জীবন ঐ টাকার উপর নির্ভর করছে। আমার বিশ বৎসরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের সঞ্চয়! শরীরের কত কষ্ট সহ্য করে, সকলরকম ভোগ বিলাস থেকে বঞ্চিত থেকে ঐ টাকা জমিয়েছি! ঐ টাকার উপর আমার একমাত্র সন্তানের জীবন নির্ভর করছে। তা নিয়ে এমন নিষ্ঠুরতা করো না। তুমি ভাল মানুষ, শরীরে দয়া মায়া আছে —তুমি এমন কাজ করতে পার, এক দণ্ডের জন্যও এমন কথা আমার মনে হয় নি। কিন্তু পৃথিবীতে প্রলোভনও বিস্তর,তার মায়া এড়াতে পারে, এমন মানুষ অল্পই আছে। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় একটা মন্দ কাজ করেই না হয় ফেলেছ, তার জন্য লজ্জা কি? সে দোষ গোপন করো না, তা প্রকাশ করায়, স্বীকার করায় মনুষ্যত্ব থাকবে! মুহূর্ত্তের প্রলোভনে মন্দ কাজ করে ফেলা আশ্চর্য্য নয়—তা স্বীকার করলে লোকে ঘৃণা করে না, বরং সে মুক্তকণ্ঠতার জন্য শ্রদ্ধা করতে পারে। এস জ্যাক, বল, টাকাটা কোথায়। ও টাকা আমার বুকের রক্ত, পাঁজরার হাড়। এ বৃদ্ধ বয়সে আর উপার্জ্জনেরও শক্তি নাই। আমার টাকাটা দাও। জেনেদা মরে যাবে না হলে—জ্যাক—" রুডিকের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। এ কথা শুনিলে নিতান্ত নির্ম্মম যে দস্যু, তাহার প্রাণও বিচলিত হয়। বেলিসার কহিল,"জ্যাক, দিয়ে ফেল টাকাটা, যথার্থই বুড়ো মানুষের বুকের রক্ত, এ টাকা।"

হতভাগ্য জ্যাক! যদি তাহার নিজের অর্থ থাকিত, সে এখনই রুডিকের হস্তে তাহা

সমস্তই অর্পণ করিত! কিন্তু কি বলিবে সে—কি করিয়া সে বুঝাইবে, যে সে চোর নহে, জেনেদার বিবাহের টাকা চুরি করে নাই। তথাপি সে বলিল, "যথার্থ বলছি মশায়, আমি চুরি করিনি। ঈশ্বরের শপথ—"

রোষে ম্যানেজার অধীর হইয়া উঠিল, কহিল, "যথেষ্ট হয়েছে" রুডিকের এ কথা শুনে। তোমার প্রাণ গলে গেল না, এত অধঃপাতে গেছ তুমি! তবু তোমায় কিছু সময় দিলাম, আরও। একে উপরে রেখে এস, কেউ। নিজের মনে বেশ করে সব ভেবে দেখ, জ্যাক, দোষ স্বীকার করবে কি না। না হলে শেষে আদালত আছে।"

পুলিশের কর্ম্মচারী কহিল, "তাহলে দুজনকে এক সঙ্গে রাখবেন না, মশায়। এই টুপিওয়ালাটা ওকে বোধ হয় কোন রকম সঙ্কেত করে দোষ স্বীকার করতে বারণ করে দিয়েছে!"

ম্যানেজার কহিল, "ঠিক কথা। দুজনকে দু' ঘরে রাখ।"

নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া জ্যাক ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বিরামদায়িনী, বিস্মৃতিদায়িনী নিদ্রা, কোথায় তুমি, হতভাগ্য বালককে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। বালক নিশ্চিন্ত হউক। আর সে ভাবিতে পারে না।

অপরাহ্নে জেনেদা আসিয়া ডাকিল, "জ্যাক!"

কাঁদিয়া জেনেদার চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। জ্যাক কহিল, "জেনেদা, তোমারও বিশ্বাস, আমি চোর?"

জেনেদা কাদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "জ্যাক, আমার মত কুৎসিং স্ত্রীলোক তুমি দেখেছ। আমি জানি, আমি কুৎসিৎ। আয়নায় আপনার মুখ দেখে নিজের উপর আমার রাগ হয়। জগতে সবাই সুন্দর, আমি রাজ্যের বীভৎসতা নিয়ে বেঁচে আছি। জ্যাক, আমার মত দুরদৃষ্ট এ জগতে আর কার?

আমার মঙ্গিন, আমার প্রিয়তম, আমার মত কুশ্রীকে বিয়ে করতে যে রাজী হয়েছে, সে শুধু এই টাকার জন্য! এই টাকাই আমার সর্ব্বস্ব, এই টাকাই আমার রূপ, আমার হৃদয়, আমার ভালবাসা! এই টাকার জন্যই মঙ্গিনের পায় আমি আশ্রয় পাচ্ছিলাম! তবু আমার এ বিশ্বাস আছে, একদিন আমার ভালবাসায় মঙ্গিনকে মুগ্ধ করব। আমি তাকে বোঝাব আমার হৃদয়ের কাছে, এ টাকার রাশি কত তুচ্ছ! কিন্তু তার পূর্ব্বে এই টাকা না হলে মঙ্গিনকে পাব না! সেই টাকা লুকিয়ে রেখে পৃথিবীর সকল সাধ, সকল আশা থেকে আমায় বঞ্চিত করো না! জ্যাক, ভাই, দয়া কর। আমার বিয়ের টাকা ফিরিয়ে দাও—তোমার এ উপকার জীবনে কখনো ভুলবো না!"

জ্যাক কোন উত্তর দিল না! কি উত্তর দিবে, সে? সে কাঁদিতেছিল! সে যে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, স্বপ্নেও এমন চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না, এ কথা কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করাইবে? জেনেদা, একবার তুমি জ্যাকের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ কর—দেখিবে, সেখানে শুভ ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন চিন্তা স্থান পায় না! বালক হইলেও জ্যাক একটু বুঝিল, আজ

নিজেকে কুরূপা বলিয়া তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য জেনেদা কতখানি হীনতা স্বীকার করিল! কিন্তু উপায় কি?

জ্যাককে কাঁদিতে দেখিয়া জেনেদা কহিল, "কাঁদছ, জ্যাক? তবে তোমার দয়া হয়েছে? জ্যাক তুমি ত নিষ্ঠুর নও! যে জেনেদার সুখের সম্ভাবনায় তুমি সহানুভূতি দেখিয়েছিলে, সেই জেনেদার সর্ব্বনাশ তুমি করতেই পার না—জ্যাক—" জেনেদা সস্নেহে জ্যাকের হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল, তাহার নত মস্তক ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কহিল, "জ্যাক, ভাই, টাকাটা তবে দাও—"

"কিন্তু জেনেদা, যথার্থ বলছি, আমি তোমার টাকা নিই নি!" জ্যাকের গণ্ড বহিয়া অশ্রুর নির্ঝর নামিল।

"না, না, ওকথা বলোনা, জ্যাক! আমি মরে যাব, মরে যাব। বল, চুপি চুপি বল, কার কাছে আছে! কিছু খরচ করে ফেলেছ, শুনেছি, তার জন্য লজ্জিত হবার কারণ নাই।"

"জেনেদা, যথার্থ বলছি। আমি টাকার কথা কিছুই জানিনা! আমি চুরি করি নি! তোমরা ভুল করছ! আমি নই—আমি নই! কি হলে তুমি বিশ্বাস করবে, আমি চোর নই! তোমরা সকলে এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে, আমায় চোর বলে সন্দেহ কেন কচ্ছ?"

জেনেদা উন্মাদের মত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "দেখ, আমার বিয়ের সকল আশা নির্ম্মূল হবে। তোমার পায় পড়ি—জ্যাক—"

জেনেদার নয়নে বর্ষার বন্যা লাগিল। অজস্র মিনতি ও অনুরোধে, সে জ্যাককে কাতর করিয়া তুলিল। কিন্তু জ্যাক—হতভাগ্য জ্যাক—সে কি করিবে! বহুক্ষণ অনুরোধ মিনতি করিয়াও যখন কোন ফল হইলনা, তখন জেনেদা গর্জ্জিয়া উঠিল, "বটে! বেশ, তবে কঠিন শাস্তি ভোগ কর, তুমি! জগতে সকলের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃসহ জীবন নিয়ে তুমি বেঁচে থাক—আমি তোমায় এই অভিশাপ দিলাম।"

জেনেদা নামিয়া ম্যানেজারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল, "কি হল?"

জেনেদা কোন উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি হইতে হতাশার এমন একটা গভীর হাহাকার ঠিকরিয়া পড়িতেছিল যে ম্যানেজার সকলই বুঝিল।

ম্যানেজার কহিল, "জেনেদা স্থির হও, কেঁদোনা, আইনের হাতে ওকে দেবার পূর্ব্বে টাকা আদায়ের চেষ্টা একবার আমরা করব। রুডিকের কাছে শুনেছি, ওর মার হাতে অনেক টাকা আছে। তাকে সব লেখা যাক। তারা যদি লোক ভাল হয় ত তোমার টাকা নিশ্চয় উদ্ধার হবে।"

একখণ্ড কাগজ লইয়া ম্যানেজার পত্র লিখিতে বসিল,

"মাননীয়াষু,—

আপনার পুত্র জ্যাক রুডিকের কন্যার বিবাহ পণের সঞ্চিত সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। আদালতের হাতে এখনও তাহাকে অর্পণ করি নাই। এই টাকার কতক সে ব্যয় করিয়াছে, বাকী কোথায়

রাখিয়াছে তাহা বহু চেষ্টাতেও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আপনাকে লিখিতেছি, আপনি এই টাকা যদি পাঠাইতে পারেন, তবেই আপনার পুত্রকে রুডিকরা ক্ষমা করিবে, নচেৎ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এই টাকার উপর বেচারা রুডিকের একমাত্র কন্যার জীবন নির্ভর করিতেছে। এই টাকা তাহার বৃদ্ধ পিতার আজীবন পরিশ্রমের সঞ্চয়। তিন দিন আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। রবিবার কিম্বা সোমবার বেলা দশটার মধ্যে যদি আপনার উত্তর না পাই, তাহা হইলে আসামীকে আদালতের হাতে দিতে বাধ্য হইব। ইতি ম্যানেজার।”

পত্রের নিম্নে ম্যানেজার আপনার নাম স্বাক্ষর করিল।

বৃদ্ধ রুডিক কহিল, “বড়ই দুঃখের কথা! এ চিঠি পড়ে মার বুক ভেঙ্গে যাবে, একেবারে!”

জেনেদা ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল, “থাক ভেঙ্গে! তার ছেলে আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছে—মা এখন তা পুষিয়ে দিক!”

হায়! যৌবন ও প্রেমের হৃদয়হীন, অন্ধ নির্ম্মমতা! পুত্রকৃত এই দারুণ দুষ্কর্ম্মের সংবাদে মার প্রাণে কি আঘাত লাগিবে, সে ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্যও জেনেদার অন্তরে স্থান পাইল না। বেচারা রুডিকের চিত্ত করুণা ও সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া আসিল—এমন সংবাদ শুনিলে রুডিক যে কখনো প্রাণে বাঁচিত না ইহা নিঃসংশয়!

রুডিকের মনে এইটুকু শুধু আশা রহিল, এ পত্র জ্যাকের মাতার নিকট না পৌঁছিতেও পারে! ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ, কতটুকু তাহার জীবন! অসংখ্য কত পত্রের সহিত একত্রে সে যাইবে—পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ ঘটিতে পারে! পৌঁছিবার সম্ভাবনা অল্পই! এমন ক্ষুদ্র পত্র পথে প্রায়ই হারাইয়া যায়। কিন্তু ম্যানেজার যে পত্র আজ ইদার নামে লিখিয়া পাঠাইল, অন্যান্য পত্রের সহিত সেখানিও যাত্রা আরম্ভ করিবে, নিশ্চয়! পিয়ন পত্র বাছিয়া ব্যাগে পুরিবে। সেই ব্যাগ ষ্টীমারে উঠিয়া, ট্রেণে চড়িয়া বহু ব্যাগের সহিত ট্রেণের ডাক-কেরাণীর হাতে পড়িবে। পরে বিস্তর পত্রের সহিত এ পত্র পোষ্টাফিসে জমা হইবে—তার পর বাড়িতে পৌঁছিবে! সেখানে পত্রখানি কেহ ছিঁড়িবে না, হারাইবে না, দগ্ধ করিবে না! ঠিকানায় মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বাহকের হস্তে দিবে। নষ্ট হইবে না। কেন? কারণ ইহা দুঃসংবাদ বহন করিয়া চলিয়াছে। দুঃসংবাদবাহক পত্রগুলার জীবন আশ্চর্য্য দীর্ঘ। পথে ইহাদিগের বিনাশ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এ পত্র সম্বন্ধে ঘটিলও তাহাই। ট্রেণ ষ্টীমার চড়িয়া কেরাণীর হাতে ঘুরিয়া পিয়নের ব্যাগে ফিরিয়া একদিন প্রভাতে এতিঁয়োতে এক পরিচ্ছন্ন কুটিরে ম্যানেজারের পত্র আসিয়া পৌঁছিল। কুটির-সম্মুখে ফটকের প্রাচীরে এক ফলক,—তাহাতে লেখা আছে,“আরাম-কুঞ্জ।” বৃষ্টির জল ও রৌদ্র মাখিয়া অক্ষরগুলা ঈষৎ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আকাশের খোকা-খুকী

(নোগুচি)

খোকা খুকী। ওগো পরী! ও অপ্সরী!
কি সুর মোদের আপন সুর?

পরী। স্বাধীন তোরা কিরণ-ডোরা
জনম তোদের হিরণ পুর;
হাওয়ার মত অব্যাহত,—
হাওয়ার গানই তোদের গান;—
গোলাপ ফুলের আমেজ মাখা
হাসির মত স্পন্দমান!

খোকা খুকী। ওগো পরী! ও অপ্সরী!
কি তাল মোদের নিজের তাল?

পরী। 'ভয়-জান-না'! 'নেই-ভাবনা'!
শূন্যে বোনো স্বপন-জাল!
হাওয়ার মত অব্যাহত,—
হাওয়ার তালেই তোদের নাচ,
নগ্ন পদে টাট্‌কা রোদে;—
হাস্‌ছে যেথায় পারুল গাছ।

খোকা খুকী। সুর শিখেছি তাল শিখেছি
এখন মোরা করব কি?
আলোর ধারা পড়্‌ছে ঝরে
মুঠায় ক'রে ধরব কি?

পরী। লক্ষ্মী মেয়ে! লক্ষ্মী ছেলে!
ঘুমাও এখন মার কোলে;
হাওয়ার খোকা হাওয়ার খুকী
দুল্‌ছে তারার হিন্দোলে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দুই দিক্

[পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ইংলণ্ডের একটি পুরাকথায় পাঠক মহাভারতেরই কদ্রু বিনতার দ্বন্দ্ব পাঠ করিবেন। দেশকাল পাত্র নির্ব্বিভেদে বিভিন্ন মানবসমাজের মধ্যে মানবজাতির মনোভাবের এই যে একটি পরম ঐক্য রহিয়াছে এইরূপ গল্পে—তাহা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেইজন্যই এইরূপ কাহিনীগুলি বারবার পড়িয়া শুনিয়াও পুরাতন হয় না।] ভাঃ সঃ

ইংলণ্ডের পুরাবৃত্তে সে আজ বহুদিনের কথা;—সে সময়ে শ্বেতদ্বীপের পথেঘাটে, যেখানে সেখানে সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহীগণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সেখানে তখন ঘরে ঘরে পৌত্তলিক পূজার্চ্চনা প্রচলিত ছিল। তাই বলিতেছি সে আজ অনেক দিনের কথা। সেই সময়ে ব্রীটনের একজন নৃপতি চারিটি প্রশস্ত পথের মিলন স্থানে জয়শ্রীদেবীর একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। জয়শ্রী দেবী দক্ষিণ হস্তে তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বাম হস্ত একখানি ঢালের উপর

অবস্থিত ছিল। ঢালখানির উপরিভাগ স্বর্ণে এবং নিম্নভাগটী রৌপ্যে মণ্ডিত। উপরিভাগে চির প্রসন্না জয়শ্রীদেবীর স্তুতিগান এবং নিম্ন ভাগে "পিক্‌ট এবং স্কটদিগকে অনুক্রমে চারিবার জয় করিবার গৌরবকাহিনী সুন্দর কারুকার্য্যের সহিত খোদিত ছিল।

একদিন দুইজন আর্ত্ত-সহায় অশ্বারোহী বীর (ইংরাজীতে যাহাদের "নাইট্‌" বলে) অস্ত্রশস্ত্রে বর্ম্মচর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া, পরস্পরের বিপরীত দিক হইতে, প্রায় ঠিক একই সময়ে সেই প্রতিমূর্ত্তিটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে প্রতিমূর্ত্তিটী দেখেন নাই। তাঁহারা ঢালখানির গাত্রে খোদিত বিবরণী এবং শিল্প-নৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া দুই জনেই রশ্মি-সংযত করিয়া অশ্বের গতিরোধ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণবর্ম্মে এবং অপর একজন শ্বেতবর্ম্মে শরীর আচ্ছাদন করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ মনোযোগের সহিত, প্রতিমূর্ত্তিটী অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহীটী বলিলেন, "ঢালখানি স্বর্ণের—।" শ্বেতবর্ণ অশ্বারোহীটী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বর্ণ ঢাল! সে কি কথা? আমার যদি চক্ষু থাকে ত ইহা রৌপ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।" কৃষ্ণবর্ম্ম অশ্বারোহী বলিলেন, "তোমার চক্ষু আছে কি না সে প্রমাণ আমার কাছে নাই তবে আমি যদি কখনও স্বর্ণ ঢাল দেখিয়া থাকি তবে সে এইখানি।" শ্বেতবর্ণ অশ্বারোহী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই প্রকাশ্য, অরক্ষিত স্থানে এতখানা সোনার ঢাল রাখিয়া দিয়া যাইবে ইহা খুবই বুদ্ধিমানের কথা বটে। নিজে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—এতদিনে যে, এই রৌপ্যনির্ম্মিত ঢালখানিই বা কেন লোকের লোভ আকর্ষণ করে নাই ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। তারিখ হইতে দেখিতেছি যে, আজ তিন বৎসর হইল এই প্রতিমূর্ত্তিটী এইখানেই আছে।"

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহী সে বিদ্রূপের হাস্য সহ্য করিতে পারিল না। বিষম বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হইল, মুখামুখী হইতে হাতাহাতি, কথাকাটাকাটি হইতে মাথাকাটাকাটির সংকল্প আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। অশ্বের মুখ ফিরাইয়া মধ্যস্থলে যুদ্ধের জন্য স্থান রাখিয়া কিয়দ্দূর পশ্চাৎভাগে হটিয়া গেলেন। তাহার পর, বড়শা গুলি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিয়া পরস্পরকে এমন প্রচণ্ড উন্মত্ত ভাবে আক্রমণ করিলেন যে কাহারও চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। ফলে দুইজনেই ক্ষতবিক্ষত, আহত হইয়া বাত্যোৎপাটিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া অচেতন অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন।

একজন উদারহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিত এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সেকালের যাজকেরা চিকিৎসকের কার্য্যও করিতেন। বনে প্রান্তরে উৎপন্ন নানা প্রকার উদ্ভিদের পীড়ানিবারণী শক্তি তাঁহারা জানিতেন। স্বহস্তে প্রস্তুত একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ উক্ত পুরোহিতের নিকট ছিল; ক্ষত স্থানে সেই অমোঘ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে তিনি যেন যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া

আনিলেন। তাহারা সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্য লাভ করিলে, পুরোহিত মহাশয় তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ বীর বলিলেন, "এই লোকটা কেন বলিবে যে ঐ ঢালখানি রূপার ?" শ্বেতবর্ণ বীর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঐ বা কেন বলিবে যে উহা সোনার ?" তার পর তাঁহারা যুদ্ধ ব্যাপার সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলেন।

পুরোহিত মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, তোমরা উভয়েই ঠিক বলিতেছ, আবার তোমরা উভয়েই ভুল বলিতেছ। যদি তোমরা কষ্ট করিয়া ঢালখানির দুই দিকই দেখিতে, তাহা হইলে, উত্তেজনার এত অপব্যয়, এত বৃথা রক্তপাত হইত না। এই ঘটনায় তোমাদের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একটী মহতী শিক্ষা লাভ হয়। আমি সমস্ত দেবতা, এবং বিশেষতঃ এই জয়শ্রীদেবীকে সাক্ষী করিয়া তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা ভবিষ্যতে আর কোন প্রশ্নের দুই দিক বিবেচনা না করিয়া কখনও বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না।"

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু।

পুনঃপ্রাপ্তি

(গল্প)

"একটু গরম দুধ খাও"—

"উঃ—না"—

"একটুখানি খাও—না হ'লে বাঁচবে কিসে।"

"না—না—আমায় খেতে বোলো না; আর আমি খাবো না। ও আমি ফেলে দিয়েছি; সে যেদিন যত্ন করে এনে দুধের বাটি আমার মুখের কাছে ধরেছিল—আমি খাইনি—রেগে ফেলে দিয়েছি- তার রক্তপাত করেছি। আমায় বিপন্ন দেখে আমার যত সব খোসামুদেরা কে কোথায় কর্পূরের মতো উবে গেল কিন্তু সে আমায় ছাড়েনি—ভায়ের মত আমার সেবা করেছে ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে—তাকে আমি চাইনি, ঘৃণায় দূর করেছি, তবু সে ফিরে ফিরে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছে!

সে কে জান? সে সরোজ, আমার সহপাঠী; একই মেসে আমরা দুজনে থাকতাম—গরীবের ছেলে ছিল সে—অতি নম্রভাবেই থাকৃতো। লোকে তার সুখ্যাতি করতো আমি হিংসায় জলে যেতাম। প্রাণপণে আমি চেষ্টা করেছি তাকে নীচে রাখতে—কিন্তু পরীক্ষায় বরাবরই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 'ক্রিকেট্' আমি ভাল খেলতাম—কিন্তু রণ্‌জির বিশ্বব্যাপী নামের মত ভারতজোড়া তার নাম ছিল। বম্বেতে সে আশ্চর্য্য খেলা দেখালে, ছোট বড় সকলেই তার সুখ্যাতি করলে—আমি সহস্র বৃশ্চিকের দংশনে জল্‌তে লাগ্‌লাম।—"

রোগী থামিল। তাহার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে চারিদিকে যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠ হইতে যে অনুতাপের আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছিল, বাতাস তাহার

প্রতিধ্বনি বহন করিয়া জগৎকে জানাইয়া দিতেছিল।

রোগী আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি তাকে কত না যন্ত্রণা দিয়েছি, কত জায়গায় কত অপমানিত অপদস্থ করেছি, মিথ্যা কত অপরাধ তার উপরে চাপিয়েছি—অম্লান বদনে সে সমস্ত সহ্য করেছে। অনেক অন্যায় কাজ আমি করেছি—সে সমস্ত দোষ নিজের উপরে নিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে। আমি তাকে যত দূরে ফেলেছি—সে ততই আমাকে নিকটে টেনে নিয়েছে।

খেলায় পা ভেঙ্গে, যখন চারিধারে আর্ত্ত-নাদের মাঝে একটি ক্ষুদ্র ক্যাবিনে একা আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিলাম—আমার এত বন্ধুবান্ধব—কৈ—কেউ ত আমায় সে সময় দেখ্‌তে আসে নি? কাতরধ্বনি পূর্ণ হাসপাতালের মধ্যে সে-ই আমার সেবা করেছে। রোগের যন্ত্রণায় আমি জানতে পারিনি কে সে।

অনেক রাত্রি—ক'টা জানি না—বিস্তীর্ণ ওয়ার্ডের এক কোণে একটি মাত্র 'ল্যাম্প' জ্বলছিল। আমার ক্যাবিনটা আমার মনের মতই সম্পূর্ণ অন্ধকার—একটু দুধ আমি খেতে চাইলাম। নিমেষের মধ্যেই 'সুইচ্‌টা' টেনে সে আমার মুখের কাছে 'ফিডিংকাপ্' ধরলে। বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোতে দেখলাম—সরোজ! ঘৃণায় রাগে আমার যন্ত্রণাবিকৃত মস্তিষ্কের সমস্ত রক্তটা আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো—কাপ্‌টা তার হাত থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়লাম—তার কপালে লেগে ঝন্ ঝন্ শব্দে সেটা মাটীতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল—তার কপাল কেটে রক্ত ছুটতে লাগলো। সে একটি কথাও বল্লে না—সামান্য বিরক্তির চিহ্ন মাত্রও তার মুখে দেখা গেল না সে আমায়, ধীরে ধীরে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লো। আমার কিন্তু সেটা সহ্য হলো না 'নার্স'কে' ডেকে সেই গভীর রাত্রে আমি তাকে দূর করে দিলাম।

ওঃ তখন আমি তাকে বুঝি নি—তাকে চিনি নি—আজ যদি সে থাক্‌তো তা'হলে অনুতাপের অশ্রুজলে আমার সে পূর্ব্ব ব্যবহার ধুয়ে ফেলতাম—তার পায়ে ধরে বলতাম—ভাই তুমি আমায় ক্ষমা কর—মোহে আমি মত্ত ছিলাম—তুচ্ছ তোষামোদ আমার বিবেচনাশক্তিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল, ধনগর্ব্ব আমায় অন্ধ করেছিল—আমি তোমায় চিনিনি—তোমায় বুঝিনি—আজ তোমায় চিনেছি, তুমি আমার কত আপনার তা আমি বুঝেছি—আমায় ক্ষমা কর—ভাই, মহান্ তুমি—তোমার কাছে আমার অনুতাপে ধৌত ক্ষুদ্র হৃদয়খানি এনেছি—তোমার উদার হৃদয়ে ধারণ কর।"

প্রলাপের ঘোরে বহুক্ষণ বকিয়া রোগী শান্তিভরে স্তব্ধভাব ধারণ করিল। পার্শ্বোপবিষ্ট লোকটি স্নেহ ও উৎকণ্ঠার সহিত তার মুখের দিকে অনিমেষে দেখিতেছিল। পিল্‌সুজের উপরে প্রদীপটা তার ক্ষীণ আলোকে ঘরের সেই উৎকণ্ঠ স্তব্ধভাবটিকে আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। ঘড়িটি অতি সাবধানতার সহিত টিক্ টিক্ করিতে-ছিল। সহসা বিষাদগম্ভীর সুরে বারটা বাজিল।—রোগী চমকিয়া চাহিল, তাহার রক্ত চক্ষু পার্শ্বের লোকটিকে চিনিল না, আতঙ্ক কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,

"কে তুমি ?"

উত্তর হইল —"আমি সরোজ"।

নীরোগের মত সে লাফাইয়া উঠিল, সুস্থ দেহীর মতই সোজা হইয়া বসিল--- বলিল ;

"মিথ্যা কথা সে ত অনেক দিন হ'লো ট্রেন কলিসনে মারা গিয়েছে"।

স। না—আহত হয়েছিলাম মাত্র !

রো। আহত হয়েছিলে ? তবে এতদিন কোথায় ছিলে ?

স। তোমাদের এই গ্রামে।

রো। কি রকম !

স। আমার মৃত্যুর গুজব আমার পক্ষে আত্মগোপনের বিশেষ সুবিধা কোরে দিয়েছিল।

রো। কতদিন তুমি এখানে আছ ?

স। সেই তোমার হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় থেকে।

রো। তা হলে তুমি সব জান ? আচ্ছা আমাকে কে খালাস করেছিল বল্‌তে পার ?

স। পরমেশ্বর। আমি তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের কারণ হয়ে ছিলাম মাত্র।

রো। তুমি আগে থেকেই সব জান্‌তে ?

স। না—তোমার গ্রেপ্তারের দিন আমি এখানে এসে উপস্থিত হই, পরে অনুসন্ধানে সব জেনেছি।

রোগী বিস্মিত;—নিস্পন্দ ! সরোজ পূর্ব্বের মত সেই রূপ স্নেহের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া। ধীরে ধীরে সে রোগীকে বলিল "শুয়ে পড়"। সে কথায় কান না দিয়া রোগী জিজ্ঞাসা করিল,

"আমার একটা সম্পত্তি দেনার জন্য নীলামে চড়ে, সেটা আবার আশ্চর্য্য রূপে আমারই দখলের মধ্যে এসেছে—কি করে জান ?"

স। তোমার স্ত্রীর নামে সে সম্পত্তি কিনে ছিলাম।

রো। তুমি ! পঁচিশ হাজার টাকা তুমি কোথায় পেলে ?

স। বাবা মরবার সময় আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন।

স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া রোগী আবেগে বলিল,

"কে তুমি আমার সরোজ !"

স। ভাই।

রো। ভাই !

স। হ্যাঁ—একই পিতার সন্তান আমরা।

রো। কি—কি !

স। ইচ্ছাপুর গ্রামে আমাদের পিতা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে একবার যান—সেখানে এক দরিদ্র বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিবাহ করে তাঁকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেন—ইনিই আমার মা ;—সমাজের ভয়ে বাবা তাঁকে ঘরে আন্‌তে পারেন নি—সেই খানেই রেখেছিলেন—আমার জন্মের এক বৎসর পরে মাতৃ আজ্ঞায় তিনি তোমার মাকে বিবাহ কর্‌তে বাধ্য হন,—তাঁর এই প্রথম বিবাহের কথা আজও পর্য্যন্ত সবাই জানে না।

রোগী ঝাঁপাইয়া সরোজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল,—

"দাদা !"

ঘরের প্রদীপটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি

বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিলেন,"আমি তোমাকে পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু তোমাকে মার এরূপভাবে প্রলুব্ধ করিয়াছিল যে, তুমি তখন আমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে অনুরোধ কর নাই। শীঘ্র দেহত্যাগের জন্য মার আমাকে প্ররোচিত করিয়াছে এবং আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। তোমার স্বপ্নের এই অর্থ।

এই স্থানের নিকটেই একটী স্তূপ। এই স্থানেই সহস্রপুত্র তাহাদের মাতাপিতাকে দর্শন করিয়াছিল। পুরাকালে এক ঋষি লোকালয় হইতে দূরে পর্ব্বতকন্দর ও উপত্যকায় বাস করিতেন। বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাসে তিনি স্বচ্ছসলিলা নদীতে অবগাহন করিতেছিলেন। এক হরিণী ঐ সময়ে জলপান করিতে আসিয়া একটী কন্যা প্রসব করে। অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী হইলেও কন্যার পদদ্বয় হরিণের ন্যায় হইয়াছিল। ঋষি এই কন্যাকে নিজ সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে ঋষি কন্যাকে অগ্নি সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। এতদুদ্দেশ্যে কন্যা অন্য এক ঋষির কুটীরে আগতা হইল। কিন্তু যে স্থানে কন্যার পদদ্বয় ভূমিস্পর্শ করিত, সেই খানেই পদ্ম-পুষ্পের চিহ্ন থাকিত। সে ঋষি এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া তাহাকে তাঁহার গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে তিনি অগ্নিদান করেন এবং কন্যা গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই সময়ে মৃগয়ার্থ বহির্গত ব্রহ্মদত্তরাজ পদ্মপুষ্পের চিহ্ন দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া,তিনি তাহাকে নিজ রথে করিয়া রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। দৈবজ্ঞগণ কন্যার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া রাজাকে নিবেদন করেন যে কন্যার গর্ভে সহস্র পুত্র জন্মিবে। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজার অন্যান্য রাজ্ঞীগণ কন্যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে কন্যা প্রতি পল্লবের উপর উপবিষ্ট এক একটী পুত্রসহ সহস্র পল্লব বিশিষ্ট একটী পদ্ম প্রসব করে। অন্যান্য রমণীগণ ইহাতে তাহাকে নিন্দা করিয়া এবং 'দুর্লক্ষণ বলিয়া পদ্মটীকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে।

উজ্জয়িনীরাজ একদিন ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া গঙ্গা-গর্ভে 'নীলমেঘাবৃত' একটী আধার তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং তন্মধ্যে সহস্র বালককে দেখিতে পাইলেন। উপযুক্তরূপে লালিত পালিত হওয়াতে তাহারা বিশেষ বলবান হইল। ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া, উজ্জয়িনীরাজ তাঁহার রাজ্যবিস্তৃতি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণের জয়ে উৎফুল্ল হইয়া তিনি বৈশালী আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মদত্তরাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন; তাঁহার সৈন্য উজ্জয়িনীরাজের নিকট নিশ্চিত পরাভূত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময়ে উপর্যুক্তা কন্যা মনে মনে উজ্জয়িনী-রাজের সহস্র বীরকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতে পারিয়া স্বামীকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে নিবেদন করিলেন—"উজ্জয়িনীরাজের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া এতদ্দেশীয় সকল বীরই ভীত হইয়াছে। কিন্তু আপনার দুর্ব্বলা স্ত্রী এই সকল বীরকে পরাভূত করিতে পারিবে।" রাজা এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে না পারায় ভয়ে অভিভূত হইলেন। কন্যা দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া যোদ্ধৃগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উজ্জয়িনীরাজের সহস্র বীর সসৈন্যে নগর অবরোধ করিলে কন্যা তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "বিদ্রোহিতা করিও না; আমি তোমাদের গর্ভধারিণী;—তোমরা আমারই সন্তান।" এই কথায় বীরগণ বলিতে লাগিলেন—"কি অসম্ভব কথা।" কন্যা তখন নিজ পয়োধর পীড়ন করিলে তাহা হইতে সহস্র ধারায় দুগ্ধ নির্গত হইয়া বীরগণের মুখে পড়িতে লাগিল। পরে তাহারা তাহাদের যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যগণকে গৃহগমনে আদেশ করিল এবং স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। উভয় দেশই সাতিশয় প্রীত হইল

এবং অধিবাসীরা নিরাপদে জীবনাতিগত করিতে লাগিল।

নিকটেই একটী স্তূপ। এই স্থানে তথাগত ব্যায়ামার্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানেও তাঁহার ভ্রমণের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই স্থানে তিনি সঙ্ঘকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিয়াছিলেন "পুরাকালে আমার মাতাকে দেখিয়া এই স্থানেই আমি আমার পরিবারবর্গের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলাম। ভদ্রকল্পের সহস্রবুদ্ধই পূর্ব্বোক্ত সহস্র যোদ্ধা।"

যেস্থানে বুদ্ধদেব ঐ 'জাতক' ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে ভগ্নাবশেষের উপরে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানে সময় সময় অত্যুজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয়। প্রার্থনা করিলে মনস্কাম পূর্ণ হয়। যে অলিন্দ-বিশিষ্ট গৃহে বুদ্ধদেব সমন্তমুখ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই গৃহের ভগ্নাবশেষ এক্ষণও দৃষ্ট হয়। সন্নিকটেই অন্য একটী স্তূপে আনন্দের শরীর রক্ষিত হইয়াছে।

নিকটে অনেকগুলি স্তূপ আছে—ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। এই স্থানে সহস্র বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। বৈশালী নগরাভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে বহুসংখ্যক পবিত্র চিহ্ন আছে। প্রতিপদ গমনে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; হ্রদগুলি বিশুষ্ক হইয়াছে এবং কেবল মাত্র অপ্রীতিকর চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

রাজধানী হইতে ৫০।৬০ লি উত্তর পশ্চিমে আমরা একটী বৃহৎ স্তূপে উপস্থিত হই। লিচ্ছবিগণ এই স্থানে বুদ্ধদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া তথাগত কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলে পর, বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিবেন এই সংবাদ অবগত হইয়া লিচ্ছবিগণ ক্রন্দন করিতে করিতে বুদ্ধদেবের সহগামী হইলেন। তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে অনুগমন করিলেও তাঁহারা সম্মত হইবেন না বুঝিতে পারিয়া, পৃথিবীপতি তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিবলে তৎক্ষণাৎ এক গভীর ও প্রশস্ত নদী সৃষ্টি করিলেন। অকস্মাৎ লিচ্ছবিগণের গতি প্রতিহত হইল। তথাগত স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের নিকট তাঁহার ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া অগ্রসর হইলেন।

বৈশালী নগরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দুইশত লি দূরে একটী প্রাচীন ও পরিত্যক্ত নগর আছে; এই নগরে কয়েকজন মাত্র অধিবাসী বাস করে। ইহাতে একটী স্তূপ আছে। বুদ্ধদেব এইস্থানে পুরাকালে বোধিসত্ত্ব, দেবতা ও জনসাধারণের হিতার্থে, মহাদেব নামে যখন তিনি রাজচক্রবর্ত্তীরূপে বাস করিতেন, সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী ছিলেন ও চতুর্ভুবন শাসন করিতেন। নিজ অঙ্গে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখিয়া ও জীবন অনিত্য বুঝিতে পারিয়া তিনি রাজসিংহাসন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিধান এবং অধ্যয়ন রত হইলেন।

নগর হইতে ১৪।১৫ লি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে যাইয়া আমরা একটী বৃহৎ স্তূপে উপস্থিত হই। এই স্থানেই সাত শত জ্ঞানী ও ঋষির সম্মিলন হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের একশত দশ বৎসর পরে বৈশালীস্থ কয়েকজন ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল। এই সময়ে যশোদ আয়ুস্মৎ কোশলে, সম্ভোগ আয়ুস্মৎ মথুরা প্রদেশে, রেবত আয়ুস্মৎ কান্যকুব্জে, সাল আয়ুস্মৎ বৈশালীতে, ও পূজস্থমীর আয়ুস্মৎ সলরিভু দেশে বাস করিতেছিলেন। আনন্দের এই সকল শিষ্যই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ত্রিপিটকে পারদর্শী ছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে যশোদ আয়ুস্মৎ সকল বিজ্ঞ ও ঋষিগণকে বৈশালীতে সম্মিলিত হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাত শত পূর্ণ হইতে একজন মাত্র বাকী ছিলেন। ফুসিহুমিলো নিজ ঐশ্বরিক ক্ষমতায় এই বিষয় অবগত হইয়া সঙ্ঘমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন সম্ভোগ সঙ্ঘমধ্যে নিজ দক্ষিণ বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"সমবেত জনসঙ্ঘ নিস্তব্ধ এবং বিনয়নম্র হউন। পুরাকালে পৃথিবীপতি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার নির্ব্বাণের পরে, বহু বৎসর ও মাস অতিবাহিত হইয়াছে, তত্রাচ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।

কিন্তু এক্ষণে বৈশালীর ভিক্ষুগণ অমনোযোগী হইয়াছে এবং আদেশ প্রতিপালন করিতেছে না। তাহারা দশপ্রকারে বুদ্ধদেবের আদেশ ভঙ্গ করিতেছে। মহাশয়গণ সকল বিষয়ই অবগত আছেন; আপনারা ধার্ম্মিক আনন্দের শিক্ষাবলী অবগত আছেন; বুদ্ধের প্রতি ভক্তিবশে আপনারা পুনরায় তাঁহার আদেশ প্রচার করুন।"

ইহাতে সমবেত জনসঙ্ঘ অত্যন্ত অভিভূত হইয়া ভিক্ষুগণকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দেন এবং তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন।

দক্ষিণ দিকে ৮০।৯০লি যাইয়া আমরা শ্বেতপুর সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। ইহার অভ্রভেদী চূড়াগুলি প্রকাণ্ড ও গোলাকার। যতিগণ ধার্ম্মিক ও শিষ্ট এবং মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সঙ্ঘারামের নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে।

নিকটে রাজা অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ। এই স্থানেই বুদ্ধদেব মগধ যাত্রাকালীন উত্তরাভিমুখী হইয়া বৈশালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; শ্রমবিনোদনের জন্য তিনি এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণও সেই চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

শ্বেতপুর হইতে প্রায় ৩০লি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গঙ্গার উভয় পার্শ্বেই স্তূপ রহিয়াছে। এই স্থানে মহামতি আনন্দ নিজ শরীর দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আনন্দ তথাগতের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, বুদ্ধিমান ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরে, তিনি মহাকশ্যপের স্থলাভিষিক্ত হইয়া মনুষ্যের শিক্ষক ও পথ পরিদর্শক হইয়াছিলেন। তিনি মগধের কোন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন; ইতস্ততঃ ভ্রমণকালীন তিনি এক শ্রমণকে অনিপুণ ভাবে একটী সূত্র আবৃত্তি করিতে শুনিতে পাইলেন। আনন্দ উহা শ্রবণ করিয়া করুণাপরবশ হইয়া শ্রমণের ভুল সংশোধনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হাস্যসহকারে শ্রমণ উত্তর করিল—"আপনি বৃদ্ধ; আপনার অর্থ ভ্রমপূর্ণ। আমার শিক্ষক সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আমি তাঁহারই নিকট হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং ইহাতে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা নাই।" আনন্দ নিস্তব্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আমার কিয়দ্দিবস পৃথিবীতে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্যগণ পাপাসক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের শিক্ষা দেওয়া সুকঠিন। আর পৃথিবীতে বাস করা অনাবশ্যক; আমি শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব।" তিনি মগধ পরিত্যাগ করিয়া বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। এই সময়ে মগধরাজ আনন্দের প্রস্থানের সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং রথ ও সৈন্যসামন্তসহ তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহার কোটী কোটী সৈন্য নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলে বৈশালীরাজ আনন্দের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া, তিনিও সসৈন্যে যথাসত্বর আনন্দের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অক্ষৌহিনী নদীর অপর তীরে সমবেত হইল এবং উভয় সৈন্যই সুসজ্জিতাবস্থায় নদীর উভয় তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ উভয় পক্ষে যুদ্ধের ও সৈন্যহানির আশঙ্কা করিয়া আনন্দ নৌকা হইতে উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া নিজ ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ব্বাণলাভ করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অস্থি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া, এক অংশ নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে ও অন্য অংশ নদীর উত্তর পার্শ্বে পতিত হইল। এবম্প্রকারে উভয় রাজাই নিজ নিজ অংশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া, অস্থিকে যথোপযুক্ত পূজা করিতে লাগিলেন।

এই স্থান হইতে প্রায় পাঁচশত লি উত্তর-পূর্ব্বদিকে যাইয়া আমরা ভৃজ্যি রাজ্যে উপস্থিত হই।

এই রাজ্যের পরিধি প্রায় চারি হাজার লি। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত; ইহার উত্তর দক্ষিণ অপ্রশস্ত।

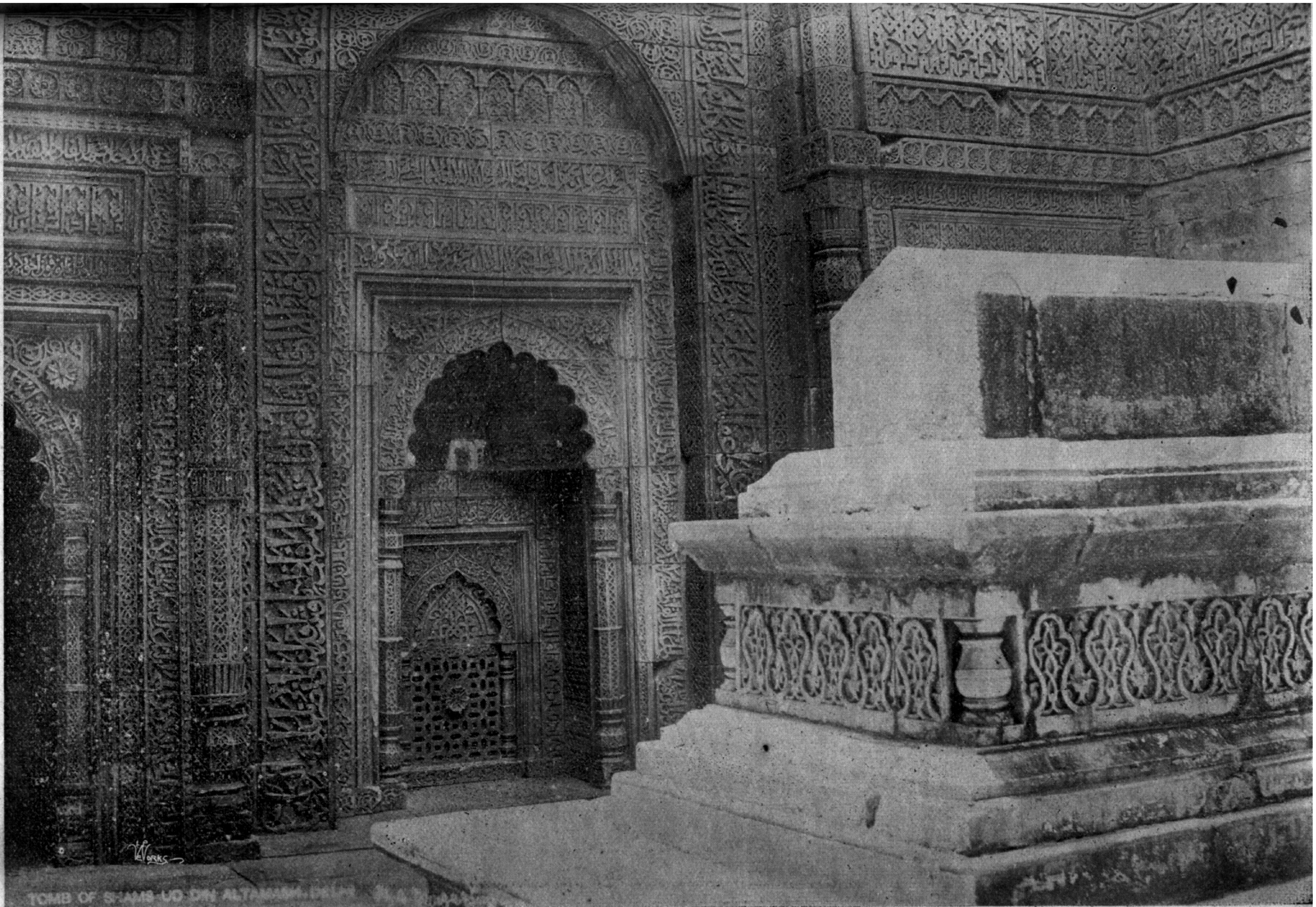
ভূমি উর্ব্বরা এবং দেশে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। জল বায়ু শৈত্যপ্রধান; অধিবাসীরা চটুল। প্রায়ই বিধর্ম্মী; অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। দেশে প্রায় দশটী সঙ্ঘারাম আছে; উহাতে সহস্রের কম যতি বাস করেন। উহারা হীন ও মহা উভয় যানই নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করে। অনেকগুলি দেবমন্দির ও বিধর্ম্মী আছে। রাজধানী চেনশুনা নামে আখ্যাত। রাজধানী প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। নগরাভ্যন্তরে এখনও প্রায় তিন সহস্র গৃহ আছে; ইহাকে একটী গ্রাম বা নগর বলা যাইতে পারে।

নদীর উত্তর-পশ্চিমে একটী সঙ্ঘারাম আছে। মাত্র কয়েকজন যতি বাস করেন; কিন্তু ইঁহারা অধ্যয়নশীল, সৎ ও সম্ভ্রান্ত।

এই স্থান হইতে নদীর ধার দিয়া যাইয়া আমরা ত্রিশ ফুট উচ্চ একটী স্তূপে উপস্থিত হই। ইহার দক্ষিণে গভীর জলাশয়। দয়াবান পৃথিবীপতি এই স্থানে কয়েকটী ধীবরকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জীবিত অবস্থায় এই স্থানে পাঁচ শত ধীবর বাস করিত। এক সময়ে তাহারা অষ্টাদশ মস্তকবিশিষ্ট এক বৃহৎ মৎস্য ধৃত করে। মৎস্যের প্রত্যেক মস্তকে দুইটী করিয়া চক্ষু ছিল। ধীবরগণ ইহাকে হত্যা করিতে অভিলাষী হয়। তথাগত সেই সময় বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার দিব্যচক্ষু দ্বারা সকল বিষয় অবগত হইয়া করুণাপরবশ হইলেন এবং এই সুযোগে ধীবরগণকে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য তিনি সমবেত জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "বৃজ্জি দেশে একটী বৃহৎ মৎস্য আছে; যাহাতে ধীবরগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তজ্জন্য আমি ঐ মৎস্যকে পরিচালিত করিতে চাই। তোমরা এ সুযোগ পরিত্যাগ করিও না।"

সমবেত জনসাধারণ এই সংবাদে নিজ নিজ ঐশ্বরিক শক্তিবলে আকাশমার্গ দিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেব স্বকীয় প্রথানুযায়ী উপবেশন করিলেন এবং ধীবরগণকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন,—"ঐ মৎস্য হত্যা করিও না। আমি আমার ঐশ্বরিক শক্তিবলে উহাকে উহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিব এবং সেজন্য উহাকে আমি মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিবার শক্তি ও মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিব।" তথাগত মৎস্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্ব্ব জন্মের কি পাপের জন্য তুমি এই কদাকার দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ?" মৎস্য উত্তর করিল—"পূর্ব্বকালে আমি আমার পুণ্যবলে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। উচ্চবংশীয় বলিয়া আমি অপরকে ঘৃণা করিতাম; জ্ঞানান্ধ হইয়া আমি সকল পুস্তক ও নিয়মাবলী তাচ্ছিল্য করিতাম এবং অহঙ্কার বলে আমি বন্ধুগণকে কুৎসিৎ বচনে অভিহিত করিতাম, যতিগণকে পশুর সহিত তুলনা করিতাম; এই কারণে আমি এইরূপ দেহ ধারণ করিয়াছি। যাহা হউক, পূর্ব্বজন্মের যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যবলে আমি বুদ্ধদেবের পৃথিবীতে আবির্ভাবকালীন জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহার পুণ্যময় দেহ নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ ও আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপ নিবেদন করিতে সক্ষম হইয়াছি।"

তথাগত তাহাকে দীক্ষিত করিলে মৎস্য দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। ইহাতে সে তাহার অবয়ব নিরীক্ষণ ও কি কারণে সে ঐরূপ দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল কথা স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে সে বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞ হইল এবং সকল দেবগণের সহিত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। পরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও পৃথকভাবে তাঁহাকে মূল্যবান পুষ্প ও গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা পূজা করিতে লাগিল। পৃথিবীপতি, ধীবর-গণকে এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে উপদেশ দিলে এবং তাহাদের সম্মুখে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলে, তাহারা আলোকপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। অনুতাপান্বিত হইয়া তাহারা তাহাদের জাল নষ্ট করিয়া, নৌকা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং কৌষেয় পরিধান করিয়া শীঘ্রই অর্হত্ব প্রাপ্ত হইল।


TOMB OF SHAMS-UD-DIN ALTAMASH, DELHI



রায় পিথোরার মন্দির



যন্ত্র-মন্ত্র

এই স্থান হইতে প্রায় একশত লি উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইয়া আমরা একটী প্রাচীন নগরে উপস্থিত হই। এই স্থানে রাজা অশোকনির্ম্মিত একশত ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। বুদ্ধদেব এই স্থানে ছয় মাস ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেবতাগণকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উত্তর দিকে ১৪০ কি ১৫০ হস্ত দূরে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ; ভিক্ষুগণের হিতার্থে বুদ্ধদেব এই স্থানে নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমে অন্য একটী স্তূপে তথাগতের নখ ও কেশ রহিয়াছে। পুরাকালে যখন তথাগত এই দেশে বাস করিতেন, তখন নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও নগর হইতে অধিবাসীবর্গ সমবেত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থে পুষ্প বিকীর্ণ করিত এবং চতুর্দ্দিকে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিত।

এই স্থান হইতে ১৪০০।১৫০০ লি উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইবার সময় আমরা পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা প্রবেশ করিয়া নেপাল পৌছি।

নেপাল রাজ্য ৪০০ লি পরিধিবিশিষ্ট এবং তুষার পর্ব্বতে অবস্থিত। রাজধানী প্রায় ২০ লি। পর্ব্বত ও উপত্যকায় দেশ সমাচ্ছন্ন। দেশে প্রচুর শাকসবজী ও ফলপুষ্প পাওয়া যায়। এই দেশে লোহিত তাম্র ও যক্ ও জীবঞ্জীব পক্ষী পাওয়া যায়। ইহারা লোহিত তাম্রনির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবসায়বাণিজ্যে ব্যবহার করে। জলবায়ু অত্যন্ত শৈত্যগুণবিশিষ্ট; অধিবাসীরা ক্রূর, হিংস্র, অধার্ম্মিক ও প্রবঞ্চক। তাহারা অশিক্ষিত কিন্তু শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী; ইহাদের দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। বিধর্ম্মী ও বিশ্বাসী একত্র বাস করে। সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির ঘন সন্নিবিষ্ট। প্রায় দ্বিসহস্র যতি আছে, ইহারা উভয় স্থানান্তর্ভূত।* বিধর্ম্মিগণের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। রাজা ক্ষত্রিয় এবং লিচ্ছবি বংশীয়। তিনি শিক্ষিত, সৎ এবং গম্ভীর। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মণ নামে এক বিদ্বান ও কৌশলী রাজা ছিলেন। তিনি "শব্দবিদ্যা" সম্বন্ধে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তিনি বিদ্বান ও ধার্ম্মিককে সম্মান করিতেন এবং তাঁহার যশঃসৌরভ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও হ্রদ আছে। অগ্নি নিক্ষেপ করিলে ইহা হইতে অগ্নি উত্থিত হয়। ইহাতে অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হইয়া, রূপান্তর গ্রহণ করে।

আমরা বৈশালী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এবং গঙ্গা পার হইয়া মগধে উপস্থিত হই।

(সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

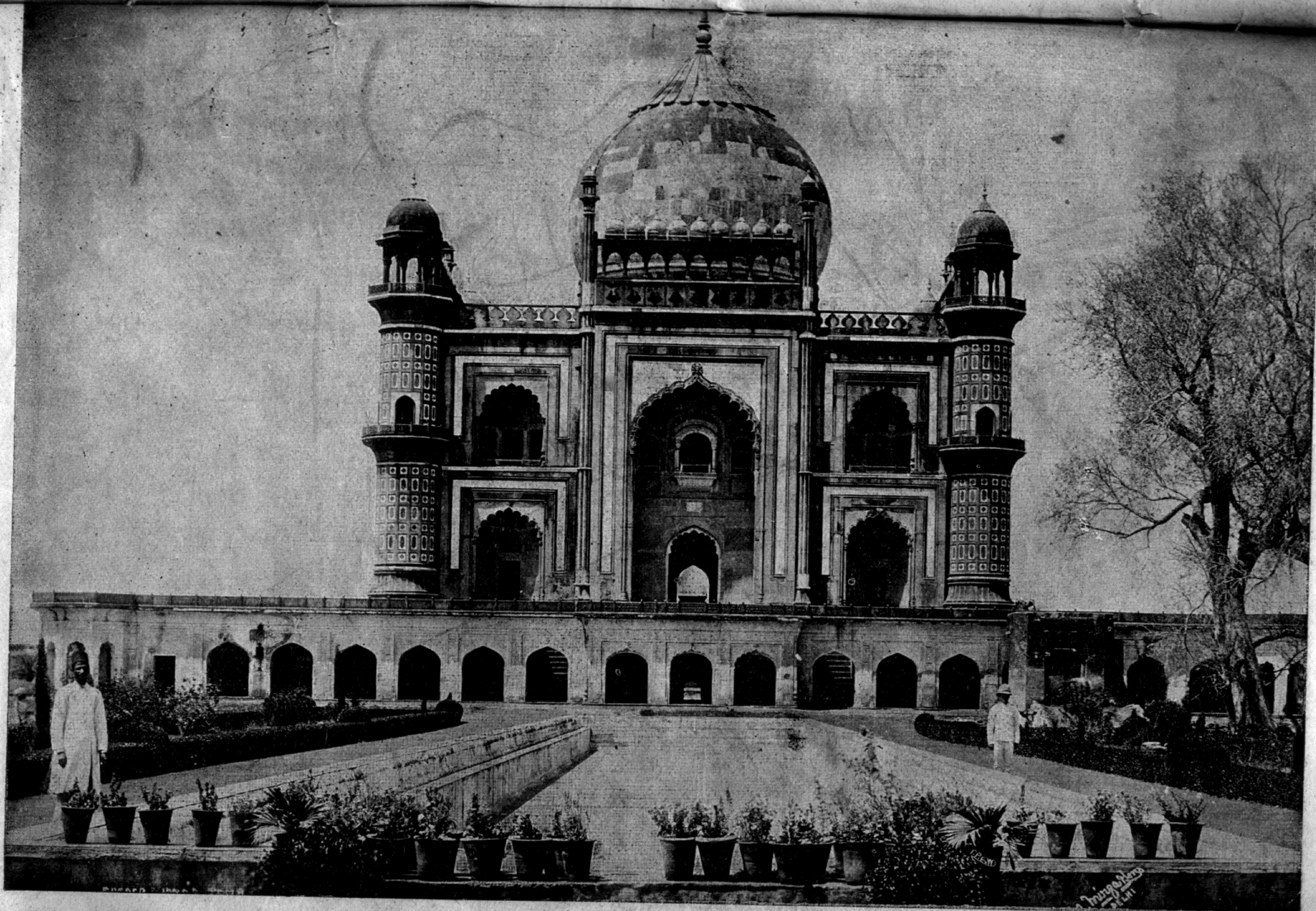
সাময়িক প্রসঙ্গ

লর্ড হার্ডিং।—লর্ড মিণ্টোর অবসর গ্রহণের পর লর্ড হার্ডিং রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া যখন আসিয়াছিলেন তখন কে জানিত সামান্য এক বৎসর সময়ের মধ্যে রাজ্যশাসন প্রণালীর এত পরিবর্ত্তন হইবে? আজ পাঁচ বৎসরের অধিককাল বঙ্গভঙ্গের যে অন্যায়-বিধান অপরিবর্ত্তিত ছিল যাহা পরিবর্ত্তনের আশাও আমাদের পক্ষে অন্যায় দাবী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল, স্বয়ং সম্রাট ভারতবর্ষে আসিয়া সেই বিধান প্রত্যাহরণ করিবেন, বঙ্গবাসীর এতদিনের আবেদন রক্ষা করিয়া বেদনা নিরাকৃত করিবেন, পুরাতন দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইবে ইহা কেহ স্বপ্নেও মনে করে নাই। রাজপ্রতিনিধি হার্ডিং মহোদয়ের যত্নে এবং একাগ্র চেষ্টার ফলে

যে বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হইয়াছে সে বিষয় কাহারো সন্দেহমাত্র নাই। এই মঙ্গলবিধানের জন্য বঙ্গবাসী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অবধি লর্ড হার্ডিং উদার ন্যায়বুদ্ধি এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার ইদ্ দাঙ্গাহাঙ্গামা তাঁহার প্রবল শাসনের বলে প্রশমিত হয়, হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি এবং বিরূপ ভাবের প্রসারে যাঁহারা উৎসাহদাতা ছিলেন তাহাদিগকে দমন করিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। স্কুলের ছাত্রদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাদের দৈনিক জীবন কেমন ভাবে অতিবাহিত হয় তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তিনি স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী শাসনসময়ে তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাতে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত উদারতা এবং দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। সকলেই আশা করিয়াছিল এমন নিপুণবুদ্ধি এবং দক্ষ কার্য্যকুশল উদার শাসনকর্ত্তা মান্যবর গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষার বিল কখনই প্রত্যাখ্যান করিবেন না কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইয়াছে। যে কারণেই হৌক ভারত গভর্ণমেণ্ট অঙ্কুরেই শিক্ষা বিলটিকে চাপিয়া দিয়াছেন। তবে দেশবাসীর যদি যত্ন ও অধ্যবসায় থাকে তবে এ ন্যায্য দাবী সত্বরে হউক বিলম্বে হউক পূরণ করিতে হইবেই।

গত ২৭শে মার্চ্চ লর্ড হার্ডিং সস্ত্রীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি এখনও ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ সমগ্র ভারতের মঙ্গল চেষ্টায় রত থাকিবেন—তবুও রাজপ্রতিনিধি আর এখানে আসিবেন না—তাহাতে আমরা দুঃখিত। এখন হইতে দিল্লী নূতন রাজধানী হইতে চলিল—পুরাতন দিল্লী অল্পদিনের মধ্যেই নূতন সংস্করণে নূতন হইয়া উঠিবে; হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই পুরাতন লোকে এ দিল্লীকে তাহাদের দিল্লী বলিয়া চিনিতেই পারিবে না। আমরা পুরাতন দিল্লীর অনেকগুলি ছবি গত মাঘ সংখ্যায় দিয়াছি—আরও কয়েকখানি এই সংখ্যায় দিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থানে স্থানে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় তাহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না এবং সেত আনন্দেরই বিষয়; ইংলণ্ডের মত অল্প পরিসর দেশে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তবে সেখানকার সহিত এখানকার শিক্ষা প্রণালীর বিস্তর প্রভেদ। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্র যে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। এমন কি, ভারতবর্ষ হইতে সে দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিতে পারিলে সেখানে গিয়া যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে-শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়। এদেশে প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের সহিত প্রত্যেক স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত। এখন পর্য্যন্ত ঢাকা হইতে ছাত্রগণ আসিয়া কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিন্তু সেখানে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানকার সমস্ত প্রবেশিকা বিদ্যালয় তাহার অধীন করিয়া দিলে কোন ছাত্রই আর ইচ্ছামত কলিকাতায় আসিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভের সুবিধা পাইবে না। যদি নূতন বিশ্-



সফদার জঙ্গের কবর

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে গুলি তাঁহাদের স্বদেশীয় নিয়মে করিলে ভাল হয়। তাহা না করিয়া বঙ্গবিহারউড়িষ্যা ও পূর্ব্ব বঙ্গের ছাত্রগণকে যদি আপন প্রাদেশিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয় তবে বলিতে হইবে যে বঙ্গ ভঙ্গের অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। হার্ডিং মহোদয় আশা দিয়াছেন যাহাতে সমগ্র বঙ্গের মধ্যে কোনরূপ বিচ্ছেদ ঘটে এমন কোন কাজই গভর্ণমেণ্ট করিবেন না, কিম্বা করিবার কল্পনা করেন না। এই আশ্বাস যাহাতে নিষ্ফল না হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নূতন শাসনকর্ত্তা। যুক্ত বঙ্গের প্রথম শাসনকর্ত্তা বঙ্গের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির বিধাতা লর্ড কারমাইকেল গত ১লা এপ্রিল চৈত্রের শুভ পূর্ণিমা তিথিতে শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লর্ড কারমাইকেল মহোদয় কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাগত অভিনন্দনের উত্তরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার উদার সরল সাধু হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার শাসনকালে যে দলাদলি, পক্ষপাত, অন্যায় উৎপীড়ন হইবে না এমন আশা হইতেছে। কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বঙ্গের প্রথম শাসনকর্ত্তার দুরূহ কার্য্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এই কঠিন কার্য্যের ভার যে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে তাহা তাঁহার কথা হইতেই সম্যক উপলব্ধি হয়। তিনি বলিয়াছেন আমি পদগৌরবের বা ঐশ্বর্য্যের মোহে এ কঠিন ভার গ্রহণ করি নাই, অন্যে যাহাই মনে করুক আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র সম্রাট দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে এই নূতন পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে,—তিনি যখন আমাকেই এই দুরূহ ভার গ্রহণ করিতে স্বয়ং অনুরোধ করিলেন তখন তাহা শিরোধার্য্য করাই আমার বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। আমার শাসনকালের পাঁচ বৎসর সুদীর্ঘ সময় শেষ না হইলে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার তোমরা করিতে পারিবে না, কিন্তু পাঁচ বৎসর কেন হয়ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশা করি আমি তোমাদিগকে আমার কার্য্যনীতি দেখাইতে পারিব;—যদিও আমি আমার নূতন জটিল কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তবুও আমি শিক্ষা করিতে ত্রুটি করিব না, এবং তোমাদের সাহচর্য্য আমার কর্ত্তব্য ভার ক্রমে সহজ করিয়া দিবে।

"আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় সম্রাট তাঁহার উপস্থিতিকালে অনেক নূতন আশার উদ্রেক করিয়াছেন, এই আশা সফল করার কর্ত্তব্য আমাদেরই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। যাহাতে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ স্নেহের বন্ধনে দৃঢ়তর হয় তাহার সাধন আমাদিগকেই করিতে হইবে।

আমি জানি এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহাতে ভারতবর্ষীয়ের সহিত ভারত-বর্ষীয়ের, ভারতবর্ষীয়ের সহিত ইংরাজের বিভিন্নতা পরিস্ফুট করিয়া তোলা হয়, কিন্তু আমি ইহাও জানি এমন সকল দৃষ্টান্তও দুর্লভ নহে যাহাতে এ ভেদবুদ্ধি দূরীকৃত করিয়া মিলন এবং সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে।



লর্ড কারমাইকেল



লেডি কারমাইকেল

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্বরূপে যাহাতে এই সাম্য এবং মৈত্রীভাব দিন দিন প্রসার লাভ করে এবং ভেদবুদ্ধি পরাহত হয় তাহাই আমার প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করিব। এই কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই আমি বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছি, প্রত্যেক কার্য্যে কেবলমাত্র শাসয়িতা নয় শাসিতের পক্ষ হইতে সম্যক বিচার করিতে আমি চেষ্টা করিব, সকল কর্ত্তব্য, সকল চেষ্টা আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় সংসাধন করিবার সাধনাই আমার একান্ত লক্ষ্য হইবে।

যদি আমি ইহা করি, তবেই কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের, ভারতবর্ষ এবং ভারত সম্রাটের প্রতি আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইল মনে করিব। ইহার অধিক করিবার আমার সাধ্য নাই, তোমরাও তাহা প্রত্যাশা করিও না। তবে ইহা অপেক্ষা স্বল্প কিছু তোমরা আশা করিবে না; ইহা অপেক্ষা হীন কিছু তোমাদিগের গ্রহণ-যোগ্য নয় তাহাও আমি জানি।” বাক্যই মানব চরিত্রের প্রধান পরিচায়ক, এই কথাগুলির মধ্যে যে সহৃদয়তা যে দৃঢ়তা, যে সৎপুরুষোচিত কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এই নূতন শাসন কর্ত্তার প্রতি আমাদের মন স্বতঃই সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত আকৃষ্ট হইয়া উঠে। বাক্য ও কার্য্যের একতা বিধান করিয়া তিনি স্বয়ং গৌরবান্বিত হউন বঙ্গদেশকে উন্নত, শান্তিসুখময় করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমরা সহৃদয় লর্ড এবং লেডি কারমাইলকে আমাদের আন্তরিক স্বাগত—

লেডি কারমাইকেল। বঙ্গের নূতন শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা করপোরেশনের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে যে সহৃদয়তা, যে অপক্ষপাত ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার পত্নী লেডি কারমাইকেলও মান্দ্রাজ মহিলাদিগের বিদায় সম্বর্দ্ধনার অভিনন্দনে সেই একইরূপ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন আমরা প্রতীচ্য-দেশবাসীরা অনেক বিষয় যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, প্রাচ্যবাসী ভারতবর্ষীয় আপনারা হয়ত তাহা ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা যদিও অবশ্যম্ভাবী, তবুও এক বিষয়ে আমাদের উভয়ের মনোভাব যে অভিন্ন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই দেশের সন্তান আপনারা মাতৃভূমিকে ভালবাসিয়া থাকেন; তাহার উন্নতি, সুখশান্তি, আপনাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি এবং বিট্রিশ সম্রাটের অধীন ভারতবর্ষের অধিবাসী আমরাও তাহার সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাহার উন্নতি সুখ শান্তি যে আমাদেরও জীবনের প্রার্থনীয় বস্তু সে সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য।

এই উন্নতি সাধনে আপনাদের ও আমাদের সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও আমরা স্ত্রীলোক, অনেক কর্ত্তব্য আমাদের আয়ত্তের অতীত তবুও আমাদের অনেক কাজ সাধ্যায়ত্ত; আমরা আমাদের চারিদিকের জীবন সুখশান্তিময় করিতে পারি, আর্ত্ত আতুরকে সান্ত্বনা দেওয়া আমাদেরি কর্ত্তব্য, উভয় জাতির প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করা আমাদেরই সাধ্য। এ কর্ত্তব্য সাধনে যখন ভারতবর্ষীয়

করিতে হইবে তখন পরস্পরকে ভালরূপে জানিবার ও বুঝিবার উপায় করিতে হইবে। একদেশে এক ভাবে শিক্ষিত আত্মীয়, ব্যক্তিকেও বোঝা অনেক সময় কঠিন; সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শে শিক্ষিত ভিন্নদেশবাসীকে সম্যক বুঝিতে পারা যে আরও কঠিন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু ইচ্ছা এবং চেষ্টা যদি থাকে তবে পরস্পরের নিকট পরিচিত এবং প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কখনই দুঃসাধ্য হইবে না। আমার একান্ত আশা, বৎসরের পর বৎসর কালের গতি যেমন অগ্রসর হয়, আমাদের উভয় জাতির প্রীতি এবং সহানুভূতি সেইভাবে বর্দ্ধিত এবং প্রসারিত হইবে"। ইনি আমাদের নবপ্রাপ্ত নূতন শাসনকর্তার যোগ্য সহধর্ম্মিণী, উভয়ের চেষ্টা এবং সাহচর্য্যে বঙ্গদেশে শাসয়িতা এবং শাসিতের জীবনে একটি নূতন আনন্দময় যুগের আবির্ভাব হইবে বলিয়া আশা হয়।

চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সম্মিলনী।

গত ৬ই এবং ৭ই এপ্রিলে চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সকলেরি স্মরণ আছে বঙ্গভঙ্গের পর বরিশালে এই প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনের সমস্ত আয়োজন হইয়াও প্রথম দিনই তৎকালের নূতন পূর্ব্ববঙ্গীয় ছোটলাট বাহাদুর স্যার বামফিল্ড ফুলারের আদেশ ক্রমে তখন তাহা বিধ্বস্ত হইয়া রহিত হয়। সে সময় শ্রীযুক্ত রসুলকে সভাপতির পদে, নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলনীর কার্য্য-বিভ্রাট ঘটায় এই সম্মানিত পদের কর্ত্তব্য বহন ও সম্পাদন করিবার সুযোগ তাঁহার সম্মিলনীর সভাপতির পদে পুনরায় তাঁহাকেই বরণ করা বড় শোভন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসুল যথার্থ স্বদেশ ভক্ত, তাঁহার চক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁহার স্বদেশের সন্তান, উভয়ের মধ্যে সকল বিরোধ বিরূপ ভাব দূর করিয়া ঐক্য এবং প্রীতি স্থাপনা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত। এমন মহৎ হৃদয় ব্যক্তি যে বঙ্গভঙ্গের সম্মিলনীর সভাপতির পদে বরিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য তাহা বলাই বাহুল্য। সভাপতি তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রথমে বঙ্গভঙ্গ রহিত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, — আইনসঙ্গত উপায়ে অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তার সহিত যদি রাজপুরুষদিগের নিকট ন্যায্য দাবী জ্ঞাপন করা হয় তাহা কখনো ব্যর্থ হয়না; রাজ অনুশাসনে ভঙ্গবঙ্গ পুনরায় যুক্ত হওয়াই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। —সম্রাট উদার হৃদয় শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের অধিকতর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল যে অপক্ষপাত ন্যায় বিচারে বিজেতা এবং বিজিতের মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষা করিবেন না তাহা তাঁহার জীবনের পূর্ব্বকৃত কার্য্যাবলি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গত ছয় বৎসর কাল বঙ্গদেশের উপর দিয়া অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায়বিচার ও অশান্তির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। উন্নতি, শিক্ষা, বাণিজ্য, সকল শুভ অনুষ্ঠান এবং চেষ্টা এই প্রবল বাধা সত্ত্বে প্রতিহত হইয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। নূতন শাসনকর্ত্তার অধীনে শান্তি প্রসারিত হইয়া দিন দিন দেশের উন্নতি ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইবে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সভাপতি মহাশয়, বড়লাট

বলিয়াছেন, যখন লর্ড রুক্ এবং লর্ড হার্ডিং উভয়েই স্বায়ত্তশাসন প্রসার বিষয়ে সহানুভূতি জানাইয়াছেন তখন বঙ্গবাসীর স্বায়ত্তশাসন প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না, এবং যেদিন প্রজাবর্গের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে সেই দিন ভারতবাসীর উচ্চতম আকাঙ্খা এবং ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ, সুন্দর এবং সফল হইবে। বঙ্গবাসী কেন ভারতবাসী যাহাতে স্বদেশরত না ভুলিয়া যান, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি কল্পে কায়মনোবাক্যে সতত চেষ্টিত থাকেন সে জন্য সভাপতি সভাস্থ সকলকে বারম্বার সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিস্তার, লুপ্তপ্রায় চারু শিল্প সকলের পুনরুদ্ধার, জাতিবর্ণ উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে শিক্ষার প্রসার চেষ্টা, ইহাই যে এখন প্রত্যেক ভারত সন্তানের প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য ইহা যেন আমরা কিছুতেই বিস্মৃত না হই।

সমালোচনা

আশীর্ব্বাদ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীভুবনেশচন্দ্র বসাক ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। [illegible] প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য একটাকা। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছেন, "এইখানি নবপরিণীতা দিগকে [illegible] দিবার উদ্দেশ্যেই সংকলিত হইয়াছে।" তিনি আরও বলেন, এখানি "পর-শিক্ষিতা [illegible] হওয়ার পক্ষে [illegible] হইবে।" গ্রন্থের ছবি ও ছাপা খুব আড়ম্বর হইয়াছে, বাঁধাইও পরিপাটী। বইখানি কতকগুলি [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের লেখার [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইটুকু ভিন্ন লেখকের নিজের [illegible] প্রকাশ না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। ভূমিকা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। রচনা যেমনই হউক না কেন কাহাকেও ধরিয়া একটা ভূমিকা লিখাইয়া লওয়া আজকাল অনেক গ্রন্থকার-সম্প্রদায়ের একটা বাতিক হইয়া উঠিয়াছে। একটা কথা মনে রাখা উচিত, A good wine needs no bush. সদ্গ্রন্থ ভূমিকার সাহায্য [illegible]

সহৃদয়তার অভাবে [illegible] ও দীর্ঘ ভূমিকাতেও ঢাকা পড়ে না।

নির্ঝর। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত। কলিকাতা ১ নং অক্রুর দত্তের লেন 'বী' প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। এখানি কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। লেখিকার পরলোকগতা কন্যা নির্ঝর বা নির্ঝরীর স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারই নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কবিতাই শোকের উচ্ছ্বাস; সেগুলি আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, হৃদয়স্পর্শী, সহানুভূতি জাগাইয়া তুলে। শোক পবিত্র, সমালোচনার সামগ্রী নহে। সেজন্য আমরা অধিক আলোচনা করিলাম না। লেখিকার রচনা-ভঙ্গী বেশ সহজ অনাড়ম্বর।

বাণীর বরপুত্র নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিয়োগে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী বিরচিত শোকোচ্ছ্বাস। জন্মভূমি প্রেসে মুদ্রিত। জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্রের নাম

তাঁহার স্থান কোথায়, অপক্ষপাত কাল তাহা নির্দ্দেশ করিবে। সঙ্কীর্ণ বিদ্বেষ কালের সে নির্দ্দেশ রোধ করিতে পারিবে না, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে সমধিক ক্ষতি হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বহু নাটক রচনা করিয়াছেন,—তন্মধ্যে অনেকগুলিই সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে না। সমালোচ্য পুস্তকখানি ছন্দে রচিত। লেখক গিরীশচন্দ্রের শিষ্য, গিরীশচন্দ্রের পরলোক-গমনে সন্তপ্ত। সে সন্তাপ কবিতার আকারে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

Village Panchayet Scheme. By Rai Kunja Lala Sing Saraswati, M R.A.S. Printed at the Indian Press, 101, Cornwallis Street, Calcutta, 1911. মামলা-মকর্দ্দমায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। মামলা-মকর্দ্দমার হাঙ্গামা অসুবিধা লোকে জানিলে বুঝিলেও উপায়ান্তর নাই। প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বিধির পুনঃপ্রচলন করিয়া আপোষে ও অল্পায়াসে বিবাদবিসম্বাদির সুমীমাংসার যদি আবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অর্থব্যয় অল্প হয়, অসুবিধাও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। এই পঞ্চায়েৎবিধির পক্ষাবলম্বন করিয়া লেখক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার সুবিধাদির আলোচনা করিয়াছেন। পঞ্চায়েৎ রাজকীয় বিচারবিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে যথারীতি কার্য্য করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনাই যে সমধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

স্বরবিবেক। শ্রীনিবারণচন্দ্র হালদার বিরচিত। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ হালদার কর্ত্তৃক ১৩নং গঙ্গানারায়ণ দত্তের গলি, পাথুরিয়াঘাটা হইতে প্রকাশিত; মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ইহা একখানি সারিগমের সাধনা-পুস্তক। সপ্তস্বরের নানা বিভিন্ন বিন্যাসের স্বরলিপি ইহাতে যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কণ্ঠ ও যন্ত্রে এই সকল স্বরবিন্যাস অভ্যাস করা সঙ্গীতসাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষাশিক্ষার যেমন প্রথম সোপান বর্ণপরিচয়, সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে সারিগম সাধনও তদ্রূপ নিতান্ত আবশ্যকীয়, সে বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে মুখে মুখে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষাদান এযাবৎ প্রচলিত থাকায় ওস্তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা হয় না। অথচ বর্ত্তমানকালে নানা কারণে পুঁথিগত শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। সুতরাং যিনি সে অভাব দূর করিবার মানসে বিধিবদ্ধভাবে পুস্তকাকারে সঙ্গীতশিক্ষা প্রচার করিতে যত্নবান হয়েন, তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

তবে উল্লিখিত গ্রন্থসম্বন্ধে দুই একটি আপত্তি তুলিবার আছে। প্রথমতঃ গ্রন্থকার নিজমতে গঠনের "পূর্ণাঙ্গতা" প্রদান করিতে গিয়া স্থানে স্থানে গ্রন্থকে কষ্টকল্পনা ও অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে যে সকল স্বরবিন্যাস, কদাপি ব্যবহৃত হয় না তাহাও স্বরচিত নিয়মরক্ষার্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত ও শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের রাগরাগিণী, এমন কি তানসকলও, এমন নিয়মাবদ্ধ অথচ সুবিস্তৃত যে সেই গণ্ডির মধ্যে যাহা আছে তাহাই আয়ত্ত করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, তাহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা, অন্ততঃ সারিগমের ক্ষেত্রে,—কেবলমাত্র সময় ও পরিশ্রম নষ্ট। দ্বিতীয়তঃ এই স্বরসাধনের মধ্যে কড়িকোমলের স্থান একেবারেই নাই, সেটিও একটি বিশেষ অভাব। সপ্তস্বরকে অঙ্ক হিসাবে না কষিয়া যদি রাগরাগিণীর মশল্লারূপে সেগুলির বিভিন্ন বিন্যাস দেখানো হইত তাহাহইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ পুস্তক অধিকতর উপযোগী হইত। অনেকগুলি সারিগম যেন কেবল কণ্ঠ ও হস্তের ব্যায়ামচর্চ্চামাত্র, সঙ্গীতসাধনার প্রশস্ত উপায় নহে। যাহাতে সকল স্বরবিন্যাসই আমাদের প্রচলিত রাগরাগিণীর অনুমোদিত হয় আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থকার তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

গ্রন্থের প্রথম ও শেষে স্বরগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চিত্র ও সঙ্গীতের উৎপত্তির বিবরণ মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে



দান্তের স্বপ্ন

ভারতী

৩৬শ বর্ষ]　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯　　　[২য় সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(৩)

হরিনারায়ণ ও শিবনারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া দেশের লোকে সবিস্ময়ে দ্বাপরের রামলক্ষ্মণ, ও ত্রেতাযুগের পাণ্ডবগণকে স্মরণ করিত। যে যুগে রাবণ ও বিভীষণ সমাজের প্রতি স্তরে ও ঘরে সদর্পে বিরাজিত হইয়া আত্মঘাতী শক্তিদ্বারা স্ব স্ব কণ্ঠশোণিতে ছিন্নমস্তার মতন আপনাদের ছিন্ন কণ্ঠ পূর্ণ করিতেছে, সেই সর্ব্বনাশা প্রলয়ের দিনে এই সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত বড় সামান্য দৃষ্টান্ত নয়। সে একদিন গিয়াছে যেদিন হিন্দুশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জক নরপতিশ্রেষ্ঠ রাম এদেশের জনসাধারণের চিত্তে আদর্শস্বরূপ ছিলেন। পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, পত্নীপ্রেমিক—যে মহাপুরুষ প্রজার ইচ্ছার মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত লাভলোকসান দুঃখসুখকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিয়া দিয়া প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালনে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পুণ্যশ্লোক-দশরথনন্দন এখন আর তাঁহার দেশের আদর্শ নহেন। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গে যুগধর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হয়। এযুগের আদর্শ

তাই পূর্ব্বের সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ এখন পত্নীনিগ্রহ-কারী কাপুরুষ মাত্র!

হরিনারায়ণ বয়সে বড় হইলেও শিবনারায়ণই উপার্জ্জনে বড় হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার কারণ এ নয় যে হরিনারায়ণ তাঁহার কনিষ্ঠের চেয়ে জ্ঞান বুদ্ধিতে কিছুমাত্র খাটো ছিলেন, বা লেখাপড়া করেন নাই। তবে তিনি ইংরাজি শিখেন নাই। ইহার গৌণকারণ, ইংরেজি শিক্ষাটা এখনকার মত তখন গ্রামবাসীদিগের পক্ষে ততটা সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু আসল কারণ তাঁহার স্বদেশী ভাষার প্রতি অন্ধ অনুরাগ। পাছে ইংরেজি শিখিতে গিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয়,—যেমন সে সময় অনেক নব্য ইংরেজীওয়ালার মধ্যে সর্ব্বদা ঘটিতেছিল;—সেই ভয়ে তিনি কৌতূহল সত্বেও ঐ জনমুগ্ধকারী অর্থকরী বিদ্যাটাকে শিখিবার প্রয়াস পান নাই। কিন্তু শিবনারায়ণ যখন মস্তকে শিখা রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ করিয়া আর দুলিয়া দুলিয়া সুর টানিয়া মুগ্ধবোধের সূত্রগুলি এবং "অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা

মুখস্থ করিতে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠের আদেশ হইল "কালথেকে তুমি ইংরেজি পড়তে আরম্ভ করো।" এ আদেশ কনিষ্ঠ শিবনারায়ণের তেমন স্নেহসম্ভাষণ বলিয়া মনে হইল না, তিনি ব্যথিতবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন দাদা?"

"ভেবে দেখলুম আজকালকার দিনে শুধু দেশভাষায় চলবে না। চির দারিদ্র্যে তোমায় আমি কেমন করে রাখবার ব্যবস্থা দেব।" খুব গম্ভীরস্বরে কথাগুলা উচ্চারিত হইয়াছিল, শিবনারায়ণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না; তাছাড়া এই অপূর্ব্ব বিদ্যাটার কেমন একটা আকর্ষণীশক্তি আছে, শিশুচিত্ত রাঙ্গা মলাট ও পশুপক্ষিদের প্রতিমূর্ত্তিঅঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

হরিনারায়ণ নিজের অল্প আয় হইতে পয়সা বাঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণায় ও বৈশাখমাসের ব্রত প্রভৃতিতে দু'দশসিকা পাওয়া যাইত। তাছাড়া ক্ষেত-খামার ও সামান্য রকম কিছু পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মোত্তর লাখরাজ তাঁহাদের ছিল, তাহার আয় হইতে মোটাভাত কাপড়ের কোন অনাটন পড়িত না। এমন কি সম্বৎসরের খরচ চালাইয়া বড়বধূর রূপার দুগাছি পৈঁছা ও সোনার পাঁচনর একছড়াও গড়ান হইয়া গিয়াছে, দুইটি ঢেঁড়িঝুমকা আর নথের একটি নোলকই যা তাঁহার পাইতে বাকী। কথা আছে পৌষের ধান কাটা হইলেই ঝুমকার সোনা ও নোলকের টাকাটা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট জমা করিয়া দেওয়া হইবে, তিনি আবার তাঁহার সহরের শিষ্যের মারফৎ সেগুলি আনাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু এই সময় হঠাৎ বৌ-ঠাকুরাণীর ঝুমকা পরার সাধে বাদ পড়িল। এমন কি পাঁচনর ছড়াও সবুজরং লাগান দেবদারু কাঠের সিন্দুকের মধ্যে সাতরাজারধন মাণিকটুকুর মত সযত্নে রক্ষিত ছেঁড়ান্যাকড়ার পুঁটুলি হইতে বাহির হইয়া, পোদ্দারের কাছে যাচাই হইতে চলিয়া গেল। ইহার কারণ হারাধন ঘোষ নূতন পুত্রবধূর জন্য সে গাছি বানি বাদ দিয়া কিনিতে সম্মত হইয়াছে, এবং শিবনারায়ণকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য হরিনারায়ণের কিছু মোটা রকম টাকার সদ্য প্রয়োজন।

যাহা হৌক্ সস্ত্রীক, অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও দাদা ছোটভাইকে তাহার পড়ার সমস্ত খরচ নিঃশব্দে জোগাইয়া চলিলেন, ইহার জন্য যতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে হইল একদিনের জন্যও তাহাতে ক্লান্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না; মনে একমাত্র আশা শিব মানুষ হইলেই তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচিবে কোন অভাবই আর থাকিবে না।

এরকম স্থলে সর্ব্বদা যে রকমটা দেখা যায়, অর্থাৎ সাধারণতঃ বিপরীত ফলই প্রায় ফলে,—কিন্তু হরিনারায়ণের পূর্ণ সুকৃতির বলে তাঁহার ভাগ্যদেবতা বা গগনবিহারী তারানক্ষত্রগণ তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন না। ছোটভাই শিবনারায়ণ পড়াশুনা শিখিয়া কৃতি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কৃতিত্বের যে প্রধান বিভূতি তাহা লাভ করিতে পারিলেন না। না উঠিল চোখে চশমা, না [illegible]

পড়িল, এমন কি দোলাইগারে, চটিপরা, পাড়াগাঁয়ে দাদা, ও হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া ব্যতিব্যস্ত মলিন বসনা বৌদিদির পায়ের ধূলা সগর্বে মস্তকে লইতেও তাঁহার এতটুকু লজ্জার লেশ দেখা গেল না। তখনকার দিনে পাশকরা ছেলেদের জীবন যাত্রা এখনকার দিনের মত এতদূর সঙ্কীর্ণ দাঁড়ায় নাই; শিবনারায়ণ বেশ মোটা মাহিনায় দূর পশ্চিম অঞ্চলে কার্য্য লাভ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল দাদা প্রথমটা স্নেহের ভাইকে কিছুতেই স্নেহহীন দূরদেশে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষে চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা দেব-দেবীগণের মাঙ্গলা ও নিজের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদের সহিত অশ্রুজলনিরুদ্ধ চক্ষে, শূন্য-হৃদয়ে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। বৌদিদি ঠাকুরপোকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস না করিয়া সঙ্গে গেলেন।

কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে ঠাকুরপোর সংসার দেখিতে হয় নাই শিবনারায়ণের বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তার পরে একদিন সহসা হরিনারায়ণেরও ডাক পড়িল—তখন আর তাঁহার মনে সেই দ্রুত আহ্বানের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ জাগাইতে পারিল না। সোনার সংসার ধনে মানে যশে পূর্ণ হইয়া মা কমলার কৃপাকটাক্ষপাতে উথলিয়া উঠিতেছিল। ঠাকুর দালানে সিংহ-বাহিনী দেবীর সজ্জা বছর বছর সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। বার মাসে তের পার্ব্বণ কিছুই ফাঁক পড়িতেছে না। মেটে দালান এখন কোটায় পরিণত,—বধূর অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারও ধরিতেছে না। তবে আর কিসের কষ্ট?

বলিতেছেন 'কতদিন আর একা ফেলে রাখবে? আর কেন—চলে এসো না!' বালক মণীশ শুধু এখনো মানুষ হইয়া উঠে নাই,—কিন্তু সে ভাবনা তাঁহার নহে, শিবর।

পতিতপাবনী জাহ্নবীসলিলে রোগীর অধোঅঙ্গ আবৃত; চারিদিকে বন্ধুগণ তারকব্রহ্ম নাম ডাকিতেছে, শিবনারায়ণ কাঁদিয়া উঠিয়া ডাকিলেন "দাদা!"

"ভাই!"

"দাদা আমি যে কিছু জানিনে, আমি কি করবো?" মুমূর্ষু ক্ষীণকণ্ঠে শোকাতুর ভ্রাতার হাত ধরিয়া দাদা কহিলেন "ভয় কি ভাই আমার বদলে এই যে তোমার সার্ব্বভৌম মশায় রইলেন, তিনিই তোমায় দেখবেন, আর যিনি সবাইকেই দেখেন তিনি তো আছেন, ভয় কি!"

পুত্র মণীশের কথা হরিনারায়ণ একবার মুখেও আনিলেন না। বরং কোনও সুহৃদ এক সময় ইহার উল্লেখ করিলে তিনি ঈষৎ উত্যক্ত চিত্তেই কহিয়াছিলেন "ওদের খবরে আমার কাজ কি? সে শিবু বুঝবে। আমার এখন খুঁজতে হবে যে নৌকা পার হবো তার কড়ির জোগাড় আছে কি না!" বলা বাহুল্য হরিনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতার প্রতি যে বিশ্বাস পোষণ করিয়া নিজের সন্তানের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, সে বিশ্বাস কখনও ভঙ্গ হয় নাই। মণীশ ও সত্য করুণাময়ীর দুই কোলেই বাড়িতেছিল, শিবনারায়ণ ঘরে ফিরিয়া মণীশকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

তারপর হইতে অল্প লোকেই জানিল যে

কি দূরস্থ প্রতিবেশিদের মধ্যে কেহ কেহ বাটী আসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মণীশের চেয়ে কনিষ্ঠ সত্যর প্রতি অযত্ন দেখিয়া আড়ালে গিয়া বলাবলি করিয়াছে "ওমা এরা ধন্যি ধন্যি! বুড়ো ছেলে ট্যাঁকে করে ঘুরচেন, কচিছেলেটার পানে একবার তাকিয়েই দেখে না!" কানে কোন কথা উঠিলে করুণাময়ী ঈষৎ হাসিয়া শুধু মণীশকে চুম্বন করিতেন, কিছুই বলিতেন না।

বড় হইয়া মণীশ দেখিল সে তাহার ছোট ভাই সত্যের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছে। কাকাবাবু ও খুড়িমার বাৎসল্য-রসটার সব টুকুই যেন সে একাই উপভোগ করিয়া লইয়াছে। বাড়ির মধ্যে ভাল ঘরটা হইতে গাছের বড় আমটা পর্য্যন্ত তাহারি পাওনা। তা ছাড়া সত্যর মায়ের কোল ও বাপের অবসর টুকু পর্য্যন্ত তাহার ইজারা করা। মনে মনে সে একটু কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু দুঃখিত হইয়া সে ইহার একটুখানিও প্রতিবাদ করিতে গেল না। কৃতজ্ঞতা কি জিনিষ, এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা কেমন করিয়া জানাইতে হয় এ বংশের সন্তান তাহা জানিত। মণীশ অন্তরের অন্তরে ভক্তি-বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া দেবোদ্দেশে সাধকের মত তাহার জীবন্ত দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে সহস্র বার প্রণাম করিল। অশ্রু গদগদ রুদ্ধ কণ্ঠে সে তাঁহাদের স্মরণ করিয়া বলিল, "মণীশের শরীরে যতদিন প্রাণ থাকবে, সে তোমাদের পায়ের কাঁটাটি পর্য্যন্ত তুলে ফেলবার জন্য তা উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হবে না।" সে বেশি কথা জানিত না, মুখে কখনও তাই একদিনও কোন স্তবগান করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার শ্রদ্ধা-ভক্তি রচনাজালের আশ্রয় অপেক্ষা করে না। আকাশঘেরা মেঘের মধ্য হইতেও দিনের আলো পাখীর ঘুমন্ত নীড়ে জগৎ-জাগান গান পাঠাইয়া দেয়। শিবনারায়ণ ও করুণাময়ীও তেমনি এই শান্ত বিনীত বালকের ডাগর চোখের মৌন কৃতজ্ঞতা ভাল করিয়াই বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই বুঝি সে কৃতজ্ঞতার পাশে বালককে দিনে দিনেকঠিনতর বন্ধনে জড়াইয়া ফেলিতেছিলেন। শিশু মণীশ কৈশোর অতিক্রম করিয়া এখন খুল্লতাতের সর্ব্ব বিষয়ে সহকারী হইয়া উঠিয়াছিল। এত দিনে শিবনারায়ণ তাঁহার এই সুশিক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্রটির মধ্যে অপসৃত ভ্রাতার পুনরাবির্ভাব দেখিতে পাইয়া শোক হইতে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। মণীশের বিনয় নম্র করুণ মূর্ত্তিটি তাঁহার চিত্ত দর্পণে তাঁহার দাদার অন্তর্বাহ্য সদ্গুণ মণ্ডলীর পূর্ণ প্রতিমাখানি ফুটাইয়া তুলিতে থাকিত; আর অশ্রুজলের উচ্ছ্বাসে তাঁহার স্নেহকাতর দৃষ্টি সহসা স্নেহাধারের মুখের দৃশ্যটুকুকে ঝাপসা করিয়া ফেলিত। শিবনারায়ণ সুগভীর নিশ্বাসের সহিত আপনার মনে কহিতেন "আহা আজ যদি দাদা, বৌদি থাকতেন!"

সত্যের সম্বন্ধে তাহার পিতামাতা একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। শিবনারায়ণ জানিতেন মণীশকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহার ইহসংসারের কর্ত্তব্যের বোঝা বহা শেষ হইয়া যাইবে। বাকি কাজগুলা করিবে মণীশ, সে দায়ীত্ব আর তাঁহার নাই। করুণাময়ীর মনেও এ বিষয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না, ভাসুরপোর উপরে তাঁহার অসীম

বিশ্বাস! দুরন্ত দাম্বাল শিশুকে যখন তিনি তাঁহার সংসারিক কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝটের ভিতর আঁটিয়া উঠিতে না পারিতেন, তখনও ব্যস্ত হইয়া মণীশকেই ডাকিয়া আনিতেন, "বাবামণি! তোমার ভাইটিকে একবার নে যাও ত ধন, কোন কাজ করতে দেয় না।"

এখনও তাহার নামে যে সমস্ত নালিশ ফরিয়াদ করিতে হয় তাহা শিবনারায়ণের পরিবর্ত্তে তিনি তাহারই নিকটে করেন। মণীশও বরাবর তাহার সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার অম্লানমুখে সহিয়া আসিয়াছে। ভাই সেরেছে কাঁদতে নেই, কাজেই শিশু সত্যের নিষ্ঠুর প্রহারগুলা বালক ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এখন আর শুধু সহিবার দিন নাই,মণীশ দেখিতেছিল সত্য তাহার কলিকাতা-বাসের সুযোগে পড়াশুনায় একেবারে অমনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার কাপড়ের কোঁচার অংশটাকে পালোয়ানের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া, এবং হাতে এক গাছা বাখারি চাঁচা ছিলা, কিম্বা ঘুড়ির লাটাই দুলাইতে দুলাইতে ওপাড়ার হরে দুগী, বা ক্যাবলা তেলির সঙ্গে পুখুরঘাটে কিম্বা ভুলুনির ডাঙ্গায় হৈ হৈ করিয়াই দিন কাটাইয়া দেয়; মা সরস্বতীর সঙ্গে বৈমাত্রেয় সম্বন্ধের চেয়েও দূরতর সম্পর্ক পাতাইবার যেন মৎলব আঁটিয়াছে।

করুণাময়ী কহিলেন, "বাবামণি, সত্যি হতে তোমাদের, উঁচু মাথা হেঁট হবে, ওছেলে আর মানুষ হলো না।"

মণীশের মনেও সংশয় জাগিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিল না। মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিয়া উঠিল "না, না, খুড়িমা, তা আপনি মনেও স্থান দিবেন না, ওছেলে খুব ভাল। দেখুন না আমার পড়াটা একবার শেষ হয়ে যাক।"

করুণাময়ী এইটুকু সান্ত্বনাতেই যথেষ্ট খুসী হইয়া মনে মনে হাঁফ ফেলিলেন। মণীশ ছুটীর সময়টা স্নানাহার বাদ বাকি সময়ের অধিকাংশ সত্যকে লইয়া পড়িল। স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে আকস্মিক শত্রুবিপ্লব ঘটিলে যেমন কাণ্ডটা উপস্থিত হয়, দক্ষিণ-পাড়ার ছেলের দলের সর্দ্দার সত্য তাঁহার দাদার দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়াতে তাহার দলের মধ্যে তেমনি একটা আতঙ্কপূর্ণ উত্তেজনা ও অরাজকতা উপস্থিত হইল! কোন সুযোগে দাদার হাত ছাড়াইয়া গিয়া সত্য যখন তাহার সযত্নস্থাপিত নিয়মসমূহের এই সকল ছোট বড় বিশৃঙ্খলা চোখে দেখিত, তখন আইনভঙ্গকারী প্রজাদের উপর মন্ত্রী-সমাজের মতই ক্ষুব্ধ রোষে সে গর্জ্জিতে থাকিত। দাদার প্রতিও মনটা যে খুব প্রসন্ন থাকিত এমন কথাও বলা যায় না। অল্প বিস্তর উপায়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার মনে খুব দৃঢ়রূপেই এই কথাটা জাগিয়া থাকিত যে নাদিরসা বা তৈমুরলঙ্গের মতই তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য তাহার দাদা এখানে আকস্মিক অনধিকার প্রবেশকারী! কেন সে তাহার কলিকাতার বাসায় থাকিল না? সেখানে কত ট্র্যাম, ইলেক্‌ট্রিক আলো কত কি আছে, সে সব ফেলিয়া তাহার এই

জলে তাহাকে হুম্‌কি দিতে আসা কেন? আসে ত দুদিন পরেই ফিরিয়া গেলে কি হয় না? কিন্তু বাহিরে সে স্পষ্ট করিয়া নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে সাহস করে না। মিউটিনিয়ারদের মত গোরার আড়ালে থাকিয়া সে মনে জোর পায় কিন্তু চোখোচোখি হইলেই মুস্কিল। রাইট বলিলেই তখন তাহার দক্ষিণে ফিরিতেই হইবে, এতটুকু সাধ্য নাই যে সে আজ্ঞা তখন অগ্রাহ্য করে। চোখে জল আসে, নাসারন্ধ্র ক্ষুব্ধ রোষে ফুলিতে থাকে তথাপি কথা রাখিতে হয়। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে মণীশ ভাইকে নিজে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে শিবনারায়ণ একদিন তাহাকে ডাকিয়া কতকগুলি পুরাতন কাগজ পত্র গুছাইতে ও তৈরি করিতে দিয়া বলিলেন, "কালকের মধ্যে এগুলো ঠিক হওয়া চাই।"

মণীশ নিজের পড়িবার ঘরের টেবিলে কাগজের বাণ্ডিল লইয়া যেমনি বিছাইল, পাশের ঘর হইতে অমনি সত্যর পড়ার শব্দ বন্ধ হইয়া গেল এবং এক মিনিট পরেই গুপ্ত স্থান হইতে ছিপ বঁড়সি বাহির করিয়া শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পা টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া লম্বা পাড়ি দিলেন। কোন একটা কাজ হাতে লইলে যে, দাদার আর হুঁসই থাকে না, এই গুপ্ত সংবাদটুকু তাহার বিশেষরূপেই জানা ছিল বলিয়া সে খুব খোস মেজাজেই বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে মৎস্য-যজ্ঞের মাঝখাকে যজ্ঞভঙ্গকারী গণরূপে দাদার আকস্মিক আবির্ভাব হওয়ায় তাহার কল্পিত আনন্দ ভোগ হইতে তাহাকে বঞ্চিত

এই ঘটনার পরদিন দুপুরবেলা সত্যকে অঙ্ক কষিতে দিয়া পাশের ঘরে মণীশ কাগজ-গুলা গুছাইতেছিল, এমন সময় বন্ধু শচীকান্ত আসিয়া হঠাৎ যেন একপাতা নভেল শুনাইয়া দিয়া গেল।

শচীকান্ত বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ অবধি তাহার কথাগুলি কেমন যেন একটা জটিল ছন্দে ও বেতাল সুরে মণীশের কানের তারে পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। "নুরজাহানের জন্য জাহাঙ্গীর কি না করেছিলেন?" অপূর্ব্ব যুক্তি! ছি ছি, এত লেখাপড়া শিখিয়া শচীকান্তের এই কি বিদ্যা হইল? মণীশের সমস্ত দেহে ঝাকানি দিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। এতবড় জুয়াচুরি দিয়া যে জীবনের গ্রন্থি বন্ধন হইবে, সে জীবনের পরিণাম কোনখানে গিয়া? সে নিজের পরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসটা সবেগে ভিতরের দিকে টানিয়া লইল। সেই সর্ব্বনেশে অধঃপতনের কাহিনী শ্রোতাকে এমনিই অভিভূত করিয়া ফেলিয়া গেল, যেন সেই-ই এই গূঢ় চক্রের চক্রী এবং সমস্ত অপরাধের অপরাধী।

অনেকক্ষণ অবধি মণীশ সেইরূপ বিস্ময় বেদনাবিমূঢ়চিত্তে সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া রহিল। এখন তাহার কি করা উচিত? এই জটিল সমস্যাযুক্ত প্রশ্ন যেন অকস্মাৎ তাহার অন্তরের সকল প্রশ্ন ও সমস্ত চিন্তাকে ছাপাইয়া চারিদিক হইতে এক সঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? সমুদয় জানিয়া

চাপিয়া যাইয়া তাহাকে এতবড় অধর্ম্মের পথে ছুটিতে দিবে? না তাহারই মঙ্গলার্থ এসব কথা তাহার পিতার কর্ণগোচর করিয়া বন্ধুকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে? মণীশ জানে শচীকান্তের পিতা পুত্রের এই জুয়াচুরি বুদ্ধিকে ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু যদি ইহার চরমফল ফলিয়া দাঁড়ায়, তবে? তবে যে কি হইতে পারে তাহা মনে করিতে গিয়াও সে শিহরিয়া উঠিল। আচ্ছা ভক্তিনাথকে গোপনে সংবাদটা দিয়া সাবধান করিয়া দিলে হয় না? বোধ হয় এই পরামর্শই সঙ্গত! এতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন সে এই অকূল চিন্তা সমুদ্রের কূল দেখিতে পাইল। আশ্বস্ত চিত্তে উঠিয়া বসিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সার্ব্বভৌম মশায় যাহাতে না টের পান, এমনি ভাবে ভক্তিনাথ কাকাকে দিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে। আর বন্ধ করিতেই বা হইবে কেন? যদি কৌশলে অর্থাৎ, কাহার জন্য তা এখন উল্লেখ না করিয়া রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ চালাবার মত তাঁর কাছ হইতে লইতে পারা যায়, তবে ত সকল দিকেই মঙ্গল! এতবড় সমাজের ক্ষতিকর বিষয়টা সমাজকর্ত্তারা একবার ভাবিয়াও দেখেন না, এটা খুব আশ্চর্য্য!

রৌদ্রের তেজ কমিতে কমিতে কখন একসময় সূর্য্যকিরণ জানালার উপর দিয়া ছাদের আলিসা ছাড়াইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণে পিছনদিক্‌কার প্রকাণ্ড আম বাগানে স্নিগ্ধতর বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। রৌদ্রতাপদিগ্ধ ম্রিয়মান গাছপালা সেই বাতাস পাইয়া রোগশয্যাত্যাগী শিশুর মত নবীন স্বাস্থ্য সম্পদলাভে সতেজ হইয়া উঠিয়া প্রচুর পুষ্প ভূষণে দেহ সাজাইয়া তুলিতেছিল। গন্ধে, বর্ণে দিক পুলকিত, আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। ধন্য মা প্রকৃতি! বিশ্ব বিমোহিনী, মায়াবিনী তুমি! এই না ভয়ঙ্করী রুদ্রাণী মূর্ত্তিতে সৃষ্টি দহন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? আর ইহারই মধ্যে কমলকুমুদাসনে আসীনা রাজরাজমোহিনীমূর্ত্তিতে বরাভয়করা হইয়া প্রসন্নহাস্যে সন্তাপিত বিশ্বকে জুড়াইতে উদ্যত হইয়াছ! করালিনী কমলায় পরিবর্ত্তিতা হইয়া গিয়াছে! দশরূপা তুমি নহ মা, সর্ব্বরূপিণী! প্রতিক্ষণেই যে তোমার বিভিন্নরূপ আমরা আমাদের অন্তর্বাহ্য ঘেরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। যখন জীব জগতে বা অন্তর্জগতে কোনরূপ গ্লানির আবির্ভাব হইতেছে তখনি যে আমরা তোমার বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতেছি। ওগো বিশ্বশক্তি! তোমার অসীমশক্তি সমুদ্রের সহস্র বীচিমালা,—শীতের পর গ্রীষ্ম, বৃষ্টির পর রৌদ্র, দুঃখের পর শান্তি—ও সুখের অন্তে বিরাম মুহুর্মুহু আনিয়া দিয়া তোমারি অসীম আবির্ভাবকে জানাইয়া দিতেছে। মানবচিত্তের অভ্যন্তরে তোমারি ত্রিগুণ—ওগো ত্রিগুণময়ী! তোমার এই বহুলরূপের লীলা আমাদের সাধ্য কি যে বুঝিব? তাই শুধু বিস্ময়পূর্ণ সম্ভ্রমে নীরবে চাহিয়া চাহিয়া তোমারই শাসনের তলায় নম্রশির হই।

মণীশ কাগজের তাড়া গুছাইয়া ফিতা বাঁধিয়া উঠিতেই মনে পড়িয়া গেল বহুক্ষণ হইতে পাশের ঘরে পাঠের সাড়া পাওয়া যায় নাই। সে নিজের আত্মবিস্মৃতিতে ঈষৎ

দাদার সাড়া না পাইয়া সত্য পড়া ফেলিয়া পলাইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিতেই সন্দেহ সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে ঘরে সত্য নাই, কিন্তু ঘরের মেজের উপর ছড়ান কতোকগুলা কুচানো কাগজ এবং দোয়াত হইতে নিঃসৃত কালীর স্রোত তাহার কিছু পূর্ব্বের অবস্থিতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(৪)

'বলি, বলি' করিয়াও মুখচোরা মণীশ কোনমতে বক্তব্যটা ভক্তিনাথের কাছে ফুটিতে পারিল না। কেমন করিয়া কোথাও কিছু নাই মাঝে হইতে গায়ে পড়িয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিবে "ওগো তোমার ভাই ঠকাইয়া বিবাহ করিতেছে, খবর লও।" ছিঃ সেটা বড়ই বিসদৃশ হইবে। আর তাছাড়া ভক্তিনাথই বা মনে করিবেন কি, যে তাঁহার ভাইএর নামে একজন বাহিরের লোক তাঁহার কাছে কুৎসা করিতে আসিল কেন? না, হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলিয়া বসা ঠিক নয়, আরো একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ সাতপাঁচ ভাঙ্গাগড়া করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিল। পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল 'আচ্ছা এ'ও ত হইতে পারে, শচীন্ তামাসা করিয়াও ত কথাটা বলিতে পারে? ঠিক ঠিক! কি ভাগ্য যে কাহাকেও কিছু বলিয়া ফেলি নাই! বোধহয় তাহার যেমন স্বভাব যা তা বলিয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করা, এ'ও সেই রকম একটা গল্প মাত্র। আঃ বাঁচা গেল, এ'টাও এতক্ষণ ছাই বুঝিতে পারি নাই।" এই ক্ষুদ্র সন্দেহটুকুর ভিত্তির উপরেই বন্ধুপ্রেমের প্রকাণ্ড অট্টালিকা রচনা করিয়া সে মনে মনে লঘুনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সত্যকে খুঁজিতে গেল। বন্ধুর প্রতি অতখানি অবিচার করিয়া ফেলিয়াছিল মনে করিতে আত্মধিক্কারে পূর্ণ হইয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

তখনকার মতন বাড়ী ফিরিয়া গেলেও, বেশীক্ষণ মণীশ নিজের মনের এই অপরাধ লইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সন্ধ্যাকাশকে স্বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া শুক্লপক্ষের চাঁদ পূর্ব্বাকাশের উপর দেখা দিবামাত্রেই সে কামিজের উপর একটা উত্তরীয় ফেলিয়া বন্ধুর গৃহোদ্দেশে যাত্রা করিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ীখানির একতল অংশের একটি পশ্চিমের ঘর শচীকান্তের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাড়ীতে ঘর অল্পই, এবং যে কয়খানি ঘর আছে সকলগুলিই পূর্ণ। কাজেই কলিকাতা প্রবাসী শচীকান্ত দুদশ দিনের জন্য বাড়ী আসিলে রাস্তার ধারের ঘরই ব্যবহার করিত, এবং রাত্রে উপরের ঘরে মায়ের বিছানা সরাইয়া সেইখানে তাহার শয্যা রচিত হইত। গঙ্গামণি নীচের ঘরে সেই সময়টা ছেলে মেয়েদের লইয়া শয়ন করিতেন। কারণ তাঁহার ভোর রাত্রি হইতে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় এবং ছেলেপিলেদের কান্নাকাটা আছে; শব্দে শচীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহার ত এখন সেরূপ অভ্যাস নাই।

তরুণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বাহিরে সারাবিশ্ব হাসিয়া গলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পশ্চিমের ঘরের ক্ষুদ্র জানালা তাহার

সেই সুপ্রচুর কিরণের কণামাত্র লাভ করিয়া ঘরের ভিতরের অন্ধকারকে কথঞ্চিৎ মাত্র তরল করিতে পারিয়াছে।

পঙ্করাশি উদ্গত অদূর পুষ্করিণীর অসংখ্য মশককুল সেই অন্ধকার গৃহে মহা উল্লাসে ঘুরিয়া উৎসবের বাদ্য বাজাইতেছিল। ঘরের মধ্যে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। দ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া মণীশ সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকিল "শচীন্ ঘরে আছ কি ?"

সাড়া না পাইয়া আবার ডাকিল "শচী !"

এবারও কোন সাড়া নাই। দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট ঘড়ি স্পন্দিত হৃদ্‌পিণ্ডের মত গভীর নিস্তব্ধতাকে আঘাত করিয়া টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছিল। ক্ষুদ্র জানালার ভিতর দিয়া বাতাসের আনাগোনা---অন্ধকারে কাহারও দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত শুনাইতে লাগিল।

শচীকান্ত ঘরে নাই স্থির করিয়া মণীশ ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে পিছন ফিরিতে গিয়া হঠাৎ বিস্ময়ে চকিত হইয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। অন্ধকারের মধ্যে ওই না একটা অন্ধকারতর পদার্থ ঈষৎ নড়িয়া উঠিল ? হাঁ, হাঁ, একটা মনুষ্যমূর্ত্তিই ত ! কে ? মণীশ ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। নিশ্চয়ই শচীকান্ত, কিন্তু একা সে এই অন্ধকারেই বা কেন, এবং তাহাকে সাড়াই বা কেন দিল না ?

একটুখানি অগ্রসর হইবার পরেই, হঠাৎ একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রা-জড়িত ভাঙ্গা স্বরে উচ্চারিত হইল "কে ?"

ঘোর

যেমন বিদ্যুতের স্ফুরণ চমকের মধ্যে তাহার হারাণো পথরেখা একমুহূর্ত্তে খুঁজিয়া লয়, মণীশের মনের সমুদয় সন্দেহের অন্ধকার তেমনি সেই সদ্য জাগরণের শিথিল স্বরটুকুতেই নিমেষে ঘুচিয়া গেল! সাবধানে অন্ধকারে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি, শচী, তুমি এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে ? কেন, শরীর ভাল নেই ?"

আবার একটা আলস্যজড়িত নিশ্বাসের শব্দ স্তব্ধ গৃহে ভাসিয়া উঠিল, অন্ধকারের মূর্ত্তি হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া গলা ঝাড়িয়া অবশেষে কথা কহিল, সে শচীকান্তই। কহিল, "হ্যাঁ মাথাটা একটু ধরেচে, ও এমন কিছু না ; ---বসো একটা আলো আনাই।" এই বলিয়া সে উঠিতে গেল ! মণীশ তাহার খুব নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিল, "না, না আলোতে কাজ কি ! বস না, আমি এক্ষণি যাবো সত্যকে পড়াতে হবে ! একটা কথা বলতে এলাম---"

কথাটি কি তাহা বুঝিতে শচীকান্তের বাকি ছিল না। এই কথাটার ভয়েই সে এতক্ষণ নিজেকে অন্ধকারের কোলে লুকাইয়া রাখিয়া, সাড়া দেয় নাই। মনটা বিশেষ একটু গরম হইয়া উঠিল, তথাপি কষ্টে আত্মদমন চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কি ?" চেষ্টাটা যে ব্যর্থ হইয়াছিল ক্ষুদ্র শব্দটা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ শচী ?"

মণীশের প্রশ্নটা শচীকান্তকে অকস্মাৎ গোপনে আরক্ত করিয়া তুলিল। বিরক্তও

কথাটা সত্য! তবুও সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না রাগ কিসের।"

"আমার মনে হচ্চে নিশ্চয় তুমি রাগ করে রয়েচ। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি আমায় ক্ষমা করবে না?"

অনুতপ্ত মণীশ বন্ধুর হাত ধরিল।

"ক্ষমা!"

"হাঁ, আমার মন বড় লঘু, তোমার সেই তখনকার তামাসাটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তোমায় কত ছোট করেছিলুম। তুমি যে এমন হেয় কাজ পারো না তা মনেও হল না! এ অপরাধ ক্ষমা কর্বে কি?"

শচীকান্ত ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। এত বড় বিশ্বাস তাহার পরে! সে বিশ্বাস কি ভাঙ্গা যায়! তাহার হাত পায়ের তলাগুলো অকস্মাৎ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। অন্ধকারের অঞ্চল তাহাকে ঢাকিয়া না রাখিলে এ গভীর লজ্জা গোপন করিতে পারা কঠিন হইত! একবার সে মনে করিল, নিজের দোষ স্বীকার করিয়া এমন উচ্চ হৃদয় বন্ধুর কাছে নিজেই প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা চাহে। কিন্তু এই সংসারটা ভগবানের নিজের হাতে গড়া হইলেও যে বেত্রহস্ত প্রহরী ইহার পরিচালনার ভার সেই অনাদি কাল হইতে অজ্ঞাত কম্মসূত্রে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, বাইবেলের সয়তানের মত সে মানুষের বুদ্ধিকে সহজে সোজা পথে চলিতে দিতে ভালবাসে না। তাহারই ইঙ্গিতে শচীকান্তের বুদ্ধি তাহার বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ করিল না। মন অভিমানিনী কুল-[illegible]

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া উঠিয়া তাহার বন্ধুর হাতখানা দক্ষিণ করতল দিয়া চাপিয়া ধরিল; "কুচ পরোয়া নেই! ও এমন কিছু অপরাধ নয়! ও ধরতে গেলে ত আর বাঁচা যায় না। তা'র পর এখন কলকেতায় ফিরচো কবে?"

"এখনি? এই ত কদ্দিন পরে এলাম!"

"আমি ত শীঘ্রই পাততাড়ি গুটোচ্চি—কী ভয়ানক মশা!" এই বলিয়াই সে দংশন-পরায়ণ মশকের উদ্দেশে নিজের বাহুতলে অন্য হস্ত দ্বারা সজোরে চপেটাঘাত করিল। "অস্থির করে তুলেচে!"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল "বীর বটে, মশার ভয়ে দেশছাড়া!"

শচীকান্ত মুখ গম্ভীর করিল "হাসচ কি? এ ভয় বড় কম ভয় নয়, হাত পা সব জ্বালিয়ে দিয়েচে। নাঃ, চলো বাইরে যাই এরা মোটে টেঁকতে দিলে না এখানে।"

গঙ্গামণি দেখিলেন তাঁহার প্রাণপণ যত্নচেষ্টাতেও তিনি তাঁহার ছেলের সহরে মনকে ঘরের মধ্যে তাঁহার কোলের কাছটিতে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছেন না। ছেলের অন্নথালিতে আহার্য্য অভুক্ত পড়িয়া থাকে, মন সর্ব্বদাই যেন উড়ু উড়ু হইয়া আছে, কিছুই যেন পছন্দ হয় না। তিনি দুঃখিতভাবে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। "ছেলেও দূরে থাকিলে এমন পরের মত হইয়া যায়! তাহাই বা কি বলিব, তাহার আজন্মই যে টানটা কম।"

বৈশাখী পূর্ণিমার ভোরে প্রাতঃস্নান করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় কালী তারা মহাবিদ্যা [illegible]

গ্রামের পথে ফিরিয়া নিজের ক্ষুদ্র গৃহোদ্যানটিতে প্রবেশ করিয়া প্রসাদপ্রসন্নমুখে ফুল তুলিতে ব্যস্ত একটি মেয়েকে ডাকিয়া কহিলেন "গৌরদিদি! পূজার উয্যোগটা শীঘ্র করে দাওতো, দক্ষিণপাড়ায় নবীনকৃষ্ণ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে আসতে হবে, বেলা হলে তাঁরা আবার ব্যস্ত হয়ে লোক পাঠাতে পারেন।"

গৌরদিদি, আর কেহ নহে, সে সেই সত্যেন্দ্রের শিষ্টা সঙ্গিনী গৌরী, সাজিভরা মল্লিকা কুন্দ ও গোটাকতক জবা গোলাপ সংগ্রহ করিয়া সে তখন গোলাপকাঁটা হইতে কাঁটাবেঁধা আঁচল ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। মাতামহের আদেশে খোঁপাখোলা-বিনানী দোলাইয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল "কি করে যাই দেখুন না! এই যে—" ইঙ্গিতে আঁচল দেখাইল। দাদামহাশয়ও মৃদু হাসিলেন; "ওরে হাবি, অমন করে টানলে কি কাঁটা ছাড়ে? রোস্ রোস্ আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।"

বলিতে বলিতে কাছে আসিয়া তাহাকে সত্বরেই কণ্টক দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। সদ্‌গুরু এমনি করিয়াই অজ্ঞ শিষ্যকে সংসারের কাঁটাবন হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ছাড়া পাইয়া গৌরী ভারি বিস্ময়ের সহিত দাদামহাশয়ের স্মিতহাস্যমণ্ডিত সৌম্য মুখের উপরে দুই ডাগর চোখের চঞ্চলদৃষ্টি অচঞ্চল করিয়া স্থাপন করিল "তুমি আমায় ছুঁলে যে, আমিত এখনও নাইনি?"

"আমি ত স্নান করেছি! মা কলুষনাশিনী এইমাত্র যে ভেতরের বাইরের সব কলুষ হরণ করে নিয়েছেন, বিশ্বসংসারের সব অশুচি যে তাই আমার কাছে শুদ্ধশুচি হয়ে গ্যাছে। ফুল তোলা হয়ে গ্যাছে ত, আর তুলছিস্ কেন? তুই যখন রাঁধুনি হবি, দেখছি কারু পাতে ভাত দিবি নে, সব নিজের পাতেই ঢালবি।"

গৌরী লজ্জিত হইয়া আরক্ত মুখে "তা বই কি, কক্ষণো না" বলিয়া নামান করবীর ডালটা ছাড়িয়া দিয়া সাজি দুলাইতে দুলাইতে বাড়ীর দিকে ফিরিল। তাহার মাতামহ সকৌতুকস্নেহে একবারমাত্র তাহার গতিশীল ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবীন সূর্য্যের ঝলমল কিরণরঞ্জিত পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নিত্য নবীন! চিরন্তন, চিরপুরাতন, তবু প্রতি প্রভাতে সেই আদি প্রভাতের সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মত নির্ম্মল, অম্লান এবং ক্লান্তিলেশহীন। যুগপ্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বপিতামহ! ভবিষ্যৎ যুগান্তর তোমার অসীম রহস্যময় কক্ষের অভ্যন্তরে সমাধিলীন হইয়া আছে! এই যে সমাধি-উত্থিত শক্তির উদ্বোধনে তোমার উদার সাম্রাজ্য গাম্ভীর্য্যময় পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে, হে সবিতা! হে জড় জগতের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর! আমাদের ক্ষীণ প্রাণে সেই শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মূর্চ্ছাতুর হৃদয়কে সচেতন করো, তোমার নিদ্রাজড় পুত্রগণ বীতনিদ্র হইয়া সামরবে পূর্ব্ব প্রভাতেরই মত তোমার মধ্য দিয়া তোমারও স্রষ্টাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ধন্য হোক্!

সহসা পশ্চাৎ হইতে একটি মধুর কণ্ঠ তাঁহাকে আহ্বান করিল "দাদা!"

"কি রে গৌরমণি! আবার ফিরলি যে?" "তুলসি তোলা হয়নি ত দাদা, কেশবার্থে বিনোমিতাং—তা' পরে কি আমি

ভুলে গেছি, কিছুতে মনে পড়চে না আমায় বলে দাও না দাদু।"

"বরদা ভবশোভনে। কিন্তু আজ পূর্ণিমা, আজ ত তুলসী তুলতে নেই দিদি, ঠাকুর ঘরে তামার টাটে তুলসি আছে তাইতেই আজ হয়ে যাবে এখন।" গৌরী ঠাকুরঘরে ফুলের সাজি রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মাতামহের হাত আকর্ষণ করিয়া আবদারের সুরে কহিয়া উঠিল "তুমি সেখানে চলো না দাদু, আমি চন্নন ঘোষ্‌বো আর তুমি ফুলগুলো সাজিয়ে দেবে। তা দাদু চলো।"

"আচ্ছা চল্‌" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খড়মের খুঁটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গৌরী আনন্দাতিশয্যে প্রায় নাচিয়া চলিল। চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য, প্রয়োজন থাক্ না থাক্ একটা প্রশ্ন করিয়া বসা তাহার স্বভাব। তাই ফস্ করিয়া সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল" পূর্ণিমার দিন তুলসী তুলতে নেই কেন দাদামশাই? কি হয়?"

"কোন রকম ক্ষতি হয়, নাহলে মহামহাপণ্ডিত ঋষিরা এসব বারণ করতেন না। যা জানিনা তাই ভুল এরকম মনে করতে নেই। এসবেরও অনেক বিজ্ঞান আছে। সে এখন তুমি ঠিক বুঝবে না।"

গৌরী এ উত্তরের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া একবার বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল মাত্র, আর প্রশ্ন করিল না। সে দেখিত সব জায়গার চেয়ে এইখানে উত্তর তেমনি কঠিন। "বিজ্ঞান!" বিজ্ঞান আবার কি জিনিষ? তাহার একটু হাসি আসিল, সত্যকে জিজ্ঞাসা করিবে সে বিজ্ঞান দেখিয়াছে কি না, সে ত কখনও তাহাকে দেখে নাই!

ঠাকুর ঘরের দালানে পা ধুইবার জল ও গামছা রক্ষিত ছিল, পা ধুইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন। গৌরী পূর্ব্বেই ঘর ও পূজার বাসন ধুইয়া স্থান করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ঝকঝকে করিয়া মাজা প্রাতঃসূর্য্যের মত রাঙ্গা তাম্র-থালিতে পীতলোহিত ও সুপ্রচুর শুভ্র পুষ্পরাশি নয়নলোভন শোভা বিস্তার করিয়াছিল। বোঁটা কাটা বিল্বপত্র ও তুলসী দূর্ব্বা, যথাস্থানে আত্মনিবেদন কামনা করিয়া আসিল। এদিকে ছোট দুখানি হাতের ঘন ঘন আন্দোলনে, মন্দরমথিত সমুদ্রোত্থিত সুধাগন্ধি সুধার ন্যায় ঘন সুরভি ছড়াইয়া চন্দনপাত্র পূর্ণ হইতে লাগিল। বাকী রহিল কেবল মালা গাঁথা। নৈবেদ্য রচনার ভার ত আর গৌরীর উপর নয়, সে বধূদের দ্বারা রচিত হইয়া আসিবে। চন্দনপিঁড়ি যথাস্থানে রাখিয়া দ্বারের নিকট হইতে "ওগো নৈবেদ্য দেওয়াও, দাদু পূজোয় বসতে পারচেন না যে" বলিয়া ডাক দিয়া আসিয়া সে মালার জন্য ফুল বাছিতে বসিয়াছে, এমন সময় অন্তরাল হইতে একটা শব্দ আসিল "অ ঠাকুঝি, নৈবিদ্যি দিয়ে এসো গে, তোমার খুকি তাঁ'দা এসে আর নে'যেতে পারলেন না। ঠাকুর পূজোয় বসেছেন। দস্যি মেয়ের প্রাণে একটু ভয় ডরও নেই ত, চেঁচাচ্চেন দেখ বসে বসে।"

মতন তখনি তটস্থ হইয়া পড়িয়া মুখখানি চুন্ করিল। সত্যই তাহার কি বুকের পাটা! যে দাদামহাশয়কে বাড়ীসুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করে, দেশসুদ্ধ লোক কত সম্মান করিয়া থাকে, সে কিনা তাঁহাকেই যা খুসী বলিতেছে তাঁহার সম্মুখে যা ইচ্ছা করিতেছে কিছু সঙ্কোচও বোধ করে না!

আচ্ছা কেনইবা লোকে তাঁহাকে অত ভয় করে? কাছে আসিতেও কেহ যেন সাহস করে না! কিন্তু তিনি ত কই কাহারও উপরে কখনও একটুও রাগ করেন না, বরং কত আদর করেন! এ কি আশ্চর্য্য!

সে জানিত না যে জগতে এই নিয়মই সর্ব্বত্রই প্রচলিত। দূর হইতে যাহাকে সবচেয়ে কঠিন ঠেকে, নিকটে আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলে দেখা যায় সেই সবচেয়ে নিকটতর, কোমলতর। কিন্তু সেই সাহসটুকুর অভাবেই সকল সমস্যা না মিটিয়া বরং বর্দ্ধিতই হইয়া উঠে।

মনের মধ্যে কোন চিন্তা চাপিয়া রাখা গৌরী মেয়ের কর্ম্ম নয়, তখনি প্রশ্ন উঠিল "সবাই আমায় বকে, তুমি কেন আমায় বকো না, দাদু?" স্নেহময় মাতামহ উত্তর করিলেন "বকি না, কি রে, বকি ত মধ্যে মধ্যে!" "ওঃ সে আবার বকা! আচ্ছা সবাই কেন তোমায় অত ভয় করে বলো দেখি? তুমি ত কারুক্কেই বকোনা!"

শিশুর মুখের বাণী হইলেও এ প্রশ্নটা উদারচিত্তেও একটা খোঁচা দিতে ছাড়িল না। এইটুকু গুপ্তবেদনাই বলো আর ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতাই বলো, তাঁহার সংযমশাসিত অন্তঃকরণের মধ্যে কোথায় একটি ছিদ্র করিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার পরিবার এবং বিশ্বপরিবার সকলেই তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রাণ সঁপিয়া না দিয়া স্বতন্ত্ররূপে দূরে সরিয়া থাকে ইহাতে যেন প্রাণের মধ্যে কেমন একটু ব্যথা বাজে। ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে সবাই আমায় ভয় করে?" এই ত ছোট মামা কাল রাত্তিরে দিদিমাকে বলছিলেন 'কাল কলকাতা যাবো। তুমি বাবাকে বলো, আমি বল্‌তে পার্ব্বো না, আমার ভয় করে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। ত্রিপদীর উপর পূর্ণপাত্র স্থাপন করিয়া পূজারম্ভের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। মনে মনে বলিলেন "শচীর আমাকে ভয় করিবার কিছু কারণ আছে যে। যাহোক একটু বয়স পাকিলেই বুদ্ধি ভাল হইবে। উচ্চ বংশের রক্ত শরীরে আছে ত। এখন নিজের প্রাক্তনবশে বুদ্ধিশুদ্ধিও একটু বিকৃত, বেশি বলিলেও কাজ হইবে না। ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গলই করিবেন।"

(ক্রমশ)

ভারতের সহিত জাপানের সম্বন্ধ

এ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বেই পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই জাপা- কাণাকে কাণা বলিলে কাণার পক্ষে শ্রুতি-মধুর হয় না সত্য কিন্তু বাস্তবিক সে যে কাণাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক বিষয়ে

দেখিয়া জাপানীরা আমাদিগকে হীনজীব মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। তুনিয়ার সর্ব্বত্রই বড় ছোটকে এইরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে; তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। আমাদের বড়লোকেরা দীন দরিদ্র আত্মীয়স্বজনকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাকি? তাই বলিতেছি জাপানীদের শতগুণের মধ্যে তুই চারিটি দোষ ক্ষমা করা যাইতে পারে।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন ও কোরিয়ার ভিতর দিয়া ক্রমে জাপানে গিয়া বিস্তারিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই উহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। তখন জাপানীরা ভারতকে তেন্‌জিকু অর্থাৎ স্বর্গ এবং ভারতবাসীকে তেন্‌জিকুজিন্ অর্থাৎ স্বর্গবাসী নামে অভিহিত করিত। শুনিয়াছি রুষজাপান যুদ্ধের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভারতবাসী জাপানের কোন পল্লীতে গিয়াছিলেন, তথায় একবৃদ্ধা তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ বলিয়াছিলেন—"আজ আমি ধন্যা, আজ স্বচক্ষে স্বর্গবাসীকে দেখাতে আমার স্বর্গে যাইবার দ্বার উন্মুক্ত হইল।"

গত রুষজাপান যুদ্ধের সময় এক পর্ব্বদিনে আমি এবং অপর একজন ভারতবাসী কতিপয় জাপানীবন্ধুর সহিত এক বৌদ্ধ-মন্দিরে গমন করি। জুতা, ছাতা এবং লাঠি দ্বারদেশে মন্দিরে নিয়োজিত কোন ভৃত্যের নিকট রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। জাপানীবন্ধুগণ পরিচালকস্বরূপ আমাদিগকে ভিতরে চালাইয়া লইলেন। করিয়া প্রসাদ (দেবতার ভোগ) লাভার্থী হইয়া মন্দিরের একপাশ দিয়া আমাদিগকে ভোজনের আঙ্গিনায় লইয়া গেলেন! আমরা উপবেশন করিতে না করিতেই তুই বৃদ্ধা আহার্য্য লইয়া উপস্থিত! তাঁহারা তাঁহাদের নমস্কারের পদগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে আমাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। আমরাও প্রত্যভিবাদন করিলাম। এক বৃদ্ধ বলিলেন ইহাদিগকে ওছাকা ছামার (বুদ্ধদেবের) মত দেখা যায়। অপরে বলিলেন নাসিকা, চক্ষু, শরীরের গঠন এবং রং ঠিক বুদ্ধদেবের মতন! বলা বাহুল্য আমাদের প্রতি তাঁহারা এক এক বিশেষণ আরোপ করার সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদনও করিতেছিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেছিলেন যে চেহারা এবং স্বভাব চরিত্রে ভক্তির উদ্রেক হয় ইত্যাদি। ঐ সময় আমাদের ওদেশের ভাষাজ্ঞান অতি সামান্যই ছিল। তাই ঔদরিক বন্ধুগণ ভোজন ব্যাপারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও মুখে বড় বড় গ্রাস তুলিতে তুলিতে আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সংক্ষেপে বৃদ্ধাদের কথাগুলি তর্জ্জমা করিয়া বলিতেছিলেন। (তুখানা কাষ্ঠ ফলকের সাহায্যে আহার্য্য গ্রহণ করিলেও জাপানীরা সাধারণতঃ অতি অল্প সময়ে অধিক অন্ন উদরসাৎ করিয়া থাকে।)

বুদ্ধদেবের প্রসাদ হইলেও তুর্গন্ধতাপ্রযুক্ত আমরা সেই আহার্য্য একেবারেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বৃদ্ধদের অনুরোধে তুই এক পেয়ালা সবুজ চা পান করিয়া ধন্যবাদ প্রদানান্তর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক

করিলাম। স্তোত্র সাধারণ শিক্ষিত জাপানী-দের পক্ষে বুঝিয়া উঠাও মুস্কিল, যেহেতু উহা বোধ হয় পালিমিশ্রিত পুরাতন জাপ ভাষা। কাজেই আমাদের দুজনকেই স্তোত্রের দিকে মন না দিয়া পর্ব্বের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলি আগ্রহের সহিত দেখিতে হইল। অপরিচিত সকলের মনোযোগই আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল। আর ওদিকে আমাদের জাপানী বন্ধুগণ গুরু ভোজনের পর তন্দ্রাভিভূত হইয়া এপাশে ওপাশে ঢুলিতে লাগিলেন। যাহা হউক সেদিনও আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম যে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের ভারতবাসীর প্রতি ভক্তির ভাব এখনও কিঞ্চিৎ আছে।

ইদানীং আর ভারতের নাম তেন্‌জিকু নাই। ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা স্বর্গের পরিবর্ত্তে ভারতকে ইন্দো অর্থাৎ ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত রুষজাপান যুদ্ধের সময় যখন আমরা জাপানে ছিলাম তখনও জাপানীরা রাস্তা ঘাটে আমাদিগকে ইন্দো ছান অর্থাৎ মিষ্টার ইণ্ডিয়া বলিত। দুই এক বৎসরের মধ্যে মিষ্টার ছাড়িয়া উহারা শুধু ইন্দো নামে ডাকিত। ঐ সময়েই বঙ্গ-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী বয়কট প্রভৃতি লইয়া হিন্দুস্থানে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে আন্দোলনের তরঙ্গলহরী—সুদুর য়ুরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের তটদেশ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছে। সেই সময় হইতেই বৈদেশিক সংবাদ পত্রে ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ পাইতে থাকে। সমপাঠিদের আলোচনায় জানিতে পারিয়াছি ...

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণ জাপগণ ভারতকে কানাডা অষ্ট্রেলিয়া হইতে কোন অংশে হীন বলিয়া মনে করিত না। আর আজ জাপানের দশ বছরের বালকবালিকাও জানিতে পারিয়াছে যে ভারতবাসী কি ভাবে আছে। এদিকে রুষযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপগণ ধরাকে সরাজ্ঞান করিতে থাকে। করিবে না কেন? মহা মহা জাতিগণও যে উহাদের বন্ধুত্ব লাভের জন্য লালায়িত! তাই গত তিন বৎসর যাবৎ আমরা জাপানের রাস্তাঘাটে নিগ্রো নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছি। পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে নব্য সুসভ্য মার্কিণ দেশের অধিবাসীগণ ভারতবাসীকে নিগ্রো বলিয়া টিটকারী দিয়া থাকে এবং হোটেল রক্ষক অর্থের লোভও সম্বরণ করিয়া ভারত-বাসীকে হোটেল হইতে তাড়াইয়া দেয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি শুধু মার্কিণ জাতি নহে আমাদের ধর্ম্মশিষ্য, মোঙ্গল জাতীয় জাপগণও আমাদিগকে পায় ঠেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুনিয়ায় মস্তক গুঁজিবার স্থানটুকু নাই। আমাদের অবস্থা অনেকটা বিপদাপন্ন জয়দ্রথের অবস্থার ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। আজকাল আমরা জাপানিদের উপহাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছি। পাগলের পিছনে দলে দলে যেরূপ লোক ছুটে, ভারতবাসীর পিছনেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানের সংবাদ পত্রে ভারতবাসীর কুৎসা গ্লান সামাজিক ত্রুটি প্রভৃতি অতিরঞ্জিত হইয়া যে ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতে সর্ব্বসাধারণের ভিতর ভারতবাসীর কলঙ্করাজিই কেবল প্রচারিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র পুস্তকে ভারতবাসীর যেরূপ রূপ-বর্ণনা করিয়া ছোট ছোট বালকবালিকার নিকট আমাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে তাহা কোন অংশেই রামায়ণের রাক্ষসের রূপ বর্ণনার চেয়ে উঁচুদরের বলিয়া মনে হয় না! হরিদাসের গুপ্তকথায় রক্তদন্তের রূপের বর্ণনা পড়িলে যেমন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, ভারতবাসীর রূপের চিত্র পাঠ করিয়া জাপানের বালকবালিকার মনেও সেই ভাবের উদয় হয়। ভারতবাসীর প্রতি জাপানিদের এই সকল প্রীতির নিদর্শন দেখিয়াই কাব্যবিশারদ মহাশয় দুএক দিনের জন্য জাপানে পদার্পণ করিয়াও লিখিয়াছিলেন; জাপান ভারতের মিত্র নয়।

রাস্তাঘাটে এইরূপ টিটকারী পাইলেও আমেরিকা এবং জাপানের বিশিষ্ট ভদ্রলোকের আমাদের প্রতি ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভদ্রলোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে আমরা অতি সদয় ব্যবহার পাইয়া থাকি। জানি না সে ব্যবহার কৃত্রিম কি না।

জাপান এবং ভারত এই দুই দেশের মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিপায় এতদুদ্দেশ্যে তোকিও সহরে প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে জাপানস্থ কতিপয় ভারতীয় ছাত্র এবং কতিপয় জাপানীর প্রযত্নে ইন্দোজাপানীজ এশোশিয়েশন নামক একটি সমিতি গঠিত হয়। প্রথম তিন বৎসরকাল ভাইকাউণ্ট নাগাওকা নামক জনৈক সদাশয় লর্ড উহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি পার্লিয়ামেণ্টের হাউস অব পিয়ার্সের একজন সভ্য। তিনি জাপানস্থ ভারতীয় ছাত্রদিগকে নিজের ছেলের মত চেহারা এবং স্নেহবিজড়িত মিষ্টভাষা ভুলিতে পারি নাই। ভারতের ছেলেরা যাহাতে কলেজ, স্কুল এবং কারখানায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি নিজে এখানে ওখানে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের পিতৃস্থানীয় হিতৈষী বন্ধুকে হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর জাপানের খ্যাতনামা কাউণ্ট ওকুমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনি জাপান্ সম্রাটের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ছিলেন: জাপানে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখিয়া সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে আশাতেই অনেক চেষ্টায় কাউণ্টকে প্রেসিডেণ্ট করা হয়। কে জানে যে ইহাতে "কৃষ্ণসর্প বিনাশার্থে নির্ব্বোধ বক নকুলকে আপন কুলায় দেখাইয়া দিল" এরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। অমৃতে গরল উদ্গীরণ হইতে লাগিল; সে হলাহলে ভারতবাসীই জর্জ্জরিত হইতে বসিয়াছে।

ভারতের প্রতি কূটনীতিজ্ঞ কাউণ্ট ওকুমার কুদৃষ্টি পড়িয়াছে। কাউণ্ট এই সমিতিসূত্র অবলম্বন করিয়াই ভারতের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সমিতি এখন সম্পূর্ণ জাপানী সম্পত্তি। কি উপায়ে জাপান ভারতের অর্থ শোষণ করিয়া ধনবান হইবে সমিতির এখন ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কাউণ্ট প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর সভ্যসংখ্যা বিশেষতঃ বণিক সভ্যসংখ্যা দলে দলে বৃদ্ধি পাইতেছে, ধনকুবের ব্যারণ শিবুছাওয়া প্রমুখাৎ ব্যক্তিগণও সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতেছেন। আমাদের তুমুল স্বদেশী আন্দোলনের সময়

সভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন "ভারতে রত্নরাজি ছড়ান রহিয়াছে; শুধু কুড়াইয়া আনিতে হইবে মাত্র। ভারতবাসী বিলাতী-পণ্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; এ সময় আমাদের মাহেন্দ্রযোগ। অক্ষমতায় আমরা যদি এ সুযোগ হারাই তবে সে ত্রুটির পরিণামে বিস্তর ক্ষতি দাঁড়াইবে। অতএব তৈজসপত্র-সহ ভারতপথে অগ্রসর হইতে হইবে।" ইত্যাদি। প্রেসিডেন্টের ভারতের প্রতি অনুরাগ অসীম বলিয়াই বোধ হয় এরূপ সুদৃষ্টি!

সমিতির প্রথম অবস্থায় যখন ভারতীয় ছাত্র জাপানে মাত্র ৪।৫ জন ছিলেন তখন ভারত পক্ষ হইতে ৪জন এবং জাপানী পক্ষ হইতে ৮জন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মেম্বর ছিলেন। দুই পক্ষে দুই জন সেক্রেটারী এবং দুই জন কোষাধ্যক্ষ। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ জাপানিদের একচেটিয়া। শেষোক্ত দুই পদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যেহেতু উঁচুদরের লোকই ঐপদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমরা ঐপদের উপযোগী নহি। দুই বৎসর আমি এই সমিতির কোষাধ্যক্ষ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মেম্বর ছিলাম। শুধু এই সমিতির সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছি তাহার আলোচনাতেই জাপান ও ভারতের বর্ত্তমান সম্বন্ধ বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সমিতির দ্বারা আমাদের লোকসান ব্যতীত লাভ নাই। অথচ ভারতীয় ছাত্রগণ ঐ সমিতির সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতেও পারিতেছে না যেহেতু সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে হয়ত দ্বিতীয় দিবসই জাপান উপকূল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারে। তাই উভয় সঙ্কট উপস্থিত।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় এক সার্কাস কোম্পানী জাপানে গিয়াছিল। এই কোম্পানীর কয়েক শত টাকা অর্থ সাহায্যে সমিতি সুন্দরভাবে মুষ্টিমেয় সভ্যদ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। এদিকে জাপানস্থ ভারতীয় বণিকগণও অনেকে বার্ষিক ১২ ইয়েন অর্থাৎ পৌণে উনিশ টাকা চাঁদা দিতে লাগিলেন। জাপানীরা প্রথম কয়েক বৎসর এক কপর্দ্দকও পকেট হইতে বাহির করেন নাই। কোন কোন ভারতীয় ছাত্র কেবল বার্ষিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া আসিতেছিলেন। এইরূপে ভারতীয় আর্থিক সাহায্যেই জাপানের সমিতি চলিতে থাকে। সমিতির টাকা ব্যাঙ্কে রাখা হয়। উহার একাউন্ট বুকখানা কোষাধ্যক্ষের নিকট থাকিবার কথা, এবং টাকা তুলিবার বেলায় সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ উভয়ের স্বাক্ষর আবশ্যক। আমি কোষাধ্যক্ষ হইলেও দুই বছরের ভিতর একাউন্ট-বুক আমার হাতে আইসে নাই। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সাকুরা মহাশয় উহা একরূপ নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন। নিজেই টাকা তুলিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী খরচ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি নামেই পর্য্যবসিত; দুই বছরে একবারও আহূত হয় নাই। সমিতির অধিবেশন মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

সমিতির বাঁধাবাঁধি তেমন কোনই কায নাই; অথচ সেক্রেটারী আপন ইচ্ছায় নিজের বাড়ীতে একজন কেরাণী রাখিয়াছেন উহার মাহিয়ানা সমিতির ফণ্ড হইতে দেওয়া হয়। কিজন্য কেরাণী রাখা হইয়াছে জিজ্ঞাসা

করিলে সেক্রেটারী মহাশয় উত্তরে বলেন, ভারত হইতে রাশি রাশি চিঠিপত্র আসে, উহার উত্তর দিতে কেরাণীর দরকার। বলাবাহুল্য যে সকল চিঠির জবাব দেওয়া হয় উহার পৌণে ষোল আনাই ভারতীয় ছাত্রগণ লিখিয়া দেন,—যেহেতু কেরাণী বাবু ইংরাজী ভাষায় বৃহস্পতি নহেন। আর একটি কথা, যাঁহারা জাপানী কারখানায় প্রস্তুত জিনিস ভারতে আমদানী করিবার প্রয়াসে পত্র লিখিতেন সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহাদের পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্যই কেবল উদ্‌গ্রীব, আর যাঁহারা জাপানে রপ্তানী করিবার প্রয়াসী হইয়া হাতীর দাঁত, সোনারূপা এবং শ্বেত পাথরের জিনিস পত্র, ঢাকাই মসলিন কিম্বা অন্যান্য ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের ব্যবসায়ী বণিকদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি প্রার্থী হইয়া পত্র লিখিতেন তাঁহাদের পত্র আবর্জ্জনা রাশিতে নিক্ষিপ্ত হইত।

পূর্ব্বে চেম্বার অব কমার্সে কাউণ্ট ওকুমার যে বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছি বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে সে বক্তৃতার বিশেষ সমালোচনা হইতে থাকে। কাউণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া প্রতিকারের উপায় দেখেন। তাঁহার বক্তৃতায় কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিলনা তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি পিয়ার্স ক্লাবে ইন্দোজাপানীজ্ এশোশিয়েসনের এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সভান্তে এক মহা-ভোজের বন্দোবস্ত করা হয়। তাহাতে ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধির (British Ambassador) নিমন্ত্রণ ছিল। অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তাঁহার প্রধান সেক্রেটারীকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করেন।

ঐ অধিবেশনে সমিতির জাপপক্ষীয় সেক্রেটারী বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন। উহাতে জানা গেল আমাদের অর্থাৎ ভারতপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার জন্য আমাদের অর্থ হইতেই ২২৫৲ দুইশত পঁচিশ টাকা খরচ করা হইয়াছে। সেদিন সভাপতি হইয়াছিলেন কাউণ্ট ওকুমা এবং গণ্যমান্য লর্ড এবং পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরগণও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে আমি প্রতিবাদ উপস্থিত করি; যেহেতু ঐ সভার অধিবেশন কখন কি উপলক্ষে হইয়াছে তাহা ভারতপক্ষের সাধারণ সভ্য দূরের কথা সেক্রেটারীকে পর্য্যন্ত জানান হয় নাই; সুতরাং উহা ইন্দোজাপ-সমিতি না হইয়া কেবল জাপসমিতির অধিবেশন বলিতে হইবে! অতএব ঐ ২২৫৲ টাকা আমাদের সাধারণ ফণ্ড হইতে বহন করা যাইতে পারে না। প্রত্যুত্তরে সেক্রেটারী সাকুরামহাশয় এবং অপর দুই একটি গণ্যমান্য সভ্যও বলিলেন যে, সে অধিবেশনে এমন কতকগুলি কথা ছিল যাহা ভারতবাসীর পক্ষে অপ্রীতিকর সেই জন্য ভারতপক্ষীয় মেম্বরগণকে উপস্থিত হইতে বলা হয় নাই।

সমিতির উদ্দেশ্য কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন না করিয়া দুই দেশের লোকের ভিতর বন্ধুত্ব স্থাপন। অথচ উহারা আমাদের বিরুদ্ধে সভা করিয়া আমাদের ফণ্ড হইতেই খরচ চাহিতে লজ্জা বোধ করে না। যখন খরচের কথা ছাড়িয়া সেক্রেটারীর অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতে-ছিলাম সেই সময় জাপানীপক্ষের দুই জন সংবাদপত্রসম্পাদক সভ্যও সেক্রেটারীর

স্বেচ্ছাচারিত্বের কথা বলিতেছিলেন। ক্রমেই গোল বাধিবার উপক্রম দেখিয়া সভাপতি মহাশয় নিকট-ভবিষ্যতে গোলমাল মিটাইয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বলাবাহুল্য নিকট-ভবিষ্যৎ সুদূরে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের ভারতীয় সভ্য সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় আমাদের পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মেম্বর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইল। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল; কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইল যে পূর্ব্বে আমরা কমিটিতে উহাদের অর্দ্ধেক ছিলাম আর আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করার পর জাপানীগণের সংখ্যা বাড়িয়া আমাদিগকে ⅓ করিয়া দিল। কিছুতেই ইহা অন্যথা করিবার উপায় নাই। কি করি —আমরা তাহাদের যথেচ্ছবিচারেই সন্তুষ্ট রহিলাম! বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব, সভ্যদের নাম, ধাম, ব্যবসা ইত্যাদি কার্য্যবিবরণী সমস্তই ইংরাজীর পরিবর্ত্তে জাপানী ভাষায় ছাপাইয়া বিলি করা হয়; ঐ সমস্ত ইংরাজীতে হইলে সকল সভ্যই বুঝিতে পারে, আর জাপানী অক্ষর ভারতীয় সভ্য মাত্রেরই নিকট দুর্ব্বোধ্য। উহাদের কি অভিপ্রায় উহারাই জানে!

ঐ সভাতেই জাপানী সেক্রেটারী সমিতির হিতৈষীদিগকে ধন্যবাদ দিবার সময় অনেকগুলি জাপানীর নাম উল্লেখ করিয়া স্তোত্র গাহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতীয় যাঁহারা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাঁহাদের অর্থে সমিতি পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল তাঁহাদের নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হইল না। ধন্য সুসভ্য জাপান! জানিনা ভূতলে এমন স্বার্থপর দেশ দ্বিতীয় একটি আছে কি না।

জাপানে আমাদের দেশের কোন গণ্যমান্য বড়লোক যাওয়া মাত্রই চাঁদারখাতা হাতে লইয়া সাকুরা মহাশয় গিয়া উপস্থিত হন। একবার প্রাতঃস্মরণীয় তাতার ভ্রাতুষ্পুত্র তোকিও সহরে যাওয়া মাত্র খাতা লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমিতির সাহায্য বাবদ দুই সহস্র ইয়েন অর্থাৎ তিন হাজারেরও অধিক টাকা আদায় করেন। আমার মনে হয় অধঃপতিত জাতির লোক তাহার স্বদেশীকে বিশ্বাস করে না। তাই তাতাসাহেব ভারতপক্ষীয় সেক্রেটারী কিম্বা কোষাধ্যক্ষকে ঐ টাকা না দিয়া বিদেশীর হাতে অর্থ তুলিয়া দিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহাকে জাপানস্থ ভারতীয় ছাত্রদের বাসস্থান ইণ্ডিয়া হাউসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। হাউসের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী কাযেই আমাদের প্রার্থনায় তিনি টলিবেন কেন? যে তাতার নাম স্মরণ করিলে ভারতীয় শিল্প বিজ্ঞানে যুগান্তরের কথা মনে পড়ে সেই তাতার বংশধর দেশের শিক্ষিত যুবকদের শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার সাহায্য-প্রার্থনা পায় ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন! জাপানীদের হস্তে তিন হাজার মুদ্রা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াই আমাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তার পর ভারত হইতে ইন্দো-জাপানীজ্ এশোশিয়েসনের সাহায্যকল্পে কাউণ্ট ওকুমার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনও দেখিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ; জানি না তিনি কতদূর কৃতকার্য্য

হইয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, কাউণ্ট ওকুমাই ভারতের উদ্ধার সাধন করিবেন। ভারতীয় ছাত্রগণ তত্রস্থ ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরীর সাহায্যবাবদ এক শত টাকা পাইলেও বিশেষ উপকৃত বোধ করিতেন; কিন্তু ধনকুবের তাহাতেও কুণ্ঠিত হইলেন!

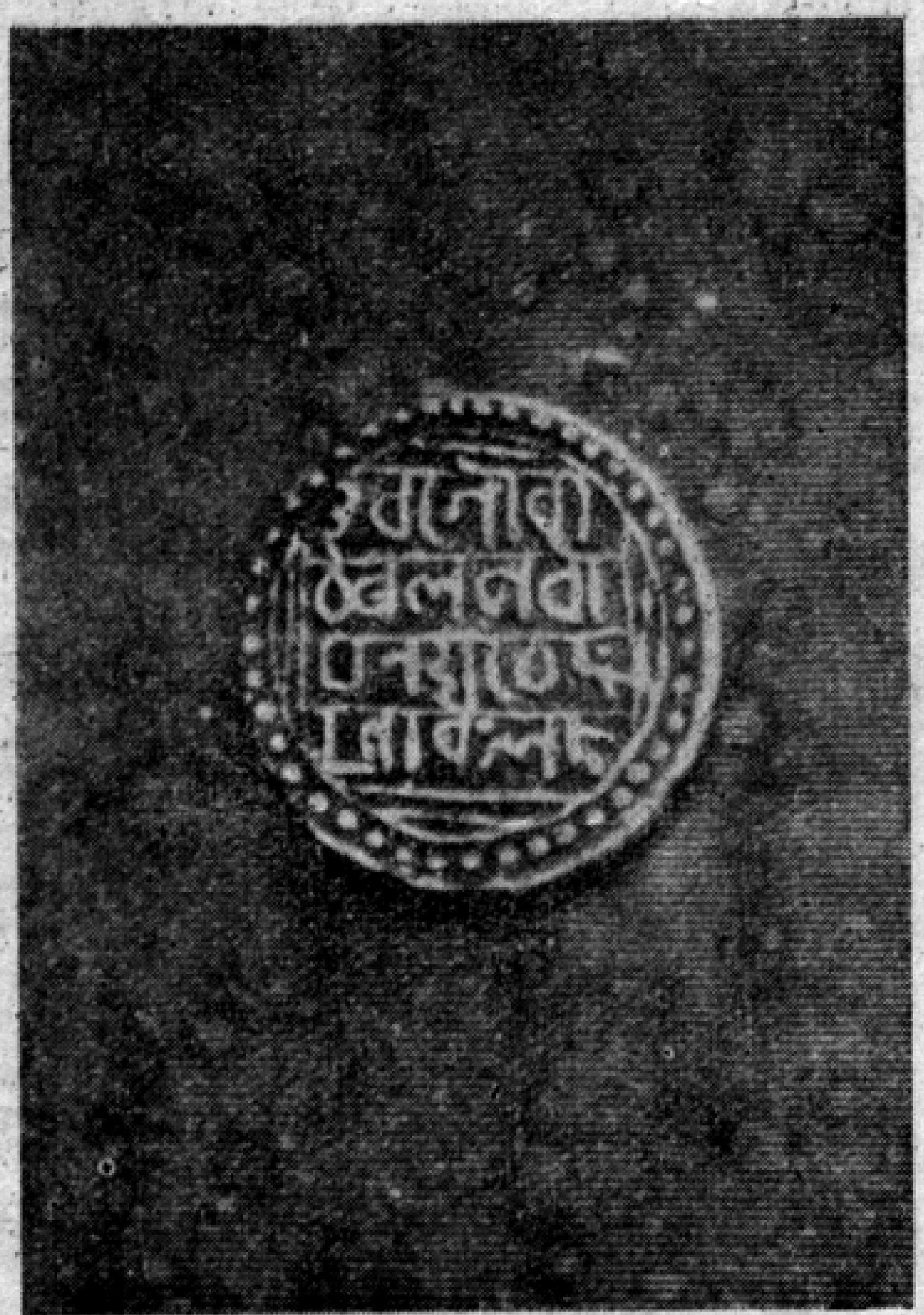
(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ সরকার।

রাজা মেঘনারায়ণের মুদ্রা

বিগত ভাদ্র সংখ্যা "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় "অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রদত্ত উপাদান অবলম্বনে" শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় "মাইবংএর ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধে একটী ঐতিহাসিক সমস্থার সূচনা করিয়াছেন। ইতি-মধ্যে গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভার কর্ত্তৃত্বে সভাধ্যক্ষ অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি" নামে একখানি সচিত্র, অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ঢাকা রিভিউতে প্রকাশিত "মাইবংএ প্রাপ্ত প্রস্তর লিপি দুইখানি"র ইতিহাস "দণ্ডবিধি" গ্রন্থেও মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইখানি প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে "শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত রাজা হৈ মাইবাঙ্গ রাজত পাথরে সিংহদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দা ১১৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।"

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে প্রস্তুতের সময়ে একস্থানে সাতটী মুদ্রা পাওয়া যায়। স্থানটি হাফলং ষ্টেশনের আরও উপরে অবস্থিত। ঐ সাতটী মুদ্রার একটী মুদ্রা বর্ত্তমানে আমার নিকট আছে। নিম্নে তাহার চিত্রপ্রদত্ত হইল।





ইহাতে

"হরগৌরীচরণপরায়ণ হাচেঙ্গসা বংশজ শ্রীশ্রীমেঘ নারায়ণ ভুপালস্য শাকে ১২৮৮"

এই কথাগুলি লিখিত আছে। হরগৌরী চরণপরায়ণ হাচেঙ্গসা বংশজ শ্রীশ্রীযশোনারায়ণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মেঘনারায়ণের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি মাইবঙ্গের নিকটে মেঘনারায়ণদেবের

শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সকল শিলালিপির তারিখ ১৪৯৮ শক। শিলালিপিগুলি মুদ্রার প্রায় ২১০ বৎসর পরে খোদিত হইয়াছিল। শিলালিপির অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। লিপিবর্ণিত "ধ" "ঙ্গ" "স" প্রভৃতির আকৃতি মুদ্রাবর্ণিত উক্ত অক্ষরগুলির আকৃতির সহিত তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে। মুদ্রালিপির ভাষা সংস্কৃত, শিলালিপির ভাষা প্রাদেশিক; শিলালিপি যে পরবর্ত্তী কালের ক্ষোদিত ইহাও তাহার একটা প্রমাণ। আহোম আক্রমণের এবং শিলালিপির তারিখের মধ্যে প্রায় ৩৫০ বৎসরের ব্যবধান, পরন্তু মুদ্রার তারিখের সহিত আহোম আক্রমণের ব্যবধান মাত্র ১৪৭ বৎসর। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে হাচেঙ্গসা বংশে দুই জন মেঘনারায়ণ জন্মিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, এবং মুদ্রাবর্ণিত মেঘনারায়ণ ভূপাল শিলালিপির মেঘনারায়ণদেবের ২১০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুদ্রাবর্ণিত রাজা মেঘনারায়ণ কে এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে এই বিষয়ের স্থির মীমাংসা পণ্ডিতমণ্ডলীর উপরই নির্ভর করিতেছে।

হাচেঙ্গসা শব্দের অর্থ "হাচঙ্গ সন্তান", "হাচেঙ্গ বংশধর"। 'হাচেঙ্গসা' কাছাড়ী জাতিদের একটা "সেমফং" অর্থাৎ গোত্র মাত্র। কাছাড়ীদের মধ্যে স্ত্রীলোক বিবাহিত হইয়াও স্বামীর গোত্র গ্রহণ করে না। পুত্রসন্তানই পিতৃগোত্রের অধিকারী। স্ত্রীলোকের গোত্রকে "জুলু" ও পুরুষের গোত্রকে "সেমফং" বলে। কাছাড়ী জাতির মধ্যে জুলুর সংখ্যা ৪২ ও সেমফংএর সংখ্যা ৪০। হাচেঙ্গসা এই ৪০টী 'সেমফং'এর মধ্যে একটি। "হাচেঙ্গ" শব্দের অর্থ "গৃহতাড়িত" "ভ্রমণনিরত" সম্প্রদায় বলিয়া মনে হয়; কারণ ১৮৮১ খৃঃ অব্দের আদমসুমারি রিপোর্টে বোড়ো (Bodo) ধর্ম্মাবলম্বীদের দেবতা "হোচেঙ্গ মাধাই"এর নামোল্লেখ আছে। এবং ঐ দেবতা "God of the Travellers" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব হাচেঙ্গসা বংশ বলিতে কোনও ভ্রমণনিরত সম্প্রদায়কে ধরিয়া নেওয়া নিতান্ত অসমীচীন না হইতে পারে। পরন্তু মাইবঙ্গে অবস্থান করিলে কাছাড়ী জাতিকে 'ভ্রমণনিরত' সম্প্রদায় বলিয়াই মনে হয়। এই সম্পর্কে কাছাড়ী জাতির ইতিকথার আলোচনা প্রয়োজন।

কাছাড়ের নৃপতিগণ আপনাদিগকে হিড়িম্বেশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। তাঁহাদের ধারণা যে হিড়িম্বাসুরের ভগিনী হিড়িম্বার গর্ভে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

এই ঘটোৎকচ মহাবীর কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভারত প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহারই বংশে কাছাড়ের নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহারা সকলেই "নারায়ণ" উপাধিভূষিত —ইহা একটা মোটামোটি কথা মাত্র! গিরিনদী-কানন-কান্তার-সমাকীর্ণ উত্তর-পূর্ব্ব ভারত অতি প্রাচীনকালে এক সময়ে আর্য্য সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এমন ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। ভুবন পাহাড়ের ও ঊনকোটি তীর্থের দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ প্রাগৈতিহাসিক যুগের উন্নত আর্য্যসভ্যতার নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত (জেনারেল ম্যাক্‌ম্যাহোন ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে "Burmese border tribes and trade routes" নামক প্রবন্ধে খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব শতাব্দীতে ইরাবতী উপত্যকা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত আর্য্য উপনিবেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার প্রান্তভূমিতে অনেকগুলি প্রাচীন পীঠস্থান ও দেবস্থানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে চীন দেশে মঙ্গোলীয় জাতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পূর্ব্ব ভারতে আর্য্য ও অনার্য্যের

বিষম সংঘর্ষণে সে বন্থান সমাকীর্ণ আর্য্য সভ্যতার লীলাক্ষেত্র প্রদেশগুলি অনার্য্যসেবিত বিপুল অরণ্যাণিতে পরিণত হয়। এই বিলুপ্ত আর্য্যসভ্যতা প্রচারে হিন্দু ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও ব্রতী ছিলেন, কারণ আসামের অরণ্যে ২।১টী বুদ্ধমূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আসামের সীমান্ত প্রদেশ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্বে মহাসাগর পর্য্যন্ত এখনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের অভাব নাই।

সেই বিলুপ্ত আর্য্য সভ্যতার সহিত ঘটোৎকচ নারায়ণের সংস্রব অসম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে সকল নরপতি আপনাদিগকে ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহারা বাস্তবিক পাণ্ডব সংসৃষ্ট কিনা ইহাই বিবেচনার বিষয়।

কাছাড়ী রাজমালায় দৃষ্ট হয় যে ঘটোৎকচ হইতে শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র পর্য্যন্ত ১০৩ জন নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাজমালায় রাজগণের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই; এবং বর্ত্তমানে আমরা অরণ্যগর্ভ হইতে যে সকল নরপতির প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি প্রাপ্ত হইতেছি তাহাদের স্থানও ঐ রাজমালায় নাই। এই অবস্থায় রাজমালার নির্ভুলত্বে বিশেষ সন্দিহান হইবার কথা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে রাজমালায় রাজাদের নামে পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকিলেও, শিলালিপিতে ও মুদ্রাদিতে নামাঙ্কিত নরপতিদের নামের সামঞ্জস্য না রহিলেও, কাছাড়ী রাজগণ পাণ্ডববংশধর হইতে পারেন। কিন্তু কাছাড়ী জাতির ৪০টী —সেমফংএর আলোচনা করিলে—দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন গোত্রের লোক বিভিন্ন সময়ে রাজপদের অধিকারী হইয়াছেন। বড (বৌদ্ধ?) প্রথম রাজবংশ বলিয়া পরিচিত, তৎপরে হুপাছেথাঙ, হুপাপারাইন, ঠাওছেন, ছিঙ্গইযুং, হাচেঙ্গ, প্রভৃতি গোত্রাধিকারীরাও রাজবংশী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই বিভিন্ন রাজবংশের কেহ কেহ—নিকৃষ্ট জাতীয় জারজ সন্তান ছিলেন, উত্তর কাছাড়ে প্রচলিত অনেক ইতিকথায় এমন আভাস যথেষ্ট আছে। এই অবস্থায় আধুনিক রাজগণের প্রাচীন বংশমর্য্যাদার দাবী শিথিল হইয়া পড়ে। রাজা মেঘনারায়ণের হাচেঙ্গসা বংশ পাণ্ডবগৌরবে গৌরবান্বিত হইবার উপযুক্ত কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পরন্তু আহোম জাতির আক্রমণের পূর্ব্বে এতদঞ্চলের অবস্থা স্মরণ করিলে আর এক দিক হইতে এই হাচেঙ্গসা বংশের উপর যথেষ্ট আলোক পতিত হয়। ১২২৯ খৃঃ অব্দে সৌমার দেশের রাজা চুকাফা 'অসম' সৈন্য লইয়া কামতি ভূমিতে রাজ্যস্থাপন করেন। এই কামতি প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও বর্ত্তমান কামরূপ। তৎপূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভদ্রসেন নামক জনৈক রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন এবং গৌড়ে তখন হিন্দুরাজ্য বাহাল ছিল। সেই সময়ে শ্বানগিরি পর্ব্বতে বিবর নামে জনৈক চুটিয়া গৃহস্থ কুবেরের অনুগ্রহে অজস্র ধনরত্ন লাভ পূর্ব্বক শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং "পর্ব্বতেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ভদ্রসেন রাজাকে পরাস্ত করিয়া রত্নপুর নামক নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক

নিজে রত্নধ্বজ পাল নামগ্রহণ করেন। তিনি বারেন্দ্র ভূমির রাজা নরপালের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম গৌরীনারায়ণ ছিল। এই বংশের নৃপতিগণেরও উপাধি 'নারায়ণ' ছিল। কাছাড়ী রাজমালায় 'ভদ্রসেন' রাজার নামোল্লেখ আছে, এবং কাছাড়ী রাজগণ এক সময়ে কামরূপে ১২০ বৎসর রাজা ছিলেন এমন একটা কিংবদন্তীও আছে। এই কিংবদন্তীর মূলে যদি কোনও সত্য থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে ১২২৯ খৃঃ অব্দে অহোম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাপনের পূর্ব্বে কাছাড়ী রাজগণ কামরূপের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কামতীশ্বর ভদ্রসেন ও কাছাড়ী রাজমালার ভদ্রসেন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। চুটিয়া বিবরের পুত্র বিজয়ধ্বজ পাল কামতীশ্বরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র ও কামরূপের রাজগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিবর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল পবিত্র বলিয়া মনে করা তাহার প্রমাণ। চুটিয়ারাজ ভদ্রসেন-বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই, বরং উভয় রাজবংশকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ এবং ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপস্থ প্রদেশে বিস্তর বনদুর্গ ও সদিয়া নগর সংস্থাপন করেন।

কিছুদিন পরেই সমস্ত কামতি প্রদেশে ইন্দ্রবংশীয় রাজার অনুচর "অসম" সেনার প্রাদুর্ভাব হয়। 'অসম'গণ বাহুবলে— কামতীশ্বরগণকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যাধিকারী হন। তখন কামতীশ্বর জাতীয়

কেহ অসমদের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক "রামসা" নামে পরিচিত হইয়া উঠিল, আর যাহারা স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া অরণ্যচারী হইলেন তাহারা নিজদিগকে "ডিমাসা" নামে পরিচয় দিয়া ডিমাপুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডিমাসা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ডিমাসা শব্দে "ব্রহ্মপুত্র বংশীয়" আর কেহ কেহ ডিমাসা শব্দে "হিড়িম্বা-বংশীয়" বুঝিয়া থাকেন। যদি রত্নধ্বজ কর্ত্তৃক পরাজিত কামতীশ্বর ভদ্রসেন রাজাকে কাছাড়ী রাজমালার হিড়িম্বা বংশীয় ভদ্রসেন হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে আপত্তি না থাকে তবে ডিমাসা শব্দের দুইটী অর্থই একার্থবাচক এবং দুইটী অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। বিশেষতঃ কেহ কেহ কাছাড়ী কামতীশ্বরকে "ব্রহ্মপুত্র বংশীয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে কাছাড়ী রাজা উদয়ভীমনারায়ণ কামরূপে রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া রাজমালায় উল্লেখ আছে এবং উদয়ভীমনারায়ণের স্থান ভদ্রসেন রাজার বহুপরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই অনৈক্য সামঞ্জস্য সংস্থাপনের প্রতিকূল; কিন্তু রাজমালার পৌর্ব্বাপর্য্য-জ্ঞানহীন ভ্রমসঙ্কুল বর্ণনার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না। এই জন্য ডিমাসা শব্দের উভয় ব্যাখ্যাই একার্থবাচক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি দেখি না।

তারপর আর একটী কথা—রাজারত্নধ্বজ চুটিয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অসভ্য পার্ব্বত্য চুটিয়া ও তৎকালীন সভ্যতর ব্রহ্মপুত্র বংশীয় সমতলক্ষেত্রবাসী কামতীশ্বরগণের মধ্যে ভাবাগত বা মূলতঃ বিশেষ কোনও

সভ্যতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অহোম আক্রমণের পরে ব্রহ্মকুণ্ড প্রদেশের চুটিয়ারাজগণ যেমন একদিকে বহুদিন পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ রাজ্যভ্রষ্ট অরণ্যচারী ভ্রমণনিরত (হাচেঙ্গসা) কামতীশ্বরগণ দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রান্তে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও এই দুই সম্প্রদায়ের আচারে অনুষ্ঠানে অনেক মিল ছিল।

চুটিয়া দেউরীগণ (পুরোহিতগণ) সদিয়ার নিকটে তাম্রেশ্বরী মাতার মন্দিরে নরবলি প্রদান করিতেন, কাছাড়ী রাজগণ মাইবং ষ্টেশনের নিকটে রণচণ্ডীর মন্দিরে নরবলি প্রদান করিতেন। দেউরী চুটিয়াগণ "কেচাখাতি" (পিশাচী) দেবীর পূজা করিতেন, "হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি" গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশ যে কাছাড়ীগণ নাকি আজ পর্য্যন্তও "কেচাইখাম্বির" পূজা দিয়া থাকেন। তারপর, দেউরীগণের ভাষায় ও কাছাড়ী ভাষায় ব্যাকরণগত বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কর্ণেল ডেল্টন (Colonel Dalton) ও মিষ্টার ব্রাউন (Brown) প্রভৃতি তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অবশ্য চুটিয়ারা বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণ সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া কাছাড়ীদের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। দীর্ঘকাল অবধি স্বাধীনতাহীন হইয়াও হিন্দুসংস্রবে আসিয়া আজ তাঁহারা আপনাদের আচার, ব্যবহার ও ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু শিবসাগর জেলার অন্তঃপাতী মাজুলিদ্বীপে এই লুপ্তপ্রায় চুটিয়া দেউরীগণ এখনও বাস করিতেছেন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন ভাষা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান নাই। তাহাদের ভাষা অবলম্বন করিয়াই ডেলটনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ কাছাড়ী ও চুটিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই অবস্থায় রাজা মেঘনারায়ণকে চুটিয়া সম্পর্কযুক্ত ভদ্রসেন রাজার বংশীয় দক্ষিণপূর্ব্ব শাখাভুক্ত রাজা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ভদ্রসেন বংশীয় রাজগণ হিন্দু রাজা ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

পার্ব্বত্য চুটিয়া বিবর প্রভৃতি উহাদের সংস্রবে আসিয়া 'নারায়ণ' উপাধি গ্রহণ করেন ও স্থাপিত নগরগুলির সংস্কৃত নাম রাখেন। অবশ্য এই বিষয়ে বারেন্দ্র ভূমির নরপালদুহিতার সহিত বিবরের বিবাহও যথেষ্ট কার্য্যকারী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তারপর হাচেঙ্গসা বংশ "হরগৌরীচরণপরায়ণ" বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রণচণ্ডী প্রভৃতি হিন্দুদেবতার প্রভৃতি অনুরাগ এই বংশের একটী বিশেষত্ব। মুদ্রাবর্ণিত মেঘনারায়ণ ভূপাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত ডিমাসা উপনিবেশ মাইবং নগর সংস্থাপনের বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় হরগৌরীচরণপরায়ণ প্রথম মেঘনারায়ণ ভূপালের সহিত 'হাইয়ংথল' নামক স্থানের শিবমন্দিরাদির কোনও সংস্রব আছে কি না জানিনা।

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব।



বেহুলা তাহার স্বামীকে লইয়া কলার ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

দুই খাতা

(গল্প)

আপিসে আমি হিসাবের খাতা লিখি বলিয়া তোমরা কেহ মনে করিও না আমি লোকটি নিতান্ত নীরস। ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখিতাম; এবং যে বয়সকে ঠিক ছেলেবেলা বলা যায় না সে বয়সেও কবিতা লিখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, ভগবান আমাকে কবিত্ব শক্তি দিয়া ইহসংসারে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও যে আমার কবিত্ব-খ্যাতি এখনও দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে নাই তাহার জন্য দায়ী আমি নহি। আমাদের বাড়ীর লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল এবং এমন কি মাসিকপত্রের সম্পাদকগুলা পর্য্যন্ত বরাবর আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কেহ কখনো আমাকে এতটুকু উৎসাহ দেয় নাই।

কবিতা লেখার জন্য ছেলেবেলায় অভিভাবকদের নিকট হইতে যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছি তাহা বলিবার নয়। যেন কী ভয়ানক অন্যায় করিয়াছি এমনি ভাবে তাঁহারা আমাকে শাসন করিতেন। ছেলেবেলায় বয়সের চাঞ্চল্যে লুকাইয়া লুকাইয়া মাসিকপত্রে কবিতা পাঠাইতাম;—পাছে উৎসাহ পাইয়া আমি একজন বড় কবি হইয়া উঠি সেই ভয়ে সম্পাদকরা আমার কবিতা ছাপিত না। কেন রে বাপু, আমি যদি বড় কবি হই তোমাদের সকলকার এত গায়ের জ্বালা কেন? বন্ধুবান্ধবদের নিকটও কবিতা দেখাইতে গেলে লাভ হইত—বিদ্রূপ, টিটকারী! আমি নেহাৎ ভালোমানুষ তাই বন্ধুবিচ্ছেদ হইতে দিই নাই, নচেৎ অন্য লোক হইলে নিশ্চয় লাঠালাঠি করিত।

প্রথম হইতেই আমার গুরুজনেরা আমাকে লেখাপড়ার বাঁধাবাঁধির ভিতর ঠাসিয়া ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি কবি—আকাশের বিহঙ্গমের মতো মুক্তপ্রাণ! বইয়ের মধ্যে দিবারাত্র চাপা পড়িয়া থাকিতে পারিব কেন? মারধোর, শাসন করিলেই হইল! জলের জীবকে কখনো ডাঙায় বাঁচাইয়া রাখা যায়? আমার অভিভাবকরা এই সহজ কথাটা বুঝিতেন না। আশ্চর্য্য!

এমনি করিয়া আমার বয়স বাড়িতে লাগিল, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না; কিন্তু সন্দেহ হইতে লাগিল আমার বিদ্যা সেই পরিমাণে বাড়িতেছে কি না তাহাই লইয়া। আমি হাসিতাম আর মনে মনে বলিতাম—তোমার ঐ পুঁথিপড়া বিদ্যা লইয়া আমার কী হইবে! যতই তাঁহারা আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে হতাশ হইতেন আমি ততই উৎসাহ বোধ করিতাম।

একটা কথা তোমাদের বলিব কি, না ভাবিতেছি। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তাহা হইলে নিশ্চয় এতক্ষণে সেকথা বুঝিয়া লইয়াছ। আমি দরিদ্র-সন্তান। কবিমাত্রেই দরিদ্র এই বিশ্বব্যাপী সত্যটা যে না জানে সে মূর্খ। আমার বিশ্বাস, ভগবান যদি আমাকে কবি না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনো ধনীকুল উজ্জ্বল করিবার জন্য আমাকে তিনি ইহসংসারে পাঠাইতেন।

কবির কাছে দরিদ্র হওয়াটা কোনো লজ্জার কথা নহে; কারণ উহাই তাহার কবিত্বের নিশানা! কিন্তু সংসারে এমন কতকগুলা জঘন্যতা আছে যাহা কবিকে দরিদ্র বলিয়া ক্ষমা করে না। যে কবি চন্দ্রের জ্যোৎস্না, পুষ্পের সৌরভ, কোকিলের কুহুধ্বনিতে বিভোর হইয়া অমর স্বর্গের স্বপ্ন সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে, হায়! তাহাকেই কি না এই মর্ত্ত্য জগতের ডাল, ভাত, কাপড়ের কথা ভাবিতে হয়। অসার অর্থ-ভাবনায় ক্ষণে ক্ষণে তাহার স্বর্গস্বপ্ন টুটিয়া যায়!

এই সত্যটা আমি আগে জানিতে পারি নাই। নিঃসম্বল পিতা যেদিন বিপুল সংসারের ভার আমার স্কন্ধে ফেলিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিলেন সেই দিন এই নির্ম্মম সত্যটা আমার চোখের সম্মুখে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল। কী উপায় আমি ভাবিয়া পাইলাম না। সকলে পরামর্শ দিল, পিতামহাশয়ের পরিত্যক্ত মার্চেন্ট আপিসের পদটি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে। শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল। আমি বরাবর চাকরিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি—খবরের কাগজে পড়িতাম চাকরি করিয়া আমাদের জাতটা উৎসন্ন যাইতেছে। শেষে আমাকেই কিনা সেই চাকরি গ্রহণ করিতে হইবে। হায়! অদৃষ্টে এই ছিল—কেরাণীগিরি!

স্বীকার করি, আমার বাপপিতামহ সবাই পুরুষানুক্রমে কেরাণী-নামের মহিমা বর্দ্ধন করিয়া গেছেন, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকেও কেরাণী হইতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই।—দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদ—কেরাণী-

বাংলা দেশটা যদি বিলাতের মতো হইত তাহা হইলে আমার ভাবনা কিসের। বই লিখিয়াই তো আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতাম—কিন্তু এদেশে বই পোকায় ছাড়া কাটে না! আমার বেশ মনে আছে এই জন্য দেশটার উপর আমার ভয়ানক অভিমান হইয়াছিল। কিন্তু আমি কবি কি, না তাই আমার চিত্ত তখনই বলিয়া উঠিয়াছিল—With all thy faults I love Thee still.

আপিসে প্রবেশ করিতে আমার বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। কারণ আপিসের বড়-বাবু আমাদের প্রতিবাসী—আমার পিতার বাল্যবন্ধু। তিনি হাত ধরিয়া আমাকে আপিসের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। বসিলাম বটে কিন্তু প্রথম প্রথম আমাকে চোখের জলে নাকের জলে হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত অশ্রুবিন্দু কালে মুক্তার দরে বিকাইবে এই ভরসায় তখন মন ঠিক রাখিতে পারিয়াছিলাম, নইলে পাগল হইয়া যাইতে হইত। আপিসের লোকগুলা কি মানুষ? টেবিল চৌকির মতোই তাহারা নীরস কাষ্ঠ! সবাই বসিয়া বসিয়া কেবল হিসাব লেখে, কেহ একটা কবিতা লেখেনা, কবিতার কথা বলেনা;—কবিত্বের সূক্ষ্ম স্পন্দন তাহাদের হৃদয়ে সাড়া তুলিতে পারে না;—তাহারা সংসারের মোটা ভোঁতা কথা ছাড়া আর কোনো কিছুতে আমোলই দেয় না। এদিকে হয়ত দেখিবে বসিয়া বসিয়া বেশ হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব করিতেছে কিন্তু আমি যদি কবিতা শুনাইতে গেলাম অমনি তাহারা গম্ভীর হইয়া উঠিল—যত কাজের তাড়া

শুনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডাই কর্ না। কিন্তু তা নয়। এ হেন অরসিক লোকের সংস্রবে পড়িয়া আমার মনে হইত আমি যেন আমার পৃথিবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কোন্ এক নূতন গ্রহে আসিয়া পড়িয়াছি।

আপিসের কাজে আমি ভালো করিয়া মন দিতে পারিতাম না। শুষ্ক টাকা আনা পাইয়ের হিসাব নিকাশ করিতে আমার প্রাণ নিকাশ হইয়া যাইত। খাতা একই; হিসাবের খাতাও খাতা, কবিতার খাতাও খাতা—কিন্তু এক খাতা হইতে অন্য খাতায় মন কিছুতেই লইয়া যাইতে পারিতাম না। হতাশ হইয়া ভাবিতাম, এমন কোনো আপিস নাই যেখানে হিসাব লিখিতে হয় না, কবিতা লিখিলে চলে। ভারতবর্ষের মতো এতবড় দেশে এমন কোনো রালি ব্রাদার্স কি নাই যাহারা পাট শনের ব্যবসা না চালাইয়া কবিতার ব্যবসা চালাইতে পারে। আমার যদি পয়সা থাকিত আমি নিশ্চয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।

কাজের ভুলচুক আমার দ্বারা ঢের হইত এবং পরিমাণেও যে কাজ কম হইত সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ইহার জন্য বড়-বাবুর নিকট হইতে প্রতিদিন কঠোর তিরস্কার পাইতাম। কিন্তু কি করিব? যাহা দ্বারা যাহা হইবার নয় তাহা সে কেমন করিয়া সাধন করিবে? সোনার পাখীকে তুমি কথা কওয়াইতে পার? বড়-বাবু তাহা বুঝিতেন না;—তাঁহার কাজ চাই!

আমি আপিসের কাজে মন বসাইবার হঠাৎ এমন একটা অভিনব কল্পনা আমার মাথায় আসিয়া আমাকে এমন উত্যক্ত করিত যে সেটার প্রতি অবিচার করিয়া তাচ্ছিল্য করিতে পারিতাম না। মনে হইত, এমন সব অমূল্য রত্ন হাতের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এখন যদি ইহাদের অবহেলা করি, হয় ত আর পাইব না। এই সমস্ত সম্পূর্ণ নূতন তথ্য হইতে জগতকে বঞ্চিত করিবার আমার কোনো অধিকার নাই। কাজেই আমাকে হিসাবের খাতা ছাড়িয়া কবিতার খাতা লইয়া বসিতে হইত। আমি যে কেন হিসাবের খাতা লিখিতাম না তাহা বড়-বাবুর মতো শুষ্ক নীরস লোক কেমন করিয়া বুঝিবে? কাজ ফাঁকি দিয়া আপিসের কোম্পানীর জনকয়েকের যদি কোনো ক্ষতি করিয়া থাকি, তবে তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্ব-মানবের আমি যথেষ্ট উপকার করিয়াছি;—Greatest good to the greatest number.

আপিসের সেদিনকার ঘটনা আমি ইহজন্মে কখনো ভুলিতে পারিব না। এত বড় অপমান কোনো দেশের কোনো কবির ভাগ্যে কখনো ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। ভাই দেশবাসী! তোমাদের আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি—যদি তোমাদের ধমণীতে এখনো এক বিন্দু উষ্ণ রক্ত থাকে, যদি তোমরা মানুষ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাক, তাহা হইলে এ অপমান—তোমাদের কবির প্রতি এ অপমান—পরমারাধ্যা দেবী সরস্বতীর প্রতি এ অপমান তোমরা তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিও না। আমি আবার ডাক দিয়া

হইতেই আমি ইহার প্রতিবিধান চাই। আমার এ ডাক যেন বৃথায় না যায়। আমার এ রোদন যদি অরণ্যে রোদন হয়, তাহা হইলে আমি চীৎকার করিয়া বলিব—বাংলা দেশ অরণ্য, এখানে মানুষ নাই, এখানকার সবাই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ।

সেদিনকার ব্যাপার তোমাদের জানাইব। না জানিলে তোমরা বুঝিবে কেমন করিয়া? সে ঘটনা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া আমি একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলাম, তাহা আগা-গোড়া এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।*

এখন শুনিলে তো। বল দেখি তোমার রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে কি না। বড়-বাবু না হয় আমার পিতৃ-বন্ধু—আপিসের গুরু; কিন্তু তাই বলিয়া এতটা স্বাধীনতা লওয়া কি ভালো হইয়াছে! আমার কবিতার খাতা টানিয়া বাহির করিয়া আপিসের সকলকার সম্মুখে অমনি করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে ব্যঙ্গ-স্বরে পাঠ করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? কবির উপর সম্ভ্রম নাই—কাব্যলক্ষ্মীর উপর শ্রদ্ধা নাই! আর, সকলে কিনা খোসামুদের মতো তাঁহার সহিত যোগ দিল—নির্লজ্জতার হাসি দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। ধিক্! ধিক্! এসব লোককেও তোমরা সমাজে স্থান দাও!

সেদিন আপিসে লাঞ্ছিত হইয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম—দূর হউক আর আপিসের ছায়া মাড়াইব না—যাহা থাকে কপালে! কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিলাম, আমি আপিস ত্যাগ করিলে আমার ক্ষোভ নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু আহা! বেচারা কাব্য-রসাস্বাদ বঞ্চিত কেরাণীকুলের কি হইবে! না, না তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে;—এই পতিতদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে—সে ভার ভগবান আমার উপর দিয়াছেন। সে কার্য্য তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই আমাকে সাধন করিতে হইবে—ঘৃণাভরে দূরে চলিয়া গেলে চলিবে কেন?

—"মেরেছ কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দিব না।"

তোমরা সবাই জানো কবি যদি উৎসাহ না পায় তাহা হইলে তাহার কাব্য স্রোতে ভাঁটা পড়িতে থাকে। আমারও কবিতার প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া আসিত যদি না মাধবীকে পাইতাম। মাধবী আমার ছেলেবেলার সঙ্গী—প্রতিবেশিনী—আপিসের বড়-বাবুরই মেয়ে।

সে ছিল আমার কবিতার বিষয়। এতটুকু ছোট্ট মেয়ে হইলে কি হয়, আমার চোখে সে কখনো মৃণালিনী, কখনো আয়েষা, কখনো জুলিয়েট, কখনো ডেস্‌ডে-মোনা। আমি নিজেও রূপান্তরিত হইয়া যাইতাম—হয় জগৎসিংহ, না হয় রোমিও, না হয় আর কিছু। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া, বসিয়া বসিয়া অ[illegible]ত কবিতা লিখিতাম,—সে কবিতার মধ্যে [illegible] বিচ্ছেদের কাতর

* সম্পাদকীয় মন্তব্য—কাব্যখানি প্রকাণ্ড, স্থানাভাববশতঃ ছাপিতে পারিলাম না। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

ধ্বনি, কখনো মিলনের আনন্দ-গীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। গলার স্বর কম্পিত করিয়া আবেগ ভরে কখনো আয়েষা, কখনো মৃণালিনী বলিয়া তাহাকে ডাকিতাম—সে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। কখনো বা ছুটিয়া গিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া প্রেম-ভিক্ষা করিতাম—নিষ্ঠুর সে ছুটিয়া পালাইত। এত করিয়া তাহাকে বলিতাম আমায় রোমিও বলিয়া ডাকিতে কিন্তু সে কিছুতেই ডাকিতে চাহিত না। একদিন বাজার হইতে একটা ভালো পুঁতুল আনিয়া উপহার দিয়াছিলাম, তাহাতে সে একবারমাত্র আমাকে 'লোমিও' বলিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া পালাইয়াছিল। আহা! সে ডাক আমার কানে এখনো লাগিয়া আছে—সে কি ইহজন্মে তাহা ভুলিতে পারিব!

মাধবী যখন তাহার মায়ের সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য মামার বাড়ী যাইত তখন আমি বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয় লইয়া কী করিব খুঁজিয়া পাইতাম না;—থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতাম; রাত্রে গোপনে বিছানার নীচে পদ্মপত্র লুকাইয়া রাখিয়া তাহার উপর শয়ন করিতাম। আবার মিলনের দিনে হাতের কাছে ফুলের মালা না পাইয়া চড়কের সময় কেনা কাগজকুসুমের তোড়া তাহার হাতে তুলিয়া দিতাম—সে ভারি খুসি হইত। যখন দেখিতাম বহুদিন ধরিয়া মাধবীর সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে না, অথচ বিরহের কবিতা লিখিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছে তখন করিতাম কি, তাহাকে বলিতাম—এস লুকাচুরি খেলি—তুমি লুকাও আমি খুঁজিয়া

—"রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে, রাজ্য, ধর্ম্ম, দয়া,
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জ্জিয়া—"

তাহাকে আকুল হৃদয়ে খুঁজিয়া বেড়াইতাম। এবং তাহার পরই কবিতা লিখিতে বসিতাম।

আমি বুঝিতেছি, তোমরা এসব কথা শুনিয়া হাসিতেছ। কিন্তু তোমরা তো কবিতা লেখ না, তাই জাননা খাঁটি কবিতা লিখিতে হইলে কি রকম মালমসলার প্রয়োজন। কবি যদি বিচ্ছেদ, মিলন প্রভৃতি নানা অবস্থার ভিতর দিয়া না যায় তবে সে বিচিত্র রসের কবিতা লিখিবে কেমন করিয়া? মনে ভাব না উদয় হইলে তো কবিতা লেখা যায় না! ভাব আনিতে হইলে সেই ভাবের উপযুক্ত অবস্থার অভিজ্ঞতা কবির থাকা চাই।

মাধবীকে আমার কবিতা শুনাইতাম। তাহাকে কবিতা শুনাইয়া আর কিছু নাই হোক—একটা সান্ত্বনা ছিল যে সে হিংসালু বন্ধুবান্ধব কিম্বা নীরস আপিসের লোকের মতো শ্লেষ প্রয়োগ করিত না। কবিতার পর কবিতা মনোযোগ এবং অমনোযোগের সহিত সে শুনিত—কিন্তু পাঠ শেষ হইলেই ছুটিয়া পালাইত।

মনে আশা ছিল, মাধবীর পিতা যখন আমার পিতৃবন্ধু তখন ভবিষ্যতে মাধবী নিশ্চয়ই আমার ঘরের লক্ষ্মী হইয়া আমার ভাঙা ঘর আলো করিয়া থাকিবে। কিন্তু হায়! মানুষ গুণের কদর বোঝে না—অর্থের চাকচিক্যে তাহারা অন্ধ। আমি গরীব বলিয়া মাধবীর পিতা তাঁহার কন্যার সহিত আমার

সহিত আমার চোখের সম্মুখে মাধবীর বিবাহ হইয়া গেল। আমি হতভম্ব হইয়া রহিলাম।

মাধবীকে হারাইয়া মনে দারুণ বেদনা পাইয়াছিলাম সন্দেহ নাই কিন্তু পরিমাণে তাহার চেয়ে বেশি করুণা হইয়াছিল মাধবীর পিতার উপরে। বেচারা বুদ্ধির দোষে আমার মতো এমন একটি রত্ন হারাইল! আমার বিশ্বাস ছিল, ইহার জন্য তাঁহাকে পরে অনুতাপ করিতেই হইবে। আমি মনে মনে বলিয়া উঠিয়াছিলাম—'অর্থ নাই বলিয়া এখন তুমি আমার প্রতি অবজ্ঞা করিলে কিন্তু সময় আসিবে যখন বুঝিবে অর্থের চেয়ে মূল্যবান সামগ্রীর অধিস্বামী আমি; তখন আমার পায়ে মাথা লুটাইতে পারিলে তুমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। তখন খোঁড়া হইতে হয় সেও ভালো তবু আমার পা তোমার সম্মুখে বাহির করিতেছি না।'

মাধবীর সহিত বিচ্ছেদে আমার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আমি সেই বিরাট আকুলতা লইয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। আমার হৃদয়ের বেদনা শতমুখে উৎসারিত হইয়া কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—ছন্দে ছন্দে একটা ক্রন্দনের সুর গুমরাইয়া ফিরিতে লাগিল। নিজের কবিতা পড়িয়া নিজের উপর প্রশংসায় চিত্ত ভরিয়া উঠিল। মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি বলিনু আমি!

এ কি সুললিত বাণীরে!"

আমি যোড়করে উর্দ্ধমুখে বলিয়া উঠিলাম—হে মঙ্গলময়! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা না বুঝিয়া আমরা হাহুতাশ করি। মাধবীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া না দিলে আমাকে যে জন্য সংসারে পাঠাইয়াছ তাহা কেমন করিয়া পূর্ণ হইত? বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয় হইতে যে অমূল্য রত্ন বিশ্ববাসীর জন্য ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহা কোথা হইতে আসিত! আমি দুঃখ পাইয়াছি তাহাতে দুঃখ নাই। তৈল যে জ্বলিয়া পুড়িয়া নিজেকে ক্ষয় করে সে দীপ-শিখাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য।

কিন্তু হায়! যাহার জন্য এ নৈবেদ্য সাজাইলাম তাহাকে দিতে পারিলাম কৈ? মাধবীর বিবাহের পর হইতে তাহার সহিত আর আমার দেখা হয় না—কাজেই তাহাকে কবিতা শোনাইতে পাই না। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কবিতাগুলি নকল করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল ছাপাইয়া দিই—কিন্তু মন তাহাতে সায় দিল না। তোমরা ভাবিওনা যে পয়সার অভাবে ছাপাইতে পারি নাই। তাহা নহে। ছাপার হরফের উপর আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। মানুষের ভাব-বিহ্বল-স্পন্দিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইলে কবিতার আসল প্রাণটি বজায় থাকে—নইলে অসাড় ছাপার হরফে শৃঙ্খলিত হইয়া তাহার কোমলতা—তাহার কবিত্ব মাটি হইয়া যায়। তার চেয়ে মানুষের বাঁকাচোরা হাতের লেখার মধ্যে থাকা ভালো; তাহাতে মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন-আলোড়নের একটা ছাপ পাওয়া যায়। গাছের ফুলের সঙ্গে কাগজের ফুলের যে তফাৎ পঠিত কবিতার সঙ্গে মুদ্রিত কবিতারও সেই তফাৎ!

মাধবী কবিতাগুলি পাইয়া কি করিয়াছিল তাহা আমি ঠিক জানিনা; তবে আমার বিশ্বাস সে পড়িয়া চোখের জল সামলাইতে পারে নাই।

মাধবীর বিবাহ হইয়া যাওয়াতে আমার অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক মাধবী ছাড়া আমার কবিতা এ দুনিয়ায় কেহ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে চাহিত না। আমি দেখিতাম আমার চতুষ্পার্শের লোকগুলার হিংসা এতই প্রবল ও বদ্ধমূল যে আমার কবি-খ্যাতি বাড়িয়া যায় ইহা তাহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এখন মাধবী কাছে নাই তবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার কবিতা-লতা বাড়িয়া উঠিবে—হায়! হায়! কে আমার অর্দ্ধমৃত কবিতা-লতায় সুধাবারি সিঞ্চন করিবে! আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—চারিদিক আমার শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল;—মনে হইতেছিল আমার প্রতিভা-সূর্য্য যেন রাহুর কবলে গিয়া পড়িয়াছে। হে ভগবান! এ জগতে এমন কি কেউ নাই যে আমার এই নৈরাশ্য-জর্জ্জরিত হৃদয়ে উৎসাহমন্ত্র ধ্বনিয়া তুলিতে পারে! নইলে আমার সব গেল! আমি জানি দেহান্তে আমার যশের প্রভা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবে; কিন্তু জীবিতাবস্থায় কবির কবিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যেটুকু খোরাকের প্রয়োজন তাহা কাড়িয়া লইলে চলিবে কেন?

আমি জানিতাম, মাধবী ছাড়া আমার দরদ বুঝিবার আর কেউ নাই। সেই তো আমার মূর্ত্তিমতী কবিতা—তাহাকে না দেখাইলে আমার কবিতা বৃথা! কাজেই যত কবিতা লিখিতাম সমস্ত নকল করিয়া মাধবীর কাছে পাঠাইয়া না দিলে চলিত না। তাহাকে কবিতা পাঠাইয়া দিয়া কল্পনা-নেত্রে দেখিতাম মাধবী সেগুলি তন্ময় চিত্তে পড়িতেছে আর আমার কথা মনে করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে চোখ মুছিতেছে! সে কী দৃশ্য! সে কী ছবি!

যখন এমনি ভাবে দিন চলিতেছে তখন একদিন বড় বাবু আমাকে ডাকিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে! কি মনে করেছ বল দেখি! আপিসের কাজ করবে? না বসে বসে কবিতা লিখবে? তোমাকে নিয়ে যে চলে না দেখ্‌চি।"

আমি এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারিলাম না। ছলছল নেত্রে নীচের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাশের লোকগুলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সেই দিন হইতে বড়-বাবুর হুকুম হইয়া গেল তাঁহারই পাশে আমার বসিবার জায়গা দেওয়া হইবে। দিন রাত তিনি কড়া নজর রাখিতেন পাছে আমি কবিতা লিখি! আমার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত; কিন্তু কি করিব? দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া টাকা আনা পাই, টাকা আনা পাই করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। মনে হইত জেলের কয়েদীরা আমার চেয়ে সুখে আছে।

বাড়ী আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম;—রুদ্ধস্রোত খুলিয়া যাইত, কবিতার প্লাবনে চতুর্দ্দিক ভাসাইয়া দিতাম। মনে আনন্দ ছিল প্রতিদিন অন্তত একটি করিয়া কবিতা মাধবীর কাছে পৌঁছিতেছে! তাহাতেই আমার জীবনটা কোনো রকমে টিঁকিয়া ছিল।

কিন্তু হায়! আমি নিতান্তই দুর্ভাগ্য! এত বড় দুরদৃষ্ট কোনো দেশের কোনো কবিকে

দিকে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। মা আসিয়া কাকুতি মিনতি করেন—মাসি আসিয়া অনুরোধ করেন—পিসী, পিসেমহাশয়, মামা, মামী, ভগ্নী, ভাগ্নে, কেহ বাকি রহিল না—সকলেরই মুখে এক কথা—আমি যেন কবিতা আর না লিখি! কিন্তু কেন? কেন? কেন? শুনিলাম, আমার রাহু—বড়-বাবু না কি শাসাইয়াছেন এমন করিয়া কবিতা লিখিলে আমার চাক্‌রি বজায় থাকিবে না। সবাই সেইজন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন ভোরবেলা উঠিয়া মাধবীকে হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া আপিস যাইবার পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। মনটা বড়ই খারাপ ছিল;—চারিদিক হইতে কেবলই তিরস্কার আর লাঞ্ছনা—আমার চিরারাধ্যা কবিতা দেবীর সহিত আমার বিচ্ছেদের আয়োজন! আমি শুষ্ক মুখে আপিসে গিয়া বসিলাম। বড়-বাবু আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন —"এখনো তোমার কবিতা লেখা রোগ গেল না? এমন করলে কাল থেকে আপিসে ঢুকতে দেব না।"

আমি ধীরকণ্ঠে মৃদুস্বরে উত্তর করিলাম —"আপিসের কাজ কামাই করে আমি তো আর কবিতা লিখি না।"

—"লেখ না তো কি!" বলিয়া বড়-বাবু সেদিন পর্য্যন্ত লিখিত মাধবীকে পাঠানো আমার সমস্ত কবিতার তাড়া আমার চোখের সামনে উঠাইয়া ধরিলেন! আমি অবাক! তাহা হইলে এসব কবিতা মাধবীর শ্রীচরণপ্রান্তে পৌছায় নাই। এতদিন ধরিয়া সেগুলি বড়-বাবুর কবলে পড়িয়া পচিতেছিল। হায়! হায়! আমার কবিতার অদৃষ্টে এত লাঞ্ছনাও ছিল। আমার মনে হইতে লাগিল আমার এতদিনের পূজা, এতদিনের সাধনা সমস্ত পণ্ড হইয়া গেছে। আমি ব্যর্থ! আমি ব্যর্থ! আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতেছিল। বড়-বাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর ভদ্রলোকের বাড়ীতে কবিতা পাঠিয়ে এরকম হেঙ্গাম করবে?"

যাহার জন্য পূজার অর্ঘ্য সাজানো তাহার চরণ-প্রান্তে যদি সে অর্ঘ্য না পৌছাইয়া দিতে পারি তবে বৃথা কেন এ আয়োজন! আমি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিলাম —"না।"

বড়-বাবু তৎক্ষণাৎ কবিতাগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। আমি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। শেষে যখন সমস্ত প্রায় ছাই, তখন আমারই এক দীর্ঘ নিশ্বাসে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল—চিতার উপর দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমার প্রাণ ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—

"সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা!"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।



নদী-ভ্রমণ

(একখানি বিলাতী চিত্র হইতে)

জাতীয় প্রণালীতে লোকশিক্ষা*

বিলাতের কোন সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া সে দিন বিখ্যাত শিক্ষাতত্ত্ববিৎ স্যাডলার সাহেব বলিয়াছিলেন লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রায়ই অপ্রিয় হয়, প্রথমে, গবরমেণ্টের নিকট ইহা প্রচুর অর্থ ব্যয়ের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকেরা ইহাকে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা মনে করিয়া ভয় পায় অথচ সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে ইহা খুব গর্হিত। আমাদিগের দেশে শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় বাধ্য করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা লইয়া কয়েক মাস হইতে খুব বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ বিধি অনুমোদন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আমরা কিয়দংশে পাইয়াছি, আমাদিগের প্রধান অন্তরায় এখন হইয়াছে, সাধারণের মধ্যে সহানুভূতির অভাব। কৃষক ও রাখালবালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলে আমাদিগের ঘরে চাকর পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিবে, ইহা অনেকেই এখন বলিতেছেন। লোকহিতৈষী মহানুভব কবেট সাহেবও ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিধানের পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা কিন্তু কেহ শুনে নাই; ইংলণ্ডের ধনী লোকদিগের যে চাকরের অভাব হইয়াছে তাহা আমরা এখনও পর্য্যন্ত ত শুনিতে পাই নাই। চাকর বিদ্যালাভ করিলে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবেই, যে এমন নহে, তবে মনিবের আজ্ঞা দেবাজ্ঞা সদৃশ পালন করিয়া চাকুরী রাখিবে না ইহা নিশ্চয়। গৃহপালিত পশু যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া অন্যত্র যায় কাহারও কথা না শুনে, তাহা হইলে গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, সংসার অচল হইয়া উঠে; কিন্তু চাকররা ত পশু নহে, তাহারা মানুষ, যখন তাহাদিগকে আমরা মানুষ বলিয়া মানিয়া লই তখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে তাহাদিগের মন আছে আত্মা আছে, চরিত্র আছে। মনের গতির ত সীমা নাই, চাকুরীর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কেহই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ তাহার মধ্যে যে বিশ্ব-বিজয়ী শক্তি লুপ্ত আছে যত দিন না তাহা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলে তত দিন তাহার তৃপ্তি নাই,—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। জগন্নাথের রথ যে অনন্ত শক্তি লইয়া আনন্দের ভূমার পাশে ছুটিয়া চলিতেছে তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য! কৃত্রিম বাধা বিঘ্ন যদি সে পথে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে যে অচিরেই চাকার তলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

জগতের নিয়মই এই যে, যদি কোন জাতি বা সমাজের কোন শ্রেণীবিশেষের আত্মশক্তি বিকাশের পথে অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অস্বাভাবিক কোন অন্তরায় দাঁড়ায়

* চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনীতে পঠিত।

তবে সে ঐ প্রতিকূল আচরণের বিরুদ্ধে কোন না কোন দিন ঘোরতর ভাবে সংগ্রাম করিবেই। ফরাসীদেশে প্রজাশক্তি যে রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল তাহার কারণ ত ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। তিন শত বৎসর ধরিয়া রাজকীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি কারাগারের প্রাচীরের মত তাহার বিশ্বের দিকে বাহির হইবার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাই সে ক্ষিপ্ত হইল। জাগ্মরিত হইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত কারাগারের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলে স্বভাবতই মন জড় এবং ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, কারাগারের অন্ধকারকেই সে তখন আলো মনে করে, কারাগারকেই তাহার ঘর বলিয়া ভালবাসিতে শিখে, তখন বিশ্বের সহিত মনের আদান প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মোহ হইতে উদ্ধার করা শিক্ষারই ত কাজ। শিক্ষা দ্বারা মন সচেতন হয়। একটু চেতনা পাইলেই আলো, অন্ধকার, কারাগার ও ঘরের প্রভেদ একবার বুঝিতে পারিলে মন আপনিই ধীরে ধীরে বাহির হইবার পথ খুঁজিবেই, কারাগারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেই। জাতীয় জীবন যখন সঙ্কীর্ণ হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে তখন যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে একটী নূতন চেতনার স্রোত আনিয়া দেন তিনিই ত জাতীয় শিক্ষক, প্রকৃত মহাপুরুষ,—তখন চিত্তবৃত্তি উদ্বুদ্ধ নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষককে বলিয়া উঠে “অসত্য হইতে আমাকে সত্যস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিস্বরূপে লইয়া যাও।”

জাতীয় জীবনস্রোত এতদিন যাহা গর্ত্তের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছিল যখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া কল কল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে তখন জলের গন্ধ আবর্জ্জনা আর কিছুই থাকিবে না। শীতের পর যখন বসন্তের প্রথম বাতাস বহিতে থাকে নির্জ্জীব গাছপালা তখন জীবন পায়, নব কিশলয়ের তরুণ সাজে সাজিয়া সমস্ত গাছগুলি নূতন আবেগে মর্ম্মরিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব আনন্দের কোলাহলে চারিদিক ভরিয়া যায়। কুঞ্জকাননে ফুল ফুটিয়া উঠে, যে পাখী এত দিন নীরব ছিল এখন সে সঞ্জীবনী শক্তি পাইয়া পঞ্চম স্বরে গান ধরে। জাতীয় জীবনে ত ঠিক তাই। শিক্ষার আন্দোলন যেন জাতির মধ্যে একটী নূতন যুগ এক অপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়া উপস্থিত করে। কত নীরব কবি যাহারা কথা বলিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কথা কহিবার নিষেধ থাকায় যাহাদিগের প্রাণ এতদিন কাঁদিতেছিল, এখন তাহারা গাহিয়া উঠিবে, ভাবুক ভাবের তরঙ্গে ডুব দিয়া অতল জলে কত রতন খুঁজিয়া পাইবে। চিন্তার আন্দোলনে সকলেই অন্তরের ভিতর একটী নূতন প্রাণের আবেগ অনুভব করিবে, প্রাতঃকালের সুনীল আকাশের উপর শুভ্র মেঘগুলি খুব সজোরে যেমন কোন সুদূর আকাশের দিকে ছুটিয়া যায় তেমনি সকলেরই অন্তঃকরণ এই নূতন জাগরণের সহিত—যাহা সত্য যাহা ধ্রুব যাহা মঙ্গল তাহার [illegible]

জাগরণের কর্ত্তা তাঁহাকে বলিয়া উঠিবে —"বাতাসকে যেমন আপনি প্রেরণ করিয়াছেন আমাদিগের মনকে তেমনি মঙ্গলের দিকে জোরে পাঠাইয়া দিন, —আমরা যেন শুধু মঙ্গলের কথা শুনি।" এ জাগরণ যে সকলের জাগরণ, সমাজের সমস্ত ব্যক্তিরই জাগরণ; ইহা ত উচ্চ শিক্ষা,—মাধ্যমিক শিক্ষার কথা নহে, এ সার্ব্বজনীন শিক্ষা; ছোট বড় দীন দরিদ্র সকলেরই শিক্ষা। বাতাস যখন বহে তখন সে ত সমস্ত দক্ষিণ দিকটা হইতেই বহে, কোন সঙ্কীর্ণ রাস্তা বা গলি দিয়া ত বহে না, ছোট বড় সব গাছের প্রাণের ভিতর দিয়া সমান ভাবেই বহে। বড় গাছ উঁচু মাথা জোরে নাড়িয়া তাহাকে খুব ডাকে সত্য, কিন্তু উঁচু বলিয়াই সে যে বাতাসের নিকট বেশী দাবী পায় তাহা নহে। আর বাতাস যদি শুধু উঁচু গাছের উপর দিয়াই বহিত তাহা হইলে ফলমূল কিছুই পাইতাম না, সমস্ত সমতল ক্ষুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইত। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে শিক্ষা সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, বট অশ্বত্থ গাছের নিকট হইতে যেমন ছোট ছোট ফলের বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না, সে সমাজের শিক্ষাতেও সেরূপ উন্নতি আশা করা যায় না; এবং বিস্তৃত সমাজক্ষেত্রে কত প্রতিভা বিদ্যালয়ের সুযোগ অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহারও ইয়ত্তা হয় না। ধনী বংশে অথবা উচ্চ জাতিতে অধিক অনুপাতে প্রতিভা থাকা সম্ভব; কিন্তু সমাজের দরিদ্র এবং নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী সুতরাং এমন কি দেশের মধ্যে যত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মে। এই প্রতিভার যাহাতে অপব্যয় না হয় তাহা ত প্রত্যেক সমাজেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ইহার জন্য যত অর্থব্যয় হউক না কেন তাহার ভার সমাজের অকাতরে গ্রহণ করা উচিত। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যদি দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া একজন নিউটন, ডারউইন, সেক্সপিয়ার বা বেসমারকে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে অর্থব্যয়ও সার্থক। যে সমাজে ইহাদিগের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটে না সে সমাজ ত তাহার নিজেরই উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া রাখে। বেসমারের ব্যবসায়িক আবিষ্কারে কত সহরের লোকের শিক্ষা ব্যয় ফিরিয়া পাওয়া গেছে। আবার সব শিক্ষার বিনিময়েই যে সমাজ অর্থ পাইবে তাহা নহে, তাহা দ্বারা এমন অনেক জিনিষ পাওয়া যাইবে তাহা অমূল্য। দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা মহৎ জীবনের ভাবুকতা মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না অথচ এইগুলি আমাদিগের সব চেয়ে বড় জিনিষ। রামপ্রসাদ বাঙ্গলা কোন অপরিচিত গ্রামের কোণে বসিয়া আপন মনে মৃদু কণ্ঠে গান গাহিয়াছিলেন, ফোনোগ্রাফে যাঁহারা গান দেন তাঁহাদের মতন তিনি সে জন্য কোন অর্থ পান নাই, অথচ তাঁহার গানগুলি এই কয় শতাব্দী ধরিয়া আমাদিগের জাতীয় জীবনের মধ্যে এমন একটী সুন্দর ভাবুকতা আনিয়া

এরূপ মহৎ জীবন যদি সমাজের বিধিনিষেধের মধ্যেও বিকাশ লাভ না করিত তাহা হইলে আমাদিগের নিভৃত পল্লীজীবনের নিরানন্দ আরও কত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিত তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। আমাদের দেশের সামাজিক অনুষ্ঠানের গুণে এ জীবন বিফল হয় না। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে কোন জাতির গঠন হইয়াছে, কোন জাতীয় উন্নতির চেষ্টা দেখা গিয়াছে সেইখানে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিকট আয়োজন দেখা যায় কারণ সার্ব্বজনীন শিক্ষা ব্যতিরেকে সমগ্র জাতীয় শক্তির উদ্বুদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান লোক শিক্ষা প্রণালীর দোষ পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিয়াছেন। শিক্ষায় অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় অথচ শিক্ষার সহিত জীবিকা অর্জ্জনের কোন সম্বন্ধ না থাকায় অন্ন সংস্থানের কোন সুবিধা হয় না। উপরন্তু অন্ধকারময় বিদ্যালয়গৃহে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য তাহাদিগের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে। স্বাস্থ্য হানির জন্য অনেকের পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসা চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার অনেকে বিদেশী শিক্ষার ফলে বিলাসী হইয়া জাতিগত ব্যবসায়কে ঘৃণা করিতে শিখে। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রণালীতে যদি আমাদিগের দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন তাহা হইলে দেশে যে খুব ক্ষতি হইবে তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আমার বোধ হয় অনেকে এ প্রকার অবস্থা ও শিক্ষা প্রণালীর ফলে বিরক্ত হইয়া সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিরুদ্ধপক্ষ হইয়াছেন। কিন্তু দোষ যে শিক্ষা প্রণালীর,—শিক্ষা জিনিষটার নহে তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। বস্তুতঃ উপযুক্ত প্রণালীতে যদি সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার হয় তাহা হইলে যে, দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

সমগ্র জাতির উপযোগী শিক্ষা প্রণালী কি তাহা আমাদিগের খুব একটা ভাবিবার এবং আলোচনা করিবার বিষয়। বিদ্যালয় সমূহের যাহারা ছাত্র হইবে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব,—সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধি অনুসারে যদি তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে পড়িতে বাধ্য করা যায় তাহা হইলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহাদিগের লেখাপড়ার সহিত জীবিকার্জ্জনের তুমুল ঝগড়া না বাধে। আমার মনে হয় আমাদিগের দেশে শ্রমজীবি কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থা যত দিন সচ্ছল না হয় তত দিন রাত্রিই তাহাদিগের পক্ষে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত সময়। আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষকের অনেক সময় সমস্ত দিন ক্ষেত্রে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রমের বিরাম নাই, গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভোজন করিবারও সময় পায় না। ইহাদিগকে যদি প্রাতঃকাল বা মধ্যাহ্নে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠান যায় তাহা হইলে ইহাদিগের পক্ষে জীবিকার্জ্জন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় যদি বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারিত হয় তাহা হইলে নৈশ বিদ্যালয় আমাদিগের দেশে শুভফলপ্রদ হইবে, দিনের অন্য সময় বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্ধারিত করিলে দেশের কৃষক এবং

শিল্পীদিগের অবস্থার অবনতি হইবার আশঙ্কা আছে।

তাহার পর শিক্ষার অবস্থা। শিক্ষার সহিত দৈনন্দিন জীবন যাপনের খুব নিকট সম্বন্ধ থাকা উচিত। জীবিকার্জ্জন যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি এবং শিল্প-শিক্ষার আয়োজন চাই। প্রত্যেক গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিয়া ছাত্রদিগকে আধুনিক প্রণালীতে কৃষি দেখাইতে হইবে। কারখানায় শিল্পীরা ছাত্রদিগকে সূত্রধরের কার্য্য, বয়ন প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দিবে। আঁকা, —এবং কাদার ছাঁচ প্রস্তুত প্রভৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া চাই। কারখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে এদেশে শিল্পের উন্নতি শীঘ্র হওয়া সম্ভব। প্রাথমিক বিজ্ঞান ও অঙ্কনও বিদ্যালয়ে শিখাইতে হইবে। কৃষিশিল্প, এবং বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মনীতি এবং সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোক-শিক্ষা জাতীয়শিক্ষা হওয়া চাই, তাহা না হইলে শিক্ষা অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়ে। আমাদিগের দেশে যেগুলি প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য—যেমন রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত, মনসামঙ্গল প্রভৃতি, তাহারা কত যুগ যুগান্তের সাক্ষী, কত বিপ্লব ঝঞ্ঝা তাহাদিগের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহারা যে সকল আদর্শ আমাদিগের নিকট উপস্থিত করে সেই আদর্শ আমাদিগের প্রকৃত অন্তরের সামগ্রী, তাহা ছাড়িয়া আমরা যদি অন্য আলোকের দিকে

অস্বাভাবিক বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইবে। দেশের যেগুলি চিরন্তন আদর্শ, যাহা নানা রকমে গানে কাব্যে সাহিত্যে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে আমাদিগের দেশে ধ্যানী জ্ঞানী ও কর্ম্মীগণ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেগুলি যাহাতে প্রত্যেক পল্লী সমাজে বিকাশলাভ করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাই স্বাভাবিক এবং হিতকর, অতএব সেই শিক্ষারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে পল্লী-সমাজে কয়েকটি আদর্শ খুব উজ্জল হইয়া রহিয়াছে, সেগুলি যেন বাঙ্গালারই নিজস্ব সম্পত্তি, সমগ্র ভারত-বর্ষের নহে। যেমন হর-গৌরীর ছড়া ও গান-গুলি। প্রথমে কন্যার সহিত পরিবারের সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদ, তাহার জন্য মেনকার আক্ষেপ, পরে আগমনীর মিলন গান এবং পুনরায় বিজয়া দশমীর দিনে দুঃসহ বিদায় বেদনা, —এ সমস্তই বাঙ্গালী পরিবারেরই সুখদুঃখের গান। দুর্গোৎসবের মিলন এবং তাহার পর বিদায় এমন বাঙ্গালীর অন্তরের জিনিষ যে এ উৎসব বাদ্য একবার বাজিয়া উঠিলে সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সঙ্গে তাহার সহিত সাড়া দেয়! সতীর নিকট ভূতনাথই দেবতা। দক্ষ জামাতাকে দেখিতে পারেন না, তাই পিতার অনাদর কন্যাকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তবুও তিনি পিতৃ ভবনে না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। পিত্রালয়ে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সতী স্বামীর বাক্য না শুনিয়াই পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু দক্ষ তাঁহাকে আদর করিলেন না, তাঁহার স্বামীকে খুব নিন্দা করিতে লাগিলেন। দুঃখে কন্যার বুক ফাটিয়া

পিতার পদতলে অকস্মাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হইল। তাহার পর ভূতনাথের অনুচরকর্তৃক দক্ষযজ্ঞ লুণ্ঠন, শেষে ভূতনাথের যে দারিদ্র্য তাহা দক্ষের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অনেকগুণে মহৎ তাহাই দেখান হইল! এই ত পুরাতন কথা। কিন্তু এ যেন আমাদিগের নিকট চিরনূতন। পতিভক্তি এবং কন্যার অনাদর এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাঁহার জন্য কন্যার ক্ষোভ, দুঃখ, গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে এরূপ ট্র্যাজেডি ত প্রতিদিনই দেখা যায়। হর-গৌরীর গানগুলি লইয়া গৃহধর্ম্মেরই সুন্দর আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছে; বঙ্গের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই একটা সুন্দর ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে। মহাদেব যখন সতীদেহ আপনার স্কন্ধে রাখিয়া ঘোর নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন প্রলয় উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল, বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলিলেন। যেখানে সতীদেহের কোন অংশ পতিত হইল সেই স্থানই আমাদিগের মহাপীঠ স্থান। গার্হস্থ্য জীবনে সতীর প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা এবং সম্মান আর কিরূপে দেখান যাইতে পারে? তাহার পর আমাদিগের পল্লীসমাজে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলি। বৃন্দাবন প্রকৃত সংসার হইতে অনেক দূরে, সেখানে শুধু প্রেম এবং আনন্দ, দুঃখজ্বালা অনুতাপ পরিতাপ কিছুই নাই। এই গানগুলি অপূর্ব্ব ভাব জগতের একটি সুন্দর এবং পবিত্র চিত্র। ইহার প্রভাবে দুঃখী বাঙ্গালী জীবনকে কেমন কবিতাময় করিয়া তুলিয়াছে। হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের গান এবং ছড়াগুলির মত আমাদিগের ব্রতকথা-সম্পদ। বাঙ্গলার পল্লীসমাজে বারমাসে যে তের পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীগণ যে সকল ব্রতকথা কহিয়া থাকেন সেগুলি আমাদিগের ঘরে ঘরে কত শতাব্দী ধরিয়া, অতিথিসেবা শুদ্ধাচার নিষ্ঠা সংযম, পাপে ভয় এবং পুণ্যে আনন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে কেমন নীরবে এবং সরলভাবে শিক্ষা দিতেছে। আমাদিগের জাতীয় আদর্শগুলি যেরূপ সোজা ও স্পষ্টভাবে সেইগুলিতে প্রকাশিত হয়, অন্য প্রকার সাহিত্যে তাহা হয় না। এই সকল লোকসাহিত্যের আদর্শ লইয়াই আমাদিগকে আধুনিক লোকশিক্ষা গঠন করিতে হইবে।

তাঁহার পর বিদ্যালয়ের বাহিরে আমাদিগের দেশে লোকশিক্ষার যে সকল অনুষ্ঠান অছে সেগুলিরও প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই যে আমাদিগের দেশে মুসলমানেরা কত শতাব্দী হইতে মহরমের সময় মিছিল বাহির করে ইহার ঐতিহাসিক তথ্য কে না জানেন? কয় শত বৎসরেরও পূর্ব্বে কারবালার মরুভূমিতে মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যের তাপে পিপাসাকাতর হোসেনের স্ত্রীপরিবার ও শিশু বালকবালিকাগণের যে ক্রন্দনধ্বনি আকাশে উঠিয়াছিল সেই হৃদয়স্পর্শী ধ্বনি বৎসরের মধ্যে একবার রাস্তায় রাস্তায় আবার শুনা যায়। সে কোন্ সুদূর যুগের কোন অতীত ইতিহাসের কথা তবুও আমরা হোসেন এবং তাহার অনুচরবর্গের বীরত্ব ও অসাধারণ তেজ যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি, এবং তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত পরিবারের দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকি। মর্শীয়ার করুণ রাগিণী

রমণীগণ হোসেনের তাজিয়ার সম্মুখের রাস্তা জলে প্লাবিত করিয়া ফেলে তখন মনে হয় সেই অতীতকালে যে ভীষণ পাপকার্য্য কারবালাভূমিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে পাপের বুঝি এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। এমনই প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেক বৎসরই হয়। হোসেনের বীরত্ব প্রতি বৎসরই মুসলমানদিগকে নূতন তেজে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। এই মহরম উৎসব এবং মিছিল সেই সুদূরকালের ঘটনাবলী আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জাতীয় চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। মহরম উৎসবের মত মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফকির অথবা কোন পীরের আস্তানার সম্মিলনে এবং হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু উৎসব অথবা সাধু পুরুষের জন্মদিন বা মৃত্যু উপলক্ষে মেলায় যে সকল গান এবং অভিনয় দেখান হয় সেগুলিও ইউরোপের মধ্যযুগে Passion এবং Miracle অভিনয়ের মত আমাদিগের লোক শিক্ষার সুন্দর উপায় হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। আমাদিগের পল্লীসমাজে এখনও যে হরিসভায় সঙ্কীর্ত্তন এবং চণ্ডীমণ্ডপে রামপ্রসাদী এবং কমলাকান্তের চণ্ডীগান হইয়া থাকে, সেগুলিও জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ ধর্ম্মভাব প্রচারের এক প্রধান উপায়। এখন অনেক পল্লীগ্রাম হইতে হরিসভা উঠিয়া যাইতেছে, চণ্ডীমণ্ডপে আর আসর জমে না। এই বিষয়ের প্রতি সকলেরই এই সময় হইতে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ একবার নষ্ট হইলে পুনরায় ইহাদিগের উদ্ধার করা অসম্ভব হইবে। তাহার পর আমাদিগের কবিওয়ালা এবং যাত্রার দল। কবিদলের সংখ্যা এখন বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে নিতাই দাস ও ভবানীবেনের যুদ্ধ—প্রচলিত কথায় "নিতে বৈষ্ণবের লড়াই" ভদ্র এবং অভদ্র লোক কিরূপ আগ্রহভরে এবং আনন্দের সহিত শুনিত, এখন আমরা তাহা ভাবিতেই পারি না। বৈঠকে বসিয়া একজন কবি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অপর কবিকে গান গাহিয়া মুখে মুখে তাহার উত্তর দিতে হইত। ইহা ত বড় সহজ নহে, কারণ অনেক সময়েই প্রশ্নগুলি ধর্ম্ম দর্শনের এমন কূট এবং জটিল সমস্যা যুক্ত যে, মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিলে তাহা বুঝাই যায় না। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে সভায় অপমান, আর যে কবি সঙ্গীত যুদ্ধে উত্তরটি আরও জটিলভাবে দিতে পারেন, যাহার পুনরুত্তর দান অসাধ্য তাঁহারই জয়, সভায় তাঁহার গলে মালা প্রদত্ত হয়। এই কার্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করা কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তবুও সে সময়ে আমাদিগের দেশে জনসাধারণের মধ্য হইতে কৃষ্ণ কর্ম্মকার, পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলু পাটুনী, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, প্রভৃতি নগণ্য লোকই সমাজের গণ্যমান্য লোকদিগের বাটীতে আসর জমকাইয়া রাখিত। আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে কবিগান এখন শুনিতেই পাই না। যাত্রাদলের সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে নাটককারগণকে অনেকে জনসাধারণের উপযোগী করিয়া যাত্রার পালা রচনা করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা যদি উপযুক্ত বিষয় লইয়া যাত্রার পালা রচনা করেন এবং ভদ্র সন্তানগণ কেবল থিয়েটারে না যাইয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া জনসাধারণের সহিত একত্রে যাত্রাও শুনেন তাহা হইলে যাত্রাগুলি কদর্য্যতা এবং অশ্লীলতা

দোষ হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগের জনসাধারণের চরিত্রগঠনের সহজ ও সুন্দর উপায় হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দেশের আরও দুইটি লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথম কথকতা। উৎসব বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে পল্লীসমাজে প্রায়ই কথকতা হইত। কথক মহাশয়েরা রামায়ণ মহাভারত হইতে গল্প বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে গানও হইত। রামধন, শ্রীধর ধরণীধর, দুর্লভ গোঁসাই প্রভৃতি ভাল ভাল কথকগণ এমন সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতেন যে সকলেই বিশেষ মনযোগসহকারে ৫।৬ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে তাঁহাদিগের কথা শুনিত। বাস্তবিক আমাদের দেশে কথকগণই প্রকৃত বাগ্মী। বাগ্মিতাবলে মনে যুগপৎ নানা ভাবের সঞ্চার করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল! এখনও এদেশ কথকশূন্য হয় নাই, তবে কথকথার এখন আর পূর্ব্বের মত আদর নাই।

এখনকার সাধারণ প্রচলিত শিক্ষায় মনুষ্যের মনোবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় না, স্বাধীনভাবে মনুষ্যকে চিন্তা করিতে দিলে তাহার বুদ্ধিশক্তি প্রখর হইবে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে এদেশে বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়া স্মরণশক্তির উপরই অধিক নির্ভর করা হয়। এদেশের বাঙ্গলা বিদ্যালয়সমূহে কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে নামে শিক্ষা দেওয়া হয়, সাধারণ শিক্ষকদিগের ইহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই হইতে অনেক সময়ে এমন কি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পাঠও মুখস্থ লইয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত কথক যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেন তাহা জটিল হইলেও যাহাতে সকলেরই বোধগম্য হয় তাহার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা থাকে। অনেক যুক্তি এবং উদাহরণ দ্বারা বিষয়গুলি আলোচিত হইতে থাকে, এইরূপে এই উপায়ে সকলেরই স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি যথোচিত ভাবে নিয়োজিত হইয়া সহজে উন্নতি লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ পুস্তকের উপর অতিরিক্তভাবে নির্ভর করিতে না দিয়া এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে যদি বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্গল এবং এই উপায়ে বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিচালিত হওয়াতে তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অধিকতর উপযুক্ত করিয়া তুলে। কয়েক বৎসর হইল ইউরোপের ডেনমার্ক প্রদেশে ক্রিষ্টেন্ কল্ড্ নামক এক ব্যক্তি কৃষকদিগের মধ্যে কথকতার মত মুখে মুখে কথাচ্ছলে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন তাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়গুলি খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই উপায়ে ডেনমার্ক প্রদেশের সাহিত্য, কৃষি এবং শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই কথকতা আমাদের দেশে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে পরন্তু উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে কথকতাই যাহাতে শিক্ষার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায় তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের সমাজে পরিব্রাজক সাধুসন্ন্যাসী অথবা ফকিরগণ জাতীয়জীবন গঠনের কিরূপ-

দেখি না। কোন্ অতীত কাল হইতে ইঁহারা যে আমাদিগের দেশে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন তাহা বলা কঠিন। তিনি কত তীর্থ কত দেশ গমন করিয়া কত পুণ্য কত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। পরিব্রাজক যখন গৃহে অতিথি হইয়া আসেন গৃহী তাঁহার পাদোদক্ লইয়া বলে, "আপনার চরণরেণুতে কত তীর্থের ধূলিকণা রহিয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া, আমাকে পবিত্র করুন। পরিব্রাজক তাঁহাকে পাদোদক্ দানে কৃতার্থ করেন। কত সুদূর প্রদেশের চিন্তা জীবনের মধ্যে ধরিয়া তিনি যে সকল নূতন আলোক পাইয়াছেন সে আলোক তিনি যতদিন না গ্রামে গ্রামে বিতরণ করেন ততদিন তাঁহার বিশ্রাম নাই। তাই আমাদিগের সমাজে যত বড় দেশব্যাপী আন্দোলন হইয়া গিয়াছে সকলেরই মূলে এই পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসী। আমাদিগের মধ্যে সাধুসেবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভিক্ষা দানের অনুষ্ঠান আছে, তাহা লোকশিক্ষার বায় বহনের কেমন সুন্দর উপায়। বাঙ্গালী ভিক্ষুকেরা রাম-প্রসাদের, দাসুরায়ের বা নীলকণ্ঠের অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব ভক্তের গান গাহিয়া কেমন নীরবে পল্লীগ্রামের গৃহে গৃহে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিই কিন্তু যাহা পাই তাহাত চিরকালের জিনিষ তবুও এক মুষ্টি ভিক্ষা আমরা অনেক সময়ে সন্তুষ্ট হইয়া দিই না। পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আজকাল অনেকে ভিক্ষুকমাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু সাধু ভিক্ষুকের মধ্যেই ত ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈরাগ্যের আদর্শ প্রকাশ পায়; সে আদর্শ যেন আমরা নিন্দা না করি। কাঙ্গাল ভিক্ষুক যে ভারতবাসীর চিরকালই শিক্ষক, সে শিক্ষককে যেন আমরা চিরকালই মাথায় করিয়া রাখি!

লোকশিক্ষার এই সকল অনুষ্ঠানগুলি নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত অথবা নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া যাহাতে আধুনিক সমাজের বিশেষ উপযোগী হয় সে সম্বন্ধে এখন সকলেরই চিন্তা করা উচিত। এখনকার সমাজে আমাদের পুরাতনশিক্ষার আদর্শ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলিরও সেরূপ প্রাণ নাই। ইহার ফলে আমাদিগের জাতীয় আদর্শগুলিও ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়িতেছে। নূতন যুগের নূতন চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের মধ্যে আমাদিগের স্বকীয় শিক্ষার আদর্শগুলি যাহাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং আমাদিগের দেশের শিক্ষার রীতি প্রণালী এবং অনুষ্ঠানগুলি আধুনিক সমাজে যাহাতে আরও উপযোগী এবং কল্যাণ-প্রদ হয়, তাহা আমাদিগের বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষীগণ আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়া দিন,—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ল্যাভোয়াসিয়ে।

বস্তুর বিনাশ নাই।

"বস্তুর বিনাশ নাই" এই মহাসত্য ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এবং দ্রব্যের বিনাশ হইলে পুনরায় তাহা পঞ্চভূতে পরিণত হয়; অর্থাৎ সৃষ্টি পঞ্চভূতের সমবায় এবং বিনাশ পঞ্চভূতে পরিণতি। এরূপ অনুমানে বস্তুর অবিনশ্বরত্ব বেশ স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। ল্যাভোয়াসিয়ে এই অনুমানকে তুলাদণ্ডের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া খাঁটি পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীনেরা তুলাদণ্ডের ব্যবহার বড় একটা শিখেন নাই, তাঁহারা যুক্তি কল্পনা অনুমানের সাহায্যে সত্যের সন্ধান করিতেন। বিজ্ঞান সেই সকল সত্যকে পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ল্যাভোয়াসিয়ে এই পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের একজন প্রধান স্থাপয়িতা।

বস্তুর অবিনশ্বরতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ল্যাভোয়াসিয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। একটি কাচনির্ম্মিত বড় বকযন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ওজনের রঙ্গ অর্থাৎ টিন বা রাঙ্ গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ রাঙ্ গলিয়া না গিয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে বালুকাযন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। উত্তাপ বশতঃ যেটুকু বায়ু বহির্গত হইয়া গেল তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া ওজন করিলেন, তৎপরে বকযন্ত্রের সরু মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া ওজন করিলেন। বদ্ধাবস্থায় বকযন্ত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে রাঙ্ রাঙ্ভস্মে পরিণত করিতে লাগিলেন। বায়ু যত বেশী থাকিবে রাঙ্ও তত বেশী পরিমাণে ভস্মে পরিণত হইবে। যখন আর রাঙ্ ভস্মে পরিণত হইতেছে না এমন অবস্থায় বকযন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় তাহার ওজন লইলেন। দেখিলেন তাহার ওজন কমেও নাই, বাড়েও নাই ঠিকই আছে। যদিও রাঙ্ রাঙ্ভস্মে পরিণত হইয়াছে, যদিও এখানে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে—তথাপি রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং পরে ওজন ঠিক আছে।

বকযন্ত্র ঠাণ্ডা হইলে তাহার সরু মুখ পুনরায় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তখন দেখা গেল যে বাহিরের বায়ু সশব্দে বকযন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিল। কেন প্রবেশ করিল?—রাঙ্ভস্ম হইবার সময় ভিতরকার বায়ুর কিয়দংশ টানিয়া লইয়াছিল। বকযন্ত্রের মুখ খুলিবার সময় বাহিরের বায়ু ভিতরের সেই শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য সশব্দে প্রবেশ করিল। ল্যাভোয়াসিয়ে পুনরায় এই বায়ুপূর্ণ বকযন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলেন,—ওজন প্রায় দশ গ্রেণ বাড়িয়াছে। তৎপরে রাঙ্ভস্ম ও বাকি রাঙ্ একত্রে ওজন করিয়া দেখিলেন যে গৃহীত রাঙ্ অপেক্ষা রাঙ্ভস্মের ওজন বাড়িয়াছে। রাঙ্ভস্মের ওজন কতটা বাড়িয়াছে?—তিনি দেখিতে পাইলেন বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণে রাঙ্ অপেক্ষা রাঙ্ভস্মের

ওজন বাড়িয়াছে। উত্তপ্ত করিবার পর বন্ধ বকযন্ত্রের মুখ ভাঙ্গাতে যতটুকু বায়ু প্রবেশ করিল,—তাহা হইতে বকযন্ত্রকে বন্ধ করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত করিবার সময় যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহার ওজন বাদ দিলে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল তাহা পাওয়া যাইবে।

তবেই দেখা গেল যে রাঙকে রাঙ ভস্মে পরিণত করিবার সময় নূতন বস্তুর (matter) সৃষ্টি হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট ওজনের রাঙ নির্দ্দিষ্ট ওজন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দুয়ের সমষ্টি ওজনের রাঙ রাঙ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। সৃজন বা বিনাশ হয় না। সকলেই দেখিয়াছেন একটি বাতি পুড়িতে পুড়িতে কমিয়া যায়, মৃতদেহ শ্মশানে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছাই হইয়া যায়। জিজ্ঞাস্য এই যে, বাস্তবিক কি বর্ত্তিকা বা মৃতদেহের বিনাশ সাধিত হইল? দেখিতে পাই, সর্ষপ প্রমাণ ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমে বৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। জিজ্ঞাস্য এই যে, নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইল কি? বাস্তবিক তাহা নহে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে বাতি জ্বলিয়া বায়ুর অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল ও কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই দুই পদার্থ সংগ্রহ করিয়া ওজন করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের মিলিত ওজন বাতির ওজন অপেক্ষা কম ত নহেই বরং বেশী। বেশী হইবার কারণ—সংযুক্ত অম্লজানের ওজন। সেইরূপ মৃতদেহ দগ্ধ হইয়া খানিকটা অংশ ভস্মে পরিণত হয়, খানিকটা অংশ জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারাম্ল বায়ুতে পরিণত হয়। যখন সুবৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না। কোন অজানিত শক্তির বলে বীজ চারিদিক হইতে গ্যাস, জল সার, বায়ু প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। যদি এই তাবৎ জল, সার প্রভৃতি ওজন করা যাইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে তাহাদের মিলিত ওজন বৃক্ষের ওজনের সমান। বাস্তবিক জগতে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বস্তুর সৃজন বা বিনাশ হইত, তাহা হইলে এতদিনে বস্তুর আধিক্যে বা অল্পতা-প্রযুক্ত জগতের নাশ হইয়া যাইত। বস্তুর অবিনশ্বরত্বের উপর সমগ্র রসায়ন শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ল্যাভোয়াসিয়ে এই ভিত্তিকে পরিমাণাত্মক সত্যে পরিণত করিয়া রাসায়ন শাস্ত্রকে পরিমাণাত্মক শাস্ত্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

ফ্লজিষ্টনবাদ।

প্রাচীন রসায়নে দুইটিমাত্র প্রধান অনুমান (theory) প্রচলিত ছিল—প্রথম, বৈশেষিকদর্শনকার কণাদ ও গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রাইটস ও এপিকিউরাসের পরমাণুবাদ; (atomic theory) এবং দ্বিতীয়, এরিষ্টটলের চতুর্ভূতবাদ ও হিন্দু-দর্শনের উন্নততর পঞ্চভূতবাদ। ১৭২০খৃঃ অব্দে জার্ম্মানির সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক ষ্টাল ফ্লজিষ্টনবাদ নামক তৃতীয় সংখ্যক অনুমান প্রচার করেন। তাঁহার জিজ্ঞাস্য হইল, দাহ্যবস্তু যখন জ্বলে তখন কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে? কাষ্ঠ, কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে জ্বলে কেন? লৌহ, যশদ,

পরিণত হয়, তখন কি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ? এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ষ্টাল শেষে ঠিক করিলেন যে, দাহ্যবস্তুমাত্রের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা দহনকালে ঐ বস্তু হইতে পৃথক হইয়া উড়িয়া যায়। সেই পদার্থের নাম দিলেন তিনি ফ্লজিষ্টন (Phlogiston)। যে দ্রব্যে ফ্লজিষ্টন যত বেশী আছে সে বস্তু তত বেশী দহনশীল। তাঁহার মত অনুসারে দহনক্রিয়া—তাহা কাষ্ঠদহনের ন্যায় দ্রুত হোক বা ধাতুক্ষরণের ন্যায় মৃদু হউক—দাহ্যবস্তু হইতে ফ্লজিষ্টনকে পৃথক করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহা হইলে ধাতুভস্ম ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতুমাত্র। ষ্টাল জানিতেন যে সীসকভস্ম, রাঙ্‌ভস্ম প্রভৃতি ধাতুভস্ম, কয়লা প্রভৃতি অঙ্গারমূলক পদার্থের সহিত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় মূলধাতুতে পরিণত হয়। এ বিষয়টি তিনি তাঁহার অনুমানের সাহায্যে বেশ সহজে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে ধাতুভস্ম যখন ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন তাহাতে কয়লার সাহায্যে ফ্লজিষ্টন সংযোগ করিয়া দিলে উহা পুনরায় ধাতুতে ত পরিণত হইবেই।

ষ্টালের এই অনুমানের অনেকেই পরিপোষক হইয়া উঠিলেন। অনুমান যতদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষিত তথ্যের বিরোধী না হয়, ততক্ষণ উহা গ্রহণীয়। ষ্টালের অনুমানের সত্যাসত্য একটি পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। সেটি এই,—যদি ষ্টালের অনুমান সত্য হয়, অর্থাৎ দহনকালে যদি কোন পদার্থ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন দ্রব্য পুড়িয়া যাইলে তাহার ওজন অবশ্য কমিয়া যাইবে, একখণ্ড কাষ্ঠ পুড়িয়া যাইলে যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহার ওজন অবশ্য কাষ্ঠের ওজন অপেক্ষা কম। কিন্তু কাষ্ঠদহনকালে ভস্ম ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এই সকলের মিলিত ওজনের নির্ণয় করা কঠিন; সেইজন্য কাষ্ঠ দহনকালে কেবলমাত্র ভস্মের ওজনের দ্বারা ষ্টালের অনুমানের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ধাতুকে দগ্ধ করিলে কেবলমাত্র ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়, এখন দেখিতে হইবে, প্রাপ্ত ধাতুভস্মের ওজন মূলধাতুর ওজন অপেক্ষা কম না বেশী। যদি কম হয় ষ্টালের অনুমান যথার্থ, আর যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা ভ্রান্ত। ষ্টালের পূর্ব্বেই পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল যে ধাতুকে ভস্মে পরিণত করিলে তাহার ওজন ত কমেই না বরং বাড়িয়া থাকে। রবার্ট রয়েল রাঙ্‌কে ভস্মে পরিণত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে গৃহীত রাঙ্‌ অপেক্ষা প্রাপ্ত রাঙ্‌ভস্মের ওজন অনেক বেশী। জন মেয়ো নামক ইংলণ্ডের আর একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক এন্টিমণি নামক ধাতুকে ভস্ম করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ধাতুভস্ম গৃহীত ধাতু অপেক্ষা ওজনে ভারী। ইহাদের পরীক্ষার ফল ষ্টালের অবিদিত ছিল না; কিন্তু তিনি ইহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন নাই।

কিছুকাল পরে যখন এই বিষয়ে রাসায়নিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তখন ফ্লজিষ্টনবাদের পক্ষপাতীগণের মধ্যে একটা গোল বাধিয়া গেল। কেহ কেহ ইহার একটা "উড়ো" মীমাংসা করিয়া দিবার

জন্য বলিলেন যে, ফ্লজিষ্টনের ওজন নাই, উহা মধ্যাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া বরং বিপরীতদিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং ইহার সংযোগে দ্রব্যের ওজন কমে ও বিয়োগে ওজন বাড়ে। এ একটা বড় অদ্ভুত মীমাংসা। যদি ফ্লজিষ্টন মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা কোন জাতীয় পদার্থ এবং কিরূপেই অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ভ্রান্ত ধারণা সহজে যায় না। এক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কাল্পনিক মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাৎকালিক রাসায়নিকগণ ফ্লজিষ্টন-বাদের ভুল দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

এই ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া রাসায়নকে নূতনভিত্তির উপর স্থাপন করা ল্যাভোয়াসিয়ের প্রধান গৌরবমণ্ডিত মহা-কীর্ত্তি। তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক জোসেফ প্রিষ্টলি ও হেনরী কেভেণ্ডিস, স্কটলণ্ডের জোসেফ ব্ল্যাক, সুইডেনের শিলে প্রভৃতি যাবতীয় রাসায়নিকই এই ফ্লজিষ্টন্‌বাদের পরিপোষক ছিলেন।—তাৎকালিক সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের ভাষা লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে নানা বাধাবিঘ্ন আপত্তি খণ্ডন করিয়া ল্যাভোয়াসিয়ে অকুতোভয়ে ফ্লজিষ্টনবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নূতন কথা প্রথমে যখন প্রচারিত হয়, লোকে তখন তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না। শেষে সত্যের জয় অবশ্যই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে অনেকেই ল্যাভোয়াসিয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন। ক্রমে সত্যের জয় হইল। কিরূপে ল্যাভোয়াসিয়ে ফ্লজিনষ্টনবাদের ভ্রম সম্যকরূপে দেখিতে পাইলেন, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। (ক্রমশ)

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

স্নান।

ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুস্থ শরীরে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। যেমন বাসগৃহের ময়লা জল চতুঃপার্শ্বস্থিত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমাদের দেহের অনেক ময়লা ত্বকের মধ্যস্থিত অসংখ্য নালী সাহায্যে নির্গত হইয়া যায়। এই ময়লার কতক অংশ জলীয়, কতক অংশ আঠাল। ইহা ঘর্ম্মের সহিত ও পৃথক্‌ভাবে নির্গত হইয়া ত্বকের উপর অবস্থিতি করে। পরে উহার জলীয় অংশ শুকাইয়া গেলে তন্মধ্যস্থিত নানাবিধ লাবণিক পদার্থ, আঠাল ময়লার সহিত মিশ্রিত হইয়া ত্বকের উপর জমিয়া থাকে। যদি আমরা রীতিমত স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা ইহাকে দূরীভূত না করি, তাহা হইলে নালীগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং দেহাভ্যন্তরস্থ ক্লেদ বাহির হইতে

না পারিয়া শরীরকে অসুস্থ করে। ড্রেণের মুখ বন্ধ হইয়া গেলে বাসগৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, চর্ম্মের উপর ময়লা জমিয়া এই সকল নালীর মুখ বন্ধ হইলে আমাদের শরীরেরও সেইরূপ দুরবস্থা উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ বাহিরের ধূলিকণা সর্ব্বদা আমাদের গায়ে লাগে বলিয়া এই ময়লার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবার বিশেষ আবশ্যক হয়। যদি এই সমস্ত ময়লা চর্ম্মদ্বারা বহির্গত হইয়া না যায়, তাহা হইলে মূত্রযন্ত্র (Kidneys) প্রভৃতি দেহস্থিত অন্যান্য যন্ত্রাদির শরীরকে পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার আবশ্যক হয়, সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যেই তাহাদিগের দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ত্বকের উপর ময়লা জমিলে শুদ্ধ যে দেহ অসুস্থ হয় তাহা নহে, বাহিরের ধূলিকণার সহিত পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি নানাবিধ চর্ম্মরোগের ও স্ফোটক বিশেষের বীজ অনেক সময়ে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং আমাদিগের ত্বকের উপর পতিত হইয়া ঐ সকল ক্লেশদায়ক রোগ উৎপাদন করে। চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিলে ঐ সকল রোগের বীজ কোন অনিষ্ট সাধন করিবার সময় বা সুবিধা পায় না।

সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নানই প্রশস্ত। ইহাতে শরীর সতেজ হয় এবং এই অভ্যাসের গুণে কফ, কাসি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগ শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে অত্যন্ত শীতল জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু অধিকক্ষণ শীতল জলে শরীর নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে দেহতাপ অধিক পরিমাণে অপহৃত হইয়া প্রভৃত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ৫।৭ মিনিট কাল জলের মধ্যে থাকিলেই অবগাহন স্নানের উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাদিগের সর্ব্বদা মাথা ধরে অথবা রাত্রে সুনিদ্রা হয় না, তাঁহাদিগের পক্ষে অবগাহন স্নান বিশেষ উপকারী। যদি গায়ে জল লাগিলে বেশী শীত বোধ হয় অর্থাৎ গায়ে কাঁটা দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ শীতল জলে স্নান করা প্রশস্ত নহে। এরূপ স্থলে স্নানের জল রৌদ্রে রাখিয়া অথবা যথাপরিমাণ উষ্ণজল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ, শিশু ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শীতল জলে স্নান অনেক সময়ে সহ্য হয় না।

উষ্ণ জলে প্রত্যহ স্নান করিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে যাঁহাদের শীতল জল সহ্য হয় না, তাঁহাদিগের পক্ষে শরীরের সহজ উত্তাপের অনুরূপ ঈষদুষ্ণ জল স্নানের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত। খোলা জায়গা অপেক্ষা ঘরের ভিতর স্নান করাই প্রশস্ত। গায়ে জল ঢালিলে দেহের তাপ-সংস্পর্শে উহা শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয় অর্থাৎ শুকাইয়া যায় এবং ঐ সময়ে দেহ হইতে তাপ অপহরণ করিয়া শৈত্য উৎপাদন করে। গরম জল শীতল জল অপেক্ষা শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে শীতকালে গরম জলে স্নান করিবার সময় শরীর হইতে ধুঁয়া বাহির হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে,

জলবাষ্প স্বভাবতঃ অদৃশ্য হইলেও শীতকালে বাহিরের শীতল বায়ু সংস্পর্শে উহা শীঘ্র ঘনীভূত হইয়া ধুঁয়ার আকারে দৃশ্যমান হয়। কি শীতল, কি উষ্ণ, সকল অবস্থাতেই অল্পাধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া জলের সাধারণ ধর্ম্ম। বেশী বাতাস বহিলে জল শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ভিজা কাপড় বাতাসে টাঙ্গাইয়া দিলে উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। এই একই কারণে খোলা জায়গায় স্নান করিলে স্নানের জল দেহ হইতে শীঘ্র উড়িয়া যাইয়া তাপশোষণ হেতু শৈত্য উৎপাদন করে; সুতরাং খোলা জায়গায় স্নান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাসি হইবার সম্ভাবনা। বাতাসের জোর না থাকিলে অথবা বেলা অধিক হইলে শীতল জলে বাহিরে স্নান করিলে কোন দোষ হয় না। অবশ্য সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। পৌষ মাঘ মাসের শীতে কলিকাতায় প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া হিন্দুরমণীগণকে সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে থাকিতে দেখা যায়।

স্নানের পর সমস্ত শরীর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া গায়ে চাপা দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষিত হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানের পর অধিক ক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকা অকর্ত্তব্য, কারণ কাপড় যত শুকাইতে থাকে, ততই দেহ হইতে তাপ অপহৃত হইয়া শৈত্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং সর্দ্দি কাসি জ্বর প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের "শুচিবাই" নামক চিকিৎসাশাস্ত্র বহির্ভূত ... তাঁহাদের মধ্যে এই কদভ্যাস প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের শরীর অনেক সময়ে এই কারণে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাঁহারা দূরস্থিত পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, সর্দ্দি কাসি লাগিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দূরে স্নান করিতে গেলে পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।

আমাদের দেশে স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা হিতকর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত। পাশ্চাত্য আচার-পক্ষপাতী নব্যসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক যুবক যুবতী এই প্রথার বিরোধী, এজন্য এই প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। গায়ে তৈল মাখিলে ঘর্ষণ দ্বারা চর্ম্মের উত্তেজনা হয়; এই হেতু অধিক পরিমাণ রক্ত চর্ম্মের দিকে সঞ্চালিত হইয়া ক্লেদ-নিঃসরণ কার্য্যের সহায়তা করে। পুনশ্চ তৈলমর্দ্দন করিলে স্নানের সময় শরীরে কম ঠাণ্ডা লাগে, এজন্য যাঁহারা নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তৈলমর্দ্দন অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৈলের অপর একটি নাম স্নেহ। ইহা মস্তকে ও শরীরে যথারীতি অনুলিপ্ত হইলে মস্তিষ্ক ও দেহ উভয়ই স্নিগ্ধ থাকে, চর্ম্মের কর্কশতা নষ্ট হয় অথচ উহা সুদৃঢ় হয়, কেশের অকালপতন ও অকালপক্বতা দোষ দূর হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং ধাতুর রুক্ষতাদোষ উপশমিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের ধাতুতে বায়ু

বায়ুরোগে কষ্ট পান, মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া অবগাহন স্নান করিলে ঐ সকল রোগের অনেক উপশম হয়। তৈলাভ্যঙ্গের উপকারিতাসম্বন্ধে চরক ঋষির উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"নিত্যং স্নেহার্দ্র শিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে।
ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশা প্রপতন্তি চ॥
বলং শিরঃ কপালানাং বিশেষেণাভিবর্দ্ধতে।
দৃঢ়মূলাশ্চ দীর্ঘাশ্চ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ ভবন্তি চ॥
ইন্দ্রিয়ানি প্রসীদন্তি সুত্বগ্ ভবতি চাননং।
নিদ্রালাভঃ সুখঞ্চ স্যান্ মূর্দ্ধ্নি তৈল নিষেবনাৎ॥
স্নেহাভ্যঙ্গাদ্ যথা কুম্ভশ্চর্ম্ম স্নেহ বিমর্দ্দনাৎ।
ভবত্যুপাঙ্গাদক্ষশ্চ দৃঢ়ঃ ক্লেশসহো যথা॥
তথা শরীরমভ্যঙ্গাদ্দৃঢ়ং সুত্বক্ প্রজায়তে।
প্রশান্তা মারুতাবাধং ক্লেশ ব্যায়াম সংগ্রহং॥
সুস্পর্শোপচিতাঙ্গশ্চ বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
ভবত্যভ্যঙ্গ নিত্যত্বান্নরোঽল্পজর এব চ॥" ইত্যাদি

অর্থাৎ—নিত্য মস্তকে তৈল অনুলেপন করিলে শিরঃপীড়া জন্মে না, কেশের রুক্ষতা অপনীত হয় এবং চুল উঠিয়া যাইয়া মাথায় টাক ধরে না। ইহা দ্বারা কেশ দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শিরোদেশ বলিষ্ঠ হয়। তৈলমর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রশান্ত থাকে, চর্ম্ম কোমল, মসৃণ ও পরিষ্কৃত হয় এবং রাত্রি কালে সুনিদ্রা লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন মৃন্ময় কুম্ভে, চর্ম্মে অথবা চক্রের ধুরায় পুনঃ পুনঃ তৈলসেক করিলে উহা সুদৃঢ়, ও ঘাতসহ হয়, তদ্রূপ শরীরে তৈল অনুলেপন করিলে উহা সুদৃঢ়, ক্লেশসহ ও সুত্বকবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যথারীতি তৈলের ব্যবহারে বায়ুরোগ প্রশমিত হয় এবং দেহ শ্রমসহিষ্ণু হইয়া থাকে। প্রতিদিন তৈল মাখিলে শরীর সুখস্পর্শ, তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হয় এবং বৃদ্ধ বয়সেও জরাজনিত লক্ষণের অসদ্ভাব হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ চরক ঋষির উপরোক্ত উপদেশ বিষয়ে নবীন পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সাহেবেরা আমাদিগকে "তৈলাক্ত বাবু" বলিয়া রহস্য করে বলিয়া আমাদিগকে যে এই দেশোপযোগী ও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত বা সত্যানুমোদিত নহে। বিশেষতঃ তৈল মাখিয়া স্নানের সময় তাহা, তুলিয়া ফেলিবার যখন সদুপায় রহিয়াছে, তখন তৈলমর্দ্দনের উপকার হইতে বঞ্চিত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না।

সকল তৈল অপেক্ষা খাঁটী সরিষা-তৈল ঝাঁঝাল, সুতরাং গায়ে মাখিবার পক্ষে প্রশস্ত। অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট কাল শরীরের সর্ব্বস্থানে তৈলমর্দ্দন করিলে ভাল হয়। এ কার্য্যের জন্য চাকরের আবশ্যক নাই, নিজে নিজেই ইহা সুন্দররূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে। আমরা বাঙ্গালীজাতি, ব্যায়াম করিতে বিশেষ নারাজ। যদি আমরা ১৫ মিনিট কাল ব্যাপিয়া সমস্ত শরীরে জোরে তৈলমর্দ্দন করি, তাহা হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য হইয়া যায়।

সরিষার তৈল মাথায় মাখিবার পক্ষে প্রশস্ত নহে। ইহা কিছু দিন ব্যবহার করিলে, মাথায় আঠা হয়। সকল তৈল অপেক্ষা নারিকেল-তৈল মাথায় মাখিবার উপযোগী। ইহা অনেক দিন মাখিলেও মাথায় আঠা হয় না এবং মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তবে অনেক পুরাতন প্রথার সহিত নারিকেল-তৈলের ব্যবহার আমাদের মহিলাকুলের নিকট ক্রমশঃ অনাদরণীয় হইয়া আসিতেছে এবং ইহার স্থলে বহুবিজ্ঞাপনমুখরিত নানাবিধ অতৈল কুতৈল অধুনা তাঁহাদের কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল তৈলের মধ্যে যথার্থ তৈল বলিয়া যে জিনিস, তাহা আছে কিনা,

তাহা অনেক সময়ে পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। তবে বিলাতী কৌশলে বিদূরিতগন্ধ কেরোসিন্ জাতীয় জ্বালানি তৈল যে অনেক সময়ে উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ তৈল প্রতিদিন ব্যবহৃত হইলে কোন কুফল প্রদান করিবে কিনা, মস্তিষ্কের কোনরূপ নূতন পীড়ার আবির্ভাব হইবে কি না, অথবা বিলাতের পরচুলা-ব্যবসায়ীদিগের সহিত এই সকল তৈলব্যবসায়ী-দিগের ব্যবসাসূত্রে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্যবংশীয় চিকিৎসকদিগের উপর অর্পিত রহিল। তবে কেরোসিন্ জাতীয় এই সকল জ্বালানি তৈলের ব্যবহারে তৈল-ব্যবহারের যে উদ্দেশ্য, তাহা যে সাধিত হয় না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের শরীরে যে মেদ (Fat) আছে, তাহা তৈলজাতীয়। ইহা দ্বারা শারীরিক তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। প্রকৃত তৈল মাখিলে উহার কিয়দংশ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেদের কার্য্যের সহায়তা করে। অনেক স্থলে ডাক্তারেরা এই কারণে কড্ লিভার তৈল গায়ে মাখিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

নারিকেল তৈল কিছু দিন থাকিলে বিকৃত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়; এরূপ তৈলের ব্যবহার অনেকের পক্ষে যে অপ্রীতিকর হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আজ কাল বিশেষ ভাবে সংস্কৃত নারিকেল তৈল বাজারে বিক্রীত হইতেছে। ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে; ইহার সহিত কিঞ্চিৎ গন্ধতৈল মিশাইয়া লইলে মাথায় মাখিবার বেশ উপযুক্ত হয়। এখনো অনেকে ঘরে মসলা মিশাইয়া যে নারিকেলতৈল প্রস্তুত করেন, তাহা ব্যবহারের অনুপযোগী নহে।

তৈল মাখিলে জামা কাপড় শীঘ্র ময়লা হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় অনেকেই তৈল ব্যবহারের বিরোধী। স্নান করিবার সময় করকরে গামছা দ্বারা গা ঘসিলে সমস্ত তৈল উঠিয়া যাইবার কথা। আবার যদি স্নানের পর শুষ্ক কাপড় দিয়া গা উত্তমরূপে মোছা যায়, তাহা হইলে গায়ে কিছুমাত্র তৈল লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানের সময় যাঁহারা সাবান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের গায়ে মোটেই তৈল লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তবে ভাল সাবান ব্যবহার না করিলে গা খস্‌খসে হয় এবং গায়ে (বিশেষতঃ শীত কালে) "খড়ি" ফোটে। যাঁহাদের সাবান ব্যবহার করিতে আপত্তি আছে, তাঁহারা সাবানের পরিবর্ত্তে বেসন ব্যবহার করিতে পারেন। বেসনে গায়ের ময়লা ও চুলের আঠা সহজেই উঠিয়া যায়, অথচ সাবান মাখিলে গা যেরূপ খস্‌খসে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। কিন্তু আজকালকার দিনে বেসনের গুণ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে ভরসা হয় না। একেত নারিকেল তৈলের সুখ্যাতি করিয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদা পাঠিকাগণের বিরাগভাজন হইয়াছি, তাহার উপর আবার বেসনের গুণ বর্ণনা করিলে হয়ত তাঁহাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে জলের দোষে সাবানের ভাল ফেনা হয় না। কোন কোন জলে সাবান ঘসিবামাত্র ভাল ফেনা

হয়, যেমন বৃষ্টির জল, কলিকাতার কলের জল ইত্যাদি। এরূপ জলকে ইংরাজীতে Soft water কহে। আমরা এইরূপ জলকে "কোমল জল" কহিব। যতক্ষণ সাবানের ভাল ফেনা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ বা বস্ত্রাদিতে সাবান ঘসিলে উহার মলিনতা অপনীত হয় না। এমন অনেক কূপের বা পুষ্করিণীর জল দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহাতে অনেকক্ষণ সাবান না ঘসিলে ফেনা উৎপন্ন হয় না; সুতরাং এরূপ জল, স্নান বা বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইলে, অনেক সাবান নষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এরূপ জলকে Hard water কহে। আমরা ইহাকে "কঠোর জল" বলিব।

যদি স্নানের জল এইরূপ "কঠোর" হয়, তবে উহাকে ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইলেই উহার কঠোরত্ব অনেক কমিয়া যায়। তখন ইহাতে সাবান ঘসিলে সহজে ফেনা হইয়া গাত্র পরিষ্কৃত হয় এবং অধিক সাবানও নষ্ট হয় না। কাপড় কাচিবার জলও ফুটাইয়া উহাতে অল্প পরিমাণ সোডা দিলে অল্প সাবানের ব্যবহারেই কাপড় পরিষ্কৃত হয়।

প্রত্যহ এক সময়ে স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; যে সময়ে যাঁহার অভ্যাস, তিনি সেই সময়ে স্নান করিতে পারেন। তবে অধিক পরিশ্রমের পর, উপবাসের পর অথবা পূর্ণ আহারের পর স্নান করা অবৈধ। অনেকেই প্রাতঃস্নানের পক্ষপাতী; গ্রীষ্মপ্রধানদেশে প্রাতঃস্নান অতিশয় সুখকর এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তিজনক। বিশেষতঃ যাঁহারা দূরে যাইয়া নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাতঃস্নানই প্রশস্ত, কারণ বেলা হইলে গমনাগমনের অসুবিধা হয়।

যাঁহাদের প্রত্যহ স্নান সহ্য হয় না, তাঁহাদের ভিজা গামছা দিয়া দিবসে ২।৩ বার সমস্ত শরীর ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহ্য হয়, তাঁহাদের পক্ষে গ্রীষ্মকালে দুইবার স্নান উপকারী ভিন্ন অপকারী নহে।

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে প্রাতঃকৃত্য-সমাধান-অভ্যাস স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ অনুকূল। ইহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে। বিশেষ অর্থেই এখানে প্রাতঃকৃত্য কথাটির ব্যবহার করিলাম। দিবসে যে সময়েই বেগ উপস্থিত হউক না কেন, ঐ বেগ ধারণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রিয়া সমাধান করিলে আমরা নানা রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার বেগ ধারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয়বিধ ভৈষজ্য শাস্ত্রের মতেই মহা অনিষ্টকর। এ সম্বন্ধে চরক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

> "ন বেগান্ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্র পুরীষয়োঃ।
> ন রেতসো না বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষবথোর্ন চ॥
> নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
> না বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ॥"
> ইতি চরক—"ন বেগান্ ধারণীয়" অধ্যায়ং॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মল, মূত্রাদি, বায়ু, বমি, হাঁচি, উদ্গার, হাই, ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা এবং পরিশ্রম-জনিত শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগধারণ করিবেক না।

তবে কার্য্যগতিকে বা স্থলবিশেষে এই সকল স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার বেগধারণ অপরিহার্য্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব, উহাদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৪)

মুখ-প্রক্ষালন।

আর একটি কথা বলিয়া স্নানের পাঠ শেষ করিব। যদি প্রত্যূষে মুখ প্রক্ষালন করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্নান করিবার সময় এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করা উচিত। সুদৃঢ় দন্তপংক্তি ভারতবাসীর একটি অমূল্য সম্পত্তি। ইয়ুরোপে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, উভয়েরই মধ্যে দাঁতের অসুখ এবং কৃত্রিম দন্তের সংখ্যা যেমন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ভারত-বাসীদের মধ্যে উহা তেমনই বিরল। মেডিকাল্ কলেজে যে সাহেব আমাদিগের দন্ত-চিকিৎসার অধ্যাপক ছিলেন, তিনি বারবার আমাদিগকে বলিতেন যে, এদেশের লোকের মধ্যে যেরূপ সুসজ্জিত ও সুদৃঢ় দন্তপংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বিলাতে তাহার নিতান্ত অভাব। দন্তশূল, মাড়িফোলা, দাঁতে পোকাধরা ইত্যাদি রোগ এদেশে খুব কম দেখা যায়। সুদৃঢ় দন্তপংক্তি খাদ্য পরিপাকের যে বিশেষ সহায়তা সম্পাদন করে, তাহা আমি আহারতত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। আমাদিগের অযত্নে যদি আমাদের এরূপ অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য আমরাই দায়ী।

দাঁতন ও মাজন ব্যবহার করা দন্তরক্ষার একটী বিশিষ্ট উপায়। দাঁতন দ্বারা দাঁতের ফাঁকের মধ্যে যাহা কিছু ময়লা ও ভুক্ত দ্রব্যের অংশ সঞ্চিত থাকে, তাহা দূরীভূত হয় এবং মাজন দ্বারা দন্ত পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। দাঁতনের পরিবর্ত্তে ব্রুস্ (Tooth-brush) ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ ব্রুস্‌খানি সাবানের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া না রাখিলে উহা পুনঃ ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত একই ব্রুস্ প্রত্যহ মুখের ভিতর দিতে অনেকে আপত্তি করেন। এরূপস্থলে প্রত্যহ একটা করিয়া নূতন দাঁতন ব্যবহার করিলে কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ দাঁতনরূপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাদের ব্যবহার অহিতকর, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

> "কদম্ব বিল্বখদির করবীর বটার্জ্জুনাঃ।
> তগরং বৃহতী জাতী করঞ্জার্কাতিমুক্তকাঃ॥
> জম্বু মধুকাপামার্গ শিরসো ডুম্বুরাসনাঃ।
> ক্ষীরি কণ্টকবৃক্ষাদ্যাঃ প্রশস্ত দন্তধাবনে॥
> গুবাক তাল হিন্তাল খর্জ্জুরৈঃ কেতকীচুতৈঃ।
> নারিকেলেন তাড্যাচ ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং॥"

এদেশে নিমগাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে; নিমের দাঁতন নরম, উহা ব্যবহার করিলে দন্ত পরিষ্কৃত এবং উহার রসে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

কাঠের কয়লার গুঁড়া সাধারণ লোকে সচ্ছন্দে মাজনরূপে ব্যবহার করিতে পারে। ইহার খরচ কিছুই নাই, অথচ কয়লার দুর্গন্ধনাশক ক্ষমতা থাকিবার জন্য মুখ বেশ পরিষ্কার থাকে। অনেকে ঘুঁটের ছাই মুখ ধুইবার জন্য ব্যবহার করেন কিন্তু ক্ষার-ধর্ম্মাক্রান্ত (Alkaline) বলিয়া উহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে দাঁত ও মাড়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। চা-খড়ি উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া

উহার সহিত অল্প পরিমাণ ফট্‌কিরি এবং ডালচিনির গুঁড়া ও কর্পূর অথবা পিপারমিণ্ট্ বা ইউকালিপ্টাস্ তৈল মিশ্রিত করিয়া লইলে সুগন্ধিযুক্ত উত্তম দন্তমার্জ্জন প্রস্তুত হইতে পারে। গৃহস্থলোক মাত্রেই স্বল্পব্যয়ে এই দন্তমার্জ্জন গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

এস্থলে আর একটী কথা আমার বলিবার আছে। স্নানের সময় অথবা প্রাতঃকালে একবার মুখ ধুইলেই যে দাঁতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, তাহা নহে। যতবার কিছু খাওয়া যায়, তাহার পরেই উত্তমরূপে কুলকুচা করিয়া মুখ পরিষ্কৃত করিয়া ফেলা উচিত। দাঁতের মধ্যে কোন সময়ে খাদ্য বা পানের অংশ আট্‌কাইয়া থাকিতে দিবে না, কিন্তু উহা বাহির করিবার জন্য ধাতুনির্ম্মিত অথবা অন্য কোন প্রকার কঠিন "দাঁতখুঁটা" ব্যবহার না করিয়া নরম খড়িকাই ব্যবহার করা উচিত। দাঁতের মধ্যে খাদ্যের অংশ বা চিবান পান আটকাইয়া থাকিলে উহা শীঘ্র বিকৃত হইয়া এমন বিষাক্ত রস উৎপাদন করে যে, তাহার সংস্পর্শে মাড়ী ফুলিয়া উঠে, দন্তশূল উপস্থিত হয় এবং দাঁত ক্রমশঃ আলগা হইয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার খাতিরে টেবিলে বসিয়া খাইবার পর কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইবার সুবিধা হয় না, কেবল দুই হস্তের দশাঙ্গুলির অগ্রভাগ গোষ্পদ-পরিমিত জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিলেই আচমনের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। এরূপ অস্বাস্থ্যকর প্রথা অবলম্বন করিলে আমরাও যে চিরকালের জন্য দাঁতের মাথা খাইবু, তাহাতে আর বিচিত্র কি? টেবিলে বসিয়া খাইতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু খাইবার পর সাহেবীধরণে আচমন না করিয়া ভাল করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলার একান্ত আবশ্যক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতিনীতি গুলির সামঞ্জস্য করিয়া লইলে উপকার ভিন্ন অপকার দর্শে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

করুণার স্বয়ম্বর

অন্তঃপুরে আছিলা করুণা
লাজময়ী, অনূঢ়া, কুণ্ঠিতা;
দুঃখ, দ্বারে করিল রোদন!—
বাহিরিলা ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা!

চীরধারী, ছলছল-আঁখি,
আর্ত্ত দুঃখে হেরিয়া দুয়ারে,
টুটে'গেল সরম-সঙ্কোচ;
আলিঙ্গন দিলা ধনী তা'রে!

বক্ষে চাপি' চুমি' মুহুমুহু,
তপ্ত তনু দিলা শীতলিয়া!
'স্বয়ম্বরে দুঃখের গলায়
বরমাল্য দিলা, গো, তুলিয়া!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার

প্রয়াগের দুয়েকটি দৃশ্য

[বহুদিন পূর্ব্বে একবার ভারতীতেই আমার প্রয়াগ দর্শনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভারতীর সে সংস্করণ এখন নিঃশেষিত, পাঠকশ্রেণীও অধিকাংশ নূতন সুতরাং আর একবার চিত্রাবলী সংযোগে সেই সকল পুরাতন কথাই নূতন আকারে লিখিলে বোধ করি অপাঠ্য হইবে না।]

গঙ্গাযমুনাসঙ্গম। সকলেই জানেন, প্রয়াগের প্রধান মাহাত্ম্য ত্রিবেণী সঙ্গমে,—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর পুণ্য মিলন স্থলে। এখান হইতে সরস্বতী যদিও অনেকদিন অন্তর্ধান করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গা যমুনার যুগলমিলনে সৌন্দর্য্যের যে স্রোত প্রবাহিত তাহা দেখিলে সরস্বতীর অভাব মনেই পড়ে না।

সরস্বতী যে প্রয়াগতীর্থ ছাড়িয়া গিয়াছেন পাণ্ডারা কিন্তু একথা স্বীকার করে না। তাহারা বলে দেবী অন্তঃশীলা বহিতেছেন। যমুনার তীরে দুর্গের ঠিক নীচে—একটি ধ্বজা পোঁতা, এই ধ্বজা নিম্নস্থ কূপেই নাকি এখন সরস্বতী বিরাজিতা তাই ইহার নাম সরস্বতী কূপ। মাঝিরা বলিল—কূপের উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলে জল ঠিক দুধের মত শাদা দেখায়! এই কূপে পাণ্ডাদের বিলক্ষণ উপায় হয়।

আমরা নৌকা করিয়া সঙ্গম দেখিতে গিয়াছিলাম। যমুনার কালো জলে নৌকা ভাসিল, যমুনাপুলের জলপ্রোথিত প্রকাণ্ড স্তম্ভের মধ্য দিয়া তরতর বেগে নৌকা দুর্গ প্রাকারের নিকটে আসিয়া পড়িল। এই দুর্গ আকবরশাহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,—ইংরাজেরা এখন ভোগ দখল করিতেছে! একদিন দুর্গের সিংহাসন-আকারে গঠিত বারাণ্ডার উপরে বসিয়া মোগল সম্রাট যখন গর্ব্বভরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তখন তিনি জানিতেন না, পেণ্টলুনের মধ্যে কামিজ-কসা, সমুদ্রপারের রাঙ্গামুখ সৈনিক বাচ্ছারা একদিন এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমান দর্পভরে দূরবীনের ভিতর দিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিবে। এ জ্ঞানটা সেদিন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

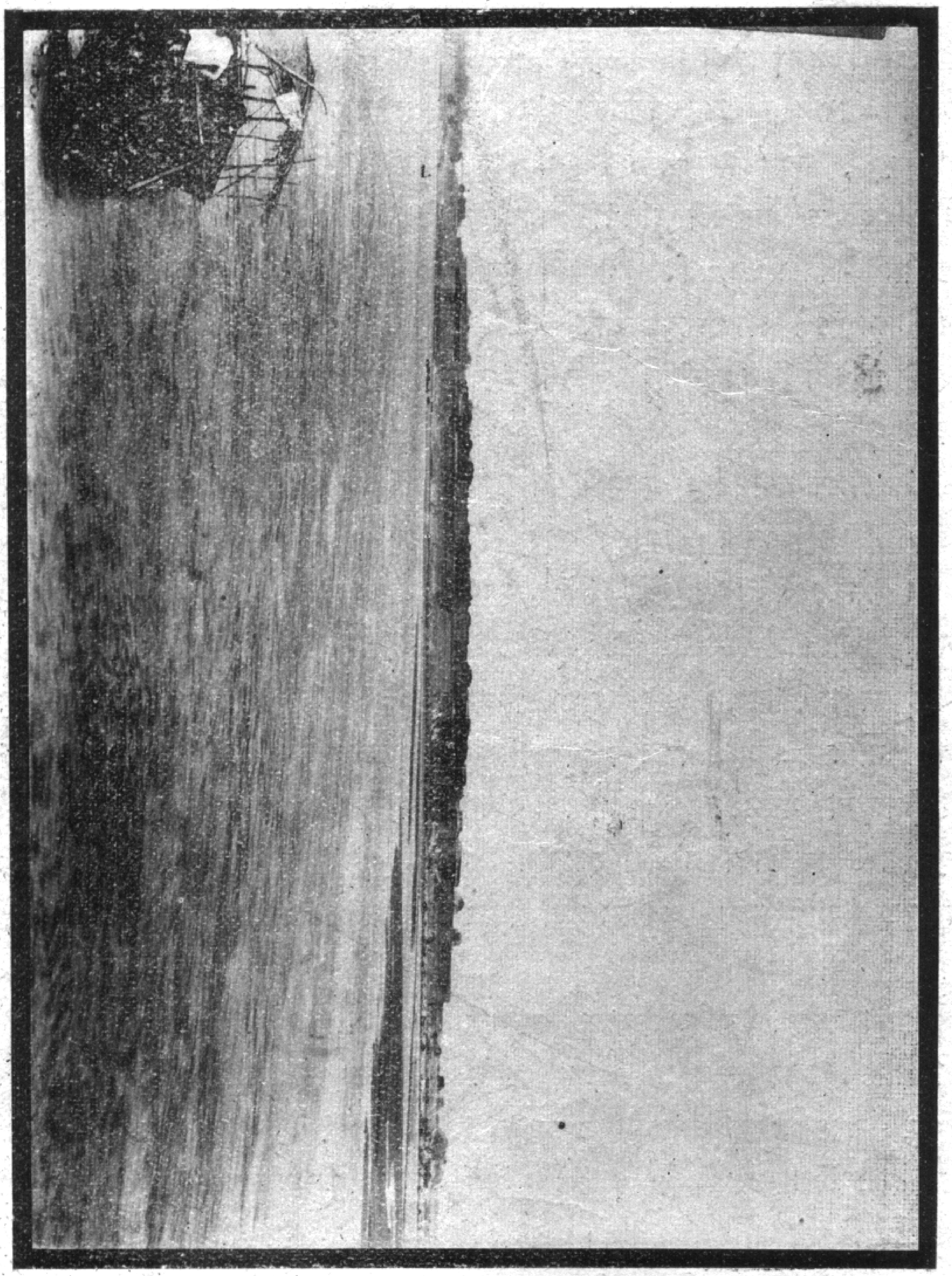
কি প্রকাণ্ড দুর্গ!—গঠনই বা কি মজবুত! পশ্চিম দিকের প্রাকার ভিত্তি ঠিক জলের ভিতর হইতে উঠিয়াছে, কত শতাব্দীর বর্ষার ভীমতোড় ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—তবু দুর্গ অটল পাষাণের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, ভবিষ্যতের শত সহস্র বৎসরের অত্যাচারকে পায়ে ঠেলিয়া দিবার জন্য ভীমদর্পে অপেক্ষা করিতেছে। কি মসলায় গঠিত হইয়া দুর্গের গাঁথুনি এত কঠিন হইয়াছে অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নদীর ধারে দুর্গপ্রাকারের একস্থানে ইংরাজ আমলে একটু ফাটিয়া গিয়াছে, তাহা যতবারই মেরামত হইতেছে ততবারই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কিছুতেই ঠিক দুর্গের অন্যস্থানের মত এ স্থানটুকুকে ইঁহারা মজবুত করিতে পারিতেছেন না।

দেখিতে দেখিতে নৌকা গঙ্গায় আসিয়া পড়িল;—পূর্ব্বে যমুনার মত গঙ্গাও দুর্গের গা ঘেঁসিয়া বহিত। এ দেশের একটি প্রবাদই আছে—

দরিয়াবাদ দরিয়া কিনারে
করিয়াবাদনিশানী,
আকবর যো কিল্লা বানায়া
ত্রিবেণীকা পানি।

এখন গঙ্গা একটু সরিয়া পড়িয়াছে, তবে বর্ষাকালে অবশ্য গঙ্গা এখনো দুর্গের ভিত্তিতে আসিয়া লাগে।

গঙ্গা যমুনার মিলন স্থানে জলের কি তোড়!



গঙ্গাযমুনা সঙ্গম (ত্রিবেণী তীর্থ)

দুইটা প্রকাণ্ড জলরাশি, একটার উপরে একটা ঝাঁপাই ঝুড়িতে ঝুড়িতে অবশেষে এক হইয়া, প্রশান্তভাবে সরিয়া পড়িয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে।—কে স্বামীর কাছে অগ্রে পৌঁছিবে—এই বিবাদে উন্মাদ হইয়া যেন দুই পত্নী একজনকে একজন তীরবেগে



অক্ষয়বট (এলাহাবাদ—ফোর্ট মধ্যস্থ)

ছাড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে, পরে অতি বেগে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াই যেন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সঙ্গম স্থানটি দেখিলে কৃষ্ণের মোহিনীমূর্ত্তি মনে পড়ে। আধো শাদা, আধো কালো, আধো জটা, আধো চিকুর, এই আধো আধো রূপে যেন দিক ভরিয়া গিয়াছে।

অক্ষয়বট। গঙ্গাযমুনা দুর্গের বহির্দৃশ্য, অক্ষয়বট দুর্গের অন্তরের ধন।

আমরা দুর্গ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া যখন শস্ত্রধারী প্রহরীদের নিকট দিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে লাগিলাম— গাটা যেন ছমছম করিয়া উঠিল। মনে হইল লোকালয় হইতে বুঝি একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। এই দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল—আর কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল শুনিলাম একই। এই দুর্গ দেখিয়াই নাকি সেই ধরণে ইংরাজেরা কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে একে একে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রতিদ্বারেই শস্ত্রধারী প্রহরী, এক দ্বার অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বার পর্য্যন্ত স্থান যেন সৈন্য ও গোলা কামানপূর্ণ এক একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। দুর্গের পয়ঃপ্রণালীর এমনই বন্দবস্ত যে ইচ্ছামাত্র দুর্গ দ্বারের নিম্নস্থ দুই পার্শ্বের স্থান একেবারে জলময় করিয়া তোলা যায়—শত্রু আসিতে হইলে প্রথমতঃ সেই জল পার হইয়া—দুর্গ বাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে। সচরাচর সকলে দুর্গের তৃতীয় দ্বারের ভিতর পর্য্যন্ত যাইতে পারে— আমাদের পাশ ছিল, আমরা চতুর্থদ্বার অতিক্রম করিয়া একেবারে অস্ত্রাগার পর্য্যন্ত পৌছিলাম।

প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে দেশীয় সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত,—যদি কেহ আক্রমণ করে আগে মরিবে দেশের লোকগুলা। সৌভাগ্যের কথা; দেশের জন্য আত্মদানের সুযোগ প্রথমেই তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—সে কি অপূর্ব্ব কাণ্ড! ঘরের চারিদিকে কত রকম করিয়া বন্দুক সাজান, দেওয়ালে দেওয়ালে বর্ষা তরবার সঙ্গীন্ ঝকঝক করিতেছে,—যেদিকে চাই চোখ যেন ঝলসিয়া যায়!

অক্ষয়বট দেখিতে চতুর্থ দ্বার অতিক্রম করিতে হয় না। তৃতীয় দ্বার পার হইলেই সম্মুখে উদ্যানে অশোকস্তম্ভ দেখা যায়। স্তম্ভপ্রতিষ্ঠার সময়াদি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত। দেশের লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। এ গদা দেখিয়া ভীমকে কল্পনা করা বড় সহজ কথা নহে। এই স্তম্ভ ছাড়াইয়া কিছু দূরেই অক্ষয় বটের সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের উপরই আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল—আমরা নামিয়া সোপানপথে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। সুড়ঙ্গে পৌছিবামাত্র অন্ধকারে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। একজন পাণ্ডা আলো হাতে লইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া চলিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়াই দেখিলাম, সুড়ঙ্গের এক পার্শ্বে ত্রিবেণীমাধবের মূর্ত্তি। পাণ্ডা বলিলেন—যেখানে এখন দুর্গ দেখিতেছ এই দুর্গ নির্ম্মাণের আগে এ স্থান গঙ্গার জলে পূর্ণ ছিল, আকবর তাহা দেখিয়া ত্রিবেণী মাধবের কাছে বর প্রার্থনা করিলেন যে, পাঁচশত বৎসরের জন্য গঙ্গাজি কিছু সরিয়া যাউন। বেণীমাধবজি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন

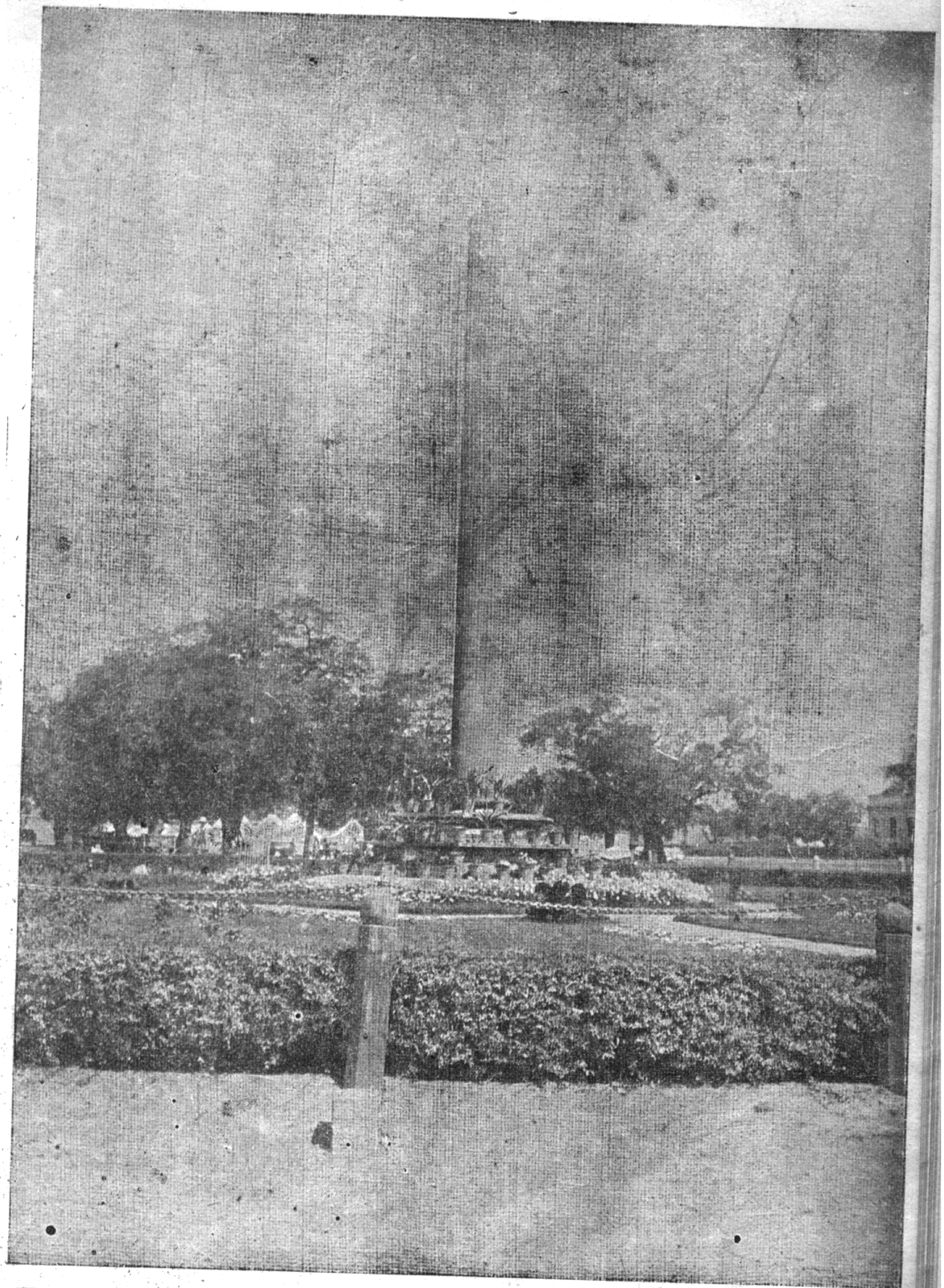
—পাঁচশত বৎসর কেন,—গঙ্গা লইয়া আমি হাজার হাজার বৎসরের জন্য এস্থান ছাড়িয়া যাইতেছি তুমি এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ কর!

গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা সুড়ঙ্গের মধ্যে যাহা কিছু আছে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

সুড়ঙ্গটা উচ্চে দেড় মানুষ আন্দাজ,—প্রস্থে বোধ হইল দুই তিন জন লোক এক সঙ্গে পাশাপাশি চলিতে পারে; আর দৈর্ঘ্যে আন্দাজ পঁচিশ ত্রিশ হাত। সুড়ঙ্গের দুই পার্শ্বের দুই দেওয়ালে অনেকগুলি কোলঙ্গা ও এক এক কোলঙ্গায় এক একটি দেবতা মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি সবই পাথরের; তাহার কোনটারই না আছে ছাঁদ—না আছে শ্রী—সবই অদ্ভুত রকমের। কিন্তু অদ্ভুত বলিয়াই বুঝি দেখিতে এত লাগে ভাল। একটি কোলঙ্গায় রাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তির কাছে আলাদা একখানি পা দেখিলাম। পাণ্ডা বলিল, বনে যাইবার পথে রামচন্দ্র প্রয়াগ দর্শনে আসিয়া এই পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গের একজন এ দেশী চাকর—এই কথায় ভাবোচ্ছ্বাসে ওহো ওহো করিয়া উঠিল।

অক্ষয় বটের কাছাকাছি আসিয়া সুড়ঙ্গের মেজের উপর কয়েকটি শিবপ্রস্তর স্থাপনা দেখিলাম। একখানি প্রস্তর ভগ্ন। পাণ্ডা বলিল আরঙ্গীব ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, ভাঙ্গিবামাত্র রক্তে সুড়ঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। আরঙ্গীব কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন—কত হিন্দু দেবদেবী নষ্ট করিয়াছেন তাহাও সে গল্প করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে সুড়ঙ্গের প্রায় শেষভাগে আসিয়া বটবৃক্ষের স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই রৌদ্রহীন বায়ুহীন নিরালোক বদ্ধপ্রদেশে দুএকটি নবীন পাতা মুঞ্জরিত একটি ছিন্নমস্তা জীবন্ত বৃক্ষ দণ্ডায়মান! অনেকে বলেন,—পাণ্ডারা প্রতিদিন নবীন পাতা আনিয়া গাছটির গাত্রে কৌশলে লাগাইয়া রাখে। তাহা হইলেও সেই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা যে ভূয়সী প্রশংসাযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পাতাগুলি এমনই স্বাভাবিক ভাবে বৃক্ষসংলগ্ন যে ইহার মধ্যে কোন ফাঁকি থাকিলেও সে ফাঁকি কিছুতেই ধরা যায় না।

গাছের প্রধান যে গুঁড়ি তাহা মাটী হইতে আন্দাজ আধহাত মাত্র, সেই গুঁড়ি হইতে অপেক্ষাকৃত দুইটা ছোট গুঁড়ি উঠিয়া প্রায় ছাদ স্পর্শ করিতেছে। গুঁড়ি দুইটির অগ্রভাগ একেবারে কাটা; পাণ্ডারা বলে, ছাত স্পর্শ নিবারণ উদ্দেশ্যে তাহারা গুঁড়ি দুইটির আগা এইরূপে কাটিয়া রাখে। প্রধান গুঁড়িটি একটি চিত্রাঙ্কিত যবনিকায় ঢাকা। পয়সা হাতে পাইয়া তবে পাণ্ডাগণ সেই পরদা সরাইয়া যাত্রীকে বট দর্শনের পুণ্য দান করে। বড় গুঁড়ির দুইপাশে দুই জায়গায় একএকটি নিতান্ত সরু ডাল বাহির হইয়াছে—সেই ডালে কাঁচা কাঁচা দুই চারিটি পাতা। তাহা ছাড়া সমস্ত গাছে আর পাতা নাই। গুঁড়ি দুইটিই কিন্তু গাঁটে গাঁটে ভরা; এবং গাঁটগুলিও দেখিতে এমন নবীন যে মনে হয় উহা হইতে কিছুদিন পরে আবার নূতন পাতা বাহির হইবে। কিন্তু শুনিলাম নূতন পাতা এ গাছে সব সময় দেখা যায় না, অনেকদিনের পর এবার দুএকটি পাতা বাহির



অশোকস্তম্ভ—এলাহাবাদ ফোর্ট

এই কথা বলিয়া তাহার পুণ্যপ্রভাব কীর্ত্তনে সন্তুষ্ট করে।

এই গুহা অক্ষয় বটের জীবন্ত সমাধি। পৃথিবীতে শুনিয়াছি সাতটি আশ্চর্য্য বস্তু আছে আমার ত মনে হইল এই বটবৃক্ষকে আর একটি আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এই গাছটি কতকালের তাহা কেহ বলিতে পারিল না। পাণ্ডা বলিল, ইহা সৃষ্টির প্রথম হইতে বিদ্যমান---যখন প্রলয়-কালে পৃথিবী জলময় হইবে,---এই গাছটি হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি পাতা উৎপন্ন হইয়া সেই জল ঢাকিয়া দিবে, —আর সেই পাতাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্স্সৃষ্টি করিবেন।' দেবতাদেরও তাহা হইলে জন্ম পুনর্জ্জন্ম আছে ?

অক্ষয় বটের পর অল্পদূর গিয়া সুড়ঙ্গের শেষ, শেষটা একেবারে বন্ধ নহে—একজন মানুষ গুঁড়িসুড়ি দিয়া সুড়ঙ্গ পারে যাইতে পারে*এইরূপ পথ আছে! পাণ্ডা বলিলেন, এই সুড়ঙ্গ বরাবর কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডার কাছে আকবরের জন্মের বেশ একটি কৌতুকজনক গল্প শুনিলাম। অক্ষয়বটের কাছাকাছি সুড়ঙ্গের মেজের উপর একজায়গায় একটু গর্ত্তের মত আছে, পাণ্ডা তাহা দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে বালমুকুন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী বসিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন শিষ্যগণ তাঁহাকে যে দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছিল, তাহাতে গরুর একগাছি লোম ছিল, সেই লোম মুখে পড়িবামাত্র ব্রহ্মচারী বলিলেন—"হা শিষ্যগণ তোমরা করিলে কি ? আমাকে এমন পাপে লিপ্ত করিলে ?" বলিতে বলিতে তিনি তনুত্যাগ করিলেন এবং সেই পাপে মুসলমানের ঘরে আকবর বাদশাহরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

আকবরের প্রতি দেশের লোক কিরূপ সন্তুষ্ট এই গল্প হইতে বুঝা যায়। আকবরের এবং তাঁহার মন্ত্রী বীরবলের প্রশংসা এদেশের লোকের মুখে ধরে না। পাণ্ডা বলিল, আকবর অক্ষয় বটের এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার পর মন্ত্রী বীরবল ইহা স্বর্ণনির্ম্মিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—শেষে তাহাতে দস্যুর উপদ্রব ঘটিতে পারে এই ভাবিয়া তাহা করেন নাই। এত গল্প করিয়াও তবু সেদিন পাণ্ডা মহাশয়ের অনেক গল্প বাকী রহিয়া গেল, তাই পরদিন তাঁহাকে আমাদের বাড়ী আসিতে নিমন্ত্রণ করিলাম। সেদিন আসিয়া, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়িয়া তাঁহাদের আয় পসার কিরূপ কমিয়াছে, সেই দুঃখই তিনি বেশী করিলেন। যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই ঃ

ফোর্টের ইংরাজদের ইচ্ছা নয় যে পাণ্ডারা দুর্গ মধ্যে থাকে,---পাণ্ডাদের উঠাইবার জন্য তাহারা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু আকবরের পরোয়ানার জোরে—তাহারা বাঁচিয়া গেছে। আকবর দুর্গ নির্ম্মাণের সময় পাণ্ডাদের এইরূপ পারোয়ানা দিয়াছেন যে, তাহারা বংশানুক্রমে দুর্গ মধ্যে থাকিয়া এই বৃক্ষের আয় ভোগ দখল করিবে। এখান হইতে অন্য কোন রাজা তাহাদিগকে উঠাইতে পারিবেন না।

গোরাগণ এ মকদ্দমায় পরাজিত হইল বটে, কিন্তু রবিবার দিন যাত্রীদের এখানে আসা বন্ধ হইল,---পাণ্ডাদের তাহাতেও বিলক্ষণ ক্ষতি,—তাহারা প্রয়াগবাসী বরদার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান দিনকর রাওকে ধরিয়া অনেক কষ্টে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে

হইতে পরে সে নিয়ম রহিত করিবার হুকুম পাইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। আগেকার মত দিনের মধ্যে যখন তখন কোন যাত্রী আর অক্ষয় বট দেখিতে আসিতে পারে না। সকালে বিকালে এখানে আসিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ইহাতে তাহাদের বিস্তর ক্ষতি,—ইহার উপর গোরা প্রহরীদের প্রতিদিন কিছু কিছু বক্‌সিস না দিলে চলে না, নহিলে তাহারা সব যাত্রী ভাগাইয়া দেয়।

বজ্রলেপ

কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাজসাহী ডিভিশনের কমিসনার মাননীয় মোনাহন সাহেব মহোদয় কথাপ্রসঙ্গে এই বজ্রলেপের কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেন। আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিব বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এই বজ্রলেপ বা বজ্রের মত কঠিন সিমেণ্ট বা আস্তরের বিষয় সাধারণ পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত করিতে পারে বলিয়া এখানে আলোচিত হইল।

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রলাল শীল মহাশয় তাঁহার "The Mechanical Physical and Chemical Theories of the Ancient Hindus" নামক উপাদেয় প্রবন্ধে এই বজ্রলেপের উল্লেখ করিয়াছেন।(১) স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার Indo Aryans নামক পুস্তকে উহার ইংরাজি অনুবাদ দিয়াছেন।(২) বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এই বজ্রলেপের প্রথম বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রলেপের উপাদানগুলি রাসায়নিকের নিকট পরীক্ষার সার্টিফিকেট পাইবে কি না একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

বরাহমিহির খ্রীষ্টপরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বৃহৎসংহিতায় বজ্রলেপ সম্বন্ধে আটটি শ্লোক আছে। সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৃহৎসংহিতা হইতে শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই বজ্রলেপের গুণবর্ণনা করিবার সময় বরাহমিহির লিখিয়াছেন।

প্রাসাদহর্ম্যবলভীলিঙ্গপ্রতিমাসু কুড্যকূপেষু,
সন্তপ্তো দাতব্যো বর্ষসহস্রায়ুতস্থায়ী।৪।

অর্থাৎ "এই বজ্রলেপ প্রাসাদ, হর্ম্য, বলভী (বাতায়ন), লিঙ্গ (শিবলিঙ্গ), প্রতিমা, ভিত্তি ও কূপে গরম করিয়া লাগাইলে উহা সহস্র এমন কি অযুতবর্ষ স্থায়ী হইবে।" অনেকে মনে করেন যে পূর্ব্বে গৃহাদি এই বজ্রলেপ নামক সিমেণ্টের দ্বারা প্রস্তুত হইত এবং সেইজন্য ভারতবর্ষে প্রাচীন মন্দিরাদি এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।

---

(১) p. 133.

(২) Indo-Aryans Vol. I. p. 85

ডাক্তার শীল লিখিয়াছেন, –

"There was ample use for these in the temple architecture of the Buddhist period, the remains of which bear testimony to the adamantine strength of these metal or rock cements" এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বজ্রলেপের উপাদানগুলির আলোচনা করা যাউক।

বৃহৎসংহিতায় তিনপ্রকার প্রস্তুত বজ্রলেপের প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আমি সেই তিনপ্রকার বজ্রলেপকে ভেষজ, প্রাণিজ ও ধাতুজ বজ্রলেপ নাম দিলাম।

ভেষজ বজ্রলেপ।

(১) আমং তিন্দুকমামং কপিত্থকং
পুষ্পমপি শাল্মল্যাঃ।
বীজানি শল্লকীনাং ধন্বনবল্কো বচা চেতি ॥ ১ ॥
এতৈঃ সলিলদ্রোণঃ ক্কাথয়িতব্যোঽষ্টভাগশেষশ্চ।
অবতার্য্যোঽস্য চ কল্কো দ্রব্যৈরেতৈঃ সমনুযোজ্যঃ ॥২॥
শ্রীবাসকরসগুগ্গুলু ভল্লাতক কুন্দুরুকসর্জ্জরসৈঃ।
অতসীবিল্বৈশ্চ যুতঃ কল্কোঽয়ং বজ্রলেপাখ্যঃ ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ "অপক্ক তিন্দুক (গাব), অপক্ক কপিত্থক (কয়েৎ বেল), শিমুলের ফুল, শাল্লকীর (শালই) বীজ, ধম্বনবৃক্ষের ছাল ও বচ এই কয়েকটি দ্রব্য একদ্রোণ পরিমাণ জলে জ্বাল দিয়া উহাদের ক্কাথ বাহির করিবে ও শেষ অষ্টভাগ থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে এই কল্কে শ্রীবাসক (তার্পিন তৈল) রস (বোল, myrh), গুগ্গুলু, ভল্লাতক (ভেলার আঠা), কুন্দুরুক (দেবদারু বৃক্ষের নির্য্যাস বা আঠা), সর্জ্জরস (শাল-নির্য্যাস বা ধুনা), অতসী, (মশিনা বা তিসি) ও বেল মিলাইয়া পুনরায় কল্ক প্রস্তুত করিলে বজ্রলেপ প্রস্তুত হইবে।"

উপরোক্ত বজ্রলেপের উপাদান হইতে দেখিতে পাই যে ঐ সকল উপাদান

পারে—গাবের আঠা, ভেলার আঠা, দেবদারুর আটা, এবং ধুনা, গুগ্গুলু ও বোল প্রভৃতি রজন (resin) জাতীয় পদার্থ ও মশিনার তৈল ও তার্পিন তৈল মিশাইয়া একটা বার্ণিস প্রস্তুত হইবে। আজ কালও কাঠের উপর পালিস করিবার জন্য কতকটা এইরূপে বার্ণিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে চূণ ও সুরকীর প্রচলন হয় নাই, উপরোক্ত বজ্রলেপ নামক আঠা দিয়া প্রাসাদ, হর্ম্ম্য প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এই বার্ণিস আস্তরের কাজেই সমধিক ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়।

(২) ভেষজঘটিত আরও এক প্রকার বজ্রলেপের উল্লেখ বৃহৎসংহিতায় আছে। উহার উপাদান প্রথমোক্ত বজ্রলেপের উপাদানের অনেকটা সদৃশ।

লাক্ষাকুন্দুরু গুগ্গুলু গৃহধূম কপিত্থবিল্বমধ্যানি।
নাগফলনিম্বতিন্দুক মদনফলমধূকমঞ্জিষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥
সর্জ্জরসরসামলকানি চেতি কল্কঃ কৃতো দ্বিতীয়োঽয়ম্।
বজ্রাখ্যঃ প্রথমগুণৈরয়মপি তেষ্বেব কার্য্যেষু ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ "লাক্ষা (lac) দেবদারু বৃক্ষের আটা, গুগ্গুলু, গৃহধূম (ঝুল) কয়েৎবেল ও বেলের মধ্যভাগ, নাগফল, নিম্ব, গাব, মদনফল, (নটফল), মধুক, (যষ্টিমধু) মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা, বোল, আমলকী এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া (প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী) কল্ক প্রস্তুত করিলে প্রথমোক্ত বজ্রলেপের ন্যায় গুণযুক্ত বজ্রলেপ প্রস্তুত হইবে।

প্রাণিজ বজ্রলেপ বা বজ্রতল।

এই বজ্রলেপ আধুনিক শিরীশ আঠার মত পদার্থ হইবে।

গোমহিষাজবিষাণৈঃ খররোম্না মহিষচর্ম্মগব্যৈশ্চ।

অর্থাৎ "গো, মহিষ এবং ছাগলের শৃঙ্গ, গর্দ্দভের রোম, মহিষ ও গরুর চর্ম্ম, নিম, কয়েৎবেল এবং বোল একত্র করিয়া (প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী) কল্ক প্রস্তুত করিলে (প্রথমোক্ত বজ্রলেপের ন্যায় গুণযুক্ত) বজ্রতল (নামক বজ্রলেপ) প্রস্তুত হইবে।"

আজকাল শিরীষ আঠা গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তুর শিং, হাড় প্রভৃতি জলে জ্বাল দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিং, হাড় প্রভৃতির ভিতর যে নরম পদার্থ থাকে (marrow) তাহা জলে দ্রব হইয়া যায় এবং সেই জল জ্বাল দিয়া প্রায় শুষ্ক করিলে শিরীষ আঠা প্রস্তুত হয়। অধুনা শিরীষ আঠা কাঠ, কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য জুড়িতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন দেখিতেছি যে পুরাকালে এই শিরীশ আঠা দিয়া ইমারতও প্রস্তুত হইত। ইহা আস্তরের কার্য্যে সমধিক প্রযোজ্য বলিয়া বোধ হয়।

ধাতুজ বজ্রলেপ বা বজ্রসঙ্ঘাত।

এই বজ্রলেপ এক প্রকার মিশ্রধাতু (alloy)।

অষ্টৌ সীসকভাগাঃ কাংসস্য দ্বৌ তু রীতিকাভাগঃ।
ময়কথিতো যোগোঽয়ং বিজ্ঞেয়ো বজ্রসঙ্ঘাতঃ॥ ৮॥

অর্থাৎ "আট ভাগ সীসক, দুই ভাগ কাংস্য এবং এক ভাগ পিত্তল এই কয়েকটি ধাতু যোগ করিয়া বজ্রসঙ্ঘাত প্রস্তুত হইবে। এই যোগ ময়ের দ্বারা কথিত।"

প্রাচীন ভারতে ৮ ভাগ তাম্র ও ২ ভাগ বঙ্গ (tin) গলাইয়া কাংস্য প্রস্তুত হইত এবং তাম্র ও যশদ গলাইয়া পিত্তল প্রস্তুত হইত।(৩) অধুনা সমভাগ সীসক ও বঙ্গ গলাইয়া সাধারণ রাং (common solder) প্রস্তুত হয় এবং এই রাং ধাতুনির্ম্মিত তৈজসাদি জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই "রাং ঝালে" তাম্র মিশাইয়া "তামার ঝাল" হইয়া থাকে। সেইরূপ "পিতল ঝাল", "রূপার ঝাল," "সোনার ঝাল"ও আছে। এই "বজ্রসঙ্ঘাত" এক প্রকার "পিতল ঝাল" বলিয়া বোধ হইতেছে। বৃহৎসংহিতায় টীকাকার ভট্টোৎপল এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে এই বজ্রসঙ্ঘাতও—

"প্রথমগুণৈস্তেষেব কার্য্যেষ্বিতি" (অর্থাৎ প্রথমোক্ত বজ্রলেপের গুণযুক্ত ও তৎতৎ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব এই মিশ্রধাতু গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্যেও ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন "At Konarak I also noticed lead in the fissures and holes in the remains of cornices but neither copper and brass"

বরাহমিহিরের এই তিন প্রকার বজ্রলেপের বর্ণনাপাঠে স্বতই মনে হয় যে তাঁহার সময়ে চূণ ও সুরকি বা বালির প্রচলন হয় নাই। শিরীষ আঠা বা অন্য প্রকার রজন ঘটিত আঠা বা কোন ধাতুঘটিত বজ্রলেপ দ্বারা প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতি বাস্তবিকই আগাগোড়া প্রস্তুত হইত কি না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ স্থাপত্য শিল্পের নমুনা এখন পাওয়া যায় না। অনেকের বিশ্বাস যে প্রাচীন অশোকস্তম্ভ এই প্রকার বজ্রলেপের সাহায্যে গঠিত, কিন্তু

(৩) অষ্টভাগেন তাম্রেন দ্বিভাগকুটিলেন চ।
বিদ্রুতেন ভবেৎ কাংস্যং...... ॥ রসরত্নসমুচ্চয়।

ডাক্তার মিত্র "রীতিকা" অর্থে "rust of iron" করিয়াছেন। কিন্তু লৌহের মরিচা কিজন্য ব্যবহৃত হইবে বুঝা যায় না। আমার মতে "রীতিকা"র পিত্তল অর্থ করাই উচিত। আর লৌহের মরিচার সংস্কৃত প্রতিশব্দ "রীতি" "রীতিকা" নহে। "রীতিকা" অর্থে পিত্তলই বুঝায়।

তাঁহারা ভুলিয়া যান যে অশোকস্তম্ভগুলি এক এক খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর হইতে খোদিত। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দির খ্রীষ্টপরে সপ্তম শতাব্দীতে রচিত। পুরীর মন্দির তাহারও পরে নির্ম্মিত। এই সকল প্রাচীন গগনস্পর্শী মন্দিরে কোন প্রকার সিমেণ্ট ব্যবহৃত হয় নাই। প্রস্তরখণ্ডগুলিকে সঠিক ভাবে কাটিয়া, একের উপর অপরকে অঙ্কশাস্ত্রানুমোদিত প্রক্রিয়ায় সাজাইয়া এইরূপ বৃহৎ মন্দিরসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ছাতের বা কার্ণিসের বড় বড় পাথর আটকাইয়া রাখিবার জন্য লৌহের অর্গল (iron clamps) ব্যবহৃত হইয়াছে। কনারকে কার্ণিসের গর্ত্তমধ্যে সীসক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তথায় এবং ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরে পূর্ব্বোক্তরূপ লৌহের ব্যবহারই দৃষ্ট হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন যে—

যদিও পুরী ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে কোনও প্রকার সিমেন্ট ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা হইলেও উড়িষ্যা-বাসীরা যে কোন প্রকার আস্তর বা সিমেন্টের ব্যবহার জানিত না এমত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে "ঘুটিং" চূণ উড়িষ্যার অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং উড়িষ্যাবাসীরা উহা ছাত, পিলানে প্রভৃতি জুড়িবারজন্য ব্যবহার করিত।

তিনি আরও বলিয়াছেন

ভারতের অন্য স্থানে, বিশেষতঃ যেখানে ইষ্টক ব্যবহৃত হইত, সেই সকল স্থানে ঘুটিং চূণ ও সুরকি ব্যবহৃত হইত। এবং আস্তর দিবার জন্য বিশুদ্ধ চূণেরই ব্যবহার প্রচলন ছিল। বেহারের নালন্দা মন্দিরে এইরূপ চূণের আস্তর দৃষ্ট হয়।

ডাক্তার মিত্র কোন সময়ে চূণ বা বালির ব্যবহার ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করেন নাই, কিন্তু বরাহমিহিরের তিন প্রকার বজ্রলেপের বিবরণ পড়িয়া আমার মনে হয় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে বাটীনির্ম্মাণকার্য্যে চূণ, সুরকী বা বালির ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। সে সময় চূণ ও বালির ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে নিশ্চয়ই উহা বজ্রলেপের মধ্যে স্থান পাইত।

এই তিন প্রকার বজ্রলেপের উপাদান দেখিয়া মনে হয় যে ভেষজ ও প্রাণিজ বজ্রলেপ আস্তরের কার্য্যে এবং ধাতুজ বজ্রলেপ মর্টার বা সিমেণ্টের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। এবিষয়ে আমি ডাক্তার শীল ও ডাক্তার মিত্রের মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। তাঁহারা উভয়েই লিখিয়াছেন যে বজ্রলেপ কেবল সিমেণ্টের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার মিত্র লিখিয়াছেন "looking to their composition I do not think they have been used for plastering." কিন্তু "লেপ" অর্থে আস্তরই বুঝায়। প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তির উপর বজ্রলেপের আস্তর ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে অশোকস্তম্ভের বাহ্যিক চাকচিক্য এই বজ্রলেপের আস্তরের জন্যই এখনও "সহস্রায়ুতবর্ষস্থায়ী" হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য ধাতুজ বজ্রলেপ আস্তরের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেই পারে না, উহা প্রস্তরাদি আটকাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইত।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

চয়ন

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি

অষ্টম খণ্ড

মগধ

মগধের পরিধি প্রায় ৫০০০লি। প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলি জনশূন্য কিন্তু গ্রামগুলি বহুজনাকীর্ণ। ভূমি উর্ব্বরা এবং প্রচুর শস্য জন্মে। এখানে এক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য চাউল জন্মে; এই চাউল আকারে বৃহৎ এবং সুস্বাদু। ইহা দেখিতেও উজ্জ্বল। ইহাকে 'মহাশালী' নামে অভিহিত করা হয়। ভূমি আর্দ্র ও নীচু বলিয়া, নগরগুলি উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রীষ্মের প্রথম মাস অতিবাহিত হইলে এবং হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস আসিবার পূর্ব্বে সমতলক্ষেত্র জল প্লাবিত হয় এবং নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে হয়। অধিবাসীরা সরল ও সাধু। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসীরা বিদ্যানুরক্ত এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে বিশেষ সম্মান করে। পঞ্চাশটী সঙ্ঘারামে প্রায় ১০,০০০ সহস্র যতি বাস করেন। অধিকাংশই মহাযান-মতাবলম্বী। দশটী দেব-মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ান্তর্গত অনেকগুলি বিধর্ম্মী বাস করে।

গঙ্গার দক্ষিণে ৭০লি পরিধিবিশিষ্ট একটী প্রাচীন নগর আছে। জনশূন্য হইলেও, ইহার প্রাচীর ভিত্তিগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে। পুরাকালে, যখন মনুষ্যের দীর্ঘ পরমায়ু ছিল তখন ইহাকে কুসুমপুর নামে অভিহিত করা হইত। কারণ রাজপ্রাসাদে অনেক পুষ্প ছিল। বহুকাল পরে, ইহার নাম পাটলিপুত্র হয়।

প্রথমে, এই স্থানে বিজ্ঞ ও বিদ্যানুরক্ত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য সেই স্থানে সমবেত হইত। এক দিবস শিক্ষার্থীগণ একত্র হইয়া পরিভ্রমণ কালে একজন বয়স্যকে সাতিশয় বিমর্ষ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল যে "আমার যৌবন অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কিন্তু, এপর্য্যন্ত আমি "ধর্ম্মরক্ষা" করিতে

অন্যান্য ছাত্রেরা এই কথা শুনিয়া পরিহাস পূর্ব্বক তাহাদের সহাধ্যায়ীকে বলিল যে "এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তোমার জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিব।" তৎপরে, তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে কন্যার পিতা ও অপর একজনকে কন্যার মাতা সাজাইয়া, একজনকে বরের পিতা ও অপর একজনকে বরের মাতা স্থির করিয়া, পাটলি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইল এবং ঐ বৃক্ষের নাম "জামাতাবৃক্ষ" রাখিল। পরে, তাঁহারা নানা প্রকার ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া বিবাহের সময় স্থির করিল। সময় উপস্থিত হইলে কন্যার (?) পিতা, ঐ বৃক্ষের একটী শাখা ভগ্ন করিয়া ছাত্রকে বলিল যে "এই আমার কন্যা; ইহাকে গ্রহণ কর।" ছাত্রটীও ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই পুষ্প শোভিত শাখা গ্রহণ করিল। সূর্য্যাস্ত কালে অন্যান্য বালকগণ গৃহে-প্রত্যাগমনে উদ্যত হইলে সেই ছাত্র গৃহাগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ তাহাকে বলিল যে তাহারা যাহা করিয়াছে। তাহা পরিহাসচ্ছলে করিয়াছে। এই স্থানে থাকিলে রাত্রিতে হিংস্র জন্তুতে তাহাকে হত্যা করিবে; সুতরাং গৃহ-প্রত্যাগমন করাই বিধেয়। কিন্তু, যুবক অস্বীকার করাতে, তাহারা তাহাকে একাকী রাখিয়া গৃহে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে এক অনৈসর্গিক আলোকরশ্মি সেই বনভূমি আলোকিত করিল; কোথা হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি এবং বংশীবাদন হইতে লাগিল এবং বনভূমি কোমল শয্যায় আচ্ছাদিত হইল। অকস্মাৎ ভদ্রবেশধারী এক বৃদ্ধ ও একটী বৃদ্ধা, এক যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সাজসজ্জা করিয়া অনেক লোক এবং বাদ্যকরগণ আসিতে লাগিল। পরে বৃদ্ধ, যুবকের হস্তে যুবতীর হস্ত সমর্পণ করিয়া বলিলেন

আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইল। সাত দিবস পরে, যুবকের সহাধ্যায়ীরা তাঁহার অন্বেষণে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বৃক্ষতলে উপবিষ্ট তাঁহাদের সহাধ্যায়ী যেন কাহার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যাগমনে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিলেন।

পরে, তিনি স্বেচ্ছায় নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত সেই বনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পাটলবৃক্ষ বৃহৎপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে; ভৃত্যবর্গ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং পূর্ব্ব-কথিত বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে সমাদরে আহ্বান করিয়া লইতে অগ্রসর হইতেছেন। তৎপরে, নানা প্রকার আহার্য্য দ্বারা সেই বৃদ্ধ, ছাত্রের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে পরিতুষ্ট করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর বাদ্য হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সকলকে এই অনৈসর্গিক ব্যাপার জানাইলেন। এক বৎসর পরে দম্পতি একটী পুত্রসন্তান লাভ করিলেন এবং তাঁহারা সেই স্থানেই সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পুরাতন রাজধানী কুসুমপুর পরিত্যাগ করা হইলে পর, এই স্থান নূতন রাজধানীর জন্য মনোনীত হইল এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনার স্মরণার্থ নগরীর নাম পাটলিপুত্র-পুর রাখা হইল।

প্রাচীন রাজপ্রাসাদের উত্তরে একটী উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ আছে; রাজা অশোক এই স্থানেই তাঁহার "নরক" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথাগতের নির্ব্বাণের শত বৎসর পরে, অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি বিম্বিসাররাজের প্রপৌত্র। তিনি রাজগৃহ হইতে তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন এবং প্রাচীন নগর প্রাচীরবেষ্টিত করেন। তাহার পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে; বর্ত্তমানে নগরের প্রাচীর-ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। শত শত সঙ্ঘারাম, দেবমূর্ত্তি এবং স্তূপের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদের উত্তরে, গঙ্গাতীরে একটী নগর আছে; ইহাতে সহস্রাধিক লোক বাস করে।

রাজা অশোক যখন প্রথম সিংহাসনাধিরোহণ করেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রূর এবং অত্যাচার-রত ছিলেন। সকলকে নির্য্যাতন করিবার জন্য তিনি একটী "নরক" প্রস্তুত করেন। তিনি নরকের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ ও দুর্গ প্রস্তুত করেন। প্রকৃত নরকের ন্যায়, অশোক নিজ নরকে গলিত ধাতুর চুল্লী, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ও নির্য্যাতনের জন্য প্রত্যেক প্রকার যন্ত্রাদি রাখিতেন। একজন অধার্ম্মিককে তিনি এই নরকের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। প্রথমতঃ, রাজ্যের সকল অপরাধীকেই—তাহাদের যেরূপ অপরাধই হৌক না কেন—তিনি এই স্থানে প্রেরণ করিয়া নির্য্যাতন করিতেন। পরে, যে কেহ ঐ নরকের নিকটে যাইত, তাহাকেই ধৃত করিয়া নির্য্যাতন করা হইত। যে কেহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইত, সেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

এই সময়ে একজন শ্রমণ ভিক্ষার্থ নগরের উপকণ্ঠে যাইবার মনস্থ করিয়া এ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, অধার্ম্মিক নরকাধিপতি তাহাকে ধৃত করিয়া হত্যার অভিলাষ প্রকাশ করিল। শ্রমণ ভীত হইয়া, ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কয়েকদিনের জন্য প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করিলেন। ঠিক ঐ সময়ে, একজন বন্দীকে বন্ধনাবস্থায় ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে কারাধ্যক্ষ এই শেষোক্ত বন্দীর হস্তপদ ছেদন করিয়া, কুট্টনে তাহার দেহ চূর্ণীকৃত করিল।

শ্রমণ এই দৃশ্যে ভীত হইয়া, পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্যের অনিত্য অনুভব করিয়া, অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই নরকাধ্যক্ষ তাঁহাকে বলিল যে "এইবার তোমার সময় আসিয়াছে।" শ্রমণ অর্হত্বপ্রাপ্ত হওয়াতে অন্তরে জন্মমৃত্যুর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং সেই জন্য যদিও উত্তপ্ত কটাহে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইল, তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে তিনি সুশীতল হ্রদে বাস করিতেছেন এবং কটাহের উপরি-ভাগে একটী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল, তিনি তাহারই উপরে উপবেশন করিলেন। নরকের অধ্যক্ষ এই দৃশ্যে ভীত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিল। রাজা স্বয়ং সেই স্থানে

উপস্থিত হইয়া, এই দৃশ্যে চমৎকৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নরকাধ্যক্ষ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহারাজ! আপনাকেও মরিতে হইবে।" রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অধ্যক্ষ উত্তর করিল যে "মহারাজের আদেশ এই যে, যে কেহ নরকের সন্নিকটে আসিবে, তাহাকেই হত্যা করিতে হইবে; রাজার সম্বন্ধে কোন পৃথক নিয়ম করেন নাই; সুতরাং আপনাকেও হত্যা করিব।"

রাজা উত্তর করিলেন "বস্তুতঃ উক্ত আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল এবং উহা পরিবর্ত্তনও করা যাইবে না। কিন্তু যখন এই নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছিল, তখন তোমাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। তুমি অনেককাল ধরিয়া প্রাণী-হত্যা করিয়াছ। আমি এই প্রাণিহত্যার শেষ করিব।" পরে, তাঁহার ভৃত্যবর্গ তাঁহার আদেশানুসারে নরকাধ্যক্ষকে তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ করিল। তাহার মৃত্যু হইলে রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নরক ও প্রাকারগুলি নষ্ট করিয়া জীবহত্যা নিষেধ করিলেন।

নরকের দক্ষিণে এবং উহার নিকটেই একটী স্তূপ। ইহা এক্ষণে পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু এখনও গম্বুজটী রহিয়াছে। তাহা খোদিত প্রস্তরনির্ম্মিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীদ্বারা চতুর্ব্বেষ্টিত। রাজা অশোক যে ৮৪,০০০ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা অশোক নিজ ঐশ্বরিক শক্তিবলে এই স্তূপ নিজ প্রাসাদমধ্যস্থলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার অভ্যন্তরে তথাগতের শরীরচিহ্ন আছে। অনবরত ঐশ্বরিক নিদর্শন এইস্থানে দৃষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে ইহার চতুর্দ্দিকে স্বর্গীয় আলোক প্রজ্জ্বলিত হয়।

রাজা অশোক 'নরক' ধ্বংস করিলে পর উপগুপ্ত নামক অর্হতের সাক্ষাৎলাভ করেন। উপগুপ্ত প্রকৃত উপায়াবলম্বন করিয়া অশোককে দীক্ষিত করেন। রাজা অর্হৎকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিলেন, "আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে আমি রাজা হইয়াছি কিন্তু আমার অপরাধের জন্য বুদ্ধদেবের দর্শন না পাইয়া দীক্ষিত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আমি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি।"

অর্হৎ উত্তর করিলেন "আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা এই যে, মহারাজ নিজ পুণ্যবলে দৈত্যগণকে নিযুক্ত করিয়া ত্রিপিটক রক্ষা করুন।"

রাজা এই কথা শুনিয়া আনন্দে অভিপ্লুত হইলেন এবং দৈত্যগণকে একত্র হইতে আদেশ দিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে তাহাদের সম্বোধন করিলেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের প্রভাব এবং আমার প্রাক্তনশক্তিতে আমি পৃথিবীপতি হইয়াছি। এক্ষণে, আমি বিশেষভাবে তথাগতের শরীরের পূজার ব্যবস্থা করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তোমরাও সকলে সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এবং একমনে জম্বুদ্বীপের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তথাগতের শরীরচিহ্নের উপর স্তূপনির্ম্মাণে যত্নবান হও। যদিও এই কার্য্য করিবার ইচ্ছা আমার মনে উদ্রেক হইয়াছে, তোমরা এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া সুনাম অর্জ্জন কর। আমি একা এই মহা পুণ্যময় কার্য্যের ফলভোগ করিতে চাহি না। সুতরাং, তোমরা প্রত্যেকে এক একটী স্তূপ নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাকে সংবাদ প্রেরণ কর।"

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যগণ নিজ নিজ নির্দ্ধারিত স্থানে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং আদেশানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুনরায় রাজার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যে আট দেশে পূর্ব্বে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া শরীরচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছিল, সেই সেই দেশস্থ স্তূপ উন্মোচন করিয়া, শরীরচিহ্নগুলি পুনরায় বিভক্ত করা হইল এবং প্রত্যেক দৈত্যের নিকট এক এক অংশ ন্যস্ত করিয়া তিনি অর্হৎকে নিম্নোক্তমর্ম্মে সম্বোধন করিলেন "আমার ইচ্ছা যে শরীরচিহ্নগুলি একই সময়ে এবং একই মুহূর্ত্তে স্থাপিত হয়। যদিও আমি চিহ্নগুলি এইভাবে ন্যস্ত করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি, তত্রাপি কিপ্রকারে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই।"



रामकृष्णदेव दयानन्द सरस्वती नानक शक्त आदिनाथ मोज़ेज़ मोहम्मद
वल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य माध्वाचार्य रामानुजाचार्य शङ्कराचार्य लार्ड चैतन्य बुद्ध ज़ोरोएँस्टर ईसू क्राइस्ट राममोहनराय

উপগুপ্ত রাজাকে বলিলেন "দৈত্যগণকে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিতে এবং সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ দিউন। সূর্য্য 'আচ্ছাদিত' হইলে, যেন স্তূপ মধ্যে চিহ্নগুলি স্থাপিত হয়।" রাজা দৈত্যগণকে তদ্রূপ আদেশ প্রদান করিলে, তাহারা স্ব স্ব স্থানে যাইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রাজা অশোকও সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে, নির্দ্ধারিত দিবসে অর্হৎ নিজ হস্তদ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলেন। যে যে স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে দৈত্যেরা সূর্য্যকে আবৃত দেখিয়া নিজ নিজ স্তূপে স্মরণচিহ্ন স্থাপিত করিলেন।

স্তূপের নিকটস্থ একটী বিহারে, তথাগত যে প্রস্তরের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। তাঁহার পাদচিহ্ন এখনও সেই প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্ট হয়। উভয় পদেই চক্রচিহ্ন এবং দশাঙ্গুলিতে মৎস্য ও পুষ্প চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সকল চিহ্নগুলি প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিতে আভাযুক্ত হয়। পুরাকালে নির্ব্বাণলাভ করিবার ইচ্ছায় তথাগত উত্তরে কুশীনগরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে একবার দক্ষিণে মগধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আমি এই শেষ পাদচিহ্ন রাখিতেছি ও মগধের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। একশত বৎসর পরে রাজা অশোক বলিয়া একজন রাজা হইবেন; তিনি এইস্থানে তাঁহার রাজধানী ও বিচারালয় নির্ম্মাণ করিবেন তিনি ত্রিপিটক রক্ষা করিবেন ও দৈত্যগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবেন।"

অশোক রাজসিংহাসনারোহণ করিলে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এই নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি স্তূপমধ্যে উল্লিখিত প্রস্তর স্থাপনা করেন এবং ইহা রাজধানীর সন্নিকটস্থ বলিয়া সদাসর্ব্বদা এইস্থানে আসিয়া প্রার্থনা করিতেন। পরে,নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ প্রস্তরখানি স্থানান্তরের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ড বৃহৎ না হইলেও, কেহই ইহাকে স্থানান্তর করিতে পারেন নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে শশাঙ্করাজ যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারে রত ছিলেন, তখন এই প্রস্তর ও তৎসহ পবিত্র চিহ্নগুলি বিনষ্ট করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাকে খণ্ড খণ্ড করা হইল কিন্তু খণ্ডগুলি পুনরায় একত্র হইল। পরে, তিনি প্রস্তরখণ্ডকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু, প্রস্তর পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিল।

প্রস্তরের নিকটে একটী স্তূপ আছে। এই স্তূপ পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন নির্দ্দেশ করে। এখনও বুদ্ধগণের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিহারের সন্নিকটে ত্রিশ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের উপরিস্থ স্মারক লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহাতে নিম্নোক্ত মর্ম্মে লিখিত ছিল যে, রাজা অশোক ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া জম্বুদ্বীপকে তিনবার বুদ্ধদেব, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে দান করেন এবং নিজ মণিমুক্তাদ্বারা তিনবারই উদ্ধার করেন।"

প্রাচীন প্রাসাদের উত্তরে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। বহির্দ্দেশ হইতে দেখিলে এই গৃহটিকে পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর অত্যন্ত বিস্তৃত। এই গৃহই রাজা অশোক তাঁহার উদাসীন ভ্রাতার জন্য দৈত্যগণকে নির্ম্মাণের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। অশোকের মহেন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মহেন্দ্র ব্যয়শীল এবং নির্দ্দয় ছিলেন। তিনি রাজার ন্যায় পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতেন। জনসাধারণ ইহা আদৌ পছন্দ করিত না। একদিন রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ রাজসমীপে নিবেদন করিলেন যে, "রাজভ্রাতা অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এই প্রকার ব্যবহার করেন। যদি রাজা নিরপেক্ষ হন, তবে প্রজা সন্তুষ্ট থাকে। যদি জনসাধারণ একমত হয়, তবে রাজা নিরাপদে শাসন করিতে পারেন। আমাদের পিতৃপুরুষগণ এইরূপ শিক্ষাই দিয়াছেন। আমাদের অভিলাষ আপনি দেশের নিয়ম প্রতিপালন করুন এবং যাহারা উহার পরিবর্ত্তনাভিলাষী উহাদের শাস্তি দিন।" রাজা অশোক মহেন্দ্রকে বলিলেন যে তিনি জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রাজশক্তি পরিচালন করিতেছেন

রাজত্বের প্রারম্ভেই নিয়মভঙ্গ করা অসম্ভব। যদি আমি তোমাকে শাস্তি দিই, তবে পিতৃপুরুষগণ আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন; কিন্তু, যদি তোমাকে ক্ষমা করি, তবে প্রজাবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইবে।"

মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া নতমস্তকে স্বীকার করিলেন যে, তিনি নিয়মভঙ্গ করিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি দোষ করিতেছেন। তিনি সাত দিবস সময় প্রার্থনা করিলেন। রাজা মহেন্দ্রকে অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করিলেন। রাজাদেশে আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্যই ঐ কারাগারে রক্ষিত হইল। প্রথম দিন অতিবাহিত হইলে প্রহরী চীৎকার করিয়া মহেন্দ্রকে অবগত করিল যে, একদিন অতিবাহিত হইয়াছে এবং ছয় দিবস অবশিষ্ট আছে। মহেন্দ্র অনুতাপে ছয় দিবস অতিবাহিত করাতে, তাঁহার আত্মা ও শরীর পবিত্র হইল এবং তিনি অর্হত্বলাভ করিয়া বিমানচারী হইয়া অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। পরে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া দূরে উদাসীনের ন্যায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা অশোক স্বয়ং মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি দেশের আইনে বাধ্য হইয়া মহেন্দ্রকে শাস্তি দিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বিবেচনা করেন নাই, যে মহেন্দ্র অর্হত্বপ্রাপ্ত হইবেন। যাহা হউক, মহেন্দ্র যখন এই প্রকার দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি এক্ষণে নগরে প্রত্যাগমন করিতে পারেন।

মহেন্দ্র উত্তর করিলেন যে "পূর্ব্বে আমি সাংসারিক মায়ায় আবদ্ধ ছিলাম এবং সৌন্দর্য্য ও বাদ্যধ্বনিতে আকৃষ্ট হইতাম; কিন্তু এক্ষণে আমি সেই সকল মোহজাল ছিন্ন করিয়াছি। আমি আর পুনরায় সংসারী হইতে অভিলাষী নহি।" রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে "যদি মহেন্দ্র নির্জ্জনবাসে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কিন্তু দুরারোহ পর্ব্বতের অধিবাসী হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। নির্জ্জনবাসের জন্য শীঘ্রই তাঁহার উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইবে।"

ক্রমশঃ

ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীসীয় প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাটকের আখ্যান-বস্তু।—উইণ্ডিস্ সাহেব এই ক্ষেত্রে তাঁহার অনুশীলনের পরিসর একটু সংযত করিয়াছেন। "ইহা স্বীকার করা কঠিন যে, ভারতবাসীরা গ্রীসীয় মূল-নাট্যগ্রন্থগুলির বিষয় অবগত ছিল অথবা ঐ গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিল; কিন্তু ঐ সকল নাটকের অভিনয় দর্শন ও লোকমুখে উহাদের আখ্যান-বস্তুর কথা শ্রবণ—উহাই উহাদিগকে ঐ সকল গ্রন্থের অনুকরণে প্রলুব্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।"

"যে নাটকটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেই "মৃচ্ছকটিকে," গ্রীসীয় আখ্যানবস্তুসমূহের প্রভাবের নিদর্শন সমধিক পরিলক্ষিত হয়। মৃচ্ছকটিক নাটকে প্রচলিত জীবনযাত্রার যেরূপ বাস্তব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অন্য কোন নাটকে, অথবা অন্য কোন ভারতীয় সাহিত্যগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।" এই অনন্যসাধারণ বাস্তব দৃশ্যের চিত্রদর্শনে আমাদের চিত্তে যেমন একদিকে বিস্ময়—তেমনি আর একদিকে একটা অবিশ্বাসের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা একটা দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র।

শূদ্রকের সৃজনীপ্রতিভা এইরূপ বাস্তব জীবনের বিভ্রম সহজেই উৎপাদন করিতে সমর্থ। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে মৃচ্ছকটিক নাটককে তন্নতন্নরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি—উহা প্রচলিত কাহিনীগুলির সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। উইণ্ডিশ্ সাহেব বলেন, একটি বণিকপুত্র ও একজন বেশ্যার প্রেমলীলা লইয়াই উহার আখ্যানবস্তু রচিত; আরও তিনি এই কথা বলেন:—"গ্রীক-রোমীয় কমেডিরও ঐ ধরণের আখ্যানবস্তু।" তাহা হইলে ঐরূপ যুক্তি-অনুসারে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে ভারতীয় নাটিকার সহিত ফরাসী ট্রাজেডিরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, যেহেতু একজন রাজা বা নায়ক এবং একজন রাজকুমারীর প্রেম লইয়া ঐ উভয় নাটকেরই আখ্যানবস্তু বিরচিত। উইণ্ডিশ্ সাহেব এইরূপ নাটিকার আখ্যানবস্তুর সহিত গ্রীক-রোমীয় কমেডির সাধারণ আখ্যান-বস্তুর মিল ঘটাইয়াছেন। তিনি বলেন,—"গ্রীক-রোমীয় কমেডিতে দেখা যায়, একজন হেটেরীর অর্থাৎ বিদুষী গণিকার প্রেমে একজন যুবক আসক্ত; কিন্তু যুবকের পিতা এইরূপ উদ্বাহ-বন্ধনের বিরোধী, তিনি চান তাঁহার তুল্যশ্রেণীর কোন রমণীর সহিত পুত্রের বিবাহ হয়; নাটকের পরিণামে প্রকাশ পায় যে ঐ যুবতী অ্যাথেন্স নগরেরই অধিবাসিনী;—এইরূপে সমস্তই ভালোয় ভালোয় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে মালবিকাগ্নিমিত্রের, আখ্যানবস্তুর সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাক্;—রাজা অগ্নিমিত্র, মহিষী ধারিণীর একজন পরিচারিকার প্রেমে আসক্ত; কিন্তু পাছে মহিষী কিংবা তাঁর দ্বিতীয় রাণী ইরাবতী ঈর্ষ্যান্বিতা হন, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক ও সশঙ্ক। পরিণামে প্রকাশ পাইল—পরিচারিকা মালবিকা একজন রাজকুমারী; তখন ধারিণীও রাজার সহিত উহার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন।" উভয় নাটকেই নায়কনায়িকাদিগের প্রেমে প্রথমে বহুতর বাধাবিঘ্ন—পরিশেষে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রেমেরই জয় হইল। কিন্তু প্রেমঘটিত নাটক মাত্রেই এইরূপ আখ্যানবস্তুর অবতারণা অপরিহার্য্য; যদি প্রেমিকেরা প্রথম চেষ্টাতেই এবং অনায়াসেই সফল-মনোরথ হন, তাহা হইলে, কোন ঔৎসুক্যই থাকে না, নাটকের নাটকত্বই থাকে না। এইরূপ নাটকমাত্রতেই নায়িকার প্রকৃত অবস্থা দীর্ঘকাল অপরিজ্ঞাত থাকিয়া হঠাৎ এক সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে;—এই বিষয়ে উভয় নাটকের মধ্যেই সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু সকল দেশের লোকের মধ্যেই এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয় নিত্য ঘটিয়া থাকে। ভারতের দেবতাসংক্রান্ত ইতিহাস, এইরূপ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। কোন দেবতা অথবা দানব, অভি-শাপগ্রস্ত হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন, এবং বহুকাল রূপান্তরিত অবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পান।

মহাভারতের মূলকাহিনী হইতে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্য্যোধন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় জিতিলেন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ তাঁহার ধনসম্পত্তি, তাঁহার রাজ্য, ভ্রাতৃগণের স্বাধীনতা, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইলেন। বিজেতা প্রথমে একান্তই নির্দয়, পরে

একটা রফার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের সাধারণ পত্নী স্বাধীন থাকিবেন, কিন্তু ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইবে। এই কথামত, যথাসময়ে পঞ্চভ্রাতা বিরাট-রাজের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অধীনে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হইলেন ঃ যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। ভীম বল্লভ নাম ধারণ করিয়া পাচক হইলেন। অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম গ্রহণ করিয়া সঙ্গীতাচার্য্য হইলেন। দ্রৌপদীও রাণী সুদেষ্ণার সৌরিন্ধ্রী হইলেন। রাণী, দ্রৌপদীর ভব্য আকারপ্রকার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন ঃ—"রাজা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন এই আশঙ্কা যদি আমার না থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে আমি মাথায় করিয়া রাখিতাম ·· পৃথুনিতম্ববতী, চিত্তবিমোহিনী তুমি, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া রাজা আমাকে বিস্মৃত হইবেন, তাঁহার হৃদয় তোমার প্রতিই আকৃষ্ট হইবে।" সুদেষ্ণার ঈর্ষ্যানল উদ্দীপ্ত হইল, তিনিও ধারিণীর ন্যায় রাজার চিত্তচাপল্যের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী দশমাসকাল সৌরিন্ধ্রীর পদে রাণীর পরিচর্য্যা করিলেন। কিন্তু একদিন দ্রৌপদী বিরাটের সেনাপতি কীচকের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় কীচক আবেগভরে দ্রৌপদীর নিকট স্বকীয় অনুরাগ জানাইল। পরে ব্যর্থমনোরথ হইয়া, সুদেষ্ণার সহিত যোগসাধনে দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার চেষ্টা করিল। এমন সময়ে ভীম আসিয়া কীচককে বধ করিল। পরিণামের এই শোকাবহ অংশটি ব্যতীত আর সমস্তই সংস্কৃত নাটিকার আখ্যানবস্তুর সহিত মিল হয়।

মহাভারতে যে সকল প্রাচীন কাহিনী সংকলিত হইয়াছে তন্মধ্যে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান একটি। এই উপাখ্যানেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অদৃষ্টের দারুণ লীলায়, পতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, দুর্দ্দশাগ্রস্তা দময়ন্তী চেদি নগরে প্রবেশ করিল। তাহার শোচনীয় পরিচ্ছদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; রাণী-মাতা প্রাসাদের ছাদ হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। দময়ন্তী উত্তর করিল ;—"আমি পতিব্রতা, আমি শ্রমজীবী, আমি দাসী, আমার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, ফলমূলই আমার একমাত্র আহার, আমি পরিত্যক্তা। সায়াহ্নে আমি যেখানেই আসিয়া উপনীত হই, সেইখানেই আমার বাসস্থান।" রাণী তাহাকে তাঁহার পরিচারিকা পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার সতীত্বমর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। যদি কোন উদ্ধত ব্যক্তি তাহার প্রতি কুদৃষ্টি-পাত করে, তাহাকে প্রহার করা হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

দময়ন্তী দীর্ঘকাল যাবৎ রাণীর সেবায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একদা, ব্রাহ্মণ সুদেব, যাহাকে দময়ন্তীর পিতা ভীম, দময়ন্তীর অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন—তিনি চেদির প্রাসাদে দময়ন্তীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। ব্রাহ্মণ রাণীকে তাঁহার পরিচারিকার প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং প্রবঞ্চনার সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি আরও এই কথা বলিলেন ;

"কোন রমণীই ইহার সদৃশ নহে; ভ্রূযুগের মধ্যস্থলে ইহার পদ্মাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ একটি জড়ুল চিহ্ন আছে। ধূলায় যদিও চিহ্নটি ঢাকিয়া গিয়াছে, পুঁছিয়া গিয়াছে, তবু আমি উহা ঠাওর করিতে পারিয়াছি। ইহা বিধাতৃদত্ত জন্ম-চিহ্ন।" সুদেবের এই কথায়, রাণীর দুহিতা রাজকুমারী সুনন্দা দময়ন্তীর ললাটদেশ পরিষ্কৃত করিয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন চিহ্নটি বাহির করিলেন। উহা নির্ম্মল-গগন-শোভী ইন্দুর ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই চিহ্ন দর্শনে সুনন্দা ও রাণীমাতা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিলেন। বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কমিয়া আসিলে, রাণী-মাতা দময়ন্তীকে ধীরেধীরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন:—"তুমি আমার ভাগিনের দুহিতা, এই চিহ্নটি তাহার প্রমাণ। তোমার জননী ও আমি আমরা উভয়েই প্রিয়দর্শন ও উদারচরিত দশার্ণাধিপতি সুদামনের দুহিতা।" এই অভিজ্ঞান-চিহ্নটির প্রসাদে, উপাখ্যানের পরিণামটি সুখজনক হইল।

ভারতীয় নাটকে এই কৌশলটি অনেক স্থলেই অবলম্বিত হইয়াছে। উইণ্ডিস সাহেব ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যথা,—শকুন্তলার অঙ্গুরী,—নাটকের নামটিতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়—"অভিজ্ঞান-শকুন্তলা"। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে সঙ্গমমণি নামক একটি মন্ত্রপূত মণির দ্বারা লতারূপে অবস্থিতা উর্ব্বশীকে পুরুরবা চিনিতে পারিয়াছিলেন; নাগানন্দে, যখন গরুড় রাজকুমারকে লইয়া যাইতেছিল, জিমূত বাহনের একটা খেলনা আকাশ হইতে পতিত হয়। রত্নাবলীর রত্নমালা; মৃচ্ছকটিক নাটকে মৃন্ময়ী শকটিকা; এই নাটকে, বসন্তসেন কর্তৃকনিক্ষিপ্ত কতকগুলি অলঙ্কার, পরে চারুদত্তের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া তুলে; মালতী মাধবে, মাধব কর্ত্তৃক গ্রথিত যে মালা মালতী ধারণ করিয়াছিল তাহা পরিণামে সৌদামিনী অভিজ্ঞান স্বরূপ আনিয়া উপস্থিত করে। এই তালিকা সহজেই দীর্ঘ করা যাইতে পারে। নায়িকার মুক্তিকল্পে বিদূষক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত রাণীর একটি অঙ্গুরী মালবিকাগ্নিমিত্রেও প্রদত্ত হইয়াছে; বিক্রমোর্ব্বশীতে আয়ুর ধনুর কথা আছে, সেই ধনুতে রাজকুমার ও তাঁহার বংশের নাম লিখিত থাকায়, পুরুরবা স্বকীয় পুত্রের অস্তিত্ব অবগত হন। মুদ্রারাক্ষসে, চাণক্য রাক্ষসের অঙ্গুলীমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন ইত্যাদি...এই নাটকীয় কৌশলটির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তখনকার শিক্ষিতমণ্ডলী ইহাতে প্রীতিলাভ করিতেন। অবশ্য ইহা গ্রীক্-রোমীয় কমেডির সচরাচর-সংঘটিত ঘটনাবিপর্য্যয়ের কথা এবং কোন অপ্রত্যাশিত সামগ্রীর দ্বারা অভিজ্ঞান উৎপাদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

হিন্দুরা এই অভিজ্ঞান-কৌশল গ্রীকদিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করিয়াছে, উইণ্ডিস সাহেব উপরি-উক্ত সাদৃশ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে একটুও ইতস্তত করেন নাই। তিনি দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃত মালবিকা, জাহাজ-ডুবিতে জলমগ্না রত্নাবলী,—ইহাদিগকে Rudens এর কন্যার পাশাপাশি আনিয়াছেন। Rudens এর কন্যাও দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃত, একজন বণিকের নিকট বিক্রীত, এবং সিসিলির উপকূলে ভগ্নতরী হয়। পরে

সেই ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে কতকগুলি শিশুর খেলনা পাওয়া যায়—সেই খেলনাগুলি দেখিয়া কন্যার পিতা কন্যাকে চিনিতে পারেন।

কেবল সাদৃশ্যমাত্র দেখিয়াই, এক নাট্য-সাহিত্য আর এক নাট্যসাহিত্য হইতে আখ্যানবস্তু ধার করিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। যে মহাকাব্যের অন্তর্গত দময়ন্তীর উপাখ্যানে, কায়িক চিহ্নের কথা আছে, সেইরূপ আর একটি মহাকাব্যের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রীর দ্বারা অভিজ্ঞান উৎপাদনের বর্ণনা আছে।

রামায়ণের কবি অতি নিপুণভাবে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। সীতাকে রাবণ যখন হরণ করিয়া লইয়া যায়, সীতা তাঁহার অলঙ্কার সকল আকাশ-পথ হইতে নীচে নিক্ষেপ করেন। বানরেরা সেই সকল অলঙ্কার পাইয়া তাহাদের রাজা সুগ্রীবের নিকট আনিয়া দেয়; পরে সুগ্রীব ঐ সকল অলঙ্কার রামকে প্রদান করে। রাম সীতার অলঙ্কারগুলি চিনিতে পারিয়া কোন্ পথ দিয়া রাবণ সীতাকে লইয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন। আরও কিছুকাল পরে, যখন রাম রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সীতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ও দূতের প্রামাণিকতা সিদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার একটি অঙ্গুরীসহ হনুমানকে সীতার নিকট পাঠাইয়া দেন। বস্তুত এই অঙ্গুরীটি দেখাইয়া সীতার সংশয় দূর হয়। এইরূপ উদাহরণ অনেক কাহিনীতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাছাড়া, এই কার্য্য প্রণালীটি শুধু কবি-কল্পনা নহে। বাস্তব জীবনেও এই প্রণালী অনুসৃত হইত। গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও, ব্যক্তি বিশেষের জন্ম মৃত্যুঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার কোন রাজনিয়ম বা রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা ছিল না। সেকালে গার্হস্থ্য জীবন ও তৎসংক্রান্ত জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রভৃতি জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির সহিত রাজ-সরকারের কোন সংস্রব ছিল না। উহা তখন একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই জন্য পুরাকালে যদি কখন কোন পার্শ্ববর্ত্তী জাতির আক্রমণে, গৃহযুদ্ধ বা দুঃসাহসিক সমুদ্র যাত্রার পরিণামে, কোন ব্যক্তি স্বকীয় পরিবার হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত, তখন অলঙ্কার ও কায়িকচিহ্নই তাহার তাদাত্ম্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় ছিল।

এক্ষণে কোন অস্থিরবাস জাতির অন্তর্ভূত লোক ও দুঃসাহসী "ভব ঘুরের" দলই আমাদের আধুনিক সমাজে সেই দূর অতীতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে। কখন কখন পুনঃপ্রাপ্ত অলঙ্কারাদি, হত্যাকারীর সন্ধান বলিয়া দেয়; কখন বা কোন কায়িকচিহ্নের দ্বারা, অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে বিচারকের সংশয় দূর হয়। তাই, যাহাতে দস্যু তস্কর ও বদমাইসের অবতারণা প্রায়ই থাকে, সেই সব সমসাময়িক মেলোড্রামায় এই সকল অভিজ্ঞানচিহ্নের প্রচুর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।—তন্মধ্যে একটি মেলোড্রামা "আমার মায়ের ক্রূশ" এই নামে দীক্ষিত।

বলাবাহুল্য, উইণ্ডিস সাহেব এই নাটকীয় কৌশলটির সম্বন্ধেই বেশীর ভাগ তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ, পত্র চিত্র প্রভৃতি অন্যান্য নাটকীয় কৌশলেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ঠিক বিচার করিতে হইলে, এই উপায়গুলির কথাও ধরা উচিত। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানবারতা

(১)

ভূগর্ভে কোথাও কোন ধাতু অথবা ধাতব পদার্থ আছে কিনা নিরূপণ করিবার এক অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে তারবিহীন তাড়িৎ ক্রিয়ার প্রচলন হইতেছে, সেই বৈদ্যুতিক স্রোত বায়ুমণ্ডলের ন্যায়, ভূগর্ভের প্রায় ২০০ হস্ত নিম্নে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, কিন্তু ধাতব পদার্থে লাগিলে উহার কিয়দংশ দর্পণস্থ আলোকরশ্মির ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া যায় ও কতক অংশ ঐ ধাতুতে বিলীন হইয়া তাপে পরিবর্ত্তিত হয়। তাড়িৎ প্রবাহের এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জার্ম্মানির দুই জন বৈজ্ঞানিক (Dr. Lowy, Leimbach) এমন এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে দুইটি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবধানে ভূমধ্যে ধাতুর অস্তিত্ব অনায়াসে জানিতে পারা গিয়াছে। এজন্য সাধারণতঃ দুইটি বিশিষ্ট যন্ত্রের আবশ্যক; একটি প্রবাহউৎপাদক বা স্রোতপ্রেরক যন্ত্র (transmitter) এবং অপরটি সেই প্রবাহের আগমনজ্ঞাপক বা বার্তাদ্যোতক যন্ত্র (receiver)। দুই স্থানেই প্রায় ২০০ হস্ত পরিমিত এক এক একটি গর্ত্ত খনন করা হয়, এবং প্রথম স্থানে প্রেরক-যন্ত্র ও দ্বিতীয় স্থানে জ্ঞাপক যন্ত্র রাখা হয়। যদি ঐ দুই স্থানের মধ্যে কোনরূপ ধাতু না থাকে তাহা হইলে প্রেরক যন্ত্র হইতে প্রবাহ পূর্ণবলেই আসিয়া দ্বিতীয় স্থানের যন্ত্রে আহত হয় এবং তাহাতে স্রোতের হ্রাস কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি সামান্য মাত্রও ধাতু ব্যবধান থাকে তাহা হইলে সেই অনুপাতে প্রবাহ হীনবল হইয়া পড়ে, কতকটা সেই ধাতুর মধ্যে আটকাইয়া যায় এবং দ্বিতীয় স্থানের জ্ঞাপক যন্ত্রে তাহার বলের হ্রাস লক্ষিত হয়। হ্রাসের মাত্রা দেখিয়া ধাতুর পরিমাণ ও দূরত্ব স্থির করা যায়।

উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় সম্প্রতি অন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িতে হয় না। যন্ত্রাদি তাহাই থাকে, কেবল ব্যবহারের বিভিন্নতা মাত্র। প্রথম স্থানের প্রেরকযন্ত্রের বাতক্ষম (antenna) সরলভাবে না রাখিয়া একটু মাটির দিকে বাঁকাইয়া রাখা হয়। ইহাতে প্রবাহ কিছু দূর গিয়া ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইচ্ছামত বক্রতার তারতম্য সাধন করা যায়; সুতরাং যত ইচ্ছা দূর বা নিকটে প্রবাহ ভূমধ্যে চালিত করা যাইতে পারে। বক্রতার পরিমাণ দেখিয়া যে স্থানে প্রবাহ মাটিতে পড়ে তাহা স্থির করা হয়। যদি মধ্যে ধাতু থাকে তাহা হইলে ঐ প্রবাহ সেই স্থান হইতে প্রতিহত হইয়া সমকোণে (আলোকরশ্মির প্রতিঘাতের ন্যায়) ঠিকরাইয়া জ্ঞাপক যন্ত্রে আসিয়া পড়ে। নচেৎ উহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। কেবল বায়ু-মধ্যস্থ প্রবাহটুকুই থাকিয়া যায়।

উক্তরূপে ভূমধ্যস্থ খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান অতি সুন্দররূপে ও অল্প আয়াসেই হইতেছে। প্রথমতঃ জর্ম্মানিতেই উহার পরীক্ষা হয়; এখন প্রায় সমস্ত সভ্য জগতেই উহার প্রচলন হইয়াছে। কেবল ভারতে এখনও আইসে নাই। এখানে অনেক স্থলে নানাপ্রকার ধাতুর খনি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ঐ সকল ভূখণ্ডের অধিকারী মহাশয়েরা একবার এই সহজসাধ্য পরীক্ষাটা করিয়া দেখুন না? বোধ হয় সুফল হইবে না।

(২)

সজীব ইতরপ্রাণীর দেহ হইতে মাংস, অস্থি, ও চর্ম্ম লইয়া মানবদেহের স্থান বিশেষে সংরোপিত করিয়া আমেরিকার অস্ত্রচিকিৎসকগণ বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতিকার সাধন করিয়াছেন। ঐরূপ চিকিৎসাকে grafting বলে। ঐরূপ প্রত্যঙ্গাদি এ যাবৎ সজীব দেহ হইতেই লওয়া হইত। সম্প্রতি জর্ম্মানীর ব্রেস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার কুটনের (Dr. Kuttner) মৃতদেহ হইতে ঐরূপ প্রত্যঙ্গাদি লইয়া মানবদেহে সংযোজিত করিয়া অসাধিতপূর্ব্ব অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এক যোদ্ধার উরুদেশের বৃহৎ অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয় তাহার ভগ্ন অস্থি বাহির করিয়া ফেলেন এবং তৎস্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত এক ব্যক্তির দেহ হইতে সেইরূপ অস্থি লইয়া বসাইয়া দেন। যোদ্ধা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হইয়া উঠে। কয়েক

মাস পরে সেই ঘোড়া জলমগ্ন হইয়া মারা যায়, তখন অধ্যাপক ডাক্তার মহাশয় তাহার উরু কাটিয়া সমগ্র বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করেন যে, মৃত অস্থি সজীব দেহে উপযুক্ত স্থান পাইয়া নূতন জীবন লাভ করে ও নিজ কার্য্য সুচারুরূপে করিতে থাকে। ইহার পর সেই ডাক্তার আরও কয়েকটি লোকের দেহে মৃতদেহস্থিত অস্থি ও চর্ম্মের "কলম" বসাইয়া সুফল পাইয়াছেন।

জেনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রচিকিৎসাধ্যাপক ডাঃ লেক্সার (Dr. Lexer) সম্প্রতি আরও অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়াছেন। একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া জার্ম্মাণ-রমণী আত্মহত্যার চেষ্টায় খানিকটা গন্ধকাম্ল (Sulphuric Acid) গলাধঃকরণ করেন। তাহাতে তাঁহার কণ্ঠনালী ও পাকস্থলীর মুখ পর্য্যন্ত একেবারে পুড়িয়া যায়। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু কিছু দিন অসহ্য কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। ইতিমধ্যে ডাক্তার লেক্সার্ একটা মৃতদেহ হইতে খানিকটা অন্ত্র (পেটের ভিতরের নাড়ি) ও গাত্রচর্ম্ম কাটিয়া লইয়া একটা নূতন গলনালী ও পাকস্থলীমুখ প্রস্তুত করেন, এবং সেই রমণীর অম্লক্ষত নলী অস্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া তৎস্থানে সেই কৃত্রিম গলনালী প্রভৃতি বসাইয়া দেন। আজিও সেই রমণী জীবিত আছেন ও "মড়ার নাড়ি" কণ্ঠে ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে পান আহার সমাধা করিয়া বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছেন।

উক্ত ডাক্তারদ্বয় ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেও জড়দেহ বা তাহার বিশিষ্ট অংশ একেবারে মরে না—সুবিধা পাইলে পুনর্জ্জীবিত হয় ও নিজ কার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে করিতে থাকে।

৩

মানবদেহের প্রাচীনত্ব লইয়া ক্রমবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে খৃষ্টপূর্ব্ব চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মানবদেহের অভ্যুদয় নির্দ্দিষ্ট আছে। সম্প্রতি এ বিষয় একটা নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে। Robert Eilioth নামক জনৈক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ নর্থফ্লিট সহরের নিকস্থ টেম্‌স্ নদীর উপকূলে ভূপৃষ্ঠের ১৭০ ফুট নিম্নে একটি নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। উহার গঠন অনেকটা আধুনিক ইংলণ্ডবাসীর কঙ্কালের অনুরূপ। সামান্য বিভিন্নতা যে লক্ষিত হয় না তাহা নহে। যে স্থানে উহা পাওয়া গিয়াছে তাহার নিম্নস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে ঐ স্তর প্রাচীন তুষার নদী (glacier) দ্বারা বিন্যস্ত। ঐ কালকে পণ্ডিতেরা তুষার যুগ (glacial age) বলেন। সে সময় মানবের অভ্যুত্থান অসম্ভব। ইহার বহু পরে প্রস্তর যুগ (neolithic age)। প্রস্তর যুগের যাহা কিছু প্রামাণ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত ভূপৃষ্ঠের নিকটের স্তরেই দেখা যায়। বহু প্রাচীন তুষার যুগের পর কোন্ সময় যে মানবের অভ্যুদয় হয় তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বহু চেষ্টায় কতক কতক প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। প্রমাণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে তুষার যুগের তিরোধানের পরই মানবের অভ্যুদয় হইয়াছে। পরে তাহার বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হওয়ায় প্রস্তরাদির দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ এবং তাহার ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপে ক্রমশ তুষার যুগ হইতে প্রস্তর যুগের অভ্যুদয় হয়। ভূগর্ভ প্রোথিত নরকঙ্কালটি যে কত কালের অধ্যাপক আর্থার কেইথ "মানবের প্রাচীনত্ব" বিষয়ক বক্তৃতায় তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে ঐ ১৭০ ফুট মাটিই আমাদের সাক্ষী। দেখা যায় যে রোমীয়গণের দ্বারা ইংলণ্ড অধিকারের পর হইতে আজও পর্য্যন্ত টেম্‌স্ উপত্যকাসমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গড়ে এক ফুট মৃত্তিকা স্তর বিন্যাসে প্রাকৃতিক নিয়মে এক সহস্র বৎসর লাগে। সুতরাং ঐ কঙ্কালের পরমায়ু এক লক্ষ সত্তর হাজার বৎসর। সুতরাং মানবের গঠন ১৭০০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এই একরূপই ছিল ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তর যুগের আরম্ভ হয় নাই। তুষারযুগ হইতে প্রস্তর যুগ পর্য্যন্ত ঐ কঙ্কাল কত শত বংশানুবর্ত্তিত মানবের একমাত্র প্রতিভূ তাহা কে বলিতে পারে। মানবদেহ অন্ততঃ ১৭০০০০ বৎসর প্রাচীনতা লাভ করিয়া আধুনিক গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৪)

মানুষ মরিতে নারাজ; এমন কি বুড়া হইতেও চাহে না। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর কঠোর আদেশ পালন করিতেই হয়, নচেৎ নবীন যুবকদলের মধ্যে কয়জন জরাগ্রস্ত হইতে প্রস্তুত? এই বিংশ শতাব্দীতে দীর্ঘ-জীবন লাভ করার কত সুখ! বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য, সমস্তই মানবকে সুখী করিতে অনবরত কতই চেষ্টা না করে! সেই দীর্ঘজীবন লাভ হয় কিরূপে? ডাক্তার ফিটনডেন্ কয়েক বৎসর এই ক্ষেত্রে "মৌলিক অনুসন্ধান" করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম রক্ষা করিতে হুকুম দিয়াছেন। অনেকে নাকি এই নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া বহুকাল ধরিয়া প্রকৃতিদেবীকে ফাঁকি দিয়া জরা ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

(১) কখনও "পেট ভরিয়া" আহার করিবে না। আধপেটা খাও, আর নিয়মমত উপবাস করিতে অভ্যাস কর। চুল্লীতে রাশিকৃত ইন্ধন ঠাসিয়া দিলে যেমন উহা ভালরূপে জ্বলিতে পারে না, সেইরূপ জঠর চুল্লীতে প্রচুর আহার্য্য ঠাসিলে আয়ুক্ষয় হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য তথ্য।

(২) যথা সময়ে প্রত্যেক অঙ্গের স্বাধীন পরিচালনা করিবে। সকালে ও বৈকালে খুব খানিকটা দৌড়াইতে পারিলে ভাল। যতক্ষণ ক্লান্তিবোধ না হয় ততক্ষণ হাঁটিবে, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন।

(৩) নিয়মিত মস্তিষ্ক চালনা করিবে। পড়া শুনা, অঙ্ককষা, গৃহচিন্তা, জঠরচিন্তা, সমাজচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তা ইত্যাদি বহু উপায়ে মস্তিষ্কের পরিচালনা হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে একটু আধটু ক্রন্দন বিশেষ উপকারী! কবিবর দান্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন "যে মানব জন্মাবধি কখনও কাঁদে নাই তাহাকে সয়তানের অবতার বলিয়া জানিও"।

(৪) প্রচুর বিশ্রাম ও নিদ্রা। এই চারিটি নিয়ম রক্ষা করিয়া ডাক্তার কোনার ৯৫ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানের বহি লিখিয়া গিয়াছেন ও মিঃ হান্টার ৮৭ বৎসর বয়সে ১২ মাইল পদব্রজে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়া সন্ধ্যায় বাটী ফিরিতেন।

ইম্পিরীএল্ গেজেটিয়ার গ্রন্থের প্রণেতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির দীর্ঘজীবনের এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পূজারীরাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহাদের রীতিমত সংযম, উপবাস, নিরামিষ ভোজন, উদ্যানে পুষ্পচয়নার্থ যথেষ্ট ভ্রমণ এবং নিদ্রা। মাংস, বসা, ও সুরা মানবদের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। শীত প্রধান প্রদেশে মাংস ও চর্ব্বি অপরিহার্য্য, কিন্তু সেখানেও উহা সংযতভাবে খাওয়া উচিত।

(৫)

বিগত জুন মাসে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থানীয় সম্বাদ-পত্রে প্লেগের বীজাণু বিনষ্ট করিবার একটি সহজ উপায় প্রচারিত হইয়াছে। কাহারও অবিদিত নাই, যে পিসু নামক এক জাতীয় পোকা ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুদের গাত্রে সর্ব্বদা থাকে—উহারা ঐ ঐ জন্তুর রক্তপান করিয়া, জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। প্লেগের বীজ পিসুর সাহায্যেই ইন্দুরের শরীরে প্রবিষ্ট হয় ও ইন্দুরের রক্তে পুষ্ট হইয়াই ইন্দুরের শরীরে প্লেগের সৃষ্টি করে। ইন্দুর মরিয়া যায় এবং তাহার গাত্র হইতে বীজাণু সকল সমগ্র বায়ুমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতেই গ্রাম ও সহরের সর্ব্বত্র প্লেগ হয়। সুতরাং প্লেগ নিবারণ করিতে হইলে উহার মূল ঐ ক্ষুদ্র পোকা সংহার করা আবশ্যক। বোম্বাইএর লাট সাহেব বিশিষ্ট ডাক্তারগণের উপদেশে এই মৎকুন সংহারের যে সহজ উপায় প্রচার করিয়াছেন তাহা এই। যে লোকেরা প্লেগ দুষ্ট দেশ হইতে আসে তাহাদের কাপড় জামা বিশেষতঃ লেপ, তোষক ও বালিশে প্রচুর পিসু থাকে। ঐ সকল কাপড় বালির উপর প্রখর রৌদ্রে দুই ঘণ্টা ছড়াইয়া রাখিলে সমস্ত পিসু মরিয়া যাইবে। রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হওয়া আবশ্যক, এবং যে স্থানে কাপড় ইত্যাদি দিতে হইবে তাহার নিকটে বৃক্ষ বা গৃহাদি থাকা উচিত নয়। মাটীতে ঘাস থাকিলে চলিবে না, ফাটা চটা মাটী বা তাহার মধ্যে ঢেলা থাকিলেও চলিবে—বেলে বা কাঁকুরে জমির উপর দিতে হইবে। কাপড় রৌদ্রে দিবার পূর্ব্বে বালুকা বা কঙ্কর বেশ উত্তপ্ত হওয়া আবশ্যক, এবং রৌদ্র সমান ভাবে দুই ঘণ্টা ধরিয়া থাকা চাই। এক ঘণ্টা অন্তর কাপড়গুলি উল্টাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় সমস্ত পিসু মরিয়া যায়। রৌদ্রের উত্তাপ ও আলোক উভয়ই প্লেগবীজের পক্ষে বিষ। এইরূপে পিসুর ধ্বংস সাধন করিতে পারিলে প্লেগও নির্ম্মূল হইবে। (শঃ ভঃ)

ধর্ম্মঘট

একটি ক্ষুদ্র দৃশ্য।

নেপল্‌সের ট্রামকর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ট্রামের ডিপোতে সারি সারি খালি গাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে—চালক ও কণ্ডাক্টরগণ পিয়াজা ডি ট্রায়ম্ফোর (Piazza di Triomfo) উপর জমা হইয়াছে। সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনেচ্ছু কেরাণী, কারিকর, দোকানদার প্রভৃতি যাত্রীগণ উহাদিগকে ঘিরিয়া এক মহাজনতার সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাদের হাতমুখ নাড়া ও ক্রুদ্ধস্বর রাস্তার সাধারণ লোককে একটু ভীত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু নেপল্‌সের এই মহাজনতা অনেকটা পারার মত চঞ্চল।

তাহাদের মাথা ছাড়াইয়া আরও উচ্চে নগরের বাগানের ফোয়ারাটির জলোচ্ছাস সূর্য্যকিরণে তরবারির মত চকমক্ করিতেছে—সাগরের মৃদু সমীরণ বড় বড় পাথরের হাতীর পায়ের মত গুঁড়িওয়ালা তালগাছগুলির পাতাগুলিকে দোলাইতেছে, রাস্তার অর্দ্ধ উলঙ্গ ছেলেগুলো চীৎকার ও হাস্যে সমস্ত আকাশ আনন্দে মুখরিত করিয়া চড়াইপাখীর মত লাফাইয়া বেড়াইতেছে। সমুদ্রের ঢেউগুলি তীরস্থ উপলখণ্ডের উপর তালে তালে আঘাত করিয়া যে শব্দ উৎপন্ন করিতেছে তাহা একখানি খোদাই করা জিনিবের মত রৌদ্রস্নাত ঐ সহরের সমস্ত কলরবের সহিত মিলিত হইয়া বিচিত্র এক অর্গ্যানের সুরের মত শুনাইতেছে।

কতকগুলি কুকুরবেষ্টিত নেকড়েবাঘের মত একদল ধর্ম্মঘটকারী দুঃখভারাক্রান্ত মুখে পরস্পর ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইয়া ঐ ক্রুদ্ধ জনতার কটূক্তিতে মোটেই কাণ দিতেছিল না—কেহ কেহ বাগানের বেড়ার উপরে উঠিয়া রাস্তার চারিদিক উৎকণ্ঠিতভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইহাদের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ভিড়ের সমস্ত লোক উত্তরোত্তর আরও রাগিয়া উঠিতেছিল — তাহাদের মধ্যে আবার কোন দার্শনিক পার্শ্বের ক্রুদ্ধ বন্ধুটিকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিল—"দেখ সেন্যর, যদি সমস্ত পয়সা ট্রামেই খরচ করে ফেল তবে ছেলেদের জন্য খাবার কিনবে কি দিয়ে?"

সুন্দর পোষাক পরা পুলিশ দুই তিনজন করিয়া এক একটা দলে দাঁড়াইয়া পথে যাহাতে গাড়ীঘোড়ার চলাচল বন্ধ না হয় তাহার চেষ্টা করিতেছিল—তাহারা উভয়দলের প্রতিই নিরপেক্ষভাবে অতি সৌজন্য ব্যবহার করিতেছিল। যখন গালাগালি ও হাতমুখ নাড়া সপ্তমে চড়িল তখন তাহারা দুই দলের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে সরু রাস্তাগুলির উপর বাড়ীর ধারে ধারে একদল 'ফিউজিলিয়র' (Fusiliers) সৈন্য দাঁড়াইয়া আছে;—তাহাদের তিন কোণ যুক্ত টুপি, খাটো কোট ও কালো পাজামার দুইপাশে রক্তধারাবৎ সরু কাপড়ের সাজ। তাহাদিগকে যেন মূর্ত্তিমান দুর্ঘটনার দূতের মত বোধ হইতেছে।

সমস্ত গোলমাল, বিদ্রূপের হাসি ও গালাগালি সহসা থামিয়া গেল—একটা নূতন স্রোত ঐ জনতার উপর বহিয়া গিয়া

উহাকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। ধর্ম্মঘটকারীরা অধিকতর বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া আরও ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত জনতা একশব্দে বলিয়া উঠিল—

"সিপাহী—সিপাহী !"

সঙ্গে সঙ্গে একটা জয়ধ্বনি ধর্ম্মঘটকারীদের বিদ্রূপ করিয়া সমস্ত আকাশ পৃথিবী কম্পিত করিল। ধূসরবর্ণের পোষাকপরা পানামা টুপি মাথায় স্থূলকায় একজন লোক আহ্লাদে রাস্তার উপর থপ্ থপ্ করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল।

ট্র্যামের চালক ও কণ্ডাক্টরগণ এই বিপুল জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ইহাকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে ট্র্যামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে সাণ্টা লুসিয়া কোয়ে (Santa Lucia Quay) হইতে সৈন্যগণ বামহাত দোলাইতে দোলাইতে কলের পুতুলের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিষ্ঠ সুন্দর একজন যুবাপুরুষ তাহাদের নায়ক—ঘৃণায় তাঁর ভ্রূ ও ওষ্ঠ কুঞ্চিত। রেশমের টুপিমাথায় ট্র্যামের ম্যানেজার অসংখ্য অঙ্গভঙ্গির সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহার পাশে পাশে আসিতেছিলেন।

গাড়ীর নিকট হইতে সমস্ত ভিড় সরিয়া গেল, সৈন্যগণ গাড়ীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—ধর্ম্মঘটকারীরা ট্র্যামের পা'দানের উপর দাঁড়াইয়া,—ম্যানেজার হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের বলিলেন "এই এবার—শুনচো—এইবার আমরা একটা যা'হয় করবো।"

সেনাপতি গোঁফে তা দিতে দিতে একবার মাথা নামাইলেন—একজন লোক টুপিটা হাতে করিয়া মোটাগলায় কি বলিতে বলিতে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিল,—তিনি তাহার দিকে চাহিয়া সৈন্যদিগকে কাজ করিবার হুকুম দিলেন।

দুই তিনজন করিয়া সৈনিকপুরুষ ট্র্যামের উপরে লাফাইয়া উঠিয়া চালক ও কণ্ডাক্টর-দিগকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল—সমস্ত লোক মুহূর্ত্তের জন্য উচ্চহাস্য করিয়া, বিস্ফারিতনয়নে, উৎকণ্ঠিত ও স্তম্ভিতভাবে গাড়ীর নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া সহসা দেখিল—সৈনিকপুরুষের মত চেহারা বৃদ্ধ একজন ট্র্যামচালক চিৎ হইয়া লাইনের উপরে শুইয়া!

একজন যুবা কণ্ডাক্টর বানরের মত অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে পাশে শয়ন করিল—দেখিতে দেখিতে অন্যান্য ধর্ম্মঘটকারীগণ একে একে লাইনের উপরে শুইয়া পড়িল। সমস্ত জনতার ভিতর হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি শুনা গেল—পরক্ষণেই কেহ কেহ মেরীর দোহাই দিতে লাগিল—কেহবা ভয়ানক রাগিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল—স্ত্রীলোকেরা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল—বালকগণ এই অস্বাভাবিক দৃশ্যে প্রথমটা হতবুদ্ধি পরে রবারের বলের মত লাফাইতে লাফাইতে আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া ম্যানেজার সেনাপতিকে কি বলিলেন। সেনাপতি ঘাড় নাড়িলেন—ধর্ম্মঘটকারীদের উপরে হাত চালাইবার হুকুম তাঁহার প্রতি নাই। দৌড়িয়া ম্যানেজার ফিউজিলিয়রদিগকে ডাকিয়া আনিলেন,—তাহারা আসিয়া চালক ও কণ্ডাক্টরদিগকে

জোর করিয়া তুলিতে গিয়া এক হাঙ্গামার সূত্রপাত করিল। দর্শকবৃন্দ ইহাতে রাগিয়া ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিল। প্যানামা টুপি মাথায় সেই লোকটি টুপিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রথমে লাইনের উপর একজন ধর্ম্মঘটকারীর পাশে শুইয়া পড়িল এবং তাহার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে মুখের কাছে মুখ লইয়া তাহাদের এই কাজের সমর্থনসূচক কথা বলিতে লাগিল। একদল যুবা পরস্পরের প্রতি মুখভঙ্গী সহকারে হাসিতে হাসিতে তাহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল এবং লাইনের উপরে শুইয়া হাতের দস্তানা আন্দোলন করিতে করিতে ম্যানেজারের সহিত কথোপকথননিরত সেনাপতির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিল। ক্রমে সকলেই একে একে লাইনের উপর শয়ন করিল—স্ত্রীলোকেরা তাহাদের চুপড়ি ও পুঁটুলি রাখিল—বালকগণ ধূলায় গড়াগড়ি দিতে দিতে কুকুরের মত সমস্ত শরীরটাকে কুঞ্চিত করিতে লাগিল।

সৈন্যেরা—প্রথম গাড়ীর পাদানের উপর হইতে অন্য গাড়ীর চাকার মধ্যে ধর্ম্মঘট কারীদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক ধ্বনি করিল; আর তাহারা টিনের তৈয়ারী কলের পুতুলের মত নহে—বিনাদেশেই তাহারা গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

* * *

আধঘণ্টা পরে নেপ্ল্সের রাস্তা দিয়া আবার ট্রাম চলিতে লাগিল। বিজয়ী কণ্ডাক্টরগণ গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া নম্র ভাবে বলিতেছে,

"টিকিট টিকিট"—

আরোহিগণ অভিনন্দনের হাসি হাসিতে হাসিতে লাল ও হল্দে কাগজের টুকরা দেখাইতেছে।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুশালা

নানাদেশের পশুপক্ষী সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করা আধুনিক সভ্যতার একটী নিদর্শন। এই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত নিউইয়র্কের উদ্যাননিবাসই অধুনা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুশালা বলিয়া পরিগণিত; বার্লিনের পশুশালা দ্বিতীয় এবং লণ্ডনের পশুশালা তৃতীয় স্থানীয়। অল্পদিন মাত্র ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়াছে। পশুপক্ষীদিগের স্বচ্ছন্দ বসবাসের এখানে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত। তাহাদিগকে স্বাভাবিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে হয় না। উদ্যানের মধ্যস্থানে বিখ্যাত ধনী রকফেলারের নামাঙ্কিত উৎসের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর রাস্তা ও সুরুচিসম্পন্ন হর্ম্ম্যাবলী বিরাজিত। শোভন গুহাযুক্ত কৃত্রিম পর্ব্বত, কৃত্রিম নদী, কেবল তাহাই নহে কৃত্রিম সমুদ্রের মধ্যস্থলে বরফ স্তূপে মেরুদেশীয় ভল্লুক আহারে নিযুক্ত। নানা জাতীয় সঙ্গীতকারী বিহঙ্গপূর্ণ কুঞ্জবনসকলকে এক অনির্ব্বচনীয় সুন্দর প্রাকৃতিক রাজ্য বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত প্রাণীগণ আপনাদের উপযোগী প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসকগণ তাহাদের আহার বিহারের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন। একবার উদ্যানস্থ হার্পি ঈগলের (Harpy Eagle) জিহ্বার এক পার্শ্বের মাংস বর্দ্ধিত হওয়াতে বেচারা কিছু খাইতে পারিত না। ঐ বর্দ্ধিত মাংসখণ্ড কাটিয়া দেওয়াতে ও উপযুক্ত শুশ্রূষা করায় এখন সে

সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য জীব উদ্যানটীর শোভাসম্পদ বর্দ্ধিত করিতেছে। আলাস্কা (Alaska) উপদ্বীপস্থ ধূসরবর্ণ ভল্লুক—ভল্লুকজাতির মধ্যে আয়তনে ও বিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;—লোহিত নদী (Red River) প্রদেশস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূকর; সুদানের একজোড়া জিরাফ; (Soudan giraffe) ইহাদের স্ত্রী পুরুষের আহার প্রণালী একেবারে স্বতন্ত্র,—পুরুষটীর জন্য উচ্চ জায়গার আহার রক্ষিত হয় এবং স্ত্রী জমীর উপর চারিটা পা বিস্তার করিয়া নীচু হইয়া আহার গ্রহণ করে; উপরে যে ঈগলের কথা বলিয়াছি সেই দুষ্প্রাপ্য হার্পি ঈগল; সুমেরু প্রদেশস্থ মাস্ক অক্স; (Musk ox) ইহারা উত্তর আমেরিকাস্থ গো-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী, ইহাদের মাংস হইতে মৃগনাভীর ন্যায় একপ্রকার সুবাস নির্গত হয়; তিব্বত দেশস্থ (Morkhor) মর্খর নামক মেষ ও নাইল (nile) নদী প্রদেশস্থ বৃহৎ শূকর,—ইহারা সকলেই দুষ্প্রাপ্য জন্তু। এ সকল ব্যতীত নানা দেশস্থ নানাজাতীয় নানা শ্রেণীর জীবদিগকে উপযুক্ত স্থানে রাখা হইয়াছে। জলচর পক্ষী সকলের জন্য কৃত্রিম হ্রদ ও তাহার তীরে জালতী দিয়া ঘেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে তাহারা বংশপরম্পরায় সুখে বাস করিতেছে। বনচরদিগের জন্য কৃত্রিম বন ও বিবর-বাসীদের জন্য কৃত্রিম বিবর তৈয়ারী করা হইয়াছে। পশুপক্ষীরা এত মানুষঘেঁসা যে উষ্ট্রশাবক নিজের রক্ষককে খেলার সাথী করিয়াছে এবং অষ্ট্রেলিয়া দেশস্থ এমু (Emu] নামক বৃহৎ পক্ষী রক্ষকের মুখ হইতে খাদ্য লইয়া ভক্ষণ করিতেছে। উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় স্বভাবের এমন সুন্দর লীলাক্ষেত্র বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই!

মাতৃঋণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রহস্য-ভেদ।

আজিকার প্রভাতে "আনন্দ-কুঞ্জ" নামটি প্রকৃতই সার্থক মনে হইতেছিল। বহির্জগতের সকল প্রকার অশান্তি ও কোলাহলবর্জ্জিত, ক্ষুদ্র উদ্যানপরিশোভিত, পুষ্পবাসসুরভিত, বিহঙ্গকূজনমুখরিত নির্জ্জন পল্লীবাসভূমিটি, এই স্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রভাতে, সত্যই একখণ্ড মায়ালোক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

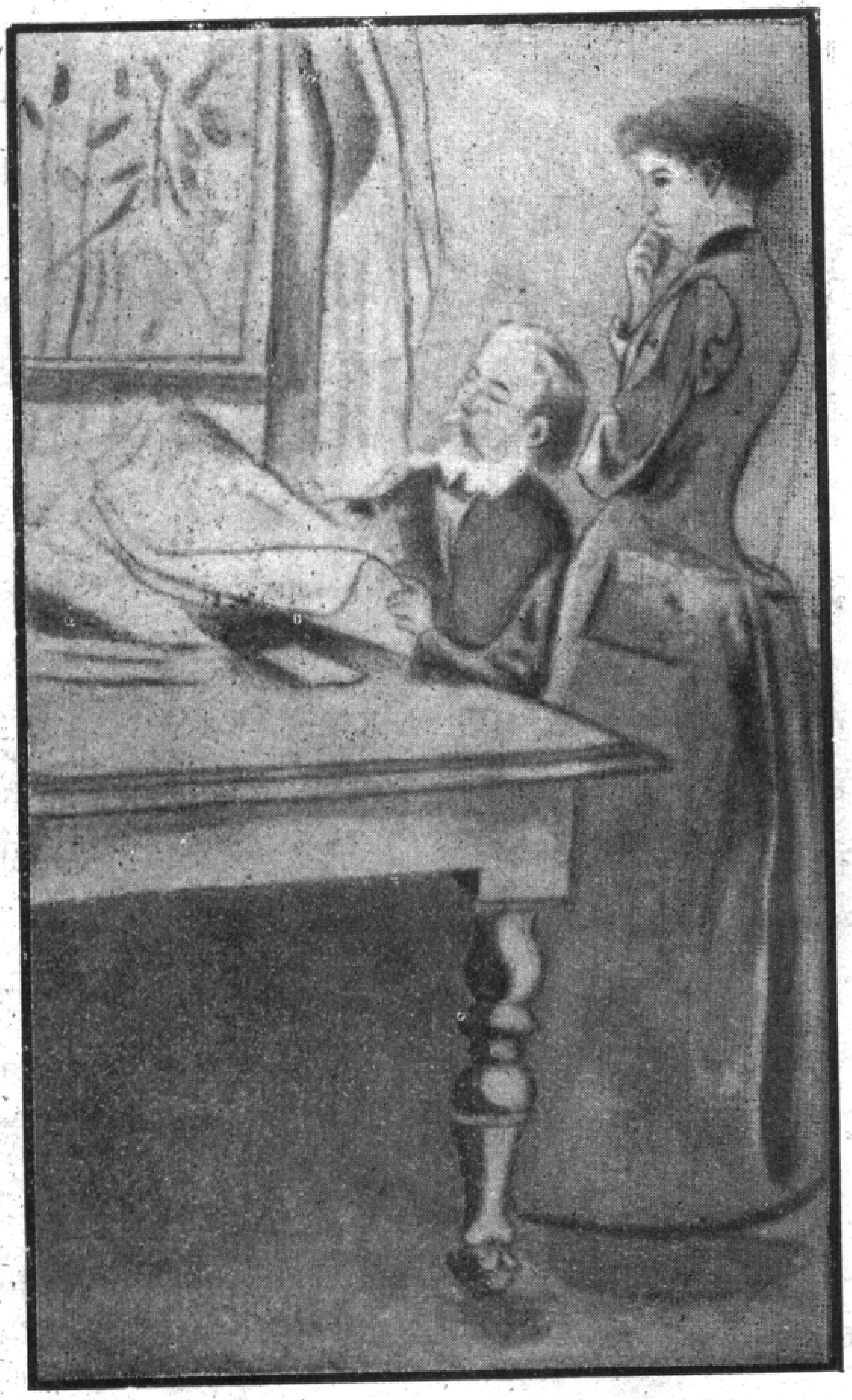
সার্লটি দ্রাক্ষাগুচ্ছ হইতে শুষ্ক ফলগুলা বাছিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। কবি কাব্যসুধা-পানোল্লাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল, ও অতিথি ডাক্তার হারজের তখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া হাঁকিল, "চিঠি আছে!"

"ইদ্রেঁর চিঠি", বলিয়া আর্জেন্ত পত্রখানা সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া সংবাদপত্রের মোড়ক খুলিল। চিঠিখানা সার্লটিকে সে দিল না। সার্লটি নিকটে আসিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আর্জেন্ত তাহা লক্ষ্য করিল। পত্রখানা ব্যগ্র ইচ্ছা সত্ত্বেও যে সার্লটি শুধু তাহার ভয়ে লইতে পারিতেছে না, ইহা সে বুঝিল। বুঝিয়া অন্তরে সে একটা বিকট আনন্দ অনুভব করিল মাত্র। সে ভাব চাপিয়া প্রকাশ্যে সে বলিল, "আঃ, আবার এ কি একটা নূতন বই বেরুল! ভিক্টর হিউগোর লেখা দেখছি! কি সব ছাইপাঁশ লেখে—অর্থ বোঝা যায় না! অবিশ্রাম লিখছেই—এতে কখনও ভাল লেখা বার হতে পারে? কত ভেবে চিন্তে

তবে বই লিখতে হয়—এই যে আমি আজ ক'বৎসর ধরে ভাবছিই শুধু—লেখা ক'ছত্র হল! একেই ত বলে সাধনা!"

সার্লটির মনোযোগ এ কথায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না! ইদেঁর পত্র আসিলে তাহার মাতৃত্বের সকল গর্ব্ব নিমেষে দৃপ্ত হইয়া উঠে,—অপর কোন বিষয়ে লক্ষ্য থাকে না। আর্জেন্তঁর কবিযশের বিচিত্র স্বপ্নে, তখন তাহাকে ভুলানো যায় না! পুত্রের এক ছত্র পত্রের স্পর্শে তাহার চক্ষে বাহ্যজগৎ একেবারেই মিলাইয়া যায়! এইটুকু আর্জেন্তঁ কিছুতে ক্ষমা করিতে পারে না। হিংসায় তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে থাকে! কঠিন নিষ্ঠুর হইয়াও সে কিন্তু সার্লটির মনের গতি রোধ করিতে পারে না। শুধু এইজন্যই সে জ্যাককে দূরে বহুদূরে পাঠাইয়াছে। নহিলে জ্যাক লেখাপড়া শিখিল, কি কারখানার কারিকর হইয়া উঠিল, ইহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যায় না!



সার্লটি নিকটে আসিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিন্তু এই দূরত্বের ব্যবধান মাতার হৃদয়খানিকে পুত্রের হৃদয়ের আরও নিকটে টানিয়া আনিল। স্নেহের সুগভীর আকর্ষণে বাহিরের সকল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। অন্তরে বাহিরে নিদ্রায় জাগরণে জ্যাক এখন অহর্নিশি মাতার হৃদয়ে জাগরূক রহিল!

জ্যাক চলিয়া যাইবার পর মাতার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। কেমন করিয়া সে প্রাণ ধরিবে? আর্জেন্তঁর সম্মুখে সার্লটি জ্যাকের নামোল্লেখ করিত না—কবি ইহাতে বিরক্ত হইত! কিন্তু আর্জেন্তঁ সহস্র বাধা দিলেও সার্লটি জ্যাককে একদণ্ডের জন্য ভুলিতে পারিল না। ভিতরে অনুরাগ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল।

আর্জেন্তঁ ইহা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। এবং ইহাতেই জ্যাকের প্রতি তাহার বিরক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতে-ছিল। পরে যখন রুডিক সংবাদ দিল, কাজকর্ম্মে জ্যাকের

তেমন মনোযোগ নাই, তখন একটা পৈশাচিক আনন্দে মাতার মর্ম্মে আঘাত দিয়া সে বলিল, "দেখ, তোমার কেমন যোগ্য ছেলে! কোন ক্ষমতা নাই! কারখানার কাজেও মাথা খেলে না! এমন অপদার্থ!"

কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। জ্যাককে পদে পদে সে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইত। সার্লটির চক্ষে জ্যাকের অপদার্থতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে তাহার আগ্রহের সীমা ছিল না! ইহাতে সে আনন্দলাভ করিত। আজ ইন্দ্রের পত্র খুলিবার লোভ-সম্বরণে অক্ষম হইয়া সে পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল—খুলিয়া যাহা পাঠ করিল, তাহাতে আনন্দে তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পত্রখানা সার্লটির দিকে ছুড়িয়া আর্জেন্তঁ কহিল, "এ রকম যে হবে, তা আমি পূর্ব্বেই জানতাম।"

এ কি নির্ম্মম আঘাত! নিষ্ঠুর বেদনা! মাতৃগর্ব্বে ও স্নেহে আহত হইয়া বেচারা সার্লটি কাঁদিয়া ফেলিল! কম্পিত স্বরে সে কহিল, "তুমি, তুমিই এর জন্য দায়ী! কেন, তুমি তাকে ত্যাগ করলে?"

যেমন করিয়া হউক, এখন জ্যাককে রক্ষা করিতে হইবে! কাঁদিয়া ফল কি! কিন্তু, কি উপায়ে? এত অর্থ কোথায় পাইবে, সে? তাহার কোন সঙ্গতি নাই—সে একান্ত নিঃস্ব! গৃহের আসবাবপত্র গাড়ীঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, কবির সাহিত্যিক মজলিসপ্রভৃতির ব্যয়ভারবহনে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

কে এখন অর্থ দিয়া তাহার জ্যাককে উদ্ধার করিবে? অকস্মাৎ 'বন্ধুর' কথা সার্লটির মনে পড়িয়া গেল! বিদায়ের পূর্ব্বে বন্ধু তাহাকে উপহার দিতে চাহিয়াছিল, সে গ্রহণ করে নাই—অতীত ভালবাসার স্মৃতিস্বরূপ বন্ধু সাগ্রহে উপহার দিতে আসিয়াছিল, পাছে আর্জেন্তঁর সম্মানে আঘাত লাগে, ইহা ভাবিয়াই প্রেমের সে অযাচিত দান সে উপেক্ষা করিয়াছিল! আজ সার্লটি সত্যই নিঃস্ব! দুই চারিখানা অলঙ্কার যাহা আছে, তাহা বিক্রয় করিলে এত অর্থ মিলিবে না! কবির নিকট এ দুঃখ নিবেদন করা, মিথ্যা! তাহার প্রকৃতি সার্লটির বেশই জানা ছিল। প্রথমতঃ কবি জ্যাককে ঘৃণা করে—তদ্ভিন্ন কবি মহা-কৃপণ! সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও হীন মাৎসর্য্যে যাহার হৃদয় পূর্ণ, মাতৃহৃদয়ের এ ব্যাকুল আগ্রহ, সে বুঝিবে না!

না! কবির নিকট কোন সাহায্য সে চাহিবে না! তবে কে এমন সুহৃদ আছে, কে এমন উদার পরোপকারী আছে—!

আর্জেন্তঁ কহিল, "ও ছেলেকে আর এখন শোধরাবার চেষ্টা করা মিথ্যা! এতদূর যে উৎসন্ন গেছে—"

কথাটা সার্লটি শুনিয়াও শুনিল না। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, একটা কথা—তিন দিনের মধ্যে টাকার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে—তিন দিনের মধ্যে না দিলে তাহার প্রাণের জ্যাক জেলে যাইবে!

আর্জেন্তঁ আবার কহিল, "ছি, ছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার এমন মাথা হেঁট হল! লোকের এত খোসামোদ করেছি, আমি, এই ছেলেকে মানুষ করে দেবার জন্য! আমার চূড়ান্ত শিক্ষা হয়েছে—"

সার্লটি কহিল, "এ তিন দিনের মধ্যে আমি যেমন করে পারি, এই টাকার জোগাড় করে

পাঠাব—না হলে জ্যাককে তারা জেলে দেবে!”

আর্জেন্ত কহিল, “এ কলঙ্কের হাত এড়ানো দরকার বটে! কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবে, তুমি?”

“তুমি যদি দয়া করে—”

আর্জেন্ত বাধা দিল, বুঝিল, টাকা দিবার জন্য সার্লটি তাহাকে অনুরোধ করিবে! সে রোষে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,“আমি দয়া করব? জানি, তুমি শেষ আমায় ধরবে! আমার খরচটা ভারি সামান্য কি না! তুমি আমার অনেক টাকা দেখেছ, না? দু বৎসর তাকে খাইয়ে যে খরচ হয়েছে, আমার, তা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করলে দেশের উপকার হত! একখানা বই ছাপালেও জগতে একটা জিনিস থাকত! আমি তার চুরির খেসারত দেব? সাড়ে তিন হাজার টাকা বড় সহজ জিনিস কি না?”

সার্লটির মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। দৃঢ় স্বরে সে কহিল, “তোমার কাছে আমি এক পয়সা সাহায্য চাই না—তোমার কিছু করতে হবে না জ্যাকের জন্য। শুধু—”

“তবে তুমি এত টাকা পাচ্ছ, কোথায়? এত টাকা, কে দেবে?”

এতটুকু সঙ্কোচ বাধা না মানিয়া সার্লটি বন্ধুর নাম করিল।

প্রেমে স্নেহে সার্লটিকে যে পরম আদরে একদিন গ্রহণ করিয়াছিল—যাহার আশ্রয়, নিতান্ত দুর্ভাগিনী সে, মুহূর্ত্তের ভুলে ত্যাগ করিয়া বিপথে আসিয়াছিল, তাহার সেই উদার হৃদয়, উপেক্ষিত বন্ধুর নিকট গিয়া সে কাঁদিয়া পড়িবে! যাহাকে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে পাপিনী সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই বন্ধু এ বিপদে কখনও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ইদা সেই বন্ধুর নিকট যাইবে।

শুনিয়া আর্জেন্ত শিহরিয়া উঠিল—কোন কথা বলিল না। সেও ইহা অনুমান করিয়াছিল।

ইদার অতীত জীবন গভীর রহস্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। শান্ত, সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই! তাহার প্রাণ যৌবনের উন্মেষে যে উদ্দাম চপল প্রেমের তৃষ্ণায় তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীর পরিমিত আদর-ভালবাসায় তৃপ্তি লাভ করে নাই! স্বামীর এক কর্ম্মচারীর কুহকে পড়িয়া অভাগিনী আপনার নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিপথগামিনী হয়! উদারহৃদয় স্বামীর সে মর্ম্মদাহ, ইদা জীবনে ভুলিবে না! তাঁহার করুণাও কি অপরিসীম ছিল! তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তারপর যে পাপিষ্ঠ ইদাকে সর্ব্বনাশের পথে আনয়ন করে,সে যখন তাহার অলঙ্কার প্রভৃতি কাড়িয়া তাহাকে ভিখারিণী অবস্থায় পথে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন এই বন্ধুই তাহাকে আশ্রয় দেয়! স্বামীর সহিত মিলন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইদা এই বন্ধুর নিকট হইতেও যে ভালবাসা লাভ করিয়াছিল, অনেক স্ত্রীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। ইদা যাহাতে কোন কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে বন্ধুর সুদৃঢ় লক্ষ্য ছিল। দীর্ঘকাল বন্ধুর আশ্রয়ে কাটাইয়া ইদা তাহাকেও ত্যাগ করিল! তাহার পর নানা অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া আর্জেন্তর সহিত নূতন করিয়া ইদা সংসার পাতিয়াছিল—কিন্তু সুখ-শান্তি স্বামীর আশ্রয়ের সহিতই সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল! দুর্ভাগিনী নারী

জীবনে আর কখনও সে সুখের স্বাদ পায় নাই।

আর্জেন্তঁ কহিল, "তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? এখন তুমি আমার স্ত্রী!"

সার্লট কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "কিন্তু তাঁর বন্ধুত্বের উপর শুধু একটু দাবী—"

আর্জেন্তঁ কহিল, "বেশ, আমি বাধা দিচ্ছি না—তবে তুমি একলা যেতে পাবে না—আমিও সঙ্গে যাব।"

সার্লট সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি যাবে! বেশ—তাহলে ওখান থেকে অমনি বরাবর ইন্দ্রে যাব, কেমন?"

আর্জেন্তঁ জানিত, ইদা তুরেঁ যাইবেই! বন্ধুর নিকট হইতে এ অর্থ ভিক্ষা করিতে সে এতটুকু দ্বিধা করিবে না। কোন বাধা, সে মানিবে না! তথাপি অতীত ইতিহাস তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। পুরাতন প্রেম যদি আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে! ইদা সেখানে কত সুখে, কত আদরে ছিল! যে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সে বহুদিন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে; দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া, তাহারই বিচিত্র মোহ যদি ইদাকে আজ আবার লুব্ধ করিয়া তুলে! তাহারই মায়ায় যদি ইদা আর্জেন্তঁকে পরিত্যাগ করে! এখানে পরুষ নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন একটা মিষ্ট কথাও ত তাহার ভাগ্যে মিলে না! তাই সার্লটকে একা যাইতে দিতে আর্জেন্তঁর মন সরিতেছিল না।

ইদা নহিলে আর্জেন্তঁরও চলে না। তাহার এই দম্ভদর্পে সায় দিয়া যাইবে, এমন লোক ইদা ভিন্ন পৃথিবীতে দুইটি নাই। অক্ষম লেখকের গর্ব্ব-আস্ফালন এই নিরীহ মুগ্ধ ভক্ত ভিন্ন কে-ই বা সহ্য করিবে! তদ্ভিন্ন তাহার মস্তিষ্কে যে নূতন একখানা নাটকের কল্পনা সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভ্রমণে তাহা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া নিমেষেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, এ আশাও তাহার মনে বিলক্ষণ জাগিতেছিল।

ডাক্তার হারজের উপর গৃহ-রক্ষার ভার প্রদান করিয়া আর্জেন্তঁ ও ইদা তুরেঁ যাত্রা করিল।

আর্জেন্তঁ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, টাকা পেলে?"

"হাঁ। ইনি ঠিক করেছিলেন, জ্যাককে একেবারে কিছু দান করবেন—নগদ দশ হাজার টাকা। এঁর বড় ইচ্ছা যে, জ্যাক সৈন্যবিভাগে ঢোকে। জ্যাক সংসার আরম্ভ করলেই দশ হাজার টাকা পাবে, এমনই ঠিক ছিল। আজই সে দশ হাজার টাকা ইনি আমার হাতে দিয়েছেন। সাড়ে তিন হাজার ত ইন্দ্রেতে দিতে হবে, আপাততঃ। বাকিটা, ইনি বলছেন, জ্যাকের যাতে ভাল হয়, ভবিষ্যতে উন্নতি হয়, এমনভাবে যেন খরচ করা হয়।"

"বেশ হয়েছে। বাকি সাড়ে ছ হাজার আমি খাটিয়ে দেব। এখানে শুনছিলাম, অল্প বয়সে চুরি করে যে সব ভদ্রলোকের ছেলে-পিলেরা উৎসন্নে যায়, তাদের শোধরাবার জন্য, তাদের মানুষ করবার জন্য এখানে একটা সমিতি আছে, সেইখানে জ্যাককে দেব।"

চুরি—চোর! কথাটা ইদার মরমে বিঁধিল! জ্যাক চুরি করিতে পারে, এমন

চিন্তাও যে তাহার মনে স্থান পায় না—তথাপি সেই পত্রখানা কি নিষ্ঠুর ভীষণ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে! সত্যই কি এ পত্র খানা আসিয়াছে, না, এ শুধু একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র!

ইদা কহিল, "সে ভেবে চিন্তে স্থির করা যাইবে। এখন ত আগে ইদ্রে যাওয়া যাক।"

আনন্দে গর্ব্বে কবির চক্ষু আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এতগুলা টাকার উপর আধিপত্য করিবে, সে! পথে সে জ্যাকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কল্পনা ফাঁদিয়া বসিল। অতীতের ইতিহাস মন হইতে মুছিয়া জ্যাককে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, কি উপায়ে, তাহারই বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সে রীতিমত বক্তৃতা দিয়া চলিল—ইদার অন্ধ মাতৃস্নেহের প্রতিও দুই চারিটা বক্র ইঙ্গিত বাদ পড়িল না। ইদার দোষেই, ইদার স্নেহের আতিশয্যে শাসনের অভাবেই যে জ্যাক মাটি হইতেছে, তাহা আর্জেন্ত বিবিধ তর্ক ও যুক্তিবিন্যাসে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিল। পরিশেষে, আর্জেন্ত "হয় তাকে আমি এবার নশ নর চূর্ণ করব" বলিয়া আপনার বক্তব্যের মাত্রা শেষ করিল।

ইদা কোন উত্তর দিল না। পুত্রকে যে কারার যন্ত্রণা হইতে সে মুক্তি দিতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না। আর্জেন্ত ইদাকে বুঝাইল, সে একাই ইদ্রে যাইবে—ইদাকে সেই নীচ লোক-গুলার বিদ্রূপদৃষ্টির সম্মুখে কিছুতে দাঁড়াইতে দিবে না—দিলে, ইদার পক্ষে মর্য্যাদা রক্ষা করা দায় হইবেই ত,—জ্যাকও তাহাতে সবিশেষ ক্ষুব্ধ হইবে। সে দারুণ অপমান হয় ত বেচারা জ্যাক সহ্য করিতে পারিবে না! আর্জেন্ত টাকা লইয়া ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জ্যাককে মুক্ত করিয়া আনিবে,—ইদা ষ্টীমারে তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিবে! ইদা সহজেই সম্মত হইল।

সেদিন রবিবার! পথে ঘাটে অবসরের একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিরামের সুগভীর তৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। নদীবক্ষে ষ্টীমারে ও জাহাজে নাবিকের দল গান ধরিয়া দিয়াছিল,—তীর হইতে কুলি ও কারিকরদিগের হর্ষ উল্লাসের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ বহিয়া আসিতেছিল। আর্জেন্ত নামিয়া গেলে ষ্টীমারে বসিয়া ইদা শুধু তাহার জ্যাকের কথা ভাবিতেছিল! সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও জ্যাক তাহার পুত্র। এক দুঃসহ মুহূর্ত্তে জ্যাক পরম শান্তি বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহার তপ্ত প্রাণ স্নিগ্ধ সরল স্নেহে জুড়াইয়া দিয়াছে, জগতে তাহার একমাত্র আপনার, জগতে তাহার সর্ব্বস্ব সেই প্রাণাধিক পুত্র জ্যাক—ইদা কি তাহাকে কখনও ছাড়িতে পারে? না—ইহজগতের সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও সে জ্যাককে ত্যাগ করিবে না!

শৈশবে সেই মুখভরা হাসি, মাতার আদরে সেই পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—আজ ইদার মনে পরিষ্কার একটি চিত্রের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইদ্রে যাইবার সময় সেই কাতর নয়নের বাক্‌হীন বেদনা, কাঁটার মত আজ ইদার মর্ম্মে বিঁধিতেছিল! এই জ্যাককে নির্ম্মম হৃদয়ে সে বিদায় দিয়াছে! কারখানার কঠিন কাজে জ্যাকের স্বাস্থ্য না জানি কতই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! ডাক্তার রিভালের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে! কেন, সে জ্যাককে দুই

হাতে চাপিয়া বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিল না! কোন্ প্রাণে জ্যাককে সে মা হইয়া এখানে পাঠাইল! আজিকার কথা কি ইদা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল?

চারিদিককার এই অভদ্র আনন্দ উল্লাসে তাহার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিতেছিল! ইহারাই ত জ্যাকের কর্ম্মসঙ্গী—! ইহাদেরই সহিত জ্যাক আজ দুই বৎসর বাস করিতেছে! মনটাকে বিক্ষিপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইদা আর্জেন্তঁ-কথিত সমিতির ছাপানো বিবরণী-পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল, "বালক-সংশোধনী সমিতি। শাসন-আলয়। নির্জ্জন কারাবাস-ব্যবস্থায় দুষ্ট বালকগণকে শিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন নির্জ্জন ক্ষুদ্রগৃহে বন্দী রাখিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না—শোনা দূরের কথা। চূড়ান্ত আয়োজন! পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

আর্জেন্তঁ ইতিমধ্যে তীরে নামিয়া রুডিক-গৃহের খোঁজ করিয়া তাহার অভিমুখে চলিয়াছিল। আপনার ক্ষমতা দেখাইবার আজ তাহার দিব্য সুযোগ মিলিয়াছে! অপরাধীকে কিরূপ বক্তৃতার বাণীতে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ম্যানেজারের নিকট কি ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, পথেই তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল!

একজন বৃদ্ধা রমণী আর্জেন্তঁকে রুডিকের গৃহ দেখাইয়া দিল। তাহার নির্দ্দেশমত আর্জেন্তঁ আসিয়া যখন রুডিকগৃহের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সে শুনিল, ভিতরে গান চলিয়াছে! গান থামিলে কে ডাকিল, "আরে,

এ কি! জ্যাক তবে হাজতে নাই—এখানেই আছে! কবি বিস্মিত হইল।

দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কবি দেখিল, সম্মুখস্থ ছোট দালানে, মজলিস জমিয়া গিয়াছে। সাত আটজন বালিকার হাত ধরিয়া জ্যাক মহাস্ফূর্ত্তির সহিত নৃত্য করিতেছে—এবং অদূরে দেয়ালে পিঠ দিয়া টুলের উপর বসিয়া, এক দীর্ঘকায়া নারী! এ আনন্দ-উৎসবের অর্থ কি? ব্যাপার কি?

ব্যাপার, যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—

জ্যাকের মাতাকে যেদিন ম্যানেজার পত্র লিখিল, তাহার পরদিন মাদাম রুডিক, উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারের আফিসে ছুটিল। বাহিরের কোন বাধাবিদ্রূপে বিচলিত না হইয়া সে একেবারে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া একনিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মশায়, আমি জানি, বেচারা জ্যাক কোন দোষে দোষী নয়। এ চুরির কিছুই জানে না সে—! জেনেদার টাকা সে চুরি করে নি।"

ম্যানেজার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "কিন্তু এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে।"

"প্রমাণ? কোথায় প্রমাণ? আমার স্বামী সেদিন বাড়ী ছিলেন না, জ্যাক একা ছিল,—এ কি যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল? কিন্তু এই প্রমাণ আমি মিথ্যা বলে দেখাতে এসেছি। জ্যাকই একা সেদিন বাড়ী ছিল না—আর একজন লোকও ছিল—"

"হাঁ, নান্তেঁ!" ইদার স্বর এতটুকু কাঁপিল না। তাহার মুখে বিষাদের একটা গভীর ছায়া পড়িয়াছিল।

"নান্তেঁই এই টাকা চুরি করেছে?"

ক্লারিসার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে দ্বিধার একটা রেখা পড়িয়া মুহূর্ত্তেই সরিয়া গেল। অবিচলিত স্বরে সে কহিল, "না, নান্তেঁ চুরি করে নি! আমি তাকে এই টাকা স্বহস্তে চুরি করে দিয়েছি!"

"দুর্ভাগিনী নারী—"

"সত্যই দুর্ভাগিনী! সে বল্লে, দুদিনের মধ্যেই এ টাকা সে শোধ করে দেবে। আমি দুদিন অপেক্ষা করলেম—এ দুদিন আমার স্বামীর হতাশা, জেনেদার অশ্রু, নির্দ্দোষ বেচারা জ্যাকের লাঞ্ছনা সব দেখে সহ্য করেছি! কি,এ কষ্ট! কিন্তু নান্তেঁ কৈ এল না ত—কাল তাকে আমি চিঠি দিয়েছি, আজ ভোরের মধ্যে সে যদি টাকা দিয়ে না যায়, তা হলে সব কথা প্রকাশ করে দেব—! তবু সে এলনা—তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

"তাই তুমি এসেছ! কিন্তু আমি কি করতে পারি?"

"কি করতে পারেন? যথার্থ যে চোর, যথার্থ যে দোষী, তাকে ধরিয়ে দিন, নির্দ্দোষ যে, তাকে মুক্ত করে দিন!"

"কিন্তু তোমার স্বামী—বেচারা রুডিক, এ কথা শুনলে সে মরে যাবে—"

"সে বেশ হবে! আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব! আমার মত পাষাণীর মরাই উচিত! পৃথিবীর ভার যাবে!"

ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে কহিল, তোমার মৃত্যু হলেই যদি জেনেদার টাকা পাওয়া যেত ত, তোমার মৃত্যু আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতাম! কিন্তু এ আত্মহত্যায় তুমি নিজেই শুধু মুক্তি পাবে! ব্যাপার সমানই থাকবে! বরং আরও ভীষণ হয়ে উঠবে।"

"তবে কি করব, বলুন?" উত্তেজনায় ক্লারিসা হাঁপাইতেছিল। তাহার মুখে চোখে কালির রেখা পড়িয়াছিল।

ম্যানেজার কহিল, "এ টাকার কিছু বোধ হয় এখনো হাতে পড়ে আছে—সেটা প্রথমতঃ উদ্ধার করতে হবে! সব, বোধ হয়, একেবারে খরচ হয়ে যায় নি?"

ক্লারিসা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। এই দুর্দ্দমনীয় জুয়াখেলার নেশা নান্তেঁকে কেমন ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছিল, ক্লারিসা তাহা ভালই জানিত।

ম্যানেজার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইল, সে আসিলে, তাহাকে বলিল, "এখনই সেণ্ট-নাজারে দু-চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে যাও। নান্তেঁকে বলবে, এখনই যেন সে আমার কাছে আসে। তাকে না নিয়ে তোমরা ফিরবে না।"

কর্ম্মচারী কহিল, "নান্তেঁ ত ইদ্রেঁতেই আছে। এইমাত্র তাকে রুডিকের বাড়ীর কাছে দেখে আসছি, আমি—"

"বেশ, তবে শীঘ্র যাও। মাদাম রুডিক যে এখানে আছে, সে কথা তাকে বলোনা—! সাবধান—সে যেন কোনরকম সন্দেহ না করতে পারে—যাও।"

কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে ম্যানেজার শূন্য মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্লারিসা স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে কারখানায় তখন কাজ চলিয়াছে। বাষ্পনির্গমনের

শব্দে কখনও মিনতি, কখনও অনুযোগের সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে,—লোহাপেটার ঢুমঢাম ভীষণ শব্দে চারিধার মুখরিত! কিন্তু ক্লারিসার অন্তরে আজ যে নানা ভাবের সংগ্রাম-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহার নিকট বাহিরের কোলাহল ত কিছুই নহে!

দ্বার খুলিয়া নাস্তেঁ ভিতরে প্রবেশ করিল! কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সে কহিল, "আমায় ডেকেছেন, আপনি?"

সহসা পার্শ্বস্থিতা ক্লারিসার পানে নাস্তেঁর দৃষ্টি পড়িল! ক্লারিসার বিষণ্ন ম্লান মুখ, ম্যানেজারের রুক্ষ দৃষ্টি—ব্যাপার বুঝিতে নাস্তেঁর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

ক্লারিসা আপনার কথা রাখিয়াছে তবে,—ম্যানেজারের নিকট সকলই প্রকাশ করিয়াছে, সে!

নিমেষের জন্য নাস্তেঁর শরীরে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল—একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, এই দুর্ব্বল নারীটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, ম্যানেজারকে তাহাব অনধিকার-চর্চ্চার সমুচিত শাস্তি দিয়া, সে পলাইয়া যাইবে—কিন্তু ক্লারিসার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের পানে আর একবার চাহিতেই চকিতে সে প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। অনুতাপে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমার ক্ষমা করুন।" নাস্তেঁ চোখের জল রোধ করিতে পারিল না।

ম্যানেজার কহিল, "কান্না, ক্ষমা,—ও সব রেখে দাও, নাস্তেঁ! কাজের কথা কও। এই নারী, শুধু তোমার জন্য, তোমার অনুরোধে, আপনার স্বামী কন্যার সর্ব্বস্ব চুরি করেছে। তাদেনের মধ্যে তোমার এই টাকা দেবার কথা ছিল—"

কৃতজ্ঞতায় নাস্তেঁ অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ক্লারিসার পানে আর একবার চাহিল! তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিয়া ক্লারিসা আপনি এ চোরের অপবাদ বহন করিয়াছে! ক্লারিসা নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল—নাস্তেঁর প্রতি একবারও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সেই ভীষণ রাত্রে নাস্তেঁর সহিত সকল সম্পর্ক সে চুকাইয়া দিয়াছে! আর নূতন করিয়া বন্ধনের প্রয়োজন নাই! ম্যানেজার কহিল, "কৈ, সে টাকা?"

"এই যে, আমি এনেছি—"

যথার্থই নাস্তেঁ আজ অর্থ আনিয়াছিল! গৃহে ক্লারিসাকে না দেখিয়া সে তাহার সন্ধান করিতেছিল, এমন সময় ম্যানেজারের কর্ম্মচারী গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনে!

ম্যানেজার কহিল, "এতে পুরা সাড়ে তিন হাজার আছে?"

"না—চারশ টাকা কম—"

"বুঝেছি—এ টাকাটা আজ খেলবার জন্য রেখে দেছ!"

"না—যথার্থ না! এ টাকাটা হেরে গেছি। কিন্তু আমি শীঘ্রই তা দিয়ে দেব।"

"বেশ! আপাততঃ আমি না হয় এ টাকা পুরিয়ে দিচ্ছি—তুমি এ চারশ' টাকা আমায় দিও। বেচারী জেনেদার বিয়ের আর বিলম্ব নাই—তোমার অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। যাই হোক, রুডিককে জানানো চাই, এ টাকা কেমন করে চুরি গেছে! এখানে বস, বসে তুমি সংক্ষেপে আগাগোড়া সব লিখে দাও—"

কি লিখাইয়া লইবে, ম্যানেজার তাহাই ভাবিতেছিল। নান্তেঁ বসিয়া কলম ধরিল। ক্লারিসা একবার মাথা তুলিল! সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! কি পত্র লিখাইয়া লইবে! এ পত্রের উপর তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে!

ম্যানেজার কহিল, "নাও, লেখো— ম্যানেজার মশায়, রুডিকের আলমারি হতে জেনেদার যৌতুকের টাকা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা যে চুরি গেছে—সে টাকা আমি চুরি করেছি। অন্য লোককে দোষী করবেন না।"

নান্তেঁ একবার আপত্তি করিল, কিন্তু ক্লারিসাকে তাহার ভয় ছিল—উপায়ান্তরও নাই। কাজেই সে ম্যানেজারের কথামত লিখিতে লাগিল,—

"এ টাকা আমি ফেরত দিলাম! রাখিতে পারিলাম না। এ টাকা আমার সর্ব্বশরীরে দাহের সঞ্চার করিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত শান্তি পাইতেছি না। যে নিরীহ, নির্দ্দোষ বেচারা-দিগের উপর, এই চুরির জন্য, নির্য্যাতন চলিতেছে, তাহাদিগকে এই দণ্ডে মুক্তি দিন। তাহারা কিছুই জানে না। রুডিককে বলিবেন, তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি কারখানা পরিত্যাগ করিলাম। লজ্জায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। যদি কখনও চরিত্র সংশোধন করিতে পারি, ঐকান্তিক পরিশ্রম করিয়া যদি কখনও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, তবেই আবার ফিরিয়া সাধুচরিত্র রুডিকের সাক্ষাৎ করিব—ইদ্রেঁতে মুখ দেখাইব, নহিলে চিরবিদায়!—"

লেখা হইলে ম্যানেজার কহিল, "নাও সহি কর! নাও—"

বিনাবাক্যে নান্তেঁ পত্রের তলদেশে নাম স্বাক্ষর করিল। ম্যানেজার কহিল, "এখন তুমি যেতে পার! গিরুনিতে যেতে পার—সেখানে আমি তোমার কাজের জোগাড় করে দিতে পারি! মানুষ হবার চেষ্টা কর। আর মনে রেখো, নান্তেঁ, ইদ্রেঁতে যদি আর কখনো তোমায় কেউ দেখে, তবে সেই মুহূর্ত্তে চোর বলে তোমায় ধরিতে দেব! তোমার এই চিঠিই তোমার অপরাধের সাক্ষ্য দেবে!"

নান্তেঁ চলিয়া গেল। ম্যানেজার কহিল, "ঘরে যাও, মাদাম রুডিক। তোমার স্বামীর জন্যই শুধু এ কাজ করলুম আমি—সত্য কথা জানতে পারলে বেচারার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগবে—"

"সে আঘাত না লাগুক। আমি আমার স্বামীকে এবার সমস্ত বেদনার হাত থেকে মুক্তি দেব, স্থির করেছি—"

"তার মানে?"

"এ প্রাণ ত্যাগ করব। জীবনটাকে নানাভাবে জড়িয়ে ফেলেছি—এ বন্ধন অসহ্য হয়ে উঠেছে—সমস্ত বন্ধন কেটে তাকে মুক্ত করে দিতে চাই, এখন, আমি।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার একটা দারুণ আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। আশ্বাসের স্বরে ম্যানেজার কহিল, "মাদাম রুডিক, মনে সাহস আনো। এ চিঠি রুডিকের হাতে পড়লে তার মনে কতখানি কষ্ট হবে, ভাব দেখি! তার উপর তুমি আত্মহত্যা কর যদি ত, সে আঘাতের বেদনা রুডিকের প্রাণে কতখানি বাজবে—তা

ভাবছ কি? তাকে শান্তিতে জীবনের এ কটা দিন থাকতে দাও—আর অভিভূত করে তুলোনা। যা হয়ে গেছে, তার চারা নাই—ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো করে গড়ে তুলতে পারো, তার চেষ্টা কর। সকলকে সুখে রাখবার চেষ্টা কর—নিজেও সুখ পাবে, শান্তি মিলবে।"

"আপনার কথা রাখবার চেষ্টা পাব" বলিয়া মাদাম রুডিক ধীরে ধীরে বিদায়গ্রহণ করিল।

রুডিক এ পত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল! নান্তে চুরি করিয়াছিল! সে চোর—অথচ তাহার পত্নী ক্লারিসা এই নান্তেঁকে এত ভালবাসে! যৌতুকের অর্থ ফিরিয়া পাইয়া অত্যধিক আনন্দে জেনেদা সকল কষ্ট ভুলিয়া গেল।

আর জ্যাক! বেচারা জ্যাক! তাহার জয়ধ্বনিতে রুডিকগৃহ আজ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ম্যানেজার স্বহস্তে জ্যাকের নির্দোষিতার বিবরণী লিখিয়া কারখানার সর্বত্র সকলের নিকট পড়াইয়া শুনাইল। অন্যায় লাঞ্ছনার জন্য জ্যাককে ডাকিয়া ম্যানেজার তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। আর রুডিকগৃহের ক্ষমা ও আদরের আতিশয্যে জ্যাক অভিভূত হইয়া পড়িল।

বেলিসার মুক্তি পাইয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

জ্যাকের জন্যই বিশেষ করিয়া আজ রুডিকগৃহে নাচের আসর বসিয়াছিল। রুডিক সহস্রবার ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া কবিকে সকল কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল। কয়েকটা প্রমাণ নিতান্তই জ্যাকের বিরুদ্ধে ছিল—নহিলে মনের মধ্যে একবারও সে জ্যাককে অপরাধী ভাবিতে পারে নাই!

তথাপি আর্জেন্তঁ শাসনের গম্ভীর বাণীতে জ্যাককে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাছা বাছা কথা দিয়া সে যে বক্তৃতা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অব্যবহার হইতেই পারে না। কাজেই আর্জেন্তঁকে কিছুতে নিরস্ত করা গেল না। রুডিক বারবার বলিতে লাগিল, "ওকে বলবার কিছু নাই—আমরা বারবার ক্ষমা চাইলেও আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।" কিন্তু আর্জেন্তঁর মুখে তখন ভাব ও ভাষার বাণ ডাকিয়াছে, তাহাকে রোধ করে, কাহার সাধ্য!

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার একটা ছত্রও জ্যাকের হৃদয়ঙ্গম হইল না—শুধু সে এইটুকু বুঝিল, তাহার মুক্তির জন্যই কবি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে অর্থও আনিয়াছে! এ অর্থ কে দিল, আর্জেন্তঁ তাহা ভাঙ্গে নাই। জ্যাক ভাবিল, আপনার অর্থ দিয়া আর্জেন্তঁ তাহার মুক্তি ক্রয় করিতে আসিয়াছে! এমন হৃদয়বান লোককে সে বরাবর সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল! সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় আজ আর্জেন্তঁর পায় জ্যাকের মন লুটাইয়া পড়িল! আর্জেন্তঁ এত মহৎ!

দুষ্ট ঘোড়াকে বশীভূত করিতে পারিলে অশ্বারোহীর যেরূপ আনন্দ হয়, জ্যাকের এই ভাব দেখিয়া আর্জেন্তঁরও ঠিক ততখানি আনন্দ হইল। সে ভাবিল, "এবার আমি ছোকরাকে বশ করেছি।"

পরে উভয়ে পথে বাহির হইল। মার সংবাদ পাইয়া জ্যাকের প্রাণে আজ আনন্দ ধরিতেছিল না। আর্জেন্তঁর প্রতি তাহার

বিশ্বাস আজ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, জ্যাক কহিল, "কারখানার কাজ আমার মোটে ভাল লাগে না! কারিকর হতে পারব না, আমি! এই নির্জ্জনতার মধ্যে থেকে কারুকে না দেখে, মাকে না দেখে, আমার কেমন মন ভার হয়ে থাকে, কাজ করতে ভাল লাগে না! কাজ যে খুব শক্ত তা নয়, তবে যাতে মাথা খাটানো যায়, এমন কাজই আমার পছন্দ—এখানে যা কাজ, সব গায়ের জোরের নিতান্ত কলের কাজ মাথা খেলাতে হয় না, মোটে—এতে তৃপ্তি পাওয়া যায় না—"

গভীর বিশ্বাসে জ্যাক আর্জেন্তঁর হাতখানা আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। আর্জেন্তঁ হাত টানিয়া লইল, সে ভাবিতেছিল, ইদা এখানে আসিয়াছে, এ সংবাদ সে জ্যাককে দিবে কি না! মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ—? না, কিছুতেই না—আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইদা জ্যাককে বুকে চাপিয়া ধরিবে! জগতে জ্যাক ছাড়া ইদা কাহাকেও তেমন আন্তরিক ভাবে চাহে না—! সাক্ষাৎ হইলে আর্জেন্তঁর কথা ইদা একবারও মনে করিবে না—জ্যাককে লইয়াই অস্থির হইয়া পড়িবে! এ আনন্দ, আর্জেন্তঁর প্রাণে সহ্য হইবে না। ঈর্ষায় তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, ইদার সহিত জ্যাকের সাক্ষাৎ ঘটিতে দেওয়া বুদ্ধির কাজ হইবে না!

জ্যাকের কথার উত্তরে আর্জেন্তঁ কহিল, "তোমার এ কথা শুনলে, তোমার মার প্রাণে বড় কষ্ট হবে। তাঁর বড় সাধ, তুমি কারিকর হও। যেমন করে পার, যত কষ্টই হোক—তোমার কারিকর হওয়া চাই-ই! তোমায় কতবার বলেছি, জ্যাক—'এ জীবন নহেক স্বপন'—কথাটা চিরদিন মনে রেখো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনো কষ্ট পাবে না।"

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। হতভাগ্য জ্যাকের প্রাণ মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে জানিল না—আর কয়েকপদ দূরেই তাহার মাতা একান্ত উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তাহারই মুখখানি দেখিবার জন্য অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে! হায়, যদি ইঙ্গিতেও সে এ কথা জানিতে পারিত!

ষ্টীমারে প্রতীক্ষা করা অসহ্য হইয়া উঠায়, ইদা তীরে নামিয়া ব্যাকুলভাবে জ্যাকের পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল! আজ দুই বৎসর পরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! এমন সময় আর্জেন্তঁ ফিরিয়া আসিল! ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাক?"

আর্জেন্তঁ কহিল, "কোন ভাবনা নাই। সে মুক্তি পেয়েছে—লজ্জায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে না—আমি এত বললুম! কোথায় সে ছুটে পালিয়ে গেল! তারপর আমিও ভাবলুম—তোমার সঙ্গে দেখা হলে মন খারাপ হতে পারে, কাজে মন বসতে আবার কিছুদিন লাগবে—এখন দেখা করতে চাচ্চে না, তা থাক, কাজেই পীড়াপীড়ি করলুম না, সন্ধানও আর করলুম না—"

ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। একটা অসহ্য বেদনায় তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিল, কাজেই মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

আজ এত নিকটে আসিয়া—দীর্ঘ

দুই বৎসর পরেও, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল না! এত নিকটে, যে একবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনা যায়! কে জানে, কবে দেখা হইবে! মাতার অতৃপ্ত হৃদয়ের কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জাপানের আইনো-জাতি

আইনোগণ জাপানের প্রাচীন অসভ্য জাতি। পুরাকালে জাপান দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই ইহাদের বসবাস ছিল। এক্ষণে জাপানে অসভ্য আইনো নিতান্ত বিরল। নবসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাপানীর সহিত ইহারাও উন্নত হইয়া উঠিয়া স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইয়েজো (Yezo) দ্বীপের উত্তর ভাগে মাত্র কতকগুলি প্রাচীন অসভ্য আইনোকে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ন্যায় ঘনদীর্ঘ কেশযুক্ত জাতি পৃথিবীর অপর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের প্রতি অঙ্গে কেশের ও রোমের এতই আধিক্য যে দেখিলে বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। তাহাদের দৈহিক গঠন বেশ দৃঢ় ও সবল, কেবল হাতের ও পায়ের কয়েকখানি অস্থি চ্যাপটা। ইয়ুরোপের দুই একটি লুপ্ত প্রায় পার্ব্বত্যজাতির মধ্যেও এইরূপ অস্থি-সংগঠন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই নম্র ও কোমল প্রকৃতি, কিন্তু ইহারা সকলেই ভয়ঙ্কর মদ্যাসক্ত।

ইহাদের কোন ইতিহাসই নাই। তাহাদের নিজেদের মধ্যেও, অতীত পুরুষের কোনও কাহিনী প্রচলিত নাই। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ এক কুক্কুর হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাহারা গর্ব্ব করে। ইহারা স্বভাবতঃ একটু অপ-
পরিচ্ছন্ন যে তাহাদের গৃহ ও দেহ কদর্য্য কীটে পরিপূর্ণ। তাহাদের ন্যায় অজ্ঞ জীব প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের ভাষার কোনও অক্ষর নাই, এবং সহস্রের অধিক কোনও সংখ্যা তাহারা কল্পনাই করিতে পারে না। পূর্ব্বে গাছের ছাল বা পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া তাহারা লজ্জা নিবারণ করিত। তাহারা আজিও ভল্লুক, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও জলকে পূজা করিয়া থাকে। ইয়েজো দ্বীপের আইনোজাতি প্রাচীন যুগে যে ভাবে থাকিত আজিও অনেকটা সেই ভাবেই আছে। কতকগুলা বিষয়ে তাহারা এতই মনোহর যে তাহাদিগকে একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না। তাহাদের মধুরকণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত একবার শুনিলে আর ভুলিবার নহে। তাহাদের সুন্দর চক্ষের স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং মৃদু হাস্যের অভিনব মাধুর্য্য নিতান্তই মনোহর।

হরিদ্রাবর্ণের চর্ম্মবিশিষ্ট, অশ্বের ন্যায় কঠিন কেশযুক্ত, ভ্রূহীন, দীর্ঘচক্ষু, বিরলপক্ষ্ম অনুন্নত নাসিকা, ক্ষুদ্রায়তন জাপানীর পার্শ্বে আইনোগণ দেখিতে নিতান্ত ভীমকায়। দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য সাধনে সক্ষম। কিন্তু যেই তাহারা কথা কহিতে যায়,

তাহাদের অধরপ্রান্তে এমন একটি রমণীসুলভ রমণীয় হাসি আসিয়া দেখা দেয় যে, তাহাদের সেই ভীমভাব কোমল মাধুর্য্যে পরিণত হইয়া দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করিয়া ফেলে।

ইহাদের রমণীরা নাকি দিনে একবার হাত ধুইয়াই পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাহারা অপর কোনও অঙ্গ ধৌত করা আবশ্যক মনে করে না। পরিচ্ছদ ধৌত করা যে একটা কর্ম্ম ইহা তাহাদের কল্পনার অতীত। ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত একই বস্ত্র দিবারাত্রি পরিধান করে। কিন্তু তাহাদের পার্ব্বত্য গ্রামগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন, কোথাও কোনও আবর্জ্জনা বা দুর্গন্ধ নাই।

ইহাদের সামাজিক প্রথা খুব সরল। পুরুষেরা ২১ বৎসরের পূর্ব্বে এবং স্ত্রীলোকেরা ১৭ বৎসরের পূর্ব্বে কদাচ বিবাহ করে না। পুরুষ বিবাহেচ্ছু হইলে একটি যুবতীকে মনোনীত করিয়া তাহাদের দলের প্রধানের অনুমতি গ্রহণ করে। তাহার অনুমতি পাইলে, হয় মধ্যস্থের দ্বারা না হয় নিজেই যুবতীর পিতার নিকটে প্রস্তাব করে। পিতা সম্মত হইলে ভাবী জামাতা তাহাকে একটি কোনও দ্রব্য উপহার প্রদান করে। ইহা হইলে পাকা কথা হইয়া গেল,



আইনু পুরুষ

তাহার পরে সকলে মিলিয়া প্রচুর মদ্য পানে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। কেবল দলের প্রধান ব্যক্তি তিনটি পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেককে একটি পৃথক বাটীতে রাখিতে হয়। পত্নী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় দারগ্রহণের বিধি আছে বটে, কিন্তু তাহাও বড় অধিক প্রচলিত নাই। পুরুষেরা বলে, একটি পত্নীই ভাল, কারণ দুইটি পত্নীর কলহ সহ্য করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য।

আইনোদিগকে প্রধানতঃ ভল্লুকের উপাসক বলা যাইতে পারে। কিন্তু উপাস্য দেবতাকে আবশ্যক বোধে বধ করিতে তাহারা কোনও সঙ্কোচ বোধ করে না ইহাই আশ্চর্য্য। তাহারা ভল্লুক শীকার করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ ও চর্ম্ম বিক্রয় করে; ইহারা স্বভাবতঃ নম্র ও ধীর হইলেও অত্যধিক সাহস ও হিংস্রতার পক্ষপাতী। সেইজন্যই বোধ হয় ইহারা ভল্লুককে পূজা করে। ভল্লুকোৎসবই ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রতিফল

(জাপানি কবিতা)

যে আমারে ভালোবাসে,
তারে আমি বাসিনাক,
রাখি তারে সদা দূরে দূরে!

তারই প্রতিফলে হায়,
তারে কভু পাইনাক,
যার তরে কেঁদে মরি ঘুরে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পুরী-মাহাত্ম্য

আমি দেখিতেছি রেল-কোম্পানী রেখার চারিদিক মাকড়ার জালের মত যতই ছাইয়া ফেলিতেছে ততই আমাদের দেশভ্রমণ ও সেই সঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার বাতিকটা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে;—এটাতে রেল-কোম্পানীর লাভ এবং পরম লাভ দেশীয় মাসিক পত্রগুলির। সেকালে রেল না থাকায় লোকে হাঁটা পথে বাহির হইত এবং তার মধ্যে পনের আনা লোক ঘরে ফিরিত না। সুতরাং "কুড়িগ্রামের ইতিহাস" "পুরীতত্ত্ব" "দার্জ্জিলিঙের পত্র" এবং "কাশ্মীরে তিন রাত্রি" প্রভৃতি সুললিত প্রবন্ধ লিখিবার সুযোগ সেকালে ঘটিত না। দুই চারি জন যাহারা বাঘ, ভাল্লুক, ঠগী ও বোম্বেটের কবল এড়াইত তাহারাই কেবল "পুরী-মাহাত্ম্য" "ক্ষেত্রতত্ত্ব" "ব্রজপরিক্রমা" এমনি দু চার খানা গ্রন্থ লিখিয়া ক্ষান্ত হইত। যখন গরুর ল্যাজ ধরিয়া বৈতরণী পার হইয়া পুরী আসিতে হইত তখন পুরীর "মাহাত্ম্য" লেখাই প্রচলিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু এখন—একরাত্রে পুরী এবং পুরীতে তিনঘণ্টা—ইহাই প্রথা;—যদিও এই চারিবার দুই মাস করিয়া আট মাস

আমি শ্রীধামে বাস করিলাম এবং ইচ্ছা করিলে আমি পুরীর প্রত্নতত্ত্ব ও কিষ্কিন্ধ্যার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ দুপাতা লিখিয়া ফেলিতে পারি।

সকল স্থানে যেমন এখানেও তেমনি প্রধান ব্যক্তি হচ্চেন—ষ্টেশনমাষ্টার, টিকিট-বাবু, কমিশনর সাহেবের ঘোড়ার সহিস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশী, হোটেলের বাবুর্চ্চি ও জগন্নাথের পাণ্ডা!

পুরীর দক্ষিণ দিকটায় লবণ-সমুদ্র, বালি, মনসা এবং ঝাউগাছ; উত্তরদিকটায় অর্থাৎ যে দিকটায় উড়ে বেহারা ও পাণ্ডাদের বাস সে দিকটায় দুই চারিটা ফল ফুলুরির বাগান দেখা যায়। এখানে ফলের মধ্যে অতি দুর্ম্মূল্য ফল হচ্ছে 'সুফল' এবং সেটা জগন্নাথের পাণ্ডারাই এক-চেটে করিয়াছে।

এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়—বাতাস, বালি, রম্ভা, গলগণ্ড এবং ক্ষুধা; বিনা পয়সায় পাওয়া যায় ইমারত গাঁথিবার বালি, চূণ প্রস্তুত করিবার ঝিনুক, ছোট কাঁকড়া ও সুনিদ্রা; সস্তায় পাওয়া যায় কট্‌কী জুতা। আমোদ প্রমোদের মধ্যে সমুদ্রস্নান, বালিতে আছাড় এবং জগন্নাথের ছড়িবরদারের ছড়ি।

এখান হইতে, দেখিলাম, জাহাজ বোঝাই হইয়া চাল রপ্তানি হইতেছে এবং রেল-বোঝাই হইয়া রোগী আমদানি হইতেছে।

উড়ে ছাড়া জীবজন্তু এখানে বড় দেখা যায় না;—কেবল গ্রীষ্মকালে সমুদ্রীয় গলপক্ষী, শীতে দলে দলে বার-এট্‌-ল এবং মাঝে মাঝে দুই চারিটা উড়ন্ত মাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এদেশে সমুদ্রতীরে কেহ গোয়াল বাঁধিয়া গরু রাখে না,—তিন চার ক্রোশ দূর হইতে দুধ আনিতে হয়। লোকে বলে সমুদ্রের ধারে গরু আনিলে তাহার দুধ জমিয়া দই হইয়া এত গাঢ় হইয়া যায় যে গোদোহন অসম্ভব হইয়া হইয়া পড়ে—একথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। স্থানের গুণে এখানে ক্ষুধাটা জন্মায় প্রচুর কিন্তু খাদ্য জন্মায় অল্প।

এখানকার লোকে প্রচুর হরিদ্রা ও তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে, ফলে খাদ্যাভাবে ইহাদের গায়ে মাস না লাগিয়া পায়ে লাগিতেছে। গজপতি গতি এখানে সচরাচর দেখা যায়।

পাল্কি বহা ছাড়া স্ত্রীলোকেরাই এখানে কাজকর্ম্ম করে আর পুরুষেরা ঘরে বসিয়া পায়ে তেল দেয়—সুখের মধ্যে ইহাই দেখি।

মোট কথা পুরীটা চার হাজার বৎসর আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। নূতন বন্দোবস্তে ছোটলাটের এখানে যদি গ্রীষ্মাবাস স্থাপিত হয় তবে বোধ হয় কিছু improve করিতে পারে। কলের জল তো আসিবেই তা ছাড়া গ্যাসলাইট, ইংরাজি বাদ্য এবং দুই একটা রাজা বাহাদুর আসাও সম্ভব। দু একখানা মোটর গাড়ি ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে, বাড়ি ভাড়াও চড়িতে সুরু হইয়াছে এবং বাংলা দেশ হইতে একদল থিয়েটার পার্টি আসিয়া 'মেঘনাদের' রিহার্সেল দিতেছে।

এ বৎসর জগন্নাথের নূতন কলেবর হইবে শুনিতেছি—পুরীটারও নূতন সংস্কার হইবে এরূপ লক্ষণ দেখিতেছি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উইলিয়াম ষ্টেড্

টিটানিকের অন্যান্য শত শত ব্যক্তির সহিত সুপ্রসিদ্ধ "রিভিউ অফ্ রিভিউজ" পত্রিকার সম্পাদক, বিশ্বহিতৈষী, উদারচেতা, মহামতি ষ্টেড্ও জলমগ্ন হইয়াছেন! যাঁহার সমগ্র-জীবন বিশ্বমানবের সহিত একাত্মবোধের কঠোর সাধনায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তিনি আজ বিশ্বের সহিত যোগ রক্ষা করিয়াই বিশ্ববেষ্টনী সমুদ্রের অতল রত্নগর্ভে মহানিদ্রায় নিদ্রিত। এই মহাত্মার শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে ইংলণ্ড চিরদিনের মত তাহার যথার্থ স্বাধীনচেতা স্বদেশবৎসল সন্তান, ভারতবর্ষ তাহার অকৃত্রিম হিতৈষী সুহৃদ ও সমগ্র সভ্যজগৎ অন্যায় ও অত্যাচারের পরম শত্রু,—মূর্ত্তিমান ন্যায়, দরিদ্র ও বিপন্নের বন্ধু, স্বাধীনতা ও শান্তির চির-উপাসক হারাইল। আজ সংক্ষেপে মানবের এই হিতৈষী সুহৃদ, জ্ঞানগৌরবদৃপ্ত পুরুষ-সিংহের পরিচয় দিব।

উইলিয়াম টমাস্ ষ্টেড ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য দরিদ্র ধর্ম্মযাজক হইলেও অতি উদারচেতা ও ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ষ্টেডের জীবনেও তাঁহার পিতার এই সমুদয় গুণ বহুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় ষ্টেডের শিক্ষা গ্রাম্যবিদ্যালয়েই সমাপ্ত হয়; এবং এই অসচ্ছলতার জন্য ষোড়শ বৎসর বয়সের সময়ই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কোন এক সওদাগরের ব্যবসায়ে কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি অবসরকালে নানাবিষয়ে কঠোর অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন। উত্তরকালে যে লেখনী সমগ্র য়ুরোপে তীব্র জ্বালাময়ী ভাষার জন্মদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ষ্টেড সেই লেখনী এই সময়েই প্রথম ধারণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার তৎকালীনলিখিত কয়েকখানি পত্র কোন এক সংবাদপত্র সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি ষ্টেডকে তাঁহার পত্রিকায় লেখক রূপে নিযুক্ত করেন। তখন ষ্টেডের বয়স আঠারো মাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টেড এই পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে ষ্টেডের সম্পাদকজীবনের আরম্ভ হইল। কিছুদিন অতি যোগ্যতার সহিত এই পত্রিকা সম্পাদনের পরই ইংলণ্ডের সংবাদ-পত্র মহলে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডের উদার-নৈতিক সম্প্রদায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জন্ মর্লীর (বর্ত্তমান ভাইকাউণ্ট মর্লী) সম্পাদকতায় সুবিখ্যাত "পেল্‌মেল্ গেজেট" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পরেই এই নবপ্রকাশিত পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন হওয়ায় মর্লী তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর পরামর্শানুসারে ষ্টেডকে ঐ পদগ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। অনতিকাল পরেই মর্লী পার্লামেণ্ট মহাসভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় ষ্টেড পেলমেল গেজেটের

সম্পাদক পদে বরিত হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণে আপনার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতঃ যাহা সত্য ও ন্যায় নির্ভীক অন্তঃকরণে তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি লোকমত বা জনপ্রিয়তার অপেক্ষা রাখিতেন না; স্বয়ং লোকমত নিয়ন্ত্রিত করিতেন, লোকমতের সৃষ্টি করিতেন। এইরূপে ষ্টেডের নাম শীঘ্রই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ধনী, দরিদ্র ইংলণ্ডের আপামর সাধারণ বুঝিলেন দেশে এক আশ্চর্য্য শক্তি-সম্পন্ন, অদ্বিতীয় মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে। মহাপ্রাণ গ্ল্যাডষ্টোন, মনস্বী কার্লাইল প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ষ্টেডের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অজস্র প্রশংসাবাদে ভূষিত করিলেন। সমগ্র দেশ তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ হইয়া পড়িল।

কয়েকবৎসর এইরূপ সুদক্ষতার সহিত "পেলমেল গ্যাজেট" সম্পাদন করিবার পর ষ্টেড স্বয়ং এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানাকারণে, -বিশেষতঃ অর্থাভাব-বশতঃ এ পত্রিকা অধিকদিন চলিল না। পরে ইহারি উদ্যোগে "টিট্‌বিট্‌স" (Tit Bits) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে পত্রিকা পরিচালন সম্বন্ধে অন্যান্য পরিচালকগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় তাঁহাকে এই পত্রিকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ষ্টেডের জগদ্বিখ্যাত "রিভিউ অফ্ রিভিউজ" পত্র প্রকাশিত হইয়া অতি অল্পদিনেই য়ুরোপীয় মাসিকপত্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লইল।

মাসিকপত্র জগতে "রিভিউ অফ রিভিউজ" এক অভিনব ও বিচিত্র সৃষ্টি। সরল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় ন্যায় ধর্ম্ম সত্য ও স্বাধীনতার প্রচারক বলিয়া উক্ত পত্র জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিল। "রিভিউ অফ রিভিউজ" সভ্যজগতে প্রধান প্রধান সমুদয় মাসিকের মর্ম্ম, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক তথা, পৃথিবীর যাবতীয় সুবিখ্যাত জীবিত ব্যক্তিদিগের জীবনী, সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি জ্ঞাতব্য ও মনোরম বিষয় সংক্ষেপে ও সুলভে সকলের নিকট আনিয়া দিল। য়ুরোপে, ষ্টেডের সংবাদপত্র পরিচালন প্রণালী "New Journalism" আখ্যায় অভিহিত হইল! দেখিতে দেখিতে "রিভিউ অফ রিভিউজের" প্রভাব সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, লক্ষ লক্ষ লোক ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইল, দেশে বিদেশে ষ্টেডের নাম "ঘরের কথায়" পরিণত হইল। কয়েকবৎসরের মধ্যে ইহার আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

উক্ত মাসিকপত্র প্রকাশ করিবার কিছুদিন পরেই ষ্টেড এক মহা সামাজিক সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। অসহায়া, অল্পবয়স্কা, অবলা ইংরাজ কুমারীকুলকে মহানগরী লণ্ডনের অসংখ্য পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ষ্টেডের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং লণ্ডনের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া এই সমুদয় অরক্ষিতা কুমারীগণের নৈতিক ও দৈহিক দুরবস্থার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার "রিভিয়ুতে" তাহার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন সঞ্চার হইল। প্রতিভাশালী ষ্টেডের অদ্বিতীয়

ওজস্বিনীভাষায় ইংরাজ কুমারীগণের শোচনীয় অবস্থা সমাজের সমুদয় স্তরের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু রুচিবাগীশগণ 'রিভুয়ে' প্রকাশিত এই সমুদয় বাস্তব বৃত্তান্ত পড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"কুৎসিৎ, কুরুচিপূর্ণ এরূপ পত্রিকা ভদ্র পরিবারে আসিবার উপযুক্ত নয়।" বহু পরিবারে "রিভিয়ুর" প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু ষ্টেড ইহাতে ভীত বা নিরাশ হইয়া তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে বিপন্নউদ্ধার ব্রতে নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিলেন; ইংলণ্ডে বিপুল আন্দোলনের তরঙ্গ বহিতে লাগিল; কিন্তু শীঘ্রই ষ্টেডকে এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। লণ্ডনের এক দরিদ্র-পল্লীর পাপপথে পরিচালন প্রয়াসী কোন পিতামাতার হস্ত হইতে তাহাদের এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরী কন্যাকে অপহরণ করিয়া গোপনে রাখিবার অপরাধে তাঁহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হইল। নাবালিকা কন্যাকে পিতামাতার অভিভাবকতা হইতে অপহৃত করিবার অপরাধে আইনানুসারে তাঁহার প্রতি দুই মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইল। আইনের চক্ষে ষ্টেড্ দণ্ডনীয় হইলেও নীতির দিক হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন। সমাজের শুচিতা রক্ষার জন্য ষ্টেডের এই আত্মোৎসর্গ বিফল হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই পার্লামেণ্ট মহাসভায় এসম্বন্ধে এক ব্যবস্থা-বিধি প্রণয়ন হইয়া ষ্টেডের মস্তকে অক্ষয় কীর্ত্তিকিরীট পরাইয়া দিল।

ষ্টেডের চরিত্রে পুরুষের কঠোরতা ও নারীর মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছিল। কোন প্রকার গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁহার মহৎ হৃদয়ে স্থান পাইত না। রুষিয়ার সম্রাট তৃতীয় আলেকজেণ্ডার দ্বিতীয় নিকোলাস, পরলোকগত ইংলণ্ডাধীশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড প্রভৃতি য়ুরোপের রাজন্যবর্গ হইতে ইংলণ্ডের অতি দীনদরিদ্র ব্যক্তিও ষ্টেডের বন্ধুত্বগর্ব্বে আপনাদিগকে গর্ব্বিত বোধ করিতেন।

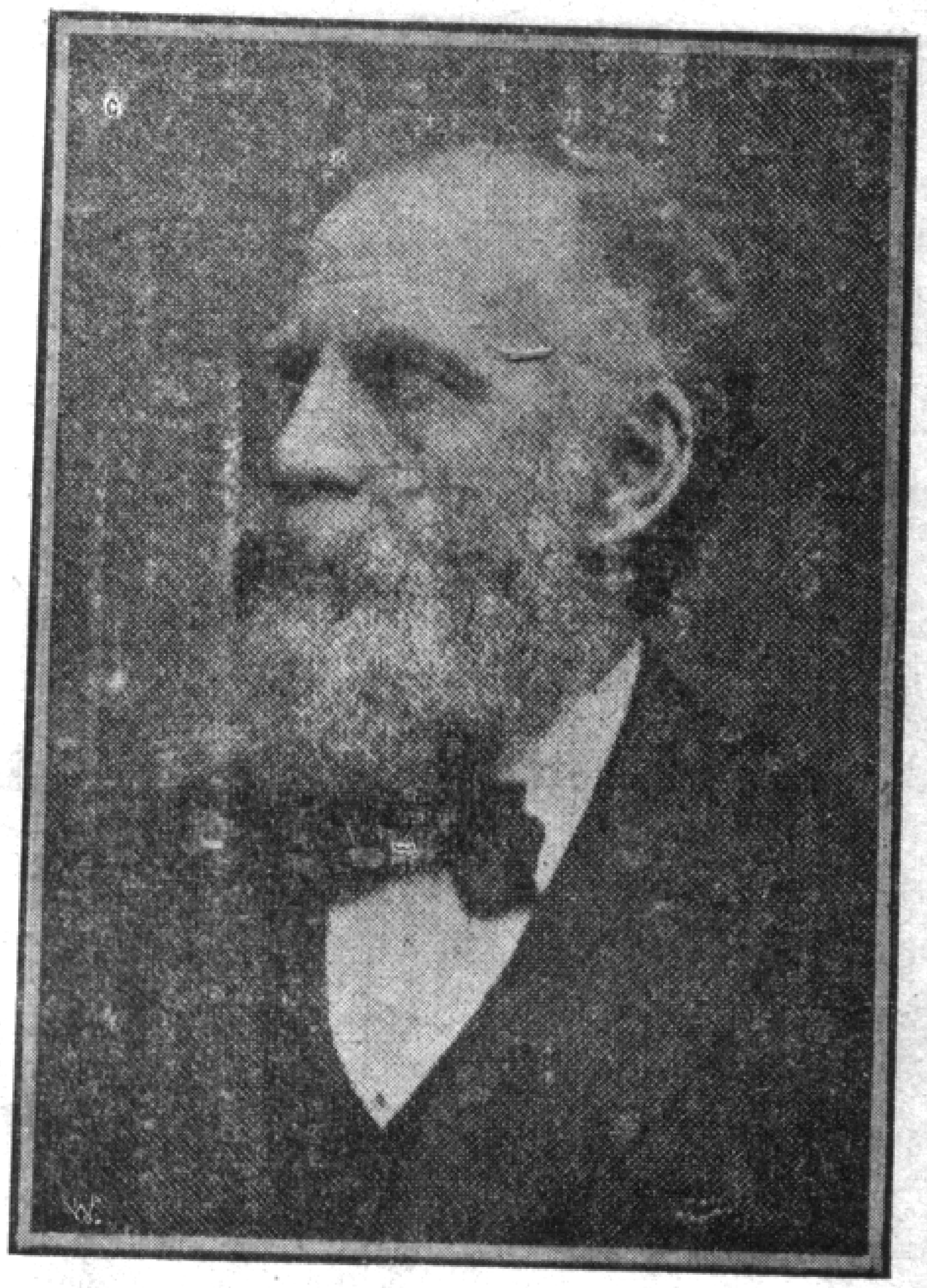
জগতে যেখানে অধর্ম্ম ও অত্যাচার, অন্যায় ও অসাম্য ষ্টেড সেখানেই ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন। কপট রাজনীতিক বা বাক্যবণিক স্বদেশহিতৈষীর বিদ্রূপ ভ্রূকুটিতে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইতেন না। পররাষ্ট্রলোলুপ ইংরাজ যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সুবর্ণ ও হীরকখনির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া স্বদেশপ্রাণ বোয়ারগণের সহিত অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তখন ষ্টেড্ রাষ্ট্রীয় গৌরবের প্রতি দৃকপাত না করিয়া স্বদেশবাসীগণকে নীতি ও ধর্ম্মের পথে পরিচালনা করিতে প্রাণপণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এ প্রয়াস নিষ্ফল হইয়াছিল। নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে কেবল লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। বোয়ারযুদ্ধের প্রতিবাদ ষ্টেডের জলন্ত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজসাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বোয়ারযুদ্ধের প্রধান নায়ক বিখ্যাত সেসিল রোড্স্ ষ্টেডের অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার উইলে দেড়-কোটিটাকা মূল্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু বোয়ারযুদ্ধের সূত্রপাতে ষ্টেডের তীব্র প্রতিবাদে সেসিল

অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, এই যুদ্ধের প্রতিকূলাচরণ করিলে তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। রোডস্ মনে করিয়াছিলেন যে ষ্টেড এই ভয়প্রদর্শনে যুদ্ধের প্রতিবাদ হইতে নিরস্ত হইবেন। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন; রোডস্ জানিতেন না যে সত্য ও ন্যায়ের উপাসক ষ্টেড তুচ্ছ অর্থের প্রলোভনে ধর্ম্মের পথ হইতে বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি অম্লানচিত্তে সম্পত্তির প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া অদম্য-উৎসাহে এই অন্যায়যুদ্ধের দৃঢ় প্রতিবাদে অটল হইলেন।

ভারতবর্ষের প্রতি ষ্টেডের অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহার "রিভিয়ুর" ছত্রে ছত্রে প্রকাশমান দেখিতাম। এ অনুরাগ করুণা নহে, বিজেতার কৃপাকটাক্ষ-মিশ্রিত অনুকম্পা নহে। এ অনুরাগ ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূত। ভারতের অনাড়ম্বর সভ্যতা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মপ্রাণ ষ্টেডের চিত্তকে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ষ্টেড জানিতেন যে, ভারতবর্ষ একদিন তাহার পূর্ব্বগৌরবস্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর সভ্য জাতির সহিত একাসনে বসিবে। ভারতের মঙ্গলের জন্য ষ্টেড বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং সে জন্য বহু লাঞ্ছনাও সহ্য করিয়াছেন,—তথাপি ক্ষান্ত হন নাই। যখন লর্ড কর্জ্জনের আদেশে সমগ্র বাঙালীজাতির তীব্র প্রতিবাদ ও সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবিভাগ করা হইল তখন মর্ম্মপীড়িত বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ষ্টেডও তাহার সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বাঙালীর উদ্বোধনে ও উদ্দীপনায় যখন সমগ্র ভারতবর্ষ পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিলাতীবর্জ্জন ও স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিল তখন ষ্টেড তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তাহার পর যখন কঠোর উৎপীড়নে, অত্যাচারে, অবিশ্বাসে, হতাশ্বাসে ভারত ক্ষিপ্ত" হইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইল তখন ষ্টেডের প্রশান্ত বাণী তাহাকে ধৈর্য্যধারণ করিতে উপদেশ দিল, ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে চলিতে কহিল। বাংলার স্বদেশপ্রাণ মহাত্মাগণ যখন বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন তখন অন্যায়-অসহিষ্ণু ষ্টেড তাঁহার "রিভিয়ুতে" মাসপরম্পরা নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের প্রতিকৃতি, সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহাদের মহৎচরিত্র ও নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণের এবং পার্লামেণ্ট মহাসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কে বলিতে পারে নির্ব্বাসিতদিগের জন্য তাঁহার এই নিঃস্বার্থ প্রয়াস তাঁহাদের ত্বরিতমুক্তির অন্যতম কারণ নহে? ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্রেরা ষ্টেডকে তাঁহাদের পরম সহায় ও বন্ধু বলিয়া জানিতেন। তাঁহার গৃহে সকলেই সমভাবে সমাদর লাভ করিতেন। ভারতবর্ষের জননায়কগণের মধ্যে যখন যিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন ষ্টেড তাঁহাদের সকলকেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, নানা প্রকারে তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন; আমাদের দেশের এই দুই মনীষীই তাঁহার নিকট যথেষ্ট উপকৃত। ষ্টেডের মৃত্যুতে আমরা পরম মিত্র হারাইয়াছি; তাঁহার ঋণ ভারতবাসী কখনই পরিশোধ করিতে পারিবে না।

পৃথিবীর বক্ষ হইতে অত্যাচার অনাচার বিদ্বেষ বিরোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ দূর করিয়া জগতে এক মহাশান্তি স্থাপনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। "হেগের শান্তিসভা" ষ্টেডের অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি এই সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। য়ুরোপে হেগের এই সালিসী সভাতে বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের কলহবিবাদ যাহাতে মীমাংসা দ্বারা মিটিয়া যায় ষ্টেড প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতেন। ষ্টেডের সকল স্মৃতিচিহ্ন কালের গর্ভে বিলীন হইতে পারে কিন্তু "হেগের শান্তিসভা" তাঁহার স্মৃতি চিরকাল জগৎ জুড়িয়া জাগাইয়া রাখিবে।

ষ্টেডের শোচনীয় মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পায় নাই। নিউ-ইয়র্কের "ধর্ম্ম ও জনসঙ্ঘের" অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য তিনি আমেরিকায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এই অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা! ষ্টেড যখন বুঝিলেন যে জাহাজ রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই তখন নির্ভীকচিত্তে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সম্মুখে মৃত্যুর করালছায়া দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না; মানবহিতে চিরজীবন যাপন করিয়া অন্তিমে অসংখ্য বিপন্নের সহিত 'ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে নীলাম্বুনির্ধির অতলগর্ভে মগ্ন হইলেন। আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে হয়ত তিনি প্রাণ হারাইতেন না; যে 'লাইফ বোট' যাত্রীদিগকে রক্ষা করিয়াছিল সে বোটে তিনি নিজে উঠিতে যান নাই—তিনি জানিতেন তাঁহার সেই স্থানটিতে আর একজনের জীবন রক্ষা হইবে—আগে সকলে বাঁচুক, পরে তাঁহার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা হইবে তিনি এই ভাবিয়া স্থির ছিলেন।



উইলিয়ম ষ্টেড্

বিশ্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আত্মোৎসর্গের পুণ্যকাহিনী চিরগৌরব গাথায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া ষ্টেড্ আটলান্টিকের অতলতলে চিরনিদ্রায় শায়িত। এ সমাধি সর্ব্বাংশেই তাঁহার উপযুক্ত।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

মর্য্যাদা

শুধাইল চন্দ্রমায় আসিয়া চকোর,
'কৃষ্ণপক্ষে কোথা তুমি থাক সুধাকর?
নিরাশ তিমিরে ফেলি বিশ্ব নিখিলেরে
কাঁদায়ে কুমুদে ফেলি পিয়াসী চকোরে?'

চাঁদিমা কহিল হাসি 'নিত্য যদি থাকি
মম স্মৃতি বল মনে কে রাখিত আঁকি?
আঁধারের বিনিময়ে চির জোৎস্নাধার
রহিলে কি রহিত এ মর্য্যাদা আমার?

শ্রীমনোরমা দেবী।

আমার বাল্যকথা

ছেলেবেলায় আমরা বাবামহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না। তিনি কখনকখনও আমাদের ডেকে ইংরেজি বাঙলায় পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে গিয়ে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার বেলায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়াবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রত্যহ আমাদের পারিবারিক উপাসনা হ'ত,তাতে আমরা সকলে যোগ দিতুম। আমি মুখে মুখে প্রার্থনা আবৃত্তি করতুম। একটি স্তোত্রমালার পুস্তকে কতকগুলি ভাল ভাল স্তবস্তোত্র সন্নিবিষ্ট ছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু আরও অন্য কারকারও বিরচিত। তার প্রায় সকলগুলিই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ফরাসী ব্রহ্মবাদী Fenelon হতে অনুবাদিত যে প্রার্থনাটি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেওয়া হয়েছে সেটিও তার মধ্যে ছিল। অক্ষয়-কুমার দত্তের একটি প্রার্থনা ছিল তা এখনো আমার কিছু কিছু স্মরণ আছে। তাঁর ভাষার বিশেষত্ব তা হতে স্পষ্ট ফুটে বেরচ্ছে। আরম্ভ এই

"হে ধ্রুবসত্য সনাতন! কালসহকারে কত বিষয়ের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার অপরিবর্ত্তনীয় অপার কারুণ্য-স্বরূপের কদাচ পরিবর্ত্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নগর সকল পুরাতন হইতেছে, রাজাও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষ অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার সেই কারুণ্য স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন নাই, ইত্যাদি।

তখন ১১ই মাঘের উৎসব খুব ধূমধামে সম্পন্ন হ'ত। বিস্তর লোকজনের সমাগম আর রাত্রে এক বৃহৎ বৈঠকী ভোজ। তাতে আমরাও যোগ দিতুম। সেই একদিন যেদিনে ছোট বড়র কোন প্রভেদ থাকৃত না। ঐ উপলক্ষে একবার একদল মিলে পলতার বাগানে গিয়ে বড়ই আমোদ আহ্লাদ করা গিয়েছিল; সেদিনের ব্যাপার আমার বেশ মনে পড়ে। ভোজের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন জগমোহন গাঙ্গুলী। লোকটী বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ—তাঁর ভুঁড়িটিও অতুলনীয়। এমন সৌখীন আমুদে অথচ কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। খাওয়া, পরা, ওঠা বসা, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁর কারিগিরি প্রকাশ পে'ত। রান্না বান্না ঘর কন্না—পোষাক সাজসজ্জা, কারুকার্য্য, ছুতরের কামারের কাজ—সকল কর্ম্মেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা ছেলের দল তাঁর বড় নেওটা ছিলুম—তাঁর ঘরে গিয়ে খেলা করতুম,—তাঁর কাছে গল্প শুনতুম; তাঁর খুঁটিনাটি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে কোনওটা আবদার করে আদায় করতুম;—তাঁর মুখের পান কি মিষ্টি লাগত! তিনি আমাকে উর্দ্দুর প্রথম কেতাব "চাহার দরবেস" শেখাতেন—"সুভান আল্লা ক্যা সানে হ্যায় কি জিসনে এক মট্টি থাকসে ক্যা ক্যা সূরতে আওর মিট্টিকি মূরতে পরদা কিয়া।"

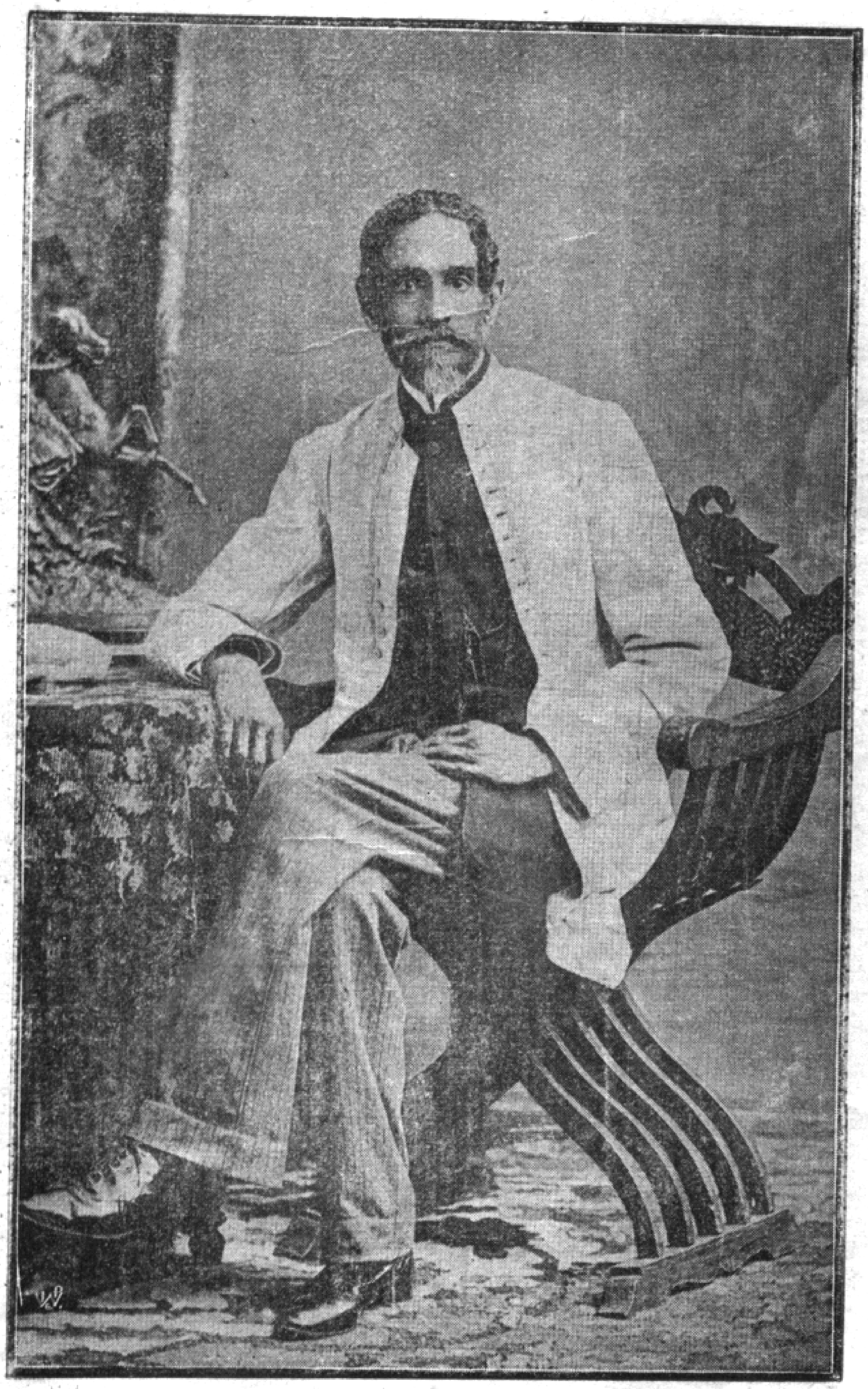
তাঁর ভুঁড়িটি আমাদের আদরের সামগ্রী

ছিল আর তিনি সকালে যে নাকডাকানো গম্ভীর আওয়াজে দিগ্বিদিক ধ্বনিত করতেন আমরা ভোরে উঠে তাই শুনতে যেতুম। তিনি একপ্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বারপাল ছিলেন। একবার একদল পুলিস ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে বলপূর্ব্বক আমাদের একটা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার যোগাড় করছিল—তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। আমাদের জগমোহন সেকালের রামমূর্ত্তি।

সেই গাঙ্গুলীমশায় পলতার বাগানে আমাদের বনভোজনের আহার সামগ্রী প্রস্তুত করলেন—সে মাছের ঝোল ভাত আর ভুলব না! আমাদের বাহনগুলি সারি সারি চলেছে—১১০টা বোট—আমরা রাত্রিশেষে পলতার বাগানে দলবলে গিয়ে উপনীত হলুম। বোটে আমাদের বিদূষক ছিলেন নবীন বাবু; তাঁর হাস্যপরিহাসে সন্ধ্যাটা খুব আমোদে কেটে গেল। তাঁর বিদ্রূপের বাণ বিশেষরূপে যাঁর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল সে লোকটি বে—বাবু। আমি তাঁকে হাবু বলব। বাবু শব্দের নবীনবাবু এক ছড়া বেঁধেছিলেন তা হাবুবাবুতে বেশ খেটে যায়—

বাববো বহবঃ সন্তি
বাবুয়ানা পরায়ণা
হাবুবাবু সমো বাবু
ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

তিনি একজন কফ্‌-প্রধান লোক—ঠাণ্ডার ভয়ে গলায় সালের গলাবন্ধ ও গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে ঝিমচ্ছেন। বোটের ভিতর একপাশে একটা ছোট কাচের আলমারী



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিল। নবীনবাবু যখন হাবুর প্রতি লক্ষ্য করে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব করলেন যে ঐ কাপড়ের পার্সেলখানা তুলোয় জড়িয়ে এই গ্লাস কেসে পুরে রাখলে ভাল হয়, তখন আমাদের হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল। পলতায় নেমে আমরা দলে দলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লুম। প্রধান দুইদল—এক দল চড়ুইভাতী রান্নার চারিদিকে, অন্য দলের কেন্দ্র হচ্ছেন—চাটুর্য্যে মশায়। ভবিষ্যতে তিনি আমাদের একজন পরম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়ত ৪০ পেরিয়ে থাকবে কিন্তু বালকের মত তাঁর ভাবভঙ্গী উৎসাহ কলরব, নৃত্যগীত লীলাখেলায় আমাদের সকলকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর তখনকার গান মনে পড়ছে—

ব্যাটা ছেলের মুখে* কড়ি সর্ব্বলোকে কয়,
সাহসের কার্য্যে ব্যাটাছেলের পরিচয়।
কলম্বস নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।
ব্যাটাছেলে হবে যদি সাহস কর আজ অবধি
বিধবা বিবাহে কর আনন্দ উদয়।

উপরে আমি পারিবারিক উপাসনার কথা উল্লেখ করেছি। কোন কোন দিন উপাসনান্তে বাবামশায় আমাদের উপদেশ দিতেন। আমাদের যা কিছু দোষ দেখতেন কোন কোন দিন উপদেশে তার উল্লেখ করে শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি রকম চাল চলনের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলুম তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময় ইংরাজী রীতিনীতির অন্ধঅনুকরণ—অতিরিক্ত সাহেবীয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ভৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন—সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। বিলেতে থাকতে আমি তাঁকে একবার নাচ-মজলিসে বিবিসাহেবের একসঙ্গে নৃত্য বর্ণনা করে পত্র লিখেছিলুম—তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি সেই রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না যাই।

বাবা মহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি যে রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা conservative হয়ে পড়েছিলেন; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটী পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স—আমি ছিলুম ঘোর Radical.

এই সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পর যতই মতভেদ থাক্ না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক দূর ইচ্ছামত চলতে দিতেন।

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগত না। আমার মনে হ'ত এই পর্দাপ্রথা আমাদের

* কথাটির সামান্য একটি অক্ষর বদল করিলাম।

জাতির নিজস্ব না মুসলমান রীতির অনুকরণ। অনুকরণ এবং মুসলমান অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হতে তার উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার বড়ই অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হ'ত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ী ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম এখন মনে হলে হাসি পায়। John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম। বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেমন স্বাধীন ভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলা মেশা করছে!—গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করছেন। আমি একবার একটী সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবার মধ্যে অতিথিরূপে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলুম। গৃহে অনেকগুলি কন্যা কুমারী ছিলেন—সমস্ত গৃহে কার্য্যে তাঁহাদেরই আধিপত্য। বিদায় নেবার সময় তাঁহাদের খাতায় স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ আমার হস্তাক্ষর রেখে যেতে অনুরোধ করাতে আমি লিখেছিলুম—

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

তাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীরা পর্দ্দার অন্ধকারে কি খর্ব্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন,—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ,—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্ব্বপশ্চিমের পরস্পর বিপরীতভাব আমার মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হল—পর্দ্দা উচ্ছেদ স্পৃহা আরও জেগে উঠল। কিন্তু তখন ভাল করে দেখতে পেলুম আমার সামনে যে পর্ব্বত সমান বিঘ্নবাধা রয়েছে তা অতিক্রম করা কি কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়। তখন সিবিলসার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে এসেছি—বোম্বাই আমার কর্ম্মস্থান নিয়োজিত হয়েছে—বোম্বাই যেতেই হবে, আর আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তখন আবার কলকাতা ও বোম্বায়ের মধ্যে রেলপথ প্রস্তুত হয়নি—জাহাজে করে যেতে হবে। বাবা মহাশয় তাতে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। এখন কথা হচ্ছে ঘাটে উঠা যায় কি করে? গাড়ী করে ত যাওয়া চাই? আমি প্রস্তাব করলুম বাড়ী থেকেই গাড়ীতে ওঠা যাক্। কিন্তু বাবামশায় তাতে সম্মত হলেন না—বল্লেন মেয়েদের পাল্কী করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক্। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ কর্ম্মচারীদের চ'খের সামনে দিয়ে বাহির দেউড়ি ডিঙ্গিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এ তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হল না। এই ত গেল পর্দ্দা ভাঙ্গার প্রথম অবস্থা। আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম।—সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজমহিলার মাঝখানে আমার

স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা।—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এসব কথা গল্পের মতই মনে হয়। এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিষ্কৃত হয়ে এল। ক্রমে আমাদের বাড়ীর লোকেরা (মেয়ে পুরুষ) আমার ওখানে গিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবাস যাপন করতে লাগলেন। ওদেশে বোম্বাই মান্দ্রাজে কোথাও বাঙ্গালা দেশের মত মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই। স্ত্রীস্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন ক'রে তাঁদের মনোভাব অনেক পরিমাণে বদলে গেল। পর্দ্দার উচ্ছেদ সাধন আমার যে চিরকালের সাধ তা ক্রমে মেটবার মত হয়ে এল। আমি বোম্বাই থেকে ছুটির সময় মাঝে মাঝে বাড়ী আসতুম—তখন দেখি পর্দ্দার তেমন কড়াকড় বাঁধুনি নেই, অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তারপর এখন!

সেকাল আর একাল—কি তফাৎ! কলকাতা সহরের ভদ্র মহিলারা রাস্তা ঘাটে গাড়ীতে মোটরে ইচ্ছামত বেড়িয়ে ব্যাড়াচ্ছেন এদৃশ্য কারও নূতন ঠেকে না। যা কিছুকাল পূর্ব্বে কল্পনারও অতীত ছিল এক্ষণে তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। সত্যি সত্যিই অন্তঃপুরবাসিনীগণ এখন মেমের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

টিটানিক অর্ণবপোতের সর্ব্বনাশ। মনে পড়ে ছেলে বেলা একটি ইংরাজী কবিতা পড়িয়াছিলাম তাহাতে একখানি জাহাজ ডুবির বর্ণনা ছিল। ইংলণ্ডের যুবরাজ এবং রাজকন্যা সমুদ্রপথে নর্ম্মাণ্ডিতে কোনও বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহাদের জাহাজ মগ্নশৈলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ডুবিতে আরম্ভ হয়। তাঁহারা যখন Life boat করিয়া সমুদ্র পার হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময় জাহাজের অন্যান্য যাত্রীগণও তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়াতে ক্ষুদ্র তরী সে ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায়। ইংলণ্ডের রাজপুত্রের এবং রাজকন্যার একত্রে মৃত্যু হয়। এই সংবাদ ইংলণ্ডরাজ হেনরির কর্ণগোচর হইবার পর জীবনে তাঁহাকে আর কেহ কখনো হাসিতে দেখে নাই। এই টিটানিক জাহাজখানি ডুবিয়া যাওয়াতে আজ ইংলণ্ড আমেরিকা কত দেশ দেশান্তরের কত ঘরে হাসির আলোক চিরনির্ব্বাপিত হইয়া গেল মনে করিলে কাহার হৃদয় অসীম বেদনায় পূর্ণ হইয়া না উঠে। আমরা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিন্ন দেশবাসী হইলেও যখনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে তখন আর কোন ভিন্নতা মনে থাকে না তখন মানবহৃদয় মানবদুঃখের সহানুভূতিতে কাঁদিয়া উঠে।

টিটানিক জাহাজ খানির মত এমন আর একখানি জাহাজ আজ পর্য্যন্ত কোন কারিগর গড়িতে পারে নাই; পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা প্রকাণ্ড জাহাজ আর হয় নাই—বিলাস এবং আবাসের উপকরণ ইহাতে যেমন ছিল এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ধনীর অর্থ, বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি কৌশল এবং কারু শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের চূড়ান্ত নিদর্শন এই জাহাজ খানিতে ছিল। সকলেরি বিশ্বাস ছিল এমন উপায়ে ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে ইহা কখনো ডুবিতে পারে না। —কিন্তু প্রথম যাত্রা শেষ না হইতে, গম্য স্থানের অনতি দূরে, ঝড়ঝঞ্ঝাহীন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে অকস্মাৎ তুষারস্তূপের সংঘর্ষে অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় দ্বিধা চূর্ণ হইয়া দুইঘণ্টা

সময়ের মধ্যে এই বিশাল তরণী অতল জলে নিমগ্ন হইয়া গেল এবং প্রায় তিন হাজার আরোহীগণের মধ্যে কেবল মাত্র ছয়শত জন ভিন্ন সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হইল। মৃত্যুই জীবনের চরম এবং কঠিনতম পরীক্ষা। সম্মুখমৃত্যুতেও, যাহার হৃদয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিবেকবুদ্ধিতে অবিচলিত তিনিই বীর এবং মহৎ হৃদয়। টিটানিকের বিপত্তিকালে নাবিকগণ, ও আরোহী যাত্রীগণ যেরূপ বীরত্ব, ও নিঃস্বার্থ মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছেন তাহা মনে করিলে হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় এমন পরীক্ষায় এমন গৌরবের সহিত আমরাও উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম কি? প্রথম যখন তুষারস্তূপের সহিত জাহাজের আঘাত লাগে তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই এমন সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তখন সান্ধ্যভোজের পর কেহ তাস খেলিতেছিল কেহবা সঙ্গীত চর্চা করিতেছিল; যে যেখানে যে ভাবে ছিল তেমনি রহিয়া গেল। দু-একজন শয়ন গৃহ হইতে ব্যাপার খানা কি জানিবার জন্য বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন চারিদিক স্থির প্রশান্ত তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিতে আবার ফিরিয়া গেলেন। তুষার স্তূপের সংঘর্ষে আসিবা মাত্র জাহাজের নিম্নভাগে বৃহৎ গর্ত্ত হইয়া অতি অল্প সময়েই জল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রধান কর্ম্মচারী সমস্ত এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিয়া আরোহীদিগকে জীবনরক্ষাকারী কটিবন্ধ (Lifebelt) পরিধান করিতে এবং নাবিকদিগকে জীবনরক্ষাকারী তরণী সমুদ্রে ভাসাইয়া আরোহীদিগকে তাহাতে উঠাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। এরূপ বিপদের সময় নিয়ম এই যে, প্রথম অসহায় শিশু এবং রমণীদিগকে তৎপরে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত পুরুষদিগকে তৎপরে সবলকায় পুরুষ আরোহীদিগকে নৌকায় নামান হয় এবং সর্ব্বশেষে জাহাজের কর্ম্মচারী এবং নাবিকগণ আপনাদিগের জীবন রক্ষার উপায় করেন। প্রথমে শিশু এবং রমণীদিগকে তরণীতে নামাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। অনেক রমণী আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আপত্তি করিলেন কিন্তু স্বামীর অনুরোধে শিশু পুত্রকন্যাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যবোধে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। কিন্তু একটি পত্নী কোন ক্রমেই স্বীয় স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হন নাই তিনি স্বামীর সহিত অগাধ সাগর গর্ভে সহমরণ বরণ করিলেন। জাহাজে যে কয়খানি Life boat ছিল তাহাতে সকল যাত্রীর স্থান হইল না। একে একে যখন সমস্ত Life boat ভাসিয়া গেল তখন তুষার শীতল জলের সংস্পর্শে জাহাজের এঞ্জিন ফাটিয়া যাওয়াতে জাহাজখানি দুআধখানা হইয়া ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গেল। জাহাজখানি একেবারে জলমগ্ন হইতে প্রায় দেড়ঘন্টা সময় লাগিয়াছিল এই সময় ধরিয়া সেখানে যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। জাহাজের বাদকবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত নির্ভীক চিত্তে আরোহীদিগের ভীতি নিবারণের জন্য বাজাইয়াছিলেন, টেলিগ্রাম করিবার ভার যাহার উপর ছিল তিনিও শেষ পর্য্যন্ত আপন স্থান ত্যাগ করিয়া যান নাই; জাহাজের কাপ্তেন আপন স্থানে দাঁড়াইয়া জাহাজের সহিত ডুবিয়া গেলেন। শেষ মুহূর্ত্তে নাবিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমরা যে ব্রিটন তাহা যেন ভুলিয়া যাইও না।"

লর্ড কারমাইকেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কিউপায়ে লর্ড কারমাইকেল মান্দ্রাজে এমন লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা নিম্ন লিখিত গল্প কয়টি হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায়।

রেলওয়ে কোম্পানীর তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের নানারূপ কষ্ট অসুবিধার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারির সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং সে বিষয় তত্ত্বাবধান করিতে যান। লাট সাহেব হইয়া গেলে, সকলেই সতর্ক হইবে, যথার্থ কথা কিছুই জানিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় অতি হীন অবস্থার ফিরিঙ্গির উপযুক্ত পোষাক পরিয়া তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট লইয়া গাড়ীতে আরোহী হইলেন—গাড়ীখানি হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী দ্রাবিড়ী তৈলঙ্গি প্রভৃতি নানা জাতীয় যাত্রী পরিপূর্ণ। সকলেরই সঙ্গে লালখেরো দিয়া বাঁধা একটি পুঁটুলি, একটি লোটা ও একখানি লাঠী। গাড়ীতে দীন ইউরোপীয়টিকে

দেখিয়া কেহই কুণ্ঠিত কিম্বা সঙ্কুচিত হইল না। হাসি গল্প পান তামাক সমান চলিতে লাগিল। এক ষ্টেশনের পর ফিরিঙ্গি ভদ্রলোকটি যে কখন নামিয়া গেলেন তাহাও কেহ লক্ষ্য করিল না। ষ্টেশনে নামিয়া তিনি প্রতীক্ষা করিবার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সারারাত যত গাড়ী যাওয়া আসা করিতে লাগিল তিনি সে সমস্ত গাড়ীর নিকট গিয়া তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। গার্ডদিগের এবং রেলওয়ের পুলিশকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। পরদিন একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া মান্দ্রাজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। যে সময় ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবার কথা তাহার চেয়ে অনেক বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং এডিকং ব্যস্ত হইয়া সেই ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট তারে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর আসিল "লাট সাহেব নিশ্চয়ই এখানে আসেন নাই; একটা ফিরিঙ্গি আসিয়া প্রতীক্ষা ঘরে সারারাত ছিল, যখনি গাড়ী আসিয়াছে তখনই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কাছে গিয়া সব দেখিয়াছে, এ ব্যক্তি এখনি মান্দ্রাজ রওয়ানা হইল।" মান্দ্রাজ নগরীর শাসনকর্ত্তা যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন ষ্টেশনকর্ম্মচারীদিগের অবস্থা একটু কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সেই অবধি যতদিন না লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন ততদিন আর রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের মনে শান্তি ছিল না।

এ ঠিক যেন হারুণ অল রসিদের গল্প পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়।

আর একবার কোনও ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে মান্দ্রাজের কোন বাজার সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ পাঠ করিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য লাটসাহেব উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাজারটিতে ইউরোপীয় সমাগম ছিল না বলিয়া সে সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাইবারও সুবিধা ছিল না, অগত্যা স্বয়ং ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রায় একঘণ্টাকাল চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহা কিছু দেখিবার শুনিবার ও জানিবার জানিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী পুলিশষ্টেশনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া বাজার সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় একজন কর্ম্মচারী বলিল "সে সব কথায় তোমার দরকার কি? আপন কাজে মন দাওগে যাও।" তিনিও গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আপন কাজই করিতেছি!" তাহার পর Visitors book চাহিয়া লইয়া তাহাতে মন্তব্য লিখিয়া "কারমাইকেল" নাম সহি করিলেন। তখন কনেষ্টবলদিগের সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হইল। ভদ্রলোকটি একখানি ঠিকা গাড়ী করিয়া বিদায় লইলেন দেখিয়া তাঁহাকে পাগলা গারদের কোন পলাতক কয়েদী জ্ঞানে তাঁহাকে নজরে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিল। কিন্তু এ ধারণাও বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিবার সুবিধা হইল না, মান্দ্রাজ শাসনকর্ত্তার জরুরি হুকুমে অবিলম্বে সেই বাজারে পুলিশ প্রহরী প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিলে তাহাদের ভ্রান্তিবিলাস বিনাশ হইয়া চৈতন্য চন্দ্রিকার উদয় হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ বৎসর সরকারী কাজ করিবার পর মান্দ্রাজের কোন হিন্দু কর্ম্মচারীকে হঠাৎ কর্ম্মচ্যুত করা হয়। তখন লর্ড কারমাইকেল প্রধান সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মফস্বল যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে সেই কর্ম্মচ্যুত হিন্দুবৃদ্ধ একখানি আবেদন পত্র লাট সাহেবের হাতে আনিয়া দেয়। লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ কলেক্টার সাহেবের বাংলায় উপস্থিত হইয়া এসম্বন্ধে সমস্ত কাগজ পত্র দাবী করিলেন। কলেক্টার সাহেব তো মহা বিপদে পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ কাগজপত্র দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না, ডাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাঁহাকে তখনি কাগজ পত্র খুঁজিয়া লাট সাহেবের হাতে দিতে হইল। এই ব্যাপারে লর্ড কারমাইকেল প্রধান সেনাপতির আগমন কালে যথা সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

আশা করি এইরূপ সহৃদয়তা, এমনি সহানুভূতি এবং ন্যায় বিচারের দ্বারা তিনি বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ও বশীভূত করিয়া লইবেন।

"ওগো"

কিছু ব'লে ডাকিনেকো তারে
ডাক্‌তে হ'লে বলি কেবল 'ওগো'
ডাকি তাবে হাজারো দরকারে,—
জীবন-রণে সেই জেনারল্ টোগো।
সন্ধি এবং বিগ্রহেরি মাঝে
মুহুর্মুহু চাই তারে সব কাজে,
ডাক্‌তে কিন্তু বাধ্‌ল সম্বোধনে,
আম্‌তা আম্‌তা খানিক, খানিক গোঁ গোঁ ;
লজ্জা কেমন যোগায় এসে মনে
তাইত তারে ডাকি সেরেফ্ 'ওগো !'

হাজার ছুতার ডাক্‌ছি সকাল থেকে
"চাবীটা কই ?" "কাগজ গুলো ?—ওগো"
"পান কোথা ?" "চূণ" ?"—(চুপ জনান্তিকে)
হাঁক ডাকেতে ডাকাত আমি রোখো।
টান্‌তে সদাই চাই যে তারে প্রাণে,
শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,
ভাষার পুঁজি শূন্য একেবারে,—
টাঁকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;
মন গড়া নাম চাই যে দিতে তারে
শেষ বরাবর কিন্তু বলি 'ওগো !'

বল্‌ব ভাবি 'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী'
ছেড়ে দিয়ে 'শুন্‌ছ ?' 'ওগো' 'হাঁগো',
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি,
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী,—
যাত্রাদলের গন্ধ ওতে ভারি ;
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা
'প্রিয়ারা'—সে করবে ওরে খাটো ;
এর তুলনায় 'ওগো,!' আমার খাসা
যদিও মানি ওটা ঈষৎ মাঠো।

ঈষৎ মাঠো —এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো !'
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার ভারি জবর লোকও।
ফুল শেষে সেই 'মুখে মুখে'র 'ওগো'
রোগের শোকের দুঃখসুখের 'ওগো'
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,
নয় সে মোটেই একপেশে, একচোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধমধুর ডাকের সেরা 'ওগো !'

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

ওঁ সনাতন ধর্ম্মসঙ্গীত। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ প্রণীত। জন্মভূমি প্রেসে মুদ্রিত। কলিকাতা, বহুবাজার. ৯নং বিবি রোজিওর লেন হইতে প্রকাশিত। কয়েকটি আধ্যাত্মিক গানের সমষ্টি

গল্প চারিটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র।

এই গ্রন্থে কবিবর রবীন্দ্রনাথের অধুনা-লিখিত সুন্দর চারিটি গল্প, 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা' 'দর্পহরণ' ও 'মাল্যদান' প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি বিশ্বের সাহিত্যে পরম সম্পদ—আদর্শস্থানীয়। গল্পবর্ণিত চরিত্রগুলি একটুও

কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না—যেন জীবন্ত! আমরা তাহাদিগের প্রাণের স্পন্দনটুকু অবধি সুস্পষ্ট অনুভব করি—এমনই অপূর্ব্ব রচনাকৌশল। তাহাদিগের সুখে আমরা উল্লসিত হই, বেদনায় আমাদিগের বুকের মধ্যে একটা হাহাকার সাড়া দিয়া উঠে। ছোটগল্প লিখিতে বসিয়া বহু লেখক সাহিত্যের প্রতি রীতিমত অত্যাচার করেন, ছোটগল্প কাহাকে বলে, তাহার বিশেষত্ব কি, না বুঝিয়াই গল্পের ওস্তাদ হইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের এই গল্প চারিটি পাঠ করিয়া গল্পের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করুন। বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের নূতন গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কাব্যামোদীর কাব্যতৃষ্ণা চরিতার্থ হইবে।

শিশির। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি,এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। কলিকাতা, নব-বিভাকর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। পাঁচটি গাথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভুজঙ্গধর বাবু সুকবি। তাঁহার রচিত 'গোধূলি' ও 'মঞ্জীর' পাঠে আমরা তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছি।

গ্রন্থখানি ভাবে ভাষায় উপভোগ্য হইয়াছে। তবে একই গাথায় বহু ছন্দের অবতারণা করা হইয়াছে, বলিয়া স্থানে স্থানে মাধুর্য্যের হানি ও রসভঙ্গ হইয়াছে। গাথাগুলির মধ্য দিয়া বেশ একটি করুণ রসের ধারা বহিয়া গিয়াছে। প্রকাশক মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, কবিতাগুলি শিশুদিগের জন্য রচিত—কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গুরুপাক হইবে। ছাপা কাগজ পরিষ্কার।

মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি,এল প্রণীত। প্রকাশক, সিটিবুক সোসাইটি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলি ক্ষুদ্র নহে, পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। লেখকের গল্প রচনায় বেশ হাত আছে। গল্পগুলি সবই করুণরসাত্মক,—পাঠে চিত্তে অবসাদ বা ক্লান্তি আসে না। রচনায়ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাই। 'প্রত্যাবর্ত্তন' গল্পের উপাখ্যান, বাঙ্গালা গল্পের রাজ্যে অভিনব—ফুটিয়াছেও সুন্দর। বিরজার হৃদয়-মধ্যে ভিতর ও বাহিরের যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহা রীতিমত দক্ষতার সহিতই বর্ণিত হইয়াছে। 'দান' গল্পটি পতিতা অনুতপ্তা সুরমার শোকাশ্রুতে শান্ত সমুজ্জ্বল। এ অশ্রুবিন্দুটুকু হীরকের মত অমূল্য। 'প্রত্যর্পণ' খাঁটি বাঙ্গালা দেশের গল্প,—কোথাও এতটুকু অস্বাভাবিকতা নাই অথচ একটি বিরাট সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'ত্যাগ' গল্পটির আখ্যানবস্তু যেমন অনন্যসাধারণ, তেমনই সুন্দর। সকল গল্পগুলির মধ্যেই এমন একটি মাধুর্য্য আছে, আর্ট আছে, যাহা আজিকালিকার ছোট গল্পে প্রায় দেখা যায় না। 'মঞ্জরী' যে সাধারণকে বিশেষ তৃপ্তি দিবে, এ আশা আমাদিগের বিলক্ষণ আছে।

উপাসনার গুরুত্ব। শ্রীমতী বসন্তকুমারী বোস্ প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়, উপাসনা কি, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। লেখিকা নূতন কথা বড় একটা বলিতে না পারিলেও 'বসুর' বানানে নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। 'বসু'কে 'বোসু' করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এইরূপ যথেচ্ছ বানান-প্রবর্ত্তনে সার্থকতা কি? লেখিকার ভাষা ভাল। মূল্য লিখিত নাই—'উৎসর্গে' লিখিত হইয়াছে, পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ ভারত-মহিলা-সমিতির ব্যয় সঙ্কুলান কল্পে অর্পিত হইবে।

ও জ্যোতিঃপথ। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, লোটাস্ লাইব্রেরী। ৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত দেখিলাম না। এই গ্রন্থে (লেখকের কথা মানিতে হইলে) 'পরমার্থ তত্ত্বের বিচার ও সাধনপ্রণালী' আলোচিত হইয়াছে। একে ত পরমার্থ তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াং' তাহার উপর লেখক বিকট ভাষার স্তূপে সে তত্ত্বটুকুকে আরও প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। তাহাতে দন্তস্ফুট করে, কাহার সাধ্য! তথাপি ২৯পৃষ্ঠা অবধি আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিলাম,

কিন্তু লেখকের বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠক একটু ভাষার নমুনা দেখুন, "ইহার যথার্থ ভাব, যেমন আমরা যে প্রকাশ মস্তকে রহিয়াছি উহাই চক্ষে আসিয়া প্রকাশ হই। চক্ষের প্রকাশ আমাদিগ হইতে ভিন্ন কিছুই নহে, আমিই।" এই ভাষার গহনে দুর্লভ মানব-জন্ম হারাইতে আমাদিগের মোটেই প্রবৃত্তি নাই, কাজেই—গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন।

ভারত কাহিনী। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

ভারতপ্রসঙ্গ ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

হিন্দুর আশ্রম-চতুষ্টয়। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

মেরি কার্পেণ্টার। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

গ্রন্থগুলি বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় সাহিত্যিকের সুগভীর চিন্তাশীলতা গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল—বঙ্গসাহিত্যে অমর কীর্ত্তি। গ্রন্থগুলির ভাষা যেমন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল, তেমনই তেজঃপূর্ণ। শিক্ষার্থীর পক্ষে এ ভাষা আদর্শ হইবার যোগ্য। বঙ্গভাষানুশীলনে রজনীকান্তের কি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার অনূদিত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে আমরা সম্যক্ পাইয়াছি এবং ভারতীর পাঠকবর্গকে গত বর্ষে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষও দেওয়া হইয়াছে। এই নিষ্কাম সাহিত্যসেবীর বিপুল অধ্যবসায়ের কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকিবে—তরুণ শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আজ রজনীকান্ত আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর ভাস্বর কীর্ত্তি আজিও সাহিত্যের তপোবনটিকে সমুজ্জল রাখিয়াছে। বাঙ্গালী তাঁহার গ্রন্থের সমাদর করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইবে না, কারণ সেগুলি শুধু বাক্যের আড়ম্বর নহে, তাহা সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ।

হিন্দু হোষ্টেল কবিসম্মিলনী। চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রতিযোগিতা। ১৩১৮। হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতি বৎসর কবিতা-প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হয়। পুরস্কার যোগ্য কবিতাগুলি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় সর্ব্বসমেত উনবিংশটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি চতুর্দ্দশপদী। কবিতাগুলিতে বিশেষত্ব নাই, তরুণ কবিযশঃ-প্রার্থীগণের ইহা প্রথম প্রয়াস। সুতরাং সমালোচনার তৌলে এগুলি ওজন করা সঙ্গত হইবে না। আমরা ছাত্রগণের এই উদ্যমের আন্তরিক প্রশংসা করি ও সর্ব্বান্তঃকরণে কবিসম্মিলনীর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

দরিয়া। নাটিকা; শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল, প্রণীত। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। নাটিকাখানি সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। গোল্ডস্মিথের She Stoops to Conquer নামক নাটিকা অবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত। অনাবিল হাস্যরসের স্নিগ্ধ প্রবাহ, কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলা, মার্জ্জিত মিষ্ট রহস্য, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সৌরীন্দ্র বাবুর রচনার বিশেষত্ব। সে বিশেষত্ব দরিয়ায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা লেখকের কল্পনা-শক্তি, চরিত্র সৃষ্টি এবং চিত্রাঙ্কন-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারে, সৌরীন্দ্রবাবু বালিকা নায়িকার সন্ধানে না ফিরিয়া একটু প্রীতিকর মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা, রাজপুতানা এমন কি কাশ্মীর অতিক্রম করিয়া, তিনি সুদূর পারস্য দেশে উপস্থিত হইয়াছেন;—সেই আঙুর, আপেল, গোলাপের দেশে। যে দেশে বুল্‌বুল্ নারাঙ্গী ও ডালিম-কুঞ্জ মধুর গুঞ্জনে মদির করিয়া তুলে; যে দেশে সুন্দরীগণ সুর্ম্মা সাহায্যে মুখচ্ছবি কমনীয় করিয়া তোলেন; যে দেশের "দ্রাক্ষাকুঞ্জে নববসন্তে প্রেম অফুরান"—সেই দেশে নাটকের সংস্থান সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। কাল;—"চারুতর বসন্ত"—"যখন আকাশে বাতাসে আলোকে

সলিলে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!” যখন, “শীতের বাঁধন ফাগুন পরশে গিয়েছে টুটি”, “মরণ পেয়েছে ছুটী!” পাত্র পাত্রী;—সুকুমার তরুণ-তরুণী—“পরস্পরেণ স্পৃহনীয় শোভা!” বিষয়, চির অভিনব প্রেম; মিলনান্ত! সাধারণের চিত্তবিনোদন হেতু এই যে পর্য্যাপ্ত আয়োজন ও গুণ সন্নিপাত তাহা ব্যর্থ হয় নাই। এই সুমধুর আয়োজনে সুশৃঙ্খলে প্রেমোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

দুই চারিটি নিপুণ ইঙ্গিতে ফিরোজার মর্ম্মের ছবিটুকু সহসা কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। “ফয়নাশা” নাট্যকারের নূতন সৃষ্টি;—নূতন বলিয়া অলৌকিক নহে। মনে হয় আমরাও যেন কোথায়—পথে ঘাটে এমন দু একটি—ফয়নাশা দেখিয়াছি। নায়িকা দরিয়া—প্রথম যখন দেখিলাম—তখন পিতার আদরে অতিরিক্ত আদরিণী একটু “আহ্লাদী” অথচ প্রেমের স্পর্শে তাহার সলীল চাঞ্চল্যে ক্রমশ বেশ ধীরতা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কবির কথা মনে পড়ে, “here's a metal more attractive” প্রেমে কৌতুকে দরিয়ার চরিত্রটী এমনি মধুর হইয়াছে যে নিমেষেই সে আমাদিগের মর্ম্মস্পর্শ করে। স্নেহশীল পিতা ওসমান আলি, পুত্রগর্ব্বে গরীয়ান আশফ, দুর্ব্বলহৃদয়া মাতা লফমের চরিত্র নিখুঁত। সেলিম ও তসীর নাট্যসাহিত্যে বেশ নূতনত্বের আভাস আনিয়াছে।

নাটিকায় অনেকগুলি গান আছে—গানগুলি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী। শ্রীগঃ।

চিত্রব্যাখ্যা

দান্তের স্বপ্ন—কবি দান্তে নিরাশ প্রণয়ী। ভালোবাসার প্রতিদানের প্রত্যাশা না রাখিয়া তিনি এক রাজকুমারীকে ভালো বাসিতেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন রাজকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত তিনি কিউপিড মূর্ত্তিতে মিলিত হইতেছেন। কবির এই স্বপ্ন চিত্রকর অঙ্কিত করিয়াছেন।

ধরা

ধরা কহে আমি তোরে ধরিয়াছি বুকে,
সহিয়াছি কত দুখ চাহি তোর মুখে,
পালিয়াছি তোরে মোর স্নেহ অঙ্কে রাখি
স্নেহাঞ্চলে দেহ তোর রাখিয়াছি ঢাকি।
এবে গেছ ছাড়াইয়া মোর স্নেহ কোল
ধরায় তুলেছ তব জ্ঞানের হিল্লোল,
বিশ্ব হতে চেতনারে আনিয়াছ বাঁধি,
তারি মাঝে সবাকারে তুলিতেছ গাঁথি।

জেনেছ কি সুনিবিড় স্নেহনীড় ভরি,
রেখেছিনু চেতনায় মম বক্ষে ধরি!
নিঃশব্দে তোমারে তাহা করায়েছি পান
আমার চেতনা হতে লভিয়াছ প্রাণ।
এবে পুত্র জননীর বন্ধন ঘুচাও—
বিশ্ব ভরা চেতনায় জড় কোথা পাও?

শ্রীমতী হেম[illegible] দেবী

গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর—“বরাবর।”

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



"নলিনীদলগত"

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১৯ [৩য় সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(৫)

জনপূর্ণ কলিকাতা নগরীতে প্রাসাদমালার পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত গেল। রাস্তায় গ্যাসের আলো চন্দ্রালোক খর্ব্ব করিয়া উর্দ্ধে চাহিয়া হাসিতেছিল। ফেরিওয়ালারা 'চাই বেল ফুল' ও 'কুল্‌পি বরফ' ঘন ঘন হাঁকিয়া চলিয়াছে।

কেরোসিনের একটি বিলাতি ল্যাম্প জ্বালাইয়া নিজের ক্ষুদ্র টেবিলটির সম্মুখে বসিয়া শচীকান্ত সেই পূর্ব্বকথিত মরক্কোচর্ম্ম-মণ্ডিত ঝক্‌ঝকে খাতাখানি খুলিয়া তাহারি একটি পৃষ্ঠায় ঘন নীল কালী দিয়া সুচারুছাঁদে একটি কবিতা লিখিতেছিল।

ঘরখানি বাসাবাড়ীর গৃহোচিত ছোটখাট এবং গৃহসজ্জাগুলিও যথেষ্ট স্বল্পমূল্য। কিন্তু সেগুলি এমনি পরিপাটি করিয়া যথাযোগ্যস্থলে সাজান যাহাতে গৃহস্বামীর বেশ একটুখানি সৌখীন রুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। একপাশে একটি লোহার আল্‌নায় দু'একখানি মিহিধুতি ও ইস্ত্রিকরা সার্ট সন্তর্পণে ঝুলান, পামসু-জুতার তখনকার দিনে খুব বেশি চলন ছিল না, করিত—ফিতার ফাঁসযুক্ত জুতাজোড়া ও রূপার কারুকার্য্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট ছড়িগাছি বিশেষ যত্নের সহিতই উপযুক্ত স্থানে সুরক্ষিত ছিল। এই সামান্য জিনিষগুলিই বেচারা শচীকান্তকে অসামান্য চেষ্টাদ্বারা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বাড়ীর পাওনা কলের রাঙ্গাপেড়ে ধুতিগুলির পরিবর্ত্তে এই সব সৌখীন দ্রব্য কেমন করিয়া যে পাওয়া যাইতে পারে সে গোপন রহস্য নাই প্রকাশ করা গেল,—মোট কথা ইহার জন্য তাহার অনেকখানি মস্তিষ্কঘৃতের ব্যয় করিতে হইত। যে কবিতাটুকু কবির লেখনী খাতার শুভ্রপটে অঙ্কিত করিতেছিল, তাহা এই।

"আঁধার কুটির মম ছিল চির অন্ধকার,
দেবি! আজি তব স্পর্শে ঘুচে গেল সে আঁধার।
যদি আসিয়াছ হেথা, তবে হেথা কর বাস,
চিরারাধ্যা দেবী তুমি, আমি তব চিরদাস।

এইখানেই লেখক লেখনী থামাইল। কোথায় কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে! হাঁ, হাঁ ঠিকই ত। নীচে দরজার কড়া নাড়িয়া

ঝি কিম্বা বামুন ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না, অগত্যা শচীনবাবু স্বয়ংই চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, মনটা সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ গলার সাড়াটা যেন ভাবী বড় কুটুম্বের মতনই লাগিতেছিল।

নিখিলনাথ উজ্জল গৌরবর্ণ সুন্দরকান্তি যুবক, মুখখানিও চেহারার মতন সদাহাস্য-মণ্ডিত ও সরলতার লীলাভূমি। শচীকান্তকে কাছে পাইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া অভিনন্দন করিয়া বলিলেন "বাঃ বেশ ত! দোর বন্ধ করে লুকিয়ে বসে আছ! এসে একটা খবরও দাওনি!"

শচীকান্তের সন্দেহকুণ্ঠিত চিত্ত এই প্রাণখোলা স্নেহতিরস্কারে একেবারে নিঃশঙ্ক আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল। সে এই অনুযোগের তেমন কোন স্পষ্ট জবাব দিল না একটু ক্ষীণ-ভাবে হাসিয়া মুখটা নত করিল। নিখিলনাথ আজ যেন খুব ঘনিষ্ঠভাব ধারণ করিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পিঠে হাত দিয়া কহিলেন "একবার চলুন দেখি এখনও আপনার কনে দেখাটা হয়নি, সেইটে সেরে নেবেন। আর যদি তারপর মত থাকে তাহলে কাল সকালে ঠাকুরমা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে দিন করাবেন বলচেন! বৈশাখ মাস পুণ্যাহ মাস তাঁর ইচ্ছা এই মাসেই বিয়েটা চুকে যায়। আপনার কোন আপত্তি নেই?"

আপত্তি! তাহা থাকা কি সম্ভব? কিন্তু তথাপি অন্তরের মধ্যে বিবেক যেন কি একটা দ্বিধার ছুতা তুলিতে চাহিতেছিল। বিবেকের এইটাই প্রধান দোষ, মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিলেও সে তাহাকে স্নেহময়ী মায়ের মত সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না। নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া সে উত্তর করিল "আ—আমার, না তা কিছু নেই।"

কিন্তু সেদিনটা আর কনে দেখা কপালে ঘটিল না। ভরসন্ধ্যার বারবেলা কন্যাদর্শনে দোষ ঘটিতে পারে,—অতএব আজ তাহা হইতেই পারে না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ শচীকান্ত গোটাকত সন্দেশ ক্ষীরমোহন গিলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথা রহিল পরদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্ত্তে নিখিলনাথ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কন্যা দেখাইবেন।

পরদিন যথা সময়ে সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, এবং নিখিলনাথও সেই শুভ মুহূর্ত্তের দূতস্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শচীকান্ত লগ্ন না দেখিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতেই মস্তকের কেশগুচ্ছ হইতে পদতল পর্য্যন্ত শরীরের যেখানে যেখানে যে কিছু প্রসাধন আধুনিক ফ্যাসান দাঁড়াইয়াছে, তাহা সযতনে সম্পন্ন করিয়া হাতআয়নায় বারবার করিয়া মুখবিম্ব দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। জানালার মধ্য দিয়া নিখিলনাথকে এদিকে আসিতে দেখিয়াই দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল ঘেরিয়া খানকয়েক চৌকি সাজান ছিল, তাহার একখানার দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিখিলনাথ কহিলেন "একটু দেরি আছে, বসো আমি আসছি।"

শচীকান্তের ললাট ঘামিয়া উঠিতেছিল, বক্ষের স্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত হইয়া উঠিল। নিখিল বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

যে ঘরে গৃহস্বামী গৃহের ভাবী জামাতাটিকে

প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন---তাহারি পিছনে বাড়ীর ভিতরের লম্বা একটি দালান। এই ঘরের মধ্য দিয়া একটি দ্বার ও দুইটি জানালা খোলা থাকিলে বাহির ও অন্দরের মধ্যে আর বড় একটা আব্রু থাকে না। এখন দ্বারটি বন্ধ থাকিলেও জানালা দুইটিই উন্মুক্ত ছিল। সহসা সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটু সুললিত স্বর সুকোমল বালকণ্ঠের হাস্যমণ্ডিত হইয়া গৃহের স্তব্ধ বায়ুস্তরে ঝঙ্কার তুলিল "সীতারাম বল্লিনে? তবে তুই আজ খেতে পাবিনে!"

শচীকান্ত চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। জানালার উপরার্দ্ধ কবাটমুক্ত, পিছনে ভিতর দালানে কড়িকাঠে ঝোলান খাঁচা এবং সেই খাঁচার নিকটে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা ঐ কথা বলিয়া পাখীকে শাসাইতেছে। "বল্লিনা, বল্লিনা, তবে আমি এই চল্লুম,—ময়না! সীতারাম বল্লো, সীতারাম—"

শচীকান্ত নীরবে বিস্মৃতদৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। সে কনে দেখিতে আসিয়াছিল, দূর হইতে পূর্ব্বেই এই কনেটির যে ছায়াদর্শন ঘটিয়াছে সেই ছায়ার অঙ্গে নিজের কবিহৃদয়ের কল্পনা দ্বারা যথেষ্ট বসন্ত পুষ্পমঞ্জরী ও নন্দন পারিজাতের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি এ দৃশ্য যেন কল্পনাকে বেগে ধিক্কারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। বৈশাখের সমুজ্জ্বল প্রভাত। বারান্দার খিলানের ফাঁকে আকাশের গাঢ় নীলিমা নাট্যগৃহের উত্তোলিত যবনিকার মত আপনাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের সোনালি রংয়ের জ্বলন্ত কিরণ সেই মেয়েটির চাঁপাফুলের মত শরীরের উপর পড়িয়া তাহার চারিদিকে যেন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া ধরিয়াছিল। অনুচিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়াও শচীকান্ত প্রশংসাপূর্ণ বদ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। এই কি কনে? না অপর কেহ?

ইতিমধ্যে তিরস্কৃত ময়না 'সীতারাম বলিল। এবং 'বল্লিনা, বল্লিনা' বলিয়া বারম্বার তাহাকে ভেঙ্গাইয়া আবার তিরস্কার লাভ করিল। এমন সময় হঠাৎ অদূরে কেহ ডাকিল "কমলা!" মেয়েটি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল, প্রভাতসূর্য্য তাহার সমস্ত আলোক একত্র করিয়া সেই সময়ে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিলেন, জগতের সমুদয় সার্থকতার আনন্দ পুষ্পবাস-আকুলিত এলোমেলো দক্ষিণে হাওয়া বহন করিয়া আনিল, অদূরে বাঁশির গান যেন যবনিকার অন্তরাল হইতে তাললয়ে ভাসিয়া উঠিতেছিল, শচীকান্ত দেখিল সে এতদিন প্রকৃতির গড়া এবং মানুষের রচিত অনেক সুন্দর জিনিষের উপরেই চোখ ফেলিয়াছে কিন্তু এই চোখের তারা দুইটির মত এমন সুন্দর জিনিষ আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। শচীকান্তের দিকে নজর পড়িতেই মেয়েটি সচকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। পুলককণ্টকিত শরীরে ব্যগ্র হইয়া শচীকান্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নিখিলনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "আসুন শচীনবাবু, মিষ্টিমুখ না করলে ঠাকুমা মেয়ে দেখাবেন না! কিছু ঘুষ আর কি, বুঝেছেন ত—"

দ্বিরুক্তি না করিয়া শচীকান্ত আসন ত্যাগ করিল, 'ক্ষুধা নাই' ইত্যাদি লৌকিকতার

বাঁধা গৎ ঝাড়িতেও তাহার রুচি হইল না, এমনি সে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিলনাথ কহিলেন "কমলকে তোমার মনে ধরবে, সে ভয় আমি করিনে, কিন্তু দানের যোগ্য দক্ষিণা দিতে পারব না এইটেই হচ্চে আদৎ ভয়! সময় বড় মন্দ, নূতন বেরুচ্চি, আর কিছু দিন—"

শচীকান্ত অসহিষ্ণুভাবে হাসিয়া বাধা দিল, "কিছু দরকার নেই, আপনাকে ও জন্যে একটুও কুণ্ঠিত হতে হবে না।"

নিখিলনাথ ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন "এসো।"

"শচীন্ না? একি এর মধ্যে বাড়ী থেকে ফিরেছ যে, ব্যাপার কি?"

একজন সহাধ্যায়ী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দরজার ভিতর দিয়া তাহাকে দেখিতে পাওয়ায় এই কথা বলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। "কবে এলে?" "পরশু"। "এত শীঘ্র! মোটে ত পাঁচদিন ছিলে তাহলে? বাড়ীর খপর ভালতো, বাবা ভাল আছেন?"

অকস্মাৎ ঘরের ছাদ ফুঁড়িয়া নিমেষে আকাশ হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল। সকাল বেলাকার সমস্ত উজ্জ্বলতা এককালে অমাবস্যা রাত্রির গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া শচীকান্তের মুখের উপর যেন খানিকটা কালী মাখাইয়া দিল। কষ্টরুদ্ধশ্বাসে সে কোনমতে উচ্চারণ করিল "হুঁ"। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করিবার শক্তিটুকু আর তাহার রহিল না। তাহার এই আড়ষ্টতার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বন্ধুটির কোন ধারণাই ছিল না; কাজেই চোখের উপরে তাহার সন্দেহ করিল না। সহজভাবেই বলিয়া গেল "শ্রীরামপুরে সেদিন গেছলুম,—মৈত্রমশায়ের শ্রাদ্ধে মস্ত পণ্ডিতসভা বসেছিল; দেশের সমস্ত বড় পণ্ডিত সেখানে জমা হয়েছিলেন। তোমার বাবাও এসেছিলেন। একে তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত তাতে ওঁদের কুলগুরু। কী সম্মান তাঁর; একধার থেকে সব্বাই উঠে দাঁড়াল, পায়ের ধূলো নেবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল যেন। ঐ রকম হওয়া যায় তবেই লেখাপড়া শেখা সার্থক। তুমি অমন আদর্শটা ত্যাগ ক'রে ভাল করলে না, শচীন্? আচ্ছা এখন তবে চল্লাম, ওবেলা আসবো'খন।"

বন্ধুটি যেমনি অতর্কিত আবির্ভূত হইয়াছিল তেমনি সহসা অস্তগত হইয়া গেল। কিন্তু দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু যেমন অকস্মাৎ একদিন গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া সুদূর ভূমণ্ডলের মধ্যে একটা বিপ্লব সংঘর্ষ আনয়ন করিয়া দিয়া আবার নিজেরই কেন্দ্রপথে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়; পশ্চাতে কাহার জন্য কি রাখিয়া গেল তাহার কিছুই জানিতে পারে না, এই ছেলেটিও তেমনি ইহাদের মধ্যে কতখানি মনস্তাপ ঘটাইয়া গেল সে সংবাদে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়া হাসিমুখে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাস্তা দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নিখিলনাথ কহিলেন "আপনার বাপ আছেন, তিনি মস্ত পণ্ডিত, এসব লুকিয়ে রাখবার অর্থ কি?" তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। শচীকান্ত নীরব নতমুখে রহিল। তাহার আর বলিবার

অপমানে তাহার সর্ব্বশরীরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। নিখিলনাথ পরুষকণ্ঠে পুনশ্চ কহিলেন, "যা হবার হয়ে গ্যাছে, আমারও একটা শিক্ষা হলো। পয়সা নেই; অভিভাবকদের দরে এঁটে উঠতে পারিনে, তাই নিরভিভাবক পাত্র খুঁজতে গেছলাম।"

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নির্ব্বাক শচীকান্তের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল "একটু দয়া করে বিচার করুন। রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হওয়ায় দোষ কি? আমার উদ্দেশ্যটা ছোট ছিল না।"

নিখিলনাথ দাঁড়াইয়াছিলেন, শচীকান্তের মুখে অকথ্য লজ্জার ছায়া দর্শন করিয়া তাঁহার সরলচিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। আসল কথা তিনি একটু বেশি রকম নব্য-তন্ত্রের লোক, কুল, শ্রেণী এ সকল মানিতেন না। একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, "ভেবে দেখলে তাতে দোষ কি?"

"তবে আমায় ত্যাগ করবেন না। বাবাকে জানাবো, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনি মত করবেন বলুন।"

নিখিলনাথ কহিলেন "তিনি কি মত দেবেন?" শচীকান্ত নতমুখে উত্তর করিল "যদি দেন আপনার অমত হবে না?" তাহার স্বর গভীর সংশয়োদ্বেগে কম্পিত হইতেছিল। প্রথম যৌবনের উত্তেজনা মানুষকে যে সকল দুঃসাহসিক কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়া তুলে সহজে তাহা হইতে মন ফিরান যায় না। নিখিলনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন, পরে কহিলেন "কাজটা বড় অন্যায় করেচেন, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে যদি এই অনর্থক

হতে পারে। আপনার বাপ নিজে দাঁড়িয়ে যদি এবিয়ে দেন তবে আমি খুসী হয়ে কমলাকে দান করবো, নচেৎ না। সে আমার বড় আদরের বোন! আজ তবে এখন বিদায়।"

(৬)

বৈশাখ মাসের সকাল বেলাটা ছোট মেয়েদের বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে। ভোর থাকিতে থাকিতে গাছ মুড়াইয়া ফুল তোলা হইয়া গিয়াছে। বাটি ভরা ভরা চন্দন তৈয়ারী। কলসীভরা জল, মুটা ভরা কচিবার্লি, গণ্ডা গণ্ডা কড়ি, বাঁটা হলুদ, জোয়ানের পুটুলি, সিন্দুর কৌটা, চালের পিটুলি এমনিতর বিবিধ সরঞ্জামে ছোট ছোট সাজি ও পিত্তলথাল ত্বরিতগতি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেহ গৃহপালিত গাভীটিকে সিন্দূরচন্দনের ফোঁটা দিয়া কদলী হাতে মন্ত্র পাঠ করিতেছে,---

"গোকল, গোকুলেবাস গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস, আমার হোক বৈকুণ্ঠে বাস!"

কোথাও বা শ্বেত চন্দনের বক্র আঙ্গুলীযুক্ত দুইখানি পা আঁকিয়া তাহারি উপরে জোড়া মল্লিকাফুল চাপাইয়া বালিকার দল সমস্বরে পাঠশালার নাম্‌তা পাঠের অনুকরণে মন্ত্রপাঠ করিতেছিল "চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা," ইত্যাদি। এইরূপে দশপুত্তল আদাহলুদ প্রভৃতি বালিকা-ব্রত চারিদিকেই মহাউৎসাহ কোলাহলের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল। কাহারও মুহূর্ত্তের হাঁফ ফেলিবার ফুরসৎ নাই।

পুণ্যিপুকুর ব্রতটি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠা

অনুষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া ছোট মেয়েরা আব্দার করিয়াও হঠাৎ এই মন্ত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারে না। কেবল কোন কোনও অভিভাবিকা শিবপূজার ফলে শীঘ্র শীঘ্র শিবের মত বর লাভ হইবে বলিয়া নিজের কাজের ক্ষতি করিয়াও মেয়েকে ব্রত করান। উঠানের এক পাশে হাতে কাটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকানা পোঁছান পাড়ে পূজার উপকরণ সাজাইয়া বসিয়া পুষ্করিণীর গর্ভে তুলসি চারা ও বিল্বডালের তলায় শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া রোরুদ্যমানা পূজারিণী মাতৃ শিক্ষানুযায়ী আবৃত্তি করিতে থাকে, "থব্বং থুল থলন্ত গজন্ত বদনং লম্বোদর, পেচ্ছন্নং মদগন্ধ মধু লুপ্ত—" ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাতিনী গৌরী মেয়েটির এতটুকু মেয়েলী ধরণ নয়। ছিপে করিয়া মাছধরায়, জল ডেঙ্গাডেঙ্গি খেলায়, এমন কি বলিতে লজ্জা করে পেয়ারা গাছের অনতি উচ্চ ডালেও কখনও কখনও তাহার সেই দুষ্টামি ভরা হাসিমুখ খানি সাত ভাই চম্পার ছোট বোন পারুলটির মত ফুটিয়া থাকিতে দেখা যাইত। সকল ঘরের সকল ঝি-বউ ব্রত কর্ম্মে ব্যস্ত, এমন দিনেও সে দস্যি দাদা মশায়ের পূজার উদ্যোগটি করিয়া দিয়া চুপি চুপি খিড়কি দোরের দিকে পা টিপিয়া চলিয়াছে। মেয়েটি মাতৃহীনা—বাপও একরকম নাই বলিলেই হয়; মেয়েটি যখন মাতৃগর্ভে তখনি তিনি একটা বড় রকম সুপারিষের জোরে এ্যাসিস্‌-ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইতে সিভিল সার্জ্জনের পদে উন্নীত হইয়া যুদ্ধের উপলক্ষ্যে বহুদূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত

পত্নীর মৃত্যু এত বড় বড় ঘটনার সংবাদও তাঁহার নিকট হইতে—না একলাইন সংবাদ আদায় করিতে পারিয়াছে—না তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকটে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। গৌরীকে তাহার মাসিমা বিন্ধ্যবাসিনীই মানুষ করিয়াছেন। মেয়ের রকম সকম দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া উঠিতেছিলেন! বড় হইতেছে এখন কোথায় দিন দিন ঘরকরণার কাজকর্ম্ম শিখিবে, মাসীর ছেলে বহিবে, ব্রত নিয়মাদি শিখিবে তাহা না হইয়া সৃষ্টিছাড়া মেয়ের কেবলই ছেলের দলে ভিড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতে মন। বাড়ীর লোকে ভর্ৎসনা এবং পাড়ার লোকে নিন্দা করে, বিন্ধ্যবাসিনী লোকের উপর অভিমান করিয়া বোনঝিকে শাসন করিতে গিয়া আদর করিয়া বসেন। মমতাময়ী মেয়েটার মুখে যে কি আছে তাহার দিকে চাহিলেই, পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া নির্ঝরের ধারা সৃষ্টি করে। আজ পাঁচজনের সমালোচনায় জিদ করিয়া বিন্দুবাসিনী তাহাকে পলায়নকালে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। সে আঁকিয়া বাঁকিয়া অনেক কৌশলেও মাসিমার হাত ছাড়াইয়া মুক্ত হইতে পারে নাই। বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে ধরিয়া পুণ্যি পুকুরের নিকটে আনিয়া বসাইলেন; নিজেই গোময় মৃত্তিকার গোলা করিয়া চারিধার নিকাইয়া পুষ্করিণীর জীর্ণসংস্কার করিলেন। তারপর যথাবিধি আয়োজন শেষ হইলে তাহার হাতে জবাফুলের অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া কহিলেন যে, সূর্য্যির দিকে চেয়ে এখন বল্ "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং—

গৌরী গোঁ হইয়া বসিয়াছিল, সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁঃ সূয্যির দিকে না কি চাওয়া যায়? তুমি চাওনা দেখি!"

"এত বেলা করিস কেন? আচ্ছা ঐ পূবদিকে চেয়েই বল্ তাতেই হবে। শীগ্‌গির সেরে নে বাবু, উনোন ওদিকে জ্বলে যাচ্ছে। এতবড় মেয়ে নিজে একটা বত্ত করতে শিখলি নে, তোরজন্যে আমি কি যে করি বাপু। আর হাত দিয়ে ঘটিটা ধর, শিবের মাথায় জল দিতে দিতে বল্,

"পুণ্যি পুখুর পুষ্পমালা, কে পূজোয় দুপুর বেলা? আমি সতী লীলাবতী, ভায়ের বোন ভাগ্যবতী, শিল, শিলেটন, শিলে বাটন, শিলা আছেন ঘরে? স্বর্গ থেকে মহাদেব বলেন গৌরী কি বত্ত করে? আকন্দ ফুল বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গাজল, এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।" প্রণাম করে চলে যা, তুইও বাঁচ্ আমিও বাঁচি।"

প্রণাম করিয়া ব্রতকারিণী প্রশ্ন করিল "কই মহাদেব তো জিজ্ঞেস করলেন না, মাসিমা।" মাসিমাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

"কৈ জিজ্ঞেস করলেন না ত—"গৌরী কি বত্ত করে? তবে কিন্তু আমি আর তাঁকে পূজো কবব না। দাদামশাই বলেন তাঁর ঠাকুর ডাকলেই আসেন। কাল থেকে তাঁকেই গৌরী পূজো করবে, এ ঠাকুর কথা কন না, আসেন না এঁকে আর গৌরী পূজো করবে না।", দুঃসাহসিকা বালিকার বুকের পাটা দেখিয়া মাসিমা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বড়বধূ কখনও রৌদ্রের তাপে ঠেলিয়া দিতে দিতে তাহার জীর্ণ বক্ষপঞ্জরে সর্ষপ তৈল প্রলিপ্ত করিয়া দিতেছিলেন। বৃদ্ধা গৃহিণীর শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছিল, তথাপি পুরাতন হাড় ভাঙ্গিলেও মচকায় না। কাপড় কাচিয়া ইহারি মধ্যে আরতির জন্য তুলার সলিতা তৈরি করিতে বসিয়াছিলেন। সলিতা পাকান হইয়া গেলে ঠাকুরের জন্য পান তৈরারি করিবেন। ছেলেমানুষদের হাতে কখন কি অনাচার ঘটে সেই ভয়ে তিনি ঠাকুরসেবার কোন কাজই ছোটদের হাতে দেন না। কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে সকালবেলার পূজার উদ্যোগটি চিরদিন ধরিয়াই ঘরের কুমারী মেয়েরা করিয়া আসিতেছে।

বিন্ধ্যবাসিনী হাঁড়ি হেনসেল তুলিয়া রাখিয়া আহারে বসিয়াছেন, কাছে বসিয়া গৌরী একটা চঞ্চল বিড়ালশিশুকে আদর করিতেছিল, সে শিশু বাহাদুরীর মধ্যে তাহার নিজের মায়ের মুখের গ্রাস মৎস্যখণ্ড কাড়িয়া আনিয়া সগর্ব্ব আনন্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অদূরে 'মেনুর' মা 'পুষুমণি মল্লিকার গোড়েগাছার মত মোটা লেজটি ফুলাইয়া তাহাকে এধারে ওধারে দুলাইতে দুলাইতে ছেলের কীর্ত্তি বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল। মানুষের মতই সে সন্তানের এই স্নেহোপদ্রব সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। এই মাতৃস্নেহের অমৃতাস্বাদ যে পাষাণ গ্রহণ করিতে পারে না, সে বৃথাই মাতৃগর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, সে নিতান্তই হতভাগ্য!

ভাত রেখো মা, এক চাকলা আম আছে দুধ দিয়ে দুটি খাবে।” শুনিয়া গৌরী বিড়ালছানাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া কহিল “বসো মাসিমা আমি তোমায় দুধ এনে দিচ্ছি।”

প্রতিবেশিনীরা দুএকজন করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নাতি বা ভাইপো কোলে লইয়া “কি করছোগো ঠান্‌দি, খুড়ি, বা মাসী! বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহরের সভা প্রতিদিনই এই বাড়ীর অন্তঃপুরে জমিয়া থাকে, তবে আজকাল পূর্ব্বের মত ততখানি জমকায় না কারণ বৈশাখ মাসে অনেকের বাড়ীতেই ‘বৈকালিক’ সাজাইবার হাঙ্গামা আছে, সেইজন্য গৃহকর্ত্রীগণ বাড়ীছাড়া হইতে পারেন না।

দক্ষিণপাড়ায় সেজগিন্নি আসিয়াই কহিয়া উঠিলেন “আর শুনতে পাচ্চো খুড়ি! দয়াল বাঁড়ুয্যের ছোট বউ সহুরে মেয়ে কিনা ছেলেটাকে একেবারে তুক্‌ করে ভেড়া বানিয়েচে! দিনে দুপুরে বোয়াগীর সঙ্গে কথা কয়! দেশে রোগ আকাল হবে না!” বাহির বাড়ীর দিক হইতে জুতার শব্দ হইল, গঙ্গামণি ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া দেখিলেন,—এ বাড়ীতে এরকম ভারি জুতা পায়ে দিয়া চলিবে কে? ভক্তিনাথ খড়ম ব্যবহার করেন, তাঁহার পিতা তাও করেন না। একটা ক্ষীণকণ্ঠ শুনিতে পাওয়া গেল “মা!”

“কে রে? আমার শচীন্‌ ফিরে এলি?” ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া গঙ্গামণি সবেগে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন “কেন বাবা, এরি মধ্যে আবার ফিরে এলি কেন? ভাল আছিস ত বাপ?”

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী মা শিহরিয়া উঠিলেন। একি হইয়াছে! সেদিনমাত্র সুস্থ ছেলেকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, আর আজ সে একি মূর্ত্তি হইয়া ফিরিল। যেন কত বড় একটা রোগযন্ত্রণায় দুই চোখের নীচে পুরু হইয়া কালী পড়িয়াছে! কষাঘাতলাঞ্ছিত কয়েদী যে রকম ক্লিষ্টভাবে চলাবেলা করে তেমনি তাহাকে যেন অবসাদের গভীর গহ্বরতলে ঠেলিয়া ধরিয়াছিল। শচীকান্ত মায়ের আশ্চর্য্যদৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল “হঠাৎ বড় অসুখ করেছিল মা, তাই ফিরে এলুম। বাবা কোথা? বাইরের ঘরে দেখলুম না ত?”

গঙ্গামণি আঁচল দিয়া পুত্রের ললাটের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতে দিতে উত্তর করিলেন “তিনি ত বাড়ী নেই, শ্রীরামপুরে রয়েছেন যে। কি অসুখ হয়েছিল? পথ্যি করেচ?”

হ্যাঁ সে এখন সব ভাল হয়ে গ্যাছে। বাবা কবে ফিরবেন জানো?”

“শুনচি ত আরো দিন আষ্টেক লাগবে। আয় তবে চান্‌ করে নে, দুটি ভাত ততক্ষণে ফুটিয়ে দিচ্চি।”

পিতা গৃহে উপস্থিত নাই শুনিয়া একদিকে শচীকান্তের বক্ষের উদ্বেগ আলোড়ন যতখানি কমিয়া গেল অন্যদিকে ঠিক সেই পরিমাণেই সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সে যে জন্য আসিয়াছে তাহা সাধন করা যে কতখানি কঠিন তাহা তাহার নিজের কাছে অজানিত নয়। ছোটবেলা হইতেই সে তাহার স্থিরদৃষ্টি গম্ভীরমূর্ত্তি পিতাকে বেত্রহস্ত

পরিমাণে ভয় করিয়া আসিয়াছে। আড়ালে যতই সে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া চোখের উপর চোখ তুলিয়া ধরিতে তাহার ভিতরের অপরাধ তাহাকে তত বেশী করিয়া সঙ্কুচিত করিয়াছে। তাই নিজের অন্তরের মধ্যে সে তাহার আপনার অধিকার সন্তানের দাবীকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। পরের মত কেবল সন্দেহ ভয় ও অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া গিয়াছিল। কাছে আসিবার চেষ্টাও ছিল না এবং ইচ্ছাও ছিল না। আজ সেই পিতাকেই তাহার একান্ত প্রয়োজন। শচীকান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল।

সেদিন 'কন্যা' দেখিতে গিয়া আকস্মিক বজ্রদীর্ণমস্তকে শচীকান্ত ঘরে ফিরিয়াছিল, সেদিন তাহার অপমানক্ষুব্ধচিত্ত ক্ষণকালের জন্য নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণাধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! সেই আত্মধিক্কারের মধ্যে সে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, এই লজ্জাজনক ব্যাপারের পর ইহাদের সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধে আসা আর চলে না, সে এখানকার বাসা উঠাইয়া দূরে সরিয়া যাইবে, এবং এই সমাজসংস্কারটার দ্বারা নিজের নামকে অমর করিয়া তোলার লোভ সম্বরণ করিয়া এই মুহূর্তের লজ্জাকে একেবারে বিস্মৃতির মধ্যে চাপা দিয়া ফেলিবে। কিন্তু বেশিক্ষণ সে এই সঙ্কল্পকে নিজের আলোড়িতচিত্তে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না। কারণ বোধহয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিতে পারে। সেদিনের আলোকোজ্জ্বল প্রভাতটি তাহার চিত্তে বিগত বসন্তের সমুদয় মধুরতা ঢালিয়া দিয়াছিল, এবং তাহারই মধ্যে সেই পক্ষী-সহচারিণী মেয়েটি তাহার মুগ্ধনেত্রে দৈত্যপুরীর রাজকন্যার মত ললিত সৌন্দর্য্যময় সোনার কাঠির স্পর্শে, একটা গুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। শচীকান্ত সেই মোহমাখা মুখখানার ছবি মনের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত লজ্জাকে জোর করিয়া জয় করিয়া লইল! সে মুখের কাছে আকাশ আপনাকে নত করিয়া আনে, বাতাস আপনাকে নিবেদন করিয়া দেয়, আর এই আত্মনিবেদনকারী হৃদয় লইয়া তাহার মানব চিত্ত কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে? সে ত তাহাকে নিজেরই 'কনে' ভাবিয়াই সেই অম্লান সূর্য্যকরে 'শুভক্ষণে' শুভদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়াছে। এখন আর তাহার সম্বন্ধ ছাড়াইতে যাওয়া চলে না।

শচীকান্ত বারবার করিয়া এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিল। পূর্ব্বে সে বিশেষ কোন আগ্রহ লইয়া এতবড় একটা কাজে হাত দেয় নাই, কিন্তু কতবড় একটা মিথ্যার সাহায্য গ্রহন করিয়া বসিয়াছিল তাহা বুঝিয়াও সেটাকে সে ছাড়িতে পারিতেছিল না। সে নিজের মনকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিল যে আমিতো উঁহাদের কাছে নিজেকে রাঢ়ীশ্রেণী বলি নাই, উঁহারা এই বিশ্বাস লইয়া আপনা হইতে সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছেন ইহাতে আমি কি করিব? মিথ্যার মধ্যে বলিয়াছি অভিভাবক কেহ নাই, তা এমনিই দোষ কি? এখন বড় হইয়াছি, চিরদিন কিছু সকলেই অভিভাবকের শাসনে

বদ্ধ থাকে না; কিন্তু এখন সে নিজের ভিতরে একটা তীব্র আগ্রহ অনুভব করিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল যথার্থ যদি বাবার মত লইয়া এ বিবাহ করিতে পারি, সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিব।

পিতা বাড়ী নাই শুনিয়া তাহার মনটা একটু সুস্থ হইল, তবু দুদিন জিরাইয়া লইতে পারিবে। আবার বিলম্ব হইয়া গেলে হয়ত—বড় মেয়ে তাহারা ব্যস্ত হইয়া অন্য পাত্র দেখিতেও পারে এই ভাবিয়া একটু উদ্বিগ্নও হইল। ভক্তিনাথ কহিলেন কলিকাতায় "বসন্ত হচ্চে শুনেই যেতে বারণ করেছিলেন; শুনলে না চলে গেলে। যাহ'ক সামান্য অসুখের উপর দিয়ে গিয়েছে সেই ভাল।" (ক্রমশঃ)

গুজরাত

(পল্লী হইতে নগরে)

গুজরাত-পল্লী হইতে সহরে যাইবার জন্য একমাত্র যান গরুর গাড়ী,—কখনও কখনও গরুর গাড়ীতে কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তবে রেলের গাড়ীতে উঠিতে হয়; এই গরুর গাড়ীতে ১০।১২টী লোকের বসিবার স্থান করিয়া লইতে হয়। কাজেই পাশাপাশি দুই সারি লোক পরস্পরের হাঁটুতে জড়াজড়ি করিয়া অকুলান স্থানটীতে কুলান করিয়া লয়। এই গোযানটী পথের ধূলিতে দিক আচ্ছাদিত করিয়া ও চাকার সংঘর্ষে একটী তালমানলয়বিশুদ্ধ সুর উৎপন্ন করিয়া স্বকীয় দেহভার দোলাইতে দোলাইতে ধীর মন্থর গতিতে ভূমির উচ্চ নীচ পরিমাপ করিতে করিতে চলে।

পল্লী হইতে সহরে যাইবার পথে—সমগ্র পল্লীর বাৎসরিক আনন্দের যে একটা স্থান,—যে স্থানে চৈত্রপূর্ণিমার, রাখী পূর্ণিমা বা কোন একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে মেলা বসে, সেই স্থানটা দেখিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। কোন পুরাতন কতকগুলি গাছ একত্র জড়াজড়ি করিয়া স্থানটীকে একটী শীতল সুপ্রসন্নতা দানে বহু বৎসর হইতে লোকের মনকে ভক্তিস্রোতে পূর্ণ করিয়াছে;—সেইরূপ স্থানে এই সকল মেলার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই সমস্ত গাছগুলির প্রতি নরনারীর দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি, রহস্যজটিল হইয়া একান্তই ভক্তি-বিনম্র রাখিয়াছে।

দ্রব্য সামগ্রী দেখিবার ও ক্রয় করিবার জন্য এই সব মেলা উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ এখানে দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা অতি সামান্যই থাকে,—তেল নুন কাপড় ও সহর হইতে আনীত বিলাতী নানা রকম খেলেনা ছাড়া আর বেশী কিছু জিনিষপত্র এখানে থাকে না। লোকসমূহের হাব ভাব, চলা ফেরা, বিচিত্র আকারের পাগড়িধারী পুরুষ ও নানা রঙ্গের সাড়ীভূষিতা রমণীগণই এখানকার প্রধান দর্শনীয় সামগ্রী। এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন ধরণের পাগড়ি বাঁধিয়া থাকে,

অনায়াসে। মেলায় যত সংখ্যক পুরুষ, স্ত্রীলোক তদপেক্ষা কিছুতে ন্যূন নয়; স্ত্রীলোকেরা সাহসী ও সবল; কাজেই জনতার অগ্রভাগে তাহাদের অধিকার।

এই মেলার প্রধান অঙ্গ, "উজানী" বা বনভোজন। মেলার চতুর্দ্দিকে স্ত্রীপুরুষেরা কেহ রন্ধনে কেহবা ভোজনে ব্যাপৃত; এই বন ভোজনের জন্যই মেলাতে এত অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। সকলেই স্বীয় স্বীয় বাসন-পাত্রাদি লইয়া আসে। খুব প্রত্যূষ হইতেই এখানে লোক সমাগম আরম্ভ হয়, এবং সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বেই সকলে আপন আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। দ্বিপ্রহরে সকলে লাড়ু, পুরি, ভাইজা, শ্রীখণ্ড, বাসুন্দি ইত্যাদি উত্তম চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সহকারে "উজানী" করিয়া মেলার আনন্দ সম্পূর্ণরূপে লাভ করে।

এখন এই মেলা ছাড়িয়া এস, একটী জনসংক্ষুব্ধ নগরীতে ঢুকিয়া পড়ি।

সহরে উপস্থিত পল্লিবাসীর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি সহরবাসীর নিকট নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। নাগরিকগণ "গামরিয়ার" প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। এই পল্লিবাসী আবার দুদিন পরে সহরবাসী হইয়া উঠিয়া নবাগত পল্লিবাসীর প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিতে ক্রটী করিবে না। পল্লী সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট,—সহরের জাঁকজমক পূর্ণ বাড়ী, বাঁধান রাস্তা ও গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়াইয়া একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পল্লীবাসীর হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড়, সহরে আসিয়া পদতল পর্য্যন্ত মিহি কাপড়ে পরিবর্ত্তিত হইবে; এবং সাধারণ ধরণের কুর্ত্তার বদলে বিলাতী জামা কাপড় ও টুপিতে আপাদ মস্তক সুশোভিত হইয়া উঠিবে। পাগড়ির পরিবর্ত্তে মূল্যবান টুপি সভ্যভব্যতার আদর্শকে উন্নত করিবে।

সহরের চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন, গুর্জ্জরের প্রাচীন নগরীগুলির বিশেষত্ব। মুসলমান রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবার জন্য এইরূপ প্রাচীরের সৃষ্টি। এই বেষ্টিত নগরীর বিপুল দরজা দিয়া নগরে প্রবেশ কর, ভিতরে প্রবেশ করিয়াও এইরূপ বহির্দ্বারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না,—পথ বাহিয়া কিছু দূর যাইয়া বিভিন্ন মহল্লায় প্রবেশ করিতে হইলেও এইরূপ এক একটী বহির্দ্বার অতিক্রম করিতে হইবে। কাজেই মহল্লাগুলি বিরাট সহর-রূপ-সিন্ধুকের অভ্যন্তরস্থ স্বতন্ত্র কক্ষাবলী বলিয়া মনে হয়। মুসলমান রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণ ও চোর ডাকাত প্রভৃতির সবল হস্ত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য এইরূপ অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে-হইয়াছিল। মহল্লার দরজা পার হইয়া গলি দিয়া যাইয়া একটী বাড়ীতে ঢুকিতে যাও দেখিবে, সেখানেও একটি কঠিন দ্বার আক্রমকের সজোর আঘাতকে প্রহত করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। এই দরজা পার হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর, প্রথমেই আকাশ অবচ্ছেদযুক্ত একটী অঙ্গন,—এটী বাড়ীর বহির্ভাগ বা বৈঠকখানা, তার পিছনের দিকে অন্যান্য কক্ষ শ্রেণী, কক্ষের দ্বার বিশেষতঃ জানালাগুলি এত ক্ষুদ্র যে গৃহগুলি মনুষ্য-বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতি অল্পই আলো ও বায়ু গৃহপ্রবেশের

অধিকার প্রাপ্ত হয়। গৃহের পশ্চাদ্দিকের গৃহগুলি এত অন্ধকার যে সেখানে কোন পদার্থ অন্বেষণ করিতে হইলে দিনের বেলায় আলো জ্বালিতে হয়। বহুদিনের পুরাণ বাড়ীগুলিতে গৃহের ভিত্তিতলে চোর কুঠরী দৃষ্ট হয়।

গৃহের উপরিতলে উঠিবার সিঁড়ি এত ক্ষুদ্র যে কোন রকমে মাথা গলাইয়া উপরে উঠিতে হয়; এই সিঁড়ির উপরি ভাগে সিন্ধুকের ডালার মত ডালা থাকে, রাত্রিতে সেই ডালা ফেলিয়া দিয়া সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র ইঁদারা অর্থাৎ কূপ গৃহ কার্য্যের সমস্ত জল সরবরাহ করে।

সহরের উদ্দাম চেষ্টার ক্ষেত্র এখানকার নানা প্রকার কলকারখানাগুলি; এক একটী কারখানায় বহুতর লোক আপনার শ্রমলব্ধ অর্থ উপার্জ্জন করে; এই সমস্ত কারখানার অধ্যক্ষেরা বিপুল ধনসমাগমের নানা ফন্দি বাহির করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ব্যবসা বাণিজ্যে এই সমস্ত লোক চতুর হইলেও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ততদূর দৃঢ় চিত্ত নয়,—প্রভূত লাভের উপায় বাণিজ্য কেন্দ্রটীকে সামান্য ক্ষতি দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকার বা উৎকৃষ্ট মাল উৎপন্ন করিয়া প্রতিযোগী বাণিজ্যকে পরাস্ত করিবার দক্ষতা পাশ্চাত্য জাতির মত ইহাদিগের নাই। মূল ধনের অল্পতাই ইহার কারণ নয়—প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দৃঢ়তার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। তথাপি বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহুগুণে সফলতা লাভ করিয়াছে।

গুজরাত নগরীতে শতকরা ৮৫ জন হিন্দু, ১১ জন মুসলমান ও ৪ জন অন্য জাত। অধিকাংশ নগরীই কলকারখানায় মুখরিত, শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক এই কলকারখানা দ্বারা প্রতিপালিত এবং প্রায় সমস্ত অধিবাসীই এই কলকারখানার সহিত কোন না কোন স্বার্থাংশে জড়িত।

সামান্য মজুরেরা মাসিক ৩০।৩৫ টাকা ও উর্দ্ধশ্রেণীর মজুরেরা ৮০।৯০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ভোর ৬টা হইতে কারখানার কাজ সুরু হয় এবং সন্ধ্যা ৬৷৷টা পর্য্যন্ত কাজ চলিতে থাকে। মজুরদের বিশ্রাম ও আহারের জন্য ১২৷৷টা হইতে একটা এই আধঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। ভোরে ৫টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া তাহারা কলের কাজে লিপ্ত হয়। বেলা ১০টা ১১টার সময় মজুরদিগের পরিবারের মহিলারা রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং স্ব স্ব স্বামীপুত্রদিগকে প্রদান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। সন্ধ্যা ৬৷৷০টার পর মজুরেরা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রির আহার সম্পন্ন করে।

কাপড়ের কারখানা গুলিতে বাহিরের বায়ু সূতার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টজনক বলিয়া কারখানার দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়, ইহাতে ভিতরের বায়ু কিরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে—তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু শৈশবকাল হইতে মজুরেরা এই বদ্ধ বায়ু গ্রহণে অভ্যস্ত বলিয়া এবং সর্ব্বক্ষণ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় এই অস্বাস্থ্যকর বায়ু সত্ত্বেও তাহাদের মাংসপেশী সবল।

এই সমস্ত কলে শেষ রাত্রিতে কলের বাঁশী বাজিলেই কারিগরেরা কলের দিকে ধাবিত

হয়। দ্বিপ্রহরে ১২॥টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত তাহারা ছুটী পায়। তারপর আবার ১টা হইতে ৬॥টা পর্য্যন্ত কাজে লিপ্ত থাকে। কাজের মধ্যেও বিশ্রামের অতি সামান্য অবসরও তাহারা করিয়া লইতে পারে। শনিবার ৪টার সময় ছুটী হয়। রবিবার কল বন্ধ থাকে। ১৫ দিন অন্তর মজুরেরা মাহিনা বুঝিয়া লয়। অধিকাংশ কারখানাই উৎপন্ন দ্রব্যের উপর হিসাব করিয়া মাহিনা দিয়া থাকে।

এই কলকারখানা গুলির জন্য সহস্র লোক পল্লিগ্রাম ছাড়িয়া ভিড় পাকাইয়া সহরে বাস করিতেছে। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকও পল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কারখানার কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। প্রত্যেক কারখানাতেই মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এই উপার্জ্জনসক্ষমা স্বাধীনা নারীগণ সুদূর পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া অনেকেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে, তাহাতে সহরের নৈতিক চরিত্র নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠে।

কলকারখানার লোকদিগের অবস্থানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা বহুতর লোকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন,—বিস্তৃত গৃহের সারি সারি দরজা; মজুরেরা কেহ পরিবার লইয়া কেহ একেলা এখানে বাস করে।

উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিলাসিতা প্রভূত পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। কারখানার কালিঝুলের মধ্যে তাহাদের এই বিলাসিতা চরিতার্থ হয় না। কোন পর্ব্বদিনে বা কলকারখানা বন্ধের দিনে এই মজুরেরা 'ফিট বাবু' হইয়া রাস্তা ঘাট সচকিত করিয়া তোলে।

কলকারখানার কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী খাদ্য মজুরেরা প্রত্যহ আহার করে। প্রচুর পরিমাণ ঘি রুটী তাহাদের নিত্য আহার।

এই সমস্ত কলকারখানা গুলি প্রায় মধ্য-শ্রেণীর লোকের সমবায় চেষ্টায় গঠিত। একটা কথা খুব শোনা যায়, বিধবার টাকায় এই কারখানাগুলি চলিতেছে। বাস্তবিকই এই সমস্ত কারখানায় বিধবাদের টাকার প্রচুর অংশ আছে। কারণ তাহারা একটু লাভের আশায় টাকাগুলি "ব্যাঙ্ক" বা কম্পানীর কাগজে জমা না রাখিয়া মিলে লাগাইয়া প্রচুর উপার্জ্জন করে। কলকারখানাগুলির ক্ষতি হইলে বিধবারাই প্রথমে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। এই কলকারখানার পরিচালকগণ 'মিলের' প্রচুর লভ্যাংশ লাভ করিয়া ধনীশ্রেণী রূপে পরিচিত, তাঁহারাই সহরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর বাসিন্দা।

সহরের নিম্নশ্রেণীর নারীগণ খুব কর্ম্মক্ষম। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা পারিবারিক কোন না কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকে। শেষ রাত্রিতে আপন আপন স্বামীপুত্র-দিগকে কলকারখানার কাজে পাঠাইয়া সেই সময় তাহারা 'ধানভাঙ্গা' 'গমপেষা' ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য করে। এই ত গেল সহরের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীর কথা।

ধনীশ্রেণীর মহিলাদিগের গৃহের কাজ খুব সামান্য; বাহিরেও বিদ্যাচর্চ্চা বা অন্য কোন কার্য্যের ক্ষেত্র নাই। কাজেই তাহাদের

জীবনটা খুব অলস ;—বিলাসিতাই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়।

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিলম্বে শয্যাত্যাগ করিয়া ধীরমন্থরভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করেন। অনেক সময় মহিলারা নিকটবর্ত্তী নদীতে স্নান করিতে যান। পুরুষেরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর 'চা' পান করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন, কেহ নির্দ্দিষ্ট কাজে যান, কেহবা রাস্তার মোড়ে, যেখানে বহুসংখ্যক লোক জটলা পাকাইয়াছে, সেই-খানে কলকারখানার সেয়ার ক্রয়বিক্রয়াদির কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ কাটাইয়া দেন।

ভোর বেলায় নগরের চারিধারে 'চা'র দোকানে ও মন্দির প্রাঙ্গণে বিলক্ষণ ভিড় দৃষ্ট হয়। নগরীর উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকই 'চা'পানে রত। দৈনিক ৫।৬ বার 'চা' পান তাহাদের অভ্যাস-দোষ-গ্রস্ত উপসর্গ।

মন্দিরে দেব দর্শনার্থ আবালবৃদ্ধবনিতার সমাগম হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ নারী সমাগমই এখানে অধিক; কারণ অধিকাংশ পুরুষ অতি প্রত্যূষে কারখানার কার্য্যে যোগ দিতে চলিয়া গিয়াছে; কোন পর্ব্ব উপলক্ষ্যে বা ছুটীর দিনে মন্দিরে স্ত্রীপুরুষের সমান ভিড়। জনতা ঠেলিয়া মন্দিরে ঢোকা তখন নিতান্তই কষ্টকর। মন্দিরের দেবতা রণছোড়জী, হনুমানজী, কালীমাতা ও জৈনদিগের তীর্থঙ্কর দেখিতে হইলে অন্য সময়ই সুবিধা।

ভোরের মত সন্ধ্যা বেলাও দেবদর্শন-প্রয়াসী নরনারীগণের হট্টগোল চলে। রাত্রি ৮।৯ টা না হইলে এ ভিড় শেষ হয় না।

জৈনদের ধর্ম্মের মন্দির গুলি গুজরাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। সাদা কালো মার্ব্বেল পাথরে ভিত্তিতল বাঁধান। অভ্যন্তর অতি পরিষ্কার ও ঝকঝকে। প্রধান কক্ষে কোন তীর্থঙ্করের সুচারু মূর্ত্তি। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বহুতর তীর্থঙ্করের প্রস্তর মূর্ত্তি। মন্দিরের স্থানে স্থানে পিঁপড়া ও কাঠবিড়ালীর আহারের স্থান আছে। যাত্রীরা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কাঠবিড়ালী ও পিঁপড়ার আহারের জন্য ছাতু চিনি ইত্যাদি প্রদান করে। সহরের বিভিন্ন অংশে রাস্তা ও গলির আশে পাশে কাঠ বিড়ালী প্রভৃতির আহারজন্য এইরূপ মঞ্চ নির্ম্মিত আছে। রাত্রিতে মন্দিরের ভিতর যে সমস্ত দীপ প্রজ্বলিত হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে কাপড়ের বেষ্টন আছে। পাছে কোন অগ্নিপ্রিয় কীটপতঙ্গ আত্মদানে আত্মনষ্ট করে ;—সেই জন্য এই সতর্কতা। জৈনগণ নিজ নিজ বাড়ীতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আপনার পয়সা খরচ করিয়া অন্যকেও ঐরূপ দীপবেষ্টনের পর্দ্দা তৈয়ার করিয়া দিয়া পরোক্ষভাবে শত শত জীবকে অগ্নি আহুতি হইতে রক্ষা করিয়া পূণ্য সঞ্চয় করে। জৈনেরা রাত্রিতে কদাচিৎ অগ্নি বা চুল্লি প্রজ্বলিত করে।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের শুভ্রবেশপরিহিত, মুণ্ডিতমস্তক জৈনযতি ও সন্ন্যাসিনীগণ তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের হস্তে কমণ্ডলু ও লোমবিনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী ; কোন স্থানে বসিতে হইলে জৈন যতি ও সন্ন্যাসিনীগণ এই সম্মার্জ্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে কীট বিদূরিত করিয়া শেষে উপবেশন করেন। মুখে পাছে কীট পতঙ্গ প্রবেশ করে এই ভয়ে একখণ্ড বস্ত্র তাহারা মুখে বাঁধিয়া রাখে।

গুর্জ্জর মালব ও রাজপুতানার জৈন

তীর্থে মঠ বহুতর, কাজেই তাহারা মঠ সংলগ্ন সদা ব্রতে উদরক্ষুধা নির্ব্বাণ করিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সমস্ত যতি-সন্ন্যাসিনীগণ সাধারণের বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপভোগ করে। তাঁহারা নিরহঙ্কার বিনয়ী ও স্বল্পভাষী।

বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে নগরীর অধিবাসীরা কিরূপে ভোজন সমারোহ সম্পন্ন করে এইবার দেখা যাক্।—

নিমন্ত্রিতেরা আসিয়া সদর রাস্তার এক দিকে স্থান করিয়া সারি বাঁধিয়া ধূলির উপর শালপাতা বিছাইয়া শালপাতায় প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্যাদি ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। রাস্তার এক অংশ দিয়া পথে লোকচলাচলেরও ব্যবস্থা থাকে। একদিকে পুরুষেরা অন্যদিকে নারীগণ উপবেশন করে। এক পাত্রের ভোজন সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইলে অন্যের পাতে তাহা প্রদত্ত হয়। উচ্ছিষ্ট বলিয়া তাহা গ্রহণে কেহ কোন আপত্তি করে না। সচরাচর এইরূপ বিরাট ভোজন ব্যাপার ধূলিপূর্ণ রাস্তাতেই সমাধা হয়; কিন্তু অনেক ধনীর গৃহে এইরূপ ব্যাপারাদির জন্য স্বতন্ত্র গৃহাদি আছে।

নগরীর পারসীক জনসংখ্যা সামান্য হইলেও একেবারে নিরুল্লেখযোগ্য নয়; কারণ তাহারাই গুজরাতের বিলাসিতার প্রবর্ত্তক। তাহাদের আচার নিষ্ঠা ব্যবহার সমস্তই পূর্ব্বে গুজরাতি হিন্দুদের অনুরূপ ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে তাহারা অতিদ্রুতগতি পাশ্চাত্য জাতির সমতুল্য হইয়া পড়িয়াছে। আত্মচেষ্টায় তাহারা কি ব্যবসা বাণিজ্য কি সামাজিক সভ্যতা—সকল বিষয়েই এতদূর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে যে দীনহীন পারসী বড় একটা দেখাই যায় না।

সহরের অধিবাসী বোরা মুসলমান শ্রেণী বাণিজ্য ব্যাপারে পারসীদিগের মতই সুদক্ষ। তাহারা বিনয়ী ও শিষ্টাচারী। গুজরাতে একমাত্র ইহাদের মহিলারাই প্রকৃত পক্ষে পর্দ্দানসিন্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

মণিবেগম

সৈয়দ অহম্মদ নজফীর দ্বিতীয় পুত্র মীরজাফর ইতিহাস-পাঠকমাত্রেরই পরিচিত। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পিতার অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিবন্ধন আলিবর্দ্দীর সংসারে আশৈশব প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ১৭২৬ (?) খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দী তাঁহাকে স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী শা খানুমের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ এই শা খানুমেরই গর্ভজাত। মীরকাশিম শা খানুমের গর্ভজাত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শা খানুম মীরকাশিমের উপর বিশেষ প্রসন্ন থাকায় তাঁহারই নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মীরজাফরের অন্যতমা সহধর্ম্মিণী মণিবেগম সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিব। মণিবেগম মীরজাফরকে অনেক সময় অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। এই মণিবেগমই উত্তরকালে জাফরের পত্নীদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ

করিয়াছিলেন ও সুখে দুঃখে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতে পারা যায়, মণিবেগম এমন কোন স্মরণীয় কাজ করিয়া যান নাই, যাহাতে তাঁহার নাম ঐতিহাসিকের নিকট স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার উপযুক্ত। তথাপি তৎকালে বাঙ্গলাদেশে তাঁহার কেন যে প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল তাহার কারণ নির্দ্ধারণে আমরা অসমর্থ। এ পর্য্যন্ত ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বড় একটা আলোচনা হয় নাই। কেহ বা মণিবেগমের নাম মাত্র করিয়াছেন, কেহ বা ক্বচিৎ তাঁহার জীবনের কোন ঘটনাবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ সম্ভবপর না হইলেও, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী হইতে যে চিত্রের আভাষ পাওয়া যায়; তাহাই আজ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

মণিবেগম কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি ও বব্বুবেগম উভয়েই প্রথমে নর্ত্তকী ছিলেন। নৃত্যকলাই বব্বুবেগমের বংশের উপজীবিকা ছিল। বব্বুবেগমের মাতার নাম 'বিশু'। বব্বু সম্মন আলিখাঁ নামক জনৈক মুসলমানের কন্যা। শিকান্দ্রার নিকটবর্ত্তী বলকুণ্ডা গ্রামে একজন বিধবা বাস করিতেন। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে তিনি নিজ কন্যার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হইয়া তাহাকে বিশুর হস্তে অর্পণ করেন। বালিকা সাজহানাবাদে (দিল্লীতে) ৫ বৎসর কাল অবস্থান করে এবং তথায় বিশুর অনুগ্রহে নৃত্যকৌশল শিক্ষা করে। বিশুর কন্যা বব্বু ও নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে নবাব সাহামৎ জং (নোয়াসিস মহম্মদ) সিরাজদ্দৌলা ও তদীয় ভ্রাতা ইক্রামুদ্দৌলার মহাসমারোহে বিবাহোপলক্ষে নাচগানের নিমিত্ত সাজহানাবাদ হইতে ১০,০০০ টাকা দিয়া বিশুবেগ ও তাহার নর্ত্তকী-সম্প্রদায়কে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। এই নর্ত্তকীগণের মধ্যে প্রাগুক্ত বালিকা মণিও ছিল। উৎসবান্তে নবাবের অনুরোধে দলস্থ লোকদিগকে তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হয়। মীরজাফর মণির নৃত্যগীতে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রত্যহই তিনি তাহার গৃহে একবার করিয়া যাইতেন। ক্রমাগত যাতায়াতে তিনি তাহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে আরও কিছুদিন তাহাকে তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মণিও স্বীকৃত হইল। মণির কিন্তু আর নৃত্যগীত ভাল লাগিল না—হৃদ্বিনোদন-বিদ্যাকুশলা মণি দেখিল, নবাবের মনোহরণ করিতে গিয়া সে নবাবকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিছুদিন পরে মীরজাফর মণিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বব্বুবেগমের সহিতও তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। (১) এই সময় হইতেই মণিবিবি 'মণিবেগম' নামে খ্যাত হন ও তাঁহার বাল্যের সঙ্গিনীদিগের সহিত সম্বন্ধ একেবারে

(১) Burke's Speech at the Impeachment of Warren Hastings (Bangabasi Edition)—p. 366 67 vol. I.

বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। স্বাধীনতাপ্রিয় যূথভ্রষ্ট বন্য হরিণীকেও প্রেমের মোহন ফাঁসে আবদ্ধ হইতে হয়—কলাবিদ্যানিপুণা নর্ত্তকী মণিকে পর্দ্দানশিনী হইয়া নবাবের অন্তপুরচারিণী হইতে হইয়াছিল। মণিবেগমের গর্ভে নিজামুদ্দৌলা ও সৈয়ফুদ্দৌলা এবং বব্বু বেগমের গর্ভে মোবারক-উদ্দৌলার জন্ম হয়। উত্তরকালে বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিক প্রণয়ের জন্য মণিবেগমই মীরজাফরের সর্ব্বাপেক্ষা আদৃতা হইয়া প্রধানা বেগম হন। সিরাজের হিরামিলের প্রাসাদ হইতে মীরজাফর যে সমস্ত রত্নরাজি গোপনে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে মণিবেগমই তৎসমুদয়ের অধিকারিণী হন।(২)

নবাব মীরজাফর বৃদ্ধ বয়সে শাসনকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় মীরকাশিমকে ডেপুটী নাজিমরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি নামে মুর্শিদাবাদের নবাব হইয়া থাকিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই কারণে তিনি শাসনভার পরিত্যাগ করায়, অনতিবিলম্বে council কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে মীরকাশিম নবাব-নাজিম হইলেন। জাফর ও তাঁহার পত্নী মণিবেগম অনুচরবর্গসহ অর্থাদি লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। তিনি ময়দাপটীতে জমী ক্রয় করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া মণিবেগমের সহিত কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া ছিলেন। (৩)

১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মীরজাফর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নূতন নবাব নিয়োগের জন্য মুর্শিদাবাদের রাজকোষ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। মীরজাফরের পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, নিজামুদ্দৌলাই তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ; বৃদ্ধ নবাব অন্তিমকালে তাঁহাকেই মসনদে বসাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মৃত্যু হয়। কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণ মীরণের শিশুপুত্রের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া নিজামুদ্দৌলাকেই মসনদে বসান। দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা কেহই মীরণের শিশুপুত্রের অনুকূলে ছিলেন না, কারণ তাহার নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা ছিল না, অধিকন্তু মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য জীবিত থাকিলে পৌত্রেরা পিতামহের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, এই সমস্ত কারণে পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক নিজামুদ্দৌলাই (৪) মসনদ প্রাপ্ত হন।

নিজামুদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হইবে তাহার খসড়াপত্র লিখিত হওয়ার পর কাউন্সিলের চারিজন সভ্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। পরে

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ—পৃঃ ৪৬৪।

(৩) Walsh's 'Murshidabad'—p. 152.

(৪) নিজামুদ্দৌলা যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাতা মণিবেগমের 'ফুলুরী' খাইবার স্পৃহা বলবতী হয়। সময়ে সময়ে তাঁহার দোহদ-ক্রিয়া প্রচুর ফুলুরী সংযোগে সম্পন্ন হইত। তজ্জন্য নিজামুদ্দৌলা ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার জননী তাহাকে 'মীরফুলুরী' বলিয়া ডাকিতেন।

Translator's Note—Mutaqherin p. 2 vol. III.

নানারূপ ভয় প্রদর্শনের পর নিঃশোষিত প্রায় রাজকোষ হইতেও অন্যূন ২০ লক্ষ টাকা বহির্গত হয়। (৫) মহম্মদ রেজা খাঁ এই অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই নায়েব সুবাদার হইবার উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন এবং তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিতেছিলেন, এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার ঢাকায় পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ যথাস্থানে নিয়োগ করিলেন। দুর্লভরাম এবং নন্দকুমার এই পদপ্রাপ্তির আশায় অনেক অর্থ ব্যয় করেন। পরিশেষে প্রচুর অর্থব্যয়ে রেজাখাঁই উক্ত পদে নিয়োজিত হন। (৬) নায়েব নিজামের জন্য ৫৩৮৬১৩১৷৵০ বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার মধ্যে ১৭৭৮৮৫৪৴০ নবাবের নিজব্যয় সঙ্কুলনার্থ এবং অবশিষ্ট সৈন্য ও বরকন্দাজ প্রভৃতি রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (৭)

নিজামুদ্দৌলা নিজামতি প্রাপ্ত হইয়া নন্দকুমারকে দেওয়ানী দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহার মাতা মণিবেগমও নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ প্রসন্ন না থাকায় তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। ১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ক্লাইভ নিজামুদ্দৌলার সহিত মিলিয়া কোম্পানীর প্রথম 'পুণ্যাহ' করেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে তিনি বিষমজ্বরে প্রাণত্যাগ করেন।

মীরজাফর ক্লাইভকে প্রকাশ্যভাবে যে দানপত্র লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই টাকা লইয়া যাইবার নিমিত্ত মণিবেগম ক্লাইভকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লেখেন।

মীরজাফরের দানপত্রে ক্লাইভকে নগদ ও হীরাজহরতাদি সমেত ৫ লক্ষ টাকা দিবার কথা ছিল। মৃত্যুকালে জাফর পুত্রকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে, ক্লাইভ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে উক্ত দানপত্রানুযায়ী টাকা যেন মিটাইয়া দেওয়া হয় এবং যদি তিনি প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার টাকা হুণ্ডীতে (Bill of Exchange) যেন বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দানপত্রে হীরাজহরতাদি সর্ব্বসমেত ৫ লক্ষ টাকা দিবার কথা ছিল। ক্লাইভ অনেক অনুরোধের পর মোহর হীরাজহরতাদির পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ২লক্ষ টাকার একখানি Nizamat Cheque ও বাকী টাকা নগদ দিতে হইবে, এই সর্ত্তে উহা গ্রহণ করেন। ক্লাইভ এই সময়ে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বেগম সাহেবার নিকট হইতে টাকা বুঝিয়া লইতে পারেন নাই।

এই ঘটনার পূর্ব্বে নিজামুদ্দৌলাও ক্লাইভকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে তাঁহার নামে নগদ তিন লক্ষ টাকা ও দুই লক্ষ টাকা মূল্যের হীরাজহরতাদি একখানি দানপত্রে লিখিয়া

---

(৫) Letter to the Court from Calcutta Council. Sept. 1765—Long's 'Selections.'

(৬) Ibid—Long's Selections.

(৭) মুর্শিদাবাদ কাহিনী—শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল্—২৪৯ পৃঃ।

দিয়া গিয়াছেন। শেষে নগদ তিন লক্ষ টাকা ও দুই লক্ষ টাকার একখানি চেক্ দূতমুন্সী সদরুদ্দীনের মারফৎ ক্লাইভকে পাঠান হইয়াছিল। জাফরের ও নিজের স্মৃতিরক্ষার্থ ক্লাইভ এই টাকায় বিলাতে পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের ও সৈনিকগণের বিধবা রমণীদের জন্য দাতব্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

নিজামুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তদীয় ষোড়শবর্ষীয় সহোদর ভ্রাতা সৈয়ফুদ্দৌলা ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের ২২শে মে তারিখে বাঙ্গালার মসনদে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময়ে মাতা মণিবেগমের হস্তে সমস্ত কর্তৃত্বের ভার অর্পিত হয়। সৈয়ফুদ্দৌলা নাবালক বলিয়া মণিবেগম অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সৈয়ফুদ্দৌলার সময় ৪১৮৬১৩১৲ টাকা নিজামৎ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। সৈয়ফুদ্দৌলা গভর্ণর ভের্লেষ্টের সহিত মতিঝিলে 'পুণ্যাহ' করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মন্বন্তরের বর্ষে বসন্তরোগে সৈয়ফুদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

সৈয়ফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর মীরজাফরের অন্যতমা ভার্য্যা বব্বু বেগমের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র মোবারকউদ্দৌলা নবাব হন। পূর্ব্বের ন্যায় মহম্মদ রেজাখাঁই নায়েব রহিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা হইতে আশানুরূপ অর্থাগম না হওয়ায় নব ব্যবস্থার আয়োজন হইতে লাগিল। ইংরাজের ক্ষতিপূরণ, মনরোর প্রাপ্য ও সেনাদলের প্রতিশ্রুত টাকা, প্রভৃতি নাবালক নবাবের নিকট হইতে কি ভাবে আদায় করিতে পারা যায়, তাহার পরমর্শ চলিতে লাগিল। (৮) রাজকোষ হইতে অর্থাগমের সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া নবাবের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য একটী গুপ্ত কমিটির সৃষ্টি হইল। নন্দকুমারের প্রবোচনায় সাক্ষ্যকমিটী নায়েব রেজাখাঁকে সকল অনর্থের মূল সাব্যস্ত করিলেও তাহার নিকট হইতে সন্তোষজনক হিসাব নিকাশ লইবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাকে গোপনে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে রেসিডেণ্ট মিডল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রেসিডেণ্ট রেজাখাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন। মণিবেগম রেজাখাঁর ঈদৃশ অবমাননায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন—তিনি ইচ্ছা করিলে এ সময় যদিও অত্যাচারী রেজাখাঁর অনিষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু তথাপি তিনি তাহা করেন নাই; তিনি রেজাখাঁর মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মণিবেগমের কৌশলে কলিকাতার কাউন্সিল নন্দকুমারের দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুত্র গুরুদাসকে 'রাজা গৌরপৎ' উপাধি ভূষিত হইয়া দেওয়ান ও হিসাব রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন এবং নবাবের বিমাতা মণিবেগমকে তাঁহার অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বুদ্ধিমতী মণিবেগম ক্ষমতাশালী মহারাজ নন্দকুমারকে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ পাইলেন।

(৮) Court's General Letter 15th April 1771 & Consultations thereupon. Nizamat Records, Paper Book No. 3; বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী—নবাবী আমল—(দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৪৫৭।

মোবারকের মাতা বব্বু বেগমের পরিবর্ত্তে বিমাতা মণিবেগম কেন যে অভিভাবিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ আমরা অবগত নহি। তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, বব্বু বেগম স্বীয়পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণর হেষ্টিংশ তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া মণিবেগমকে এ পদের উপযুক্ত স্থির করেন।

কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ মণিবেগম রাজা গুরুদাসের অধীনে ইৎবর আলিখাঁ নামক একজন খোজাকে নিযুক্ত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইৎবর আলিই নায়েবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইৎবর আলি অতিশয় নির্ব্বোধ ও নীচমনা ছিলেন। পদগর্ব্বে-গর্ব্বিত ইৎবর সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নির্য্যাতিত করিয়া রাজ্যে অশান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। মণিবেগম এই নির্ব্বোধ, শাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ খোজার প্রতি কৃপাপরবশ হওয়ায় অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এবং এই খোজারই কুপরামর্শে তিনি মোবারকের অভিভাবিকা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গভর্ণর হেষ্টিংশ মোবারকের ২৪ লক্ষ টাকা বৃত্তির পরিবর্ত্তে ১৬ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন এবং মোবারককে অল্প বয়স্ক দেখিয়া তাঁহার সেই টাকার যথোচিত ব্যয়নির্দ্ধারণার্থ মণিবেগমের হস্তে তাহার সুবন্দোবস্তের ভার প্রদান করেন। মণিবেগম ঐ টাকা নিম্নলিখিত বাবদে ব্যয় করিতেন।

১। নবাবের বিলাসিতা, সাংসারিক খরচ ও সামরিক ব্যয়।

২। মীরজাফরের আত্মীয়স্বজন ও তাঁহার 'রক্ষিতা' স্ত্রীলোকদিগের বৃত্তি।

৩। আলিবর্দ্দীর বংশধরগণের বৃত্তি।

৪। পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব নাজিমগণের অনুগ্রহভাজন কয়েকজন উপযুক্ত লোকদিগের বৃত্তি।

ইহার পর নন্দকুমারের পরিণাম যাহা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। জাল অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হয়। প্রায় ২ বৎসর কাল বিচারের পর রেজাখাঁ নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মণিবেগমকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাসও সরিয়া পড়িলেন। মোবারক উদ্দৌলার সময় ৩১৮১৯৯১৲ টাকা নিজামৎ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৭৯৩ (৯) খৃঃ অব্দে মোবারকের মৃত্যু হয়।

মণিবেগমের কার্য্যকালের হিসাব নিকাশের সময় তহবিলে অনেক টাকা কম পড়ায় তিনি বলেন যে, গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংশ ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের প্রীত্যর্থে ঐ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। নবার বাবর জং তাঁহার প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াই হউক, অথবা অপ্রতিহতশক্তিসম্পন্না মণিবেগমকে বশে রাখিবার জন্যই হউক, এ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই।

মোবারকের মৃত্যুর পর তাঁহার

(৯) 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে (পৃঃ ২৫৭) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি,এল মহাশয় ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে মোবারকের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Walsh সাহেব তাঁহার 'Murshidabad' নামক পুস্তকের ২১পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন যে, ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে মোবারকের মৃত্যু হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবরআলি খাঁ বাহাদুর ১৭৯৩খৃঃ অব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে নিজামতি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮১০ খৃঃ অব্দের ২৮শে এপ্রেল তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাবর জংএর মৃত্যুর পর কাহাকে মসনদে বসান হইবে, এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল। মণিবেগম, রাজসভাসদবর্গ ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক মোবারকের দ্বিতীয় পুত্র কাশিম খাঁকে মসনদে বসাইবার জন্য মত দিলেন; কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, বাবর জংএর পুত্রকে মসনদে না বসাইয়া তাঁহার খুল্লতাতকে নিজামতি দিলে পিতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। তিনি আরও বলিলেন মহম্মদীয় ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পিতার সমস্ত সম্পত্তি পুত্রেরই প্রাপ্য। ন্যায় ও আইনের অবমাননা করিতে আমি অসমর্থ। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেসিডেণ্ট সাহেবের যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া অগত্যা মণিবেগম তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

১৮১০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন আলিজা মসনদে আরূঢ় হইলেন। এইরূপ ১১ বৎসর ছয় মাস কাল রাজ্য চালাইবার পর ১৮২১ খৃঃ অব্দের ৬ই আগষ্ট রবিবার তিনটার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মণিবেগমকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখিতেন ১৮১২ খৃঃ অব্দে মণিবেগমের মৃত্যু হইলে তাঁহার বয়ঃসংখ্যা অনুসারে তোপধ্বনি করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। জাফরাগঞ্জ সমাধিভবনে নবাব নাজিমদিগের সমাধিরউত্তরে একটী প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে মণিবেগম সমাহিত হন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, মহাশয় তাঁহার 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর' ২৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ৮০২ খৃঃ অব্দে মণিবেগমের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু আমরা Walsh সাহেবের 'Murshidabad' নামক পুস্তক পাঠে অবগত হই যে, মণিবেগম আলিজাব নিজামতি প্রাপ্তির সময় (১৮১০ খৃঃ অব্দ—জুন মাস) তাঁহাকে মসনদে বসান হইবে কি না, এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। (১০) ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি ১৮১০ খৃঃ অব্দেও জীবিত ছিলেন। এক্ষণে যদি Walshএর উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ১৮১০ খৃঃ অব্দের পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ নিখিলবাবুর পুস্তকে ১৮১২ স্থলে ১৮০২ লিখিত হইয়াছে।

মণিবেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকখানি পত্রে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। (১১) বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর সেগুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

মণিবেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্তঃপুর হইতে প্রাপ্ত ধনরাজি হইতে ১৬০৫৩৲ টাকা কর্ত্তন করিয়া বক্রী ১৪৮৫৪৫৪৸০ টাকা তাঁহার নিজস্ব বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এই টাকা

(১০) Walsh's "Murshidabad" p. 189.

(১১) Walsh's "Murshidabad" p.p. 191-2 and 194.

হইতে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের বন্দকী বহুমূল্য প্রস্তররাজির উদ্ধারকল্পে ও অন্যান্য বাবদে টাকা বাদ দিয়া বক্রী ৫৮২৭৬০৸/৫ টাকা নবাব বাহাদুরকে প্রদান করা হয়। অধিকন্তু মণিমুক্তা, স্বর্ণরৌপ্যের বাসন প্রভৃতি ও অন্যান্য সম্পত্তিও নবাবকে দেওয়া হইয়াছিল



মণিবেগমের কবর

—ইহার মূল্যও প্রায় ৮৫০,০০০ টাকা। এই-রূপে মণিবেগমের মৃত্যুর পর নবাব বাহাদুর জমি-জমাও প্রাসাদ-সংলগ্ন চক-বাজার (যাহার বার্ষিক আয় ১২,০০০ টাকা ছিল) ব্যতীত কমবেশী ৫ লক্ষ টাকা পাইয়া-ছিলেন।(১২)

(১২) ঐতিহাসিক নিখিলবাবু তাঁহার পুস্তকের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"মণিবেগমের বৃত্তি হইতে অনেক টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। গভমের্ণ্ট তাহা নবাব-নাজিমকে প্রদান করেন নাই।" (মুর্শিদাবাদ কাহিনী—পৃঃ ২৬৩,

বুদ্ধিমতী মণিবেগম কোপনস্বভাবা ছিলেন, কিন্তু তৎকালে পরদুঃখকাতরা রাণী ভবানী ব্যতীত তাঁহার ন্যায় দানশীলা রমণী কেহ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দানশীলতার জন্য সকলে তাঁহাকে "মাদর-ই-কোম্পানী"(১৩) অর্থাৎ কোম্পানীর মাতা নামে অভিহিত করিত। স্নেহময়ী জননীর আখ্যায় আখ্যাত হওয়া যে কম সৌভাগ্যের কথা নয় একথা বলা বাহুল্য।

নবাব-নাজিমদিগের প্রধানা মহিষীকে 'গদ্দিনাসীন' বেগম বলে। গদ্দিনাসীন বেগমেরা বাৎসরিক লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন—মণিবেগম এই বৃত্তির সমস্ত টাকা দানাদি পুণ্যকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

এক সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মণিবেগমকে একখানি পালকী, ৩০ জন বাহক এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য চাকরাণ জমি উপঢৌকন দিয়াছিলেন। এই জমি অদ্যাপি নিজামত ভুক্ত আছে।

মণিবেগম মাসিক ১২০০০৲ টাকা (১৪) ও বব্বুবেগম ৮০০০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। মুর্শিদাবাদ সহরে, যে চক্ মসজিদ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহা মণিবেগমেরই কীর্ত্তি। তিনি ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার পুস্তকাগার হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে আমায় একখানি মূল পারস্য গ্রন্থ দিয়াছিলেন। তাহাতে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মণিবেগমের লিখিত একখানি পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। পত্রখানি হইতে তাহার দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ও ইংরাজদের প্রতি তাঁহার যে একটা সহানুভূতি ছিল এবং তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। পত্রখানি ১৩ই জানুয়ারী ১৮০০ খৃঃ অব্দে লিখিত।

"আপনার বিনীত ভৃত্যের অসুস্থতার বিষয় অবগত হইয়া আপনি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও পুনরায় আরোগ্য সংবাদ পাইয়া আমার প্রিয়বন্ধু নসীব মহম্মদ খাঁর মারফৎ আনন্দ প্রকাশ করিয়া যে অনুগ্রহ লিপি পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। আপনি আমার ও আমার পরিবারবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল-বার্ত্তা জানিতে চাহিয়া মহানুভবতারই পরিচয় দিয়াছেন; তাহার জন্য আমি আপনার নিকট চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এই মহৎ হৃদয়া ও পরম হিতৈষিনী রমণীকে দীর্ঘ-জীবন দান করুন। শীতের প্রকোপবশতঃ

(১৩) "Some Transactions of the C.H.S."—Bengal Past and Present—Journal of the Historical Society.—April 1908; P. 210.

(১৪) রেসিডেণ্ট স্যামুয়েল মিড্লটনের ১৭৭২ খৃঃ অব্দের ১৮ই নবেম্বরের লিখিত নবাবী-বৃত্তি বিভাগের হিসাবে লেখা আছে যে, মণিবেগম মাসিক ৮৩৩৩-৫-৩, বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা পাইতেন।

(Nizamat Records, Book No. 3.)

আপনার বিনীত ভৃত্য কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভগবানের কৃপায় ও আপনার শুভ ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াছে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আপনি কৃপা করিয়া আপনার শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন কুশলসংবাদদানে বাধিত করিবেন। অধিক আর কি নিবেদন করিব। ইতি—"

সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বাধীন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে কেমন করিয়া একজন অবলা রমণী আপনার চতুঃপার্শ্বে প্রভুত্ব-বিস্তার করিতে পারে—মীর্জাফর বণিতা মণিবেগম তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। মণিবেগম বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া দান ও পুণ্যকার্য্যে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া, আত্মীয়স্বজন এবং অধীন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকালে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ গোপনে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আপন আপন ক্ষমতা ও প্রাধান্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সতত যত্নপর ছিলেন; বুদ্ধিমতী মণিবেগম তাঁহার নিয়োজিত গুপ্তচরের নিকট হইতে ও অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার ইংরাজবন্ধুগণের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নেই সে সমাচার অবগত হইতেন এবং উদ্ধত প্রকৃতি কর্ম্মচারীগণকে সদয় ব্যবহারে তাহাদের অভিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে দিতেন না। তাঁহার মধুর প্রকৃতিগুণে সেই সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রতমন্ত্র

আমি কতকগুলি ব্রতের মন্ত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী কর্তৃক লিখিত "হরির চরণ" ব্রতের মন্ত্র এইরূপ ঃ—

"হরি হরি বৈশাখ মাস,
কোন্ শাস্ত্রে পড়্লো মাস?
চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা,
হরি বলেন মা গো মা।
আজ কেন আমার শীতল পা,
কোন্ ভক্ত পূজে পা?
সে ভক্ত কি বর মাগে?
গিরিরাজ বাপ চান,
মেনকার মত মা চান,
রাজ রাজেশ্বর স্বামী চান,
অমর বর পুত্র চান,
সভা উজ্জ্বল জামাই চান,
নিত্যানন্দ ভাই চান,
গুণবতী বৌ চান,
রূপবতী ঝি চান,
লক্ষ্মণের মত দেবর চান,
দুর্গার মত আদর চান,
দাস চান, দাসী চান,
রূপার খাটে পা মেলতে চান।

* *

* *

সিঁতেয় সিন্দূর মুখে পান,
বছর বছর পুত্র চান।
হবে পুত্র মরবে না,
চক্ষের জল পড়বে না।" প্রভৃতি।

(অনেক স্থানে "রণে এয়ো ব্রত" নামে এক রকমব্রত চলিত আছে। এই ব্রত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম।

ধানের পুঁটুলি	সিঁদূরের কৌটা
কাঁচা আম কিম্বা সুপারি।	গোটা ধনের পুঁটুলি।

বালিকারা উপরের মত একটী পিটুলির ঘর আঁকিয়া নেকড়ায় বাঁধা গোটা ধনে একটি ঘরে, নেকড়ায় বাঁধা ধান একটি ঘরে, সিন্দূর কৌটা একটি ঘরে, এবং একটি কাঁচা আম কিম্বা সুপারি একটি ঘরে রাখে। তাহার পর

সিন্দুরের কৌটা ধরিয়া বলে—

"রণে রণে এয়ো হবো।

ধনের পুঁটুলি ধরিয়া বলে—

জনে জনে সো হবো।

ধানের পুঁটুলি ধরিয়া বলে—

আকালে লক্ষ্মী হবো।

আম কিংবা সুপারি ধরিয়া বলে—

সময়ে পুত্রবতী হবো।

এইরূপ তিনবার বলে। তৎপরে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া নমস্কার করে :—

"রণে এয়ো ব্রত করে যেন হই স্বামীর সো।
যতকাল থাকব বেঁচে যেন না পড়ে আমার নো॥"

আবার কাহাকেও কাহাকেও নিম্নলিখিত রূপও বলিতে শুনা যায় :—

"রণে এও সনে যান।
আকালের ভাত সকালে খান॥)

সরু ধানে কাল পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োতীতে॥
এক গলা গঙ্গার জলে, শুরু মল্লিকে ফুলে।
মরণ হয় যেন সোয়ামী পুত্রের কোলে॥"

"পুণ্যি-পুকুর" ব্রতের একটী পাঠান্তর এইরূপ :—

"পুণ্যি-পুকুর ক্ষীরের ভেলা।
কে পূজেরে দুপুর বেলা?
এয়োরাণী—ভাগ্যমানি।
বাজা রে শঙ্খের ধ্বনি॥
সাত ভায়ের বোন হবো।
সাবিত্রী সমান হবো॥
হাট, ঘাট পূজন।
সোনার থালে ভোজন॥
সোনার থালায় ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু॥"

"কুল-কুলতি-ব্রতের" ছড়াটী দিয়া আমি এবারকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব।

এই ব্রত বালিকারা আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত করে। এই ব্রত চারি বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। সন্ধ্যার পর তুলসী গাছের তলায় কুলপাতা পাতিয়া হাতে করিয়া প্রদীপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিম্নলিখিত ছড়াটী আবৃত্তি করে :—

"কুল্-কুলতি কুলবতী,
তুলসী তলায় দিয়ে বাতি,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাতি।"

প্রদীপটী তিনবার ঘুরাইয়া তাহার পর কুলপাতার উপর রাখিয়া দেয় এবং নিম্নলিখিত ছড়াটী আবৃত্তি করিয়া তুলসীকে নমস্কার করে :—

"হরি প্রিয়া তুলসী দেবী করি নমস্কার।
অন্তিম কালে কোরো মাগো ভব নদী পার॥"

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী

রূপকথার রূপান্তর

মায়েদের পক্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "টুনটুনির বই" একখানি মহার্ঘ পুস্তক। আনা কতকে এত অসংলগ্ন, শিশু-মনকাড়া আবোল তাবোলের যোগাড় হওয়া যেন সুলভে সাত রাজার ধন হাতে পাওয়া। এমন মন-ভোলান, দুরন্তপনা-স্থির-করানো, অধৈর্য্যে শান্তিমানান প্রলাপমালা প্রতিদিন নিজের মস্তিষ্ক হইতে নিষ্কাষিত করা কঠিন। সুতরাং কোথাও লিপিবদ্ধ-ভাবে এরূপ কথা পাইলে মাতৃগণের নিতান্তই সুবিধা। অপেক্ষাকৃত সুসম্বদ্ধ উপকথায় পাঁচ ছয় বছরের শিশুর মন তেমন আকৃষ্ট হয় না। তার অপরিপক্ক মস্তিষ্ক সুবিন্যস্ত সংলগ্নতাকে অনুসরণ করিতে পারে না। কিন্তু বেড়ালের আর বাঘের, শেয়ালের আর হাতীর, পিঁপড়ের আর বাঁদরের, চড়াইয়ের আর কাকের অসম্ভব, অসমঞ্জস লীলাখেলার বৃত্তান্ত তার ক্ষুদ্র দেহের ভিতর-কার ক্ষুদ্র মনটিকে একেবারে নিজের পাঞ্জার ভিতর যেন পুরিয়া লয়। আর রাজকন্যা, রাজপুত্তুর, সদাগরের ছেলে—ইহারা সব কল্পনার জীব। যখন কল্পনাশক্তি কিছু কিছু অঙ্কুরিত হইয়াছে তখনই ইহাদের মনন ও শ্রবণ রসাত্মক হয়। কিন্তু বাঘ শেয়াল বাঁদর হাতী ইহারা যে চিড়িয়াখানার আলাপী, নূতন পরিচয়ের বহু-সম্ভাবনা-বিশিষ্ট অদ্ভুত জীব। সুতরাং ইহাদের ক্রিয়াকলাপের বৃত্তান্তের মত নিদিধ্যাসনের বস্তু শিশুর পক্ষে আর কিছু নহে।

রোগশয্যায় শায়িত একটি ক্ষুদ্র শিশুকে এই গল্পগুলি শুনাইতে শুনাইতে একটি গল্পে কোন পঞ্জাবী গল্পের রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম "টুনটুনির বই"-এর গল্পগুলি বুঝি উপেন্দ্রবাবুর স্বকপোল-কল্পিত, কেননা আমাদের শৈশবে আমরা ইহার রসাস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম। এবার খট্‌কা লাগাতে "গ্রন্থকারের নিবেদন" উল্‌টাইয়া দেখিলাম—"সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চাহে, তখন পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এইসকল গল্প বলিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া রাখেন।"

ক্রমে যত পড়িতে লাগিলাম দেখিলাম একটি আধটি নয়, ইহার অন্তর্গত অনেকগুলি গল্পই পঞ্জাবী গল্পের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। পঞ্জাবের চারণ-গাথায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জাব-বীরের বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়। এই গল্পগুলিও কি তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য? বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উপকথা-গুলি কি পঞ্চনদকূল হইতে ভাগীরথীর উপকূল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছে? আর্য্যগণ সিন্ধু-নদের তীর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্মরণাতীতকালে ক্রমে ক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কথার টানে পঞ্জাবীভাষার টানের আশ্চর্য্য আভাষ পাওয়া যায়; পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের পঞ্জাবীর ন্যায় জোরাল ও জেদাল ভাব এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি বাঙ্গালী জমিদারের আজ পর্য্যন্ত পঞ্জাবের সহিত গতিবিধি ও বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রভৃতি ব্যাপার, স্মরণাতীত কালের

ঘটনা পরম্পরা নহে—এসকল স্পষ্টই স্মরণীয় ঐতিহাসিক কালের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিতেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইলে বোধ হয় ভারত-ইতিহাসের নব নব অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

আজ "টুনটুনির বই"এর একটিমাত্র কাহিনী ও তাহার অনুরূপ পঞ্জাবী কাহিনীটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। বারান্তরে অপরাপর কাহিনীরও সাদৃশ্য দেখাইব।

পূর্ব্ববঙ্গের কাহিনী

টুনটুনি আর নাপিতের কথা।

টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে নাচতে খেলে বেগুন-কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হ'ল মস্ত বড় ফোড়া। ওমা! কি হবে! এত বড় ফোড়া কি করে সারবে।

টুনটুনি একে জিজ্ঞেস করে, তাকে জিজ্ঞেস করে। সবাই বল্লে—"ওটা নাপিতকে দিয়ে কাটিয়ে ফেল্।" তাই টুনটুনি নাপিতের কাছে গিয়ে বল্লে—"নাপিত দাদা নাপিত দাদা আমার ফোড়াটা কেটে দাওনা।" নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বাঁকিয়ে, নাক সিটকিয়ে বল্লে—"ঈস্! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোড়া কাটতে গেলুম আর কি!"

টুনটুনি বল্লে,—"আচ্ছা দেখতে পাবে এখন, ফোড়া কাটতে যাও কি না!" বলে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলে—"রাজা মশাই! আপনার নাপিত কেন আমার ফোড়া কেটে দিচ্ছে না? ওকে সাজা দিতে হবে।"

শুনে রাজা মশাই হো হো করে হাসলেন, বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে কিছু বল্লেন না। তাতে টুনটুনির ভারি রাগ হ'ল, সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বল্লে, "ইঁদুর ভাই! ইঁদুর ভাই! বাড়ী আছ?" ইঁদুর বল্লে, "কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই! ব'স ভাই! খাট পেতে দি', ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে—"তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ কর!" ইঁদুর বল্লে, "কি কাজ?" টুনটুনি বল্লে, "রাজা মশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটে কেটে ফুটো করে দিতে হবে।"

তা শুনে ইঁদুর জিব কেটে, কাণে হাত দিয়ে বল্লে—"ওরে বাপ্‌রে! আমি তা পারব না।" তাতে টুনটুনি যারপর নাই রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বল্লে, "বিড়াল ভাই! বিড়াল ভাই! বাড়ী আছ?" বিড়াল বল্লে, "কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই, ব'স ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে, "তবে ভাত খাই, যদি ইঁদুর মার।" বিড়াল বল্লে, "এখন আমি ইঁদুর টিঁদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে!"

শুনে টুনটুনি রাগের ভরে লাঠির কাছে গিয়ে বল্লে—"লাঠি ভাই, লাঠি ভাই। বাড়ী আছ?"

লাঠি বল্লে—"কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই, বস ভাই। খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে—"তবে ভাত খাই, যদি বিড়ালকে ঠেঙ্গাও।" লাঠি বল্লে—"বিড়াল আমার কি করেছে যে আমি তাকে ঠেঙ্গাতে যাব? আমি তা পারব না!"

তখন টুনটুনি আগুনের কাছে গিয়ে বল্লে—"আগুন ভাই, আগুন ভাই বাড়ী আছ?"

আগুন বল্লে,—কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই, বস ভাই। খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে—"তবে ভাত খাই যদি তুমি লাঠি পোড়াও।" আগুন বল্লে "আজ ঢের জিনিষ পুড়িয়েছি, আজ আর কিছু পোড়াতে পারব না।"

তাতে টুনটুনি তাকে খুব করে বকে, সাগরের কাছে গিয়ে বল্লে—"সাগর ভাই, সাগর ভাই বাড়ী আছ?"

সাগর বল্লে—"কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই, বস ভাই, খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে,—"তবে ভাত খাই, যদি আগুন নিবাও।" সাগর বল্লে—"আমি তা পারব না"

তখন টুনটুনি হাতীর কাছে গিয়ে বল্লে—"হাতী ভাই! হাতী ভাই! বাড়ী আছ? হাতী বল্লে—"কে, ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই, বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে, "তবে ভাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেল!" হাতী বল্লে, "অত জল আমি খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।"

কেউ তার কথা শুনলে না দেখে, টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূরে থেকে তাকে দেখেই বল্লে—"কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই, বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?"

টুনটুনি বল্লে—"তবে ভাত খাই, যদি হাতীকে কামড়াও।"

মশা বল্লে,—"সে আবার একটা কথা? এখনি যাচ্ছি! দেখব হাতী বেটার কত শক্ত চামড়া।" ব'লে সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বল্লে—"তোরা আয় ত রে ভাই, দেখি হাতী বেটার কেমন চামড়া!"

অমনি পীন্—পীন্—পীন্—পীন্ করে যত রাজ্যের মশা বাপ, বেটা, ভাই, বন্ধু মিলে হাতীকে কামড়াতে চল্লো। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পীন্—পীন্—পীন্ ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল। তখন—

হাতী বলে,—সাগর শুষি!
সাগর বলে,—আগুন নিবাই।
আগুন বলে,—লাঠি পোড়াই।
লাঠি বলে,—বিড়াল ঠেঙ্গাই।
বিড়াল বলে,—ইঁদুর মারি।
ইঁদুর বলে,—রাজার ভুঁড়ি কাটি।
রাজা বলেন,—"নাপ্‌তে বেটার মাথা কাটি।"

নাপিত হাত যোড় করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লে—"রক্ষে কর টুনি দাদা, এস তোমার ফোড়া কাটি!"

তারপর টুনটুনির ফোঁড়া সেরে গেল, আর সে ভারি খুসী হয়ে আবার গিয়ে নাচতে গাইতে লাগল—টুনটুনা টুন্ টুন্ টুন্! ধেই ধেই ধেই!

পঞ্জাবী কাহিনী

চড়ুই আর কাকের কথা।

বাবলাগাছের উপর এক ছিল কাক আর এক ছিল চড়ুই। কাকের কাছে ছিল মাটির গুলেল আর চড়ুইয়ের কাছে ছিল সোনার। কাক বল্লে, "এস চড়ুই আমরা দুজনে গুলেলে গুলি ছুঁড়ি, যার গুলি সব চেয়ে দূরে যাবে সে দুই গুলেলই জিতে নেবে।" চড়ুই বল্লে "আচ্ছা।" দুজনে গুলি ছুঁড়লে। কাকের ছিল মাটির, হালকা—অনেক দূর গিয়ে পড়ল, আর চড়ুইয়ের ছিল সোনার ভারি, বেশী দূর গেল না। কাক করলে কি, দুই গুলেলই নিয়ে নিলে। চড়ুই কাকের চাতুরী টের পেয়ে, আর আপনার গুলেল হারিয়ে দুঃখে রাগে বাবলাগাছকে বল্লে—"বাব্‌লা! বাব্‌লা! কাককে উড়িয়ে দাও।"

বাবলা উত্তর দিলে—"কাক আমার কি নিয়েছে—আমি কেন তাকে শুধু শুধু উড়োতে গেলুম!"

চড়ুই বেচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাঁদতে লাগল—

কাক গুলেল দেয় না।
বাবলা কাক উড়ায় না।
বেচারী চড়ুই কি করে?

তখন সে ছুতোরের কাছে গেল। গিয়ে বল্লে—"ছুতোর ছুতোর বাবলা চেরো।"

ছুতোর বল্লে—"বাবলা আমার কি ক্ষতি করেছে? আমি কেন বাবলা চিরতে যাই!"

বেচারী চড়ুই নিরাশ হয়ে কাঁদতে লাগল—

কাক গুলেল দেয় না।
বাবলা কাক উড়ায় না।
ছুতোর বাবলা চেরে না।
বেচারী চড়ুই কি করে?

ফের সে রাজার কাছে গেল, গিয়ে বল্লে—"রাজা রাজা ঐ ছুতোরকে রাজ্যি থেকে তাড়িয়ে দাও?" রাজা বল্লেন—"ছুতোর বেচারা কি দোষ করেছে—আমি তাকে শুধু শুধু রাজ্য থেকে তাড়াব কেন?"

বেচারী চড়ুই হতাশ্বাস হয়ে কাঁদতে লাগল—

কাক গুলেল দেয় না।
বাবলা কাক উড়ায় না।
ছুতোর বাবলা কাটে না।
রাজা ছুতোর তাড়ায় না।
বেচারী চড়ুই কি করে?

ফের সে রাণীর কাছে গেল, গিয়ে বল্লে—"রাণি, রাণি! রাজার উপর মান কর।"

রাণী বল্লেন—"রাজার উপর মান কেন করব? রাজা আমার কি হানি করেছেন?"

ভগ্নমনোরথ হয়ে চড়ুই বেচারী কাঁদতে লাগল—

কাক গুলেল দেয় না।
বাবলা কাক উড়ায় না।
ছুতোর বাবলা চেরে না।
রাজা ছুতোরকে তাড়ায় না।
রাণী রাজার পরে মান করে না।
বেচারী চড়ুই কি করে?

এবার সে সাপের কাছে গেল। গিয়ে বল্লে—"সাপ সাপ রাণীকে কাটো।" সাপ বল্লে—রাণী আমার কি লোকসান করেছেন? আমি কেন রাণীকে কাটতে যাব?"

চড়ুই কাঁদতে লাগল—

কাক গুলেল দেয় না।
বাবলা কাক উড়ায় না।

ছুতোর বাবলা চেরে না
রাজা ছুতোরকে তাড়ায় না
রাণী রাজার পরে মান করে না
সাপ রাণীরে কাটে না
বেচারী চড়ুই কি করে?

তার পরে সে লাঠির কাছে গেল, গিয়ে বল্লে—"লাঠি লাঠি সাপ ঠেঙ্গাও।" লাঠি বল্লে—"সাপ আমার কি নিয়েছে যে আমি তাকে ঠেঙ্গাতে গেলুম?"

চড়ুই কাঁদতে লাগল—
কাক গুলেল দেয় না
বাবলা কাক উড়ায় না।
ছুতোর বাবলা চেরে না
রাজা ছুতোরকে তাড়ায় না
রাণী রাজার পরে মান করে না
সাপ রাণীরে কাটে না
লাঠি সাপ ঠেঙ্গায় না
বেচারী চড়ুই কি করে?

ফের সে আগুনের কাছে গেল, গিয়ে বল্‌লে—"আগুন আগুন লাঠি পোড়াও!" আগুন বল্লে—"লাঠি আমার কি নিয়েছে যে "আমি তাকে পোড়াব?"

চড়ুই কাঁদতে লাগল—
কাক গুলেল দেয় না
বাবলা কাক উড়ায় না
ছুতোর বাবলা চেরে না
রাজা ছুতোরকে তাড়ায় না
রাণী রাজার পরে মান করে না
সাপ রাণীরে কাটে না
লাঠি সাপ ঠেঙ্গায় না
আগুন লাঠি পোড়ায় না
বেচারী চড়ুই কি করে?

এবার সে জলের কাছে গেল, গিয়ে বল্‌লে—"জল জল আগুন নেবাও।" জল বল্‌লে "আগুন আমার কি করেছে? আমি তাকে কেন নেবাব?"

চড়ুই কাঁদতে লাগল—
কাক গুলেল দেয় না,
বাবলা কাক উড়ায় না,
ছুতোর বাবলা চেরে না,
রাজা ছুতোরকে তাড়ায় না,
রাণী রাজার পরে মান করে না
সাপ রাণীরে কাটে না
লাঠি সাপ ঠেঙ্গায় না
আগুন লাঠি পোড়ায় না
জল আগুন নেবায় না
বেচারী চড়ুই কি করে?

এবার সে উটের কাছে গেল, গিয়ে বল্‌লে—"উট উট, জল খেয়ে ফেল।" উট বল্‌লে—"জল আমার কি করেছে, না আমার তেষ্টা আছে, শুধু শুধু জল কেন খেতে যাব?"

চড়ুই কাঁদতে লাগল—
কাক গুলেল দেয় না
বাবলা কাক উড়ায় না
ছুতোর বাবলা চেরে না
রাজা ছুতোরকে তাড়ায় না,
রাণী রাজার পরে মান করে না
সাপ রাণীরে কাটে না
লাঠি সাপ ঠেঙ্গায় না
আগুন লাঠি পোড়ায় না
জল আগুন নেভায় না
উট জল খায় না
বেচারী চড়ুই কি করে?

এবার সে ইঁদুরের কাছে গেল, গিয়ে বল্‌লে—"ইঁদুর ইঁদুর উটের নাসা কাট।"

ইঁদুর উত্তর দিলে—এস চলো কাটি!
তখন উট বল্‌লে—চলো জল খাই!
জল বল্‌লে—চলো আগুন নেবাই!
আগুন বল্‌লে—চলো লাঠি পোড়াই!
লাঠি বল্‌লে—চলো সাপ ঠেঙ্গাই!

সাপ বল্‌লে—চলো রাণীকে কাটি!

রাণী বল্‌লে—এই নাও এক্ষণি আমি রাজার উপর মান করছি!

রাজা বল্‌লেন—এই নাও এক্ষণি আমি ছুতোরকে রাজ্য থেকে তাড়াচ্ছি!

ছুতোর বল্‌লে—এই নাও এক্ষণি আমি বাবলা চিরছি!

বাবলা বল্‌লে—এই নাও এক্ষণি আমি কাক উড়াচ্ছি!

কাক বল্‌লে—এই নাও তোমার সোনার গুলেল ফিরিয়ে দিচ্ছি!*

পাঞ্জাবী কাহিনীর রসটুকু পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত পৌছিতে পৌছিতে অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িয়া নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ধারণ করিয়াছে। তথাপি মূলতঃ দুই গল্পই যে এক সে বিষয়ে কি পাঠকদের সন্দেহ হয়?

এই প্রসঙ্গে রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের পঞ্জাবীসম্পর্কিত জমিদার পরিবারগণের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের বঙ্গোপনিবেশের বৃত্তান্ত যদি আমাদের প্রেরণ করেন এবং আর আর যেরূপে সম্ভব এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে সাহায্য করিয়া বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের ঐতিহাসিক সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হন তবে উত্তর প্রদেশের জাতীয় ইতিহাস তাঁহাদের নিকট বিশেষ ঋণী হইবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত

(১৩১৮ চৈত্র সংখ্যার পর)

(চ) জীবের পুরুষকার এবং ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য।

শঙ্কর যে শুধু ব্যবহারিক দ্বৈতমাত্র সমর্থন করিয়াছেন তাহা নয়, জীবের পুরুষকারেরও সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেকেই অদ্বৈত-বাদের নামে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকেন, অথবা লোকের যত্নচেষ্টার উপরে আস্থা-শূন্য হইয়া থাকেন। শঙ্কর সেরূপ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ হতোদ্যম অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। তিনি দার্শনিক ক্ষেত্রে যেরূপ পুরুষকার স্বীকার করিতেন, সেইরূপেই স্বীয় জীবনে সিংহ-বিক্রমের সহিত, জীবের হিতের জন্য পুরুষকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পুরুষকার-সাধনার অভাবই ভারতীয় জাতি সকলের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যোগ-বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ-দেব রামকে বলিতেছেন:—"বাসনারূপ সরিৎ শুভ এবং অশুভ এই দুই পথেই প্রবাহিত হয়, তাহাকে পুরুষকারের দ্বারা বিশেষ যত্নের সহিত শুভ পথে সংযোজিত করিবে। তোমার মন যখন অশুভ পথে সমাবিষ্ট হয়, হে বীরবর,

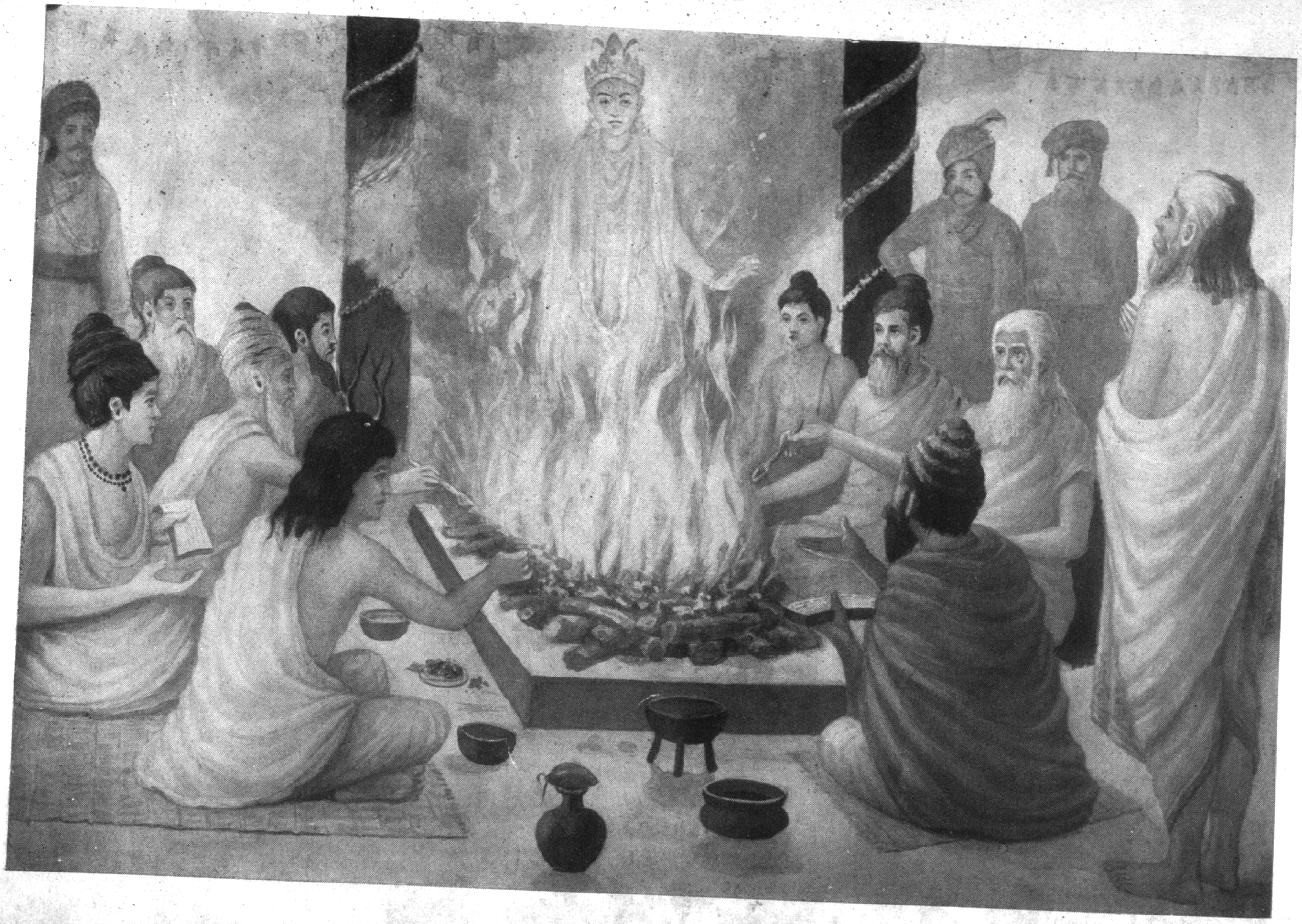
---

* এই গল্পটী পারিবারিক উৎসবে শিশুগণ কর্ত্তৃক অভিনয়ের জন্য পূজনীয় পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী মহাশয় নাট্যাকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা কোনদিন বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিবার ইচ্ছা

তখন বলের সহিত পুরুষার্থ দ্বারা টানিয়া তাহাকে শুভ পথে ফেলিবে। লোকের চিত্ত শিশুর তুল্য, অশুভ পথ হইতে চালিত হইলে, শুভ পথে গমন করে, আবার তাহা হইতে চালিত হইলে অশুভ পথে গমন করে। অতএব বলের সহিত তাহাকে শুভ পথে চালনা করিবে।"(১) পঞ্চদশী বলিতেছেনঃ—"ঈশ্বরই জীবের পুরুষকারের রূপেও প্রকাশিত হইতেছেন।" "ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে।" শঙ্কর নিজে পুরুষকার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? ব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে (অ-২। পা-৩। সূ-৪২॥) সূত্র করিতেছেনঃ—"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ॥" তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ যেরূপ প্রযত্ন করে, সেই প্রযত্ন অনুসারেই ঈশ্বরও তাহাকে দিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকেন।" পরে আবার বলিতেছেনঃ—"লোকে যেমন নানাবিধ লতা গুল্ম বা ব্রীহি-যবাদি প্রত্যেকটী নিজ নিজ বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং পর্জ্জন্য বা বৃষ্টি তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সকলের মধ্যে সাধারণ নিমিত্ত,—যদি বৃষ্টি না হয়, তবে তাহাদের নানাপ্রকার রস, পুষ্প, ফল, পত্রাদি জন্মে না, আবার তাহাদের স্ব স্ব বীজ না থাকিলেও জন্মে না, সেইরূপ জীবের কৃত প্রযত্ন অনুসারেই ঈশ্বর তাহাদিগের শুভাশুভ বিধান করেন। (তবে আপত্তি হইতে পারে) জীব পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীন হইলে, তাহার কৃত প্রযত্নের উপরে তাহার শুভাশুভ কিরূপে নির্ভর করিবে? (উত্তর) জীব পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন হইলেও জীবই করে, জীব করে বলিয়াই ঈশ্বর তাহা দ্বারা করাইয়া থাকেন। এজন্যই বিধি-নিষেধ শাস্ত্র বৃথা হয় না। অন্যথা ঈশ্বরই যদি জীবকে বিহিত কিম্বা প্রতিষিদ্ধ কার্য্য করান, এবং জীব সম্পূর্ণ পরতন্ত্রই হয়, তাহা হইলে বিধি-নিষেধ শাস্ত্র নিরর্থক হয়। আবার জীবের কর্ত্তৃত্ব যদি সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলে শুভাশুভ বা দণ্ড-পুরস্কারের অভাবে, লৌকিক পুরুষকার নিষ্ফল হয়। জীব এবং ঈশ্বরের পরস্পর উপকার্য্য এবং উপকরণ সম্বন্ধই বলা হইতেছে।"

অন্য আর এক সূত্রের ভাষ্যে (সূত্র-৩৪) ঈশ্বরের উচ্চাবচ নানা শ্রেণীর প্রাণীযুক্ত এই জগৎ নির্ম্মাণ-জন্য বৈষম্য বা পক্ষপাতিতা এবং নৈর্ঘৃণ্য বা নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সেই প্রশ্নের সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—যে, প্রাণীবর্গের স্বকৃত কর্ম্ম জন্যই জগতে সুখদুঃখের বৈষম্য, ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরতার জন্য নয়। শঙ্কর বলিতেছেন,—"যদি আপত্তি কর, যে ঈশ্বর এই জগতের কারণ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতা দোষ আরোপ করিতে হয়,—যথা, তিনি দেবতাদিগের অত্যন্ত সুখভাক্, এবং পশ্বাদিকে অত্যন্ত দুঃখভাক্ করিয়া থাকেন। তাহাতে সাধারণ লোকের ন্যায়, তাঁহার মধ্যেও রাগ (আসক্তি) এবং দ্বেষ বা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়। আবার দুঃখ-যোগ

(১) "শুভাশুভ-মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা-সরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥
অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়। স্বং মনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর॥



দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

বিধান, এবং প্রজাবর্গের সংহার-সাধন করাতে ঈশ্বরের অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাও প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা নয়। ঈশ্বরে পক্ষপাতিতা এবং নিষ্ঠুরতা আরোপ করা যায় না, কারণ ঈশ্বর যাহা করেন, তাহা সাপেক্ষ। কাহার অপেক্ষা করে? সৃজ্যমান প্রাণীকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করে। ঈশ্বরকে পর্জ্জন্যবৎ দেখিতে হইবে। ব্রীহি-যবের সৃষ্টি সম্বন্ধে যেমন পর্জ্জন্য সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি-যবের বৈষম্য সম্বন্ধে তাহাদের বীজগত স্ব স্ব সামর্থ্যই কারণ, সেইরূপ দেব-মনুষ্য-পশ্বাদির সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর সাধারণ কারণ, কিন্তু জীবগত তাহাদের স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মই সংসার বৈষম্যের কারণ। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন।" সূত্র-৩৪॥ এস্থলে আমাদের উল্লেখ করা আবশ্যক যে বৃষ্ট এবং বীজ—এই দুয়ের মধ্যে লোকে বীজকেই বৃক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; বৃষ্টিকে কেহ বৃক্ষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করে না, বৃষ্টি সাহায্য-কারী মাত্র। শঙ্করের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবগণের স্ব স্ব কর্ম্মই জীব-জগতের বৈষম্যের কারণ, ঈশ্বর সহকারী মাত্র,—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরকে স্রষ্টৃপদচ্যুত করা হয় না কি?

পরের সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পুনরায় বলিতেছেনঃ—"হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক-মাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন।" এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগই ছিল। (পাঠক অবশ্য এই সঙ্গেই ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে সৃষ্টির একটা 'পূর্ব্ব' বা আদিও ছিল, সৃষ্টি "অনাদি" বলা শ্রুতি-বিরুদ্ধ।) সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মই ছিল না, যদনুসারে এই বৈষম্য-দোষপূর্ণ সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইতে পারে। সৃষ্টির পরেই শরীরাদির বিভাগ, এবং সেই বিভাগ অনুসারেই (দেবতির্য্যগ্নরাদির) যাহার যেমন কর্ম্ম,—অর্থাৎ যাহার যেরূপ শরীর, তাহার তদনুরূপই কর্ম্ম। তাহা হইলে কিরূপে বলা হইতেছে যে কর্ম্মানুসারেই শরীর? ইহাতে ইতরে-তরাশ্রয় দোষ (Arguing in a circle) ঘটিতেছে। এই আপত্তির উত্তর এই,—সৃষ্টি অনাদি। (কিন্তু "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ-স্বরূপই ছিলেন" এই কথা দ্বারা সৃষ্টির অনাদিত্ব কি শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইতেছে না?) —এবং অনাদিত্ব হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায়, জীবের কর্ম্ম এবং সৃষ্টিবৈষম্য পর্য্যায়ক্রমে পরস্পরের কার্য্য এবং কারণরূপে (অনন্তকাল) চলিয়া আসিতেছে! ইহাতে কোন বিরোধ নাই। (সূত্র-৩৫॥)

পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে আবার শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"সংসারের আদি আছে, এরূপ কল্পনা করিলে সংসার যেন অকস্মাৎ উদ্ভূতের ন্যায় হয়। (অর্থাৎ অনন্তকাল বিনা সৃষ্টিতে থাকিয়া, অকস্মাৎ যেন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ দেখায়।) অবিদ্যাও একরূপা। অতএব অবিদ্যাও বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না। একথার উত্তর এইঃ-রাগাদি ক্লেশ, এবং বাসনা জনিত বিচিত্র-কর্ম্মের সহযোগে, অবিদ্যাও সংসার বৈষম্যের কারণ হইতে পারে। আর কর্ম্ম ভিন্ন শরীর হয় না, শরীর ভিন্ন কর্ম্ম হয় না,—সৃষ্টির আদি আছে, এরূপ স্বীকার করিলে, ইতরেতরাশ্রয় দোষও ঘটে। অপর

পক্ষে সৃষ্টি অনাদি বলিলে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কোনরূপ দোষ থাকে না।" (ব্রহ্মসূত্র অ-২। পা ১। সূত্র ৩৬॥) সৃষ্টি-প্রবাহ ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলাতে কোনরূপ দোষ থাকে না। তাহা হইলে সংসারও "অকস্মাৎ উদ্ভূতের ন্যায় হয় না" সত্য। কিন্তু কোন সৃষ্ট জীবের কর্ম্ম-বিশেষকে অনাদি বলিলে, তাহার কর্ম্মত্ব থাকে না। কাল অনাদি হইলেও, ঐ জীব-বিশেষ সম্বন্ধে, তাহার কর্ম্ম আদিমান্, কারণ কর্ম্ম ঐ জীবেরই কৃত। জীবও সেইরূপে কাল-প্রবাহ সম্বন্ধে অনাদি হইলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে আদিমান্, কারণ জীব ঈশ্বরেরই সৃষ্ট,—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি-বৈষম্য যদি অনাদি অথচ কর্ম্ম-জন্য বলা হয়, তবে স্রষ্টার স্রষ্টৃত্ব থাকে না। কর্ম্ম জীবেরই কৃত। সেই কর্ম্মই যদি ঈশ্বরের সমকালবর্ত্তী এবং অনাদি হয়, তবে জীব কি ঈশ্বরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী? ন্যায় মতে ক্রিয়া বা কর্ম্ম ক্রিয়াবানেরই আশ্রিত, এবং ক্রিয়াবানের সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কর্ম্মকে অনাদি বলিলে জীবকেও অনাদি বলা হয়, এবং আমাদের শাস্ত্রে তরু লতা গুল্মাদিও জীব-বিশেষই। তবে ঈশ্বরকে কিরূপে এ সকলের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে? আবার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে কর্ম্মই যদি জীব-সৃষ্টির নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হয়, এবং ঈশ্বর পর্জ্জন্য-স্থানীয় সহকারী মাত্র হন, তবে কর্ম্মই যথার্থ স্রষ্টা হইল, ঈশ্বর কর্ম্মেরই সহকারী মাত্র। 'কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ"—শঙ্করের বিরুদ্ধপক্ষ কর্ম্মমীমাংসক-দিগের এই মত, এবং নৈয়ায়িকাদির তটস্থ ঈশ্বরবাদই প্রবল হইল। সৃষ্টি কালপ্রবাহ সম্বন্ধে অনাদি, কিন্তু স্রষ্টা হইতেই সৃষ্টি, স্রষ্টারই লীলা অথবা স্বভাব সৃষ্টি। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলেরই লীলা সৃষ্টি, এ কথা শ্রুতি-বিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিতেছে, ঈশ্বর "স্বরাট্", কর্ম্মকে সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার অংশী বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। অতএব সংসারের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দৃষ্টে কর্ম্মের সৃষ্টি-বীজত্ব এবং অনাদিত্ব স্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না।

বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে, শঙ্করের ন্যায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর পক্ষে পরমেশ্বরের "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের' প্রশ্নই হইতে পারে না; কারণ সকলই তিনি। তিনি নিজের প্রতিই নিজে সেই বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য প্রদর্শন করেন। দুইজন যেখানে আছে, সেখানেই মাত্র বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের প্রশ্ন সম্ভব। কিন্তু ভূমাস্বরূপ পরমেশ্বরে—যাঁহার মধ্যে অন্য বলিয়া কেহ নাই, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি"—সে প্রশ্নই উঠিতে পারে না। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" সংসারের দুঃখ-সুখ অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা-জনিত। শঙ্কর নিজেই তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন,—"অবিদ্যাবেশ হেতু জীব দেহাদিতে আত্মভাব আরোপ করিয়া, তজ্জনিত দুঃখ দ্বারা নিজেকে দুঃখী মনে করে। জীবের দুঃখ পারমার্থিক নয়। অবিদ্যাকৃত-নামরূপ-জনিত দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ক অবিবেক এবং ভ্রম হইতেই জীবের দুঃখাভিমান। দেহাত্মাভিমান-ভ্রান্তি দ্বারা যেমন স্বদেহগত দাহচ্ছেদাদি নিমিত্ত দুঃখ, লোকে অনুভব করে, সেইরূপ পুত্রমিত্রাদি-গোচর দুঃখও তদভিমানজনিত ভ্রান্তি দ্বারাই অনুভব করে। স্নেহবশে 'আমিই

পুত্র' 'আমিই মিত্র' এইরূপে নিজেই পুত্র-মিত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা দ্বারা নিশ্চিত জানা যায় যে মিথ্যা অভিমান-ভ্রম হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। ব্যতিরেক দর্শন দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়ঃ—যথা, বহুলোক একত্র উপস্থিত থাকিলে, যদি ঘোষণা করা যায় 'পুত্র মৃত', 'মিত্র মৃত', তখন যাহাদের পুত্রমিত্রাদিমত্ব অভিমান আছে, তাহাদেরই তন্নিমিত্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অভিমান-শূন্য পরিব্রাজকাদির দুঃখ উৎপন্ন হয় না।" (ব্রহ্ম-সূত্র। অ-১। পা-৩। সূ ৪৬॥)

অতএব লোকের অবিদ্যাজনিত ব্যবহারিক-সংসারের সুখ দুঃখ দৃষ্টে ঈশ্বরের পরমার্থিক স্বরূপে বৈষম্য-নৈর্ঘ্ণ্য দোষ আরোপ করা অসঙ্গত। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে ঈশ্বর নিজের প্রতিই নিজে সেই ব্যবহারিক বৈষম্য-নৈঘৃণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। যে ঐশ্বর্য্যবলে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও, যুগপৎ অসংখ্য স্থানের অসংখ্য ভক্ত উপাসকের অসংখ্য প্রকারের পূজা গ্রহণ, এবং প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাকেন, অথবা যে ঐশ্বর্য্য-কণিকার বলে, জীব নিজেও স্বপ্নকালে, নিজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন জগৎ রচনা করিয়া নিজের নিকটেই নি[illegible]যুগপৎ বহুরূপে প্রকাশিত হয়,—অথচ তাহা একের বহুত্বরূপ বিরোধ দোষে বাধিত হয় না, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বলে দেবতির্য্যগ্নরাদি অসংখ্য ভোক্তারূপে নিজেই ব্যবহারিক সংসারের সর্ব্ববিধ বৈষম্য-নৈর্ঘ্ণ্য ভোগ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে বৈষম্য-নৈর্ঘ্ণ্যের আপত্তি নিতান্ত অমূলক। ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মস্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিতে-ছেনঃ—"হে বিশ্বরূপ! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার অথবা কুমারী, তুমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড ধারণ কর, তুমিই নবজাত শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ কর। তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ, অথবা হরিদ্বর্ণ লোহিতাক্ষ শুকাদি পক্ষী, তুমিই তড়িৎগর্ভ মেঘ, তুমিই ঋতু, অথবা সমুদ্র সকল।"(৩৪।অ-৪। শ্বেতাশ্বতর॥)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

আহার।

মৎপ্রণীত "খাদ্য" নামক পুস্তকে খাদ্য কাহাকে বলে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, পরিপাক-ক্রিয়া, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ, বয়সভেদে খাদ্যের পরিমাণ, রন্ধন, পরিমিত ভোজন, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন, ভেজাল খাদ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা সুসঙ্গত ও সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। এস্থলে আহার সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

আমরা সর্ব্বদাই কোন না কোনরূপ

পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য না করিলেও শারীরিক যন্ত্রাদি আপনা হইতেই নানাবিধ দৈহিক ক্রিয়া নিয়ত সম্পাদন করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাসক্রিয়াজনিত ফুসফুসের প্রসারণ ও সঙ্কোচন প্রভৃতি স্বাভাবিক দেহক্রিয়াগুলির সমাধা আমাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই উহা দ্বারা আমাদের দেহ অল্পবিস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ক্ষয়ের পরিপোষণ করিয়া থাকি।

অতি ক্ষুদ্রকায় নবজাত শিশুকে আমরা ক্রমশঃ পুষ্টদেহ বালক এবং উন্নতদেহ, বিশাল-বক্ষ, দীর্ঘভুজ যুবকে পরিণত হইতে দেখিতে পাই। ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সমধিক বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে; অস্থিসমূহ দৃঢ় হয় ও আয়তনে বিস্তৃতি লাভ করে; পেশীসমূহ পুষ্ট ও সবল হয় এবং শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রাদির আকার-গত বৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। আহার দ্বারাই শরীর এই বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে। এই কারণে শৈশব ও কিশোর অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ সময়ে যথোচিত খাদ্যের অভাব হইলে অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রাদির কোনটিই সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং চিরজন্মের মত ঐ শিশুর দেহ খর্ব্ব, অপরিপুষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এই জন্য শিশু ও বালকদিগের খাদ্যের উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেহ-রক্ষার জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। মৃতদেহে তাপের অভাব বলিয়া উহা স্পর্শে শীতল বোধ হয়। জীবিত মনুষ্যের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। আমরা খাদ্য হইতে এই তাপ প্রাপ্ত হই। জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে উহা শোণিতস্থিত নিশ্বাসগৃহীত অক্সিজেনের দ্বারা মৃদু ভাবে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে; এইরূপে আমাদিগের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্যই দেহতাপ উৎপত্তির আকর।

আমরা যে-কোন কার্য্য করি না, উহা সম্পাদন করিবার জন্য অল্পবিস্তর শক্তির প্রয়োজন হয়। শারীরিক তাপ রূপান্তরিত হইয়াই আমাদিগের কার্য্য করিবার শক্তি উৎপন্ন করে। পাথুরে কয়লার মধ্যে যে অব্যক্ত শক্তি (Potential energy) নিহিত থাকে, দগ্ধ হইবার সময় তাহা প্রথমতঃ তাপে পরিণত ও তৎপরে কার্য্য করিবার শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কল চালাইতে সক্ষম হয়। আমাদের খাদ্যের মধ্যে এইরূপ অব্যক্ত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ভুক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়াই তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে।

জাগ্রত অবস্থায় আমরা আমাদিগের মস্তিষ্ক নানাবিষয়ে অবিরাম পরিচালনা করিয়া থাকি। সময়ে সময়ে উহা গুরুতর চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। এইরূপ মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; যথোচিত খাদ্য গ্রহণ করিলেই মস্তিষ্ক পুনরায় সতেজ ও উর্ব্বর হইয়া উঠে। বহুকাল ব্যাপিয়া যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাব ঘটিলে শরীর যেমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্কও সেইরূপ হীনশক্তি হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক ক্ষয়-নিবারণ, দেহের বৃদ্ধি সাধন, দেহতাপ-জনন, কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন এবং মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তিসংরক্ষণ, ইহাদের প্রত্যেকটির জন্য খাদ্য-গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহাদের সকলগুলি সমভাবে এই কয়টি কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী নহে। খাদ্যস্থিত যে সকল উপকরণ এই সকল কার্য্যের উপযোগী, তাহা সমপরিমাণে সকল খাদ্যের মধ্যে থাকে না। এ সম্বন্ধে দুগ্ধই একমাত্র আদর্শ খাদ্য;—ইহার মধ্যে উপরোক্ত কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ করিবার সমস্ত উপকরণই যথাপরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই জন্য কেবল দুগ্ধকেই আমরা "পূর্ণখাদ্য" বলিয়া থাকি।

শিশুর শরীর রক্ষা ও উহার বৃদ্ধি সাধনের জন্য দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

মাংসজাতীয় খাদ্যের দ্বারা সাধারণতঃ শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। মাংসের যে গুণ, দুগ্ধের মধ্যে যে ছানা থাকে তাহারও সেই গুণ।

তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য দ্বারা শারীরিক তাপ উৎপন্ন হয় এবং উহাই রূপান্তরিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তিতে পরিণত হয়। দুগ্ধের মধ্যে যে মাখন ও দুগ্ধশর্করা থাকে, তাহারা এই দুইজাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভূত। মাখন ও দুগ্ধশর্করা হইতে শিশুর শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

লবণজাতীয় খাদ্য অস্থি-নির্ম্মাণ, রক্ত-পরিষ্কার এবং খাদ্য-পরিপাকের জন্য পাচক রস প্রস্তুত করিয়া থাকে। দুগ্ধের মধ্যে লবণজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং উহার দ্বারাই শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ও কোমল অস্থি দৃঢ়তা ও বিশালতা প্রাপ্ত হয়।

জল ভুক্ত-দ্রব্যকে তরল করিয়া রক্তমধ্যে গৃহীত হইবার উপযোগী করে এবং জলের সাহায্যেই শরীরের দূষিত পদার্থ মল, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতির আকারে নির্গত হইয়া যায়। দুগ্ধের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ জল আছে, সুতরাং শিশুদিগের পৃথক্‌ভাবে জল পান করিবার আবশ্যক হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধের মধ্যে শিশুর শরীর-রক্ষার উপযোগী সমস্ত উপকরণই যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে নানা কারণে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শুধু দুগ্ধের উপর নির্ভর করা চলে না, কারণ তাহা হইলে এত অধিক দুগ্ধ পান করিবার আবশ্যক হয় যে, তন্মধ্যস্থিত কতকগুলি উপকরণ আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। সুতরাং শিশু ব্যতীত অপর কেহ শুধু দুগ্ধের উপর নির্ভর করিলে তাহার পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রত্যহ একরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে আহারে বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা।

যখন একমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোনও খাদ্যদ্রব্যে, মাংস, তৈল, শর্করা ও লবণ, এই চারিজাতীয় উপকরণ একত্রে শরীর রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে না, তখন আমরা মাছ, মাংস, ডাল, চাউল, ঘৃত, তৈল, শর্করা প্রভৃতি কোন এক প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিলে

লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি শুধু মাংস ভক্ষণ করি, তাহা হইলে মাংসজাতীয় উপকরণ প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেও শর্করাজাতীয় উপকরণের নিতান্ত অভাব উপস্থিত হয়, কারণ মাংসের মধ্যে শর্করা-জাতীয় উপকরণ একেবারেই নাই। অধিকন্তু মাংসজাতীয় উপকরণ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে একপ্রকার বাতরোগ (Gout) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ আমরা যদি শুধু ভাত খাই, তাহা হইলে শর্করাজাতীয় উপকরণ আহরণের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না বটে, কিন্তু মাংসজাতীয় ও তৈলজাতীয় উপকরণের নিতান্ত অসঙ্গতি ঘটে, কারণ ভাতের মধ্যে ঐ দুই জাতীয় উপকরণ অতি অল্প পরিমাণেই আছে। ভাত হইতে মাংসজাতীয় ও তৈলজাতীয় উপকরণ যথাপ্রয়োজন সংগ্রহ করিতে হইলে এত অধিক ভাত খাইবার আবশ্যক হয় যে, তন্মধ্যস্থিত অত্যধিক পরিমাণ শর্করাজাতীয় উপকরণ (Starch) পরিপাক না হইয়া অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি উৎকট রোগ উৎপাদন করে। অতএব আমাদিগের বয়স ও রুচিভেদে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী হইতে উপরোক্ত চারিজাতীয় উপকরণ যথাপরিমাণে সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নানাজাতীয় খাদ্যসামগ্রী একত্রে মিশ্রিত করিয়া (Mixed diet) গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

আমরা মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ওট্‌মিল্, যব, ময়দা, ছানা প্রভৃতি সামগ্রী হইতে মাংসজাতীয় উপকরণ; ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি, সরিষার তৈল প্রভৃতি পদার্থ হইতে তৈল-জাতীয় উপকরণ; চিনি, গুড়, ময়দা, চাল, আলু প্রভৃতি দ্রব্য হইতে শর্করাজাতীয় উপকরণ এবং খাদ্যমাত্রেরই মধ্যে, যে অল্পাধিক পরিমাণ লাবণিক পদার্থ অবস্থিতি করে তদ্দ্বারা, ও খাদ্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া লবণজাতীয় উপকরণ শরীর রক্ষার উপযোগী পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।

আমাদিগের সকল খাদ্যসামগ্রীর মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণ জল থাকে; এতদ্ব্যতীত আমরা জল ও অন্যান্য পানীয় তৃষ্ণা নিবারণার্থ পান করিয়া থাকি। ইহা দ্বারাই আমাদিগের শরীরের জলের অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

এইরূপে পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য দুগ্ধ না খাইলেও উপরোক্ত বিভিন্নজাতীয় খাদ্যসামগ্রী হইতে শরীররক্ষার উপযোগী চারিজাতীয় উপকরণ যথাপরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্‌জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদিগের শরীরের সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতে পারে এবং আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে সক্ষম হই।

আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যে সকল পদার্থ বহির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের পরিমাণ পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিলে সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য কত পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা সহজেই স্থির করিতে পারি। কার্ব্বন্ ও নাইট্রোজেন্ এই সকল পরিত্যক্ত পদার্থের প্রধান উপাদান; সুতরাং যদি আমরা পরীক্ষা দ্বারা কত কার্ব্বন্ ও কত নাইট্রোজেন্ দিবসে আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছে তাহা স্থির করি, তাহা হইলে

যে পরিমাণ খাদ্যের মধ্যে ঐ পরিমাণ কার্ব্বন্ ও নাইট্রোজেন্ থাকিবে, তাহাই ভক্ষণ করিলে আমাদিগের শরীরের দৈনিক ক্ষয় পূরণ হইবার কথা।

একজন সুস্থদেহ সহজপরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক বাঙ্গালীর দেহ হইতে দিবসে প্রায় ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ এবং ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বন্, মলমূত্র ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের আকারে, পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, তন্মধ্যে অন্ততঃ ঐ পরিমাণ কার্ব্বন্ ও নাইট্রোজেন্ বিদ্যমান থাকে। কোন একজাতীয় খাদ্য হইতে আমরা এই পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বন্ একত্রে প্রাপ্ত হইতে পারি না। তিন পোয়ার কিঞ্চিদধিক মাংস খাইলে আমরা ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ পাইতে পারি বটে কিন্তু ঐ পরিমাণ মাংস হইতে ১৪০০ গ্রেণের অধিক কার্ব্বন্ সংগ্রহ করিতে পারি না। পুনশ্চ তিন পোয়া চাউল হইতে আমরা ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ পাইতে পারি, কিন্তু ৭৮ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটি খাদ্যসামগ্রীর কোন একটির দ্বারা আমাদের শারীরিক ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে না। যদি আমরা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করি, তাহা হইলে উপরোক্ত ক্ষতির পূরণ হইয়া শরীর পোষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত চারিজাতীয় উপকরণ কোন্ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে কত পরিমাণে আছে, তাহা জানা থাকিলে, কোন্ খাদ্য কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ এবং ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইল না। খাদ্যসম্বন্ধীয় যে কোন পুস্তকে বিবিধ খাদ্যসামগ্রীতে এই সকল বিভিন্নজাতীয় (মাংসজাতীয়, তৈলজাতীয়, শর্করাজাতীয় ও লবণজাতীয়) উপকরণ শতকরা কত পরিমাণে থাকে, তাহার বিস্তৃত তালিকা সন্নিবেশিত আছে; জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাহা সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবেন।

পরিশ্রমভেদে অল্লাধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়, ইহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক করে না। মোটামুটী ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সহজপরিশ্রমী সুস্থদেহ যুবাপুরুষের শরীরের ওজনের প্রতি সেরে প্রায় ১½ কাঁচ্চা পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্যের আবশ্যক হয়। যদি ঐ ব্যক্তির ওজন ১ মন ৩০ সের হয়, তাহা হইলে দিবসে তাহার প্রায় দেড় সের খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অধিক পরিশ্রম করিলে অবশ্য এতদপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয়। এই পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী এরূপভাবে ব্যবস্থিত হওয়া উচিত যে, ঐ ব্যক্তি উহা হইতে ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ ও ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

একজন সহজপরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালী যে প্রকার খাদ্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিলে ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ এবং ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ শরীরের দৈনিক ক্ষয় পূরণের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে, হিসাব করিয়া তাহার

একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই পরিমাণ খাদ্যকে রুচি ও সুবিধামত ভাগ করিয়া দিবসে অন্ততঃ তিন বারে গ্রহণ করা উচিত। যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহারা মাছ বা মাংসের পরিবর্ত্তে ডাল বা ছানা ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে এরূপ বাঁধাধরা তালিকা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক না হইবারই কথা। রুচি, পরিপাকশক্তি, অভ্যাস প্রভৃতি নানা কারণের উপর খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকার নির্ভর করে। আমাদের তালিকা এ বিষয়ের একটা স্থূল সত্য নির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র।

একজন সহজ পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক খাদ্যের তালিকা।

চাউল	...	৩ ছটাক
আটা বা ময়দা		৫ „
ডাল	...	১½ „
মাছ বা মাংস	...	২½ „
আলু	...	১ „
অন্য তরকারি	...	২ „
তৈল বা ঘৃত	...	½ „
দুগ্ধ	...	৮ „
লবণ	...	½ „
মসলা	...	যথাপরিমাণ
অম্ল দ্রব্য	...	যথারুচি

আমাদের দেশের ছাত্রদিগের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ অনেক স্থলেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত নহে, এজন্য তাহাদিগের মধ্যে যেমন কেহ কেহ অত্যধিক স্থূল হইয়া পড়ে। সেইরূপ আবার অনেকেই সম্যক্ শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নগরের ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছাত্রদিগের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে যে আহার প্রদত্ত হয়, পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে যে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ইংরাজ ছাত্রদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে কম থাকে। এইজন্য ছাত্র-জীবনে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রেরা শারীরিক দৈর্ঘ্য, বক্ষের প্রসারতা ও দেহের ওজন সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতি লাভ করিতে থাকে, বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে ২।৪ জন ব্যতীত অপর কাহারো মধ্যে সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না, বরঞ্চ অনেক স্থলে অবনতির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কলিকাতার কোন একটি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ছাত্রাবাসে যে খাদ্য প্রদত্ত হয়, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে তাহার মধ্যে ১৫০ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ থাকে না। ২৫০ গ্রেণের স্থানে এত অল্প নাইট্রোজেন্ পাইলে ছাত্রদিগের শারীরিক বৃদ্ধির যে অন্তরায় ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অবশ্য যাহারা অর্থব্যয় করিতে সমর্থ, তাহারা বাহির হইতে বিবিধ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এই অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে কিন্তু সামান্য অবস্থার ছাত্রদিগকে ছাত্রাবাসের খাদ্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার প্রথা সর্ব্বথা নিরাপদ নহে। ছাত্রাবাসের খাদ্যের এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে বাহির হইতে কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের অবসর ও আবশ্যক যেন একেবারেই না থাকে। এজন্য আমাদিগের বিবেচনায় কলিকাতার ছাত্রাবাসসমূহের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ উভয়েরই সংস্কারের

বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতি যে কোন নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যের কোন একটির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে এবং ভাতের পরিমাণ কমাইয়া তৎপরিবর্তে রুটীর ব্যবস্থা করিলে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি শীঘ্র দেখিবার আশা করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ল্যাভোয়াসিয়ে

প্রিস্ট্‌লে কর্তৃক অম্লজানের (Oxygen) আবিষ্কার।

ধাতু অপেক্ষা ধাতুভস্মের ওজন অধিক এই সত্য আবিষ্কারের পর ফ্লজিষ্টনবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ধাতুভস্মের ওজনবৃদ্ধির হেতু সঠিক নির্ণীত না হইয়াছিল ততদিন ফ্লজিষ্টনবাদের বিরুদ্ধে ল্যাভোয়াসিয়ে কোনও নূতন মত প্রচার করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ধাতুর সহিত কোন্ পদার্থ যুক্ত হইলে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ল্যাভোয়াসিয়ে সচেষ্ট থাকিলেন।

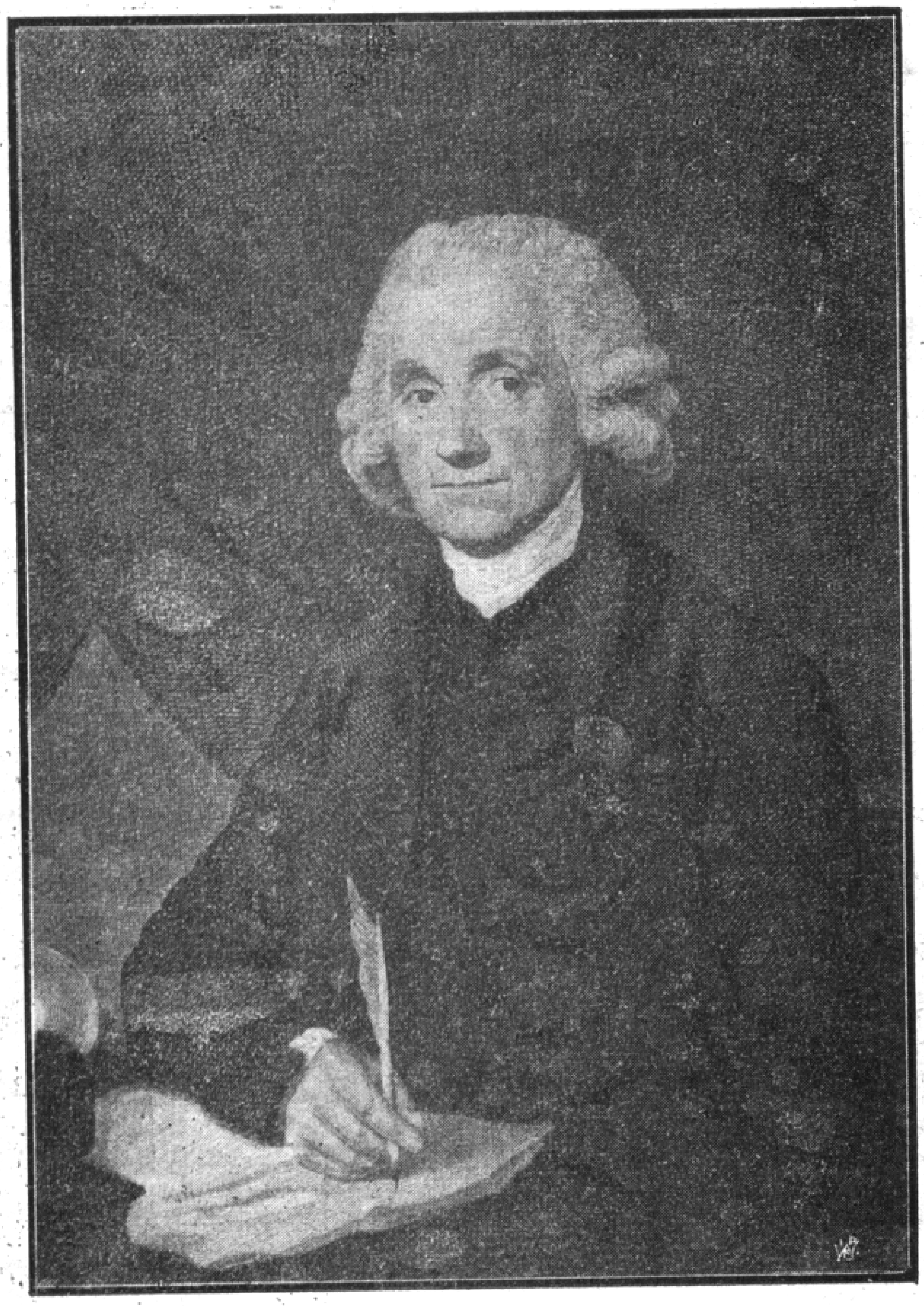
সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের দুইজন প্রথিতনামা রাসায়নিক দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার করিলেন। জোসেফ প্রিষ্ট্‌লের (Joseph Priestley) দ্বারা অম্লজান এবং হেন্‌রি কেভেণ্ডিসের দ্বারা (Henry Cavendish) জলের রাসায়নিকস্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। এই দুইটি আবিষ্কারের ফলে ল্যাভোয়াসিয়ে ফ্লজিষ্টনবাদকে চিরদিনের জন্য রসায়নশাস্ত্র হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অম্লজানের আবিষ্কর্তা

১৭৩৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের লিড্‌স্ নামক সহরের নিকটবর্ত্তী ফিল্ডহেডস্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। বাল্যকালে তাঁহার রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই; এবং উত্তরকালে তিনি ধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের নানাস্থানে ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম করিবার পর অবশেষে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে লিড্‌সে মিলহিল চ্যাপেলের ধর্ম্মযাজকের পদ প্রাপ্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে (ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে বড়ই দুর্ভাগ্যক্রমে) তাঁহার গির্জ্জার ঠিক পাশেই মদ চুয়াইবার একটি কারখানা ছিল। অনেকেই জানেন যে মদ চুয়াইবার সময় এক প্রকার "বায়ু" বাহির হইতে থাকে তাহাকে আমরা এখন অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid gas) বলি। প্রিষ্টলের ইচ্ছা জন্মিল যে এই "বায়ু" তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই "বায়ু" পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি এতগুলি "বায়ুর"স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া-

বলিয়া রসায়নশাস্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

এখনকার মত দ্বিতল বা ত্রিতল নানা যন্ত্রসমন্বিত রসশালা(১) তখন ছিল না। প্রিষ্ট্‌লের রাসায়নিক যন্ত্রের মধ্যে কাচের লম্বা শিশি, বোতল, ছিপি, জলপাত্র, পারদ, চামড়ার থলি প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সামান্য শিশি বোতলের সাহায্যে প্রিষ্ট্‌লে অম্লজানের আবিষ্কার, বায়ুর আংশিক স্বরূপ নির্ণয়, জলের স্বরূপ নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের আবিষ্কার প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক আবিষ্কারের দ্বারা রাসায়নিক জগতে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নানাবিধ "বায়ু"র পরীক্ষার ফল তিনভাগে বিভক্ত একখানি বৃহৎ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত অবিষ্কারের বর্ণনা করিবার স্থান আমাদের নাই;—আমরা এখানে কেবল তাঁহার অম্লজানের আবিষ্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।



জোসেফ প্রিষ্ট্‌লে

প্রিষ্ট্‌লের নিকট একটি ভাল আতসী কাচ (Burning glass) ছিল। তিনি এই আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যাতাপ একত্রীভূত করিয়া সেই তাপে নানা দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই উপায়ে লোহিত পারদভস্ম (Red oxide of Mercury) উত্তপ্ত করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে উহা হইতে একপ্রকার গ্যাস বাহির হইতেছে। এই গ্যাস পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহা সাধারণ

(১) "রসশালা" Chemical laboratory অর্থে ব্যবহৃত হইল। রসরত্নসমুচ্চয়ে এই রসশালার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অতএব "রাসায়নিক পরীক্ষাগার" প্রভৃতি কথা গড়িবার দরকার নাই।

বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্পন্ন। এই গ্যাসে মোমবাতী সাধারণ বায়ু অপেক্ষা অনেক ভাল জ্বলে। তিনি কয়েকটা ইঁদুর এই গ্যাসে এবং সমপরিমাণ সাধারণ বায়ুতে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে ইঁদুর সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই গ্যাসে বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। তিনি নিজেও এই বায়ু শুঁকিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"এই গ্যাস শুঁকিবার সময় ফুস্ফুসের উপর উহার ক্রিয়া সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন প্রকার বলিয়া অনুভব করি নাই, কিন্তু শুঁকিবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত বক্ষদেশে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছিলাম। কালে হয়ত এই বায়ু একটি বিলাসের সামগ্রী হইয়া উঠিবে। আজ পর্য্যন্ত আমার সহিত দুইটি ইঁদুরও এই বায়ু সেবনের সুখ অনুভব করিয়াছে।"

প্রিষ্ট্‌লের ভবিষ্যদ্‌বাণী কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছে। যদিও অম্লজান এখনও বিলাসের সামগ্রী হয় নাই, তত্রাচ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে অম্লজান শুঁকাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা হয়।

এইরূপে লোহিত পারদভস্ম উত্তপ্ত করিয়া প্রিষ্ট্‌লে সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্পন্ন নূতন বায়ুর আবিষ্কার করিয়া অন্যান্য দ্রব্য হইতে উহা প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। মেটে সিন্দূর (Red lead) উত্তপ্ত করিয়া দেখিলেন যে উহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে তিনি এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনিও একজন ফ্লজিষ্টনবাদী ছিলেন। এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন "ফ্লজিষ্টনহীন বায়ু"। এই বায়ুতে মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ভাল জ্বলে, তাহার কারণ উহাতে সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ফ্লজিষ্টন কম আছে—তিনি এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন।

এই নূতন বায়ুর আবিষ্কার-সংবাদ ল্যাভোয়াসিয়ের নিকট দৈববাণীরূপে পৌছিল। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখিতে পাইল যে এই নূতন বায়ু ফ্লজিষ্টনবাদের মোহময় আবরণ ভেদ করিবে। তিনি প্রথমে প্রিষ্টলের পরীক্ষা বিচার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রিষ্টলের বিপরীতগামী হইল। তিনি ভাবিলেন যে যখন মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই নূতন বায়ুতে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে জ্বলে, তখন সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ু অন্য কোনপ্রকার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে, এবং বাতি জ্বলিবার সময় এই নূতন বায়ু বাতির উপাদানের সহিত সংযুক্ত হয়। তিনি সাধারণ বায়ু হইতে এই নূতন বায়ু আহরণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া খানিকটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের পারদ একটি বকযন্ত্রে (Retort) গ্রহণ করিলেন। এই বকযন্ত্রের মুখ, একটি পারদপাত্রে আংশিকভাবে নিমজ্জিত বায়ুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি কাচপাত্রে (Bell-jar) প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রথমে একখণ্ড কাগজের দ্বারা কাচপাত্রে বায়ুর পরিমাণ মাপ করিয়া লইয়া বকযন্ত্রস্থিত পারদকে দ্বাদশ দিবস অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল যে বায়ুর পরিমাণ প্রায় ছয় ভাগের একভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং বকযন্ত্রস্থিত পারদের উপর লোহিতবর্ণের পারদভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। কাচপাত্রস্থিত অবশিষ্ট বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহাতে আর বাত

জ্বলিতেছে না। পরে এইরূপে প্রাপ্ত লোহিত পারদভস্ম উত্তপ্ত করিয়া তিনি উহা হইতে এই নূতন বায়ু অনেকখানি প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিতে পারিলেন। আরও তিনি দেখাইলেন যে পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া পারদভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যান্য ধাতুও এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হয়। এতদিনে তিনি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন "অম্লজান"।

এখন তিনি প্রচার করিলেন যে ফ্লজিষ্টন-বাদ নিতান্ত ভ্রান্ত। ধাতু ভস্ম হইলে তাহার ওজন কমে না, বরং বাড়িয়া থাকে। এই ওজন বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই নয়—ধাতু সাধারণ বায়ুর অন্যতম উপাদান অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। যখন ধাতুভস্ম অঙ্গার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয়, তখন অঙ্গার ধাতুভস্মের অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারাম্লে (Carbonic acid gas) পরিণত হয় এবং অসংযুক্ত ধাতু পড়িয়া থাকে। ফ্লজিষ্টন বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং উহা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রথম প্রথম তাঁহার নূতন মতের কেহই পোষকতা করিল না। এতদিনের পুঞ্জীভূত ভ্রান্ত ধারণা একদিনে যাইবার নহে। কিন্তু শেষে সত্যেরই জয় হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারই জীবদ্দশায় ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী এবং ব্ল্যাক প্রভৃতি স্কচ রাসায়নিকগণ তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। কেবল প্রিষ্টলে ও কেভেণ্ডিস আজীবন ফ্লজিষ্টনবাদী রহিয়া গেলেন।

কেভেণ্ডিস কর্ত্তৃক জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ল্যাভোয়াসিয়ের অম্লজানবাদ একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পূর্ব্বেই জানা ছিল যে যশদ (Zinc) প্রভৃতি ধাতু যখন জলীয় হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অম্লে(২) দ্রবীভূত হয় তখন উদজান (Hydrogen) নামক একটি খুব লঘু গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং ধাতু ভস্ম হইয়া অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হয়। ফ্লজিষ্টনবাদীরা বলিতেন যে এই অতি লঘু উদজানই ফ্লজিষ্টন; এবং অম্ল সংযোগে ধাতু হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট ধাতুভস্ম পড়িয়া থাকে। ল্যাভোয়াসিয়ে ইহার উত্তরে বলিলেন যে এই উদজান বায়ু লঘু হইলেও উহার ওজন আছে,

(২) আমি dilute অর্থে "জলীয়" করিলাম। "দ্রবীভূত" "dissolved" অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই সমীচীন। "Acid" অর্থে "অম্ল" করিলে ক্ষতি নাই, কারণ সুশ্রুতে "অম্ল"বর্গের উল্লেখ আছে। যেমন "হাইড্রোক্লোরিক এসিডের চলিত নাম "Muriatic acid" এবং বৈজ্ঞানিক নাম "হাইড্রোক্লোরিক এসিড", সেইরূপ আমরা উহার বাঙ্গালায় চলিত নাম "লবণাম্ল" এবং বৈজ্ঞানিক নাম "হাইড্রোক্লোরিক অম্ল" করিতে পারি। এইরূপ "গন্ধকাম্ল" ও "সালফিউরিক অম্ল", "অঙ্গারাম্ল" ও "কার্ব্বনিক অম্ল" চলিতে পারিবে। "অম্লজান" ও "অক্সিজান", "উদজান" ও "হাইড্রোজেন" দুইই চলিবে।

তবে উহা বাহির হইয়া যাইলে কেমন করিয়া ধাতুভস্মের ওজন ধাতু অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে? তিনি ফ্লজিষ্টনবাদীদের ভ্রম দেখাইয়া দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজ মতানুযায়ী কোন ভালমীমাংসা তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে ইংলণ্ডের তাৎকালিক অন্যতম প্রধান রাসায়নিক কেভেণ্ডিস জলের রাসায়নিকস্বরূপ নির্ণয় করিলেন। প্রাচীন গ্রীকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতের মনীষীগণ এই চারি ভূত ভিন্ন ব্যোম নামক সুক্ষ্মতর পঞ্চম মৌলিক পদার্থের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কঠোর হস্তে পড়িয়া অজ্ঞাতকুলশীল "ব্যোম" ভিন্ন অপর চারি ভূতের ভূতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রিষ্ট্‌লে, কেভেণ্ডিস, সিলে, ল্যাভোয়াসিয়ের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অম্লজান ও নাইট্রোজেন নামক দুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ (৩) বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। কেভেণ্ডিস জলের যৌগিকত্ব ৩) সপ্রমাণ করিলেন। হেন্‌রি কেভেণ্ডিস বড়ঘরের সন্তান ছিলেন—ডিউক অব ডেভনসায়ারের পৌত্র এবং লর্ড চার্লস কেভেণ্ডিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। তিনি প্রথমে হেক্‌নী স্কুলে পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেমন-এক-রকমের লোক ছিলেন, কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না, খুব অল্পই কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং যদিও তিনি অনেক লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু এমনি তাঁহার নাম প্রকাশের ভীতি ছিল যে তাঁহার লেখা খুব অল্পই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শেষ



কেভেণ্ডিস

বয়সে প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার খরচ কিছুই ছিল না। নিজের পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি কোনও দৃক্‌পাত করিতেন না এবং তাঁহার বাটীর আসবাব পত্র তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ীই ছিল। বাটীর যেটি বৈঠকখানা সেই ঘরটিকেই তিনি তাঁহার

(৩) মিশ্রণ "Mechanical mixture" অর্থে এবং "যৌগিক" "Chemical compound" অর্থে ব্যবহৃত হইল। "Chemical combination" "রাসায়নিক সংযোগ" এবং "combined" "সংযুক্ত" হইতে পারে। সেইরূপ "Chemical decomposition" "রাসায়নিক বিয়োগ" ও "decomposed" "বিযুক্ত" করিলাম।

প্রধান যন্ত্রাগার করিয়াছিলেন; দোতালার ঘরগুলিকে তিনি মানমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একটি মাত্র ভৃত্য তাঁহার নিকটে ছিল; কিন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে তাঁহার শেষ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত তখন সে ভৃত্যকেও বিদায় করিয়া দিলেন, এবং আদেশ দিলেন যেন সে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া না আসে। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে।

এই চিরনির্জ্জনতাপ্রিয়, সংসারবিরাগী ও কথঞ্চিৎ বিকৃতমস্তিষ্ক ইংরাজ, তাঁহার সমগ্র জীবন সাধনানিরত ভারতের যোগীর ন্যায়, বিজ্ঞানের সেবায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষে ও রসায়নে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এ সকল বিষয়ে যে শুধু তাঁহার অসামান্য জ্ঞান ছিল তাহা নহে, তিনি এই সকল বিদ্যায় ভূরি ভূরি মৌলিক গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ, বায়ুর পরিমাণাত্মক রাসায়নিক বিশ্লেষণ, তাপসম্বন্ধীয় পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার এবং জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও পরীক্ষার অতীত ছিল না। তিনি ল্যাভোয়াসিয়ের মত তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রত্যেক পরীক্ষায় করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য কোন কোন ইংরাজ তাঁহাকেই রসায়নশাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন।

কেভেণ্ডিস যে পরীক্ষার দ্বারা জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন, প্রিষ্ট্লে কিন্তু তিনি ঐ পরীক্ষার গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হন নাই। প্রিষ্ট্লে একটি কাচপাত্রে উদ্‌যান ও সাধারণ বায়ু একত্র মিশাইয়া তাহা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের (Electric spars) দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিলেন। এই দুই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে কাচপাত্রের ভিতরটা অল্প অল্প জলবিন্দুতে সিক্ত হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে এই জল উদ্‌যান ও বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে আসে নাই, উহা বোধ হয় বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প হইতে আসিয়াছে। মোট কথা তিনি এই জলের প্রতি আদৌ মনোযোগ করেন নাই। করিলে তিনিই জলের রাসায়নিক উপাদানের আবিষ্কারের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। কেভেণ্ডিস প্রিষ্ট্লের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন যে এইরূপে প্রাপ্ত জল একটা অবাস্তর পদার্থ নহে; উহা উদ্‌জান ও বায়ুর অম্লজানের সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে। ক্রমশঃ তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে সমস্ত উদ্‌যান গ্যাস ও সাধারণ বায়ুর পঞ্চমাংশ একত্র সংযুক্ত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং এক সময়ে তিনি ১৩৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ জল এই উপায়ে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জলের কোনও স্বাদ বা গন্ধ ছিল না এবং উত্তপ্ত করিলে উহার সমস্ত অংশই বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত।

কেভেণ্ডিস ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বায়ুর পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ অম্লজান গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে একভাগ

মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ করিলে সমস্ত গ্যাসই জলে পরিণত হয়, অসংযুক্ত অম্লযান বা উদ্‌যান অবশিষ্ট থাকে না। অতএব দুইভাগ পরিমাণ উদ্‌জান ও একভাগ পরিমাণ অম্লজান সংযুক্ত হইলে বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কেভেণ্ডিসের একজন বন্ধু ও সহকারী—সার চার্লস ব্ল্যাগডেন, কেভেণ্ডিসের এই সকল পরীক্ষার ফল ল্যাভোয়াসিয়ের গোচরে আনয়ন করেন। লেভোয়াসিয়ে তৎক্ষণাৎ কেভেণ্ডিসের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া অনেকখানি জল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আরও জলীয় বাষ্পকে একটি পোর্সিলেনের নলে উত্তপ্ত লৌহের উপর চালনা করিয়া উহা হইতে উদ্‌জান বায়ু প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষায় জলীয় বাষ্প বিযুক্ত (decomposed) হইয়া উদ্‌জান ও অম্লজানে পরিণত হয় এবং অম্লজান গ্যাস লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া অক্সাইড অব আইরনে পরিণত হইয়া থাকে ও উদ্‌জান বাহির হইয়া আসে। এখন এই দ্বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা জলের রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না।

ল্যাভোয়াসিয়ে কেবলমাত্র এই সকল পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিলেন না। কেভেণ্ডিস ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত না হওয়াতে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। ল্যাভোয়াসিয়ের অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি উহার সন্ধান পাইয়াছিল। তিনি এখন দেখিতে পাইলেন যে এই আবিষ্কার ফ্লজিষ্টনবাদীদিগের শেষ আশাও নির্মূল করিবে। এতদিনে তিনি ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে উদ্‌জান কেন দিলেন। তিনি বলিলেন যে এখানে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হইতেছে—প্রথমে জল বিযুক্ত হইয়া অম্লজান ও উদ্‌জানে পরিণত হয় ও পরে অম্লজানের সহিত ধাতু সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। সেই ধাতুভস্ম অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (salt) পরিণত হইয়া থাকে এবং উদ্‌জান বায়ু অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। অতএব ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে কাল্পনিক ফ্লজিষ্টনের উদ্ভবের কোনও সম্পর্ক নাই, জলের বিয়োগে একদিকে উদ্‌জান বায়ু বহির্গত হয় ও অপর দিকে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়। এতদিনে ল্যাভোয়াসিয়ের জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

ল্যাভোয়াসিয়ে কর্তৃক ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদের বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। কত অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্ত সহিষ্ণুতা, বিচিত্র ভাবপ্রবণতা এক একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার কাহিনীকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য কত মহাপুরুষ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—রবার্ট বয়েল, হুক, মেয়ো, ব্ল্যাক, প্রিষ্টলে, সিলে, বার্গমান, কেভেণ্ডিস, কারওয়ান, রদারফোর্ড, জেমস্ ওয়াট ও সর্ব্বোপরি ল্যাভোয়াসিয়ের গৌরবমণ্ডিত নাম ইহার সহিত জড়িত আছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে "A chemist is the most patient animal, even

গর্দ্দভ অপেক্ষাও রাসায়নিককে সহিষ্ণু হইতে হয়। কেহ কেহ অশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে সমগ্র জীবন কেবল নানাবিধ পরীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার এই সকল পরীক্ষাকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর কোন নূতন অনুমান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা সকলেই সাধনাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানের উন্নতিকেই একমাত্র ধ্রুব সত্য মনে করিয়া জ্ঞানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে কল্পনাশক্তি কেবল কবিরই প্রয়োজন। কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নহে;—কি কবি, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক সকলেরই কল্পনাশক্তি, ভাবপ্রবণতা সমান প্রয়োজন। এই কল্পনাশক্তির বলে বৈজ্ঞানিক স্থূলে সূক্ষ্ম দেখেন, দূর অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবর্ত্তন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পান, জড়-জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় আবর্ত্তনবিবর্ত্তন আকৃতিবিকৃতি না দেখিয়াও দেখিতে পান। এই কল্পনাশক্তি, এই ভাব-প্রবণতা, এই সূক্ষ্মদৃষ্টি ল্যাভোয়াসিয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। অপরে যেখানে উল্টা দেখিতেছিলেন সেখানে তিনিই কেবল সবই সোজা দেখিলেন। অপরের ও নিজের পরীক্ষার মধ্যে সত্য কোন অন্ধকারময় গূঢ় গহ্বরে লুক্কায়িত আছে তাহা তাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ল্যাভোয়াসিয়ে এইরূপে ফ্লজিষ্টনবাদকে রসায়নশাস্ত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া প্রাচীন রসায়নকে নূতনভাবে গঠিত করিতে লাগিলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী রাসায়নিকগণ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পূর্ব্বে যাবতীয় রাসায়নিক পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের অনুযায়ী ছিল, এখন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন পরিভাষার সৃষ্টি হইল ও তিনি একখানি রাসায়নিক গ্রন্থ রচনা করিলেন—এই গ্রন্থ চিরদিন রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরম আদরণীয় হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থে তিনি জড়পদার্থকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন—কঠিন, তরল ও বায়বীয় (৪); এবং উত্তাপ-সহযোগে কঠিন পদার্থ তরল ও ক্রমশঃ বায়বীয় আকার ধারণ করিতে পারে তাহাও দেখাইলেন। তাহার পর বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ—অম্লজান, এজোট (Azote, Nitrogen) জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ল প্রভৃতির সংমিশ্রণ। পূর্ব্বেকার "ফ্লজিষ্টিকেটেড্ বায়ু", "ফ্লজিষ্টন-হীন বায়ু" প্রভৃতি কথা একেবারে উঠাইয়া দিলেন। জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ অম্ল, ক্ষার, লবণ, প্রভৃতি রাসায়নিক বিভাগ ও পরিভাষা লিপিবদ্ধ করিলেন। আধুনিক রসায়নের যতটুকু জ্ঞাতব্য বিষয় তৎকালে ছিল সমস্তই গুছাইয়া নিজের মনোমত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

---

(৪) "Gaseous" কথাটার বাঙ্গালা "বায়বীয়" করিলাম, "বাষ্পীয়"ও হইতে পারে। "গ্যাস" কথাটা অনেকটা চলিয়া গিয়াছে; উহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে "গ্যাস্, বায়ু ও বাষ্প" তিনই ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু বাষ্প কথাটা "Vapour"এর প্রতিশব্দ হওয়া সমীচীন মনে করি।

ল্যাভোয়াসিয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশদ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব হইবে না। কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রাণিসমূহের শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, ধাতুভস্ম-প্রস্তুত-পদ্ধতি এবং দহনক্রিয়া এই তিন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন একরকমের। প্রাণিগণ শ্বাস লইবার সময় শরীরের মধ্যে বায়ু গ্রহণ করে: বায়ুর অম্লজান শরীরের ভিতর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অঙ্গারাম্লে পরিণত হয় এবং উহা বায়ুর নাইট্রোজেনের (৫) সহিত ও প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসে। ধাতুভস্ম-প্রস্তুত-পদ্ধতি ও দহনক্রিয়া এই অম্লজানের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

ল্যাভোয়াসিয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণিদেহের ঘর্ম্ম (ঘাম) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। কতকটা কাজ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত সেই সময় এই কাজটি শেষ করিবার জন্য তিনি বিচারকের নিকট সময় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কফিনাল ফরাসী সাধারণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন দেখিলেন না; তিনি জুরির মন্তব্য না লিখিয়াই এই মহাপুরুষকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তৎপর দিবস তাঁহার নশ্বর দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্ক-প্রসূত কার্য্যাবলীর পুণ্যস্মৃতি আজ বিশ্বের বহু নরনারী সাদরে পূজা করিতেছে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

ভারতে লৌহ নিষ্কাশন

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ লোহার কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। এমন উৎকৃষ্টতর লৌহ অতি অল্পদিন হইল ইয়ুরোপ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে। এখনও ভারতবর্ষের কুতুবমিনার ও দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ বৈদেশিক পর্য্যটকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। কুতুবমিনারের গাত্রে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রচলিত সংস্কৃত অক্ষর খোদিত আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে এত বড় লৌহ-স্তম্ভ ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান কার-

(৫) ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় Nitrogenকে "যবক্ষারজান' করিয়াছিলেন। তাঁহার কারণ "যবক্ষার" অর্থে "সোরা" বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু বৈদ্যকগ্রন্থে যব পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই "যবক্ষার" বলা হইয়াছে—উহা ক্ষার বিশেষ, সোরা আদৌ নহে। (আমার "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন—যবক্ষার" দেখুন)। সেইজন্য আমি Nitrogenকে "নাইট্রোজেন" বা "নেত্রজান" করিলাম—"যবক্ষারজান" করিলাম না।

খানাতেও এখন প্রস্তুত হইতে পারে না; কিন্তু ভারতবর্ষে চতুর্দশ শতাব্দীতে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল। বিখ্যাত রস্কো তাঁহার বৃহৎ রাসায়নিক পুস্তকে লিখিয়াছেন--

"আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কি করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীর হিন্দুগণ হাতে করিয়া এরূপ বৃহৎ লৌহদণ্ড ঢালাই করিত। ইয়ুরোপের নবোদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দ্বারা ঐরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা আধুনিক যুগেও বিশেষ আয়াসসাধ্য।"*

কি করিয়া যে তখন লোহার কারখানার এত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে এখন আর কেহই জানে না। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ১২, ৮৮৩, ৮৭৯ পাউণ্ড মূল্যের লৌহ এবং ইস্পাত আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে; এবং ৫ বৎসরের মধ্যে (১৯০৮ খৃঃ অব্দে) উহার সংখ্যা বাড়িয়া ২২,০৮৪, ৬৭৭ পাউণ্ডে (১) পৌছিয়াছে, এবং এই ভাবেই প্রতিবৎসর আমদানী লোহের মূল্য বা লৌহের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। কেবল ১৯০৮ সালেই প্রায় ৩২ কোটি টাকা আমাদের দেশ হইতে এই জন্য চলিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে যেরূপ এমন উত্তম লোহার খনি আর কোথাও নাই এবং তাহা হইতে লৌহ বাহির করিবার সুবিধাও বর্ত্তমান আছে। ধারোয়ার অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চৌম্বক (Magnetits) এবং হিমেটাইট্ (Hematite) নামক দুইপ্রকার প্রধান লৌহজ (Iron compound) পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সালেম, বেলারী, চান্দর, রায়পুর, জব্বলপুর ও মধ্য-প্রদেশের অন্যান্য জেলায় ঐ প্রকার পাথর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্দ্ধা (Wardah) জেলায় লৌহযুক্ত পাথর, চুণ, ও কয়লা প্রভৃতি লোহ-নিষ্কাশনের প্রধান উপাদান সমূহ একত্র পাওয়া যাইতে পারে। (২)

পুরাকালের লৌহনিষ্কাশন প্রথা ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; এখন তাহার ক্ষীণ রেখা যেটুকু বর্ত্তমান আছে, তাহারই বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। মধ্য-প্রদেশে যে সকল লোক এখন লৌহনিষ্কাশনে নিযুক্ত তাহাদের দ্বারা মোট একহাজার টন মাত্র লোহা প্রতিবৎসর নিষ্কাশিত হয়। ইহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী জানেনা, ভারতের পুরাতন প্রণালীও সম্যক অবগত নহে; জানিলে আরো অধিক পরিমাণ ফল তাহাদের নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব হইত।

দক্ষিণাবর্ত্তে ও মধ্য-ভারতে একদল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু আছে যাহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে লৌহ আছে দেখে এবং তাহা নিষ্কাশণের জন্য কয়লা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য নহে বোঝে সেই খানেই তাহারা চুল্লি নির্ম্মাণ করে। সালেম জেলার পারিয়াগণ সংস্কৃত লৌহ (Wrought Iron) ও ইস্পাত এই উভয় সামগ্রীই কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়া থাকে(৩)।

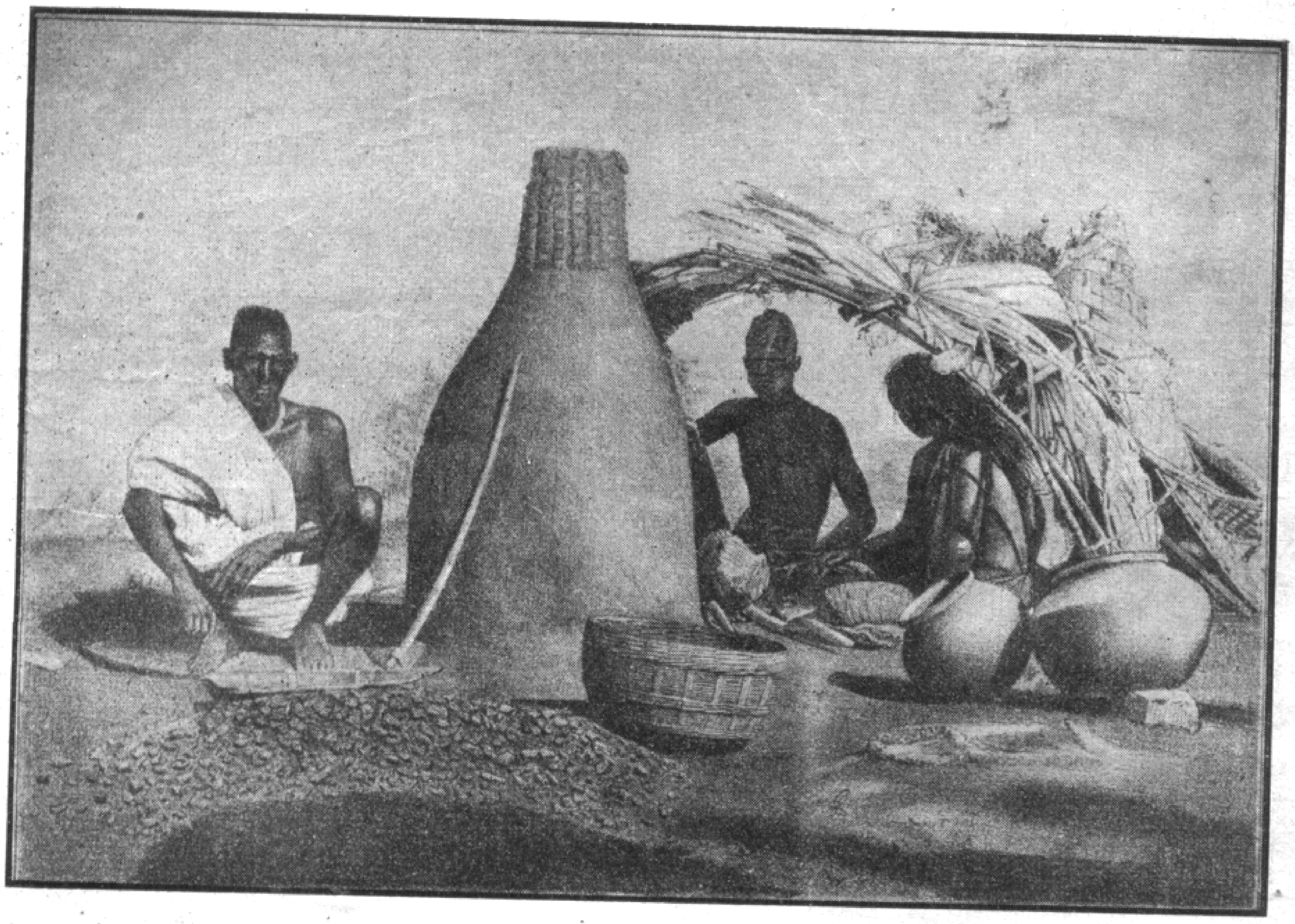
(*) Treatise on Chemistry p. 1114

(১) Records of the Geological Survey of India Vol. XXXIX, 1910.

(২) Sketch of the Mineral Resources of India by T. H. Holland.

(৩) Records of the Geological Survey of India—Vol XXV p. 3, 1892.

ইহারা প্রথমতঃ লৌহ খনিজের বড় বড় খণ্ডগুলিকে হাতুড়ি দিয়া ভাঙ্গিয়া ৩ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত ছোট ছোট টুক্‌রায় পরিণত করে, পরে এক প্রকার কুলা বা ঝাড়ন দিয়া ঐ গুলিকে ঝাড়িয়া বড় টুক্‌রাগুলিকে ছোট টুক্‌রা হইতে পৃথক করিয়া ফেলে এবং খনিজ খণ্ডগুলিকে মিশ্রিত লঘু বালুকাদি হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। এবং বড় বড় কার্য্যোপযোগী খণ্ডগুলিকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চূর্ণীকৃত করে; পরে মাটীর উপর মোচার আকারে (Conical shape) বা চিম্‌নীর আকারে তাহাদের চুল্লী নির্ম্মাণ করে। চুল্লীর নিম্ন ভাগের ব্যাস ১০।১৫ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ ভাগের ব্যাস ৮।১০ ইঞ্চির অধিক প্রায়ই হয় না। উচ্চতাতেও চুল্লীগুলি সাধারণতঃ ২।৪ ফিট মাত্র হয়। চুল্লীর নিম্নে দুইটী



সালেম জেলার পারিয়াগণকর্ত্তৃক লৌহ নিষ্কাশন

ছিদ্র থাকে, একটি দিয়া গরম বাতাস প্রবিষ্ট হয় ও আর একটি দিয়া লৌহ ও বালুকা প্রভৃতি আবর্জ্জনা রাশি বহির্গত হয়। ইহারা প্রায়ই খনিজ এবং কয়লা আন্দাজ করিয়া মিশাইয়া থাকে,—ঠিক হইল কিনা তাহা বিচার করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে অনেক কার্য্যোপযোগী জিনিষ বৃথাই নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার সহিত ইহারা তাহাদের পুরাতন অসম্পূর্ণ নিয়মগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, কোনো রূপ সংস্কারের প্রস্তাব তাহারা শুনিতে প্রস্তুত নহে। আমার মনে হয় ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। কারণ এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক বিতরণ

করিবার জন্য আমরা কখনো কোনো চেষ্টা করি নাই ;—চিরকালই তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণাভরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি, অথচ আমাদের জীবন-মরণের সোনার কাঠি, রূপার কাঠি তাহাদেরই হাতে !

তবে সুখের বিষয় এই যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে নব জাগরণের সূচনা হইয়াছে। গত ৭০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে লৌহ নিষ্কাশনের জন্য কতকগুলি উদ্যমের সূচনা দেখা গিয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই ব্যর্থ হইলেও আমরা আশা করিতে পারি যে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারিব।

লৌহ নিষ্কাশন করিবার জন্য বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান মিঃ জোসিয়া মার্সেল হিথ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়া ঐ কোম্পানীরই সাহায্যে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশে লৌহ নিষ্কাশনের উদ্যম করেন। (৪) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Porto Novo Steel Company ঐ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া মালবর প্রদেশে বেইপুর নামক স্থানে কার্য্য আরম্ভ করে। মিঃ হিথ্ এবং পূর্ব্ব কথিত কোম্পানী অনেক প্রকার রাজ-অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও কার্য্যটিকে সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এবং শীঘ্রই উঁহাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ কোম্পানী উঠিয়া যায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে East India Iron Company নামে ৪০০,০০০ পাউণ্ড মূলধনে একটি কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানী কাবেরী নদীর তীরে কইম্বুতর জেলায় ও দক্ষিণ আর্কট জেলায় দুইটি বাত্যাসহায় চুল্লী (blast furnace) নির্ম্মাণ করে কিন্তু উহাও অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বীরভূম ও কালাধুঙ্গিতে (কুমায়ুন) আরও কতকগুলি লৌহ নিষ্কাশনের উদ্যম হয়, কিন্তু কোনটিই সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের Bengal Iron & Steel Company মার্টিন কোম্পানীর সুন্দর তত্ত্বাবধানে সুচারু রূপে কার্য্য করিতেছে। আজ কাল এ কোম্পানী তিনটি চুল্লীতে কাজ করিতেছে ; এবং প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫, ০০০ টন লৌহ নিষ্কাশন করিতে ইহারা সমর্থ। প্রায় ১০৪, ০০০ টন বর্গ ফিট বিস্তৃত ইহাদের লৌহ ঢালাই করিবার স্থান, এবং প্রতি বৎসর প্রায় ১৪, ০০০ টন লৌহ উহাতে ঢালাই হইয়া থাকে এবং গড়ে প্রায় ৩,০০০ লোক এই স্থানে কার্য্য করে।

তৎপরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত টাটা লৌহ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মূলধন নামতঃ (nominally) ১,৫৪৫, ০০০ পাউণ্ড বা ২২৫, ৩২,৭০০০০ টাকা। উহারা ময়ূরভঞ্জ প্রদেশে কতকগুলি লৌহখনির স্বত্ব স্বল্প মূল্যে ক্রয় করিয়াছে এবং মধ্য-প্রদেশে বালাঘাট জেলায় কতকগুলি ম্যানগানি খনি, ছোটনাগপুরের চূণের পাথর এবং ঝেরিয়া অঞ্চলের কয়লার খনি উঁহাদের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতা হইতে ১৫৩ মাইল দূরে, কালিমাটী রেলরাস্তার উত্তরে সুবর্ণরেখা নদীতীরে—এই কোম্পানীর কার্য্যস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সম্প্রতি

(৪) Records of the Geological Survey of India Vol. XXXIX 1910.

ইহারা একটী চুল্লীতে কাজ আরম্ভ করিয়াছে; একটী বাত্যাসহায় চুল্লী (blast furnace) ও একটী ইস্পাত চুল্লীর (Steel furnace) কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ইহাতে প্রায় বৎসরে ১২০,০০০ টন অসংস্কৃত লৌহ (Pig Iron) ও ৭০,০০০ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবে, এবং ইহা দ্বারা প্রথমতঃ রেল (Rail) ও ছাতের বীম প্রস্তুত হইবে। গবর্ণমেণ্ট ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ২০,০০০ টন এই লৌহ-রেল্ বিলাতী লৌহের দরে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মূলধনে গঠিত।

ভারতে যে পরিমাণে লৌহ খনিজ বর্ত্তমান আছে, তাহার পক্ষে এইরূপ দুই একটী কারখানা কিছুই নহে। আমাদের মৃত্তিকা গর্ভে এত অর্থ থাকিতেও আমরা পথের ভিখারী!

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর নানাদেশে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ ও লৌহযন্ত্রাদি রপ্তানী হইত। (৫) বিখ্যাত দামাস্কাস্ তরবারীর লৌহ হাইদ্রাবাদ হইতে রপ্তানী হইত। (৬) কুতুব মিনার ও পুরাতন দালান ও মসজিদের লৌহ কবাটগুলি দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। মান্দালে এবং ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানে এখনও লোহার ছাতা প্রস্তুত করিবার প্রথা দেখা যায়। পূর্ব্বে এই সকল ছাতা অতি উৎকৃষ্ট ভারতীয় লৌহ দ্বারা প্রস্তুত হইত। এখন অতি অপকৃষ্ট বৈদেশিক লৌহ দ্বারা ঐ কার্য্য হইয়া থাকে।

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

আয়ুষ্মতী

আলো আরাধনা করিয়া নিয়ত
গেল যত অকল্যাণ,
চির এয়োতির সুমঙ্গল সাজ
ধরণী পাইল দান।
কুশণ্ডিকা শেষ সিন্দূর রাগ,
অরুণ ললাটে ঢালে,
অলক্তে রাঙায় রাতুল চরণ
তপন অস্তকালে,
সন্ধ্যা পরায় জরির আঙিয়া
গোধূলি-কিরণ-জালে॥

সোনার দুকূল পরায় আদরে
চন্দ্রিকা ভালবেসে,
চুমকি বসান সূক্ষ্ম ওড়না
ঘোমটা নিবিড় কেশে,
দিক্‌বধূদের সীঁথির মুকুতা
ঝাপটা অলক দেশে!
আলো আরাধনা করিয়া নিয়ত
গেল যত অকল্যাণ,
সবিতার বরে ধরার জীবনে
চির সাবিত্রীর দান॥

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী।

---

(৫) Dr. P. C. Ray's 'Hindu Chemistry.'

চন্দ্রনাথ

১

অফিসের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। প্রতি সোমবার দুই একজন করিয়া হতভাগ্য কেরাণীকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রীতিমত দুর্ভাবনা পড়িয়া গিয়াছিল, কবে সাধের চাকুরিটি করচ্যুত হয়!

চন্দ্রনাথ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু, সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল, এই মার্কার জোন্সের অফিসে অতিবাহিত করিয়াছে। হিসাব বিভাগে সে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী। বেতন কিন্তু পঞ্চাশের উপর উঠে নাই। বেতন বৃদ্ধির জন্য কখনও সে মুনিবদিগকে এতটুকু ধরিয়া পড়ে নাই। এক্ষণে ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় তাহার পরিবারে লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, আয়ে কুলাইয়া উঠে না—গৃহিণী প্রত্যহই অনুযোগ করে—চন্দ্রনাথ শুধু হাসিয়া বলে, "আজ সাহেবকে বলব।" কিন্তু বলা কখনও ঘটিয়া উঠে না।

গৃহিণীর রুক্ষ মেজাজ, ও শিশুগুলার দুরবস্থায় চন্দ্রনাথের মন টলিলেও সাহেবের নিকট বেতনবৃদ্ধির জন্য উমেদারী করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাহেব যদি বলে, "না!"

সে প্রত্যহই নিয়মিত সময়ে অফিসে আসিত ও চেয়ারে চাদরখানি বাঁধিয়া মোটা লেজর বহি খুলিয়া নিঃশব্দে আপনার কর্ত্তব্য সারিয়া যাইত। হিসাবনিকাশে এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে সাহেবরা কোনদিন চন্দ্রনাথের এতটুকু ত্রুটি দেখিতে পান নাই—কার্য্যেও তাহার শিথিলতা ছিল না।

চন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে একটু সেণ্টিমেণ্ট ছিল। শৈশবে সে একবার কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আজ যদিও তাহার কোন প্রমাণ পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি স্ত্রীর নিকট হইতে দুইটা সোহাগের বাণী, আদরের সম্ভাষণ, পাইলে সে কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মীর অকৃপা ও ষষ্ঠীর কৃপায় ইদানীং সে দুইটি সামগ্রীও বেচারা চন্দ্রনাথের অদৃষ্টে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া রাখা ছাড়া তাহার গত্যন্তর ছিল না।

বেচারী গৃহিণীকেও এ বিষয়ে দোষ দেওয়া যায় না। পাঁচ ছয়টি শিশু যখন অনশনের জ্বালায় চীৎকার শব্দে ক্রন্দন জুড়িয়া দেয়, একাদশবর্ষীয় বালক আসিয়া বলে, বই ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তাই পড়া বলিতে না পারায় মাষ্টার মহাশয় পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম দারুণ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছেন, তখন অসহায়া রমণীর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা একান্ত দায় হইয়া উঠে। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার উৎকট বাসনা তাহার তপ্ত হৃদয়তল হইতে গর্জ্জিয়া উঠে এবং সংসারের প্রতি স্বামীদেবতাটির আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য দেখিয়া হতাশ্বাসে অভাগিনী নারীর ক্ষুব্ধ অন্তর ভরিয়া যায়। সে সময় স্বামীদেবতাটি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মুখে থাকেন, তবে তাঁহার শিরে বন্যার প্লাবনের মত

রোষ ও অভিমানের উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি সবলে আঘাত করে। চন্দ্রনাথ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া সেদিন যখন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন গৃহিণী হরসুন্দরী সাভিমানে বলিল, "ও পোড়া আপিস না হয় ছেড়ে দাও, বাপু! বিশ বছর মাথার ঘাম পায় ফেলে চাকরি করছ—ঝড় বৃষ্টি রোগ শোক মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তাতে দৃক্‌পাত নেই—তা সেই পঞ্চাশ টাকা! সংসারে খরচ বাড়ছে বই কমছে না ত! সাহেবদের বুঝিয়ে বল না একবার—এতগুলির মুখে অন্ন দিতে এ টাকায় কুলোবে কেন?"

চন্দ্রনাথ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "সাহেবকে বলি ত—"

"তার জবাব দেয় কি?

"বলে, কাজ কর—বাড়বে বৈ কি!"

"বাড়বে ত, কবে বাড়বে? ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে আমি চিতেয় সেঁধুলে—"

"না!—তা কেন? তবে কি জান,—বিস্তর লোকের চাকরি যাচ্ছে—অফিসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে—এ চাকরিটুকু থাকে যদি কোনমতে ত সে মস্ত বরাত জোর—তার উপর এখন বাড়াবার কথা—"

"এই বিশ বচ্ছর আপিস ত খারাপ চলে আসেনি—কবে থেকে আমি বলছি, তা গ্রাহ্যই নেই। গরিবের কথা শুনবে, কেন?"

"হর—" চন্দ্রনাথ স্ত্রীর কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, "হর"—তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল।

হরসুন্দরী স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ও কি—চোখে জল এল নাকি! না বাপু, আমার ঘাট হয়েছে—আর কখনো কিছু বলব না—ওদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে—"

হরসুন্দরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে চন্দ্রনাথ বাহিরে রোয়াকে আসিয়া বসিল। তখন সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটিয়া উঠিয়াছে! ঝিল্লীর মিশ্র রাগিণীতে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে! এতটুকু বায়ু নাই! গাছ-পালাগুলা অন্ধকারে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে! কি যেন একটা বেদনার ভীষণ আঘাতে প্রকৃতির নিশ্বাসরোধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল, তাহার অন্তরও ঠিক এমনই! কোথাও এতটুকু আশার আলোক নাই, শুধু অন্ধকার! দারুণ যন্ত্রণায় তাহারও নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম করিল।

২

সেদিন সোমবার। অফিসে আসিয়া চন্দ্রনাথ নিত্যকার মত লেজর বহিখানি খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় চাপরাশি আসিয়া কহিল, "সাহেব সেলাম দিয়াছেন!"

চন্দ্রনাথের বুকটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল,—তাইত, কেন?

সাহসে ভর দিয়া সে সাহেবের কক্ষে আসিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব কহিলেন, "চন্দ্রনাথ, অফিসের অবস্থা ত দেখিতেছ! আজ আবার হেড অফিস হইতে পত্র আসিয়াছে, কয়জনকে ছাড়াইবার জন্য—"

চন্দ্রনাথের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

সাহেব কহিলেন, "তুমি আমাদিগের বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী—তোমাকে

ছাড়াইতে যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে! কিন্তু কি করিব—আমার প্রতি যে হুকুম হইয়াছে—"

চন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু আজ বিশ বৎসর আমি এই অফিসে কর্ম্ম করছি, কোনদিন কাজে ত্রুটি পান নি—বোধ হয়—"

সাহেব কহিলেন, "জানি, সব জানি, চন্দ্রনাথ। দুই মাস পূর্ব্বে তোমায় ছাড়াইবার জন্য পত্র আসিয়াছিল, আমিই বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহা রদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আর হইল না—এবার দুঃখিত চিত্তে তোমাকে বিদায় দিতে হইতেছে। উপায় নাই! তবে একটু দয়া তাঁহারা করিয়াছেন, পনেরো দিনের মাহিনা তোমায় অতিরিক্ত দিবার আদেশ পাইয়াছি।"

সে কথা চন্দ্রনাথের কানে গেল না। সে কহিল, "হিসাব-নিকাশের কাজ চলবে কি করে?"

সাহেব কহিলেন, "হিসাব কোথায় যে তার নিকাশ হইবে? কি করিব, বাবু, আমি একান্ত নিরুপায়! গুডমর্ণিং—"

চন্দ্রনাথ ধীরপদে বাহিরে আসিল। মনে উদয় হইলেও একবার সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, জীবনের এই অপরাহ্নে ছেলেমেয়েগুলির হাত ধরিয়া সে কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে!

বাহিরে চারি পাঁচজন কেরাণী উদ্‌গ্রীব-ভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাগজের মত তাহার সাদা মুখ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। কৌতূহলপ্রশ্নে মুহূর্ত্তে তাহাকে সকলে বিব্রত করিয়া তুলিল।

অবিনাশ কহিল, "এতদিনের লোকটাকে

মধু কহিল, "এই বেলা সরে পড়ে অন্যত্র চেষ্টা করা যাক হে—ব্যাপার ক্রমশই সঙ্গিন হয়ে উঠছে—"

হলধর কহিল, "টাইপিষ্টের চাকরির অভাব নেই। তুমি ত সহজেই জুটিয়ে নেবে, আমরা মাছিমারার দল, যাই কোথা?"

সত্য কহিল, "ব্যবসা করা যাবে! কিছু না হয়, এক পানচুরুটের দোকান"—

অবিনাশ কহিল, "ঠাট্টা নয়—এ রকম তালপাতার ছাউনি বেঁধে থাকবার চেয়ে, পানচুরুটের দোকান কি, রাস্তায় কাপড় হেঁকে বেচে বেড়ানোও ঢের সোয়াস্তির, ঢের আরামের—"

কোলাহলের মধ্য হইতে বিদায় লইয়া চন্দ্রনাথ সোজা পথ ধরিয়া, লালদীঘির ধার ছাড়াইয়া, হাইকোর্টের পাশ দিয়া একেবারে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

সূর্য্য তখন মধ্যগগনে দীপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পরিশ্রান্ত দুই চারিজন পথিক বৃক্ষতলে ছায়ার আশ্রয় পাইয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রনাথ ভাবিল, জগতে ইহারাই সুখী! কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভর চিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিয়াছে! কোন অশান্তি নাই! চাকুরির ভাবনা, আহারের ভাবনা ভাবিতে হয় না—গৃহে রুক্ষ মুখের অকরুণ বাণী শুনিতে হয় না! গৃহে ফিরিলে হয়ত দুইটি প্রসন্ন নেত্রের প্রফুল্ল দৃষ্টিপাতে সমস্ত ক্লান্তি মুছিয়া যাইবে! কিন্তু সে? আজ কি বলিয়া সে স্ত্রীর নিকট মুখ দেখাইবে? স্ত্রীরই বা দোষ কি? অহর্নিশি দারিদ্র্যের সহিত যাহাকে সংগ্রাম

হয়, বুভুক্ষু অনশন-পীড়িত অসহায় শিশুর ক্রন্দনের উৎপাতে যে বেচারী মুহূর্ত্ত বিরাম অবসর পায় না, তাহার মুখে হাসি আসিবে কোথা হইতে? সে যে এই সংসারে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, সে কাহার জন্য? কি তাহার দায়—? চন্দ্রনাথ কোনদিন কি তাহাকে সুখী করিতে পারিয়াছে? সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে? দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ! নাই, নাই, নাই! দিবারাত্রি যেখানে এই ধ্বনি উঠিতেছে, সেখানে গৃহলক্ষ্মীর প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি যে বিরাট ম্লানিমায় আচ্ছন্ন রহিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

চন্দ্রনাথ আরও ভাবিতেছিল, তাহার অসহায় দুর্ভাগা শিশুগুলির কথা! বেচারা শিশুগুলি! কেন তোরা এ গৃহে আসিয়াছিলি? ধনীর প্রাসাদে অজস্র স্নেহ, অজস্র সমাদর, অজস্র সম্ভোগ—সব ছাড়িয়া কেন এই নিরন্নের ভগ্ন দীর্ণ কুটিরকোণে, আকাশের নক্ষত্র, তোরা, খসিয়া পড়িলি? দুষ্ট গ্রহের এ কি দারুণ অভিশাপ!

ক্রমে নন্দন-সদৃশ ইডেন উদ্যানের উচ্চ ঝাউগাছগুলার শীর্ষদেশ কনক-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া সূর্য্য পশ্চিমে গঙ্গার কোলে হেলিয়া পড়িল। গাড়ীঘোড়ার শব্দে ও লোকজনের কোলাহলে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিল! দিনের শেষে শ্রমজীবির দল গৃহে ফিরিয়াছে, অভাবহীন বিলাসীর দল ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, চারিধারে সুখের নির্ঝর উছলিয়া উঠিয়াছে—এ সুখের মধ্যে বুকের ভিতর অসীম দুঃখভার বহিয়া চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গৃহের পথে চলিল। সারা পথ শুধু সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, গৃহে ফিরিয়া হরসুন্দরীকে আজ কি বলিবে?

৩

হরসুন্দরীকে চন্দ্রনাথ কোন কথা খুলিয়া বলিল না। সে স্থির করিল, একে সে বেচারী এই দুঃখে সারা হইয়া আছে, ইহার উপর যদি সে শুনে, তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, সাধের চাকুরিটি গিয়াছে,—তাহা হইলে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে! পনেরো দিনের অতিরিক্ত মাহিনা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা কিছুদিন ত কাটানো যাইবে, ইতিমধ্যে সে অন্যত্র একটা চাকুরির জোগাড় করিয়া লইবে। তখন হরসুন্দরীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেই চলিবে, এখন নহে!

পরদিন হইতে চন্দ্রনাথ যথানিয়মে বেলা দশটার সময় নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যায়—আবার পাঁচটার সময় গৃহে ফিরে! হরসুন্দরীর মনে এতটুকু সন্দেহ হইল না! এটর্ণির অফিসে, হাইকোর্টে ও ছোট আদালতে উকিলদিগের নিকট চন্দ্রনাথ চাকুরির উমেদারী করিয়া ফিরিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই এক উত্তর মিলিল, "তোমার বয়স হয়ে গেছে—আর অত মাহিনাই বা কে দিবে?" বেচারা প্রতিদিনই অবসন্নচিত্তে ঘুরিয়া ফিরে, চাকুরি কোথাও মিলে না!

হরসুন্দরী একদিন কহিল, "হাঁগা, তুমি দিন দিন এমন শুখিয়ে যাচ্ছ কেন? ভাতে ত বস, শুধু, খাওয়া একেবারে গেছে! একজন ডাক্তারের কাছে যাও না, একবার—কোন অসুখ-বিসুখ হ'ল না ত!"

চন্দ্রনাথের বক্ষের ভিতর দীর্ঘনিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাদের

মত লক্ষ্মীছাড়ার আবার অসুখ! আমরা মলে দুঃখ ভোগ করবে কে, হর?"

হরসুন্দরীর নয়নপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। সে কহিল, "আমি কত কড়া কথা বলি তোমাকে—তাই কি রাগ করেছ, আমার উপর?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "না—হর, রাগ করিনি! তোমাদের এ দুঃখ কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না! মাহিনা বাড়াবার জন্য এত বলি, তা সাহেব কিছুতে শোনে না। ভাবছি, এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর কোথাও চেষ্টা দেখি!"

হরসুন্দরী কহিল, "না, না, চাকরি ছাড়ে না! আগে কোথাও স্থির না করে অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিতকে ছাড়তে আছে!"

৪

পরদিন চন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলে মধ্যাহ্নে অবিনাশ আসিয়া ডাকিল, "চন্দ্রবাবু—"

চন্দ্রনাথের একাদশবর্ষীয় পুত্র দীননাথ আসিয়া কহিল, "বাবা আপিসে গেছেন।"

"অফিস? কোথাও চাকরীর জোগাড় হয়েছে, তাহলে! কত টাকা মাহিনা হ'ল?"

দীননাথ কথাটা না বুঝিয়া বিস্ময়-বিহ্বল-ভাবে অবিনাশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অবিনাশ কহিল, "তোমার বাবা কোন্ অফিসে গেছেন?"

দীননাথ কহিল, "যেখানে বরাবর চাকরি করছেন—"

অবিনাশ কহিল, "মার্কার জোন্সের অফিস! সে অফিস ত একেবারে উঠে গেছে, আজ দশ পনেরো দিন হ'ল—"

দীননাথ কহিল, "কই আমাদের ত বাবা বলেননি—তিনি রোজই ত আগেকার মত ঠিক সময়েই আপিসে যান।"

অবিনাশ কহিল, "সে কি? আজ চারদিন পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার যখন দেখা হ'ল, তিনি বললেন, চাকরীর চেষ্টা দেখছি, সুবিধা হয়ে উঠছে না— আমায় বলেছিলেন, একটা জোগাড় করতে—কদিন আমার ওখানে যাচ্ছেন—"

হরসুন্দরী দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। মাতার সঙ্কেতে দীননাথ ভিতরে আসিল। পরে প্রশ্নোত্তরে উভয় পক্ষই ব্যাপার বুঝিল। হরসুন্দরী বুঝিল, আজ দুই মাস হইল, চন্দ্রনাথের চাকুরি গিয়াছে, কিন্তু কথাটা তাহার নিকট সে গোপন রাখিয়াছে। পাছে, জানিতে পারিলে, তাহার মনে কষ্ট হয়! যে স্বামী তাহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তাহার মুখের একটি মিষ্ট কথার প্রত্যাশী মাত্র, তাহাকে হরসুন্দরী রূঢ় বাণীতে অহরহ কিরূপ পীড়িত করে! সে কি নিষ্ঠুর! অবিনাশ বুঝিল, ব্যাপারটা চন্দ্রনাথ বাড়ীতে ভাঙ্গে নাই।

অবিনাশ কহিল, সে অন্যত্র আপনার জন্য একটি চাকুরি জোগাড় করিয়া লইয়াছে। অফিস ছোট। বেতনও কাজে সামান্য! সেই অফিসেই চন্দ্রনাথের জন্য সে একটি চাকুরি জুটাইতে সমর্থ হইয়াছে, বেতন পঁচিশ টাকা মাত্র। তবে নূতন অফিস, উন্নতি হইলে বেতন বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।

হরসুন্দরী পুত্রকে দিয়া জানাইল, সংবাদটি চন্দ্রনাথের জন্য লিখিয়া রাখিয়া গেলেই ভাল হয়। অগত্যা অবিনাশ কাগজ কলম লইয়া ইংরাজীতে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিল।

দীনুর হস্তে পত্র দিয়া কহিল,"এই চিঠিতে আমি সব কথা লিখে দিলাম—পারি ত সন্ধ্যার সময় এসে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।"

অবিনাশ চলিয়া গেল।

৫

নিয়মিত সময়ে চন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। হরসুন্দরী পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া কহিল, "কার চিঠি, এ?"

চন্দ্রনাথ গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর মুছিয়া স্নিগ্ধ করিয়া পত্র খুলিল। হরসুন্দরী নিকটে বসিয়া স্বামীকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। পত্রপাঠ শেষ হইলে তাহার কোটরগত শুষ্ক চক্ষু বহুদিন পরে আজ দীপ্ত হইয়া উঠিল। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কে লিখলে, গা!"

চন্দ্রনাথ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "বড় বিপদ হয়েছে, হর, শুনলে তোমার কষ্ট হবে, অথচ তোমায় না বললেও নয়!"

"কি বিপদ?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "মাহিনা বাড়াবার জন্য তুমি সাহেবকে বলতে বল, কিন্তু অনেকের চাকরি একেবারেই যাচ্ছে—অফিসের অবস্থা অতি খারাপ। সাহেব আমায় বলছিল, যদি পঁচিশ টাকায় রাজী হও ত, কাজ কর, না হলে রাখতে পারব না।"

হরসুন্দরী অলক্ষ্যে মৃদু হাসিল, অকম্পিত স্বরে কহিল, "তা তুমি কি বললে?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "আমি বলেছি, ভেবে দেখব, সাহেব! তারপর আজ অন্যত্র কর্ম্মের চেষ্টা দেখতে গেছলুম, বাজার একেবারে মন্দা! আর তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে বলে, লোকে বড় একটা নিতে চায় না, অত মাহিনাতে। সাহেব আমার মত জানতে চেয়েছেন, তাই এই চিঠি---"

হরসুন্দরী বুঝিল, এ গোপন করার অর্থ, এ মিথ্যা বলার অর্থ, আর কিছু নহে, শুধু অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনা হইতে তাহাকে রক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

সে তথাপি আত্মগোপন করিয়া কহিল, "কি জবাব দেবে, তুমি?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "এইতেই ত চলে না—পঁচিশ টাকাতে তোমার কষ্ট আরও বাড়বে যে, হর, অথচ বাজারও যা দেখছি,—তুমি কি বল?"

হরসুন্দরী কহিল, "আমি বলি, ওতেই রাজী হও। কোথায় আবার এ বয়সে আমাদের পোড়া পেটের জন্য কার উমেদারী করতে যাবে—"

চন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু চলবে কি করে?"

হরসুন্দরী কহিল, "ভগবান নিরুপায়ের উপায়, তিনিই উপায় করবেন'খন! তিনি জীব দিয়েছেন যখন, আহারও মেলাবেন!"

কৃতজ্ঞতায় চন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে কহিল, "তাইত—"

হরসুন্দরী কহিল, "আমি ছেলেবেলায় লেস বোনা ও সেলাইয়ের কাজ ত শিখেছিলাম—তাই করব, বাজারে বেচে কিছু পাওয়া যাবে, তাহলে—"

চন্দ্রনাথ কহিল, "তোমার একদণ্ড অবসর নাই! সংসারের এত কাজ, ছেলেপিলে দেখা, তার উপর আবার মেহনৎ সহ্য হবে কেন, হর? তার চেয়ে আমি অন্যত্র ছেলে পড়ানো একটা যাতে জোটে, তার চেষ্টা দেখি—"

হরসুন্দরী কহিল, "তোমার এ মেহনৎ

সহ্য হবে, আর আমার—যাক তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ, আমি সব জানতে পেরেছি কিন্তু, আর আমায় লুকোতে পারবে না—" আগ্রহের আতিশয্যে হরসুন্দরীর গোপনতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে কহিল, "ও চিঠি সাহেবের নয়, আজ অবিনাশবাবু এসে লিখে রেখে গিয়েছেন যে! দীনুকে ডেকে তিনি বলছিলেন, আমি সব কথা শুনেছি। দুমাস তোমার চাকরি নাই! পাছে আমার মনে কষ্ট হয়, তাই তুমি আমায় বলনি, এ কথা, যদি তোমায় কড়া কথা বলি, যদি আমি রাগ করি—?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "ছি, ছি, ও কি বলছ, হর! তোমায় একদিনের জন্য সুখী করতে পারিনি, উল্টে এই ভাবনার বোঝা আবার তোমার ঘাড়ে চাপাব?"

হরসুন্দরী কহিল, "আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমি তোমায় কত রুক্ষ কথা বলেছি! জানি, আমাদের জন্য ভেবে ভেবে তুমি সারা হয়ে যাচ্ছ, তোমার সে কষ্ট একটুও লাঘব না করে আমি আরও কটু কথা বলেছি, আমার এ অপরাধের শাস্তি নাই।"

চন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে কহিল, "হর, আজ এ দারিদ্র্যে সত্যই আমার আনন্দ হচ্ছে। চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা কবে হবে, জানি না, তবে আমার গৃহের লক্ষ্মীকে আজ আমার অন্তরের মধ্যে যে ফিরে পেয়েছি, এ কি কম সুখ!"

গদগদ চিত্তে চন্দ্রনাথ হরসুন্দরীকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইল। মিলনের পুলকস্পর্শে তাহার সকল বেদনা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল! এমন সময় বাহির হইতে ক্রীড়োন্মত্ত দীনু ডাকিল, "বাবা, অবিনাশবাবু এসেছেন, তোমায় ডাকছেন।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কবুতরের কথা

(ঐতিহাসিক কাহিনী)

(১)

যশোহরের সদর ষ্টেশন হইতে উত্তরে বারবাজার বলিয়া একটী প্রাচীন স্থান আছে। আজকাল আর সেখানে প্রাচীনতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই,—কেবল কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ইষ্টকখণ্ড আর কতকগুলি পুষ্করিণী দেখিয়া মনে হয়, যে এস্থান পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বা নবাবের আবাসভূমি ছিল। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, খুলনার অন্তর্গত বাগের হাটে যে খাঞ্জালির দর্গা ও মসজিদ আছে, সেই দর্গা মসজিদাদি স্থাপনকারী খাঞ্জালি বা খানজেহান আলি দিল্লি হইতে এইদিকে আগমন কালে পথিমধ্যে যাহাতে আহারাদির ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য দ্বাদশজন সঙ্গীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের বন্দোবস্ত শেষ হইবার পূর্ব্বেই খাঞ্জালি তথায় উপস্থিত হন এবং আহারাদি

প্রস্তুত হয় নাই দেখিয়া দ্বাদশ সঙ্গীকে তথায় থাকিতে আদেশ দিয়া, অপরাপর সঙ্গীসহ নিজে বাগের হাট যাত্রা করেন। দ্বাদশ সঙ্গী এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া তথায় মসজিদ দর্গাদি প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন করিয়া সেই স্থান আপনাদের বাসোপযোগী করিয়া লন। এইস্থানের নাম এইজন্য "বারবাজার" হইয়াছে।

অপর একটী কিম্বদন্তী এই যে, এইস্থানে যে "৬ বুড়ি ৬টা" পুষ্করিণী আছে এবং অন্যান্য যে সকল মসজিদ আছে উহা এক গাজীর কৃত। প্রবাদ এই যে, এই গাজীই মুকুটরায়কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা মাইচম্পাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ইনি বোগদাদাধিপতি "ছয় সেকন্দরের পুত্র।" তৃতীয় কিম্বদন্তী এই যে, বারবাজারের নিকটবর্ত্তী বাতুরগাছা নামক স্থানে শ্রীরাম রাজা নামে তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত এক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি ছিলেন। বাতুর-গাছায় এইক্ষণও একটি বৃহৎ গড় দৃষ্ট হয়। পরিখা পূর্ব্বে প্রায় ২০ হাত গভীর ছিল; বর্ত্তমানে ৮।৯ হাত গভীর। কোন সময়েই এই পরিখা জলশূন্য হয় না। গড়ের মধ্যস্থিত ৫।৬ বিঘা স্থান লইয়া রাজার প্রাসাদ ছিল—ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই যে, এই প্রবল রাজা "ছয় সেকেন্দরের পুত্র" গাজীর বরপুত্রের সহিত যুদ্ধ করেন। গাজীর বরপুত্র যে কে তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই এবং এই যুদ্ধ কোন সময়ে ঘটে তাহারও কোন নিদর্শন নাই। যাহা হউক প্রবাদ এই যে, শ্রীরাম রাজা গাজীর বরপুত্রের নিকট পরাজিত হইয়া বন্দীরূপে নবাবের নিকট প্রেরিত হন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে রাজা পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইবার সময় দুইটী পারাবত সঙ্গে লইয়া যান এবং যুদ্ধে পরাজিত হইলে এই পারাবতদ্বয় পরাজয় সংবাদ বহন করিয়া আনিলে পরিজনবর্গ যেন পরিখার জলে দেহ বিসর্জ্জন করেন,—এইরূপ আদেশ দিয়া যান।

যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইলেন এবং গাজীর বরপুত্র শ্রীরাম রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নবাবের নিকট উপস্থিত করিলেন কিন্তু রাজা নবাবকে পরিতুষ্ট করায় তাঁহার অনুগ্রহে স্বাধীনতা লাভ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়! বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? পথিমধ্যে বিহঙ্গমদ্বয় কাহারও অসাবধানতায় পিঞ্জরমুক্ত হইয়া রাজার রাজ-ধানী বাতুরগাছায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ-পুরে রাণীর নিকট উপস্থিত হইল। রাণী ও পরিজনবর্গ বুঝিলেন, রাজা পরাজিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রাণবিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ মনে করিয়া পরিখার গভীর জলে সকলেই দেহত্যাগ করিলেন।

এদিকে শ্রীরাম রাজা বিহঙ্গমদ্বয়কে পিঞ্জরমুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়া সৈন্য সামন্তকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়া, নিজে অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু রাজধানী পৌঁছিয়া দেখিলেন সব শেষ হইয়াছে। প্রিয়তমা রাণী ও পরিজনবর্গ আর কেহই নাই। রাজাও শোকাতুর হইয়া সেই পরিখার জলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। সব শেষ হইল।

(২)

পূর্ব্বে আমরা 'মুকুটরায়' ও 'ছয় শেকন্দরের পুত্র' গাজীর উল্লেখ করিয়াছি। এই মুকুট রায়ের সহিত আমরা যে মুকুটরায়ের কথা এইক্ষণ উল্লেখ করিতে যাইতেছি, কোনও সম্পর্ক আছে কিনা ইতিহাস বা কিম্বদন্তী তাহা লেখে না। প্রথমোক্ত মুকুটরায়ের রাজধানী ছিল যশোহর খুলনা লাইনের রেলষ্টেশন ঝিকরগাছার নিকট, আর শেষোক্ত মুকুটরায়ের রাজধানী ছিল ঝিনেদহ মহকুমার এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বারিবাথন নামক স্থানে। উভয় মুকুটরায়ের ইতিহাসের সহিত অনেক পুষ্করিণী খননের কথা প্রচলিত আছে এবং উভয়েই যে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন তৎপক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে মুকুটরায়ের কথা বলিতেছি তাঁহার সঙ্গে ১৬ হল্কা হস্তী, ২০ হল্কা অশ্ব এবং ২২ শত বেলদার থাকিত। (এক হল্কা = ১৬)। মুকুট রায় যেখানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া স্নান করিতেন। যাহার সঙ্গে দ্বাবিংশতি বেলদার থাকিত তাঁহার পক্ষে ইহা নিতান্ত অসম্ভবও নহে। মুকুটরায়ের একটী পুষ্করিণীর নাম 'ঢোল সমুদ্র'। ঢোল সমুদ্র ৫২ বিঘা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে ২৫ বিঘা জলকর। প্রবাদ এই যে, ঢোল সমুদ্র খনন কালে কিছুতেই জল উঠিল না। পরিশেষে সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া পূজার্চ্চনা ও অসংখ্য ঢুলী ঢোল বাজাইলে পর পুষ্করিণী জল পূর্ণ হইয়া উঠে। অপর প্রবাদ এই যে, ঢোল সমুদ্র এত গভীর ছিল যে পুষ্করিণীর তলদেশে দাঁড়াইয়া বাদ্য করিলে উপর হইতে সে বাদ্য শ্রুত হইত না। ঢোল সমুদ্র ব্যতীত 'মিঠা পুকুর' ও 'নটী পুকুর' নামে অন্য দুইটি পুকুর মুকুটরায় খনন করাইয়াছিলেন। শেষোক্ত পুকুরে তাঁহার নর্ত্তকীগণ স্নান করিত বলিয়া উহার এরূপ নামকরণ হয়! পুষ্করিণী খনন ব্যতীত রাজা অনেক রাস্তাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাস্তাগুলির এখনও সামান্য সামান্য নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদের আর বিশেষ কিছুই চিহ্ন নাই।

প্রবাদ এই, রাজা মুকুটরায় গায়েশ কাজী নামক এক মুসলমানকে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন। গায়েশ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন না করাতে, ক্রোধান্ধ হিন্দুরাজা গায়েশের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল কিন্তু এই কাজীহত্যায় রাজা রাজ্য হারাইলেন। নবাব এই কাজী হত্যার বিবরণ অবগত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ রাজাকে বন্দী করিয়া নবাব-দরবারে আনয়ন করিল। রাজা মুকুটরায়ও রাজধানী পরিত্যাগ কালীন সঙ্গে দুইটী পারাবত লইয়া গেলেন এবং বিচারে মুক্তি লাভ না করিলে পারাবত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিবেন এইরূপ বলিয়া গেলেন এবং শ্রীরাম রাজার ন্যায় মুকুটরায়ও নবাবের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া দেশে ফিরিবার অগ্রেই তাঁহার পিঞ্জরমুক্ত কবুতর দুইটী রাজধানী পৌছিল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এই মনে করিয়া পরিজনবর্গ দেহত্যাগ করিলেন। রাজা রাজধানী পৌছিয়া যখন দেখিলেন যে সব শেষ হইয়াছে তখন তিনিও প্রিয় পরিজনবর্গের অনুসরণপূর্ব্বক দিব্যধামে গমন

করিলেন। রাজা মুকুটরায়ের আর কোন-চিহ্নই থাকিল না! কেবল প্রবাদই আজ তাঁহার কথাটুকু বজায় রাখিয়াছে।

(৩)

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার অধীন নয়াবাড়ী বলিয়া একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। খুলনা হইতে মাগুরা পর্য্যন্ত যে ষ্টীমার প্রত্যহ যাতায়াত করে, সেই ষ্টীমারে নলঙ্গী ষ্টেশনে নামিয়া ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী মিঠাপুরের খেয়াঘাট পার হইয়া এই নয়াবাড়ী গ্রামে পৌছান যায়। নয়াবাড়ী মুসলমান-প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে মাঠের মধ্যে "পাতাল ভেদী রাজার" বাড়ী আছে। পাতাল ভেদী রাজা কে তাহারও কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার গড়ের চিহ্ন, প্রাসাদের সামান্য ভগ্নাবশেষ এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। গড়ের চারিটি কোণ দীর্ঘে প্রায় ৩০০ শত হাত; প্রস্থে উহাপেক্ষা কিছু কম। পরিখাটী প্রায় ৩০ হাত বিস্তৃত। বৎসরের ২।৩ মাস ব্যতীত অন্য সকল সময়েই জল পূর্ণ থাকে। এখনও সেখানে ৩টী প্রাসাদের ঢিবি দেখা যায়; ৬টী পুষ্করিণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাসাদ হইতে নবগঙ্গা নদীর তীর পর্য্যন্ত রাজপথের চিহ্ন আছে। এখনও লোকে মনে করে, মৃত্তিকাগর্ভে নদীতীর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ ও ভূগর্ভে রাজার প্রাসাদ আছে। অথচ রাজা কে, তিনি কোন জনপদের রাজা ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তিনি ঐ দেশের রাজা ছিলেন, কি অন্য কোন দেশের রাজা বিদ্রোহী হইয়া ধনজন রক্ষার জন্য ঐস্থানে গুপ্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহারও কোন প্রচলিত কাহিনী নাই। পাতাল ভেদী রাজার বাড়ীর পার্শ্বেই একটী স্থানকে গ্রামবাসীরা ইমামবাড়ী বলে। হিন্দু রাজার প্রাসাদসংলগ্ন ইমামবাড়ীর উদ্দেশ্যই বা কি কে বলিতে পারে? কেহ বলিবেন রাজা প্রজারঞ্জক ছিলেন, হিন্দু মুসলমানকে এক চক্ষে দেখিতেন; তাই প্রাসাদসংলগ্ন ভূমিতে মুসলমানপ্রজার জন্য ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ বলিবেন, হিন্দু রাজাকে পরাজয় করিয়া, মুসলমান নবাব ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শেষ কথাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, শ্রীরাম এবং মুকুট রাজার ন্যায় এই পাতাল ভেদী রাজার নামের সহিতও দুইটী সংবাদবাহী পারাবতের কথা উপরি-উক্ত প্রকারে আজি পর্য্যন্ত সংযুক্ত রহিয়াছে। শ্রীরাম এবং মুকুটের ন্যায় এই রাজার পারাবত দুইটীও পিঞ্জরমুক্ত হইয়া রাজার পূর্ব্বে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে পরিজন-বর্গের ও পরে রাজার মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে যে এদেশে পারাবত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা হইত, এই সকল কাহিনী তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

খসরুবাগ

খসরুবাগ প্রয়াগের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন এ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি এই বাগান প্রস্তুত করেন। মৃত্যুর পর এই সাধের বাগানেই তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এখন খসরুবাগ গভর্ণমেণ্টের হাতে। শুনিয়াছি ৩।৪ শত টাকা বেতনে এ বাগানের একজন ইংরাজ তত্ত্বাবধায়ক আছে। বাগানের দুইটি গেট। প্রথম গেটের অন্তর্গত স্থান এখন খসরুবাগের সামিল নহে, সেখানকার রাস্তা দোকানাদি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। পূর্ব্বে এইখানে নবাবের খাসদোকান বসিত। ইহার কাছে একটি কূপবাটিকা আছে; দোতালা বাড়ীর মধ্যে কূপ, কূপের ভিতর পর্য্যন্ত সিঁড়ি, গরমিকালে বেগমগণ এইখানে আরাম করিতেন।

প্রথম গেটের কমপাউণ্ডের সীমায় দ্বিতীয় আর একটি প্রকাণ্ড গেট। ইহা উচ্চে বোধ হয় ৫০ হাতেরও অধিক হইবে, এই তোরণের শিল্প কার্য্যও চমৎকার। ভিতরে ঢুকিয়া বাগানের রাস্তার দুই পাশে চাহিয়া দেখ— বিচিত্র সুন্দর মখমলশয্যা বিছান রহিয়াছে। সে মখমল পশমের নহে, ঘাসের মাঝে মাঝে নানাবর্ণের বিলাতিফুল ফুটাইয়া এ মখমল প্রস্তুত। সেই ফুলন্ত মখমল সাজের অন্য পার্শ্বে ফুলবাগান। নানা রঙের নানা আয়তনের হাজার হাজার গোলাপ একসঙ্গে ফুটিয়া সৌরভে চারিদিক আকুল করিয়া তুলিতেছে। গোলাপ ফুলের এমন মনোহর

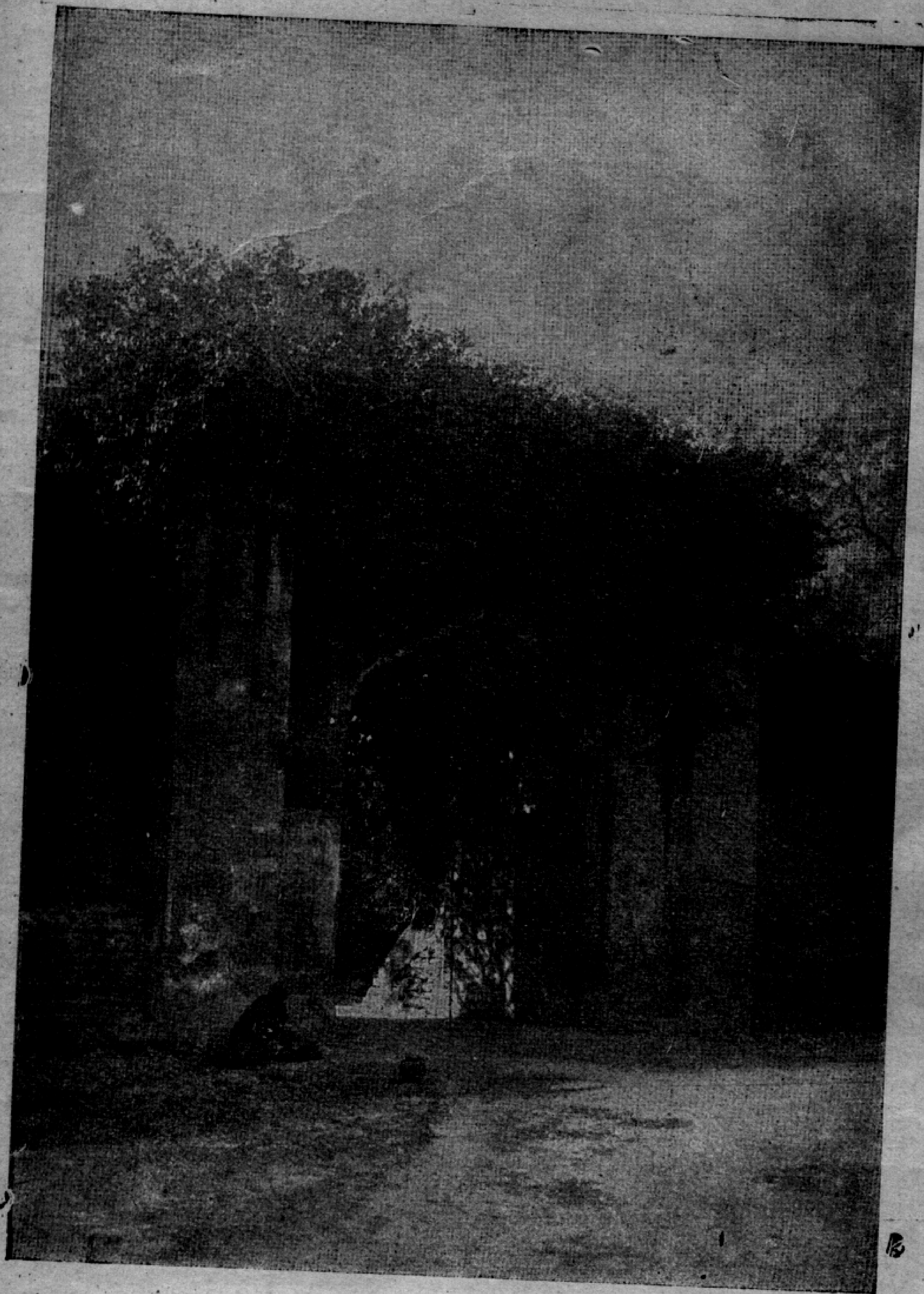
যে এখানে একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে খসরুবাগ গোলাপের জন্যই প্রসিদ্ধ।

বাগানের মধ্যে এক লাইনে তিনটি সমাধি মন্দির। প্রথমটি খসরুর মাতার, দ্বিতীয়টি শূন্য; খসরুর যে বেগমের জন্য ইহা নির্ম্মিত হয় তিনি দিল্লিতে বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করেন,— সেইখানেই তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়। সুতরাং এখানকার মন্দিরটি শূন্যই রহিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় মন্দিরটিতে স্বয়ং খসরু ও তাঁহার দুই বালক পুত্র শয়ান আছেন। হতভাগ্য খসরু শাজাহানের প্ররোচনায় তাঁহার দুইটি বালক পুত্রের সহিত একই দিনে একজন ক্রীত-দাস কর্ত্তৃক নিহত হন। খসরু ও সাজাহান দুই জনেই সহোদর ভ্রাতা, মানসিংহের ভগিনী ইঁহাদের মাতা। পিতা জাহাঙ্গীর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই রাজ্য লোভে দুই ভ্রাতায় বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ নিবৃত্তির জন্য দুই ভাইকে স্বতন্ত্র রাখিবার ইচ্ছায় খসরুকে তিনি এলাহাবাদের শাসন ভার দিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। সাজাহান ও খসরুর বিবাদে তাঁহাদের মাতা সাহাজানকেই দোষী দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন; এবং এমন পুত্রের মুখ দেখিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্র খসরুর সহিত এলাহাবাদে আগমন করেন। খসরু এখানে আসিয়াও নিস্তার পাইলেন না। একদিন তিনি ও তাঁহার দুই পুত্র আহার করিতেছেন;

অন্যত্র প্রেরণ করিয়া খসরুর একজন ভৃত্যবেশী শাজাহানের লোক পিতাপুত্র তিনজনকে একসঙ্গে হত্যা করে। কিন্তু পরে শাজাহান দোষ মুক্ত হইবার জন্য এই ভৃত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন।—পুত্র-শোকে রাজ্ঞীও কিছুদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন।

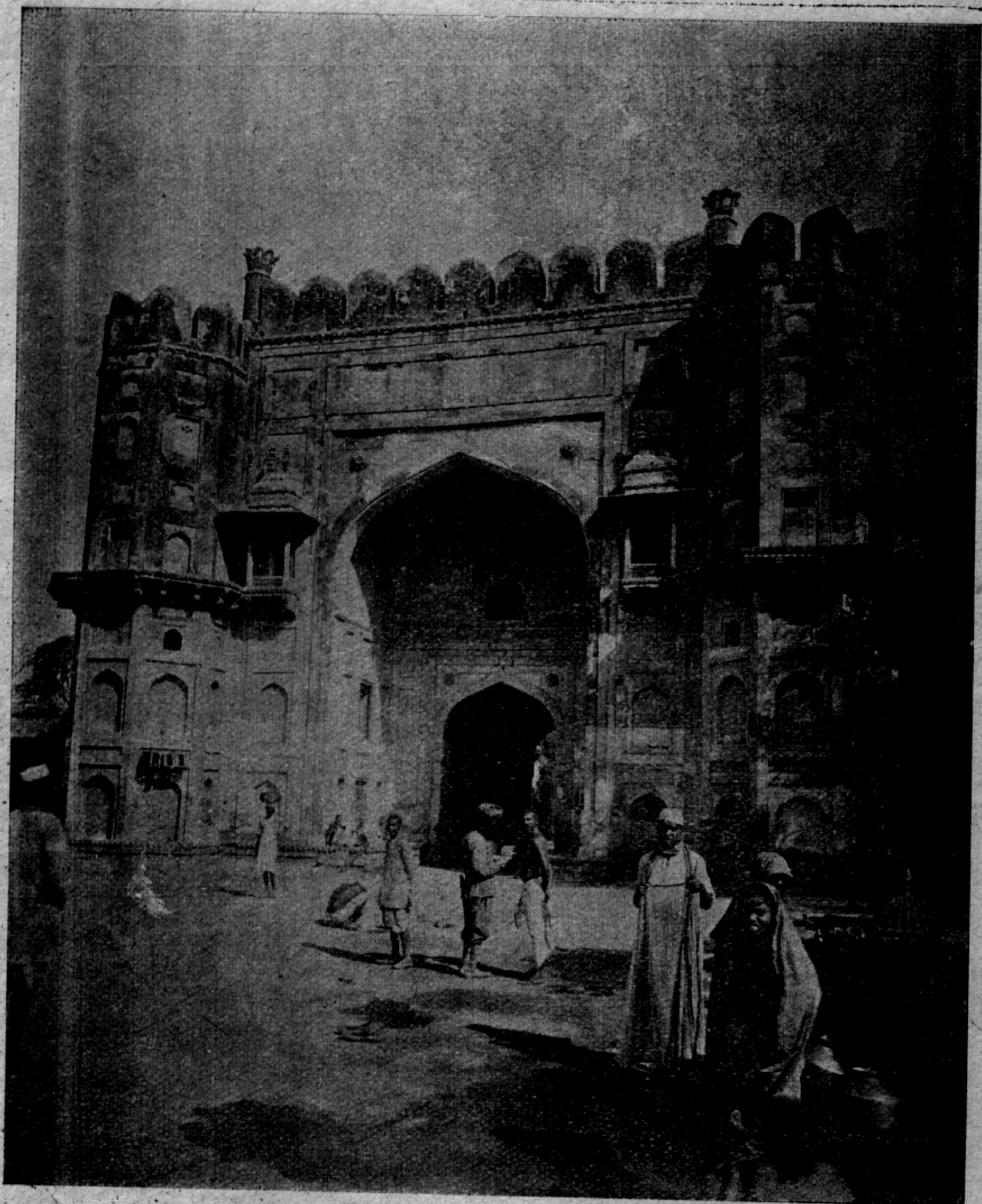
যে ফকীরের উপর এই সমাধি তিনটির



খসরুবাগের প্রথম গেট

রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত—তাঁহার কাছে আমরা এই সকল কথা শুনিলাম। ফকীর পারস্য ভাষা বেশ জানেন। সমাধি মন্দিরের খোদিত শ্লোক পড়িয়া তিনি আমাদিগকে তাহার অর্থ বলিতে লাগিলেন। খসরুর সমাধি মন্দিরের দেয়ালে অনেকগুলি

এই মর্ম্মের কবিতা লেখা আছে,—ধনের জন্য কি না হয়, পুত্র পিতার অবাধ্য হয়, ভাই ভাইকে নিধন করে, ইত্যাদি। এক স্থলের দুই ছত্র কবিতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। তাহার অর্থ এই; "এই যে নবাব খসরু—ইনি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভারও সহ্য করিতে পারিতেন

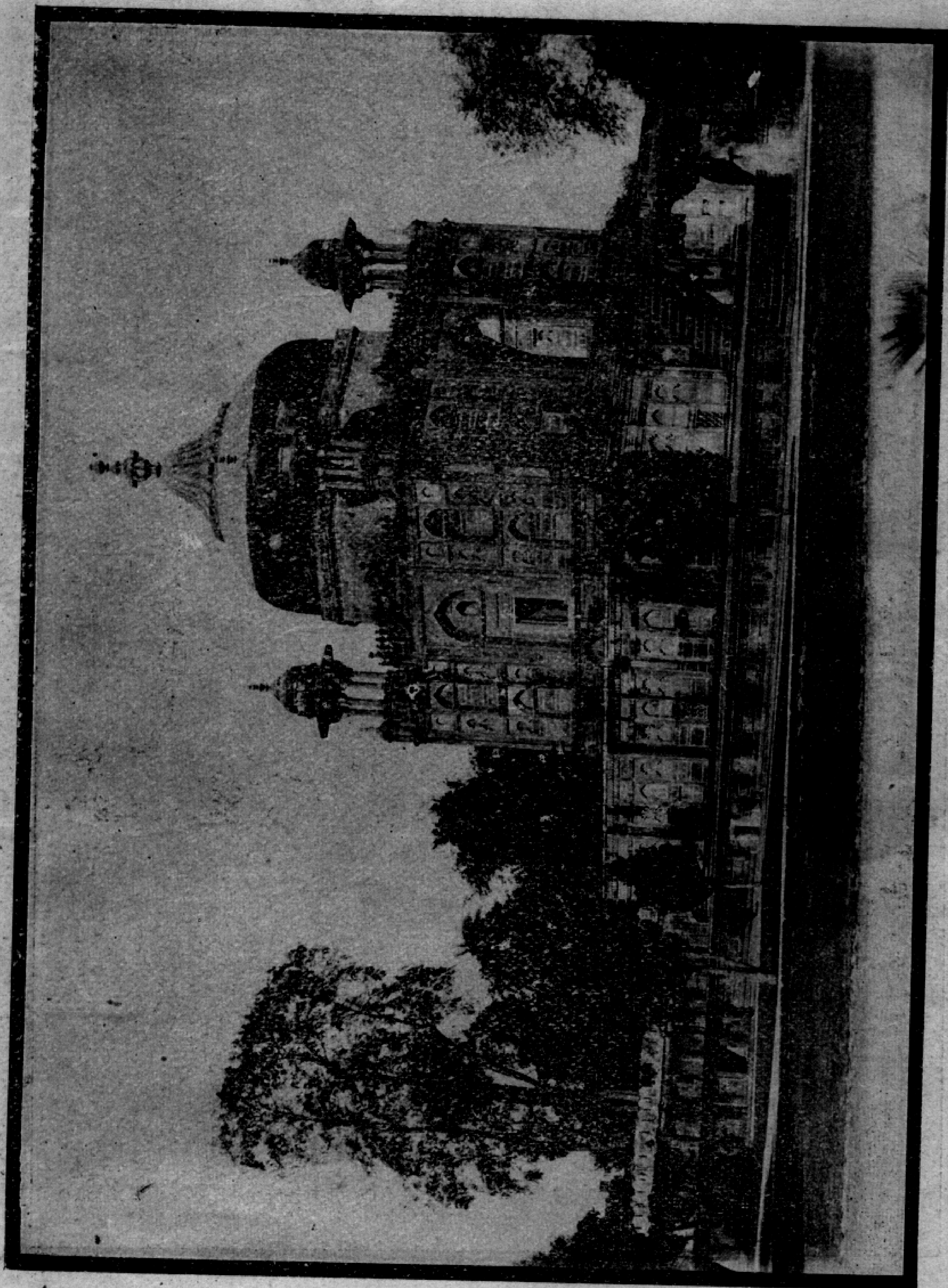


খসরুবাগের দ্বিতীয় গেট

না, অঙ্গে ব্যথা লাগিত, আর এখন কত মণ পাষাণ ভারের নীচে স্বচ্ছন্দে শুইয়া আছেন।"

খসরুর সমাধি প্রস্তরের উপর কতকগুলি ফুল ছড়ান দেখিলাম। শুনিলাম মুসলমানেরা অনেকে অনেক কামনা করিয়া খসরু ও তাঁহার

পুত্রদ্বয়কে পূজা করিয়া যায়,—বিনা অপরাধে হত হওয়ায় তাঁহারা "সহিদ" অর্থাৎ পীর বলিয়া গণ্য। এক লাইনের এই তিনটি সমাধি মন্দির ছাড়া খসরুবাগে আরও সমাধিমন্দির আছে। সমাধিস্থল দেখিলে মনে কি যে একটা ঔদাস্যময় কষ্টের ভাব, কিছুই কিছু নয় এইরূপ

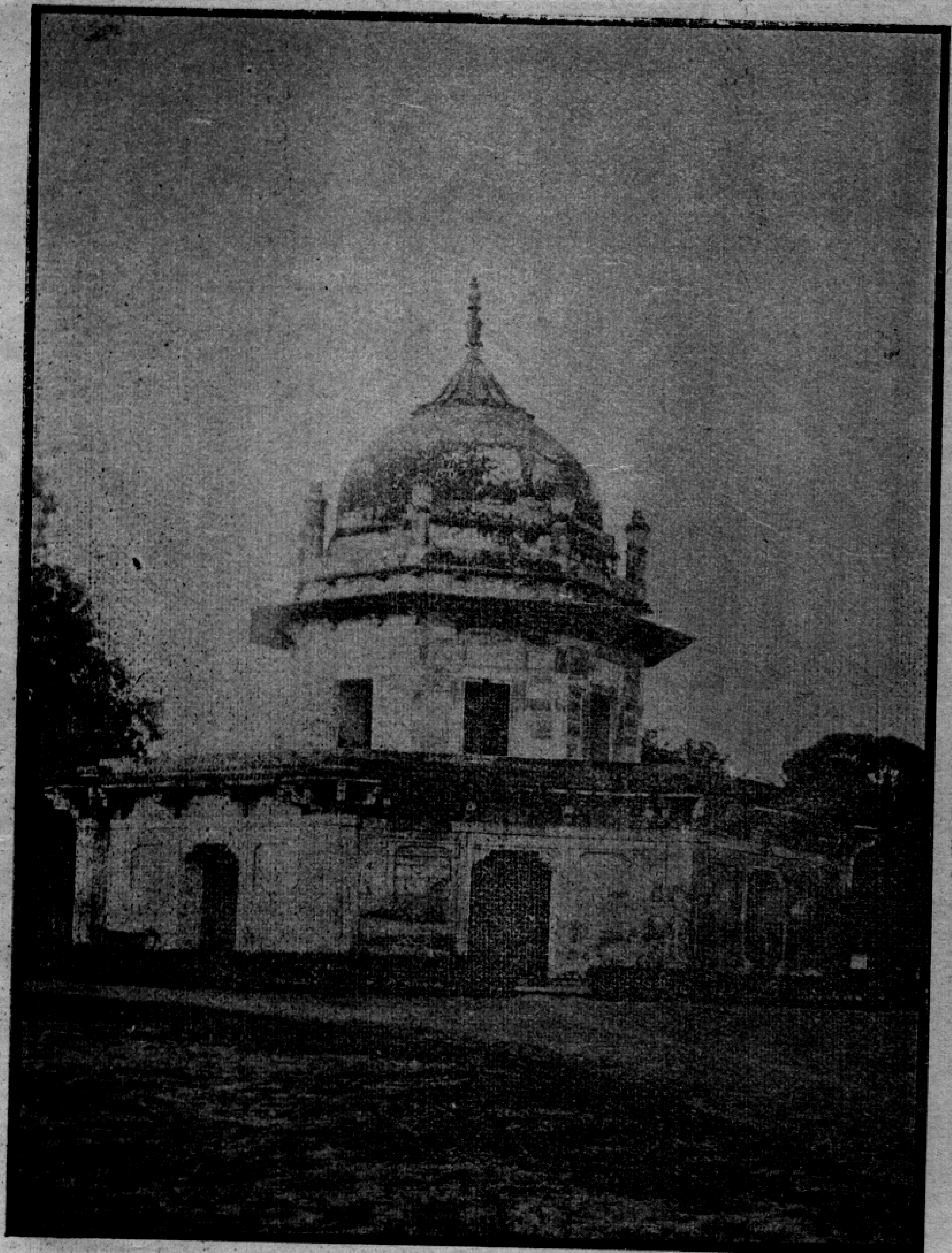


খসরুর কবর

একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়া পড়ে সে ভাব মন হইতে সহজে তাড়ান যায় না। অথচ এই কষ্টেরও এমন একটা আকর্ষণ আছে যে,—সমাধি ক্ষেত্রে আসিলে আর ফিরিতেও মন

চাহে না।—কে জানে মৃত্যুর মধ্যে কি মায়া নিহিত—মৃত্যুকে সকলে দূরে রাখিতে চায়, মৃত কেহ দেখিতে চাহে না—তবু শব দেখিলে তাহার দিকে না চাহিয়াও কেহ থাকিতে পারে না।

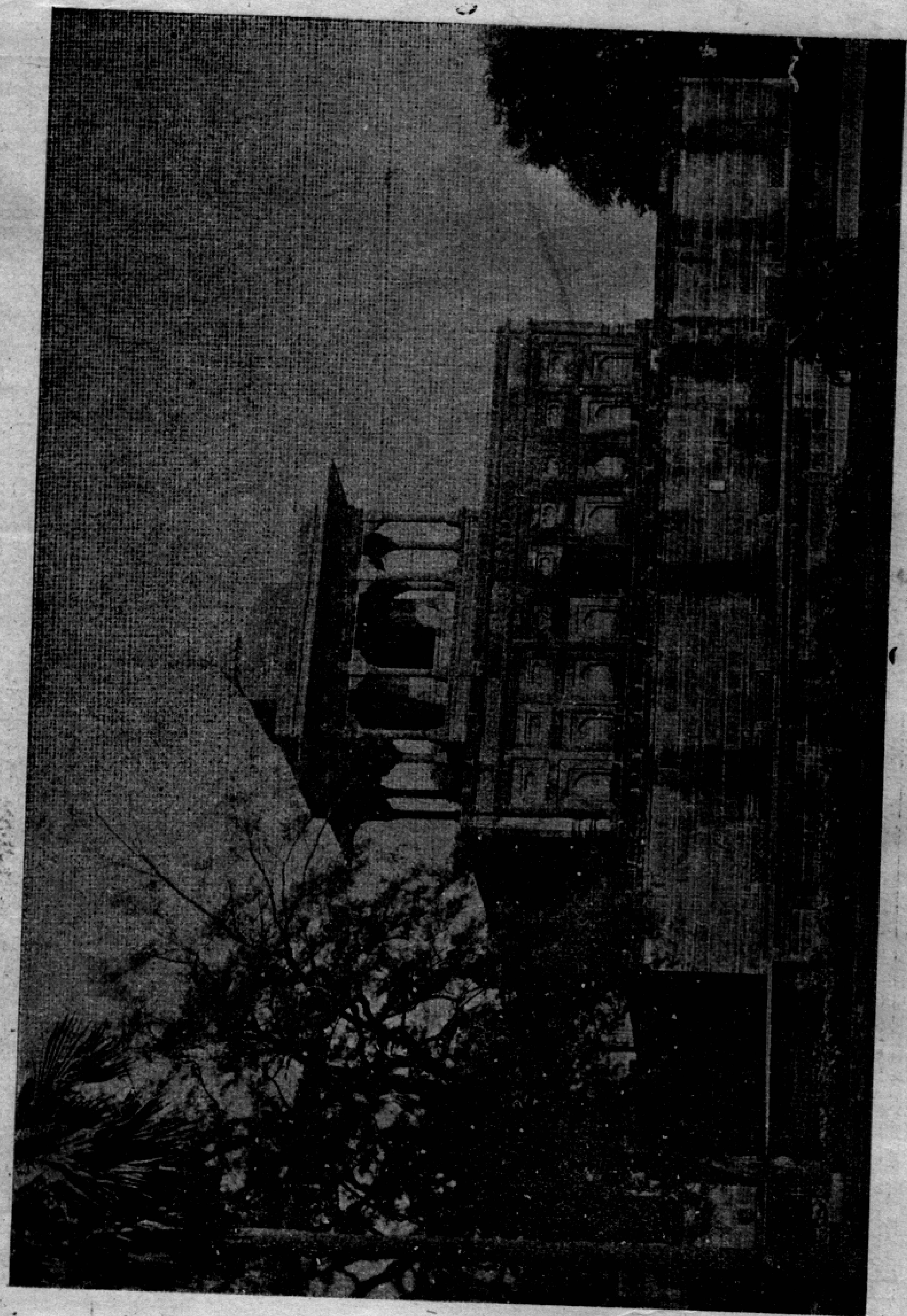
আমরা একদিন প্রয়াগের গোরস্থান



খসরুর মাতার কবর

দেখিতে গিয়াছিলাম। কত সাধের স্ত্রী মরিয়াছে, স্বামী সেই মৃতদেহের উপর উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কত স্ত্রী কত স্বামীর গোরের উপর অশ্রুমাখা কাতরোক্তি

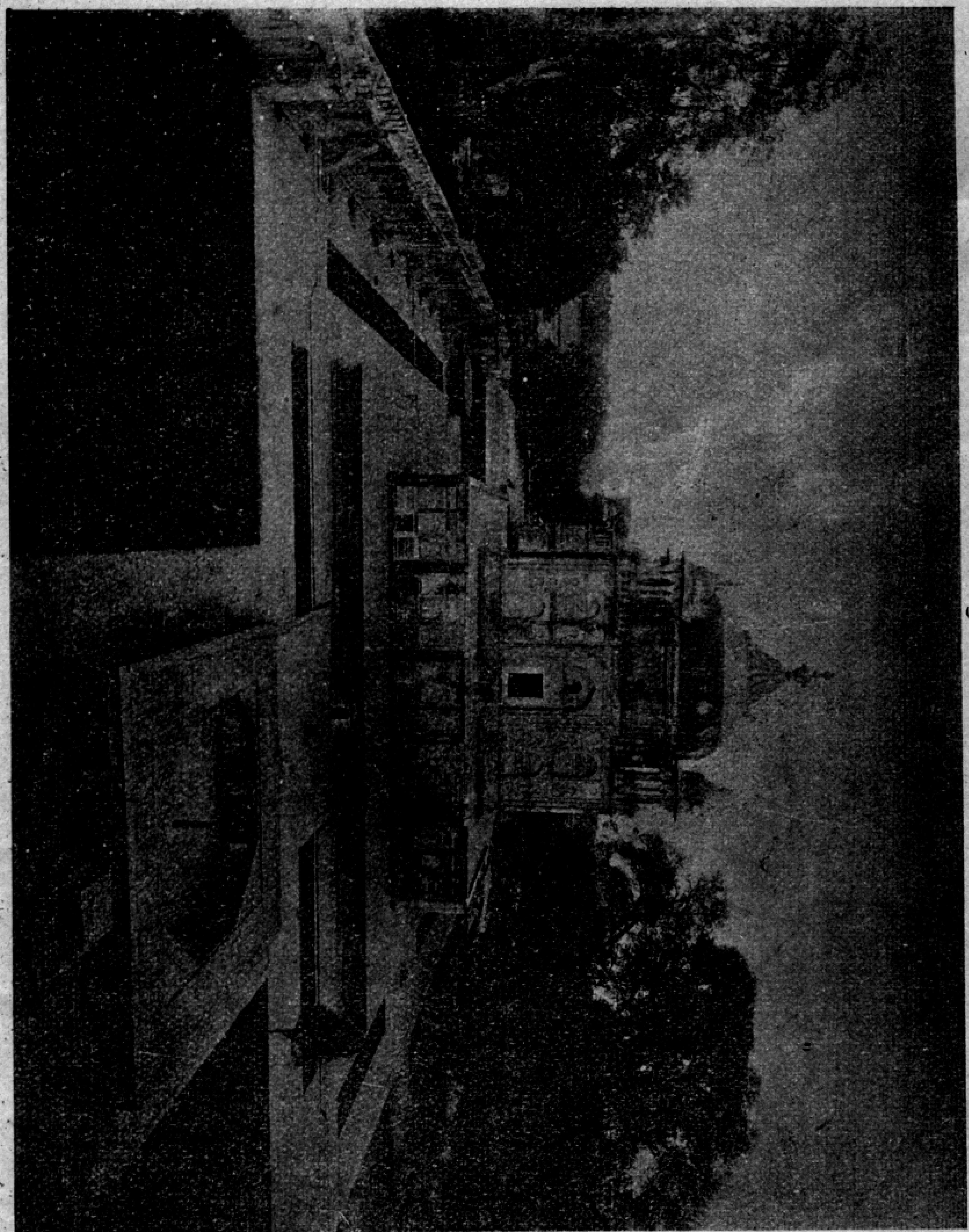
লিখিয়াছেন। একজন ধনীর একটি মাত্র পুত্র একুশ বৎসর বয়সে ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছে, একজন একে একে চারিটি পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে এইখানে শুয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সংসারে বুঝি আর তাঁহার আপন বলিতে কেহ নাই! কত পিতামাতা, পুত্র



শূন্য কবর

কন্যা, স্বামীস্ত্রী, ভাইভগিনী অশ্রুজল ও হৃদয়বেদনা মাখাইয়া প্রিয় মৃতের সমাধি-শয্যার উপর ফুলশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে শুইয়া আছে তাহার কাছে মাটীশয্যা ও ফুলশয্যা দুইই সমান। এ যে স্থল—এখানে স্নেহ প্রেম অশ্রু বেদনা কিছুই

পৌঁছে না। সমাধি ক্ষেত্রে আসিলে স্নেহ প্রেমের, অশ্রুবেদনার এই উপেক্ষা দেখিয়া মর্ম্ম বিদ্ধ হয়, সংসারের অনিত্যতা প্রাণের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে, অহঙ্কার ভুলাইয়া দেয়, ক্রমে সেই কষ্টের মধ্যে একটা পবিত্র প্রশান্তভাব অন্তঃশিলা বহিতে আরম্ভ করিয়া



খসরুবাগের অন্তর্গত আর একটী কবর

সেই কষ্টকেও এমন উপভোগ্য করিয়া তোলে যে, সমাধি ক্ষেত্র হইতে তখন আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না—তাহার মধ্যে একটি সত্য মঙ্গল-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

চয়ন

ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীসীয় প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মঃ উইন্‌ডিস্, মৃচ্ছকটিক এই নামটিতেই গ্রীক্ প্রভাবের আর একটি নিদর্শন পাইয়াছেন ; ক্ষুদ্র শকট বা "শকটিকের" সহিত গ্রীক্ নাট্যোল্লিখিত "ক্ষুদ্র পাকপাত্রের" (Aulularia), ক্ষুদ্র "রত্ন-ভাণ্ডের" (Cestellaria) যেন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে......অবশ্য এই সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই সাদৃশ্য হইতে অনুকরণের অনুমানটি স্থাপিত হইতে পারে না। নাটকের নাম নির্ব্বাচন নাট্যশাস্ত্রের নিয়মাধীন ; নাটকের জাতিভেদে নাটকের নিয়মেরও পরিবর্ত্তন হয়। "প্রকরণ"-জাতীয় নাটকে, নায়ক ও নায়িকার নামে নাটকের নাম প্রদত্ত হয়। কিন্তু মৃচ্ছকটিক একটি মিশ্র ধরণের নাটক ; এই জাতীয় নাটকের একটিমাত্র নমুনা এপর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহিত্যদর্শন আর একটি নাটকের উল্লেখ করেন, তাহার নাম "বধ্যশিলা" ;—শুধু নাম ধরিয়া বিচার করিতে হইলে, উহা মৃচ্ছকটিকের সহিত একশ্রেণীভুক্ত। অবশ্য "সংকীর্ণ প্রকরণ"গুলির নাম নাট্য-সরঞ্জামের কোন এক বিশেষ সামগ্রী হইতে গৃহীত হইয়া থাকে।

মঃ উইণ্ডিস্, মৃচ্ছকটিকের গল্পটিতে গ্রীক-আদর্শের এইরূপ একটা আভাস পাইয়াছেন :—রাজনৈতিক আখ্যানবস্তু ও গার্হস্থ্য-আখ্যানবস্তু এই দুয়ের সংমিশ্রণই "নব-কমেডির" প্রচলিত রীতি। "Epidicus"এর ঘটনাগুলি থীব-নগরসংক্রান্ত কোন এক যুদ্ধে সংঘটিত হয়। এটোলীয় ও এলীয়দিগের মধ্যে যুদ্ধই "Captif" নাটকের "পশ্চাৎ-ভূমি"। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বিচারের দৃশ্যটা গ্রীক্-ভাবে অনুপ্রাণিত ;—যদিও Menander ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ কার্য্যতঃ ইহার প্রয়োগ করেন নাই। Cestellaria নাটকে, Alcesimarque ও Seleniumএর পরস্পরের সহিত যেরূপ Bacchusএর উৎসবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইরূপ কামদেবের মন্দিরে বসন্তসেনার সহিত চারুদত্তের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রকৃত জন্মবিবরণ প্রকাশ পাইলে, গ্রীক্ নাটকে যেরূপ দশাবিপর্য্যয়সূচক শেষ-পরিণামে নায়িকা স্বকীয় স্বাধীনতা লাভ করে, ইহারই অনুরূপ মৃচ্ছকটিকায়, বসন্তসেনা নরভূপতিকর্তৃক "বধূ"-পদ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ গ্রীক প্রণয়ী, স্বকীয় প্রণয়িনীর অভিভাবকের প্রার্থিত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করে, শর্বিলক সেইরূপ মদনিকার মুক্তিপণ সংগ্রহ করিবার জন্য চৌর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বসন্তসেনা তাহার দাসীকে যে মুক্তি দান করে, গ্রীক্-রোমিও কমেডি ইহার মধ্যে, স্বকীয় "Libertina"র পরিচয় প্রাপ্ত হয়।

এই সকল সাদৃশ্যের প্রাচুর্য্য, সাদৃশ্যের দুর্ব্বলতাকে পূরণ করে না, বরং আরো বাড়াইয়া তুলে। অপ্রধান খুঁটিনাটির সম্বন্ধেই এই সকল সাদৃশ্য ; এই সকল সাদৃশ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে ...

পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ নাই; আসলে ভারতীয় নাটকের মূলভিত্তি ও নাট্য কার্য্যের ধরণটা অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত রহিয়াছে! ফুলের নক্সায় আচ্ছন্ন হইলেও কাপড়টা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

যদি ভারত বাস্তবপক্ষেও গ্রীসের নিকট হইতে উপাখ্যান, ও ঘটনাবলী ধার করিয়া থাকে, তথাপি মূল-আখ্যানের মৌলিকতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; এবং কেন হয় নাই ইহারও একটা হেতু নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এস্থলেও গ্রীসীয় প্রভাব সমর্থিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলীর সহিত রাষ্ট্রিক ঘটনাবলীর কখন কখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, বিচারালয়ে কখন কখন ভুল বিচার হইয়া থাকে, ধর্ম্মোৎসবের সময় কখন কখন নায়কনায়িকার মধ্যে প্রেম-সঞ্চারের সুযোগ হয়, দুর্ব্বল ও অসৎপ্রকৃতির লোকেরা উদ্দাম প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে, এবং অর্থের দ্বারা অনেক সময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করা যায়—এই সব কথা জানিবার জন্য গ্রীসীয় আদর্শ অনুশীলন করা ভারতের প্রয়োজন হয় নাই। ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলনের দ্বারা এই সকল তথ্যের ভারতীয় লক্ষণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। উহাদিগকে বিচ্ছিন্নভাবে, অসংলগ্নভাবে দেখিলে সহসা অনুকরণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সংযুক্তভাবে ও সংলগ্নভাবে বিচার করিলে উহাদের উৎপত্তি ভারতীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বসন্তসেনা বেশ্যা-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং বর্ণভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উহাকে চারুদত্ত হইতে চিরকালের জন্য পৃথক করিয়া রাখি-য়াছে। হৃদয়ের সম্বন্ধসূত্রে বসন্তসেনার উপর চারুদত্তের অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু আইন অনুসারে তাহার উপর প্রথমাগত নায়কেরই অধিকার। এই কঠোর দারুণ সত্যটি শকার বসন্তসেনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়;—বসন্তসেনা যদি তাহার ব্যবসায়ের কর্ত্তব্য অবহেলা করে, রাজবিধি ঐ কর্ত্তব্য পালন করিতে তাহাকে বাধ্য করিবে। তাছাড়া, যাহা রাজবিধি অপেক্ষাও উচ্চতর, সেই রাজানুগ্রহ একজন বেশ্যাকেও কুলবধূ-পদে অভিষিক্ত করিতে পারে। তাই নাটকীয় শেষ-পরিণামের উদ্দেশ্যে আর্য্যকের অবতারণা অপরিহার্য্য। একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যতীত বসন্তসেনার সহিত চারুদত্তের মিলন-ঘটনা অসম্ভব। তাই শূদ্রকের রচিত গল্পের মধ্যে দুইটি আখ্যানবস্তুর একত্র সম্মিলন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এই দুই নাট্য-পদ্ধতির মধ্যে, নাটকীয় কার্য্যের স্থায়িত্বসম্বন্ধেও বিলক্ষণ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীক্ নাট্য-সাহিত্যে কাল-সীমা সাধারণতঃ একদিন। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে এক এক অঙ্ক ধরিয়া কালের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এক-অঙ্কপরিমিত কার্য্য এক-দিনের বেশী স্থায়ী হওয়া উচিত নহে। এসম্বন্ধে অ্যারিষ্টলের ও ভরতের নিয়ম এক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

অতএব ভারতীয় অঙ্ক-বিভাগ-পদ্ধতি গ্রীক্ ট্র্যাজেডি বা কমেডি হইতে গৃহীত হয় নাই। ইহা ভারতীয় উন্নতির ক্রমবিকাশ হইতে স্বতঃ উৎপন্ন—ইহা ভারতের স্বাভাবিক ক্রমাভিব্যক্তির শেষ-পরিণাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিব্বতের স্ত্রীপুরুষ

স্ত্রীর পুরুষান্তর গ্রহণ কিম্বা একাদিক্রমে ৫।৭ টী পতিগ্রহণের ঘৃণ্য প্রথা তিব্বতবাসী-দিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। তিন প্রকারে স্ত্রীলোকেরা একাধিক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকে, যথা—এক পরিবারে একান্নভুক্ত কতিপয় ভ্রাতা মিলিয়া কোন একটী মহিলার পাণিগ্রহণ করে,—বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর অনুমতি গ্রহণানন্তর বহুপুরুষের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারে,—কোন সপুত্রক পুরুষের গৃহশূন্য হইলে পিতা কিংবা পুত্র উভয়েই কোন একটি স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ গর্হিত নিয়ম অন্য কোন সভ্য বা অসভ্য দেশে আছে বলিয়া মনে হয় না।

কোন সংসারে কেবল মাত্র পিতা অথবা পুত্র বিবাহ করিলেই পরিবারস্থ অন্যান্য সকল পুরুষের পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল; অর্থাৎ তিব্বতবাসীদিগের নিয়মানুসারে সেই স্ত্রীতে পরিবারস্থ সকল পুরুষগণই পুত্রকন্যাদি উৎপাদন করিতে পারে ও করিয়া থাকে। পিতা পুত্র একই স্ত্রীতে আসক্ত এইরূপ জঘন্য পাপপ্রথা স্মরণ করিলেও চিত্ত কলুষিত হয়! তাহারা কেবল মাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মিলনকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর ক্ষমতা বা অধিকার এত অধিক যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বামী স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থের এক কপর্দ্দকও নিজের নিকট রাখিতে পারে না। সমস্তই তাহাকে প্রিয়তমার চরণপ্রান্তে অর্পণ করিতে হয়। এমন কি অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্বামী অধিক অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইলে স্বল্পার্থ উপার্জ্জনকারী স্বামী বেচারার আর রক্ষা থাকে না। তাহাকে প্রায়ই স্ত্রীর কোমল হস্তের প্রহার ভোগ করিতে হয়। স্বামীর অর্থের প্রয়োজন হইলে নিতান্ত অসহায় বালকের ন্যায় অতি সন্তর্পণে স্ত্রীর নিকট করজোড়ে মিনতি করিয়া তাহা চাহিয়া লইতে হয় এবং কি কি বাবদ কত অর্থের দরকার তাহার সন্তোষজনক বিস্তৃত কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে হয়। কখনকখনও বা স্ত্রীর তিরস্কার নতশিরে বহন করিয়াই রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কোন পুরুষ উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ গোপন করিয়া রাখিয়াছে যদি কোন কারণে তাহার স্ত্রীর মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হয় তবে সেই স্ত্রী তৎক্ষণাৎ রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে স্বামীর গণ্ডদ্বয় চপেটাঘাতে প্রস্ফুটিত দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় রাঙ্গাইয়া দেয়। মোট কথা, স্বামীকে স্ত্রীর পদপ্রান্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়। কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে স্ত্রী স্বামীকে বাজারে অথবা কোন দোকানে যাইতে আদেশ করে এবং স্বামীও নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আদেশ পালন করিয়া স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখে। কখনকখনও কতিপয় পুরুষের মধ্যে কোনও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে অথবা কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাদের মতামত অনুসারে সেই বিষয়ের মীমাংসা করে।

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ বিবাহের চুক্তি ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। তিব্বতে স্ত্রীপুরুষেরা সাধারণতঃ বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করে। তবে কোনকোনও স্থানে পুরুষ ইহারও অপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে। কোন পরিবারে পাঁচভ্রাতা মিলিয়া কোন একটী স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিলে সন্তানগণ তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতা বলিয়া ডাকে এবং অপর চারিজনকে কাকা বলে।

স্ত্রীলোকেরা প্রথম বিবাহে নিজের ইচ্ছানুসারে পুরুষ গ্রহণ করিতে পারে না। এ সময় পিতামাতা যেরূপ বর ঠিক করেন কন্যার তাহাকেই বরণ করিতে হয়। এমন কি বিবাহের প্রস্তাব যে চলিতেছে এরূপ আভাসও কন্যাকে প্রদান করা হয় না, কন্যা কেবল মাত্র বিবাহের দিন জানিতে পারে যে, আজ তাহার বিবাহ। সুতরাং এইরূপ অদ্ভুত বিবাহের পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে অর্থাৎ বিবাহ হইতে না হইতেই প্রায় কন্যা চুক্তিভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং ইচ্ছানুরূপ পুরুষগণের অঙ্কশায়িনী হয়। কখনকখনও কন্যা পিতামাতার অনুমতি গ্রহণান্তর মনোমত পুরুষে আত্মসমর্পণ করে বটে কিন্তু এরূপ বিবাহ অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুত্রগণ বিবাহের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে পিতা ধনে, মানে, কুলে সমতুল্য কন্যার সন্ধান করেন। সন্ধান মিলিলে একজন ঘটক বহুবার কন্যার পিতার নিকট যাতায়াত করে এবং বরের গুণকীর্ত্তন করিয়া কন্যাপক্ষের মত গ্রহণ করে। সম্বন্ধ এক প্রকার ঠিক হইয়া গেলে কন্যার পিতা পুরোহিতের নিকট কিংবা কোন ভবিষ্যৎবক্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বরকন্যার ভাবী জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে এবং তদনুসারে ঘটকের নিকট শেষ মন্তব্য জ্ঞাপনকরতঃ স্বীয় কন্যাকে বরের হস্তে সম্প্রদান করে।

বর ও কন্যা উভয় পক্ষ আপন আপন পুত্রকন্যার নিকট তাহাদের বিবাহের প্রস্তাব অতি গোপনে রাখে। পাত্র দেখা হইয়া গেলেও বরকন্যা তাহাদের বিবাহের বিষয় বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহারা যখন বিবাহ বাসরে উপস্থিত হয় তখনও তাহারা কোথায় আসিয়াছে বা কিজন্য আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে না। কিম্বা বর ও কন্যা কেহই কাহারও নামধাম জানিতে পারে না। কেবল মাত্র বিবাহের শুভ মুহূর্ত্তেই তাহাদের উভয়কে মুখোমুখী করিয়া দাঁড় করান হয়।

তাহাদের মধ্যে যৌতুক প্রদানের ব্যবস্থা নাই। কেবল মাত্র কন্যার পিতা সাংসারিক কার্য্যে যে যে বস্তু নিত্য প্রয়োজনীয় কন্যার সহিত তাহাই দিয়া থাকেন। নচেৎ তাঁহার বংশগৌরবের হানি হয় এবং লোকচক্ষে তাঁহাকে ঘৃণিত হইতে হয়। বরের পিতা কিঞ্চিদর্থ কন্যার মাতাকে প্রদান করে, ইহাকে 'দুগ্ধমূল্য' কহে, অর্থাৎ ক'নের মাতা যে এতদিন কন্যাকে লালন পালন করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে পারিশ্রমিক

দিন বরকন্যার পিতামাতা পুনরায় কোন গণকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মতানুসারে পরিণয় কার্য্য সম্পন্নোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে এবং তাহাদের ভাবী-জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিবাহের দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কন্যার পিতামাতা কন্যাকে বলে, "আজ বড়ই শুভদিন, আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, (আকাশ পরিষ্কার না থাকিলেও এই কথা বলা হয়) কোন প্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাকের আশঙ্কা নাই, চল আজ আমরা মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসি। আজ আমাদের 'লিঙ্‌কা' উৎসব; সুতরাং তুমি ভালরূপ বেশ বিন্যাস করিয়া আমাদের সহিত চল।" তাহা শুনিয়া কন্যা উল্লাসের সহিত বেশ বিন্যাস করিয়া পিতামাতার সহিত মন্দিরে যায়। কখনকখনও কোন সুচতুরা বালিকা এই সকল অত্যধিক আড়ম্বর দেখিয়া পিতামাতার ছলচাতুরী বুঝিতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত বিপদাশঙ্কায় অবিরাম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকে। যে বালিকা এই সকল ছলচাতুরী বুঝিতে পারে না সে পিতামাতার আদেশমত আনন্দের সহিত হস্তপদাদি প্রক্ষালন করে এবং তাহার অঙ্গমার্জ্জনেরও বিশেষরকম ধূম পড়িয়া যায়! এইস্থানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিব্বতবাসিগণ সাধারণতঃ অঙ্গে জলস্পর্শ করায় না, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি তাহারা প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মুখে একটুখানি জল দেন। তাঁহাদের এই মুখ ধোওয়া ব্যাপারটাও নিতান্ত ঘৃণাজনক একটা কাণ্ড! পদস্থ ব্যক্তিগণের প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাদের একজন অনুচর একটী ক্ষুদ্র পাত্রে একটু গরম জল লইয়া আসে। তখন তিনি সেই উষ্ণ জলটুকু মুখগহ্বরে ফেলিয়া দেন এবং কিছুক্ষণ পরে মুখের সেই জল একটু একটু করিয়া পুনরায় হাতে রাখিয়া তদ্দারা মুখখানা ধুইয়া ফেলেন; অর্থাৎ সেই জলটুকু মুখমণ্ডলে তৈলের ন্যায় মাখাইতে থাকেন। যখন মুখের জল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় তখন কয়েকবার হাতের তালুতে থুতু ফেলিয়া সেই সংগৃহীত থুতুতে পুনরায় মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করেন। সুখের বিষয় আজকাল তিব্বতবাসী অল্পস্বল্প পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছে।

বিবাহের দিবস গোপনে ঘটক বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যার নিমিত্ত চিরুণী, মাথার কাঁটা ও অন্যান্য ২।৪টী সৌখীন দ্রব্য গোপনে কন্যার পিতার নিকট রাখিয়া যায়। পিতামাতার আদেশে মন্দিরে উৎসব উপভোগের আশায় উৎফুল্ল হইয়া কন্যা যখন অঙ্গসৌষ্ঠব কার্য্যে ব্যস্ত থাকে তখন তাহার পিতামাতা বরপক্ষের প্রদত্ত সেই চিরুণী কাঁটা ইত্যাদি কন্যার নিকট উপস্থিত করিয়া বলে, "এস, খুকী! তোমার চিরুণীখানা ভেঙ্গে গিয়েছে—মাথার কাঁটাও পুরাণ হ'য়ে গিয়েছে---এই নাও তোমার জন্য আজ সব নূতন জিনিষ এনেছি! মাথায় এই ভাল তৈল দিও, আর যত ভাল ক'রে পোষাক পর্ত্তে পার তাতে কোন ত্রুটি ক'রোনা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু চতুরা কন্যা পিতামাতার এইরূপ কৌশল বুঝিয়া পোষাকাদি পরিতে নিতান্ত

অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকে। তখন তাহার সখিগণ যথাসম্ভব তাহাকে উৎসাহিত করিয়া পোষাক পরিচ্ছদাদি পরাইয়া বিবাহ স্থানে লইয়া যায়।

সকল প্রকার আয়োজন শেষ হইলে পিতামাতা তাহাদের কন্যার জন্য নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেন। এই আমোদ প্রমোদ তাঁহাদের অবস্থানুযায়ী কোন স্থানে এক সপ্তাহ কোন স্থানে দুই সপ্তাহ কোন স্থানে বা তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। অবস্থা অতিশয় অসচ্ছল হইলেও ঐ আমোদ প্রমোদ অন্ততঃ ২।৩ দিবসকাল স্থায়ী হয়। এইরূপ উৎসবের সময় কন্যার পিতৃগৃহ তাহার আত্মীয়স্বজনে ভরিয়া যায়। এবং তাহারা প্রত্যেকেই আত্মীয়তার নৈকট্যানুসারে যথাশক্তি টাকাকড়ি, খাদ্যদ্রব্যাদি অথবা পোষাক পরিচ্ছদাদি কন্যাকে উপহার প্রদান করে। কন্যাগৃহে উৎসবের শেষভাগে বরের পিতামাতা কন্যার অভ্যর্থনার জন্য আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কোনও একটি লোককে কতিপয় অনুচরবর্গের সহিত কন্যার পিতার বাড়ীতে প্রেরণ করেন। এইরূপে বিবাহকার্য্য শেষ হয়।

সুখের বিষয়, এখন সভ্যতার আলোক তিব্বতের দুর্ভেদ্য অন্তরতম গুহাপ্রদেশেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহার সংস্পর্শে শীঘ্রই যে তিব্বতের উল্লিখিত ঘৃণ্য সামাজিক প্রথাসকল অতীত অন্ধকার রাজ্যে দূরীভূত হইবে, ইহার মধ্যেই তাহার লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভিন্ন গ্রহে জীব-চিহ্ন *

মানমন্দির দর্শনার্থী ব্যক্তি মাত্রেই প্রায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে সচরাচর এই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—চন্দ্রে মানুষ আছে কি না? অন্যান্য প্রশ্ন অপেক্ষা ইহা বহুতর বার পৃষ্ট হইলেও এবং কেহ রহস্যচ্ছলে এবং কেহ বা তথ্যাভিলাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেও ইহা বাস্তবিকই একটি গভীর প্রশ্ন। অন্তরীক্ষবিহারী গ্রহ উপগ্রহাদি সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহাদের মনে একথা স্বতঃই উদিত হয় যে, লোকান্তরেও আমাদের ন্যায় জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে কি না? সূর্য্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহাদি আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের সকলের বক্ষেই কি সচেতন প্রাণীরা বিচরণ করে? সেই সকল জীব কি আমাদের ন্যায়? আমাদেরই ন্যায় কি তাহাদের জীবন যাত্রাপ্রণালী? তাহারাও কি হলকর্ষণ, বীজবপন এবং শস্যকর্ত্তন করে—আমাদেরই ন্যায় ক্রয় বিক্রয় এবং লাভালাভ গণনা করে? তাহাদের জগতেও কি পণ্ডিতেরা অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ হস্তে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যজাল ছিন্ন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট রহিয়াছেন?

* Astronomical Society of the Pacific নামক বিজ্ঞান-সভায় Mr. H. C. Wilson কর্ত্তৃক পঠিত।

তাঁহারা কি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে চাহিয়া থাকেন এবং আমরাও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানী কি না ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন? অথবা, এই অসীম বিশ্বজগতে যে কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে নিজের প্রতিচ্ছবি অনুযায়ী মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টা কি কেবল আমাদের বসুন্ধরাকেই গৌরবান্বিতা করিয়াছেন?

আপনারা বলিবেন যে এই সকল রহস্যের উদ্ঘাটন প্রয়াস নিরর্থক; ইহাদের নিঃসন্দিগ্ধ সমাধান কোনও কালে সম্ভব নহে। সত্য; কিন্তু তবুও এ সকল বিষয় জানিতে আমাদের স্বতঃই বাসনা হয়, এবং সাধ্যপক্ষে জ্যোতি-র্বেত্তার এ বিষয়ে আলোকপাত করা উচিত। সম্প্রতি পর্যাবেক্ষণ ফলে পৃথিবীর পরি-বেষ্টনের সহিত মঙ্গল গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থার সাদৃশ্য বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং আন্তর্গ্রহিক সংবাদ বিনি-ময়ের উপায় উদ্ভাবন বিষয়েও প্রস্তাব চলি-তেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পত্র মুখে প্রচারিত হয় যে, জনৈক জ্যোতির্ব্বেত্তা মঙ্গল গ্রহে কতকগুলি বিচিত্র আলোক লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ রশ্মিমালার পরিস্ফুরণ প্রণালী তাঁহার নিকট কতিপয় বিশিষ্ট সাঙ্কে-তিক চিহ্ন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অর্থাৎ, আমাদের সৈন্য বিভাগে প্রচলিত সঙ্কেত-রীতির অনুসরণে মঙ্গলগ্রহবাসী জীবেরা আমাদের এই পৃথিবীর অথবা গ্রহান্তরের অধিবাসীবৃন্দের নিকট সংবাদ প্রেরণের প্রয়াস পাইতেছেন। এ জনরবের মূলে কোন সত্য ছিল না। কিন্তু তথাপি এতদ্বিষয়ক কল্পনা কতক কৌতুকচ্ছলে এবং কতক বা সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে; এবং ধরাপৃষ্ঠে এক সুবৃহৎ ত্রিভুজের প্রান্তত্রয়স্থ তাড়িতকোষ হইতে আলোকপ্রবাহ ক্ষেপণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহে সংবাদ প্রতিপ্রেরণের ব্যবস্থার নানারূপ প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রস্তাবের মধুর কল্পনায় একজন মহিলা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যুকালে ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানসভায় (Institute de France) এতদ্বিষয়ক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ২৫০০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ১৪,৮৪৪ টাকা) দান করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে কোন ফল লাভ হইবার আশা নাই; এবং আমি ইহা মনে করি না যে এ বিষয়ের পরীক্ষা কোন দিন গৃহীত হইবে। কিন্তু, তদ্সত্ত্বেও এ সকল বিষয়ের কল্পনা বাস্তবিকই মোহকরী এবং ইহা অবলম্বন করিয়া একখানি লোকপ্রিয় নভেল রচিত হইতে পারে।

বিভিন্ন গ্রহগুলি বাস্তবিকই জীবসমন্বিত কি না অবরোহযুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ঐ বিশ্বাসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন মতামত প্রকাশের অবসর আমার নাই।

ঐরূপ মতামতের পরিপোষক যুক্তিমালার অবতারণা খুবই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি আমার বক্তব্য কেবল দূরবীক্ষণ ও আলোকবিশ্লেষণকারী যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত তথ্য সমূহের ভিতরেই নিবদ্ধ রাখিব। গ্রহগণের প্রাকৃতির অবস্থা এবং তন্নিবন্ধন তাহাদের বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাই আমার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হইবে। আমি "বাসযোগ্যতা" বলিলাম

কেননা, আমার এরূপ মনে হয় না যে, আমরা কখনও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে পারব যে এই গ্রহটি প্রকৃত পক্ষেই জীববিশেষ দ্বারা অধ্যুষিত। দূরবীক্ষণ যতই ক্ষমতাশালী হউক না কেন, ইহা কখনই আমাদিগকে স্বচক্ষে লোকান্তরের অধিবাসীদিগকে দেখিতে সক্ষম করিবে না। আমরা যে সৃষ্টিকৌশলে দূরবীক্ষণের আকারবর্দ্ধিণী শক্তির শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তাহা নহে; কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ যে সুগভীর বায়ুসমুদ্রের মধ্য দিয়া আমাদিগকে গ্রহাদি লক্ষ্য করিতে হয় তাহার সতত প্রবহমান তরঙ্গরাজির আলোড়ন জনিত প্রক্রিয়া ফলে, গ্রহাগত রশ্মিমালা বক্রীভূত ও একত্র মিশ্রিত হইয়া দ্রষ্টব্য গ্রহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া তোলে। দূরবীক্ষণের ক্ষমতা আমরা যতই বর্দ্ধিত করি, দ্রষ্টব্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন ততই নৈরাশ্যজনক রূপে অসম্ভব হইয়া উঠে। কদাচিৎ আমাদের এই বায়ুসমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়, এবং কেবল সেই অতি বিরল সুযোগ উপলক্ষেই জ্যোতির্ব্বিৎ তাঁহার যন্ত্রের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিবার সুবিধা পান। গুড্‌সেল (Goodsell) মানমন্দিরে মাঝে মাঝে এইরূপ সুযোগ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া, ঐরূপ একটি সুযোগের কথা আমার বেশ মনে আছে। দর্শনার্থী অনেকগুলি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এবং মেঘও শীঘ্রই আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপি যে অল্প কয়েক মিনিট মাত্র আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহারই মধ্যে চন্দ্রস্থ বিরাট গহ্বররাজির মধ্যে কতকগুলির গভীর তলদেশস্থ অনেক অপূর্ব্বদৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য স্পষ্টতররূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র দৃশ্য যতই স্পষ্ট হউক না কেন, ইহারা এত স্পষ্ট নহে যে ইহাদের দ্বারা মনুষ্য, হস্তী বা এমন বিশেষ কোন গৃহ বা বৃক্ষের পৃথক সত্তা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমাদের ১৬ ইঞ্চি দূরবীক্ষণের সর্ব্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা চন্দ্রকে ১৫০ মাইলের মধ্যে আনিতে পারি; অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল যদি বস্তুতঃই আমাদের নিকট হইতে দেড় শত মাইল দূরে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে আমরা খালি চোখে যেরূপ দেখিতাম, এই যন্ত্র সাহায্যেও চন্দ্রের আয়তন সেইরূপ দেখি। নিস্তরঙ্গ বায়ুসমুদ্রে পর্ব্বতের উপর প্রকাণ্ড লিক্ দূরবীক্ষণ (Lick Telescope) অনুকূল অবস্থায় স্থাপন করিলে, চন্দ্রমণ্ডল বড় জোর ষাট মাইলের মধ্যে আসিতে পারে। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন এত দূর হইতে কিরূপ দেখা সম্ভব। যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সাদা চোখে কোন মানুষকে দেখিতে হইলে, তাহাকে দশ মাইলের মধ্যে থাকিতে হইবে। এমনও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, আমরা এরূপ শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিলাম যে তাহাতে চন্দ্রমণ্ডলকে দশ মাইলের মধ্যে আনা গেল, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল দর্শিবে না। কেননা, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের তুঙ্গতম শৃঙ্গেও যে বায়ু থাকিবে, তাহার ফলে ঐরূপ শক্তিশালী দূরবীক্ষণও ফলোপদায়ক হইবে না। অতএব চন্দ্রমণ্ডলে প্রাণী দেখিবার কোনই আশা নাই। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকট উপগ্রহেই যখন এইরূপ, তখন অন্যান্য গ্রহাদির সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

অতঃপর গ্রহণের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের জীবনধারণের উপযোগী কিনা এবিষয় অনুসন্ধান করিলে, আমরা প্রথমতঃ দেখি যে চন্দ্র উপগ্রহ একেবারে বায়ুশূন্য। অন্ততঃ পক্ষে, ইহা নিশ্চিত যে বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র সাহায্যে আমরা পৃথিবীর কোন স্থান যতদূর নির্বাত করিতে পারি, চন্দ্রমণ্ডলের বায়ুরাশি তদপেক্ষাও তরল। কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে চন্দ্র নক্ষত্ররাজির যে রশ্মিমালার মধ্য দিয়া গমন করে, চন্দ্রের কঠিন আবরণ দ্বারা প্রতিহত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তাহাদের লক্ষ্যগত কি প্রখরতাঘটিত কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। চন্দ্রমণ্ডল মেঘহীন, সুতরাং বারিহীন। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে বায়ু ও বারি চন্দ্রের কঠিন ত্বক্‌ দ্বারা শোষিত হইয়াছে। বায়ু ও বারি ব্যতিরেকে কোন লতাগুল্মাদি জন্মান সম্ভব নয়; আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত ভস্মরাশি ব্যতীত কোন মৃত্তিকাও ইহাতে নাই। চন্দ্রমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ যৎপরোনাস্তি বন্ধুর ও বিভগ্ন; অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতমালা, অগ্ন্যুৎপাত-জনিত ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র শৈলশ্রেণী, এবং গিরিস্রাব প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে বিরাট গহ্বর, মুখব্যাদানকারী বিবরসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; একএকটির বিস্তার সহস্র সহস্র গজ, গভীরতা অজ্ঞেয়! চন্দ্রমণ্ডলে শৈত্যের প্রচণ্ড প্রকোপ অনুমেয়। সূর্য্যরশ্মি চন্দ্রপৃষ্ঠে ভীষণভাবে আসিয়া পড়ে, আবার পরমুহূর্ত্তেই মহাকাশে বিকীর্ণ হইয়া যায়। যে বায়ু ও বাষ্পের ঘন আবরণ পৃথিবীতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত, প্রশমিত ও

আত্যন্তিক অভাব। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পরীক্ষার ফলে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রমণ্ডলের দীর্ঘতম দিবসের (যাহা আমাদের চতুর্দ্দশ দিবসের সমান) অবিচ্ছিন্ন সূর্য্যরশ্মি ও চন্দ্রের উত্তাপ পরিমাণ তাপমানযন্ত্রের দ্রবণাঙ্কের (freezing point) ঊর্দ্ধে তুলিতে পারে না। ঐ পরিমাণ দীর্ঘ রজনীর শৈত্যও সমভাবে ভীষণ। নিশ্চয়ই চন্দ্রমণ্ডল আমাদের ন্যায় জীবের বাসোপযোগী স্থান নহে।

আমার বোধ হয়, সূর্য্যগ্রহকে আমরা ধর্ত্তব্যের বাহিরে ফেলিতে পারি। কেবল উপরিভাগেই প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রি তাপ-সমন্বিত একটা প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড,—বাসপক্ষে নিশ্চয়ই আরামজনক স্থান নহে। কিন্তু তথাপি সার উইলিয়ম হর্শেলের (Sir William Herschel) ন্যায় সর্ব্বজনমান্য বিজ্ঞানাচার্য্যও এই মত পোষণ করিয়াছেন যে সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগে শীতল স্থান থাকিতে পারে। বহিঃস্থ প্রচণ্ড তাপ হইতে কোন বিচিত্র উপায়ে সংরক্ষিত এই অভ্যন্তরদেশে জীবন সম্ভব, এবং এমন কি আরামদায়কও হইতে পারে। কিন্তু কি প্রকারের আবরণ প্রতি বর্গফুটে ১০,০০০ অশ্ববলসমন্বিত উত্তাপের প্রচণ্ডবেগ হইতে রক্ষা করিয়া সূর্য্যাভ্যন্তর বাসোপযোগী করিতে সক্ষম, তাহা কেহই এখনও সন্তোষজনকরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

সূর্য্যকে ছাড়িয়া, প্রথমেই আমাদের বুধ গ্রহের (Murcury) উপর লক্ষ্য পড়ে।

সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা ছিল। ইহার কক্ষ সূর্য্যের এত সন্নিকট যে ইহার বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ অতি কষ্টে এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় নিষ্পন্ন হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কিন্তু শিয়াপেরিলি (Schiaparelli) ইটালীর নির্ম্মল আকাশে মধ্যন্দিন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বুধগ্রহের পৃষ্ঠদেশস্থ কতিপয় চিহ্নের অভিজ্ঞানে সক্ষম হন। ইহার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই গ্রহ যে সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সেই সময়ে ইহা স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর কেবল একবারমাত্র আবর্ত্তিত হয়; ফলে ইহার একদিক্ সততই সূর্য্যের অভিমুখে থাকে। সম্প্রতি অরিজোনার অন্তঃপাতী ফ্লাগষ্টাফ্ (Flagstaff) নগরে লাউয়েল (Lowell) সাহেবের পর্য্যবেক্ষণাবলী দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। এবং যদিও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এখনও ইহাতে একমত হন নাই, তথাপি ইহা একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিয়া গহীত হইলে, এই সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলিতে হইবে। কারণ, প্রকৃতই যদি বুধগ্রহ সূর্য্যের অভিমুখে নিরন্তর একই দিক্ স্থাপন করে, তবে এই গ্রহের একার্দ্ধে অনন্ত দিবস এবং অপরার্দ্ধে চিররাত্রি বিরাজমান। আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি যে, সূর্য্য যদি আকাশপথে দৈনন্দিন গতিরোধ করিয়া মধ্যগগনে স্থির হইয়া বসে, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবীর দশা কি হয়। দিন রাত্রির পর্য্যায়ের অভাবে একটি চিরস্থির মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড অবিশ্রান্ত

তাপপরিমাণ হ্রাসজনকরূপে বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলে। বুধগ্রহের সূর্য্যাভিমুখ প্রদেশের অবস্থা বুঝিতে হইলে, আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যাহ্নতপনের কিরণরাজির প্রখরতা নবগুণ বৰ্দ্ধিত করুন, তবেই ঐ গ্রহের একার্দ্ধে সৌরতেজের প্রভাব কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বুধগ্রহের অপরার্দ্ধের অবস্থা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত—তথায় কেবল অবিচ্ছিন্ন রজনী আর মহাকাশের ন্যায় অতিনিম্ন তাপ-পরিমাণ। এই উভয় মণ্ডলের সন্ধিস্থলে ৪৭ ডিগ্রি বিস্তৃত যে ভূভাগ থাকিবে, তাহাই কেবল এই গ্রহের অষ্টাশীতিদিবস-ব্যাপী সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে পর্য্যায়ক্রমে ছায়া ও আলোক উপভোগ করিবে। বুধগ্রহের আবর্ত্তনক্রিয়া সমভাবাপন্ন হইলেও, ইহার পরিভ্রমণগতি পরিবর্ত্তনশীল। এই হেতু ইহার প্রায় সম্পূর্ণ ডিম্বাকৃতি কক্ষে বুধগ্রহ যখন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তখন সূর্য্যও আকাশমার্গে স্থাণুবৎ বসিয়া না থাকিয়া, ৪৭ ডিগ্রি পরিমিত একটি বৃত্তাংশের মধ্য দিয়া আকাশমার্গে আপাত দৃষ্টিতে বিচরণ করে। ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত সন্ধিস্থলস্থ ভূভাগ পর্য্যায়ক্রমে ছায়া ও আলোকসমন্বিত হয়। আপনারা হয়ত আশা করিতেছেন যে, এই ছায়ালোকমণ্ডিত মণ্ডলের মধ্যভাগস্থ শীতোষ্ণতা আমাদের ন্যায় জীবের সহনীয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা খুবই সম্ভব যে বুধগ্রহ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বায়ু ও বারিহীন। আয়তনে পৃথিবীর একবিংশতি ভাগমাত্র হওয়ায়, এই গ্রহের

ধারণ করিয়া রাখিতে অক্ষম। লাউয়েল সাহেবের পর্য্যবেক্ষণঅনুসারেও বুধগ্রহে বায়ুমণ্ডলের কোনও দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ, এই গ্রহে যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহারা কুজ্ঝটিকা বা মেঘদ্বারা কোনরূপ অস্পষ্টতাদোষে দূষিত নহে। অতএব, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে বুধগ্রহ আদৌ বাসযোগ্য নহে।

অতঃপর, সূর্য্য হইতে আরও দূরে আসিয়া আমরা শুক্রগ্রহে (Venus) উপনীত হই। আয়তন এবং ঘনত্বে এই গ্রহ পৃথিবীর অতি অনুরূপ। যদি কোথাও সম্ভব হয়, তবে এই গ্রহেই আমরা আমাদের জীবনোপযোগী পরিবেষ্টন দেখিবার আশা করিতে পারি। সেদিন পর্য্যন্ত শুক্রগ্রহের আবর্ত্তনকাল পৃথিবীর আবর্ত্তন-কালের প্রায় সমান বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিয়া আসিতেছিলেন। ফলে, শুক্রগ্রহের দিবারাত্রের পর্য্যায়ও পৃথিবীর সদৃশ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অধিকন্তু এই গ্রহে যে সমুদায় চিহ্নাদি লক্ষিত হয়, তাহারা এতই অনুজ্জ্বল ও অস্পষ্ট যে, শুক্রগ্রহ একটি নিবিড়, জলদজালশোভিত, বায়ুমণ্ডলে আবৃত বলিয়া বৈজ্ঞানিক-দিগের ধারণা জন্মিতেছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কিন্তু শিয়াপেরিলি (Schiaparelli) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুক্রগ্রহ বুধগ্রহের ন্যায় সূর্য্যাভিমুখে সতত একই দিক্ স্থাপন করে, এবং উহারই ন্যায় সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর কেবল একবারমাত্র আবর্ত্তিত হয়। লাউয়েল সাহেবের দৃঢ়তর করিয়াছে এবং ফ্লাগষ্টাফ্ (Flagstaff) নগরে ঐ গ্রহের যে বর্ণচ্ছত্র গৃহীত হয়, তাহাতে শুক্রগ্রহের পরিভ্রমণবেগের মন্থরতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা কিন্তু দ্বিপ্রহরে গৃহীত বর্ণচ্ছত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারি। যেহেতু, মধ্যাহ্নকালে আমাদের আকাশের বর্ণচ্ছত্র অর্থাৎ আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের বিশ্লিষ্ট বর্ণসমূহ দৃশ্যমান গ্রহের বর্ণচ্ছত্রের উপর পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় শুক্রগ্রহের প্রকৃত পরিচয় লাভ কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

শুক্রগ্রহের কক্ষ প্রায় সর্ব্বাংশে বৃত্তাকার। এই হেতু, এই গ্রহ যদি সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে ঠিক একবার মাত্র স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ইহার সূর্য্যাভিমুখী অংশ বিপরীত প্রদেশের তুলনায় বুধগ্রহ অপেক্ষা অধিকতর বিসদৃশ এবং একভাবাপন্ন হইবে। অধ্যাপক লাউয়েল দেখাইয়াছেন যে শুক্রগ্রহের বায়ুরাশি সূর্য্যনিম্নস্থ ভূভাগ হইতে বিপরীতদিকে নিরন্তর প্রবহমান থাকায় এই গ্রহের বায়ুপ্রবাহ কার্য্যতঃ নিষ্পন্দ। এই অবস্থার একটি ফল হইবে যে, জলীয় বাষ্প ক্রমাগত সূর্য্যাভিমুখ ভাগ হইতে তাড়িত হইয়া বিপরীতদিকস্থ তমসাচ্ছন্ন ভূভাগে তুষার বরফের আকারে স্তূপীকৃত হইবে। এই স্থানের তাপ পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া জলীয় বাষ্প আসিবামাত্র ঘনীভূত হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিলে গ্রহের

স্থায়ী আবরণে আবৃত হইবে। অতএব, এই সমস্ত অনুমান সত্য হইলে, বলিতে হয় যে, শুক্রগ্রহ বুধগ্রহ অপেক্ষাও বাসের পক্ষে অধিকতর অনুপযোগী।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

কথা ও সুর

(গল্প)

১

তুতেঁ একজন কবি। বন্ধুগণ সকলেই তুতেঁর কবি-প্রতিভার সুখ্যাতি করিত, করিত না, শুধু সম্পাদকগণ, যাহাদিগকে তুতেঁ অহরহ রাশি রাশি কবিতা পাঠাইয়া বিব্রত করিয়া তুলিত। তা সম্পাদকগণের অভিমতে কিছুই আসিয়া যায় না, তাহারা কাব্যের মর্ম্ম কি বুঝিবে? যাহা হউক, তথাপি তুতেঁ একজন কবি, কারণ সে দুই ছত্র রচনা মিলাইতে পারিত! সুতরাং সকল অনর্থের মূল যে অর্থ, তাহার উৎপাতও তাহার ছিল না! জগতে যাঁহারা মহাকবি বলিয়া খ্যাত, পার্থিব মুদ্রাসম্পদে তাঁহারা চিরদিনই নিঃস্ব! ভারতীর এ কুখ্যাতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে! ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই, বরং গৌরব আছে!

প্রতি সোমবার তুতেঁ সম্পাদক-মহলে অজস্র খণ্ড কবিতা বিতরণ করিত; তুতেঁর কবিতার সহিত সম্পাদকগণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁহারা জানিতেন, তাহার কোনটিই চলিবে না, সুতরাং তুতেঁ শনিবার সেই বিতরিত খণ্ডকবিতাসমূহ আবার সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত। এই শনিবার দিনটি গভীর নিরাশার বাণে তাহাকে যখন একান্ত কাতর, জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত, তখন বেচারা কবি সান্ত্বনালাভের জন্য বন্ধু জার্ভিসের উদ্দেশ্যে ছুটিত।

জার্ভিস ছিল, একজন সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ। সুরে তাহার জ্ঞান, অপূর্ব্ব! অন্ততঃ এই বিশ্বাস লইয়া জার্ভিস বন্ধুমহলে প্রতিপত্তি জাহির করিত। পৃথিবীতে প্রতিভার আদর নাই—নহিলে নিরালা গৃহকোণটিকেই শুধু বিচিত্র সুরঝঙ্কারে জার্ভিস মুখরিত করিবে কেন—বড় বড় মজলিস, আনন্দসভা ও সম্মিলনীতে তাহার স্থান হয় না!

সেদিন জার্ভিস শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল। তথাপি বন্ধুকে দেখিয়া সে কহিল, "এস, এস, তুতেঁ! ব্যাপার কি?"

তুতেঁ ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সম্পাদকগণের নীচ ঈর্ষার কথা,—সেই পুরাতন কাহিনী!

জার্ভিস কহিল, "তোমার লেখা ফিরিয়ে দিয়েছে! দেবেই ত! আজকাল কি গুণের আদর আছে! চারিধারে সব দল পাকিয়ে বসে আছে! নূতন প্রতিভাশালী লোকগুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না। দেখ না, আমার অবস্থা! মিছা দুঃখ করে কি হবে, বল! মনটা খারাপ হয়ে গেছে, তোমার, দেখছি। ঐ টেবিলে একটা স্ত্রী পাশ আছে,

মিমিক থিয়েটারের,—জোগাড় করেছিলাম। আমার মাথা ধরেছে, যেতে পারব না। পাশখানা নষ্ট হয় কেন, তুমি যাও, বেশ আমোদ পাবে।"

তুর্তে কহিল, "আজ যেন আমোদ পাব, কিন্তু কাল সকালে কি হবে? ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠছি যে—"

জার্ভিস কহিল, "বটে! তবু কাল যা হবার, কাল হবে! আজ কেন উতলা হও, তার জন্য! আজ থিয়েটারে যাও—হাতের কাছে যে সুখটুকু আছে, সেটুকু ছেড়ো না।"

তুর্তে কহিল, "তুমি পাগল! কাল খাব কি, তার কোন সংস্থান নাই—"

জার্ভিস কহিল, "যাও, যাও, বিরক্ত করোনা, যা বললাম, শোন—আজ রাত্রে হয়ত এমন একটা কিছু আমার মাথা থেকে বেরুতে পারে, যাতে দুজনেরই মাসখানেকের সংস্থান হয়ে যেতে পারে—"

ফ্রী পাশখানি পকেটস্থ করিয়া তুর্তে বিদায় গ্রহণ করিল। আহার যদি একান্তই না মিলে, আমোদই মিলুক! দোষ কি? একটা বিষয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে ত!

ফ্রী পাশ দেখাইয়া তুর্তে ষ্টলে বসিবার অধিকার পাইল। তখন একে একে থিয়েটারের শূন্য আসন বিচিত্রবেশধারী দর্শকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদিগের হাস্য কলরবে চারিধার মুখরিত! জঠর যাহাদিগের পূর্ণ, পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবার তাহাদিগের কোন কারণ নাই! তুর্তে! আহা, বেচারা তুর্তে! হায় উপেক্ষিত, অবহেলিত কবি! তাহারই শুধু অন্ন জুটে না!

অভিনয় আরম্ভ হইল। ক্ষুধার জ্বালায় তুর্তের চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল। অভিনয় কবির মোটে ভাল লাগিতেছিল না। সহসা যখন এক নারী, পল্লবিনী লতার মত ক্ষীণ দেহলতাটি আঁকাইয়া বাঁকাইয়া সুমধুর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন কবি মুহূর্ত্তে সচেতন হইয়া উঠিল! তুষার-শুভ্র গ্রীবাটি ঈষৎ হেলাইয়া, গতিতে বিদ্যুৎ ছুটাইয়া, ক্ষিপ্র চরণে সে এক অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা,—দেখিয়া কবি মোহিত হইয়া উঠিল! অপূর্ব্ব রূপসী, এই নারী—কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছেগুচ্ছে ঝরিয়া পড়িয়াছে—যেন কেশের রাশিতে তরঙ্গ ছুটিয়াছে, যেন রূপের নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! নৃত্যশেষে বিচিত্র স্বপ্নের মত কিশোরী অদৃশ্য হইল! কবির অন্তরে জাগিয়া রহিল, এক বিচিত্র রেশ! প্রোগ্রাম দেখিয়া কবি জানিল, অভিনেত্রীটির নাম, মার্সিলি!

অভিনয় ভাঙ্গিলে মার্সিলিকে দেখিবার জন্য কবির চিত্তে একটা আকুল আগ্রহ জাগিল! বাহিরে সে দাঁড়াইয়া রহিল—মার্সিলি বাড়ী যাইতেছিল—কবির সম্মুখ দিয়াই সে চলিয়া গেল—যেন একটা তড়িতের প্রবাহ খেলিয়া গেল! মার্সিলি কবির দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না! কবির প্রাণ ক্ষুব্ধ হইল! হায় নারী, যদি জানিতে, যদি বুঝিতে, একটি ভক্ত হৃদয় নীরব অবদানের ভারে আজ কিরূপ নত হইয়া পড়িয়াছে!

২

প্রভাতে কবি জার্ভিসের নিকট ছুটিল। জার্ভিস তখনও শয্যা ত্যাগ করে নাই।

জার্ভিস কহিল, "এ কি, এত ভোরে এসেছ যে! কিছু খপর আছে নাকি? তোমার কবিতা সম্পাদকগুলো নিলে নাকি?"

উচ্ছ্বসিত আবেগে কবি কহিল, "আমি একটা গান লিখব,মনে করেছি, জার্ভিস। সে এক অপূর্ব্ব ধরণের গান—সেটিতে তোমায় সুর দিয়ে দিতে হবে! একটা সুর—চমৎকার সুর! বন্ধুত্বের খাতিরে আমার এ উপকারটি করবে, আশা করি।"

"গান! এই ভোরেই গান লিখবে! হঠাৎ এ খেয়াল হল যে - "

"গানটার একটা অর্থ আছে! এটা কারো উদ্দেশ্যে লিখতে হবে—"

"উদ্দেশ্যে! কার উদ্দেশ্যে?"

"মার্সিলির উদ্দেশ্যে! মিমিক থিয়েটারের অভিনেত্রী, মার্সিলি—গানটার নাম, মার্সিলির প্রতি।"

"বটে! কই, কথা কই? কথা?"

জার্ভিস ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

তুর্তে কহিল, "ভাবটা এখনও মাথায় আছে—লিখিনি, বা লেখবার চেষ্টাও করিনি, এখনো! একটা কাগজ আর পেন্সিল দাও, আমাকে। ভারী শীঘ্র এটা লিখে ফেলতে হবে!"

জার্ভিস কাগজ পেন্সিল আনিয়া বন্ধুর হাতে দিল! কহিল, "সুর চাই! সুর! ভাল কথা, গানটা লেখা না হলে সুর দিই, কিসে?"

তুর্তে কহিল, "এই গানে আমার প্রতিভাটা তাকে বোঝাতে চাই। এ গানে তাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলব, বশ করে ফেলব। এ গান এমন অপূর্ব্ব হবে! গানে মার্সিলির হৃদয় জয় করব! সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নূতন কাণ্ড, নয়, বন্ধু?"

মুস্কিলে ফেললে! সুরে এমন অসাধ্য সাধন! চেষ্টা করে দেখি —"

তুর্তে কহিল, "সুরে অসাধ্যসাধন নয়, বন্ধু, গানের কথাগুলি এমন হবে যে, এক একটি কথা তীক্ষ্ণ তীরের মত তার হৃদয়টাকে বিঁধে ফেলবে—তাতে থাকবে, যেমন তেজ, তেমনি আকুল করুণতা! তাতে এমন কথা থাকবে যে,সে কথা একবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে, আবার পর মুহূর্ত্তে সিংহাসনে অপূর্ব্ব মহিমায় দৃপ্ত বলে উঠে বসবে! এমন লেখা কখনো আমি পূর্ব্বে লিখিনি! তার রূপের স্তবগান! একটা খুব সহজ সুর দিতে হবে, যাতে তার মনোযোগ কথাগুলো ছাড়িয়ে সুরের দিকে না ঝুঁকে পড়ে।"

"কি? তুমি আমার প্রতিভাটাকে ছেঁটে দিতে চাও, সে গান থেকে? তোমার কতকগুলো অসার কথার পিছনে আমার সুর চাপা পড়ে থাকবে! কখনো না।"

"এ তোমার অন্যায় হচ্ছে, জার্ভিস! আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি! যখন তাকে বিবাহ করব, তখন তোমার এ উপকারের জন্য রীতিমত পুরস্কার দেব। থাক্, এখন বাজে কথা থাক। গানটা লিখে ফেলি, আমি—"

তুর্তে চলিয়া গেল। পথে তখন সূর্য্যকিরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাতাসে একটা আনন্দ জাগিয়াছে। পথে চলিতে চলিতেই তুর্তে কবিতার কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিল।

তাহার পর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া সে কলম হাতে লইয়া কাগজের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহিল! ছত্রগুলা,—কৈ, সেরূপ মুক্ত আকুল

করা গিয়াছিল, কবিতা সেরূপ দাঁড়াইল না! মার্সিলি কি এ খুঁতটুকু ধরিয়া ফেলিবে? না! কবির প্রতিই তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া উঠিবে, কবিতার প্রতি ততটা লক্ষ্য না থাকিবারই সম্ভাবনা। তুতেঁ যেন কল্পনানেত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মার্সিলি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, এই কবির সন্ধান না পাইলে সে জলস্পর্শ করিবে না! কোথায় কবি, কোথায় সে, কোথায় হে প্রাণের নিধি, বাঞ্ছিত বঁধু! সারা প্যারিতে কবির সন্ধানে মার্সিলির লোক ছুটিয়াছে! কবিকে না পাইলে, মার্সিলি এক দণ্ড বাঁচিবে না! এস, এস, হে প্রিয়, হে দয়িত, কোথায় আছ, এস তুমি!

হায়, কল্পনা যদি এই মুহূর্ত্তে বাস্তবে পরিণত হইত! কেন, এমন হয় না, ভগবান? ভগবানের করুণার কথা আজ তুতেঁর বিশেষ করিয়া মনে হইল, তিনি যদি কৃপা করেন, তবে—!

তথাপি কবিতার ছত্র তেমন ফুটিল না! মনের মত কথা জুটিল না। তুতেঁর রাগ হইল, নিজের উপর বিরক্তি ধরিল। ইচ্ছা হইল, আপনার মাথাটা দেওয়ালে প্রচণ্ডভাবে ঠুকিয়া সে চূর্ণ করিয়া ফেলে! মাথা, এই মাথা এত ভাব লুকাইয়া রাখিয়াছে, কিছুতে ছাড়িয়া দিবে না! ভীষণ, লক্ষীছাড়া এই মাথা, কি উৎকট গোঁ লইয়া খাড়া হইয়া আছে!

বিপুল চেষ্টায় ছয়টি ছত্র আরও যাহা বাহির হইল, তাহা নিতান্ত পঙ্গু! ছন্দে তেমন ধ্বনি নাই, ভাবটাও সম্পূর্ণ খুলে নাই! তুতেঁ নিজেই তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

সে যাহা লিখিবে ভাবিয়াছিল, তাহা ত বাহির হইলই না, যাহা ভাবে নাই, কলমের ছত্রে তাহাই বাহির হইয়াছে! তাহার মাথা, কালি, কলম, কাগজ প্রভৃতি সকলেই তাহার বিরুদ্ধে এ কি ঘোর ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়াছে! বাসার দাসীকে ডাকিয়া সে গানটা পড়িয়া শুনাইল। শুনিয়া সে বেচারী, ভাবার্থ না বুঝিলেও, কাঁদিয়া ফেলিল।

তুতেঁ তখন কাগজ লইয়া জার্ভিসের উদ্দেশ্যে চলিল।

৩

জার্ভিস গানটি আগাগোড়া পাঠ করিল। সে কাঁদিল না, কিন্তু পাঠ করিয়া নিমেষের জন্য ভাবাভিভূত হইল।

তুতেঁ কহিল, "কেমন?"

জার্ভিস গম্ভীরভাবে কহিল, "হাঁ, মিল আছে দেখচি! এই যে প্রথম ছত্রে তৃতীয় ছত্রে, দ্বিতীয় ছত্রে চতুর্থ ছত্রে মিল রয়েছে। কবিতাতে মিল থাকাটাই প্রধান দরকার। মিল না থাকলে ত আর কবিতা হয় না। কিন্তু এক অজানা নারীকে কবিতাদ্বারা, শুধু কতকগুলো কথার ছটায় ভালবাসতে বাধ্য করা কতদূর সফল হবে, তা আমি ঠিক ধারণা করতে পাচ্ছি না—"

তুতেঁ কহিল, "কিন্তু এই ছত্রের পিছনে কবি যে জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে উঠেছে। নইলে কথার এমন কি ক্ষমতা আছে! সে যে কথার সৃষ্টি-কর্ত্তাকে মনে মনে কল্পনা করে নেবে।"

"তার পর?"

"তার পর সে সমস্ত প্যারি সহর চুঁড়ে ফেলবে, এই কবিকে খুঁজে বার করবার জন্য।

"কি হবে?"

"আমি আত্মপ্রকাশ করব। কবিতাটায় এখন আমি নাম দেব না। থিয়েটারে গিয়ে সন্ধান নেব, কবির খোঁজ চলছে কি না—"

"আর যদি খপর পাও, কোন খোঁজ নিচ্ছে না—"

"তুমি বড় নিষ্ঠুর, জার্ভিস—"

"আহা, খারাপ দিকটাও ত ভেবে রাখা উচিত। নিরাশার জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল। আমিও একটা গান লিখে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেছলাম, অথচ আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিত রয়েছি—"

"বাঃ, তুমি কি করে আপনাকে বোঝাবে? সুরে তা হতে পারে না ত! কথা চাই, তার জন্য! এখানে আমি আমার ভক্ত হৃদয়টাকে একেবারে তার সম্মুখে খুলে ধরেছি যে, একেবারে লুটিয়ে দিছি—"

সন্ধ্যার সময় থিয়েটারের দ্বার-সম্মুখে গিয়া আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে তুর্তেঁ দাঁড়াইয়া রহিল। মার্সিলি আসিল,—থিয়েটারের ভিতর চলিয়া গেল, কবির দিকে চাহিলও না! কবির সারা চিত্ত বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। হায়, প্রতিভার পূজা, প্রতিভার আদর পৃথিবীতে নাই! তবু তাহার মনে একটা সান্ত্বনা জাগিল,—চলিয়া গেলে, মার্সিলি, বেশ, যাও! আজ চিনিলে না, একবার চাহিয়াও দেখিলে না! কিন্তু দুইদিন পরে এই উপেক্ষিত অবহেলিত লোকটির জন্য তুমি পাগল হইয়া উঠিবে! ইহাকে পাইলে স্বর্গ পাইবে! ইহারই হাত ধরিয়া ভ্রমণ করিবে এবং ঈষৎ লজ্জা দিবে! তখন—! ভবিষ্যতের ছবি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তুর্তেঁ মৃদু হাসিল।

সেই রাত্রে সহসা এক বিচিত্র স্বপ্নে তুর্তেঁর নিদ্রা সুন্দর সুমধুর হইয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিল, নদীর জলে এক তরণীবক্ষে তাহার ক্রোড়ে শ্রান্ত শির রাখিয়া মার্সিলি শয়ন করিয়া আছে! চন্দ্রের স্নিগ্ধ রজতরশ্মি মার্সিলির মুখে পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে! এমন সময় জার্ভিস আসিয়া তাহাকে ঠেলিল, "তুর্তেঁ, গানের সুর হয়েছে, শোন।" স্বপ্ন ভঙ্গে তুর্তেঁর মন বিষাদে ভরিয়া গেল! এমন মধুর স্বপ্ন! তবু সে রাগ করিতে পারিল না—তাহার গানে সুর দেওয়া হইয়াছে! জার্ভিস বাজাইয়া গানটি গাহিল। সুর সম্বন্ধে তুর্তেঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, তথাপি সে কহিল, "চমৎকার সুর!" সে ভাবিল, সে না বুঝিলেও, মার্সিলি নিশ্চয় বুঝিবে, ইহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবে! কৃতজ্ঞতায় তুর্তেঁর হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "জার্ভিস, ভাই, তোমার ঋণ কখনো ভুলব না। বিবাহের পর অবস্থা ফিরে যাবে, আমার। মস্ত একটা বাড়ী নেব, আমি। তোমাকে কিন্তু প্রায়ই আমাদের অতিথি হতে হবে! হাভানা চুরুট, শাম্পেন সব বন্দোবস্ত থাকবে। সে বাড়ীতে তোমার ক্ষমতা আমারই মত হবে। তখন একবার এই সব সম্পাদকগুলোকে দেখে নেব! এখন যাঁরা আমার কবিতা ফেরত দেন আগাগোড়া, তখন তাঁরাই আবার সেগুলি চেয়ে নিয়ে গিয়ে ছাপবেন, আরও লেখবার জন্য অনুরোধ

"তুমি একেবারে স্থির-নিশ্চয় হয়ে বসেছ। যাই হোক, আমি তোমাকে নিরুৎসাহিত করতে চাইনে—যোদ্ধা যদি যথার্থই মার্সিলি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়—"

"যদি! নিশ্চয় আকৃষ্ট হবে! কবিপ্রতিভা সে বুঝবে না?"

"বেশ! হলে ভালই ত। তবে তুমি গানটি তাকে পাঠাচ্ছ, কেমন করে?"

"মিমিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়ে আসব। বেশ করে বলে আসব, এটা খুব দরকারী জিনিস, তাঁর কথামত রেখে যাচ্ছি। তারপর রোজ থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ নেব।"

৪

থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের হাতে ছোট একটি পার্শেল দিয়া তুঁতে কহিল, "এটা মাদামোসেল মার্সিলিকে দিতে হবে! এটা পাবার জন্য তিনি বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন! কে দিয়েছে, তা বলবার প্রয়োজন নাই। তিনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

পরদিন অদম্য কৌতূহল লইয়া তুতেঁ আবার থিয়েটারে গেল। তাহার সম্মুখ দিয়া মার্সিলি থিয়েটার-গৃহে প্রবেশ করিল। মার্সিলির গতিতে বা ভঙ্গীতে এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না! তুতেঁর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কোনমতে সেদিন সে একখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে গেল। অভিনয়কালে মার্সিলি একবারও তুতেঁর দিকে ফিরিয়া চাহিল না! নির্ম্মম আঘাতের বেদনায় আবার তুতেঁর বুকটা হা-হা করিতে লাগিল! তথাপি সে অন্যান্য দর্শকগণের দিকে চাহিয়া অন্তরে একটা গর্ব্ব করিতেছিল। সে-ও আজ ইহাদের মত একজন দর্শকমাত্র! কিন্তু তুইদিন পরে যখন সম্ভাবনা সত্যে পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন ইহারা দেখিবে, প্রচ্ছন্ন একটা পশ্চাতের আসনে একদিন এমন একজন লোক দর্শকভাবে বসিয়াছিল, যাহার স্পর্শে আসন পবিত্র মহিমাময় হইয়া উঠিয়াছিল! হায়, সে দিন, সে শুভ মুহূর্ত্ত, আর কত বিলম্বে, দেখা দিবে, তুমি, বন্ধু!

পরদিন অপরাহ্ণে জার্ভিস ও তুতেঁ একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই হোটেলে মার্সিলি প্রায়ই ভোজন করিতে আসিত, তুতেঁ সন্ধান পাইয়াছিল। তুতেঁ জার্ভিসকে বলিয়াছিল, আজ সে আপনাকে আর গোপন রাখিবে না! পরিচয় দিবে! লজ্জায় বেচারী মার্সিলির বুক ফাটিয়া যাইতেছে! নিষ্ঠুরভাবে দূরে থাকিয়া আপনাকে গোপন রাখিয়া তুতেঁ আর তাহাকে ক্লেশ দিবে না—তাই সে জার্ভিসকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। জার্ভিসেরও মনে একটা আগ্রহ জাগিয়াছিল, তাহার সুরের সমাদর হইল কেমন, জানিতে হইবে!

এমন সময় মার্সিলির গাড়ী দেখা দিল। বন্ধুদ্বয় হোটেলের দ্বার-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। মার্সিলি গাড়ী হইতে যেমন ফুটপাথে পা দিয়াছে, সহসা অমনি তাহার পা পিছলিয়া গেল। তুতেঁ ক্ষিপ্রহস্তে মার্সিলির একটি হস্ত ধরিয়া ফেলিল! আনন্দে সে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দেখিল, জার্ভিস মার্সিলির অপর হস্ত ধরিয়াছে! এ

তুর্তে কহিল, "অনুগ্রহ করে আমার হাত ধরে চলুন—ফুটপাথে পিছল। জার্ভিস, এখনই ফিরে আসছি। তুমি এখানে দাঁড়াও!"

দৃষ্টির বিষে যদি মানুষের মৃত্যু হইত, তবে জার্ভিস আর একদণ্ড বাঁচিত না! জার্ভিসের দিকে চাহিয়া তুর্তে যখন তাহাকে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে বলিল, তখন দৃষ্টির সহিত কবি আপনার অন্তরের সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল! জার্ভিস কিন্তু হঠিবার পাত্র নহে! তুর্তে কতকগুলা কথা গাঁথিয়া দিলে কি হইবে,—গানে সুর দিয়াছে সে, সুতরাং মার্সিলির সঙ্গে যাইবার তাহারও তুল্য অধিকার আছে!

মার্সিলি উভয় বন্ধুকে ধন্যবাদপ্রদানে আপ্যায়িত করিয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। বন্ধুদ্বয়ও চেয়ার টানিয়া মার্সিলির সম্মুখে বসিয়া ভৃত্যকে আহার্য্য আনিতে আদেশ দিল।

চায়ের পিয়ালাটি নামাইয়া রাখিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া মার্সিলি কহিল, "আপনারা আজ আমার বড় উপকার করেছেন, বড় বাঁচিয়েছেন, সেইজন্যই বলছি, যদি আর একটু অনুগ্রহ করেন—আমি এক বিপদে পড়েছি—"

কবি কহিল, "বলুন, কি হয়েছে? আপনার ঈপ্সিত একটি ফুল তোলবার জন্য আমি সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারি—"

জার্ভিস কহিল, "মাদামোসেল, আজীবন আমাকে আপনার অনুগত ভৃত্য বলে জানবেন—"

বন্ধুদ্বয় পরস্পরের পানে তীব্রভাবে একবার চাহিল! যে চাহনিতে অগ্নি ঠিকরিয়া

মার্সিলি তাহা লক্ষ্য করিল না। সে কহিল, "কাল রাত্রি থেকে আমি একটি লোকের সন্ধান কচ্ছি! একজন লোক, মস্ত ক্ষমতাপন্ন লোক—এমনভাবে আত্মগোপন করে রেখেছেন, আমার কাছ থেকে—"

আনন্দে কবি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। জার্ভিসের হস্ত হইতে মদ্যের বোতলটা পড়িতে পড়িতে কোনমতে রক্ষা পাইয়া গেল। উভয়েই অস্থির হইয়া উঠিল, হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনিটুকু পাছে মার্সিলি শুনিয়া ফেলে! এমন আত্মসংযমে তাহারা পূর্ব্বে কখনও অভ্যস্ত ছিল না।

মার্সিলি কহিল, "যতক্ষণ না এঁকে খুঁজে বার করতে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নাই! আপনারা যদি এ বিষয়ে আমায় একটু সাহায্য করেন ত আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকি।"

নাটকের নায়কোচিতভাবে কবি উচ্ছ্বসিত আবেগে কহিল, "মাদামোসেল, আজ হতে আমি আপনার ভৃত্য—"

জার্ভিস কহিল, "আপনার সেবায় আজ হতে আমার জীবন আমি উৎসর্গ করলাম—"

কবি কহিল, "এই লোকটি কিসের জন্য আপনাকে এত ভাবিয়ে তুললে, তা জানতে পারি কি—"

জার্ভিস কহিল, "বিশ্বাস করে সে কথাটি আমায় বলেন যদি—"

মার্সিলি কহিল, "একজন আমায় একটি সুন্দর উপহার দিয়েছেন, অথচ নিজের নাম প্রচ্ছন্ন রেখেছেন—"

ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। জার্ভিসও তাহার অনুসরণ করিল। মার্সিলি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল!

কবি তুতেঁ কহিল, "মাদামোসেল, আপনি যাকে খুঁজে সারা হচ্ছেন, সে এই আপনার সম্মুখে!—"

জার্ভিস কহিল, "যার জন্য আপনি মনের শান্তি হারিয়ে বসেছেন, সে পাষণ্ড আর কেউ নয়—সে এই আমি!"

"তুমি!" তুতেঁ হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

"হাঁ, আমি।" জার্ভিসের স্বর বজ্রগম্ভীর।

"সে অমর কথাগুলি, আমারই রচনা!"

"কিন্তু তার সে স্বর্গীয় সুর—সে বিহ্বল-করা সুর—আমারই মস্তিষ্ক হতে বেরিয়েছে।"

"সুরে কি এসে যায়—কথা না থাকলে শুধু সুরে কি হয়?"

"কথাগুলো ত পাগলের প্রলাপ—সুরই প্রাণ!"

মার্সিলি কহিল, "কিন্তু এ সবের অর্থ, কি? আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। কথা, সুর,—এ সবের মানে কি?"

উভয়ে এক সঙ্গে উত্তর দিয়া উঠিল, "মাদামোসেল, সেই গানটার কথা বলছেন ত, সেই মার্সিলির প্রতি কবিতাটা? সেটা—"

"ও! সেই বাবিশ কবিতাটা! কি সর্ব্বনাশ! আঃ, কি জঘন্য লেখা! মানুষে এমন কবিতাও লেখে!· সে আমি পড়েই পুড়িয়ে ফেলেছি! হাঃ, হাঃ—সে ত পড়ে আর হেসে বাঁচিনে! সে কথা বলছি না, আমি! আমি বলছিলাম, যখন কাল রাত্রে দ্বিতীয় অঙ্কের নাচটা নাচছিলাম, তখন ষ্টল থেকে কে একটা ফুলের তোড়া আমার ষ্টেজে ছুড়ে দেন! পরে দেখি, তার মধ্যে একটি হীরার ব্রুচ রয়েছে—তার দাম প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। আমি তাঁরই সন্ধান কচ্ছি—কে দিলে, এত টাকা দামের জিনিসটা............"

মার্সিলি চলিয়া গেল। তুতেঁ জার্ভিসের পানে চাহিল; জার্ভিস তুতেঁর পানে চাহিল।

তুতেঁ কহিল, "এই তোমার বন্ধুত্ব, বিশ্বাসঘাতক! তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় উড়িয়ে দিচ্ছিলে—"

জার্ভিস কহিল,—"তুমিই ত আমায় উড়ুচ্ছিলে! এঁকে লক্ষ্য করেই ত আমি অন্তর থেকে আমার আকুল যাচনার সুর তুলেছিলাম। সে কি এই প্রথম! তখন, কোথায় তুমি! মার্সিলি তখন থিয়েটারে নামেনি, সার্কাসওয়ালী ছিল। কতবার সে আমার এ আকুল প্রার্থনা পাষাণ প্রাণে উপেক্ষা করে গেছে, তা যদি জানতে, বন্ধু—"

কয়েক মিনিট পরে দুই বন্ধু বিষণ্ণ চিত্তে পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া হোটেল হইতে বিদায়গ্রহণ করিল। হোটেলওয়ালা বিলের টাকা না পাইয়া উভয়ের কোট দুইটা আটকাইয়া রাখিল, অর্থ আনিয়া খালাস করিয়া লইয়া যাইবে!

হায়, প্রতিভার আদর দূরে থাকুক, হোটেলওয়ালাটা প্রতিভার প্রতি সামান্য করুণাও করিল না! বাহিরে পথে বন্ধুদ্বয়ের অন্তর মথিত করিয়া শুধু মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি

তদনুসারে, তিনি দৈত্যগণকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন—"আগামী কল্য আমি তোমাদের ভূরি ভোজনে নিমন্ত্রণ করিব। তোমরা প্রত্যেকেই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে কিন্তু বসিবার জন্য নিজ নিজ আসন আনয়ন করিবে।" দৈত্যগণ আমন্ত্রিত হইয়া বিজ্ঞাপিত সময়ে উপস্থিত হইল। আহারাদি সম্পন্ন হইলে, রাজা দৈত্যগণকে বলিলেন "তোমরা যে সকল প্রস্তর আনয়ন করিয়াছ, তাহা একত্র করিয়া আমার জন্য একটী প্রস্তর-গৃহ নির্ম্মাণ কর।" রাজাদেশে, দৈত্যগণ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিল। তখন অশোক স্বয়ং ভ্রাতাকে ঐ পর্ব্বতগৃহবাসে অনুরোধ করিলেন।

পুরাতন রাজধানীর উত্তরে, এবং নরকের দক্ষিণে শূন্যগর্ভ একখানি বৃহৎ প্রস্তর আছে। নিমন্ত্রিত শ্রমণগণের আহার্য্যগ্রহণের সুবিধার জন্য অশোকরাজের আদেশে দৈত্যগণ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পুরাতন রাজধানীর দক্ষিণপশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতস্থ গহ্বরে এবং উপত্যকায়, উপগুপ্ত ও অন্যান্য অর্হৎগণের বাসের জন্য রাজা অশোক দৈত্যগণদ্বারা বহুসংখ্যক প্রস্তরাবাস নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

ইহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন প্রাসাদ আছে। বর্ত্তমানে ইহা কতকগুলি প্রস্তরসমষ্টি মাত্র। একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও আছে; দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ বারিরাশিতে লহরীমালা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। ইহার জল পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার জল পান করিলে বা ইহাতে অবগাহন করিলে, সকল পাপ দূরীভূত হয়।

পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে পাঁচটী স্তূপসমষ্টি আছে। ভিত্তিমূল উচ্চ কিন্তু এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি, যাহা আছে, তাহাও যথেষ্ট উচ্চ। দূর হইতে সেগুলিকে পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হয়। অধিবাসীবর্গ এই সকল স্তূপের ঊর্দ্ধদেশে গৃহ-নির্ম্মাণে চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে "অশোকরাজের ৮৪,০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ ব্যাপার শেষ হইলেও, পাঁচ পঙ্ক্তি স্মরণচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল, সেইজন্য তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত এই পাঁচটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। নন্দরাজ নিজ ধনরক্ষার্থ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কতিপয় অবিশ্বাসী এইরূপ প্রচার করে। এইপ্রকার জল্পনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, পরবর্ত্তীকালে একজন রাজা, লোভ-পরবশ হইয়া নিজ সৈন্যসামন্তসহ এই ধনরাশি দখল করিবার অভিপ্রায়ে স্তূপ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল, পর্ব্বতরাশি ভূমিসাৎ হইল, ধূমরাশি সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল এবং স্তূপমধ্য হইতে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। সেনাপতি ও সৈন্যগণ এবং অশ্ব ও হস্তিগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা এইরূপে পরাজিত হইয়া আর অগ্রসর হইলেন না। যতিগণের জল্পনা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন, কিন্তু কিংবদন্তী ঐরূপ প্রচার করে।"

পুরাতন কুক্কুটরাম নগরীর দক্ষিণপূর্ব্বস্থ সঙ্ঘারাম রাজা অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন তিনি প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখনই এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম অতি উচ্চ। এইস্থানে একসহস্র যতি সমবেত হইয়াছিলেন। কুক্কুটরাম সঙ্ঘারাম ধ্বংস হইয়াছে; কেবল ভিত্তিমূল অবশিষ্ট রহিয়াছে।

সঙ্ঘারামের নিকটে "আমলক" নামে একটী স্তূপ আছে। আমলক ভারতবর্ষে ঔষধার্থে ব্যবহৃত একপ্রকার ফল। রাজা অশোক একবার বহুদিন ধরিয়া পীড়িত থাকায় বিবেচনা করিলেন যে তিনি আর সুস্থ হইবেন না। এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার সকল ধনরত্ন-বিতরণে অভিলাষী হইলেন। রাজমন্ত্রী রাজার অভিলাষপূরণে অনিচ্ছুক হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে যখন রাজা অশোক একটী 'আমলক' ফল আহার করিতেছিলেন, তিনি ঐ ফলের অর্দ্ধাংশ কুক্কুটরাম সঙ্ঘারামে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 'আমলক' ফল হস্তে করিয়া, তিনি

মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে জম্বুদ্বীপের রাজা কে?" মন্ত্রী উত্তর করিল—"মহারাজই জম্বুদ্বীপের অধিপতি।" রাজা উত্তর করিলেন, "না। আমি আর এক্ষণে জম্বুদ্বীপের অধিপতি নহি; কারণ এই ফলের অর্দ্ধাংশ মাত্রই আমার বর্ত্তমান সম্বল। বায়ু প্রবাহিত হইলে যেরূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা যায় না, তদ্রূপ পৃথিবীতে অর্থ ও সম্মান রক্ষা করা দুষ্কর। দিগদিগন্তব্যাপী আমার রাজ্য, এবং আমার নাম ও খ্যাতি, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে আমি এক দুর্দ্দান্ত ও পরাক্রান্ত মন্ত্রীর ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র।

পরে, তিনি একজন পরিচারককে তথায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে তিনি পরিচারককে বলিলেন, "এই অর্দ্ধাংশ ফল কুক্কুটরাম সঙ্ঘারামের যতিগণকে প্রদান করিয়া, তাঁহাদের নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন কর। "যিনি পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপের অধিপতি ছিলেন, তিনি এক্ষণে মাত্র এই অর্দ্ধ "আমলক" ফলের অধীশ্বর। তাঁহার সর্ব্বস্ব হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই স্বল্পমূল্যের উপহারের জন্য তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন এবং অনুমতি করুন যাহাতে রাজার পুণ্যবৃদ্ধি হয়।"

এই কথা শুনিয়া যতি-সঙ্ঘ মধ্যস্থিত স্থবির এইপ্রকার প্রত্যুত্তর করিলেন,—"অশোক রাজা পূর্ব্বের পুণ্যফলে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। তাঁহার পীড়িতাবস্থায় তাঁহার লোভী মন্ত্রিগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, অপরের ধনসঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু, এই অর্দ্ধাংশ ফল উপহার প্রদান করাতে, রাজা দীর্ঘজীবি হইবেন।" রাজা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, যতিগণকে প্রচুর পরিমাণে উপহার প্রদান করিলেন। অধিকন্তু,তিনি সঙ্ঘারামাধ্যক্ষকে এই ফলের বীজ উপযুক্ত পাত্রে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া, স্বাস্থ্যলাভের জন্য এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।

এই স্তূপের উত্তরপশ্চিমে, একটী প্রাচীন সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে একটী স্তূপ আছে; এই স্তূপের নাম "কিণ্টি।" পূর্ব্বে এই নগরে প্রায় একশত সঙ্ঘারাম ছিল; যতিগণ গম্ভীর, বিদ্বান্ এবং সচ্চরিত্র ছিলেন। বিধর্ম্মীয় পণ্ডিতগণ উহাঁদের প্রভাবে নিস্তব্ধ থাকিতেন। কিন্তু, পরে, পূর্ব্বোক্ত যতিগণ নির্ব্বাণলাভ করিলে, তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ তাঁহাদের ন্যায় বিদ্বান্ হইতে পারেন নাই। এই সুযোগে বিধর্ম্মীদিগের আচার্য্যগণ, শাস্ত্রাদি শিক্ষার জন্য তৎপর হইয়াছিলেন। তৎপরে, তাঁহাদের সহযোগিগণকে একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সকল পণ্ডিতকে একত্র কর এবং বৌদ্ধগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত কর।

পরে তাঁহারা রাজাকে সম্বোধন করিয়া দুর্ব্বল ও প্রবলের প্রভেদ নিরূপণ করিতে বলিলেন। বিধর্ম্মিগণ সুপণ্ডিত হওয়াতে তাঁহারা যতিগণকে পরাস্ত করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, সেই দিবস হইতে কোন সঙ্ঘারাম যেন ঘণ্টাধ্বনি করিয়া যতিসঙ্ঘ আহ্বান না করে। রাজাও এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে যতিগণ লজ্জান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন। দ্বাদশ বৎসর আর ঘণ্টাধ্বনি হইল না।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব নামে সুপণ্ডিত ও প্রথিতনামা এক যুবা বাস করিতেন। তিনি স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ও সুখ হইতে বিরত থাকিয়া ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিতে লাগিলেন। দেব নামে শিক্ষিত ও ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। এই ব্যক্তি কার্য্যতৎপর হইয়া বলিলেন, "বৈশালীতে, বিধর্ম্মীদিগের নিকট যতিগণ পরাস্ত হওয়াতে, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া, যতিগণ ঘণ্টাধ্বনি করেন নাই। অধর্ম্মের "পর্ব্বতকে উৎপাটন" এবং ধর্ম্মের দীপ প্রজ্বলিত করিতে আমি সাহসী হইয়াছি।"

নাগার্জ্জুন উত্তর করিলেন, 'বৈশালীর বিধর্ম্মিগণ সুপণ্ডিত; তুমি তাহাদের পরাস্ত করিতে পারিবে না। আমি স্বয়ং যাইব।" দেব উত্তর করিলেন, "কয়েকটী জীর্ণ কাণ্ড ভূমিসাৎ করিতে, আমরা কি জন্য পর্ব্বতকে ভূপাতিত করিব? আমি যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি বিধর্ম্মীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব। যাহা হউক, প্রভু বিধর্ম্মীদিগের পক্ষালম্বন করুন, আমি আপনার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই; তর্কের ফলাফলানুসারে আমি যাইব কি আপনি যাইবেন, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে।"

তখন, নাগার্জ্জুন বিধর্ম্মিগণের পক্ষালম্বন করিলেন

এবং দেব তাঁহার শিক্ষকের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তদিবস অতিবাহিত হইলে, নাগার্জ্জুন পরাভূত হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভ্রমপূর্ণ মতকে সমর্থন করা যায় না। তুমি যাইতে পার; তুমিই বিধর্ম্মীকে পরাস্ত করিতে পারিবে।"

দেব বোধিসত্ত্বের গুণগ্রাম বৈশালীস্থ বিধর্ম্মিগণ অবগত থাকাতে, তাঁহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন,—"মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রমণদিগকে ঘণ্টাধ্বনি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমরা প্রার্থনা করি, আপনি এরূপ আদেশ প্রচার করুন, যাহাতে কোন বৈদেশিক শ্রমণ নগরে প্রবেশ না করিতে পারে; কারণ, তাহাহইলে শ্রমণগণ একত্র হইয়া পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে।" রাজা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ রাজাদেশ পালনের জন্য বিশেষরূপ তৎপর হইলেন।

দেব, নগরের নিকট উপস্থিত হইলেও, নগর-প্রবেশে সক্ষম হইলেন না। রাজাজ্ঞা অবগত হইয়া, নিজ বসন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন এবং তৃণদ্বারা নিজ কষায় বসন আবৃত করিলেন। পরে, পৃষ্ঠদেশে বসন রাখিয়া তিনি নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তিনি তাঁহার কষায় বসন পরিধান করিয়া সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইলেন। সঙ্ঘারামে কোন বন্ধুবান্ধব না থাকাতে, তিনি "ঘণ্টা প্রাসাদে" রাত্রির জন্য অবস্থান করিলেন এবং প্রত্যুষে সবলে ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অধিবাসীবর্গ ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইল এবং জানিতে পারিল যে পূর্ব্বদিবসের আগন্তুক একজন ভিক্ষু। তৎক্ষণাৎ সকল সঙ্ঘারাম ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা এই শব্দ শুনিতে পাইয়া বিশেষরূপে এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়াও ঘণ্টাধ্বনির প্রকৃত কারণ অবগত হইতে পারিলেন না। পরে এই সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়া, দেবকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। দেব উত্তর করিলেন, যতিসঙ্ঘকে একত্র করাই এই ঘণ্টার কার্য্য। যদি সেই উদ্দেশ্য সাধিত না হইল, তবে ইহাকে এখানে রক্ষা করা বৃথা।

রাজ-পারিষদগণ বলিলেন "পুরাকালে যতি-সঙ্ঘ তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে, স্থির হয় যে, আর কেহই ঘণ্টাধ্বনি করিবেন না। এই ঘটনা দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।" দেব উত্তর করিলেন, "ইহা কি সত্য? তথাপি আমি পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি করিতে সাহসী হইয়াছি।"

রাজ-পারিষদগণ রাজার নিকট যাইয়া নিবেদন করিল যে, এক বৈদেশিক শ্রমণ যতিগণের পূর্ব্বের লজ্জা অপনোদন করিবার জন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছেন। তখন রাজা বৌদ্ধগণকে আহ্বান করিলেন এবং আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা পরাজিত হইবে, তাহারাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

তখন বিধর্ম্মিগণ তাহাদের পতাকা ও ঢক্কাসহ তথায় আগমন করিয়া, প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন দেব বোধিসত্ত্ব মঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক বিধর্ম্মীদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টার অনধিক সময়ে তিনি বিধর্ম্মিদিগকে পরাজিত করিলেন। রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ সন্তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বের সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

যে স্থানে ঘণ্টাধ্বনি হয়, সে স্থানে যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় প্রাসাদ-ভিত্তিমূল আছে। বহুপূর্ব্বে এই স্থান ভূতগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণের আবাস ছিল। এই ব্রাহ্মণ মনুষ্যের বাসস্থান হইতে বহুদূরে এক বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মার্জ্জনকামনায় দৈত্যগণকে পূজা করিতেন। এই শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে তৎপরতায় সহিত তর্ক করিতেন। তাহার বক্তৃতার খ্যাতি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কেহ তাঁহার নিকট কোন দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করিতে আসিলে, তিনি যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তর দিতেন। প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তিগণও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। রাজকর্ম্মচারী ও জনসাধারণ সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

এই সময়ে অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব বাস করিতেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি ত্রিমহাযান বিদ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বলিতেন যে,"এই ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট শিক্ষা না করিয়াও পণ্ডিত হইয়াছেন; তিনি প্রাচীন শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন না করিয়াও শাস্ত্রকুশল; তিনি নির্জ্জন মরুভূমিতে বাস করেন এবং অহঙ্কারী। এসকলই দৈত্যগণের সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে। দৈত্যগণের সাহায্যে তিনি যে বাগ্মিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতেই লোকে তাঁহাকে অপরাজেয় মনে করে। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে পরাভূত করিব।"

তৎক্ষণাৎ তিনি ভূতগ্রস্ত ব্রাহ্মণের কুটীরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন, "অনেককাল হইতে আপনার গুণাবলীর প্রশংসা শুনিতেছি, আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি যবনিকা উত্তোলন করিয়া, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন।" কিন্তু ব্রাহ্মণ গভীর তাচ্ছল্য-সহকারে, যবনিকা-উত্তোলনে বিরত থাকিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মাতৃঋণ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-যাত্রা

দুঃখের দিন দীর্ঘ বোধ হইলেও, কোনমতে কাটিয়া যায়। জ্যাকের দিনও কাটিয়া যাইতেছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদবর্ণিত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জেনেদা বিবাহের পর স্বামীর গৃহে গিয়াছে। এ দুই বৎসরে জ্যাক আপনার দুর্ব্বল বাহু দুইটিকে কারখানার কাজে দক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার শিক্ষানবীশীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে কারখানায় কাজ করিয়া বেতন পায়। বেতন সামান্য,—কাজের অনুপাতেই তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট। অপর কারিগরের মত জ্যাক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে পারে না; হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার হাত ভারিয়া যায়, সর্ব্ব দেহ হইতে ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়ে। তাহার দুই করতল কঠিন পরুষ হইয়া উঠিয়াছে; হাতে কড়া পড়িয়াছে। দিনের শেষে পরিশ্রান্ত দেহটাকে কোনমতে টানিয়া সে রুডিকের গৃহে ফিরে, আহারাদি হইলেই শয়ন করে; প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আবার কারখানায় ছুটে। কাহারও সহিত মিশিতে বা গল্প করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। জীবনটা একান্তই স্ফূর্ত্তিহীন, লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রুডিক-গৃহেও ইদানীং কেমন-একটা স্তব্ধতা বিরাজ করিত। জেনেদা চলিয়া যাওয়ায় তাহার কক্ষ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। মাদাম রুডিক আর গৃহের বাহির হয় না, বা কাহারও প্রতীক্ষায় গৃহমধ্যেও বসিয়া থাকে না! পর্ব্বতগাত্র-নিঃসৃত নির্ঝরিণী যেমন আপনার বেগে আপনি বহিয়া যায়, মাদাম রুডিকের জীবনটাও তেমন আপনিই বহিয়া চলিয়াছিল। তাহাতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। রুডিক আপনার কর্ত্তব্য-পথে তেমনই অচপল স্থির লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিল

পরিবারটির উপর দিয়া যে সদ্য একটা উদ্দাম ঝড় বহিয়া গিয়াছে, গৃহখানির প্রতি একটু মনোযোগ দৃষ্টি স্থাপন করিলেই বাহিরের লোক সহজেই তাহা বুঝিতে পারিত।

জ্যাকের জীবনে ইতিমধ্যে একটি ছোট ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটনাটি নিতান্ত সামান্য হইলেও তাহার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। সুতরাং তাহার উল্লেখের প্রয়োজনও আছে। এবার শীতটা প্রচণ্ড পড়িয়াছিল, বর্ষাও রীতিমত নামিয়াছিল। সহরের পথঘাট বহুদিন জলমগ্ন ছিল। কাজকর্ম্ম তাহার মধ্য দিয়াই সারা হইতেছিল। সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্যাকের অতিরিক্ত সর্দ্দিকাশী হইয়াছিল। সপ্তাহাধিককাল জ্বরগায় কারখানায় তাহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল—তাহার পর একেবারে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। সামান্য জ্বর ও কাশী মধ্যে মধ্যে লাগিয়াই রহিল। মাতার নিকট হইতে পত্রাদি সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল! মাতার পত্রে জ্যাক জানিয়াছিল, আর্জেন্তঁর কাজের ভিড়ে পত্র লিখিবার বিজন অবসর তাঁহার একপ্রকার দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি জ্যাকের চিন্তা মাতার মনে অহরহই জাগরূক আছে। জ্যাক যেন পূর্ব্বের মত নিয়মিত পত্রাদি লিখিয়া মাতার ভাবনা দূর করে! কবি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া "ফষ্টের কন্যা" নাটকের রচনা সমাপ্ত করিয়াছে। প্রকাণ্ড পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকখানি কয়েকটি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে দেখানও হইয়াছে, কিন্তু এই সব স্বার্থসর্ব্বস্ব দুর্ব্বৃত্ত লোকগুলা আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধাভরে বহিখানি ফেরত দিয়াছে। কবি ইহাতে একান্ত কাতর মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। সাড়া দিয়াছে. এ সকল তুচ্ছ অবহেলাদ্বারা তাহাকে রোধ করিয়া রাখিতে, কাহারও সাধ্য নাই! কবি তাই মরোভাঁ প্রভৃতির সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। যেদিন সে সাধনার কথা জগতে প্রচারিত হইবে, সেদিন একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলে, শুধু সারা পারির অধিবাসী নহে, সমস্ত সভ্যজগৎ স্তম্ভিত চকিত হইয়া উঠিবে! সে শুভদিনও আসন্ন প্রায়!

মরোভাঁ, মাড়, জিমনেস! সে আজ কতদিনের কথাই বা! তত দুঃখের মধ্যেও সে কি সুখের দিন ছিল! জিমনেসের জ্যাক ও কারখানার জ্যাকে কতখানি প্রভেদ! জিমনেসের জ্যাক—সে এক শান্ত, সুসভ্য কোমল ভদ্র বালক, আর কারখানার জ্যাক—হাড়গুলা উঠিয়া পড়িয়াছে, হাত কড়া কঠিন হইয়াছে, অগ্নির উত্তাপে থাকিয়া-থাকিয়া দেহের বর্ণ মলিন কদর্য্য হইয়া গিয়াছে! ডাক্তার রিভালের কথা আজ বর্ণে বর্ণে ফলিয়া উঠিয়াছে—সামাজিক সম্পর্কই মানুষে-মানুষে বিভিন্নতা আনে।

রিভালগৃহের স্মৃতিতে সহসা আজ জ্যাকের চিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল। আর্জেন্তঁর সহস্র নিষেধ-সত্ত্বেও সে রিভালকে ভুলিতে পারে নাই। জ্যাকের জীবনের একাংশে যাহা-কিছু শুভ্র উজ্জ্বল ছিল, তাহা রিভালের স্নেহ-কিরণ স্পর্শেই! প্রতিবর্ষের প্রথম দিনটিতে রিভাল পরিবারের শুভ কামনা করিয়া জ্যাক রিভালকে পত্র লিখিত। তাহার উত্তরও আসিত। সে কি মধুর আশ্বাস-পরিপূর্ণ স্নেহের উচ্ছ্বসিত বাণী! এ বৎসর কিন্তু কোন উত্তর আসে

জানে! সিসিল! সিসিলের নাম মনে পড়িবামাত্র জ্যাকের নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল!

এই সুগভীর হতাশার মধ্যে একটি কথা শুধু জ্যাকের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিত। সে তাহার মাতার কাতর অনুরোধ,—মাতা লিখিয়াছিল, "জ্যাক, আপনার দিন কিনিয়া লও, মানুষ হও, উপার্জ্জনক্ষম হও। যেদিন আমার ভার তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে, সেদিন আমি সুখী হইব—সেদিন আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।" কি করিয়া মাতার দুঃখ ঘুচাইবে, সে? বেতন অতিশয় সামান্য, কাজ করিবার শক্তিও তাহার অল্প; সুতরাং বেতন-বৃদ্ধির আশা নিতান্তই ক্ষীণ! শান্ত নম্র প্রিয়দর্শন হইলে কি হইবে! কাজ চাই! কাজ কর, বেতন মিলিবে, বেতন বাড়িবে। সেরূপভাবে কাজ করিবার শক্তিই বা দুর্ব্বল জ্যাকের কোথায়! লাবাসাঁদরের আশ্বাস সত্ত্বেও জ্যাক তেমন কর্ম্মঠ হইয়া উঠিল না—সে সম্ভাবনাও তাহার ছিল না। এই সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, শিক্ষানবীশীর যুগ অতিক্রম করিয়া সে দৈনিক অর্দ্ধ ক্রাউনের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না। এই অর্দ্ধ ক্রাউনের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে বাসাখরচ জোগাইতে হইবে, তাহার উপর বসন ও রোগ হইলে পথ্যাদিও আছে! অসম্ভব! অসম্ভব! এ জীবনে উন্নতির কোন আশা নাই। মা যদি আজ সহসা লিখেন, "জ্যাক, আমি তোমার নিকট যাইতেছি—!"

রুডিক একদিন জ্যাককে ডাকিয়া কহিল, "এ কাজে এসে তুমি ভাল করনি! ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে কি এ কাজ পোষায়? উন্নতির আশা ত আমি এখানে কিছু দেখছি না, তোমার! আমি হলে এখানে আর পড়ে না থেকে অন্য কোনদিকে চেষ্টা দেখতাম! এক কাজ করবে, জ্যাক—? সিড্‌নাস্‌ জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার সেদিন একটি লোকের কথা বলছিলেন—এঞ্জিনের জন্য তাঁর একজন লোক চাই। দিনে পাঁচ সিলিং মাহিনা পাবে। সারা পৃথিবী ঘুরবে,—খাওয়া-দাওয়া আলাদা পাবে! কাজটা প্রথম শক্ত বোধ হবে, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে! চাই কি, একদিন জাহাজের কাপ্তেনও হতে পারবে! করবে, এ কাজ?"

সানন্দচিত্তে জ্যাক সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মাসিক সাড়ে সাত পাউণ্ড মাহিনায় আরম্ভ! সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ! জ্যাকের চিত্ত উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। মাতুর নিকট হইতে অজানা দেশের কত বিচিত্র কাহিনী সে শুনিয়াছিল। শৈশবে দুই চারিটা রূপকথায় কোন্‌ পরীর দেশের সুমধুর স্বপ্নের কাহিনী শুনিয়া কি মোহে তাহার চিত্ত মাতিয়া উঠিত, আজ জ্যাকের তাহাই মনে পড়িল! প্রথমে জাহাজের এঞ্জিনে কয়লা দিবার কাজ করিতে হইবে—তাহাতে কি আসিয়া যায়? পরিশ্রম এখানকার অপেক্ষা লঘু হইবে ত! উন্নতির অশাও আছে!

চারি বৎসর পরে একদিন প্রভাতে মাদাম রুডিকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রুডিকের সহিত জ্যাক ইদ্রে পরিত্যাগ করিল। সেদিনকার প্রভাত কি সুন্দর স্নিগ্ধভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল!

ছোট ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া জ্যাক

চারিধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া ষ্টীমারের বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমেই তাহার বিস্তারিত দেহ চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে। বায়ু নির্ম্মল, জল পরিষ্কার, আকাশ রৌদ্র রঞ্জিত! দূরে তীরপ্রান্তে বৃক্ষগুলার উচ্চতা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া একটা দীর্ঘ শ্যামল শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে। মাঝে মাঝে কর্ষিত ক্ষেত্রের পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন জলাভূমি। কোথাও নদীর তীরে সারি সারি মিলের চিমনি হইতে ঘনকৃষ্ণ ধূম নির্গত হইয়া এক দিক্‌কার আকাশটাকে মসী-নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। বায়োস্কোপের ছবির মত একটির পর আর একটি বিচিত্র দৃশ্য আসিয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি-সাধন করিতেছে। নদী ছাড়িয়া ষ্টীমার ক্রমে সাগর-সঙ্গমে আসিয়া পড়িল। তরঙ্গের এ কি উদ্দাম উন্মাদ নৃত্য! দুরন্ত শিশুর মত বায়ু সহর্ষে সে নৃত্যলীলায় যোগ দিয়াছে! জল লইয়া সে মহানন্দে লোফালুফি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জ্যাক পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখে নাই। জল, জল! চারিধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, অনন্ত অসীম পারাবার! তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে—কি বিপুল হর্ষ ঠিকরিয়া উঠিতেছে! ভ্রমণের নেশা জ্যাককে বিভোর উন্মাদ করিয়া তুলিল।

ক্রমে অদূরে দক্ষিণে পর্ব্বতের ক্রোড়ে সেন্ট নাজারের গৃহচূড়া ফুটিয়া উঠিল। অগণিত মাস্তুলশির! মনে হইতেছিল, কে যেন আকাশের গায় অজস্র কালির রেখা টানিয়া রাখিয়াছে। ষ্টীমার আসিয়া একটা জেটিতে লাগিল। জেটির নিকট আশেপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল। এক একটা যেন বিরাট দুর্গ, যেমন সুন্দর, তেমনই সজ্জিত।

রুডিক ও জ্যাক জেটিতে অবতরণ করিল। সেখানে উভয়ে শুনিল, সিড্‌নাস জাহাজ সেই দিনই দুই তিন ঘণ্টা পরে জেটি ছাড়িবে। জ্যাককে লইয়া রুডিক ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। জ্যাককে দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার কহিল, "ছোকরাটীর স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, বোধ হচ্ছে, রোগা দেখছি।"

রুডিক কহিল, "সম্প্রতি জ্বর হয়েছিল। জাহাজে থাকতে থাকতেই সেরে যাবে। সমুদ্রের হাওয়ায় স্বাস্থ্য ভালও হবে।"

"বেশ, বেশী কথা কবার সময় নাই, রুডিক! মাহিনার সম্বন্ধে কথা হয়ে গেছে ত? আপাততঃ পাঁচ শিলিং। আর কাজ—"

"হাঁ, সে সব কথা আমি বলেছি।"

"বেশ, ছোকরার নাম কি?"

"জ্যাক!"

জ্যাককে জাহাজে রাখিয়া রুডিক বিদায় গ্রহণ করিল। জাহাজ দেখিয়া জ্যাক বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কি, এ ব্যাপার! অসংখ্য লোকজন - সকলেই দারুণ ব্যস্ত। কলকব্জার সংখ্যা নাই। কি, এ!

জ্যাককে সঙ্গে লইয়া ইঞ্জিনিয়ার বহু সোপান অতিক্রম করিয়া জাহাজের নিম্নতলে এঞ্জিনকক্ষে আসিল, একটা কৃষ্ণগহ্বর দেখাইয়া কহিল, "এখানে কয়লা আছে। এটা বয়লার, এতে কয়লা জোগাতে হবে, তোমায়। এই তোমার কাজ।"

বয়লার! জ্যাক চাহিয়া দেখিল, এ যেন একটা সুদীর্ঘ অগ্নির হ্রদ। অনলের

লেলিহান রসনা, ভীষণ দৈত্য-রসনারই মত লক্ লক্ করিতেছে! সেখানে যাহারা কাজ করিতেছে,—তাহাদিগের মুখ, নগ্ন বক্ষ ও পরিচ্ছদ কয়লার গুঁড়ায় বিকট কালো! দেখিয়া মনে হয়, ইহারা যেন একটা ভীষণ প্রলয় উদ্যোগের চেষ্টায় এই নরকের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র লাগাইয়া দিয়াছে।

সর্দ্দারকে ডাকিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া দিল, "এই ছোকরা তোমার এখানে কাজ করবে—এর নাম, জ্যাক!"

সর্দ্দার কহিল, "খুব সময়ে এসেছে—কয়লা দেবার জন্য একজন লোক এখনি চাই, আমাদের। এস, জ্যাক!"

জ্যাক কাজে লাগিয়া গেল। বড় খোন্তার সাহায্যে ভস্মস্তূপের সহিত দগ্ধ কয়লার রাশি বয়লার হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে; পরে ঝোড়ায় বহিয়া, উপরে ডেকে উঠাইয়া আনিয়া, সেখান হইতে সাগর বক্ষে তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে। এই কাজ! কাজটী কঠিন। ঝোড়ায় বোঝাই যাহা দেওয়া হয়, তাহা রীতিমত ভারী, সোপান-শ্রেণীও দীর্ঘ এবং সরু। তদ্ভিন্ন উপরকার মুক্ত শীতল বায়ু ছাড়িয়া এই অন্ধকূপে বদ্ধ উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে নামিয়া আসিবার সময় নিশ্বাস রোধ হইয়া আসে। এক বার, দুই বার জ্যাক ঝোড়া বহিল। তৃতীয় বার তাহার পা আর চলিতে চাহে না। ঝোড়া তুলিতে না পারিয়া সে ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস সজোরে বহিতেছে। একজন সহকর্ম্মী আসিয়া কহিল, "নাও, একটু ব্রাণ্ডি খাও দেখি—"

জ্যাক কহিল, "আমি ব্রাণ্ডি খাই না।"

"খাও না? তবেই এখানে কাজ করেছ, তুমি! এ পরিশ্রম সহ্য হবে, কি করে, তবে? কখনও খাও না?"

"না।" জ্যাকের পেশীগুলা একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। চেষ্টা করিয়া কোন মতে সে কয়লার ঝোড়া পৃষ্ঠে তুলিয়া উঠিল।

ডেকের শোভা তখন পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র বেশধারী যাত্রীর দল সমাগত হইয়াছে। তাহাদিগের আনন্দ কোলাহলে ডেক মুখরিত। জ্যাকের মনে হইল, এই প্রকাণ্ড জাহাজ যেন একটা ভূখণ্ড,—কত দেশের কত জাতির লোক এখানে একত্র আসিয়া মিলিয়াছে। কাহারও মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, কাহারও বা আসন্ন বিদায়-দুঃখে বিষণ্ণ, মলিন।

জ্যাক তন্দ্রাবিষ্টের মত শূন্য ঝোড়া হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মুখ দিয়া এক নারী সুন্দর পরিচ্ছদ ভূষিত এক বালকের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। দেখিয়া জ্যাকের এক অতীত দিনের কথা মনে পড়িল,—যখন সে মাতার হাত ধরিয়া নির্ম্মল প্রফুল্ল চিত্তে এখানে ওখানে বেড়াইতে পাইত! নারীটি যেন তাহার মাতারই ছায়া, আর এই বালক সেই অতীত দিনের সজ্জিত সুন্দর জ্যাক! বালকের পরিচ্ছদ জ্যাকের গায় লাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া নারী বালককে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিল, "দেখে চলতে পারিসনে! এখনি খালাসিটার গায়ের সমস্ত কয়লা পোষাকে লাগিয়েছিলি—"

মুহূর্ত্তে জ্যাকের চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিমেষে সে দেখিল, তাহার স্থান কোথায়! তাহার স্পর্শও আজ এমন অবজ্ঞার, এত হেয়! তা ধিক এ হীন জীবনে!

জাহাজের কাপ্তেন হাঁকিয়া উঠিল, “দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখছ, হে ছোকরা? যাও, নিজের কাজে যাও।”

জ্যাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে আপনার কাজে নীচে নামিয়া গেল। সেই আবর্জ্জনাময় অনলকুণ্ডই এক্ষণে তাহার যোগ্য স্থান।

জ্যাকের জীবন-ইতিহাসে এ এক নূতন পৃষ্ঠা আজ উন্মোচিত হইল। কালিঝুলিমাথা সঙ্গীদিগের সহিত কালিঝুলি মাথিয়া এই অনলগহ্বরে বসিয়া তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে! উপায়ান্তরই বা কি? মিছা দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই! মনে শক্তি আনিয়া জ্যাক কাজ করিতে লাগিল। কাজ করিতে করিতে তাহার মনে হইত, যেন সে অন্ধ বধির হইয়া গিয়াছে, তাহার জীবনীশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে, শুধু একটা যন্ত্রের মত দম খাইয়া সে কাজ করিয়া চলিয়াছে! অপরে যাহা করে, সে তাহা দেখে এবং দেখিয়া সেইরূপই কাজ করে! পরিশ্রান্ত হইলে সকলে একটা নলের ধারে গিয়া সবলে নলটা টিপিয়া ধরে এবং উপর হইতে বাহিরের মুক্ত বায়ুর একটা ঝলক আসে, সেইটুকু পরম পরিতৃপ্তির সহিত সকলে উপভোগ করে! সেও সেইরূপ করিত! আঃ, কি সুন্দর! সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া যায়! পরে, ব্রাণ্ডি! একটু পান না করিলে চলে না, সত্যই ক্লান্তি ঘুচে না। অগত্যা জ্যাককে ব্রাণ্ডি পান করিতে হইল। পান করিয়া সে যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিত।

এই ঘনান্ধকারময় জীবনে আলোকের ক্ষুদ্র একটি বিন্দু মাঝে মাঝে তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিত। সে তাহার মাতার চিন্তা। মাতাকে ইদানীং সে দেবীর মত আপনার হৃদয়মন্দিরে ভক্তির সহিত একান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করিত! মাতাকে সুখী করিতে হইবে—ইহা ভাবিয়াই জ্যাক আপনার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্যই করিত না। মাতার দুঃখ ঘুচাইতে পারে যদি সে, তবে তাহা কি পরম সুখ!

বন্দরে জাহাজ থামিলেই জ্যাক মাতার একখানি করিয়া পত্র পাইত! অমনই তাহার সকল শ্রান্তি ঘুচিয়া যাইত। জ্যাকের পত্র এক্ষণে সুদূর ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইদা প্রায়ই অনুযোগ করিত। কিন্তু জ্যাক সত্যই অবসর পাইত না। ইদার পত্র আর্জেন্তঁর সংবাদেই পূর্ণ থাকিত। ইদা এতিঁয়ো ছাড়িয়া পারিতে গৃহ লইয়াছে। পারিতে বাস করিবার প্রয়োজনও হইয়াছে। মরোভঁা প্রভৃতির সাহায্যে একটি নূতন সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মরোভঁা প্রভৃতি তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। তদ্ভিন্ন, ইদা লিখিয়াছে, “এতদিনে দেশের একটি গুরুতর অভাব মোচন হল। বন্ধুবান্ধবদের অত্যন্ত আগ্রহে আর্জেন্তঁ একখানা মাসিকপত্র সম্পাদন করতে আরম্ভ করছেন। পত্রখানা দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ থাকবে। নূতন প্রতিভাশালী লেখকদের উৎসাহ দেওয়াই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সব বিখ্যাত মাসিক পত্র আছে, তাদের অহঙ্কার বড় বেশী, আর তা ছাড়া সে সব সম্পাদকেরা এমন পরশ্রীকাতর যে নূতন লেখকদের কোনরকমে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাদের দমিয়ে দেবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করছে। এতে কবিরও একটা

উপকার হবে, তাঁর লেখা এবার লোকে পড়বে, চিনবে! কি অমূল্য সম্পদ তিনি সাহিত্যে দান করছেন, এবার তারা বুঝবে! আমিও এ বিষয়ে যতটুকু পারি তাঁকে সাহায্য কচ্ছি। মরোভাঁ বেশ একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি এখন "ফষ্টের কন্যা" নাটকখানা নকল কচ্ছি। কাগজ বেরুলেই তোমায় পাঠাব। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি—বড় দেখতে ইচ্ছা হয়। সুবিধামত তোমার ছবি তুলিয়ে একখানা আমায় শীঘ্র পাঠিও—তা দেখেও আমার প্রাণ কতক ঠাণ্ডা হবে।"

ইহার কয়েকদিন পরে জাহাজ যখন হাভানায় আসিয়া নোঙর ফেলিল, তখন পোষ্টাফিস হইতে জ্যাক একটা প্রকাণ্ড প্যাকেট পাইল। মোড়ক খুলিয়া জ্যাক দেখিল, একখানি দীর্ঘাকৃতি গ্রন্থ,—আর্জেন্তঁর সম্পাদিত মাসিকপত্রিকার প্রথম সংখ্যা। লেখা আছে,—

ভবিষ্যৎ জাতির আলোচনা

মাসিক পত্র

কবি দি' আর্জেন্তঁ সম্পাদিত।

স্থচী

বিষয়	লেখক
আমরা যাহা আছি, এবং যাহা হইব	সম্পাদক
ফষ্টের কন্যা—নাটক—প্রস্তাবনা	কবি আর্জেন্তঁ
উপনিবেশে শিক্ষাবিস্তার	এবরিস্তিঁ মরোভাঁ
ভবিষ্যৎযুগের কারিগর	... লাবাসাঁদর
পুষ্প-সুরভির সাহায্যে রোগ-চিকিৎসা	ডাক্তার হারজ্
অপেরা হাউসের ম্যানেজারের প্রতি একখানি পত্র	... এল্।"

জ্যাক একবার পৃষ্ঠাগুলা উল্টাইয়া গেল। পড়িয়া সে কিছু বুঝিল না। কতকগুলা দুর্ব্বোধ্য কথার সমষ্টিমাত্র। কালির অক্ষরে কে যেন হেঁয়ালির জাল বুনিয়া রাখিয়াছে! কভারটি বেশ রঙ্গিন কালিতে মনোজ্ঞভাবে ছাপা হইয়াছে। স্থচীতে লেখকগণের নাম পড়িয়া রোষে তাহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দারুণ অভিশম্পাতে লেখকগুলাকে অভিশপ্ত করিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড সব, আমার জীবনটাকে ক'জনে মিলে একেবারে নষ্ট করে দিলে!" কিন্তু এ অভিশম্পাতে ফল কি? তাহাদিগের এতটুকু ক্ষতি হইবে না—যন্ত্রণায় তাহারই বক্ষের অস্থিপঞ্জরগুলা শুধু চূর্ণ হইয়া যাইবে! মাসিকপত্রখানা ছিঁড়িয়া পাকাইয়া সজোরে সে জলে ফেলিয়া দিল।

যত দিন যাইতে লাগিল, আপনাকে যতই নিরুপায় অসহায় বলিয়া জ্যাক বুঝিতে পারিল, কাজের দিকে তাহার উৎসাহ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে শরীরে শক্তিও সঞ্চারিত হইতেছিল। কাজ করিতে করিতে ভবিষ্যতের একটি সুখকল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিত,—তাহার অর্থ হইয়াছে, ছোট একটি কুটিরে সে বাস করে, মাতাও এখানে আসিয়াছে,—আর,—আর একটি মুখের সুধামাখা কথায়,

উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—সে মুখ সিসিলের—!

এমনই স্বপ্নে জাহাজের সেই রুদ্ধ অন্ধকূপে একদিন যখন সে বিভোর ছিল, সহসা তখন এক প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত জাহাজ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। উপর হইতে একটা ভীতিচকিত কোলাহল নামিয়া আসিল। তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অন্ধকূপস্থ লোকগুলার কর্ণে প্রবেশ করিল। জ্যাকও তাহা শুনিল।

ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য, উদ্‌গ্রীবভাবে সকলে উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন সময় উপরে সোপানের সম্মুখে ইঞ্জিনিয়ারের বজ্রগম্ভীর বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, "খবরদার—উপরে আসবার চেষ্টা করেছ কি, এই পিস্তলের গুলিতে মাথা উড়াব।" ইঞ্জিনিয়ারের হস্তে পিস্তল।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে একজন কহিল, "কি হয়েছে?"

"একখানা মার্কিন জাহাজ আমাদের জাহাজের উপর এসে পড়েছিল। ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে গেছে—ডুবছে। শীঘ্র যাও, কসে দম দাও—তীরের দিকে যতটা পৌঁছুতে পারি! তীর বেশী দূরে নয়।"

সকলে আপন-আপন স্থানে ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে কল চলিতে লাগিল। এঞ্জিন-কক্ষ ভয়ানক হইয়া উঠিল। কয়লা, কয়লা, কয়লা দাও! আবার দাও! ক্রমে উত্তাপ অসহ্য হইল। রক্তের মত লাল আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চালাও কল, চালাও, পূরা দমে চালাও!

জ্যাক ভাবিতেছিল, মরিতে হইবে, কিন্তু এ কি মৃত্যু! আকাশ নাই, বাতাস নাই, এই রুদ্ধ অনলগহ্বরে বসিয়া কি ভীষণ অসহায় শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে! দুইধারে লৌহনির্ম্মিত সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর—আত্মহত্যা অপেক্ষাও যে এ ভীষণ, নিষ্ঠুর মৃত্যু!

সব শেষ! পম্প আর চলে না। আগুন একেবারে নিভিয়া গিয়াছে! লোকগুলার স্কন্ধদেশ অবধি জল উঠিয়াছে, জাহাজ দ্রুত জলগর্ভে নামিয়া পড়িতেছে—এমন সময় সোপানসম্মুখ হইতে ইঞ্জিনিয়ার চীৎকারস্বরে হাঁকিল, "ছুটে এস, উপরে এস, নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাও!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমার বাল্যকথা

২

আমি গতবারে আমার বাল্য জীবন সম্বন্ধে যে কালের কথা পেড়েছি সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল। তখন আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত

দূর পর্য্যন্ত যায়; এবার যতটা পারি সুদূর অতীতের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর। আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে মনে পড়ে



দ্বারিকানাথ ঠাকুর

মনে পড়ে না তা নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে তাও নয়। একদিন তিনি আমাদের তিন ভাইকে একটি ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু দিয়ে ছিলেন, দুচারটি হাসির কথা বলেছিলেন, সে ঘরটি মনে আছে আর তাঁর চেহারাও মনে পড়ে, তবে ঝাপসা ঝাপসা। তাঁর যে চেহারা আমার মনে অঙ্কিত আছে তা সে সময়কার চাক্ষুষ জ্ঞান থেকে কিম্বা তাঁর যে সকল চিত্র আমরা সচরাচর দেখতে পাই তার প্রতিচ্ছবি তা ঠিক বলা যায় না—খুব সম্ভব শেষটাই হবে।

কর্ত্তাদাদা যখন আমাদের ছেড়ে বিলাত যাত্রা করেন তখন আমরা নিতান্ত শিশু, সে সব ঘটনা কিছুই মনে নাই। এদেশে যখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসে তখন আমরা বোটের মধ্যে গঙ্গার উপরে ভাসছিলুম—ভয়ানক ঝড় তুফান উঠেছে আর বড়দাদা হেমেন্দ্র ও আমি মার কাছে ভয়ে জড় সড়,—সেই তুফানের মধ্যে আমাদের একজন ভৃত্য কর্ত্তাদাদার মৃত্যু সংবাদ এনে বাবামশায়ের হাতে দিলে। এই ঘোর দুর্য্যোগে আমরা পলতার বাগানে নেমে, সেখান থেকে গাড়ীতে উঠে কোন প্রকারে বাড়ী পৌছলুম—পৌছেই দুধ দুধ করে অস্থির। এইটুকু আমার মনে আছে। পিতার আত্মজীবনীতে ঘটনাটির বর্ণনা এইরূপ :—

আমাদের স্বরূপ খানসামা আমার হাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ আনিয়া দিয়া বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমাদের বোট ও পিনিস কালনা ছাড়াইয়া কতকদূর গিয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতার অভিমুখে ফিরিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টি ও বাতাসের কোলাহল। পলতায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। পলতায় পৌছিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এখানে আসিয়া বোট কাৎ হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে একহাত জল দাঁড়াইয়াছে, সকলি বৃষ্টির জল। যদি পলতায় গাড়ী না থাকিত তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকেও বলিতে পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতর গাড়ীর চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতিকষ্টে বাড়ী পৌছিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতর স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতালায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পৃঃ ৬০—৬১

দ্বারিকানাথ ঠাকুর দুবার ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বারে লণ্ডন নগরে ১৭৬৮ শকে (August 1846) তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও অপর একজন আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্ত্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। আমি প্রথম যখন সেই সমাধি মন্দির দেখি তখন তার নিতান্ত ভগ্নাবস্থা,

পরে তার জীর্ণসংস্কার হয়েছে। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় দুই মহাত্মা যাঁরা ঐ সুদূর পশ্চিমে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন যাতে বিলুপ্ত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, এ কথা বলা বাহুল্য।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় তাঁর অগাধ জমিদারী বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে যান তা তাঁর মনের মতন হয়নি। যে সকল কর্ম্মচারীর উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাঁদের কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কর্ত্তা নিজে তত্ত্বাবধান না করলে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়' এ এক প্রকার ধরা কথা। আমার পিতা যদি তেমন মনোযোগ করে বিষয় কর্ম্ম দেখতেন তা হলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু করতে হ'ত তাই করতেন। কর্ত্তা দাদা তাঁকে লণ্ডন থেকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখেছিলেন তার এই উদ্ধৃতাংশ থেকে দাদা মশায়ের মনোভাব কতকটা জানা যায়ঃ—

"আমার সকল বিষয় সম্পত্তি যে নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয়রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।" *

আমি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্রের উপকূল Worthing নামক বন্দরে গিয়া কিছুদিন বাস করি। উহা আমার নিকট এক প্রকার তীর্থস্থানের ন্যায় মনে হয়েছিল, কেন না ঐখানে আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একমাস কাল যাপন করেন। ১৮৪৬ মার্চ্চ মাসে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন, এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার মার্টিনের পরামর্শে রোগ শান্তির জন্যে এই বন্দরে গিয়ে অবস্থিতি করেন। তিনি যে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করি; সাহেবটির নিকট হতে দাদামহাশয়ের অনেক খবর শুনতে পাই। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইঃ—

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল তার মধ্যে দুইজন এদেশীয়

From Dwarkanath Tagore to Debendranath Tagore

London 19th May, 1846.

* It is only a source of wonder to me that all my estates are not ruined. Your time, I am sure, being more taken up in writing for the newspapers and in fighting with the missionaries than in watching over and protecting these important matters which you leave in the hands of your favourite Amlas—instead of attending to them yourself, most vigilantly.—If I was strong enough to bear the heat and climate of India, I should immediately have left London personally to superintend &c.

ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জর্ম্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোট কাকা নগেন্দ্রনাথ আর দূরসম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীনবাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোট কাকার গায়ে এক বহুমূল্য সবুজ রংএর সাল ছিল আর তাঁর জলজলে কাল'চোখের প্রশংসা সর্ব্বত্র শোনা যেত। তাঁর কথা আর বেশী কিছু জানতে পারলুম না। আমার পিতামহের শরীর শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন—তারপর আহার; তাঁর ভৃত্য হুলির তয়ের কারি-ভাত আর একটু কমলানেবুর জেলি, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি সাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন—Duchess of Inverness রোজ পত্রদ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হতে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (Tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হ'ত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফজল ভাল বাসতেন। দিনরাত তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত প্রিয়ভৃত্য হুলি তাঁর শোবার ঘরের বাহিরে শুয়ে থাকত। অনেক সময় তাঁর বিছানার পাশে মাদুরের উপর বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হতে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হতে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্টে তিনি পরলোক গমন করেন। †

কর্ত্তাদাদামশায়ের স্মৃতি যতই অস্পষ্ট

† গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত। Worthing—25th August, 1862.

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু

1st August, 1846

হোক্ না কেন, মেজকাকা ও ছোট-কাকাকে (গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ—) আমার বেশ মনে পড়ে। তাঁদের মুখশ্রী জীবন্তভাবে দেখছি, তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছি, এখনো মনে করতে পারি। বাবামশায় অনেক সময় বাড়ী থাকতেন না। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাই তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় কোন না কোনখানে ভ্রমণে বেরোতেন। যখন গঙ্গায় বেড়াতে যেতেন তখন কোন কোনবার আমাদের সঙ্গে নিতেন নইলে বাড়ীতে রেখে যেতেন। মার কাছে আমরা বেশীক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম স্থান। বল্‌তে গেলে মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন; তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম, তাঁর সঙ্গে তাস খেলতুম, তাঁর কাছ থেকে বেছে বেছে নিয়ে বই পড়তুম—হাতেমতাই, লয়লা-মজনু, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, ল্যাম্বস টেল, পল ভার্জ্জিনিয়ার অনুবাদ, এই রকম কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল। আমাদের অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চ শিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বাঙ্গলা বেশ জানতেন, তাঁরাই আমাদের এক প্রকার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিন্তু অন্য সময় যাই হোক্ ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতুম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিন ব্যাপী এক রকম জ্বর হ'ত তা ম্যালেরিয়া বলতে পারি না, কেননা তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। জ্বর হলেই ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল—প্রথম দিন তেল (Castor Oil) ও তেলের চেয়েও বিস্বাদ জলের সাগু; দ্বিতীয় দিন এলাচদানার মত সামান্য কিছু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত—সেই জ্বরের এই ক্রম ছিল। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাহনগর প্রভৃতি কাছাকাছি গঙ্গার ধারের জায়গা ও হুগলী বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি দূরের কোন কোন স্থান স্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হত। এই-ক্ষণে সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আবাস ভূমি বলে পরিত্যাজ্য। তেমনি আবার কল-কাতা এখন জলের কলে, নালানর্দ্দমার সংস্কারে ও আর আর ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নাই; এমন কি, কলকাতাই এক্ষণে পল্লীবাসীদের বায়ু পরিবর্ত্তনের ও স্বাস্থ্য অর্জ্জনের প্রধান স্থান বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষায় কলিকাতা ইউরোপেরও প্রধান প্রধান নগরীর সমকক্ষ দেখা যায়। অনেক ইংরাজে বলেন দুই একমাস ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যের হিসাবে কলিকাতার সমতুল্য স্থান ভারতবর্ষে মেলা দুষ্কর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোথা যাও

(সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী-পর্য্যটন-যাত্রার উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে)

১

ঢালিয়া অপূর্ব্ব অসংখ্য প্রপাত,
দিনান্তে লুকালে দিবসের নাথ,
ধরা হয়, ভাঙি কুন্তলের বাঁধ,
মুক্তকেশী মহাকালী!
হে রবীন্দ্র! ঢালি আলোক-তরঙ্গ,
চলিলে প্রবাসে আঁধারিয়া বঙ্গ!
হের দেখ, দেব, জননী-উৎসঙ্গ,
তোমা বিনা আজি খালি!

২

হায় এ তিমিরে নাহি তারা শশী!
চারিধারে শুধু সূচিভেদ্য মসী!
ঝলসি নয়ন, চমকিছে অসি
অসত্য-দৈত্যের করে!
চারিধারে আজি আঁধার-জলদ
গরজে গম্ভীরে! গর্জ্জে যেন নদ
পড়িয়া সমুদ্রে! —কালিয়ার হ্রদ
যেন কালিন্দীর সরে!

৩

নহে এ রজনী নয়ন-আনন্দা,
ফোটে না এ রাতে দিব্য নিশিগন্ধা!
প্রকৃতি-দুলালি সেফালীও বন্ধ্যা,—
—অপরূপ অমানিশা!
কেবলি হেথায় জম্বুক-চীৎকার,
পেচকের রব শুনি বার বার,
আলেয়ার হাসি বাড়ায় আঁধার,
পথিক হারায় দিশা!

৪

ফোটে না কুমুদী,—কোথায় কৌমুদী?
ফেনিল আঁধার উঠিছে বুদ্‌বুদি!
অন্তর-নয়ন রাখিয়াছে রুধি
মুখোসের আবরণ!
এ দীর্ঘ যামিনী কেমনে পোহাবে?
জোনাকীর পাঁতি আলো কি বিলাবে?
ঘরে নাহি বাতি! কি মেঘান্ধ রাতি!
কোথা যাও হে তপন?

৫

কি বলিব দেব? সকলি বেঠিক্!
এ যে ঝুটা চুনি, এ পান্না অলীক!
এ বঙ্গেতে নাহি একটি মাণিক,—
নাহি নাহি গৃহমণি!
শিরে ওই জ্বলে—ও নহে রতন!
মহাদেব-ভালে চাঁদের কিরণ
ও নহে, ও নহে!—বিকটবদন
বিষধর ও যে ফণী!

৬

আপন চরণ-শবদে আপনি
উঠি চমকিয়া! ঝিল্লি রণরণি
চারিধারে শুনি! বঙ্গ-গৃহমণি,
কোথা যাও দিনমণি,
তুমি ঢালিয়াছ অযুত কিরণ
সত্য ও ধর্ম্মের! কোন্ সে রতন
তব প্রভারাশি করেছে গ্রহণ?
কোন্ সূর্য্যকান্তমণি?

৭

তুমি এনেছিলে হাস্যময়ী ঊষা,
উজ্জ্বল আলোক, কুসুমের ভূষা;—
মোরা চক্ষু বুজি, করেছি শুশ্রূষা
আঁধারের, দিনমানে!
নিবিড় বসনে করেছি বন্ধন,
গান্ধারীর মত, মোরা দুনয়ন!
ঠেলেছি চরণে হীরক রতন,
না চাহিয়া তব পানে!

৮

অভিমানে খেদে তাই কি চলিলে
বঙ্গ পরিহরি? আঁধার আসিলে,
তবে নরনারী বুঝে গো নিখিলে,
রবির কি প্রয়োজন।
এখন, বুঝেছি মর্য্যাদা তোমার
ওহে দিনমণি। কি ঘোর আঁধার!
কোথা গেলে দেব? আলোক-সম্ভার
আন আন, হে তপন।

৯

ওহে গুরুদেব, মানি তব শিক্ষা,
ওহে ঋষিরাজ, জানি এই দীক্ষা।
অপূর্ব্ব সুন্দর!—কবির প্রতীক্ষা
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের তরে।
লোহিতে রঞ্জিয়া পূরব গগন,
নব মহিমায় এস গো তপন,
প্রতিভা-উষার হেরিয়া বদন,
কমল ফুটুক সরে।

১০

ক্ষম অপরাধ!—এ আঁধার আর
ভাল নাহি লাগে। বিকট চীৎকার
ওই শোনো দেব করে বার বার
অসত্যের সেনাদল!
কিরণে ভাস্বর এস দিনকর!
নবীন সৌন্দর্য্যে এস হে সুন্দর!
ছাড়ি ছদ্মবেশ, এবার পূজিব
তোমার ও দীপ্তি! কিরণে রঞ্জিব
হৃদয়ের শতদল!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

টাইটানিক কথা। আজ ত এক মাসের উপর হইয়া গেল টাইটানিক জাহাজ-ডুবি হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে কথা আর ফুরাইতেছে না। না ফুরাইবারই কথা। জাহাজ ত অনেক ডোবে, মাল মশলা আসবাব সরঞ্জাম অনেক নষ্ট হয়—এখানেও তাহা অপরিমিত ভাবে হইয়াছে—টাইটানিকের মত এত বড় জাহাজ আজ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা একখানি সচল নগরীবিশেষ, বিলাসের উপকরণ এখানিতে যেমন ছিল এমন আর আজ পর্য্যন্ত কোথাও কোনও অর্ণবপোতে নাই। আহার বিহার স্নান পানের সকল আয়োজনই ইন্দ্রের নন্দন-স্বপ্নতুল্য। সেই জন্যই কি আজ পর্য্যন্ত তাহার ধ্বংস-বিলাপের বিরাম নাই। অর্থ অনেক নাশ হইয়াছে আবার সঞ্চিত হইবে, যেমন জলযানখানি মগ্ন হইয়াছে হয়ত তদপেক্ষা বৃহত্তর, বহুবিলাস-সজ্জা-সুলভ, সুন্দরতর আর একখানি নির্ম্মিত হইবে। বিজ্ঞান কি না কল্পনা করিতে পারে, অর্থ-বল কি না সাধন করিতে পারে? বিলাপ প্রলাপ তবে সে জন্য নয়। বিজ্ঞান যাহা বিধান করিতে পারে না, অর্থ যাহা সাধন করিতে পারে না, আজিকার বিশ্বব্যাপী বিলাপ তাহারি জন্য। বিজ্ঞান যে প্রাণ দিতে পারে না, অর্থ যে প্রাণ গঠন করিতে পারে না, দুর্লভ অসংখ্য সেই মানবপ্রাণ এখানে ক্ষণিকের মধ্যে বায়ুতাড়িত প্রদীপের মত অকস্মাৎ নিভিয়া গিয়াছে, তাই এ বিশ্বব্যাপী ক্রন্দন। এই সংখ্যাতীত মানবপ্রাণ যে নষ্ট হইল, তাহা যেন নিতান্ত অবহেলায় গেল, কতকগুলি অবশ্য-করণীয় বিষয়ে অসাবধানতা এবং অনবধানতাবশতঃই এমন ঘটিয়াছে; তাই আজ আর এ কথার শেষ নাই। যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য দোষীর দণ্ডবিধান এবং ভবিষ্যতে বিপৎ-প্রতিবিধানচেষ্টায় আজ বহুল অনুসন্ধান চলিয়াছে। নিত্য নূতন বিবরণ নূতন ঘটনার আবিষ্কার আমাদের ~~অদম্য~~ কৌতূহল সঞ্জীবিত ও সঞ্চারিত করিতেছে।

আর এক কারণে এ কথা আমরা ভুলিতে পারিতেছি

না– এখানে অমর মানবাত্মার সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হইল, তাহার পবিত্র স্পর্শ সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া যেন ধন্য হইলাম। গীতায় পড়িয়াছিলাম –

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবক।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

এই মানব-আত্মাকে শস্ত্র ছেদন, অগ্নি দহন, জল ক্লিন্ন কিম্বা পবন শোষণ করিতে পারে না।

আজ দেখিলাম জড়পঞ্চভূত যথার্থই আমাদের জড়ভূতসমষ্টি মানবদেহ নাশ করিতে পারে, তাহার আত্মার ঐশী শক্তিকে কিছুতেই দমন করিতে পারে না। মাটীর দেহ তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া অজর অমর অক্ষয় আত্মা স্বর্গগামী হয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ঐশী শক্তি আছে, যখন তাহা এমনি দৈবদুর্বিপাকে প্রকাশিত হইয়া পড়ে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, তখনি আমাদের চক্ষের ও মনের সম্মুখ হইতে অন্ধকারের যবনিকা অপসারিত হইয়া যায়। আমরা যাহা দেখিতে পাই, যাহা শুনিতে পাই তাহা পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই, কখনো শুনিতে পাই নাই। মানব বিদ্যাবুদ্ধি অর্থবলের উপর নির্ভর করিয়া অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতিবিজয়ী যে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আত্মম্ভরিতায় মনে করিয়াছিল যাহার উপর বায়ুবরুণের ক্ষমতা চলিবে না,—রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি-দেবীর অঙ্গুলির ক্ষণিকস্পর্শে তাহা বুদ্বুদের ন্যায় ফাটিয়া-খসিয়া অতল জলে মিশিয়া গেল। অর্থ গেল, কৌশল গেল, বিলাস গেল, সব বিনাশ হইল তবু এ ক্রূর নিয়তি, অন্ধশক্তি মানব-মনকে পরাজিত করিতে পারিল না। মরিয়া তাহারা প্রচার করিল, আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ। ঐশ্বর্য্যলালিত লক্ষপতি দরিদ্র নারীকে রক্ষা করিলেন, আসন্নমৃত্যুতাড়িত কর্ম্মচারী অবিচলিত-ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিলেন, নববিবাহিত তরুণ স্বামী সম্মুখে দীর্ঘজীবনের সুখসম্ভোগের প্রলোভনে লুব্ধ না হইয়া তরুণী পত্নীকে বিদায় দিলেন, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সহিত অতল জলে সহমরণ বরণ করিলেন, কত পুরুষ শান্তভাবে আপন জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অসহায় নারী, শিশু ও জরাগ্রস্তকে বাঁচাইলেন। কোন বিহ্বলতা নাই, কোন বিচলিত উন্মত্ততা নাই; জাহাজের কাপ্তান ডুবিতে ডুবিতে আদেশ প্রচার করিলেন, স্বদেশগৌরব রক্ষা কর, ভুলিও না তোমরা ব্রিটনবাসী। দেখিতে পাই সকলেই যেন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যাহা করিবার করিয়াছে। এত মহত্ত্ব, এমন ধৈর্য্য, এমন প্রসন্ন স্বার্থত্যাগ এতাদৃশ শৌর্য্যের এমন আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব সমাবেশ ইহার পূর্ব্বে আর কখনো দেখা যায় নাই। তাই এ কাহিনী ভুলিতে পারিতেছি না। এ কথা এই মহত্ত্বের বিবরণ প্রতিদিন যেন আমরা স্মরণ করি, নশ্বর জীবনে অনশ্বর আত্মার উদ্দেশে প্রতিনিয়ত অবনত নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া যেন ধন্য হই।

টাইটানিক জাহাজের সহিত যখন পর্ব্বতপ্রমাণ তুষারস্তূপের সংঘর্ষ ঘটিল, তখন প্রথমে কেহই আশু অনিবার্য্য বিপদের কথা বুঝিতে পারেন নাই— যখন বুঝিলেন তখনও কয়েকজন জীবনরক্ষার চেষ্টা না করিয়া শয়নঘরের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্থানে অন্য আর কাহারও জীবনরক্ষার উপায় হয় এই তাঁহাদের মনোগত ভাব—সম্ভবতঃ ইঁহাদেরি মধ্যে একজন ছিলেন মহোদয় ষ্টেড সাহেব।

নিমজ্জনোন্মুখ টাইটানিকের আশেপাশে নৌকাগুলি প্রায় একঘণ্টাকাল প্রতীক্ষা করিয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে জাহাজখানি সত্যসত্যই ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীমতী মেয়ার নাম্নী কোনও ভদ্রমহিলা মজ্জনোন্মুখ জাহাজে স্বামীকে রাখিয়া কিছুতেই লাইফ বোটে উঠিতে সম্মত হইতেছিলেন না, তখন তাঁহার স্বামী তাঁহাদের অসহায় নয় মাসের শিশু সন্তানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। মার্ভিন নামক এক নববিবাহিত দম্পতি জাহাজে ছিলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে জাহাজ হইতে নৌকায় তুলিয়া দিবার সময়—সুন্দরি তোমার তরুণ জীবন রক্ষা হওয়াই আবশ্যক, বলিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টাইটানিকের এঞ্জিন ঘরে যাহারা কাজ করে, লাইফ বোটগুলি সমুদ্র বক্ষে নামাইয়া দিবার সময় সারিগান গাহিয়া তাহারা যাত্রীদিগের উৎকণ্ঠা নিবারণ করিয়াছিল

জাহাজের ঐক্যতান বাদ্যের ভার যাহাদের হস্তে ছিল, তাহারা প্রথম তুষারস্তূপের সংঘর্ষ সময়ে নানা রূপ হাল্কা নাচের বাজনা বাজাইয়া আরোহীদিগের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল; কিন্তু জাহাজ যখন ডুবিতে আরম্ভ করিল, মৃত্যু আসন্ন, তখন তাহারা বাজাইল "আরো কাছে প্রভু তোমার আরো কাছে।"

যে সকল স্বামী, তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া পরে বীরের মত সমুদ্র-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল তিনজন সৌভাগ্যবান পত্নীদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন।

টাইটানিকের তারের সংবাদ-দাতার ঘর জলে প্লাবিত হইবার পরও তিনি তাহা ছাড়িয়া যান নাই, ডুবিতে ডুবিতে চারিদিকে এই সংবাদ দিয়াছেন, এঞ্জিন ঘর জলে প্লাবিত, টাইটানিক ডুবিতেছে, বাঁচাও, বাচাও।

টাইটানিক হইতে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ওয়ার্ড নামে একজন ইংরাজ,- তিনি বলিয়াছেন আরও পাঁচখানা জাহাজ ডুবিবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এবার তাঁহার শিশু পুত্র টাইটানিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, সে নাকি তিনবার উপরি উপরি স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে টাইটানিক ডুবিয়া যাইবে।

যে সকল ভদ্রমহিলা রক্ষা পাইয়াছেন তাহার মধ্যে একজন বলিয়াছেন "আমার স্বামীও একখানা লাইফ-বোটে একটু জায়গা পাইয়াছিলেন কিন্তু অপর একজন মহিলাকে সে স্থান ছাড়িয়া দিয়া আমার ও শিশুকুমারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।" ধন্য তাঁহার স্বামী-গৌরব। কাপুরুষ পতিকে লইয়া চিরএয়োতি থাকা অপেক্ষা বীর স্বামীর বিধবা হওয়াও অধিক সৌভাগ্যের কথা।

এমন দারুণ বিপদকালে সম্মুখে আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও স্ত্রী-যাত্রীগণ নারীসুলভ কোন ভীতিকাতরতা কিম্বা বিহ্বলতা প্রকাশ করেন নাই। সুকুমার শিশু-বালক-বালিকারাও কোন উদ্বেগ দেখায় নাই।

সপ্তাহকাল পরে ব্রিমেন নামক জর্ম্মান জাহাজ ঐ পথে যাইবার সময় তাহার যাত্রীরা দুই ক্রোশের মধ্যে ১০০ একশত মৃতদেহ, টাইটানিকের আসবাব ভগ্ন দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্যাবিনে প্রবেশ করেন।

টাইটানিক যখন ডুবিতেছে তখন তাহার প্রধান কর্ম্মচারী কাপ্তান স্মিথ দেখিলেন একটি অসহায় শিশুকে লাইফবোটে উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই; সে ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক করিতেছে। তিনি তখনই তাহাকে এক হাতে উঠাইয়া ধরিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং অতি কষ্টে অন্য হাতে সাঁতার দিয়া গিয়া তাহাকে একখানি লাইফ্‌বোটের আরোহীদিগের জিম্মায় দিলেন; তাহারা তাঁহাকেও উঠাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি সাঁতার দিয়া আবার মজ্জনোন্মুখ জাহাজে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ জাহাজ জলের উপর ছিল ততক্ষণ তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানেই দেখা গিয়াছিল।

টাইটানিক বিপত্তি হইতে আমাদের এক শিক্ষা হইল, আত্মার মহত্ত্ব যদি থাকে, তবে বিলাস, অভ্যাস কিম্বা ঐশ্বর্য্য কিছুই তাহাকে হীন করিতে পারে না। কোটিপতি যাত্রীগণ প্রসন্ন মুখে দরিদ্রদিগকে জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অথচ দুই জন জুয়ারি, স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

ষ্টেড মহোদয়ের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন,—ষ্টেড অনেকবার বলিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের কাজ শেষ হইয়া গেলে তাঁহার আকস্মিক এবং ভয়ঙ্কর মৃত্যু হইবে। এমন ধারণা কেন তাঁহার মনে স্থান পাইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যে উপায়ে তিনি এই বার্ত্তা পাইয়াছেন তাহা যে অভ্রান্ত তাঁহার মনে এ সম্বন্ধে দ্বিধামাত্র নাই।

টাইটানিক জাহাজ-ডুবি হইতে যে সকল নাবিক বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই এই সকল দারুণ বিঘ্ন বিপদ এবং আসন্ন মৃত্যুভীতির আক্রমণে কেমন যেন বুদ্ধি ও উৎসাহহীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যখনি তাহারা কাউণ্টেস রথসের সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে তখন আর তাহাদের বাক্যস্রোত বন্ধ হয় না,—তাহাদের উৎসাহের সীমা

রথস ছিলেন, তাহাতে আরো ত্রিশ জন স্ত্রীযাত্রী ছিল। নাবিকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প—বোধ হয় জন চার পাঁচ হইবে। যে নাবিক সেই বোটের তত্ত্বাবধান করিতেছিল সে দেখিল, কাউন্টেস রথস ভিন্ন আর কেহই কর্ণধারের কাজ করিতে পারিবে না—এ ভার তাঁহাকেই দেওয়া হয়। সেই কালরাত্রিতে, দারুণ শীতে, তিনি পাঁচ ঘণ্টাকাল অবিচলিত ভাবে এই দুরূহ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

টাইটানিক জাহাজের এঞ্জিনচালকগণ জনে জনে কর্ত্তব্য পালন করিয়া কেমন বীরের মত আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা সংখ্যায় চুরাশি জন ছিল। জাহাজ যখন ফাটিয়া এঞ্জিন ঘর জলে প্লাবিত হইয়া গেল তখন পর্য্যন্তও তাহারা সেইখানে থাকিয়া জল সেঁচিয়া ফেলিতেছিল এবং অন্যান্য জল-প্রবেশের মুখ বন্ধ করিয়া জাহাজ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। জাহাজ ডুবিবার তিন মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা আপন স্থান ত্যাগ করে নাই। যাহারা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে কার্য্যে অবসর পাইয়াছিল তাহারাও স্বেচ্ছায় এ কার্য্যে যোগ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

ভারতবর্ষেও একবার এমনি আত্মবিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সে আজ ত্রয়োদশ শত বৎসরের কথা। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতাপ-প্রতিপত্তির সময়। বঙ্গোপসাগর বক্ষে একখানি অর্ণবপোত বৌদ্ধপ্রচারকগণকে লইয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ গুপ্ত শৈলে আঘাত পাইয়া তরণীখানি দুই খণ্ড হইয়া গেল—ডুবিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। অন্য একখানি তরণী সাহায্যার্থে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধ প্রচারকদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে চাহিল—কিন্তু প্রচারকগণ কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না—তাঁহারা বলিলেন সর্ব্বাগ্রে অন্য যাত্রীদিগের প্রাণ রক্ষা হউক, তাহার পর আমাদের কথা ভাবিও। যখন অন্যান্য যাত্রীগণ ভিন্ন তরণীতে আরোহী হইল তখন দেখা গেল আর স্থান নাই—বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ডুবিয়া গেলেন।

প্রাচ্য প্রতীচ্যের এই আত্মবিসর্জ্জন ব্যাপারে প্রভেদ অনেক। বৌদ্ধগণ জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং উদার বিশ্বমৈত্রীর বলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু টাইটানিকের নাবিকগণ কতদূর এরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া প্রাণ দান করিয়াছিলেন বলা কঠিন। তবে এ কথা স্থির নিশ্চয় যে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তাঁহাদের এই আত্মত্যাগের মূল কারণ—পাশ্চত্য সভ্যতার দোষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু যে সভ্যতা এমন অমূল্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সঞ্জীবিত রাখিতে পারিয়াছে তাহা যে ক্ষমতাশালী সে বিষয়ে আর দ্বিধা চলে না।

৷\উইলিয়াম ষ্টেড। টাইটানিক জাহাজ-ডুবিতে যে সকল মহৎ-প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, অনাথের সহায়, বন্ধুহীনের চিরবন্ধু উইলিয়াম ষ্টেড তাহার মধ্যে মহত্তম। আর্কিমিডিস গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর বাহিরে দাঁড়াইবার মত একটু স্থান যদি পাইতাম, তবে অনায়াসে তাহাকে টলাইতে পারিতাম। আর্কিমিডিসের জীবনের যাহা দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা মাত্র ছিল, ষ্টেড তাহা সহজে সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই এ পৃথিবীর ঊর্দ্ধে এবং বাহিরে আসন গ্রহণ করিয়া আর্কিমিডিসের কল্পনাতীত দিব্য শক্তির দ্বারা তাহাকে টলাইয়াছিলেন। পৃথিবীর সন্তান হইলেও পার্থিব মলিনতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; মর্ত্ত্যবাসী হইলেও অমৃতধামের অপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার চিত্ত নিয়ত উজ্জ্বল ছিল।

অতলান্তিক মহাসমুদ্রের অগাধ বক্ষে তাঁহার নশ্বর দেহ আজ সমাহিত, যে বীর পুরুষের মহাপ্রাণ সমুদ্রের মত সীমাহীন, উদার মমতায় তাহারি মত অপার ছিল এ সমাধি তাঁহার যোগ্য হইয়াছে।

৺ষ্টেড মহোদয়ের কোনও বন্ধু তাঁহার যে স্মৃতিচিত্র গুলি বেঙ্গলিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এগুলি একত্র করিলাম।

ষ্টেড এবং রাজমন্ত্রী মর্লি উভয়েই ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশবাসী এবং উভয়েই পুরাতন পিউরিটান প্রথায় শিক্ষিত এবং প্রতিপালিত। এই শিক্ষার প্রভাব তাঁহারা জীবনে কখনো অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যদিও উভয়ের প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য ছিল, তবুও কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়েই

তাঁহাদের সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপার, বিশেষ উন্নত কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। জীবনের গতি ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়া উভয়ের মধ্যে বহু-দূরতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তবুও কতক বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা এবং ভাব প্রকাশে ভিন্নতা ছিল না। একবার ডেলি ক্রনিকেলের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মর্লি ষ্টেডকে লিখিয়া পাঠান, "তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া এক রাত্রিতেই আমার মাথার চুল সব সাদা হইয়া গিয়াছে।" উত্তরে ষ্টেড লিখিলেন, "কৃষক সম্মিলনীর মস্তকে মুদ্গর প্রহার করিও না, হারকোর্ট এবং কাওয়েন এবং জীবন্ত বিভীষিকা স্বরূপ হইয়া নিজে স্বচ্ছন্দে ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া পরিচয় দিও না।"

মর্লি অবসর গ্রহণ করিলে ষ্টেড যখন সেই সম্পাদকীয় পদ লাভ করিলেন, তখন একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট সকলেরি অবারিত গতি ছিল, সেই বিশ্বপ্রেমিকের নিকট পৃথিবীর স্পর্শ বহন করিয়া যে কেহ উপস্থিত হইত তাহাকে সাদরে স্বাগত জানাইতেন। কতবার কতলোক তাঁহার অপরিমিত বাদান্যতা এবং ঔদার্য্যের সুবিধা গ্রহণ করিয়া প্রতারণা করিয়াছে তাহার হিসাব নাই। যেদিন প্রথম তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় সেদিনের কথা আর ভুলিব না। তাঁহার চোখের মত এমন চোখ আর কোথাও কখনো দেখি নাই, যে কেহ তাঁহার দৃষ্টির আকর্ষণী অনুভব করিয়াছে সেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে। যে চক্ষু এককালে স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল, আয়ত তীক্ষ্ণ এবং বর্ণসুষমায় মনোহর মনে হইত, তাঁহার সেই চোখই যেন মুখের সকল অংশ অধিকার করিয়া আছে—তাঁহার দৃষ্টি এমন স্বচ্ছ এমন একাগ্র, নির্ম্মল সকরুণ চক্ষু দুটিকে তাঁহার মনের বাতায়ন বলিলে ভুল হয় না। অধিকক্ষণ তাঁহার চোখে চোখে চাহিতে সঙ্কোচ হইত; মনে হইত সহসা যেন নগ্ন দেহ মন কোনও মানবের সম্মুখে তাহার বিনানুমতিতে আসিয়া পড়িয়াছি। সে দৃষ্টি শিশু চক্ষের মত নির্দ্দোষ সরলতা-ব্যঞ্জক ছিল।

তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে তিনি আপনার কিম্বা অপরের প্রতি কোনরূপ মায়া দেখাইতেন না। ১৮৮৪ সালের ৮ই জুন যেদিন পার্ণেলাইট এবং রক্ষণশীল দল একত্র হইয়া গ্লাডষ্টোনকে পরাভব করে, সেদিন যদিও রাত্রি দুইটার পর আমি শুইতে যাই তবুও সাতটা বাজিতে বাজিতে তিনি আমার ঘুম ভাঙাইয়া পেল মেল গেজেটের জন্য পার্লামেণ্টের সেই দৃশ্যের বর্ণনা লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

তিনি যে কাজ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিতেন তাঁহাকে কিছুতেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইত না। চালর্স ডিল্কে খুব ক্ষমতাশালী বক্তা, সুপণ্ডিত, মন্ত্রী সভার বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি হইলেও তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না। ষ্টেডের মনে হয় এরূপ হীনচরিত্র ব্যক্তির পার্লামেণ্টে স্থান হওয়া উচিত নয়। দেশের নেতা আদর্শচরিত্র হওয়া আবশ্যক। তাই তিনি ডিল্কেকে পার্লামেণ্ট হইতে বিদূরিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া নিরতিশয় নিষ্ঠুরভাবে তাহার জীবনের যে সকল গুপ্ত কলঙ্ক-রহস্য প্রকাশ করিলেন তাহা করিবার সাহস কিম্বা প্রবৃত্তি অতি অল্প লোকেরই হইত। যদিও তাঁহার মন করুণায় কোমল ছিল, তবু অন্যায়ের উপর তিনি বজ্রের ন্যায় রুদ্রতেজে সমুদ্যত আঘাত করিতে কাতর হইতেন না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁহার জীবনের মুলমন্ত্র ছিল। পার্ণেলের জীবনের গুপ্ত কলঙ্ক যখন প্রথম দুএক-জনের মুখে মুখে রটনা হইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ষ্টেড একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্ণেলের হীনতা প্রচার করিয়া আইরিস দলকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিব কি? তখন যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে আইয়ারল্যাণ্ডের দুর্গতির শেষ থাকিত না, পার্ণেল ভিন্ন এই অসহায় পীড়িত দেশের পক্ষে যুদ্ধ করিবার আর কেহই ছিল না। তাই ষ্টেড তখন কিছু দিন কিছু করিলেন না কিন্তু তাঁহার উদ্যত বজ্র অধিক দিন নিরস্ত ছিল না। যেদিন কলঙ্ক-কথা প্রকাশ হইয়া গেল, সেদিন ষ্টেড অন্য সকলের অপেক্ষা নিষ্ঠুর ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়া পার্ণেলকে পার্লামেণ্ট হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রচার করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আইয়ারল্যাণ্ড যদি পার্ণেলকে

ত্যাজ্যপুত্র না করে, তবে বুঝিব আইয়ারল্যাণ্ড স্বয়ং কলঙ্কদুষ্ট।

আমি ষ্টেড সম্বন্ধে এসব কথা বলিতেছি তাহার কারণ তাঁহাকে আমি সাধু মহাত্মা কিম্বা পুণ্যের অবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহি না। তিনি দোষেগুণে মানুষ ছিলেন সত্য, তবে তেমন মানুষ দুনিয়ায় দুএকজন কচিৎ দেখা যায়। দুএকটা বুঝিবার ভয়ানক ভুল সত্ত্বেও তাঁহার মত মহাপ্রাণ মানুষ বড় দুর্লভ। যৌবনের অনভিজ্ঞতায় যাহা করিয়াছিলেন পরে সে বিষয়ে তাঁহার অভিমত কি ছিল জানিতে পারি নাই, তবুও বিশ্বাস, যাহা করিয়াছিলেন তাহার জন্য পরে অনুশোচনাও করিতে ত্রুটি করেন নাই। বড়ই বিচিত্র মনে হয় যে পুরুষের প্রাণ নারীর অধিক কোমল ছিল। পৃথিবীর সুদূরতম প্রদেশবাসীর দুঃখ কষ্ট যাঁহার মনে বেদনার সহানুভূতি জাগ্রত করিত, সেই তিনি সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বিশেষের প্ররোচনায় অতি নিষ্ঠুর হইয়া দাঁড়াইতেন—ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি তাঁহার করুণাই তাঁহাকে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিত। তিনি সকলকেই দয়া করিতেন, বিশেষ নারীজাতিকে, তাঁহাদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করিত, যে তাঁহাদের জীবন নিঃসম্বল করিত, নিরাশ্রয় করিয়া পথে দাঁড় করাইত সেই সম্ভোগপরায়ণ কর্ত্তব্যবিমুখ পুরুষদিগের তিনি একেবারে যম ছিলেন। দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি প্রবলের সম্মুখে ভয়ঙ্কর করালমূর্ত্তি ধারণ করিতেন।

তাঁহার এই বিশ্বাস, এই কার্য্য চেষ্টার জন্য কোন কর্ম্মই শিরোধার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মনের অন্তরতম প্রদেশে এই বিশ্বাস সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, জীবনকে সম্পূর্ণ সুন্দর করিতে হইলে যুদ্ধ-বিমুখ হওয়া চলে না। জর্ম্মান কবি হায়েনের মত তিনিও আশা করিতেন, আর্ত্তত্রাণ চেষ্টায় সম্মুখ যুদ্ধে সংগ্রাম সঙ্গীতের উৎসাহে তাঁহার জীবনের অবসান হইবে। বিলাসী পুরুষের কুমারী বলিদান বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল- সেখানে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, দেখিতেছ কি এই ত আরম্ভ, দুর্ব্বল দুঃখীর পক্ষ অবলম্বন দোষে আমাকে বহুবার এ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

তাঁহার হৃদয়ের বল, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের বজ্রকাঠিন্যের কথা বলিয়াছি, তাঁহার শিরীষকুসুম সুকুমার হৃদয়ের এবং শিশুসুলভ সরলতার বিষয়ে দুএকটি কথা বলা আবশ্যক। দৈবঘটনার প্রতি তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল—পরলোকগততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে বাতুল বলিলেও চলে। এবিষয়ে কতবার কতজনের কপটতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তবু তাঁহার বিশ্বাস ক্ষীণ হয় নাই। স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যেমন ধ্রুব, লোকান্তর-সংবাদ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস তেমনি নিশ্চল, অন্ধের মত নিরপেক্ষ ছিল। স্ত্রীজাতির দ্বারাও তিনি যে প্রতারিত হয়েন নাই তাহা বলিতে পারি না। যে কেহ হউক না দুঃখ জানাইলেই তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন, রাজপুত রাখি-ভ্রাতার ন্যায় তাহার দুঃখ নিরাকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন। সকলেই যে অলীক দুঃখকাহিনী লইয়া আসিত তাহা নয়, তবে অনেকে এ কার্য্য করিয়াছে—প্রমাণ লইয়াও তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার ধনসম্বল অধিক ছিল না। তবুও প্রার্থী কখনো তাঁহার সম্মুখ হইতে ব্যর্থ ফিরিয়া যায় নাই। তিনি কার্য্যে এবং বাক্যে সমান উদার ছিলেন। এই শেষ যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে হাউস্-অব-কমন্সে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়, আমাদের দুজনের এমন হৃদ্যতা ছিল যে ওজন করিয়া কথা বলিবার কখনো আবশ্যকতা হইত না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি যে পরিমাণে ধর্ম্মক্ষিপ্ত তোমার পক্ষে ভাল সম্পাদক হওয়া অসম্ভব, অথচ যেরূপ উত্তমভাবে তুমি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন কর তোমার ধর্ম্মোন্মাদ যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি মুখ ভরিয়া হাসিলেন। শেষাশেষি তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত বার্দ্ধক্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে—তাঁহার নিয়ত অস্থিরতা এবং অবাধ বাক্যস্রোত যেন মন্দ হইয়া আসিতেছিল। তিনি কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেন না, বলিতেন যুবাজনোচিত সামর্থ্যে তাঁহার শরীর ও মন পরিপূর্ণ।

যুবকের ন্যায় উৎসাহিত হৃদয়েই তিনি এই নূতন অপূর্ব্বগঠন পর্ব্বতপ্রমাণ অর্ণবপোতের প্রথম সমুদ্রযাত্রা বর্ণন করিবার জন্যই যাত্রী হইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল যাত্রা শেষে যে ধর্ম্ম যে শান্তি প্রচারের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার কার্য্যগতি আরো অগ্রসর করিয়া দিবেন। ভবিষ্যতের কথা হইলে আমি যেমন স্বভাবতঃ বিঘ্ন বিপদের কথা বলিতাম তিনি তেমনিই স্বভাবতঃ আশা, সফলতা এবং প্রসন্ন ভাগ্যে বিশ্বাস করিতেন।

বন্ধু ষ্টেড উদার সরল হৃদয় স্নেহপরায়ণ ভাবোন্মত্ত ছিলেন, কখনো কখনো বিপথগামী হইলেও চিরদিন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বুদ্ধিচালিত হইয়াই কার্য্য করিতেন। আত্মবিস্মৃতি, পরহিতসাধন, অতুলনীয় নির্ভীকতা, অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রাণতা এবং পরদুঃখকাতরতায় তিনি মহাকাণ্ডারী যীশুখৃষ্টের প্রেমিক ভক্ত শিষ্য এবং খৃষ্টান নামের যথার্থ অধিকারী ছিলেন।

সমালোচনা

করঙ্ক। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী। ১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। 'করঙ্ক' সুধীন্দ্র বাবুর নব-প্রকাশিত ছোট গল্পের বহি। ইহাতে সর্ব্বসমেত আটটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির অধিকাংশই করুণ রসাত্মক। ছোট গল্প রচনায় সুধীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব অপরিসীম। সে কৃতিত্বের পরিচয় বর্ত্তমান গ্রন্থে অক্ষুণ্ণ আছে। করুণরসের অবতারণায় সুধীন্দ্রবাবু সিদ্ধহস্ত। ছোট একটি কথায়, ছোট একটি ইঙ্গিতে, যেন ভাবের বন্যা বহিয়া যায়। "মিতে," "কাসিমের মুরগী," "কুকুরের মূল্য", "ঋণশোধ," "স্নেহের নির্ঝর" প্রভৃতি সকল গল্পগুলিই আখ্যানে, ভাষায় অপূর্ব্ব মনোরম। গল্পগুলি বেশ একটি শান্তশ্রীতে মণ্ডিত, কোথাও এতটুকু অস্বাভাবিকতা বা অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না, কোথাও একটি অনাবশ্যক শব্দের ব্যবহার নাই। "বিজয় বাবুর বদান্যতা" গল্পটিতে করুণ ও হাস্যরস গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের মতই মনোহারীভাবে পাশাপাশি মিশিয়া গিয়াছে। 'করঙ্ক' যে আপামর-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিবে, সে বিষয়ে আমাদিগের এতটুকু সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ কভার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট, আর্টিষ্টিক প্রেসের আর্টিষ্টিক নিদর্শন।

বৈতানিক। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী। ১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি কবিতা গ্রন্থ। সনেট, গান প্রভৃতি লইয়া ৩২টি রচনা আছে। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভাবে ছন্দে তেজ আছে, সুর আছে। কবির বীণা সর্ব্বত্রই মিঠা বাজিয়াছে, কোথাও বেসুরা হয় নাই। কবিতাগুলি কোথাও প্রেমের স্পর্শে স্বপ্নময়, সুমধুর, কোথাও ভগবানের নামমাহাত্ম্যে গম্ভীর মহিমাময়, আবার কোথাও বা স্বদেশ-প্রেম ও স্নেহের স্পর্শে পরম উজ্জ্বল, বিচিত্র। 'গৃহলক্ষ্মী,' 'নারী,' 'দাসী' প্রভৃতি কবিতাগুলি বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে পরম গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



পল্লীপথে

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩১৯ ৪র্থ সংখ্যা

আমার বাল্যকথা

(৩)

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটকাকা)

ছোটকাকার কাছে আমরা অনেক সময় যেতুম। তিনি গৌরবর্ণ তেজীয়ান্ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হত, আমরা তাঁকে ভয় করে চলতুম। তাঁর বৈঠকখানায় নানা রকম লোভনীয় জিনিস ছড়ান থাকত। একবার মনে আছে ছোট ছোট ছর্‌রা ভরা মকমলের কাপড় মোড়া একরকম সর্পাকৃতি কাগজ চাপা তাঁর লেখবার টেবিলে ছিল, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। কাপড় ঢাকার ছিদ্র দিয়ে সীসার গুলিগুলা ঝরে পড়ছে, তাই এক মুঠা কুড়িয়ে নিয়েছিলুম। একটু পরে আমায় তলব পড়ল, চোরামাল শুদ্ধ ধরা পড়ি আর কি! তখন কি করি, সীসার গুচ্ছ মুখে পুরে রেখে ছোটকাকার কাছে হাজির। তার কিয়দংশ গলাধঃকরণ হয়েছিল কি না মনে নাই আর গেলবার দরুণ পরে কোন অসুখ ভোগ করতে হয়েছিল কি না বলতে পারি না।

ছোটকাকা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন তা দেখে বোধ হয় তিনি সে দেশে বেশ আমোদে ছিলেন আর তাঁর প্রবাস কালে ইংলণ্ড স্কটলণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করে ব্যাড়াতেন। তাঁর রূপ লাবণ্যের দরুণ তিনি সাহেব বিবিদের, বিশেষত বিবিদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে স্বদেশে সহজে ফিরতে চাইতেন না। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিস্‌তুত ভাই চন্দ্রবাবু তাঁকে দেশে ফেরবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পত্র লেখেন তাতে তাঁকে এইরূপে লোভ দেখাচ্ছেন :—

"আগামী মাসে অক্সফোর্ড কেম্বিজের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা বিধান উদ্দেশে কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তাহাতে তুমি প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছামত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বিদ্যার্থীগণ কৃতিত্ব লাভ করিলে উপাধি ও সম্মানের বিবিধ চিহ্ন সকল লাভ করিতে পারিবে।

অতএব বাড়ী ফিরিলে তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিবার যে আপত্তি তার গুরুত্ব অনুভব করিবে না।” (21st September 1846.)

ছোটকাকা সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক’রে এইরূপ লিখছেন—

“তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার এখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা নাই, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না। তুমি জান, আমি সাধারণতঃ ইংরাজ জাতিকে ভাল বাসিনা, তাহাদের চাল-চলন দুচক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাদের সকল বিষয়ে বণিকবৃত্তি আমি মনের সহিত ঘৃণা করি, তথাপি একটা কি আছে যাহা এই সকল বিরুদ্ধভাবকে খণ্ডন করিয়া দিতেছে; ইংলণ্ড ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে কোন মতেই আমার মন উঠিতেছে না।”

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হল, যে দিন ফিরে এলেন আমার বেশ মনে পড়ে, ছেলেদের সে মহোৎসবের দিন কেননা তিনি আসবার সময় তাদের জন্যে নানা রকম খ্যালনা নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হল, আমি একটা কলের ময়ূর পেয়েছিলুম।



নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটকাকার কাছে অনেকানেক লোক যাওয়া আসা করত—রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র—পুরাকালের সব খ্যাতনামা পুরুষ—এ সবার মধ্যে তাঁর দুজন মুসলমান বন্ধু ছিল, বজলুল করীম ও জলুল রহীম। তাঁদের নিয়ে অনেক আমোদ প্রমোদ হত, কখনও বা ইংরাজি মোগলাই মিশ্রিত খানা দেওয়া হত। তার

ভাগ আমরাও কিছু কিছু পেতুম। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে তখনকার কালে হিন্দু মুসলমানে যেমন হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল এখন তা দুর্লভ-দর্শন।

বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরে ছোট-কাকা দেখলেন আমাদের কার ঠাকুর কোম্পানি হাউস তখনো বেশ চল্‌ছে। ভিতরে ভিতরে তার যে অসার টলমল অবস্থা তা বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষে সেই হাউস ফেল হওয়াতে তিনি অশেষ ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। এই বিষয় পিতার জীবনীতে এইরূপে বর্ণিত আছে :—

"এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আমার এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়, এমন কি, ১০০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর একজনের আনুকূল্য করিতেন—তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয়ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল।" (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

তিনি উল্লিখিত নানা কারণে বিলাত থেকে ফিরে এসে অবধি একটা উচ্চ পদের সরকারী চাকরীর সন্ধানে ফিরছিলেন। যে সকল বড় বড় সাহেব তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে পত্র লেখেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি ৬ই মার্চ্চ ১৮৫৪ সালে কষ্টম্‌স কলেক্টরের সহকারী রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে পদ তাঁকে অধিক দিন ভোগ করতে হয় নাই। ১৮৫৬ জুন মাসে তিনি ইস্তফা পত্র দিয়ে তাঁর কলেক্টর Young সাহেবকে লিখছেন—

"আজ আমার অবকাশের দিন সমাপ্ত হইল। দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি গত তিন মাস ধরিয়া আমার বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট মিটাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাতে যদিও অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হইতে পারি নাই। আরো তিন সপ্তাহ কাল সময় না পাইলে এই সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া আমার কর্ম্মে ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। আপনি আমার পুনঃ পুন ছুটির আবেদন গ্রাহ্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন; পুনরায় ছুটির দরখাস্ত (একদিনের জন্য ও) করিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করা আমি নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করি, অতএব একান্ত বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার এই চাকরীর ইস্তফা-পত্র প্রেরণ করিতেছি। যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেণ্টের এই চাকরী স্বীকার করি তখন তাহার বেতনের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিলনা কিন্তু এইক্ষণে আমার যেরূপ বৈষয়িক অবস্থা এখন তাহাতে আমার

ঔদাসীন্য করা ঠিক হয় না। আমার এই যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিজের দোষে নয় কিন্তু আমার স্বর্গগত ভ্রাতার ঋণভার আমার উপরে পড়িবার দরুণ আমি একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় সেই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন।"

Young সাহেব এই পত্রের উত্তরে লেখেন—"তুমি লিখিতেছ যে তিন সপ্তাহ সময় পাইলে তুমি তোমার পাওনাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইতে পার। তা যদি হয় তাহা হইলে আমার পরামর্শ এই যে একেবারে ইস্তফা না দিয়া তুমি আর এক মাসের অবকাশ প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত কর, উত্তর পাইলে যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবে। আপাতত আমি তোমার এই ইস্তফা-পত্র গবর্ণমেণ্টে না পাঠাইয়া আগামী কল্য পর্য্যন্ত তোমাকে মনঃস্থির করিবার সময় দিতেছি।"

কলেক্টর সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ছোট কাকা কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কয়েক মাস্ পরেই দেখা যায় তাঁর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও স্বাস্থ্যলাভ-মানসে তিনি বোম্বাই নাসিক ইন্দোর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হন।

কলিকাতা হতে বিদায় নিয়ে তিনি বিদেশ থেকে তাঁর বন্ধু বান্ধবদের যে সকল পত্র লিখেছিলেন তা হতে তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তটাই পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এই :—

বোম্বাই, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

তিনি সমুদ্র-পথ দিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই পৌঁছিয়া Elephanta ও সালসেটের গুহামন্দির ও অন্যান্য হিন্দুকীর্ত্তি দর্শন করিয়া তলঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পিম্পলগামে উপনীত হন।

পিম্পলগাম, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬।

"মারওয়াড় প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতেছি—এই দেশ রাজপুতবীর ও বীরাঙ্গনা-গণের রঙ্গভূমি কিন্তু হায়! সে সব কীর্ত্তি কোথায়? যাইতে যাইতে মনে হইতেছে "Tis Greece but living Greece no more"—গ্রীস বটে কিন্তু সে জীবন্ত ভাব তাহাতে নাই।

পরে তথা হইতে নাসিকে উত্তীর্ণ হইলাম, যাহা শিবাজীর অযোগ্য প্রতিনিধি বাজী-রাওয়ের বাসস্থান। সঙ্গে কোন ভৃত্য নাই, বন্ধু নাই, মনে অশান্তি, শরীর অপটু এই অবস্থায় ডাঙ্গা পথ দিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই।"

মালেগাম, ২১এ ডিসেম্বর

"চান্দোর দেখিলাম। অত্যুচ্চ পর্ব্বত পরিবৃত মনোজ্ঞ দুর্গম স্থান। যে সকল প্রদেশ মরাঠী ও পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্রিটিষ সৈন্যের গোলা-গুলি বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা অন্যতর, ইহার গাত্রে সেই ক্ষতচিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান। রাজবাটী (রঙ্গমহল) দর্শন করিলাম। ইহার ভিতর প্রথম হোল-কারের গদী রক্ষিত আছে, একটি সামান্য কঠোর গাদী, সেই অশ্বারোহী বীর সেনার যোগ্য আসন বটে। চান্দোর ত্যাগ করিয়া

দিনের আলো থাকিতে থাকিতে তলঘাটের শোভা সন্দর্শন করিলাম। চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী—কি চমৎকার দৃশ্য! এই পর্ব্বতমালার উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তার নির্ম্মাণ কৌশল কি আর বর্ণন করিব—যে কারিগরের ইহা মনঃকল্পনা তাহার প্রতিভা স্মরণ করিয়া দিতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির উপরে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঘাট হইতে নামিয়া দেখি উপত্যকাভূমির দৃশ্যও অতি মনোহর—শ্যামল শস্যক্ষেত্রে যেন মখমল বিছাইয়া দিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ কুঞ্জবন আবার বিহঙ্গদলের মধুর গানে প্রতিধ্বনিত—এ সকলি যারপর নাই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ভাই সে যাহাই হোক্, বাড়ীর দিকে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে—মনে হইতেছে আমার সেই কোণের ঘরটি পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে সেরা।"

ইন্দোর, ২৮এ ডিসেম্বর

ইন্দোর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তলঘাটের শোভা সৌন্দর্য্য পুনর্ব্বার উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন "আমি Alps পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছি তাহার উপর দিয়া যে পথ কাটিয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসা-যোগ্য, তবুও এই গিরিপথের নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়। এই সকল পথ দিয়া ভ্রমণ করা অতিশয় শ্রান্তিজনক। আমি বাল্যকাল হইতে ভ্রমণে অভ্যস্ত না হইলে এতটা কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম না।"

তাঁর আর এক বন্ধুকে লিখিতেছেন—"আমি ইন্দোর সহর দেখিলাম। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই। রাস্তা ঘাট পাথরে বাঁধান, ভাল স্প্রিঙের গাড়ীর পক্ষে একেবারে অচল। গিঞ্জী সহর, বাজার যেমন আমাদের বড় বাজার, সরু সরু গলী, ময়লা ধূলিময়, ঠিক আমাদেরই পুণ্য নগরীর অনুরূপ। রাজ-প্রাসাদে গিয়া সমস্ত দেখিলাম; ছোট ছোট ঘর, সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, ঠিক যেন একটি কয়েদ-খানা। দেখিবার মধ্যে সুবিখ্যাত অহল্যা-বাইয়ের সমাধি মন্দির, প্রস্তর নির্ম্মিত, নানা মূর্ত্তি খোদিত, ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক সুন্দর ও প্রশংসনীয়। আমার ভ্রমণকালে আমার দেশীয় লোকেরা আমাকে যে আদর যত্ন করিয়াছে তাহা কখনও ভুলিব না।" (To Jadub Kissen Sing)

আগ্রা, ৫ই জানুয়ারি ১৮৫৭

"ইন্দোর হইতে যখন তোমাকে পত্র লিখি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আগ্রায় আসিয়া আমি এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িব। আসল কথা হচ্ছে, এ সকল স্থানে ব্যাড়াইবার আরাম নাই, রাস্তা ঘাট দুর্গম, গাড়ীর ঝাঁকানি, আবহাওয়াও পীড়াদায়ক। এই শরীর লইয়া কোন রকমে যে আগ্রায় পৌছিয়াছি, হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এই আশ্চর্য্য! সাত দিন সর্দ্দি কাশীতে শয্যাগত ছিলাম—গলার আওয়াজ বন্ধ, অস্ত্র করিতে হইল। এখন একটু ভাল হইয়াছি, কল্যই কলিকাতার অভিমুখে রওয়ানা হইব। আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিয়াছি—আমার যে এতটা পথের কষ্ট—এত অর্থব্যয় এই তাজ দর্শনে তাহা সার্থক বোধ হইতেছে।"

১৮৫৪ সালে ছোটকাকার বিবাহ হয়। যখন তিনি 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' যশো-হরের একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেন

তখন আমার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর—ঘটনাটি আমার বেশ মনে পড়ে। বিবাহের পর তাঁহার বৈলাতিক বন্ধুরা তাঁহাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন। Duke of Inverness লিখিতেছেন—"আমি ইংলণ্ডে তোমাকে অতি বালক দেখিয়াছিলাম—ইহার মধ্যে তোমাকে বিবাহিত বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না। তুমি যে আমাদের দৃষ্টান্তে এক পত্নী লইয়াই সংসার করিবার মানস করিয়াছ, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়, কেন না বহুবিবাহে গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে, নিদান আমার তাই বিশ্বাস।"

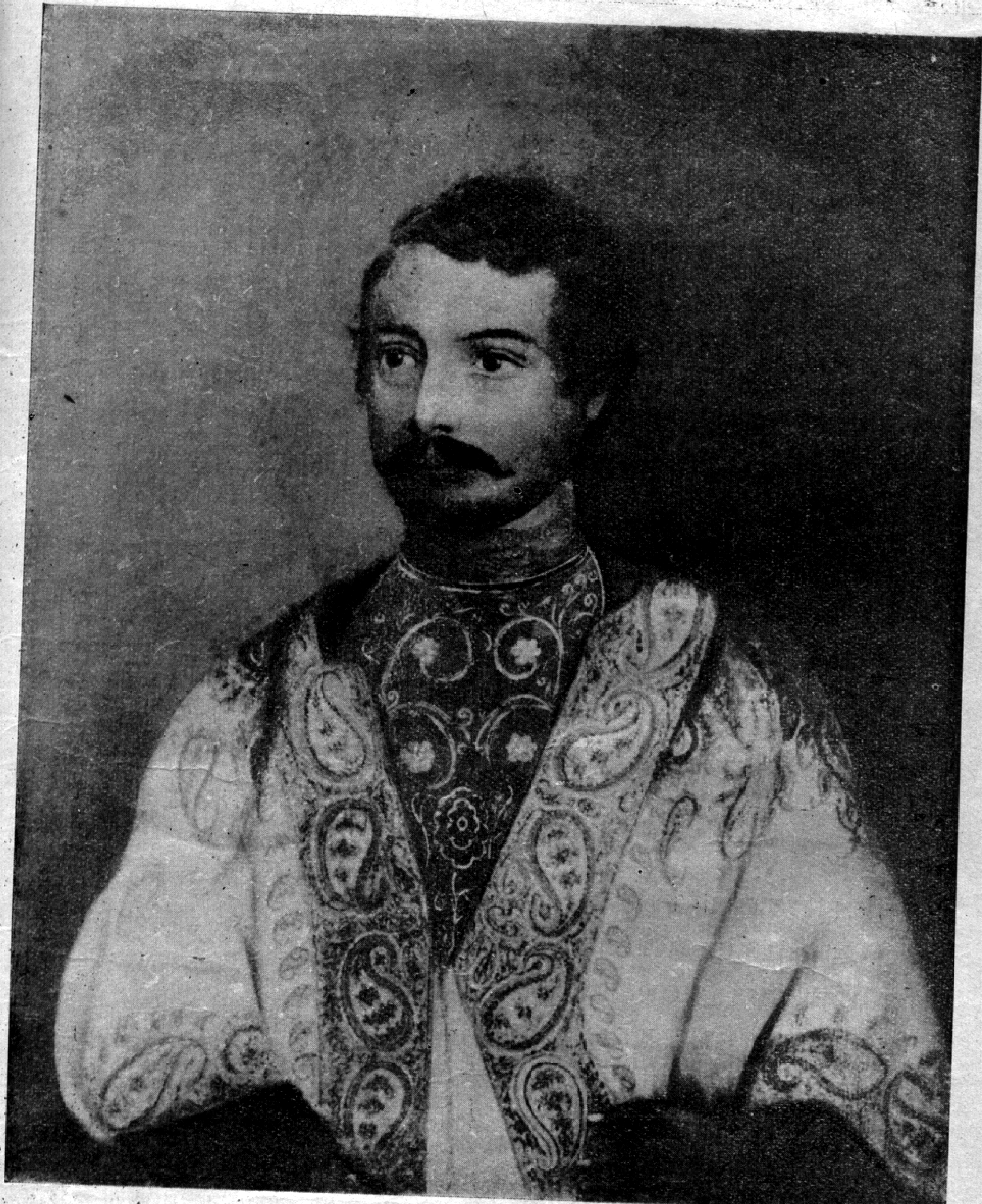
বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন ও কি কারণে পদত্যাগ করলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়েই দেশভ্রমণে বাহির হন—কিন্তু সেই ভ্রমণে তাঁর শরীর শোধরান দূরে থাক্ তিনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত রোগগ্রস্ত হইয়া বাড়ী ফিরে আসেন। এই যে তাঁকে রোগে ধরল তার হস্ত হতে তিনি আর মুক্ত হতে পারলেন না। এই জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন শরীরে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর উপর দিয়ে কত ডাক্তারী হাকিমী চিকিৎসা পরীক্ষিত হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একজন হাকিম মুক্তাচূর্ণ ঘটিত এক বহুমূল্য ঔষধ প্রস্তুত করে আনে ও তিনি সেই ঔষধ সেবন করেন কিন্তু তাহার মূল্যের অনুরূপ গুণের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। তাঁর সেই পীড়িত অবস্থায় আমি তাঁর সঙ্গে এঁড়েদহ বাগানে কিছু দিন বাস করেছিলুম, ক্রমে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি হতে লাগল। তাঁর শরীর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল অবশেষে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হলেন।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজকাকা)

মেজকাকা মহাশয় সুরসিক অমায়িক সৌখীন পুরুষ ছিলেন। যেন বিলাসিতা মূর্ত্তিমান। তাঁর সখের বাগানটি ফলে ফুলে সুশোভিত—আঙ্গুর বাতাবী নেবু পীচ প্রভৃতি বাছা বাছা ফল, আর চম্পা চামেলী মালতী, বেল জুঁই রজনীগন্ধা গোলাপ বকুল কত রকম সুগন্ধ ফুলের গাছ। একটি ছোটজাতের জুঁই ফুলের ব্যাড়া ছিল, রোজ বিকেলবেলা সেই সব জুঁই ফুল আমরা রাশি রাশি কুড়িয়ে আনতুম। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক Experiments নিয়ে আমোদ করতেন ও আমাদেরও ডেকে আমোদ দিতেন। রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রদর্শনের মধ্যে যা মনে আছে তা হচ্ছে Galvanic Battery'র প্রয়োগ, তাড়িতপ্রবাহযোগে আমার যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হত সে সহজে ভোলবার নয়। সে সব বৈজ্ঞানিক ভেল্কীবাজীতে আমাদের খুবই আমোদ হত। যেমন বিজ্ঞানে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও মেজকাকার গতিবিধি ছিল। তিনি যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি শিখেছিলুম—সে এই—

ললিত

দুখে গেল সুখনিশি প্রাণনাথ কৈ এল\
সুখের শয়ন আজু নয়নজলে ভেসে গেল।\
আকাশেরি শোভা তারা, আকাশে মিশাল তারা\
রমণীর ধ্রুবতারা সুখতারা প্রকাশিল।



গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেজকাকা "বাবুবিলাস" নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবদের মধ্যে দিননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল সেই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা। 'কামিনীকুমার' বলে তাঁর একখানি পদ্যোপাখ্যানেরও সেকালে বেশ আদর ছিল।

মেজকাকার সব দিকেই চৌকোষ বুদ্ধি ছিল। বিষয়কর্ম্মে তাঁর যে দক্ষতা মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে তাঁর কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে দীননাথ ঘোষালের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি আমাদের ভারী প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁকে হাতের কাছে পেলে তাঁর কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প আদায় না করে কিছুতেই ছাড়তুম না। তিনিও কথক ঠাকুরের মত গল্পের ঘটায় আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। রামায়ণ ও মহাভারত ছেলেবেলায় এইরূপ মুখেমুখে শুনেই আমাদের এক রকম শেখা হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগদত্তা

সমস্ত বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোধূলির হেমাভ রক্তরাগে অস্তাচলশায়িত তপনের শাসনতাম্রলিপি পশ্চিমাকাশে জলন্ত সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার ছায়া তখনও পূর্ব্বের নদীপার ছাড়িয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত হয় নাই। গ্রামের মেয়েরা আসিল, গা ধুইয়া জল লইয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল। যাহারা দল বাঁধিয়া আসিবার অবসর পায় নাই তাহারা একে একে ক্ষুণ্ণগতিতে আসিতেছে, কাজ সারিয়া আবার সেই দুপাশের সবুজ ঘাসের মধ্যে সুন্দরীর কালো চুলের মধ্যে সাদা সিঁথিটুকুর মত লাইনটানা পথটি ধরিয়া আমগাছের ছায়াস্নিগ্ধ বকুলফুলের গন্ধামোদিত পত্রখচিত পুষ্পভূষিত কাননমধ্য দিয়া

গাঙ্গুলী বাড়ীর মণীশ তাহাদের বাড়ীর সমুখ দিকটায় বেশ একটু সুদৃশ্য করিয়া ফুল বাগান রচনা করিয়াছিল। নানাজাতির লতা, ক্রোটনের বিচিত্র বর্ণখচিত পত্রাবলী আর দেশী বিদেশী ফুলগাছের মধ্যে বর্ণ ও গন্ধ অপর্য্যাপ্ত পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল। সাদা রাঙ্গা করবী জবা চাঁপা ও জুঁই গাছের ডালগুলা ফুটন্তফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেই গাছগুলা ঘিরিয়া ঘিরিয়া অনেকগুলা প্রজাপতি এবং দুটো একটা মৌমাছিও মধুচক্র রচনা করিবার লোভে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইতেছিল। এই বাগানের কোকিল কিন্তু নিতান্ত সেকেলে, সে এই সাজান বাগান ছাড়িয়া তাহার চিরদিনকার পুরাণো আমগাছটার পাতা-ঢাকা ডালের মধ্যে কালো শরীর লুকাইয়া

ফুল বাগানে বাঁধানো বেদির উপরে মণীশ বসিয়া পড়িতেছিল। সে সবে দু এক খানি মাত্র উপন্যাস পড়িয়াছে, আজও প্রথমটা লর্ড লিটনের একখানি বিখ্যাত রচনা লইয়া বসিয়াছিল, তার পর তাহা অত্যন্ত ক্লান্তিকর হইয়া পড়ায় সে উপন্যাস ছাড়িয়া কাকার পড়িবার ঘরে গিয়া অধ্যাপক বেনের (Bain) লজিক লইয়া আসিয়াছে।

এমন সময় একব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, পরে লোহার গেটের মধ্যে ঢুকিয়া অগ্রসর হইয়া ডাক দিল "কিহে মণীশ, কি হচ্চে ?"

মণীশ খুব মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতেছিল, লেখকের নাস্তিকতার মধ্যে তাহার প্রশান্ত ললাটের লুক্কায়িত দীর্ঘশিরা ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিলেও সে অধরে দশন চাপিয়া আপনাকে স্থির করিয়া লইয়া অধিক আগ্রহের সহিত পড়ায় মন দিতেছিল। মাতৃ অঙ্কে শয়ন করিয়া যে অভাগা তাহার মাকে চিনে না তাহারই মত সেও নিতান্তই কৃপার পাত্র যে ভগবানের এই এতবড় দয়ার রাজ্যে স্থান পাইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না !

বন্ধুর গলার সাড়া পাইয়া হঠাৎ সে বিস্মিত হইয়া ফিরিল। প্রথমে নিজেরই ভ্রম মনে করিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণে সশরীরে তাহাকে সম্মুখীন্ দেখিয়া সাশ্চর্য্যে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া কহিল, "একি ফিরে এলে যে ?"

স্নানাহার ও বিশ্রামে শচীকান্তের মুখের বিবর্ণ ক্লান্তিভাব ঘুচিয়া আসিয়াছিল। শচীকান্ত বসিয়া পড়িয়া মণীশের পরিত্যক্ত পুস্তকখানা তুলিয়া লইয়া তাহার নামটার উপর চোখ বুলাইয়া কহিয়া উঠিল,

"পড়ো পড়ো একটু জ্ঞান পাবে। হঠাৎ এ সখ্ যে ?"

মণীশ বন্ধুর পাশে আসন গ্রহণ করিয়া কহিল "জ্ঞান পাবার জন্য ! কি আছে দেখছিলুম।"

"কি দেখলে ?"

"যারা জড়ের দাসত্ব করতে জন্মেচে তারা তা ছাড়া আর বেশি কি করতে পারে ? যে যাতে তৃপ্ত সে তাই নিয়েই থাক্! তবে নিজের বিশ্বাস পরের মাথায় চাপাবার বন্দোবস্ত করে তাদের মাথা খাবার যোগাড় করে তোলে তাই বড় দুঃখ হয় !"

"অর্থাৎ ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও সৃষ্টিদায়ভারে পাছে কোমল স্কন্ধে আঘাত লাগে সেই ভয়ে এতটা দুঃখ হচ্চে ! তোমার পুরাণো ধরণের মতগুলো যদি ছাড়তে মণীশ !"

মণীশের অধরপ্রান্ত বিষণ্ণ হাসিতে ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সহিত বন্ধুর দিকে ফিরিয়া কহিল "আমিও হয়ত তোমার জন্য অমনি দুঃখের সুরে বলতে পারি,—তোমার ওই আত্মপ্রতারণাকারী মতটা যদি ত্যাগ করো শচীন্ !"

শচীকান্ত তাহার কণ্ঠস্বরে তাহার মনের লেখা পাঠ করিয়াছিল সে ঈষৎ গরম হইয়া কহিল "কোন্টা আত্মপ্রতারণাকারী সেটা ভেবে বলো, এই উনবিংশতাব্দিতে ঈশ্বর মানে এমন মূর্খ ক'জন আছে ? বৃথা মনের ভার বাড়ানো, সময়ের অপব্যয়, আর

আমার মতে ঈশ্বর না মেনে কেবল নিজের কাজ নিজের শক্তির দ্বারা সম্পন্ন করে যাওয়াই ভাল।"

"তোমার 'মত' আমার 'মত' এখন জনেজনের এক একটা মত হয়ে দাঁড়িয়েচে নাকি? আগে ত শুনেছিলুম, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। দেখ শচীন্ অন্যে এসব কথা বল্লে ততো কষ্ট হয় না কিন্তু তুমি যখন এই রকম বলো তখন আমায় যেন মুগুর দিয়ে মারো। তোমার বাবা অতবড় জ্ঞানী, কত-লোক তাঁর সংসর্গে উন্নত হয়ে গেল, এঁর চেয়ে শতাংশে কম বুদ্ধি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতকে তোমার পূজো করা কিছুতেই সাজেনা।"

শচীকান্ত এ তিরস্কারের বিরুদ্ধে কোন খণ্ডন-যুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করিল না। সে মণীশকে বেশ চিনিত, এতর্ক বাড়াইয়া তুলিলে যে এখন দুচারিদিন পর্য্যন্ত তাহাকে অন্য কোন কাজের কথা বলিতেই পারিবে না ইহা স্মরণ করিয়া সে এইখানেই চুপ করিয়া গেল। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বই-খানা ফেলিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল "ব্যস্ ব্যস্ পণ্ডিতমশায়! ইতি করো, আর না!"

এখন দুটো কাজের কথা কওয়া যাক,—তোমার সেই বইটা শেষ হয়ে গেছে? "নিভিয়া'কে কেমন লাগলো?"

"মন্দকি, বেশ মেয়েটি।"

"তুমি স্কটের কি কি পড়েছ? মোটে ঐ চারিখানি! নাঃ তুমি সংসারে জমিয়ে উঠ্‌তে পারবে না দেখচি! আচ্ছা ডিকেন্সের কোন কিছু পড়া হয়েছে?"

মৃদুস্বরে কহিল "ডিকেন্সের পিকুইক্ পেপার আর ডেভিড্ কপারফিল্ড্ পড়েছি। বেশ লেখার ধরণ।"

শচীকান্ত এইবার নিজের বক্তব্যটা মনে মনে গুছাইয়া লইতেছিল, চোখে চোখে চাহিয়া বলিয়া যাওয়ার চেয়ে পাশাপাশি থাকিয়া বরঞ্চ কোন সঙ্কোচের কথা কহিতে বাধা কম, সে ত্বরিত উঠিয়া কহিল "আঃ এমন সন্ধ্যাটা আলসে হয়ে বসে নষ্ট ক'র না, এসো একটু বেড়ান যাক,—"এই বলিয়া মণীশের হস্ত আকর্ষণ করিল।

"মণীশ! তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে?"

শচীকান্তের স্বর কাঁপিয়া গেল; বিস্মিত মণীশ অকস্মাৎ চলা বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখে তাহার দুই চোখের উৎসুক দৃষ্টি নীল আকাশের মধ্যস্থ দুইটি দীপ্ত তারকার মত জ্বলিতেছিল।

মণীশ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি?"

"এসো বল্‌চি" বলিয়া সে আবার চলা আরম্ভ করিল, কিন্তু অনেকক্ষণ কথা কহিল না। মণীশের বিস্ময়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা ফুলবাগানের সীমা অতিক্রম করিয়া আম্র বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, শুক্লাপঞ্চমীর অপরিণত শিশুচন্দ্র গভীর নীলিমার এক প্রান্তকে দিব্য কিরণরঞ্জিত করিয়া দেখা দিয়াছেন। সারি বাঁধা মল্লিকাগুলার কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহারা তাহাদের খানিকটা সুমিষ্ট গন্ধ দিয়া

তুলিয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে মণীশ ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে ফিরিয়া নিস্তব্ধ শচীকান্তের মুখের দিকে চাহিল "কৈ কিছু তো বল্লে না ?"

"বলি"—বলিয়া শচীকান্ত একটা ফুলভরা ডাল বাম হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহা হইতে আধফোটা মল্লিকা ছিঁড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল, সেদিনকার সেই কথাবার্ত্তার পর বহু চেষ্টাতেও সে যেন এ কথাটা প্রকাশ করিয়া নিজেকে খাট করিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। সে বরাবর জানে মণীশ দুই একটা বিষয়ে ছাড়া নিজেকে তাহা হইতে আর সকল বিষয়েই ছোট বলিয়া মনে করে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, চট করিয়া বলিয়া ফেলিল—"সেদিন তোমায় যে সম্বন্ধটার কথা বলেছিলুম মনে আছে ?"

মণীশের সে কথা মিথ্যা বলিয়াই মনে হইয়াছিল তাই সে সেদিক দিয়া না ভাবিয়া অন্য কোন কথা মনে করিয়া একটুখানি চুপ করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, কিছুই মনে পড়িলনা ; উত্তর করিল "কই না।"

শচীকান্ত ইহা বুঝিল, সে অকারণেও ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল "মনে নেই নিখিল বাবুর বোনের কথা ?"

মণীশ যেন চমকিয়া উঠিল, কহিল "সে তবে কি মিথ্যে নয় ?" তাহার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, যদিও এই সামান্য প্রশ্নে রাগ করিবার কোন কারণই ছিল না, কিন্তু তথাপি সহসা কেমন তাহার এই প্রশ্নের ধরণে শচীকান্তের ঈষৎ ক্রোধ হইয়া গেল। গম্ভীর ভাবে সে কহিল "না মিথ্যা না হওয়ায় ক্ষতিটা কি ? নিখিল বাবু এ বিয়ের জন্য বাবার মত চান, আমি তাঁর মত নিতে এসেচি।"

বর্ষার চলন্ত মেঘের মত মণীশের মুখের উপরে যেমন সহসা ক্লেশের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল তেমনি শীঘ্র তাহা এক মুহূর্ত্তেই সরিয়া গেল। সে অনুতপ্ত ভাবে বাহুর উপরে হাত রাখিল ; "মাপ কর ভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এ যদি হয় খুব সুখেরই বিষয় হবে। তাঁকে বলেছ ?"

শচীকান্ত কহিল "তিনি বাড়ী নেই, তাছাড়া আমি নিজে কেমন করেই বা এ সব কথা তাঁকে বল্‌বো ? তোমাকেই ভাই আমার এই উপকারটি করতে হবে, তুমিই বলবে যে, 'রাঢ়ী বারেন্দ্রের সম্মিলনের ইচ্ছায় তিনি তাঁর মত চেয়েচেন, তিনি যদি মত দেন তবে বাধা দেবে কে ? বেশ করে একটু গুছিয়ে বলো, দেখো ভাই এখন আমার জীবন মরণ তোমার হাতেই নির্ভর করচে।"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল "আমার যথাসাধ্য আমি বলবো, সে জন্য অত করে বল্‌তে হবে না, কিন্তু ঐ যে কথাটা বল্লে শচীন্, ওটা যেন বইএর কথা। সেই মেয়েটিকে একটি বার বুঝি দেখেছ ? তার উপর জীবন-মরণ নির্ভর—বলো কি ?"

শচীকান্ত তাহার তামাসায় চটিল, কিন্তু বাহিরে সে হাসিয়া কহিল "যদি কখনও দিন আসে তবে দেখা যাবে। তুমি এত অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে চাইছো কিন্তু তাকে যদি দেখতে তাহলে বুঝতে! চাঁদকে না দেখা থাকলে ছবির চাঁদ থেকে চাঁদ বোঝা যায় না।"

মণীশ হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতেই

কহিল "তার গায়ের চামড়াখানা তোমার আমার চেয়ে না হয় কিছু বেশি সাফ্ কিন্তু তাই বলে কি সেখানা তোমার আমার চেয়ে বেশিদিন স্থায়ী হবে! মানুষ তো আর ছবি নয় চেহারা ভালমন্দ নিয়ে কি হবে?"

"'Beauty a thing joy forever', এ কবি বলেচেন, দার্শনিক বলেছেন, প্রকৃতি নিজে বলচেন, শুধু তুমিই না বল্লে চলবে কেন? তুমি কি সৃষ্টিছাড়া? সৃষ্টিশুদ্ধ লোক যা চায় তুমি তা চাও না?"

মণীশ হস্তস্থিত ফুলটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল, "তবে বোধ হয় আমি সৃষ্টিছাড়া, আমি জগৎকে সাদাকালো দিয়ে বিচার করতে পারিনে, তার ভিতরে এক চিরনবীন চিরসুন্দরকে দিয়ে দেখি; তাঁর কোন রং নেই, রূপ নেই।"

মণীশের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উদাস হাসিটুকুর মধ্যেও তাহার সহানুভূতির অবিচলিত প্রতিজ্ঞার সুর শুনিয়া শচীকান্ত বেশ একটু আশ্বস্ত হইয়া নিজের মধ্যে একটা বল সঞ্চয় করিয়া ফিরিল। সে যখন চেষ্টা করিবে বলিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই করিবে।

মণীশের সঙ্গে তাহার মতের মিল নাই, চরিত্রের মিল নাই অথচ এই দুইটি ভিন্ন হৃদয়ের ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি একতার স্বচ্ছ স্রোত যে কেমন করিয়া বহিতেছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। দুজনেই দুজনকে ভালবাসিত, বন্ধু বলিয়া মনে করিত, বিশ্বাস করিত। আজও মণীশ প্রফুল্লচিত্তে বিশ্বাস করিয়া লইল যে শচীকান্ত নিখিলবাবুর নিকট যেটুকু গোপন রাখিয়াছিল তাহা জানাইতে সহসা কলিকাতা চলিয়া গিয়া আপনার ভুল সংশোধন করিয়া আসিয়াছে। ভুল করা মানবধর্ম্ম, সে ভুলকে যে স্বীকার করিতে পারে এবং তাহার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে পারে সে-ই মানুষ।

সে তাহার এমন বন্ধুর জন্য নিশ্চিন্ত রহিল না। প্রথমেই সে শিবনারায়ণের নিকটে গেল। যাহা বলিবার ছিল জানাইয়া কহিল "রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহ চলা কি উচিত নয়?"

শিবনারায়ণ চশমাশুদ্ধ দুই চোক ভাইপোর মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কে বল্লে উচিত নয়?"

সে একটু ইতস্তত করিল "কেহই ত চালাবার চেষ্টা করেন না, হিন্দু সমাজের ভিতর থেকে এজন্যে খুব বেশী করে যত্ন নেওয়া দরকার।"

শিবনারায়ণ কহিলেন, "যখন দরকার হবে, তবে নিশ্চয়ই লোকে চেষ্টা করবে, স্বয়ং ঈশ্বর তখন লোকের মনে চেষ্টা এনে দেবেন।"

মণীশ একথা মানিত, সে ইহার বিপক্ষে গেল না, কিন্তু এইটুকু সে মনে মনে বলিল "কে জানে এখনই সেই সময় আসেনি? এইত মনে চেষ্টাও জাগরিত হয়ে উঠ্‌চে! কিন্তু সেকথা সে বলিল না। শিবনারায়ণ কহিলেন "নিখিলবাবু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুমতি চেয়েচেন আমি তাঁকে সেকথা বলতে পারি। কি বলো?" সানন্দে মণীশ সম্মতি দিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী ফিরিবার পর দু তিন দিন পরে একদিন মণীশের খুল্লতাত উৎকণ্ঠিত মণীশকে ডাকিয়া তাহার হাতে

একখানা লেখা কাগজ দিয়া কহিলেন "সার্ব্বভৌম মশায়ের লেখা নিখিলবাবু—না—কে তাঁকে পাঠিয়ে দিও। তাঁর ইহাতে সম্মতি আছে।"

মণীশের অত্যন্ত আনন্দ হইল। বন্ধু হইয়া বন্ধুর জন্য সে তবে কিছু করিতে পারিল। নিশ্চয়ই শচীকান্তের ভালবাসা এই উপলক্ষ্যে তাহার প্রতি বৃদ্ধি পাইবে। কাগজখানা খুলিয়া দেখিল, শচীকান্তের পিতা লিখিয়াছেন,—

"রাঢ়ীবারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি শাস্ত্রসম্মত, ইহা ত কিছুমাত্র সামাজিক ক্ষতিকর নহে। পথক্লেশের জন্যই ইহা পরিত্যজ্য হইয়াছিল। এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিবাহ চলিত হওয়া প্রার্থনীয়। যাহা শাস্ত্রসম্মত কালানুসারে লোকাচার বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেও তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করায় কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আমি এইরূপ বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।"

এই পত্র যখন শচীকান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিল তাহার চোখে আকাশের রং সোনামাখা ও ক্ষুদ্র অসজ্জিত ঘর নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিয়া দেখা দিল! সে খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আত্মসংবৃত হইবার চেষ্টায় বাক্স গুছাইতে উঠিয়া গেল। সমস্ত ভয়সংশয়কে সরাইয়া দিয়া সাফল্যের আগ্রহ তাহার মনে পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

মণীশ কহিল 'এইবার কেন সব কথাই খুলে বলা যাক্ না?"

শচীকান্ত কহিল "কন্যাপক্ষেরই এটা বলা উচিত, আমি বল্লে যদি আবার বাবা কিছু খুঁৎ ধরে বসেন, কাজ কি! একে তিনি আমার ওপোর তেমন খুসী নন।"

শেষ কথাটায় মণীশকে একটু দুঃখিত করিল, কিন্তু সে কিছু বলিল না।

শচীকান্ত ঠিক করিয়াছিল কাল পরশুর মধ্যেই সে কলিকাতায় ফিরিবে, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা তাহার এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বাধা দিতে লাগিল।

মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন, বড়দাদার ছেলের উপনয়ন এবং মণীশের গৃহে প্রীতিভোজ উপলক্ষ্যে তাহাকে পাঁচ ছয়দিন কাটাইয়া যাইতে হইল। বিদায়কালে এবারে মনটা কিছু উদার ছিল, প্রণাম করিয়া পিতার পদধূলি মাথায় গ্রহণ করিল, উমাকান্ত প্রসন্নমুখে মাথার উপর দক্ষিণ হাতখানি রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেন আসিলে? কেনই বা আবার ছুটী না ফুরাইতেই চলিয়া যাইতেছ! কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কাহারও প্রতি তাঁহার বিরক্তিও ছিল না, আকর্ষণও বেশি প্রবল নয়। যেটা অনুচিত বলিয়া জ্ঞান ছিল একমাত্র তাহার উপরেই ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল।

গাড়ির মধ্যে সে একটি নিভৃত কামরা লাভ করিল, ইহাকেও সে আজ নিজের জন্য মস্ত পুরস্কার মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না। একলা বসিয়া সেই একেবার দেখা মুখখানি,—যাহা সেদিনকার নীল আকাশের তলে প্রভাত রৌদ্রে মণ্ডিত হইয়া মেঘের মধ্যে যেমন তড়িৎ খেলিয়া যায়,—

সেইরূপে তাহার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি স্নিগ্ধ আলোক রেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছিল তাহারি কথা প্রসন্নচিত্তে ভাবিতে লাগিল।

দুপারের চলন্ত গাছ, মাঠ, ক্ষেত্র ও বাতাস যেন স্বপ্নপুরের শোভা ও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া তাহার চক্ষুকে সার্থক ও চিত্তকে শান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সে প্রথমে নিজের বাসায় গেল না। গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বারে উপস্থিত বামুনঠাকুরের হাতে জিনিষপত্র নামানোর ভার দিয়া সে একেবারে দ্রুতপদে নিখিলনাথের বাসার দিকে চলিল। কাগজখানা মুঠা করিয়া হাতেই চাপিয়া ধরিয়াছিল।

স্পন্দিত বক্ষে দূরে হইতেই সে দেখিল বাড়ীর উপরনীচের সমুদয় দ্বার রুদ্ধ, জানালা বন্ধ, বাড়ী অন্ধকার,—মনুষ্য অবস্থিতির চিহ্নই নাই।

শচীকান্তের বক্ষে সজোরে একটা আঘাত পড়িল। সমস্ত চিত্ত বিকল করিয়া কানে-কানে কে যেন বলিয়া উঠিল, তাহারা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে। মাতালের মত তাহার পা টলিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরুপায় ক্রোধ আগুনের মত দপ দপ করিয়া মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

বাড়ীর পাশেই রামধন সেকরার দোকান, লোকটা তাহাকে চিনিত। রাস্তায় আলোকে সে তাহাকে জনহীন বাড়ীটার সম্মুখে উর্দ্ধনেত্র হইয়া ভূতের মত ঘুরিতে দেখিয়া ডাকিল। করিয়া ফিরিয়া চাহিত না, কিন্তু আজ নিজের গরজ—ভাবিল হয়ত সে ইহাদের নূতন বাসার সন্ধান দিতে পারে। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবুরা কোথা গেছেন জানিস্?"

রামধন একটু চুপ করিয়া রহিল, তার পর কহিল "আপনি কি দেশে গিয়েছিলেন নাকি? কিছুই জানেন না!"

ইহার ভিতরে আরো কিছু জানিবার আছে নাকি? অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কোন যোগ্য বরপাত্র হঠাৎ খুঁজিয়া মিলিয়াছে, বৈশাখের সন্ধ্যায় শুভলগ্নের কিছুই অভাব ছিল না,—সে নিষ্পন্দ থাকিয়াই উচ্চারণ করিল "কি!"

রামধন তখন হঠাৎ অক্ষেপের স্বরে কহিয়া উঠিল "সে আর কি বল্‌বো! আজ সাতদিন হয়ে গেলো মায়ের দয়া হয়ে ডাক্তার বাবুটি মারা পড়্‌লেন? বড় ভাল ছিলগো ভদ্দরলোক,—তেমার অমন হাঁপিং কপ্‌টা সারিয়ে দিলে! এক পয়সাও নিলে না।"

শচীকান্ত বহুক্ষণ নীরবে পরিত্যক্ত গৃহের দিকে তাকাইয়া রহিল। কার্ণিসের ছায়া দীর্ঘ হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে রেলিংগুলার বক্রছায়া বারান্দার দেওয়ালে আঁকার মত দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল "মেয়েরা কোথায় গেলেন?"

রামধম উত্তর করিল "তাতো জানিনে বাবু, ডাক্তারবাবুর ব্যারাম হতেই একটি বুড়গোছ ভদ্দর নোক এখানে এসেছিলেন,

বুড়ী ঠাকুমা আর ছোট বোনটি, কি কান্না কেঁদেই গেল,—মনে করলেও প্রাণটা ফেটে যায়। তা বাবু এখন কলিকাল এই রকমই এখন হবে! সে রামরজ্যি তো আর নেই যে অকাল মরণ হবে না।”

এই বলিয়া কালমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে রামধন একটি সরু চিমটা লইয়া মাটির গামলা হইতে জ্বলন্ত টিকা উত্তোলনে মনঃসংযোগ করিল, শচীকান্ত ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিল। দৈব বলিয়া কোন একটা মানবশক্রর অবিশ্বাস্য অস্তিত্ব লইয়া সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন নিজের মস্তিষ্ক-ঘৃতের অপব্যবহার হইতে দেয় নাই, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে এই অদৃশ্য শনি-দেবতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। গণেশের মুণ্ডপাতের মত তাহারই দুটি নেত্রের করুণা বর্ষণই যেন সেই বিদ্যুৎপ্রভা তরুণীকে তাহার জীবনের মাঝখান হইতে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য করিয়া লইল! হায় কবিজীবন যেন চিরঅভিশপ্ত!

ঘরে বসিয়া সে আবার সেই কবিতার খাতা খুলিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে কবিতা লিখিতে বসিল, লিখিল—

“কেন হেরিলাম!
পতঙ্গ বহ্নির মুখে পুড়িবারে ধায় সুখে,
তেমনি সে রূপানলে পুড়ে মরিলাম।
জ্বলন্ত পাবক শিখা কেন হেরিলাম।”

তারপর ইতিহাসের বই খুলিয়া এথেন্স ও রোমের বীরগণের চির স্মরণীয় কীর্ত্তি কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া, গণিতের বড় বড় অঙ্কগুলাকে মীমাংসা করিয়া, চোকভরা ঘুম লইয়া গিয়া বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। যে ক্ষুদ্র মুখখানি চিত্তপটে ইতিমধ্যে পুরাতন চিত্রপটের রেখার ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, প্রাণপণ বলে তাহাকেই মনশ্চক্ষের সম্মুখে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেও ফলে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কেমন মনের ভিতরটা ভাঙ্গা-জানালার অভ্যন্তরস্থ জ্যোৎস্নালেখাস্পর্শের মত একটুখানি চকচকে হইয়া রহিল মাত্র! প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বপ্নও তাহার মোহন তুলিকাপাতে সেই সুললিত মুখখানি অঙ্কিত করিয়া তুলিল না। বিদ্যুতের মতনই সে তাহাকে চকিতমাত্র দেখিয়াছিল।

(৮)

রজনীর যে স্তব্ধ মুহূর্ত্তে সমস্ত নিশীথ কুসুমেরা তাহাদের প্রেমাপ্লুত হৃদয় সুরভি-রাশি তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যে উর্দ্ধপানে প্রেরণ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তেমনি পুষ্পসুরভিময় চিত্তখানি আত্মবিস্মৃতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে আবদ্ধ উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহোদ্যানটিতে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছিলেন। এমনি প্রতিরাত্রেই প্রায় ঘটিয়া থাকে।

পদতলের নীচের জমীতে মাটির আলের দ্বারা ভাগ করা ক্ষেত্রে কলাইশুটির গাছ সাদা ও বেগনি ফুলে ভরিয়া উঠে, ফুলের মধ্যে ভ্রমরের দল গুঞ্জন করিয়া যায়; মাথার উপরে বিশাল আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয়টা উজ্জ্বল নক্ষত্রে খচিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে কয়টি মাত্র ফলপুষ্প এবং আকাশের সমুদয় গ্রহের অপ্রতিহত অধিকার গ্রহণ

করিয়া পূজাপরায়ণ এই তপস্বীচিত্ত সুদূর বিশ্বের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। সে চিত্ত কখনও বিহ্বল নির্ব্বাক বিস্ময়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া অসীম রহস্যের লেখা পাঠ করিতে থাকে কখনও জ্যোতির্ম্ময় দুইটি নেত্রতারকা আপনার ভাবে আপনি নত হইয়া আসিয়া অনন্তের মঙ্গল স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়ে। তারপর কোন্ সময় চারিপাশে পুষ্পমুকুল গুলি বিকাশিত হইয়া উঠে, ফোটা ফুলগুলি ঝরিয়া যায়, রাত্রের অন্ধকার ভোরের আলোকে মরিয়া আসে, তাহার কিছুই তাঁহার কাছে ধরা পড়ে না। রাত্রের শেষ অন্ধকারকে ছিন্ন করিয়া দূরস্থ ল্যাম্পের আলোটীর মত যখন সূর্য্যের প্রথম উদয়ালোকের আভাষ পূর্ব্বাকাশকে গোলাপী আভায় রঙ্গিয়া তোলে তখন তিনি চমকিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যান।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি, বাহিরে বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়াও ছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের পরিদৃশ্যমান জ্যোতি এবং অদৃশ্য জগদতীতের অজ্ঞাত আনন্দের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া আজও সেই মহাচিত্ত খানি বিশ্বাতীত লোকে নিজের পরিপ্লুত আত্মাকে প্রেরণ করিয়াছিল। দেহ এই পৃথিবীর মাটীর উপরে বিচরণ করিতেছে কিন্তু এই স্থূল দেহের প্রকৃত অধিকারী যিনি তিনি তাঁহার নিজস্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বাগানের একপ্রান্তে গোশালা, তাহাতে দুগ্ধবতী দুইটি গাভী ও গৃহিণীর স্বহস্তসেবা দ্বারা পরিপুষ্ট দুএকটি গোবৎস বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে। গোগৃহের বামে বিচালির গাদা এবং একটি ধানরাখা মরাই রাত্রের অন্ধকারে স্থূল লম্বকায় দুইটি নিস্তব্ধ প্রহরীর মত প্রতীয়মান হইতেছিল। কৃষ্ণবসনাচ্ছন্ন, সতর্ক দৃষ্টি, আত্মকর্ম্মসজাগ যেন দুইটি বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য প্রভুর চরণক্ষেপধ্বনি গণনা করিয়া তাঁহার আহবানের প্রতীক্ষা করিতেছে।

খসিয়া পড়া তারাখণ্ডের মত গোটা কত জোনাকি গাছের উপরে নীচে চারিপাশে ঝিলমিল করিয়া কাঁপিয়া বেড়াইতেছিল। আলেয়ার আলোকবিন্দু নিবিয়াই আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। চারিদিক নিঝুম হইয়া রহিয়াছে। নিজের বাহুটীর উপর অন্ধকার কালো চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া নিদ্রাকাতর বালিকার মত সমস্ত প্রকৃতি অচেতন করিয়া রহিয়াছে। তাহার ঘুমন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত অতি ধীরে বাতাস বহিতেছিল, বেড়ার ভিতর হইতে ঝিঁঝিঁর দল ঐক্যতান স্বরে অতি মৃদু মৃদু ঘুম পাড়ানিয়া গান গাহিতেছিল! সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন কিসের একটী সাড়া পাইবার জন্য শুদ্ধ ব্যাকুলতার সহিত উর্দ্ধে চাহিয়া ছিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয় সহসা এক সময় তাঁহার স্বপ্নবিচরণ বন্ধ করিলেন। বাহ্যশক্তি শরীরের উপর আধিপত্য ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অন্তরের ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। তাঁহার মনের মধ্যে তখন কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বোধ হয় তখন তিনি নিজেও ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু কি যে একটা অবক্তব্য অপরিজ্ঞাত ভাবের তড়িৎ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া

তাঁহার ভিতরের আনন্দময় কোষকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে ইহা তাঁহাকে দেখিয়া স্পষ্টই অনুভব হইতেছিল।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ভোরের দিকে বিবর্ণ পাণ্ডুমুখে বিদায় লইলেন। অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলিতে জ্বলিতে নিবিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক জীবন্মৃত রোগীর মুখে আরোগ্যের নবীন আভার মত ঈষৎ পরিষ্কার হইয়া আসিল। পথের কুকুরটা নিদ্রাক্রান্ত শরীর একপাশে মেলিয়া দিতে দিতে একবার ডাকিয়া উঠিয়াই নীরব হইল। উমাকান্ত সংসজ্ঞ হইয়া উঠিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

স্নান পূজা সারিয়া বাহিরের ঘরে আসিতেই ছাত্র কয়েকটি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভক্তিনাথ আর্য্যমিশনের ছাপা গীতাখানি খুলিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার কোন প্রশ্ন আছে বুঝিয়া তক্তাপোষের উপর আসন গ্রহণ করিয়া পুস্তকখানির দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"কিছু জান্‌বার আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ"। সম্ভ্রমের সহিত নিকটে আসিয়া ভক্তিনাথ পুস্তকখানি পিতার সম্মুখে ধরিলেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম কয়টি শ্লোক নীল পেন্সিলের দ্বারা চিহ্ন করা রহিয়াছে। কহিলেন "এইখানে যে ভগবান 'ময্যাবেশ্য মনো যেমাং নিত্যযুক্তা উপাসিতে শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ; এই শ্লোকে সগুণ উপাসককে যুক্ততম করিয়াছেন, তবে আবার এই সকল শ্লোকে নির্গুণ উপাসনাকেই বড় করিয়াছেন কেন? ইহা পরস্পরবিরুদ্ধ ঠেকিতেছে না?"

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের চক্ষের জ্যোতি এখনও যুবকদলের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ছিল। এখনকার বার বছরের ছেলেটিকেও চশমা ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক তাঁহার এই পরিণত বয়সেও খোলা চোখে যথেষ্ট সচ্ছন্দে পড়াশোনা করিতেন সেজন্য তাঁহার কাচখণ্ডের প্রয়োজন হইত না। পুঁথির পত্রের উপর দৃষ্টি করিয়া স্মিত গম্ভীর মুখে কহিলেন "ভগবানের মুখের কথা পরস্পর বিরোধী হওয়া সম্ভব কি? এর মানে এই যে,—যে সারূপ্যলাভ করেছে তার আর ভাল মন্দে প্রভেদ কি? উপাসকদের মধ্যেই না 'তর', 'তম' থাকে।"

ভক্তিনাথ দ্বিধাহীন বিশ্বাসে মস্তক আন্দোলন করিল, "এই অধ্যায়ের সমস্তটুকু আজ যদি সুবিধা হয় আমাদের বুঝিয়ে দিন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ হাসিটুকু হাসিলেন, কহিলেন, বাপু আমার সুবিধার কোনদিনই অভাব নাই, তোমরা যদি সুবিধা পাইয়া থাক তবে আসিয়া বইস বুঝাইয়া দিতেছি।

গীতাপাঠ চলিল। উপনিষদের রত্নভাণ্ডার তাহার ভিতরকার এই রত্নাধার দ্বাদশ অধ্যায়। প্রফুল্ল গভীর কণ্ঠে সাধক পাঠ করিতে লাগিলেন,

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।

ইত্যাদি

ভগবানের প্রীতিপাত্র ...

কণ্ঠে সেই বর্ণনা গম্ভীরতর পবিত্রতর শুনাইতে লাগিল।

ছাত্রদল বক্ষঃবদ্ধবাহু নিরুদ্ধশ্বাস। পথে চলিতে চলিতে দুএকজন পথিক মন্ত্রমুগ্ধবৎ জানালার সম্মুখে রুদ্ধগতি নদীস্রোতের মত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। দুএক জন করিয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশও করিতে আরম্ভ করিল। গীতা অন্যত্র পাঠ হয় কিন্তু এমন ব্যাখ্যা কোথাও হয় না। এবং উচ্চারণের ললিত গম্ভীর ঝঙ্কার এমন আর কোথাও শোনা যায় না। গ্রামের মধ্যে শিবনারায়ণের মতই অবস্থাপন্ন আরও দুএক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ সন্তানের বাস আছে। শ্রীপতি তাহাদের মধ্যে একজন। আজ তিনিও এই গীতাপাঠের সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠ শেষ হইলে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা ভট্টাচার্য্য মশায়, গীতাকে কভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে?" ভট্টাচায্য মহাশয় ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন "তিনভাগে, কিন্তু দেখো দাদা এ তোমাদের জমিদারী ভাগ নয়,—জজের কাছে হুকুম আনতে যেওনা যেন এক্ষণি।"

শ্রীপতি লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল। সম্প্রতি তাহারা দুইভায়ে জেলার জজ আদালতে বিষয় ভাগের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। এই সব গোলমাল লইয়া দুই ভায়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। শ্রীপতিকে নিরুত্তর দেখিয়া শিবনারায়ণ কহিয়া উঠিলেন "আচ্ছা তিনভাগে যে বল্লেন, আমরা জানি অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা আঠার ভাগে বিভক্ত। তিন কি জন্য বলচেন? কি রকমে তিনভাগ হলো?"

"প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভগবান বুঝাতে চেষ্টা করছেন 'তৎ' অর্থাৎ তুমি,—মধ্যের ছয়ে 'তম্' অর্থাৎ আমি কে, এবং শেষের ছয়ে তুমি ও আমির সংযোজন করে দিয়ে দেখিয়েছেন 'তৎ তম্, অসি' অর্থাৎ তত্ত্বমসি। গীতার এই প্রকৃতরূপ, এবং ইহাই প্রদর্শন করা গীতার উদ্দেশ্য। বুঝিতে পারিয়াছ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রতিদিন এই রকম এক আধঘণ্টা আমাদের কিছু কিছু বুঝিয়ে দিলে তবু অনেকটা মনের ময়লা দূর হয়ে যায়। আপনার মহৎ সঙ্গেও যেন মনটা কিছু ক্ষণের জন্য উন্নত হয়। কাল থেকে নিয়মিত আসবো। আহা সকালটা বড়ই ভাল কেটে গ্যালো। মন যেন লঘু হয়ে গ্যাছে।"

শিবনারায়ণ বিদায় লইলেন। শ্রীপতি বাবু উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিলেন না, কিছু যেন বলিবার জন্য মনটা উস্‌খুস্ করিতেছিল। চোখ মুখ গরম হইয়া উঠিয়াছে। শ্রোতাদের মধ্যে একটি দুইটি করিয়া লোক কমিতে আরম্ভ করিলেও তখনও অনেকগুলি বসিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীপতির চিত্তে সহসা যে বিবেকের সূক্ষ্ম এবং অতি তীক্ষ্ণ আঘাত ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটুখানি হাসিমাখা বিদ্রূপের সহিত মিশাইয়া বিঁধিয়া দিয়াছেন সে তাহার বিষাক্ত যন্ত্রণায় ক্রমেই যেন অধিকতর অভিভূত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার সহিত দুএকটা কথা কহিবার আশায় তাই বসিয়া রহিল। কাহার জীবনের স্রোত কখন কোন জোয়ার ভাঁটার আকস্মিক স্পর্শে কোন পথে ফিরিয়া দাঁড়ায় তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ধনী যুবকের

দ্বিধার ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ পুঁথি প্রত্যর্পণ করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "এসো শ্রীপতি একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্। ভক্তি, রামু চাঁড়ালের পিলের প্রলেপটা আনিয়া দাও দেখি, তাহাকে দিয়া আসিতে হইবে। মধু ময়রার নাতিটির জন্য তুই মোড়া কাশীর পাঁচনও আনিয়া দাও। হাঁ ঠিক হইয়াছে, আচ্ছা একখানি কাপড়ও রামুকে দেওয়া দরকার, উপস্থিত, নূতন না পার পুরাণই আনিয়া দাও। এসো শ্রীপতি।"

শ্রীপতি, এই বৃদ্ধ অথচ যুবকের চেয়েও কর্ম্মচঞ্চল, শিশুর চেয়েও আনন্দ প্রবলচিত্ত লোকটির সঙ্গ বিস্ময়ের সহিত গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাঁহার সুগৌর মুখের ললাট চিবুক ব্যাপিয়া যেন শৈশবের চিন্তাহীন সরলতা তাঁহার মুখশ্রীকে একটি কোমল ভাবে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ প্রাচ্য দেবপ্রতিমার চতুস্পার্শ্বস্থ দিব্য জ্যোতি যেন তাঁহার চারিদিকে প্রভাতসূর্য্যের কিরণ স্বতঃই বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে। ইঁহার নিকট বাস্তবিকই সমুদয় ক্ষুদ্রতা ও লঘুতা যেন লজ্জায় মরিয়া যায়, অন্তঃকরণের তলদেশে যত কিছু গোপন দুর্ব্বলতা নিহিত হইয়া আছে সমস্তই যেন সেই দুই জ্যোতির্ম্মণ্ডিত নেত্রের অন্তর্ভেদী শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীপতি কহিল "আজ আপনি আমাকে যথেষ্ট জ্ঞান দিয়াছেন। আমি ভাইয়ের সঙ্গে মোকর্দ্দমা মিটাবার চেষ্টা করবো।"

উমাকান্ত কহিলেন "ভগবানই তোমার বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করে দিয়েছেন, তাঁকে প্রণাম কর।" শ্রীপতি তাঁহার আদেশ পালন করিল। তারপর চলিতে চলিতে হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়াতে ঈষৎ উদ্বেগের সহিত সহসা কহিয়া উঠিল "কিন্তু একটা বড়ই মুস্কিল আছে। বাড়ী ভাগ হলে দক্ষিণের ঘরগুলো শুরর ভাগে পড়বে। সেই দিকেই ভাল হাওয়া, উত্তরে ত তেমন হাওয়া নেই; সেইগুলো আমায় নিতে হবে যে।"

কথাটা সে আত্মগতই বলিয়াছিল, কিন্তু ইহার উত্তর পাইল। উমাকান্ত কহিলেন "না না তুমি এ অত্যাচার সহ্য করোনা, ছোট ভাইকে ভাল হাওয়া লাগাতে দিতে আছে! মহাভারত!"

শ্রীপতি কথাটা বলিয়াই মাথা হেঁট করিয়াছিল। সার্ব্বভৌম সহাস্যমুখে পুনশ্চ কহিলেন "এক কাজ করোনা!"

"আজ্ঞা করুন।"

"কতোকগুলো লঙ্কা কিনে দক্ষিণ দিকে দিন রাত চারটি চারটি জ্বালিয়ে দাওগে। ভয়ে ভায়া আর জান্‌লা খুলে রাখতে পারবেন না বাতাসও বন্ধ। উকিলমোক্তার খরচা নেই, কাজও হাসিল্।"

লজ্জায় মরিয়া গিয়া আরক্তমুখে শ্রীপতি কহিল "আমায় ক্ষমা করুন!"

বাড়ী ফিরিয়া নূতন রোগী 'কেলোহাতির' শিশুটির সম্বন্ধে ভক্তিনাথকে কিছু উপদেশদান করিয়া, ও ছাত্রদলের মধ্যস্থ একটি যুবার নাড়ি দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাঁহার চঞ্চলা নাতিনীটি কোথা হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল "আজ কে এসেছেন বল দেখিন্?" 'কে?' বলিয়া উমাকান্ত গৌরীর গোলগাল মুখখানা দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিলেন

সেখানা দুষ্টামির হাসিতে আগাগোড়া ভরিয়া আছে। চক্‌চকে দুইটা চোক হইতে কৌতুকমিশ্র চপলতা যেন নির্ঝরের ধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে সহজে রহস্য ফাঁশ করিতে রাজি হইল না। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "বলোনা দেখি কেমন পার? কক্ষণো পারবে না। আচ্ছা গুণে বলো। পারলে না? পারলে না? তুমি হেরে গ্যালে। এসো দেখবে এসো।"

আর একটু অগ্রসর হইতেই একজন শুভ্রবসনা বর্ষীয়সী বিধবা আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। উমাকান্ত তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন "গিরিজা!" গিরিজাসুন্দরী অঞ্চলপ্রান্তের চাবিগুলা অঙ্গুলীদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হাস্যের সহিত সজলকণ্ঠে কহিলেন "আমি এসেছি ভট্‌চায্যিমশাই, বলি সবারি ত একটা না একটা উপায় করচো আমার জন্যে এবার কি করবে কর দেকি। এমন করে সবাই মিলে ভুলে থাকলে ত আর চলে না। ভাবলুম দেখি ভগবান এবার ভক্তকে কেমন করে এড়ান।"

উমাকান্ত গৌরীর অযত্নন্যস্ত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছগুলা নাড়িতেছিলেন, চোখ তুলিয়া তাঁহার ভক্তের মুখের দিকে চাহিলেন "তোমার ভগবান ত তাঁর ভগবানত্ব সত্ত্বেও তোমার মনের কামনা জান্‌তে পারলেন না। মানুষ ভগবানের এইটেই সব চেয়ে দোষ। এখন বলো দেখি ভক্তিমতী! তোমার তপস্যা কোন বর লাভের উদ্দেশ্যে! ইন্দ্রত্ব চাই, না অমরত্ব চাই? গিরিজাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন, "অমর হতে চাইনে ঠাকুর, মরতে পেলে এখনি বেঁচে যাই। তবে একটা কথা তুমি ঠিক বলেছ, আমার মনের খবর তোমার কাছে কি আর লুকোন আছে? তুমি যে অন্তর্য্যামী! শচীকান্তকেই আমি আজ চাইতে এসেছি। তোমার ঐ ছেলেটিকে আমায় দিতে হবে।"

(ক্রমশঃ)

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত

(ছ) ঈশ্বরই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, কার্য্য কারণের অনন্যত্ব।

'কারণ' কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে, আর্য্য এবং অনার্য্য, আধুনিক এবং প্রাচীন, সকল শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মধ্যেই অত্যন্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে কার্য্যের উৎপাদক শক্তি-বিশেষরই নাম কারণ। তাঁহাদের মতে আমাদের পুরুষকার ভিন্ন অন্য কোনরূপ শক্তিরই ধারণা আমাদিগের হয় না। এ জন্যই তাঁহারা বলেন, বিশ্বাত্মার পুরুষকারই জগতের সর্ব্বপ্রকার কারণ বা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিরূপে প্রকাশিত।* অনেকে আবার শক্তিই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কোন

কার্য্য উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত এবং নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বা ব্যাপার সমষ্টির নামই কারণ। তাঁহাদের মতে কোন একটী অবস্থা বা ব্যাপার বিশেষকে পৃথক্ ভাবে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই ভ্রম। প্রাচীন যবন দার্শনিক আরিষ্টটল (Aristotle) চারিপ্রকার কারণ বিভাগ করেন, যথা—উপাদান (Material cause) (২) অবয়ব বা আকৃতি (Formal cause) (৩) নিমিত্ত Eficient cause এবং (৪) উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন Final cause. আধুনিক দার্শনিকগণ নিমিত্ত-কারণ-কেই বিশেষভাবে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায়মতে "অন্যথাসিদ্ধি শূন্যত্বে সতি নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং কারণত্বং।" কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তথাপি কার্য্যের অনুৎপাদক,—এইরূপ ব্যাপারের নাম অন্যথা-সিদ্ধি,—যথা, ঘটরূপ কার্য্যসম্বন্ধে কুলালের পিতা 'অন্যথাসিদ্ধি' নয়, অথচ কার্য্যের অব্যবহিত এবং নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী, এইরূপ ব্যাপারকেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। অর্থাৎ যে ব্যাপার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলেই কার্য্য হয় (অন্বয়), এবং না থাকিলে হয় না (ব্যতিরেক), এরূপ অব্যবহিত এবং নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারকেই সেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। ন্যায়মতে কারণ তিন প্রকারঃ— সমবায়ী অসমবায়ী, এবং নিমিত্ত। সমবায়ী কারণ,—ঘট সম্বন্ধে যেমন মৃত্তিকা, অসমবায়ী কারণ বলিতে সমবায়ী কারণের প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটতম কারণ,—যথা, ঘট সম্বন্ধে, ঘট-কপালদ্বয়ের সংযোগকে বুঝায়। নিমিত্ত কারণ সমবায়ী কারণ হইতে ভিন্ন, যেমন ঘট সম্বন্ধে কুম্ভকার। বেদান্ত মতে কারণ দুই প্রকারঃ—উপাদান এবং নিমিত্ত,—যথা ঘট সম্বন্ধে তাহার উপাদান কারণ—মৃত্তিকা, এবং নিমিত্ত কারণ—কুম্ভকার (কুলাল)।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে 'কারণ' শব্দে অনেক স্থলেই উপাদান কারণ-কেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, যথা "কারণা-দনন্যত্বং কার্য্যস্য"—(ঘটাদি) কার্য্য তাহার (উপাদান) কারণ (মৃত্তিকাদি) হইতে অভিন্ন। নিমিত্ত কারণকে স্থানে স্থানে তিনি 'কারক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, যথা ঘট সম্বন্ধে কুলাল বা কুম্ভকার। জগৎরূপ কার্য্য সম্বন্ধে শঙ্করের মত যে, ঈশ্বরই তাহার উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। তিনি বলি-তেছেন, (সূত্রভাষ্য—অ—১। পা—৪। সূ—২৩ হইতে ২৭)—"ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মুক্তির কারণ। শ্রুতি ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে-ছেন ;—"জন্মাদ্যস্য যতো"—'যাহা হইতে এ সকলের জন্ম।' ঘট এবং রুচক (স্বর্ণহার) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত লক্ষণ দ্বারাই দেখা যায়, ঘট এবং রুচকাদির সম্বন্ধে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণাদির ন্যায় প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব), এবং কুম্ভকার (কুলাল) ও সুবর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণত্ব, উক্ত শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই উভয়বিধ কারণত্বকেই লক্ষ্য করা হইতেছে।" আবার বলিতেছেনঃ—"ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব কিমাত্মক, —এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান অথবা নিমিত্ত কারণ? ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্রই বলা যাউক, কারণ তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কিসের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে? শ্রুতিই ঈশ্বরের জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বের উল্লেখ

করিতেছে। ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ঈক্ষা বা জ্ঞান-পূর্ব্বক। 'স ঈক্ষাঞ্চক্রে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-দ্বারাই তাহা দেখা যায়। ঘটাদি সম্বন্ধেও ঈক্ষা বা জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্তৃত্ব কুম্ভকারাদি নিমিত্ত-কারণেই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব (অর্থাৎ কর্তৃত্ব) সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। রাজা-প্রভৃতি ঈশ্বর বা কর্তৃস্থানীয়দিগের কেবল নিমিত্ত-কারণত্বই দৃষ্ট হয়। অতএব পরমেশ্বরেরও নিমিত্ত কারণত্ব মাত্র স্বীকার করাই সঙ্গত"।

আবার "পরমেশ্বরের কার্য্য—এই জগৎ—সাবয়ব—অচেতন এবং অশুদ্ধ। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহার (উপাদান) কারণও এইরূপই হওয়া সঙ্গত যেহেতু কার্য্য এবং তাহার (উপাদান) কারণের সারূপ্য (সমানরূপতা) দৃষ্ট হয়। এই জগৎ কার্য্যের ন্যায়, ব্রহ্ম সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব এবং অশুদ্ধত্বাদি লক্ষণ-যুক্ত নহেন,—কারণ শ্রুতি বলিতেছেন,—ব্রহ্ম "নিষ্কলং, নিষ্ক্রিয়ং শান্তং, নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" অতএব শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মকারণত্ব নিমিত্তত্ব মাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে। অচেতনত্ব, অশুদ্ধত্বাদি গুণযুক্ত জগতের অন্য (উপাদান) কারণ (যেমন সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি) স্বীকার করিতে হইতেছে। এই কথার উত্তরে আমরা বলিতেছিঃ—ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বা প্রকৃতি,* এবং নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করিতে হয়। তিনি কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন। কেন? তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত বাধিত হয় না। প্রতিজ্ঞা—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যাদি—যাহার শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞান দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা দেখা যায় যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে, অপর সকল অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হয়। এ কথা একমাত্র উপাদান কারণ সম্বন্ধেই সত্য। একমাত্র (মৃদাদি) উপাদান কারণ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই (সেই উপাদান গঠিত) অজ্ঞাত বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ হয়,—যেহেতু কার্য্য মাত্রেই তাহার উপাদান কারণ হইতে অভিন্ন। নিমিত্ত কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন বলা যায় না, যেহেতু শিল্পী তাহার নির্ম্মিত প্রাসাদাদি হইতে ভিন্নরূপেই সংসারে দৃষ্ট হয়।

জগতের ব্রহ্ম-কারণত্ব বিষয়ক শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে শঙ্কর পুনরায় বলিতেছেনঃ—"হে সৌম্য, একখণ্ড মৃত্তিকা দৃষ্টে যেমন ঘটাদি সমস্ত মৃন্ময় বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান-লাভ হয়, কারণ বিকার মাত্রেই শব্দ (স্ফোট—Logos)-জনিত নাম-রূপ ভেদমাত্র, 'মৃত্তিকা ইহাই সত্য'। এই শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত উপাদান সম্বন্ধী। সেইরূপ একখণ্ড সুবর্ণ দৃষ্টে, মুকুট বলয়াদি স্বর্ণময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, অথবা একটী মাত্র নখ-নিকৃন্তন (নরুণ) দৃষ্টে লৌহময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মৃৎপিণ্ড, স্বর্ণখণ্ড, এবং নখ-নিকৃন্তন প্রভৃতির দৃষ্টান্তসকলই ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব বিষয়ক। এইরূপে সর্ব্ব বেদান্তোক্ত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত, উভয়ই যথাসম্ভব ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা উপাদানত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আবার "যতো বা ইমানি

ভূতানি জায়ন্তে" —'যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মে' এই শ্রুতি বাক্যে 'যতো' 'যাহা হইতে' এই অপাদান কারকের প্রয়োগ দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকৃতিত্বই বুঝাইতেছে। অন্য স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতার অভাব হেতু ব্রহ্মের নিমিত্ত কারণত্বও জানা যাইতেছে। সংসারে ঘট বা স্বর্ণহাররূপ কার্য্য বা উৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে মৃত্তিকা বা সুবর্ণাদির উপাদান-কারণত্ব যেমন তাহা হইতে স্বতন্ত্র, কুম্ভকার বা সুবর্ণকার প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃসাপেক্ষ, জগৎ-কার্য্য সম্বন্ধে ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অধিষ্ঠাতা (কুম্ভকারাদি স্থানীয়) জগৎ সৃষ্টি কার্য্য যাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বের অপেক্ষা করিতে পারে,—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সেরূপ অধিষ্ঠাতা কেহ নাই। শ্রুতিই প্রকাশ করিতেছে, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন।"

শঙ্কর আবার বলিতেছেনঃ—"এতদ্দ্বারাও দেখা যায় যে ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান, যেহেতু শ্রুতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকেই কারণরূপে উল্লেখ করিয়া প্রলয় এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেঃ—"এই সমস্ত ভূত-গ্রাম, আকাশ (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন, এবং আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়।" যাহা হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং যাহাতে যে বস্তু লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা ব্রীহি-যবাদি সম্বন্ধে এই পৃথিবী।

আবার এতদ্দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা জগতের উপাদানত্ব প্রতিপন্ন হয়, কারণ ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেঃ— "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—তিনি আপনাকে স্বয়ংই করিলেন। এতদ্দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব, উভয়ই প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম যিনি কর্ত্তারূপে পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ক্রিয়মানত্ব বা কর্ম্মরূপত্ব কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছিঃ—বিকাররূপে পরিণতি দ্বারা। সেই আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ হইয়াও স্বয়ংই আপনাকে বিকারবিশেষরূপে পরিণমিত করিয়াছেন। বিকাররূপে পরিণাম প্রাপ্তি মৃদাদি প্রকৃতি বা উপাদানের সম্বন্ধেই দৃষ্ট হয়। 'স্বয়ং' এই বিশেষণ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তান্তরানপেক্ষিত্বও প্রকাশিত হইতেছে।"

এইরূপে ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা জগদুপাদানত্ব প্রমাণিত হইল। তবে যে আপত্তি করা হয়ঃ—ঈক্ষা বা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব সংসারে কুম্ভকারাদি নিমিত্ত কারণেই দৃষ্ট হয়, মৃদাদি উপাদান কারণে তাহা দৃষ্ট হয় না,—ইহার উত্তর এইঃ—সৃষ্টি সম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, যেহেতু সৃষ্টি ব্যাপার অনুমানগম্য নয়। তাহা শব্দ বা শ্রুতি প্রমাণেরই গম্য। শ্রুতি অনুসারেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি ঈক্ষিতা বা জ্ঞানময় ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব বা উপাদানত্বও প্রমাণ করিতেছে।

শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া শঙ্করাচার্য্য নিরস্ত হইতেছেন না। তিনি তর্ক দ্বারাও ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। "কারণ হইতে কার্য্য অনন্য",—এই মূল সূত্রের উপরে তিনি তাঁহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ভাবিলে দুঃখ হয় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—যথা ক্রিয়া (Work or kinetic

শক্তির এবং দ্রব্যের রূপ-ব্যত্যয়, এবং অনশ্বরত্ব (Conservation and transformation of energy, conservation and transformation of matter) ইত্যাদি, যাহা আজ কাল অনেকেই অবগত আছেন, শঙ্কর তাহা অবগত ছিলেন না। যদি শঙ্করের তাহা জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার তর্কের মূল তত্ত্ব—"কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব" প্রমাণ করিবার জন্য, তাঁহাকে এত আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব প্রতিপন্ন হয়, যে কারণ থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি, না থাকিলে নয়,—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের, এবং তন্তু থাকিলেই পটের উপলব্ধি, না থাকিলে নয়। এইত নিয়ম যে এক বস্তু থাকিলে, তাহা হইতে ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি দেখা যায় না; যথা,—গো হইতে অশ্ব ভিন্ন, সেজন্য অশ্ব থাকিলে গো-সত্তার উপলব্ধি হয় না। কুলালের সহিত ঘটের যদিও নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব আছে, কিন্তু ভিন্নত্ব হেতু কুলাল থাকিলেও ঘটের উপলব্ধি হয় না। (আপত্তি) কিন্তু একের সদ্ভাবেও ত অন্যের উপলব্ধি সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যথা অগ্নির সদ্ভাবে ধূমের। (উত্তর) তাহা নয়, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গো-গৃহ প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ ধূম দৃষ্ট হয়।"

"কার্য্য কারণের অনন্যত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও হয়। যথা তন্তু সংস্থান সম্বন্ধে,—তন্তু পরিত্যাগ করিলে পট নামক কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। পটরূপ কার্য্যে আতানবিতান-যুক্ত (টানা-পৈরাণ—warp and woof) তন্তু মাত্রেরই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। সেইরূপ আবার তন্তুর মধ্যে অংশু (আঁশ)। অংশুর মধ্যে তাহার অবয়ব সকল। এই প্রকারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ, তিন প্রকার রূপ। তৎপর বায়ু মাত্র, এবং তৎপর আকাশ-মাত্রও অনুমান করা যায়। তৎপর একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। আমাদের কথা এই যে তাঁহাতেই সকল প্রমাণের শেষ।" ২—১—১৫।

আবার বলিতেছেনঃ—"ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়,—যে উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ রূপেই পরকালীন-জাত কার্য্যের কারণেতে সত্তা।" শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেঃ—"হে সৌম্য, পূর্ব্বে এ সমস্ত সংরূপেই ছিল", "পূর্ব্বে এই সমস্ত এক আত্মারূপেই ছিল", ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা "ইদং" বা 'এই' শব্দ গৃহীত কার্য্যজাতের কারণের সহিত সামানাধিকরণ্য বুঝায়। যে বস্তু যেরূপে যাহাতে না থাকে, সেই বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না—যথা বালি হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে, কার্য্য যখন তাহার কারণ হইতে অনন্য, উৎপত্তির পরেও কার্য্য তাহার কারণ হইতে অনন্য জানা যায়।" ২—১—১৬।

আবারঃ—"শব্দ বা শ্রুতি প্রমাণ ভিন্নও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা এবং তাহার কারণ হইতে অভিন্নত্ব যুক্তিসঙ্গত জানা যায়। যুক্তি বর্ণনা করা যাইতেছেঃ—সংসারে দধি, ঘট, বা স্বর্ণহারাদি যাহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ক্ষীর, মৃত্তিকা অথবা স্বর্ণাদি সংগ্রহ করিতে

দেখা যায়। যে দধি ইচ্ছা করে, সে মৃত্তিকা অথবা যে ঘট ইচ্ছা করে, সে ক্ষীর কখনও সংগ্রহ করে না। যাহারা অসৎকার্য্যবাদ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, এই মত সমর্থন করে, তাহাদের কথা সত্য হইলে, সেরূপ করাও সঙ্গত হইত। উৎপত্তির পূর্ব্বে সকলের মধ্যেই সকলের অভাব যদিও সমান বা বিশেষত্ব-রহিত তবু ক্ষীর হইতেই বা কেন দধি হইবে, মৃত্তিকা হইতে কেন হইবে না, অথবা মৃত্তিকা হইতে কেন ঘট হইবে, ক্ষীর হইতে হইবে না? প্রাগসত্ত্ব সমান বা বিশেষত্ব রহিত হইলেও ক্ষীরের মধ্যেই দধি বিষয়ে, এবং মৃত্তিকাতেই ঘট বিষয়ে কোনরূপ উৎকর্ষ বা 'অতিশয়' আছে, যাহা দধি-বিষয়ে মৃত্তিকাতে অথবা ঘট-বিষয়ে ক্ষীরেতে নাইঃ—তুমি হয়ত এরূপ বলিবে। তাহা যদি হয়, তবে এই অতিশয় বা উৎকর্ষবত্ত্ব হেতুই, উৎপত্তির প্রাগবস্থাতে অসৎকার্য্যবাদ অসিদ্ধ, এবং সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। 'অতিশয়' শব্দদ্বারা কারণের কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তিবিশেষই কল্পিত হইতেছে (Compare energy, kinetic and potential)। তাহা না হইলে, যে কোন শক্ত্যন্তর অথবা শক্তির অভাবও সেই কার্য্য উৎপাদন করিতে পারিত,—কারণ অন্যত্ব এবং অসত্ত্ব সর্ব্বত্রই সমান। অতএব কারণের আত্মভূত সেই শক্তিবিশেষ, এবং সেই শক্তিবিশেষের আত্মভূত কার্য্য।" আবার বলিতেছেনঃ—"অশ্ব হইতে মহিষ যেমন ভিন্ন, কারণ হইতে তাহার কার্য্য, অথবা দ্রব্য হইতে তাহার গুণ সম্বন্ধে সেইরূপ ভেদ বুদ্ধির অভাব হেতু তাহাদের তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়।" আবার বলিতেছেনঃ—"উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অভাব বলিলে, উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা, এবং বস্তুরহিত হয়। যেহেতু উৎপত্তি একটী ক্রিয়া, অতএব গত্যাদি ক্রিয়ার ন্যায়, তাহা সকর্ত্তৃকা হইবে। ক্রিয়া অথচ অকর্ত্তৃকা কথাই বিরুদ্ধ। ঘটেরই উৎপত্তি অর্থাৎ ঘটই উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা। তথাপি যদি বল ঘট কর্ত্তা নয়, তবে কি ঘটোৎপত্তি ক্রিয়া অন্য-কর্ত্তৃকা কল্পনা করিতে হইবে? এরূপ হইলে ঘট-কপালাদির উৎপত্তিও অন্য-কর্ত্তৃকাই কল্পনা করিতে হইবে? তাহা যদি হয়, তবে 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে' বলিলে, কি কুলালাদি কারণ সকল উৎপন্ন হইতেছে, বুঝিতে হইবে? কিন্তু লোকে ঘটের উৎপত্তি হইতেছে বলিলে, কুলালাদি কারণ সকল উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করে না। বরং কুলাল পূর্ব্বোৎপন্ন বলিয়াই প্রতীতি থাকে। যদি বলা যায়, 'কার্য্যের উৎপত্তি, এবং আত্মলাভ' বলিলে তাহার স্বীয় কারণের সত্তার সহিত সম্বন্ধলাভ বুঝায়, তবে অলব্ধাত্মক বা অবস্তু কিরূপে সম্বন্ধ লাভ করিবে? দুইটী সৎবস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর, সৎবস্তুর সহিত অসতের, অথবা অসৎবস্তুদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হয় না।

পুনরায় প্রতিপক্ষের অন্য আপত্তির উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন। আপত্তি, যথাঃ—"উৎপত্তির পূর্ব্বেই যদি (ঘটাদি) কার্য্যের সত্তা থাকে, তবে (কুলালাদি) কারকের ক্রিয়া নিরর্থক হয়। (মৃত্তিকাদি) কারণ যেমন পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া, তাহার স্বরূপ নিমিত্ত

নিরর্থক, সেইরূপ কারণ হইতে অনন্যত্ব, অতএব প্রাক্‌সিদ্ধির হেতু, কার্য্যের ও স্বরূপ-সিদ্ধির জন্য (কুলালাদি) কারক-ব্যাপার নিরর্থক। অথচ দেখা যায় (কুলালাদি) কারক-ব্যাপার নিরর্থক নয়। অতএব কুলালাদি কারক-ব্যাপারের অর্থবত্ত্ব সিদ্ধির জন্যই, আমাদের মত যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে (ঘটাদি) কার্য্য থাকে না।" শঙ্কর এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেনঃ—"সেরূপ দোষ হয় না, যে হেতু অনন্য হইলেও কারণকে কার্য্যাকারে ব্যবস্থিত করাতেই কারক-ব্যাপারের অর্থবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। কার্য্যাকারও কারণেরই আত্মভূত, যেহেতু কারণের আত্মভূত না হইলে, কার্য্যাকারের আরম্ভই হইতে পারে না,—এই আমাদের বক্তব্য। আর 'বিশেষ' বা ভিন্ন-প্রকারত্বমাত্র দর্শন হইলেই বস্তুর অন্যত্ব সিদ্ধ হয় না। দেবদত্ত যথন আপনার হস্ত-পদ সঙ্কোচ করে, আর যথন সে তাহার হস্ত-পদ প্রসারণ করে, তখন সে বিশেষত্ব বা ভিন্নরূপত্ব-যুক্ত দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বস্তুর ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ আমরা জানি দেবদত্ত একই। সেইরূপ প্রতিদিনই লোকের পিত্রাদির নানাপ্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের ভিন্ন-বস্তুত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু 'আমার পিতা', 'আমার মাতা' প্রভৃতি আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি বল যে এই সকল স্থলে জন্ম এবং মৃত্যু দ্বারা অন্তরিত না হওয়াতে, এরূপ করা সঙ্গত, কিন্তু অপরাপর স্থলে সঙ্গত নয়। তাহা বলা যুক্তিযুক্ত নয়, যেহেতু মানুষের জন্ম-মৃত্যুর অবস্থাভেদ আমাদের প্রত্যক্ষ। অদৃশ্য (অতি ক্ষুদ্র) বটবীজ প্রভৃতিরও সমান-জাতীয় অবয়বান্তর-যোগে বর্দ্ধিত অঙ্কুরাদি-রূপ যখন আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাকেও আমরা জন্ম বলিয়া থাকি। আবার সে সকল অবয়বের ক্ষয় হেতু, তাহার অদর্শন প্রাপ্তি হইলে, আমরা উচ্ছেদ বা মৃত্যু বলিয়া থাকি। এইরূপে জন্ম এবং মৃত্যুদ্বারা অন্তরিত বা ব্যবচ্ছিন্ন হইলেই, যদি বস্তুর ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অসতের সত্তালাভ, এবং সতের অসত্তালাভ হয়। তাহা হইলে শিশু যখন গর্ভস্থ থাকে, এবং সেই শিশু যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে শয়ান থাকে, (অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে) দুই ভিন্ন বস্তু। এক একজন মানুষও তবে বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য অনুসারে ভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ হইলে পিত্রাদি শব্দ ব্যবহার লোপ করিতে হয়। এইরূপে ক্ষণ ভঙ্গবাদের উত্তর প্রদত্ত হইল।" আবার বলিতেছেনঃ—"যে মনে করে যে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, তাহার মতে কারক-ব্যাপার বিষয়-রহিত হইয়া পড়ে,—কারণ অভাবের বিষয়ত্ব অসম্ভব,—আকাশের বধের জন্য খড়্গাদি অনেক অস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় উপহাস-যোগ্য। যদি বল যে কারক-ব্যাপারের বিষয় সেই সেই কার্য্যেরই সমবায়ী কারণ (উপাদান), তাহা বলিতে পার না; কারণ তোমাদের মতে কার্য্য তাহার সমবায়ী কারণ বা উপাদান হইতে ভিন্ন। কারক-ব্যাপারের বিষয়—সেই উপাদান—যদি কার্য্য হইতে ভিন্ন হইল, তখন তদ্দ্বারা সেই উপাদান হইতে ভিন্ন বস্তু

তাহার সমবায়ী বা উপাদান কারণের নিজেরই অতিশয় বা অবস্থা-বিশেষ মাত্র, তাহাও তুমি বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদানরূপে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিতে হইল।" এইরূপে আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন :— "অতএব ক্ষীরাদি দ্রব্যই যখন দধি প্রভৃতি রূপে অবস্থান করে, তাহাই তখন 'কার্য্য' নামে অভিহিত হয়। শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও কারণ হইতে কার্য্যের ভিন্নত্ব দেখান যায় না। মূল কারণও সেইরূপ কার্য্যের পর কার্য্যের আকার ধারণ করিয়া, নটের ন্যায় শেষকার্য্যে পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হইয়া, সর্ব্বব্যবহারের পাত্রত্ব লাভ করে।" ২—১—১৮ ॥

পরের সূত্রে আবার শঙ্কর বলিতেছেন :— "পট যখন সম্যক বেষ্টিত থাকে, তখন তাহা "পট কি অপর কোন দ্রব্য, স্পষ্ট বুঝা যায় না। যখন তাহা প্রসারিত করা যায়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেই সম্বেষ্টিত দ্রব্যই পট। প্রসারণ দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়। সম্বেষ্টিত অবস্থায় তাহা পটই, এরূপ জানা গেলেও, তাহা কত বড়, তাহা বিশেষ ভাবে জানা যায় না। প্রসারিতাবস্থায় তাহা কত বড়, তাহা বিশেষভাবে জানা যায়। সম্বেষ্টিত পট হইতে প্রসারিত পট ভিন্ন নয়। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে তন্তু-প্রভৃতি কারণাবস্থায় অবস্থিত পটাদি কার্য্য অস্পষ্ট থাকিয়া, তাঁত (তুরী) মাকু (বেম) তাঁতি (কুবিন্দ) প্রভৃতি কারক-ব্যাপারদ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হইলে পটরূপে স্পষ্টতঃ গৃহীত হয়। সম্বেষ্টিত এবং প্রসারিত পটের দৃষ্টান্ত অনুসারেও, কার্য্য তাহার কারণ হইতে অভিন্ন।" ২—১—১৯ ॥

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন :—"আবার সংসারে দেখা যায়, প্রাণ-অপান প্রভৃতি প্রাণ-বিকার প্রাণায়ামদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যখন কারণরূপে অবস্থিত থাকে, তখন কেবলমাত্র জীবন রক্ষা কার্য্য নিষ্পন্ন করে কিন্তু আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্যান্তর নিষ্পন্ন করে না। আবার সেই সকল প্রাণবিকার পুনঃপ্রবৃত্ত হইলে, জীবন রক্ষা ভিন্ন আকুঞ্চনপ্রসারণাদি কার্য্যান্তরও নিষ্পন্ন করে। অথচ প্রাণা-পানাদি প্রাণবিকার প্রাণেরই রূপান্তর ভিন্ন অন্য কিছু নয়,—যেহেতু সমীরণ স্বভাব বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্বও এইরূপ। অতএব সমস্ত জগৎ যখন ব্রহ্মকার্য্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন তখন এই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতংমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" সিদ্ধ হইল।২—১—২০ ॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

কেন ?

যেতেছে সরিয়া নিশার আঁধার
আলোক আসিছে ফিরি ;
আবার আলোক ডুবিছে সুধীরে
আঁধার আসিছে ঘিরি।

আঁধারে, আলোকে খেলিছে এরূপে
চিরদিন ধরাপরে ;
হৃদয়ের আলো নিভে যদি কভু
কেন নিভে চিরতরে ?

চিঠি

(গল্প)

গুডফ্রাইডের ছুটিতে পুরী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রতীরে বালির চরে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি বিপিন। সে আমার বাল্যবন্ধু। আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"বিপিন যে!"

বিপিন বিস্ময়ের সহিত বলিল—"বাঃ! তুমি! তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।"

বহুদিন পরে দুই বন্ধুর মিলন;—আমরা পাশাপাশি বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলাম। সন্ধ্যা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রতীর জনশূন্য—কেবল আমরা দুই বন্ধুতে বালির রাজত্বের অধিপতি হইয়া বিরাজ করিতেছি;—সম্মুখে পায়ের কাছে পড়িয়া সমুদ্র শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহের মতো গর্জ্জন করিয়া ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছে; চাঁদনিতে আমাদের অধিকৃত বালির রাজত্বটি পরীর রাজত্বে রূপান্তরিত হইয়া গেছে।

বিপিনের জীবনটা যেন রোমান্সের জাহাজ! তার মধ্যে কত ঘটনাই যে আছে। সেগুলা তাহার মুখে শুনিলে মনে হয় যেন উপন্যাস শুনিতেছি।

আমি বলিলাম—"বিপিন! আজকের এমন রাতটা! তোমার দুটো একটা রোমান্স শোনাও।"

বিপিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"বলছি শোন। কিন্তু মাঝে মাঝে টিপ্পনি কেটোনা,—তাহলে সব রোমান্স মাটি হয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা।"

বিপিন বলিতে লাগিল—

আমি তখন ট্রেণিং স্কুলের হেড মাষ্টার; কলিকাতার এক বাসাবাড়ীতে থাকি। আমার ঠিক সম্মুখের বাড়ীতে থাকিত এক বিদেশী রমণী। সে মুসলমানী। কেহ তাহাকে চিনিত না, জানিত না, তবু তাহার সম্বন্ধে গুজবের অন্ত ছিল না। কেহ কেহ বলিত —ইনিই সেই দেলেরা বিবি যিনি এককালে নৃত্যগীতে লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা মহল সরগরম রাখিয়াছিলেন। এসকল কথা কি করিয়া প্রচার হইল তাহা জানিনা;—কিন্তু এখন সে বাড়ীর মধ্যে একরকম বন্ধই থাকিত—কোথাও যাইত না—দুএকটি দাসদাসী ভিন্ন তাহার ঘরে কাহাকে প্রবেশ করিতেও দেখিতাম না। আমি যে ঘরে বসিতাম সেখান হইতে তাহার শয়নকক্ষ দেখা যাইত। সেইজন্য সামনের জানালাটা প্রায় আমি বন্ধ করিয়াই রাখিতাম।

আমি সেদিন স্কুলে যাই নাই, শরীর ভালো ছিল না, দুপুর বেলা একলা বসিয়া একখানা ইংরাজী নভেলের পাতা উল্‌টাইতেছিলাম—একটু তন্দ্রা আসিতেছিল—এমন সময় হঠাৎ শুনিলাম দ্বারের বাহির হইতে মিহি গলায় কে ডাকিল—'বাবুজি!'

আমি বুঝিতে পারিলাম না কে ডাকিতেছে, উদ্‌গ্রীব হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আবার ডাক আসিল

'বাবুজি'। আমি সাড়া দিলাম—'ভিতর আও'।

দরজা ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল; আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম; বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম;—সম্মুখে আমার প্রতিবাসিনী বিদেশিনী দেলেরা!

দেলেরাকে ঠিক যুবতী বলা যায় না। যৌবনের লাবণ্য তাহার দেহ হইতে বিদায় লইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু তবুও সে সুন্দরী। বয়সের জীর্ণতার সহিত তাহার সৌন্দর্য্যের যে একটা সংগ্রাম চলিতেছে তাহা তাহার চেহারা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সেই জীর্ণতার উপর পালিস ঘসিয়া তাহার সৌন্দর্য্যকে সে বাহির হইতে এমনি অটুট রাখিয়াছে যে সহসা দেখিলে তাহার যৌবন যে নির্ব্বাণমুখ তাহা ঠাহর করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

দেলেরার দিকে চাহিতে আমার মনে হইল যেন তাহার সমস্ত দেহে একটা অবসাদ-ভরা বিষণ্ণতা জড়াইয়া আছে;—তাহার অমন উজ্জ্বল আঁখি মর্ম্মান্তিক কাতরতায় ছল ছল করিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে আমার ঘরে দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সেই সকরুণ দৃষ্টিতে আমার সে ভাব দূর হইয়া গেল। মনে হইল, বেচারা নিশ্চয় কেনো বিপদে পড়িয়া আসিয়াছে।

দেলেরা আমার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবুজি! আমার একটা উপকার করবে?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"কি?"

সে কহিল—"বড় জরুরী চিঠি। মেহেরবাণী করে লিখে দেবে?"

আমি বলিলাম—"চিঠি! তুমি পাঠাবে? কাকে?"

সে কহিল—"ইয়াসিন্‌কে!"

ইয়াসিন্ যে কে তাহা বোঝা গেল না। আর প্রশ্ন করা শোভন হইবে না ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিয়া উঠিলাম—"আমি তো ফার্সি জানিনা—বাংলা লিখ্‌লে চল্‌বে?"

সে কহিল—"খুব চলবে। যাতেই লেখ কোনো ক্ষতি হবে না।"

আমি কাগজ কলম টানিয়া লইয়া বলিলাম—"বল, কি লিখতে হবে।"

সে বলিল—"উঁহু! ও কাগজে হবে না বাবুসাহেব! এই কাগজ নিন।" বলিয়া সে জরী-বসানো মেরজাইয়ের অভ্যন্তর হইতে একখানা ছবি-আঁকা রঙিন চিঠির কাগজ বাহির করিল,—তাহাতে আতরের গন্ধ ভরভর করিতেছে।

আমি কাগজখানা লইয়া লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বলিলাম—"বল।"

দেলেরা বলিল—"লেখ শাহাজাদা!"

আমি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"শাহাজাদা!"

সে বলিল—"হাঁ! শাহাজাদা! ইয়াসিন্! আমার আশক্!"

আমি লিখিতে লাগিলাম; দেলেরা বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার কথার মধ্য হইতে একটা আকুলতা যেন উপচাইয়া উঠিতেছিল;—ইয়াসিনের সহিত মিলনের

সে যে কি করিয়া প্রকাশ করিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া সে ছটফট্ করিতেছিল। কোনো কথাই যেন তাহার কাছে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল না। ইয়াসিন্ যেন অন্তত একখানি চিঠি তাহাকে লেখে এই কথা সে এমনি কাতরতার সহিত বলিতেছিল যে মনে হইল যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! শেষে চিঠি সমাপ্ত করিয়া বলিল—"লেখ, পিয়ারী দেলেরা।"

চিঠি লেখা শেষ হইলে আমি বলিলাম—"ঠিকানা?"

"হাঁ, হাঁ, ঠিকানা!" বলিয়া দেলেরা আকাশের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—"লেখ, শাহীবাগ লক্ষৌ।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানি ধীরে ধীরে আমার হাত হইতে লইয়া দেলেরা চলিয়া গেল;—আর আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না।

আমার মনে একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। কে এই রমণী? ইহার অতীত জীবনের রহস্য কোন্ গোপনতার অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া আছে কে জানে! আমি আর কৌতূহল দমন করিয়া রাখিতে পারিলাম না। সেই অবধি আমার বসিবার ঘরের জানালাটা খুলিয়া বসিতে লাগিলাম। যতই দেখিতাম, মনে হইত দেলেরার জীবনটা যেন একটা কুহেলিকার মধ্যে ঘেরা রহিয়াছে।

দেলেরাকে আমি যেটুকু দেখিতাম তাহাতেই আমার বোধ হইত তাহার মধ্যে কেমন একটা অসামঞ্জস্য আছে। কখনো মনে হইত সে দেবীর মতো পবিত্র;—যেন প্রেমের একটা শুভ্র জ্যোতি তাহার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে বেষ্টন করিয়া দীপ্তি পাইতেছে; কখনো মনে হইত সে পিশাচী—একটা পাপের লীলা তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। কখনো সে এমনি করিয়া বিরস বদনে বসিয়া থাকিত যে মনে হইত যেন কোন্ এক চির-বিরহিণী নারী প্রিয়তমের সহিত মিলনের জন্য কোন্ যুগযুগান্তর হইতে অবিচলিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছে; কখনো সে এমন মাতাল হইয়া উঠিত যে তাহার দিকে চাহিতে ভয় করিত;—জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ তাহার চোখ দুইটা যেন নরকের অগ্নি ছিটাইতে থাকিত!

দেলেরার মধ্যে এ সমস্তই সত্যরূপে ছিল। দেবীর ভাব, বিরহিণীর ভাব সে যে অভিনয় করিত আমার তাহা মনে হয় না। আমার মনে হয় এই অজ্ঞাতকুলশীলা নারীর পঙ্কিল হৃদয়ের মধ্যে কোথাও একটা উজ্জ্বল পবিত্রতা লুক্কায়িত আছে, সুবিধা পাইলেই তাহা জাগিয়া উঠে।

দুই সপ্তাহ চলিয়া গেছে। আমি সেদিন সন্ধ্যাবেলা একা ঘরে বসিয়া আছি হঠাৎ চাহিয়া দেখি দরজা ঠেলিয়া দেলেরা প্রবেশ করিল। আজ আর সে আমার নিকট হইতে প্রবেশের অনুমতি চাহিল না। তাহাতে আমি চটিয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু দেলেরার মুখের পানে চাহিতে তাহাকে কোনো কড়া কথা বলিতে পারিলাম না। আমি মৃদুস্বরে শুধু বলিলাম—"কি?"

সে বলিল—"বাবুসাহেব ব্যস্ত আছেন?"

আমি বলিলাম—"না। কি দরকার তোমার? ইয়াসিংকে চিঠি লিখ্‌তে হবে নাকি?"

সে তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"ইয়াসিং কী! ইয়াসিন্ বল!"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, তাই। এখন কি দরকার বল দেখি।"

সে বলিল—"একখানা চিঠি লিখতে হবে।"

আমি বলিলাম—"কাকে?"

—"দেলেরাকে!"

—"দেলেরা?"

সে গম্ভীরভাবে বলিল—"হাঁ, দেলেরা!"

আমি বিস্মিত নয়নে তাহার দিকে চাহিলাম। সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। আমতা আমতা স্বরে বলিতে লাগিল—"দেলেরা আর একজন আছে। আমার বন্ধু—বন্ধু ঠিক নয়—পরিচিত একজনের প্রণয়িনী সে। তার নামও ইয়াসিন্। সেই দেলেরাকে চিঠি পাঠাতে চায়—সে নিজে লিখতে জানেনা।"

আমি দেলেরার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিলাম। সে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল;—তাহার হাতের আঙুলগুলা কাঁপিতে লাগিল; সে ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার পানে একবার মাত্র চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

প্রথমটা আমার কিছুই বোধগম্য হয় নাই। হঠাৎ সব ব্যাপার যেন খোলসা হইয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"বোঝা গেছে তোমার চাতুরী! ইয়াসিন্ ফিয়াসিন্ ওসব কিছু নয়—এমনি করে চিঠি লেখাবার অছিলায় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার তোমার মতলব! বেরোও আমার ঘর থেকে তুমি! আমার কাছে ওসব চালাকী চল্‌বে না।"

আমার চীৎকারে দেলেরার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কেমন ইতস্তত করিতে লাগিল;—চলিয়া যাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিল কিন্তু যাইতে পারিল না; কি একটা কথা তাহার মুখে আসিয়া আটকাইয়া গেল;—কেবল মৃদু কথার গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সে কিছুক্ষণ মুখ নীচু করিয়া ওড়নার আঁচল খুঁটিতে লাগিল, তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা! বাবুজী!" বলিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল;—তাহার উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস ঘরের চারিদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাতে আমার তখনই মনে হইল দেলেরার উপর আমি যে সন্দেহ করিয়াছি তাহা অমূলক। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া আমার মন বলিয়া উঠিল—ছি, ছি এ কী করিলাম!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক্ কলিাম একবার যাওয়াই ভালো। কিন্তু দেলেরার ঘরে যাওয়া? দোষ কি? আমি শুধু ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে যাইতেছি বই ত নয়!

আমি তাহার ঘরে পৌঁছিয়া দেখিলাম সে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে শুধু উঠিয়া বসিল, কোনো কথা কহিল না।

আমি ডাকিলাম—"দেলেরা!"

দেলেরা কোনো উত্তর করিল না, কেবল আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম—"দেলেরা! আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেচি—তুমি কিছু

দেলেরার রুদ্ধ অভিমান যেন উথলিয়া উঠিল। তাহার চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"বাবুসাহেব! একখানা চিঠি লিখ্‌তে তোমার এত কষ্ট?"

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না।

দেলেরা অভিমানের স্বরে বলিতে লাগিল—"ইয়াসিন্ বোলে কেউ নেই! নাই বা থাকল। তুমি মাত্র চিঠি লিখে দিচ্ছ বই ত নয়—"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"ইয়াসিন্ মিথ্যা! তাহলে এ সব তোমার চাতুরী!"

দেলেরা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল—"না।"

—"তাহলে চিঠি লেখাতে আমার কাছে গিয়েছিলে কেন?"

—"আমি যে নিজে লিখতে জানিনা। ইয়াসিন্‌কে চিঠি না পাঠালে—" বলিয়া দেলেরা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম—"এই যে তুমি বল্লে ইয়াসিন্ নেই!"

—"নেই তো!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। একবার মনে হইল দেলেরা পাগল নাকি! তারপর মনে হইল নিশ্চয় এ তাহার চাতুরী—আমাকে ভুলাইবার ফাঁদ! আমি কঠোর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলাম। ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলাম—"খবরদার! আমার ঘরে আর তুমি চিঠি লেখাতে যেয়ো না।" বলিয়া আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। দেলেরা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমার মুখের পানে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে বাক্স হইতে আমার লেখা চিঠিখানা বাহির করিয়া আনিল। আমার হাতের কাছে সেখানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"এই নাও তোমার চিঠি। যদি কোনো অপরাধ করে থাকি ত ক্ষমা কোরো।" বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এ চিঠি এখনও পাঠাও নি?"

সে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—"পাঠাব কাকে?"

—"কেন—ইয়াসিন্‌কে!"

—"ইয়াসিন্ বোলে ত কেউ নেই!"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সমস্তটাই যেন প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমি কোনো কথা না কহিয়া দেলেরার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

দেলেরা বলিল—"সত্যই ইয়াসিন্ বোলে কেউ নেই।"

মুখে সে একথা বলিল বটে কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে তাহার অন্তর যেন একথায় সায় দিতেছে না।

দেলেরা আবার বলিল—"ইয়াসিন্ থাকুক আর নাই থাকুক তাতে তোমার কি! তুমি শুধু একখানা চিঠি লিখে দিয়েছ বইতো নয়! তাতে তোমার এমন কী ক্ষতি হয়েছে!"

আমি বলিলাম—"ক্ষতি কিছু নয়, কিন্তু মিছামিছি চিঠি লেখালে কিসের জন্যে?"

—"কেন ইয়াসিনের জন্যে!"

—"ইয়াসিন্ বোলে ত কেউ নেই!"



রাম ও শূর্পণখা।

দেলেরা এবার বিরক্তির স্বরে বলিল—"নাই বা সত্যি রইল ইয়াসিন্! তাতে কি! আমার মনে হয় সে আছে;—সে অনেক দূর দেশে বিরহ-কাতর হৃদয়ে আমার প্রতীক্ষায় রয়েচে।"

আমি খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া দেলেরার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম—"আর দেলেরা? যার নামে চিঠি লেখাতে গিয়েছিলে—সে?"

দেলেরা বলিল—"সে আমি। সে চিঠি আমার কাছেই আসত! সে চিঠি পাবার জন্যেই তো বাবুসাহেব! আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। তেমন চিঠি আমায় কেউ লেখে না;—কেউ আমায় ভালোবাসে না।"

বলিতে বলিতে দেলেরার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কাতর দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে লাগিল!

আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

দেলেরা বলিতে লাগিল—"এমন সময় ছিল যখন বিদেশ থেকে আমার চিঠি আসত;—আমি দিনরাত সেই চিঠির প্রতীক্ষায় থাকতুম—সে চিঠিতে কত কথাই থাকত—কত আদরের কথা সে আমার লিখত। সে চিঠি পড়ে আমার প্রাণ ভরে উঠত;—সে চিঠি আমি বুকে করে রাখতুম! তেমন চিঠি আর এখন আমায় কেউ লেখেনা।" বলিতে বলিতে দেলেরা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"আমি এখনই লিখে দিচ্চি দেলেরা! বল কি লিখতে হ'বে?"

দেলেরা বিস্ময়ের সহিত বলিল—"আমি কি বলব বাবুসাহেব!"

আমি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম।

দেলেরা বলিল—"আমি মেয়ে মানুষ আমি বলে দিলে তো ঠিক হবেনা;—তুমি লেখ।"

আমি থতমত খাইয়া বলিলাম—"তাই তো! কি লিখি?"

দেলেরা বলিল—"কি লিখবে? এমন কি তোমার কেউ নেই যে তোমার চোখের মণি, হৃদয়ের রতন, প্রাণের প্রাণ?—যাকে না দেখলে তুমি আঁধার দেখ—যাকে প্রাণের কথা বলবার জন্যে প্রাণ পাগল হয়ে ওঠে? তাকে লিখতে হলে যেমন করে লিখতে তেমনি করে লিখে দাও।"

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা কাগজ দাও—লিখে দিচ্চি।"

দেলেরা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না বাবুসাহেব! এত তাড়াতাড়ি নয়। তাড়াতাড়ি করলে ভালো হবে না। বেগারঠেলা, যা-তা লেখা আমি চাই না। তোমার অবসর মতো, তুমি বেশ করে সব গুছিয়ে, তোমার মনের মতো করে লিখে রেখো,—আমি আর একদিন গিয়ে চিঠি শুনে আসব।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল,—গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশব্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল কোন্ একটা অদৃশ্যযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জ্জনের মত প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু যেমন মৃদঙ্গ করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরামধারা সমস্ত আকাশের মর্ম্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে সুর শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাত্ম্য; ইহাতে সেই বড় সুরটির শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তাই আমি চুপ করিলাম।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জ্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জলবাতাসের শব্দের অনুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা একটি গান; তাহাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মত একটির পরে আরেকটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হইতেছিল।

অথচ আমার মনে হইতেছিল তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে,—তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি। এই গানই পূজামন্দিরের সুগন্ধি ধূপের ধূমের মত আকাশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করিয়া কেবলি উপরে উঠিতেছে। সমুদ্রের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যাহা উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে বরঞ্চ দেখিতে পাই সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে কিন্তু দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্ব্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে।

চোখে লাগিতেছে স্পন্দনের আঘাত আর মনে দেখিতেছি আলো; দেহে ঠেকিতেছে বস্তু আর চিত্তে জাগিতেছে সৌন্দর্য্য; বাহিরে ঘটিতেছে ঘটনা আর অন্তরে ঢেউ খেলাইয়া উঠিতেছে সুখদুঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়, আর-একটার আয়তন নাই তাহা অখণ্ড। এই যে "আমি" বলিতে যাহাকে বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্ত্তের চিন্তা ও অনুভূতি অথচ এই সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে একটি জিনিষ আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি, এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপমাত্র নহে বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনই সফল হইতে পারে না। অনেক সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তখন, আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষরূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড়পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি ফিরি কাজ করি কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিত্তদ্বারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্য তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটার অনুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। তাঁহারা এক রূপকে আর এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিষটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপক মাত্র—তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোন নকল দেখিতে পাওয়া যায়? কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিনী বলিবার কি মানে হইল? তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সঙ্গীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সঙ্গীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড় ভাল লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্দ্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কিনা জানিনা। অন্তত আমি সারং রাগকে মধ্যাহ্ন কালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিনা। তা হোক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নবনব রাগিণী বাজিতেছে আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটী গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

য়ুরোপের বড় বড় সঙ্গীত রচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্ত্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে

আলোচনা করা যাইবে। আপাতত য়ুরোপীয় সঙ্গীতসভার বাহির দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গানবাজনা করিয়া থাকেন। যখনি সেরূপ বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোনে গিয়া বসি। বিলাতী গান আমার স্বভাবত ভাল লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ভাল জিনিষ ভাল লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরস্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়। সেই জন্য য়ুরোপীয় সঙ্গীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভাল না লাগে তখনো তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া চুকাইয়া দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও দুই একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই শ্রোতারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা বিশেষ রূপে জমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটী করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোন গান বা ইংলণ্ডের গৌরবগর্ব্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায় সঙ্গীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেম নিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর সঙ্গীতের ভিতরকার শক্তি নহে তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস। অর্থাৎ হৃদয়াবেগের উত্থান পতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা।

ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো মৃদু কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু গান ত স্বভাবের নকল নহে, কেননা, গান আর অভিনয় ত এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যখন ইহাদের গান শুনি তখন আমার কেবলি মনে হইতে থাকে হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু সঙ্গীতে ত আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই ন। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা ত আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সঙ্গীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্নজাতীয়। কারণ, বাহিরের দিকে যাহা আবেগ অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য্য। ঈথরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে তবে তাহাতে সঙ্গীতের

সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিততকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না সেইখানেই সঙ্গীতের প্রভাব! সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদী নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।

কিন্তু সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া ঝোঁক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সঙ্গীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মত সঙ্গীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিষ; কবিতার ছন্দের মত সে তাহার সৌন্দর্য্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।

অভিনয় জিনিষটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয় তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায় মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার মত বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা-সাক্ষীর সেই গলদঘর্ম্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিংএর হ্যাম্‌লেট—ও ব্রাইড্ অফ্ লামার্ম্মুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিং-এর প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে;—তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা ত আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট জিনিষটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানব-জীবনের সাধনাতেও যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্যউপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধনায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে এই তাহার সত্য লক্ষ্য।

যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে ছেলে-ভুলাইবে না।

এই প্রবলতার ঝোঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলি ধাক্কা মারিবার চেষ্টা য়ুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর য়ুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মত করিয়া দেখিতে চায়। এইজন্য যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি সেখানে দেখিতে পাই, হাত দুখানি জোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা দুটি উল্টাইয়া ভক্তির বাহ্য-ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিস্ফুট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে যে সকল ছাত্র বিলাতী আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পন্থায় ছুটিয়াছে। তাহারা মনে করে বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে—কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা ত তাহাদের সাধনা নহে—যাত্রার দলে ছাড়া আর ত কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক-শিল্পীরা তাপসবুদ্ধের মূর্ত্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ—তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব গণিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপসবুদ্ধের মূর্ত্তি গড়িয়াছিল কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আন্তরমূর্ত্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই—তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব্ব করিতেই হইবে—বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরব সমুদ্র
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

সুজান-দ্বীপ

প্রয়াগে যমুনাবক্ষে সুজান-দ্বীপ নামে একটি পাহাড়-দ্বীপ আছে। আমরা বড়ুয়াঘাট হইতে নৌকাযোগে একদিন তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। গঙ্গার যেমন বেণীঘাট, যমুনার তেমনই বড়ুয়াঘাট প্রধান। কিন্তু বেণীঘাট সঙ্গমঘাট বলিয়া একটি প্রধান তীর্থ স্থান, কাজেই এ ঘাটে যেমন লোকের ভিড়, নিশানের কারখানা, বড়ুয়াঘাটে তাহার



কিছুই নাই। সমুদ্র নিকটে নহে বলিয়া গঙ্গাযমুনা কোন নদীতেই এখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে না—তাই নদীতে তেমন স্রোতের বেগ নাই,—নৌকা যেদিকে ইচ্ছা সহজেই চালান যায়। প্রয়াগে নৌকার চলাচলও যে বেশী আছে তাহাও নয়, যমুনার পুলের কাছে—নৌকার যেখানে আড্ডা সেখানেই মোট ৫।৬খানি মাত্র নৌকা সর্ব্বদা বাঁধা থাকে, আর নদীর বুকে মাঝে মাঝে দুএকখানি নৌকা চলিতে দেখা যায়।

ধোপারাই বড়ুয়াঘাটের প্রধান শোভা। যমুনার ধারে সারাদিনই প্রায় সার গাঁথিয়া ধোপারা আহা ওহো শব্দ করিতে করিতে তালে তালে কাপড় কাচে। হায়! সেকালে যমুনাপুলিনে শ্যামের সেই বংশীধ্বনি—আর একালে ধোপাদের এই চীৎকার সঙ্গীত! ঘাটের উপরেই প্রায় দুইটি বড় বড় অট্টালিকা —একটি ফকীরের—একটি রাজার। রাজার বাড়ীর প্রস্তর গেট চন্দন কাঠের বাক্সের মত ফুললতাপাতা কাটা। এখানকার ধনী মাত্রেরই প্রায় পাথরের বাড়ী। আর ইংরাজমাত্রেরই প্রায় খোলার বাঙ্‌লা। যমুনার ধারের মিশনারীদের সুদৃশ্য সুন্দর বাঙলাখানি রাজপ্রাসাদকেও যেন টেক্কা দিতেছিল।

আমরা বড়ুয়াঘাট হইতে আন্দাজ এক ক্রোশ আসিয়া দেখিলাম—গহনাগাঁটি ও রঙিন কাপড়-পরা স্ত্রীলোকেরা ঝম ঝম করিয়া ও ফিটফাট পুরুষেরা সার গাঁথিয়া তীর দিয়া চলিতেছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় মাঝি বলিল—"নিকটে শ্যামা-মায়িজির গাছতলায় সকালে মেলা ছিল—সেখান হইতে লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে।" শুনিলাম সে বৃক্ষটি নিকটেই। সেইখানে নৌকা লাগাইতে হুকুম দিলাম। কিছুপরে একটা পাহাড়ের মত উঁচু পাড়ের নীচে নৌকা থামিল। আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটা বাঁধান গাছতলায় কতকগুলা ভাঙ্গা-চোরা মূর্ত্তি—তাহাই শ্যাম-মায়িজি। সকালে এইখানে মেলা হইয়া গিয়াছে, পুতুলগুলো সব সিঁদুর মাখান—আর নিকটে অনেক ভাঁড়কোঁড় পড়িয়া আছে—তাহাই মেলার অবশেষ। সেই উচ্চ পাড়ের নিম্নদেশ দিয়া যমুনার একটা শাখানদী বর্ষাকালে কানপুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। এখন তাহার শুষ্ক চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই উচ্চ স্থান হইতে যমুনা দেখিতে কি সুন্দর! নীল-আকাশ প্রতিবিম্বিত যমুনার জল এত ঘোর নীল যে সমুদ্রও যেন তত সুনীল নহে। সেই কাল জলে তীরের বৃক্ষচ্ছায়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সূর্য্যের কিরণ চিক চিক করিতেছে সমস্ত আকাশটা তাহার মধ্যে তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতেছে পড়িতেছে; একটা ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে অসীম জগৎসংসারের যেন লীলাখেলা চলিয়াছে।

এখান হইতে আরও অনেক দূরে গিয়া প্রায় ২টার সময় সুজান-দ্বীপে পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য আমাদের সঙ্গে খাদ্যাদি ছিল। দ্বীপটি স্তরে স্তরে দীর্ণ বিদীর্ণ একটি প্রকাণ্ড পাষাণমূর্ত্তি। তাহার পদতলে নদীর জলে বড় বড় ভাঙ্গা পাথর গড়াগড়ি যাইতেছে, দ্বীপগাত্রে একএকটা চাঙ্গড়া এমনই ভাবে ঝুঁকিয়া আছে—যেন এখনই পড়িয়া যাইবে।

যমুনার জলের মধ্যে স্তরে স্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদারিত সেই উচ্চ পাহাড়ের মাথায় একটি শিব-মন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্য নীচে হইতে মন্দির পর্য্যন্ত বরাবর পাহাড়কাটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরমধ্যে জনমানব নাই। মন্দিরের নিকটে একটিমাত্র নিমগাছ —আর দুএক স্থলে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দুএকটা আগাছার জঙ্গল। চারিপাশের আর সমস্ত অসমান উদ্ভিদশূন্য জমী মাজা পাথরের মত মসৃণ। মন্দিরে ভিতরের দেয়ালে দেয়ালে ফার্সি লেখা। শিব মন্দিরে ফার্সি লেখা কেন বুঝিতে পারিলাম না।

এই দ্বীপের সম্মুখে যমুনার তীরে আর একটি উঁচু পাহাড়—মধ্যে কেবল একটা সঙ্কীর্ণ জলের ব্যবধান। দেখিলে মনে হয় এই দুই পাহাড়—আগে একটিমাত্র সংলগ্ন পাহাড় ছিল পরে কোন কারণে মধ্যস্থিত অংশ ভাঙ্গিয়া এখন ইহারা এমন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সুজান-দ্বীপ দেখা হইলে নামিয়া নৌকাযোগে আমরা ঐ পাহাড়ের পদতলে পৌঁছিয়া সেখান হইতে উপরে উঠিলাম। এ পাহাড়ের উপর সম্মুখা-সম্মুখী দুইটী মন্দির— একটী কৃষ্ণরাধার একটী শিবের। কৃষ্ণরাধার মন্দিরটী বেশ সুসজ্জিত। এ পাহাড় জনশূন্য নহে, এখানে মন্দিরের কাছেই লোকজনের বসতি আছে, মন্দিরের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একজন পুরোহিত বাস করেন। এই পুরোহিতের কাছে শুনিলাম, নবাব সাসুজা তাঁহার এক প্রিয় হিন্দু কর্ম্মচারীর অনুরোধে যমুনাবক্ষস্থ এই দ্বীপে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাঁহার নিজের নামে ইহার নামকরণ করেন। তখন বুঝিলাম শিবের মন্দিরে ফার্সি লেখা কেন?

এই সব দেখিয়া শুনিয়া নৌকা ছাড়িতে প্রায় চারিটা হইয়া গেল। বিকালে যমুনার দৃশ্য কি চমৎকার! পশ্চিম আকাশের লাল আভায় নদীর পশ্চিমদিক লালে-লাল হইয়া উঠিয়াছে। জলের মধ্যে যেন সহস্র সহস্র রাঙ্গা জবা ফুটিয়াছে, আর উপকূলে উঁচু উঁচু সোজা পাড়ের উপর ছোট ছোট কুটীরে ও বড় ছোট গাছ-পালার গায়ে গায়ে সেই লালের স্নিগ্ধ লাবণ্য পড়িয়াছে। সেই সোজা পাড়ের উপরকার কুটীরগুলি দেখিলে কেমন ভয় ভয় করে, মনে হয় তাহারা যেন নদীর লালজলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই ভাঙ্গনধরা তীরের উপর আর এক বর্ষা পর্য্যন্ত কুটীরগুলি রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে হইল না। পশ্চিমের এই আলোক পথ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিকে অন্ধকারের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম এখনো স্নিগ্ধ লাবণ্যময়, কিন্তু পূর্ব্বদিক একবারে অন্ধকার কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সেই কুয়াসার প্রাণের মধ্যে আমাদের সম্মুখ দেশে পুলের একটা আলো এক একবার কেবল আলেয়ার মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, আর পাশে নৌকার জানালা দিয়া আকাশের এক একটী তারা চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে—দুই একটা নদীর জলে নৃত্য করিতেছে। একদিকে আলোক একদিকে অন্ধকার আমরা মধ্যের সন্ধিস্থল হইতে যাত্রা করিয়া আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমাগত অন্ধকার কুয়াসার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। সেখানে আশ্রয় ফেলিয়া আসিয়াছি —মানুষ মানুষ আমরা!

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাবিচার

এ দেশের গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীশিক্ষার ফল ভাল কি মন্দ হইয়াছে, এই বিষয়ে সেদিন কোন একটি বিদুষী মণ্ডলীতে বাদ প্রতিবাদ হয়। শ্রীমতী 'ক' আলোচ্য বিষয়টির পক্ষে, এবং শ্রীমতী 'খ' সজোরে বিপক্ষে বলার পর, শ্রীমতী 'গ' 'ঘ' প্রভৃতি দুই বিপরীত পক্ষ যথাক্রমে সমর্থন করিলেন। অনেক প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনান্তে অধিকাংশের মতে সাব্যস্ত হইল যে আমাদের ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষার ফল ভালই হইয়াছে।

একজন প্রবীণা বলিলেন তাঁহাদের কালে স্ত্রীশিক্ষার কুফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার এই কথাটি মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ছোট ছোট ভাইবোনের তত্ত্বাবধান, রন্ধন ও সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে পটু হইয়া, উপরন্ত নিজেকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে। এবং আজকালকার মেয়েরাও যদি এই কথাটি স্মরণ রাখে তবেই স্ত্রীশিক্ষায় সুফল ফলিবে, নচেৎ নহে। কেহ বলিলেন কিছু কিছু পথভুল হইলেও, অশিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষা শ্রেয়। কেহ বলিলেন এখনো স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল বিচারের সময় আসে নাই।

কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল স্ত্রীশিক্ষা, এবং অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর উচ্চতর স্ত্রীশিক্ষা বাঙ্গলা দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব কোন্ পথে যাইতেছি, ইহা ঠিক কি ভুল, এবং আমাদের গম্যস্থান কোন্‌টি, তাহা বিচার করিবার সময় কি হয় নাই?—কর্ম্ম-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাস্রোত চিরদিন পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই আমরা আজ পর্য্যন্ত ভরসা পাই যে, মানব ভ্রান্তির সংস্কার করিতে করিতে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

আমারত মনে হয় সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের ন্যায়, স্ত্রীশিক্ষার ফল সম্পূর্ণ ভালও হয় নাই, সম্পূর্ণ মন্দও হয় নাই। সুতরাং এক কথায় বা সমগ্রভাবে ইহার বিচার করা অসম্ভব। দুঃখের বিষয় সমাজ সংস্কার করিতে গেলেই পুরাতন মন্দের সহিত কতক ভালও লোপ পায়, এবং নূতন ভালর সহিত মন্দও আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ আমাদের সমাজ যেরূপভাবে গঠিত, তাহাতে এই এক পরিবর্ত্তনে বিস্তর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক প্রথাসকল এমনি সুনির্দ্দিষ্ট, এমনি পরস্পর-সাপেক্ষ, এমনি ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট; এবং পরিবর্ত্তনের কারণ বাহির হইতে অযাচিত অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, দেশের অন্তর হইতে ক্রমশঃ স্বতঃই উদ্ভূত হয় নাই। সুতরাং যদি কোন ভুল হইয়াও থাকে, তজ্জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তকদের দোষ দেওয়া যায় না। ফলাফল দেখিয়া আমাদের পক্ষে এখন ভুল ধরা যত সহজ, তাঁহাদের পক্ষে তখন তত সহজ ছিল না।

কিন্তু সেকালের হিন্দু স্ত্রীলোকের তুলনায় একালের শিক্ষিতা ভারতমহিলা ভাল কি মন্দ তাহা সম্যক্‌রূপে বিচার করা কঠিন হইলেও, বিশ্লেষণ করিয়া শেষোক্তের দোষগুণ দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ এবং কার্য্যতঃ ফলপ্রদ। কেন না তাহাতে নীরত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীরগ্রহণের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। বলাবাহুল্য

কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান স্কুলকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে সকল বঙ্গরমণী, মাতা পত্নী দুহিতা ও ভগ্নীরূপে সুখে দুঃখে ঘরসংসার করিতেছেন, তাঁহারাই সম্প্রতি বিচারাধীন। তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, এবং দিনে দিনে বৃদ্ধিলাভ করিতেছে।

নব্যশিক্ষিতার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ লোকে সাধারণতঃ উপস্থিত করিয়া থাকে, পর্য্যায়ক্রমে সেগুলি আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

প্রথম, ধর্ম্মভাবের হ্রাস। ধর্ম্ম বলিতে যে পরিমাণ আচার বিচার, পূজা আহ্নিক, ব্রত উপবাসাদি বুঝায়, তাহার প্রতি নব্যদলের আস্থা কম, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার এক কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচলন, অন্যতম কারণ পুরুষদিগের হিঁদুয়ানীতে শৈথিল্য। কিন্তু মানসিক ধর্ম্মভাবের হ্রাস স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। দুই চারজনের অবিশ্বাস, এবং দুইচার জনের বিশ্বাস শিথিল বা প্রাণহীন হইলেও, ভারতবর্ষের এখনও এমন দিন আসে নাই, এবং ঈশ্বর করুন যেন এমন দুর্দ্দিন কখনও না আসে, যে তাঁহার কন্যাগণের ধর্ম্মে মতি নাই। ধর্ম্মের যে অংশ কর্ম্মের প্রকাশ, যাহার এক নাম সুনীতি, সে সম্বন্ধে একই বক্তব্য। ধর্ম্মের পথ চিরদিনই শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়, সুতরাং তাহার পারিপার্শ্বিক পথিক বা বিপথিক কোন দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে। তবে সামাজিক শাসন এ বিষয়ে গুরুতর সহায় তাহা নিঃসন্দেহ। এবং সমাজ সংস্কারকগণের দৃষ্টি রাখা উচিত যেন এক দিকে ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই অপরদিকে সুদৃঢ় গঠন আরম্ভ হয়। স্ত্রীশিক্ষাপক্ষপাতীর এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক, কারণ উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই বলবৎ।

দ্বিতীয়, নম্রতার অভাব। ইহা শিক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কথায় বলে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। যে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত, সে জানে শিক্ষা "অনন্তপারং" সুতরাং হাঁটুজল পাওয়ায় বিশেষ বাহাদুরী নাই। অতএব যাঁহারা অহঙ্কারব্যাধি গ্রস্ত, তাঁহাদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র সুচিকিৎসা। প্রথম স্ত্রীশিক্ষার আমলে যদিও এরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, আশা করি আজকাল বৎসরে বৎসরে গণ্ডা গণ্ডা এফ, এ, বি, এ, উপাধি-ধারিণীর মধ্যে কেহ মনে করেন না যে "আমি একজন!"

বাধ্যতার অভাবও এই শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষার ফলে কিঞ্চিৎ মানসিক স্বাধীনতা, উক্ত স্বাধীনতার ফলে নিজস্ব মতামত গঠন, এবং তাহার ফলে ভিন্ন মতের সহিত কখনো কখনো অল্পবিস্তর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভদ্র ও বিনীতভাবে নিজমত সমর্থন করিতে পারিলে আপত্তি কি? কার্য্যক্ষেত্রে ত 'জোর যার মুলুক তার' হইবেই। রমণীর জোর খাটাইবার স্বতন্ত্র মুলুক চিরকালই নির্দ্দিষ্ট আছে, যাহাতে বুদ্ধিবিবেচনাপূর্ব্বক সে জোর খাটাইতে পারে তাহাই কি স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নহে?—আমারত মনে হয় অন্ধ দাসত্ব অপেক্ষা স্বেচ্ছাসেবার মাহাত্ম্য বেশি। একটা বয়সের পর অতিবাধ্যতার আদান প্রদান দুইই ক্ষতিজনক, কারণ তাহাতে এক পক্ষের অত্যাচার-প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, অপর-পক্ষের বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশের হানি হয়। যদি

বঙ্গরমণী এত নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিচারে যন্ত্রবৎ পূজা না চালিতেন, তাহা হইলে বোধহয় তাঁহাদের দেবতারাও মানুষ হইবার আর একটু বেশি চেষ্টা করিতেন। ধীশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া যাহাতে শ্রী ও হ্রী নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিলেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত !

তৃতীয়, গৃহকর্ম্মে অক্ষমতা বা তাচ্ছিল্য। প্রথমটি আংশিকভাবে স্বীকার্য্য, কারণ ইস্কুল কলেজের তাড়নায় পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসে ও যেন খেলাচ্ছলে গৃহকর্ম্ম শিখিবার সুযোগ কম। নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ইস্কুল যাওয়া, ইস্কুল হইতে আসিয়া পড়া তৈরি করা, পরীক্ষার সময় মাথায় মাথায় ভাবনা পড়া (এবং সম্ভবতঃ মাথাধরা !)—ইহার মধ্যে বড়ি দিবার বা পান সাজিবার অবকাশ কোথায় ? তাহার উপর ইদানীং অনেক স্থলে কন্যারত্নগুলিকে যেরূপ চৌষট্টিকলাকুশলা করিয়া তুলিবার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হওয়া বিচিত্র নহে ! কিন্তু তথাপি যখন দেখি অনেক নব্যাশিক্ষিতাই সুগৃহিণী ও রন্ধননিপুণা, তখন বলিতে বাধ্য হই যে অধিকাংশের অপটুতা ইস্কুলের শিক্ষা প্রভাবে নহে, গার্হস্থ্য শিক্ষার অভাবে। মায়ের দৃষ্টান্ত এবং উপদেশে নব্যদলেরও গৃহিণীপনা শিখিবার যথেষ্ট সুবিধা আছে। কেবল পূর্ব্বে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য সেইজন্য একমাত্র শিক্ষণীয় ছিল, এখন তাহার অনেক ভাগিদার জুটিয়াছে বলিয়া সময় সংক্ষেপ, এবং সচেষ্ট ব্যবস্থা আবশ্যক। ইস্কুলেরও এ বিষয় সচেতন হওয়া উচিত, কারণ ইস্কুল ও গৃহের পরস্পর সাহায্য ভিন্ন শিক্ষার সম্পূর্ণতা অসম্ভব। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়াই যদি মনে করি তাহার ইহকাল-পরকালের পথ পরিষ্কার হইল, তাহা হইলে ইস্কুল বেচারার প্রতি একটু জুলুম করা হয়। আবার বালিকাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরও মনে রাখা উচিত, যে পরীক্ষা দেওয়াই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যে পিতামাতার সাধ্যে কুলায়, তাঁহারা যদি ইস্কুলে একেবারে না দিয়া বাড়ীতে কন্যাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, কিম্বা তাহার সুবিধা না হইলে অন্ততঃ তাহাদের পরীক্ষা দিতে নিবৃত্ত করেন, তাহা হইলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী শিখিবার কোনই বাধা থাকে না।

গৃহকর্ম্মে তাচ্ছিল্যের অভিযোগ গুরুতর; কিন্তু আশা করি ভিত্তিহীন। আমি ত স্বকর্ণে কোন নব্যার মুখে গার্হস্থ্যকর্ম্ম সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ কখনো শুনি নাই। যে গৃহধর্ম্ম নারী জীবনের সারবস্তু, যাহার জন্য সমাজে নারীর স্থান ও মান, তাহার তুচ্ছতম কর্ত্তব্যকর্ম্মকেও যে রমণী হেয় জ্ঞান করে, সে কৃপাপাত্র অতি দীন। তবে কালভেদে অবস্থাভেদে কর্ত্তব্যের পার্থক্য হইয়া পড়ে। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা'ই প্রধান কর্ত্তব্য। যাহার দাসদাসী রাখিবার সামর্থ্য আছে, সে যদি তাহাদের দ্বারা অধিকাংশ গৃহকর্ম্ম করাইয়া লয়, এবং কেবলমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি কি ?—বিশেষতঃ তাহার ফলে যদি সে আলস্যে দিনপাত না করিয়া অন্য প্রকার সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবসর পায়। তথাপি

ঘটনার উপর যখন নারীজীবনের সমস্ত নির্ভর, এবং ভাগ্যদেবীও চঞ্চলা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখন সকলপ্রকার গৃহকর্ম্ম বালিকামাত্রকেই শেখানো উচিত। আমার কোন আত্মীয়া বলেন যে "ঘাড়ে পড়িলেই মেয়েরা সব কাজ করিতে পারে।" কিন্তু আমি তাঁহার মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চচ্চড় করিবেই। এবং যদিও কেহ কেহ নিজগুণে পূর্ব্বশিক্ষাভাব পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন, অধিকাংশের পক্ষে অভ্যাসই প্রবল হয়। যাহা করিতে পারি তাহাই করিতে ভাল লাগে। এবং অনভ্যস্ত কাজ করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছা বোধ হয়। সাহিত্যানুরাগ সঙ্গীতানুরাগ যেমন স্বভাবে না থাকিলেও শিক্ষাগুণে কতকপরিমাণ উদ্রেক করা যাইতে পারে, গৃহকর্ম্মানুরাগ তেমনি বাল্যাবধি জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। যদিও ধনী-গৃহিণীর রন্ধন করা কখনো আবশ্যক না হইতে পারে, তবুও আত্মীয়বন্ধুকে স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া খাওয়াইবার বিশুদ্ধ চিরপ্রচলিত আনন্দ হইতে পিতা-মাতা কেন তাহাকে বঞ্চিত করিবেন? জানা থাকা চাই, অভ্যাস রাখা চাই। তারপর কে কোন্ কাজে কতটা সময় ক্ষেপণ করিবে না করিবে, সে তাহার কর্ত্তব্যবোধ, অবস্থা ও অভিরুচির উপর নির্ভর।

চতুর্থ, স্বাস্থ্যহানি। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পার্থক্য এত বেশি, যে কোন সাধারণ নিয়ম বাহির করা কঠিন। তবে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে দেখিতে পাই, যে আমাদের মধ্যে দিদিমার অপেক্ষা মায়ের, এবং মায়ের

হইতেছে। ইহা যদি সত্য হয় তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাই ইহার একমাত্র, কিম্বা প্রধান কারণ কি না, তাহা বিবেচ্য। শরীরতত্ত্ববিৎ এবং চিকিৎসকই এস্থলে উপযুক্ত বিচারক। তবে স্বল্প অভিজ্ঞতায় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অধিকাংশ বঙ্গরমণীর শরীর, মন, ও ভবিষ্যৎ জীবনের গঠন স্মরণ রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কঠিন সংগ্রামে তাহাদের যোগ না দিতে দেওয়াই ভাল। যে পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহাতে ব্যয় হয় সেটি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত, নহিলে আবশ্যক কালে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরীক্ষা ভিন্ন কি বিদ্যালাভ হয় না? এ বিষয়েও মনোযোগ করিলে পিতামাতা কন্যাগণকে শিক্ষার কুফল হইতে উদ্ধার করিয়া সুফল দান করিতে পারেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবন যখন এমন স্বতন্ত্রছাঁচে ভগবান ঢালিয়াছেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের একই রকম শিক্ষা দেওয়া কখনোই সমীচীন নহে। যাহার যাহা প্রধান কর্ত্তব্য হইবে তাহাই সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রত্যেককে প্রথমে দিয়া, তাহার উপর নাহয় অলঙ্কারস্বরূপ পরে কিছু যোগ করা যাইতে পারে। অবশ্য সন্তানশিক্ষার ভার যে মাতার হস্তে, তাঁহার পক্ষে কোন শিক্ষাই অনাবশ্যক বলা যায় না, এবং তাঁহার সহৃদয় সহানুভূতির ক্ষেত্র যতই প্রশস্ত হয় ততই ভাল। কিন্তু স্বাস্থ্য লাবণ্য, কর্ম্মক্ষমতা, প্রসন্নতা, সৌজন্য প্রভৃতি গৃহিণীজনোচিত গুণ যাহাতে নষ্ট না হয়,

মনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং উভয়েরই স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য আছে। একদিকে অতিমাত্রায় উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে অপরদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য মানে সামঞ্জস্য, এবং সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র। তাহার সব শিক্ষাদীক্ষা যাহাতে সেই সাম্যকে অতিক্রম না করে, ও একটি সহজ শ্রীর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে, তাহাই বাঞ্ছনীয়। নিছক পণ্ডিত সওয়া যায়, কিন্তু নিছক পণ্ডিতা অসহ্য। শরীরমনের গঠনের ন্যায়, বুদ্ধিবৃত্তির গঠনেও স্ত্রীপুরুষের যে একটি ভগবদ্দত্ত প্রভেদ আছে, তাহা বজায় রাখিতে পারিলেই ভাল। পুরুষালী মেয়ে বা মেয়েলী পুরুষ, কোনটিই সমাজে আদৃত হয় না। বিদ্যাদানের সময় সে কথা সর্ব্বদা স্মরণীয়। সেকালের রমণীগণের মধ্যে প্রায়শঃ যে শরীরমনের স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, উৎসাহ, পরিশ্রম ক্ষমতা, সরসতা ও প্রফুল্লতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় আজ কালকার অনেক মেয়েকে যেন নিস্তেজ, নীরস ও নিরানন্দ মনে হয় বলিয়াই এত কথা বলিলাম। জানিনা শিক্ষার সহিত, বা শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত এই পরিবর্ত্তনের কতদূর যোগ, কিন্তু কিছু আছেই ; অন্ততঃ মানসিক স্বাস্থ্যের কোটায় পড়ে নিশ্চয়। আগেকার মেয়েরা যেমন প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে পারেন, হাসিতে পারেন, কথায় ও কাজে অনেকস্থলে যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চতুরতার পরিচয় দিয়া থাকেন, পরকে যেমন আপন করিতে পারেন, সর্ব্বাবস্থায় যেমন একটি সহজ সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, আজকালকার অনেক শিক্ষিত মেয়ে

কি এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষকে একটু শুষ্ক, একটু স্বার্থপর, একটু নির্লিপ্ত, একটু ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলে ? যদি প্রমাণ হয় যে, সে শিক্ষায় মেয়েদের স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শতগুণেও সে দোষ ঢাকিবার নয়।

পঞ্চম, বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়তা। ইহার কি সত্যই বৃদ্ধি হইয়াছে, না প্রকারান্তর হইয়াছে মাত্র ? সেকালের মেয়েরা গয়না ভালবাসিতেন ; একালের মেয়েরা হয়ত কাপড় বা অপরাপর সৌখীন দ্রব্য ভালবাসেন, যাহার আমদানী সম্ভবতঃ তখন এদেশে হয় নাই। সুন্দর জিনিষ ভালবাসা চিরকালই মেয়েদের একটি রোগ বিশেষ, এবং দুঃখের বিষয় সুন্দর জিনিষ প্রায়ই দামী। কালভেদে সৌন্দর্য্যের উপকরণের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। অবশ্য বসন অপেক্ষা ভূষণ স্থায়ী, এবং অসময়ের বন্ধু। সে হিসাবে এ পরিবর্ত্তন মন্দ বলিয়া স্বীকার্য্য। তবে কালক্রমে অন্য যে-সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা তাহারই অন্তর্গত এবং বোধ করি এ দোষ শিক্ষিতাদের মধ্যে আবদ্ধ নহে। যাহা কিছু বদল দেখা যায় সবই (বিশেষতঃ মন্দগুলি) শিক্ষার ঘাড়ে চাপানো অন্যায়। তাহা ছাড়া আর্থিক অবস্থাই বিলাসিতার ন্যায়ান্যায়ের পরিমাপ। একজনের যাহা দুষ্প্রাপ্য সখ্ মাত্র অন্যের পক্ষে তাহাই অনায়াসলব্ধ চিরাভ্যস্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। যাহার যাহা সমাজ বা 'দল', তাহার সহিত সমপদক্ষেপে চলাই নিরাপদ, বাড়াবাড়ি করিলেই দৃষ্টিকটু হয়। কাহাকে কি শোভা পায় তাহা অন্যে ঠিক বলিতে পারে না। এরূপ

খুঁজিতে হয়। তবে যখন আমাদের ভাঙ্গনের মুখে বাস, ও সকলেরই কিছু না কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে, এবং নানাকারণে ব্যয়ের দিক বাড়িতেই চলিয়াছে, তখন সুগৃহিণীর পক্ষে মিতব্যয়িতাই প্রশংসার্হ, শাস্ত্রেরও তাই উপদেশ। যিনি নিজের সংসার সুচারু অথচ সংযতরূপে চালাইতে পারেন, আজকালকার বিশৃঙ্খলার দিনে তিনিই যথার্থ গৃহলক্ষ্মী। আর যে-কোন ক্ষেত্রে পুরুষগণ সংস্কারক হউন না কেন, গৃহসংস্কারে নারীর সাহায্য নহিলে চলে না। ক্রিয়াকর্ম্মে, সংসারযাত্রায়, অশনআসনে, বসনভূষণে, সর্ব্বত্রই অযথা ব্যয় সঙ্কোচ করিবার ক্ষমতা প্রধানতঃ রমণীর হস্তে। সব দিক রক্ষা করিয়া যদি সাধ্যমত স্বল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে পারি তবেই আমরা সুশিক্ষিতা নামের যোগ্য। নচেৎ এ শিক্ষার আদর ক্রমশঃই কমিবে। ইংরিজিয়ানার প্রকোপে আমাদের চালচলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা নিজেকে না পারুন—চেষ্টা করিলে অন্ততঃ ছেলেমেয়েদের এ রোগ হইতে এখনো কতকপরিমাণে রক্ষা করিতে পারেন না কি? প্রথমেই যাঁহারা জেতৃজাতির আচারব্যবহার নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন এখন তাঁহাদের বর্জ্জন শিখিতে হইবে, বাছাই করিতে হইবে। সতর্ক ও দক্ষরূপে এই নির্ব্বাচন কার্য্যে ব্রতী হইয়া যাহাতে কোনকালে একটি নব্য বঙ্গসমাজ গড়িয়া তুলিতে পারা যায় সেই দিকে শিক্ষিত মেয়েদের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। বিলাসিতার আর একটি দোষ এই, যে নিজের পক্ষে যাহা নিরীহ মনে হয়, অন্যের পক্ষে তাহাই অনিষ্টকর দৃষ্টান্ত হইতে পারে, সুতরাং মনে মনে একটা আদর্শ খাড়া করিয়া সেই অনুসারে চলিবার চেষ্টা করাই ভাল।

আমোদপ্রিয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত অনেক কথাই খাটে, যথা কালভেদে পার্থক্যমাত্র, নিজস্ব দলের অভ্যাসমধ্যে আবদ্ধ রাখিলে দোষ নাই, ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রথা যে অকালবিজ্ঞতা অনুমোদন করে আমিত তাহার পক্ষপাতী নহি। আমোদ-আহ্লাদ যদি নির্দ্দোষ হয়, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত না ঘটায়, তাহা হইলে এই দুঃখের সংসারে তাহার প্রচলন ত সুখের বিষয়। একে ত আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী মেয়েদের নিশ্চিন্ত বাল্যজীবন নাই বলিলেই হয়। বালিকা বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই তাহারা বিবাহিতা ও অন্তঃপুরবদ্ধা; কিশোরী না হইতেই মাতৃব্রতে দীক্ষিতা ও সংসারপাশে বিজড়িতা; যুবতী না হইতেই হয়ত বৈধব্যের নির্ব্বাণপ্রাপ্তা। তাহারা কি রক্তমাংসের জীব নহে? বিধাতা কি তাহাদের মানুষ করিয়া গড়েন নাই? আকাশ, বাতাস, আলো, গাছপালা, মানুষের মুখ;—কাব্য ও সঙ্গীতরসমাধুর্য্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহচর্য্য, অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম—এসকলে কি তাহাদের কোন অধিকার নাই? বাল্যের সরল আনন্দ, বার্দ্ধক্যের স্নিগ্ধ বিশ্রাম কি তাহাদের পক্ষে আবশ্যক নহে?—এইত সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন সম্মুখে প্রসারিত, তাহার মধ্যে কি সামান্য আমোদপ্রমোদও তাহাদের পক্ষে দূষণীয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে যাহার যেরূপ আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, তাহার

কাজকর্ম্ম আমোদপ্রমোদ তদনুরূপ হওয়া উচিত, এবং কার্য্যতঃ হইয়াও থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বিবাহবয়সের প্রসারণ, অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটন প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের প্রচলনজন্য সম্প্রতি বাঙ্গালীর মেয়ে কতকগুলি নূতন আমোদের অধিকারিণী হইয়াছেন বটে ঃ—যথা, বায়ুসেবন, বায়ুপরিবর্ত্তন, দেশভ্রমণ, বিনানুষ্ঠাণিক নিমন্ত্রণ, সাহিত্যসঙ্গীত শিল্পকলার অনুশীলন বা রসাস্বাদন, ইত্যাদি। ইহার কোনটি, বা সবগুলিই অবস্থানুযায়ী মাত্রাপূর্ব্বক ভোগ করিলে কোন ত আপত্তির কারণ দেখি না। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতমের নিয়ম লঙ্ঘন না করিলেই হইল। যদি ইহাতে আপশোষের কোন কারণ থাকে তাহা এই যে, সবগুলিই কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ, এবং যাঁহারা ইহাতে অভ্যস্ত তাঁহারা আমাদের দেশের অনাড়ম্বর সুলভ সরল আমোদপ্রমোদে সন্তুষ্ট হন না, এবং অনেকে সেকেলে সুন্দর শিল্পকলার আদর বা চর্চ্চা করেন না, জানেন না। আবার বলি যে সেকাল ও একালের সুসঙ্গত সম্মিশ্রনসাধন আধুনিক মায়েদের প্রধান কর্ত্তব্য, এবং কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। ইংরাজী কথায় বলে নরম ডাল যেদিকে নোয়াইবে, গাছ সেইদিকেই ঝুঁকিবে। ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, ক্ষমতা, আদর্শ, অধিকাংশই ছেলেবেলার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, এবং সে অভ্যাস করাইয়া দেওয়া বিশেষরূপে মায়ের কাজ। তবে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকল বিষয় সুবিবেচনাপূর্ব্বক দিক্‌নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই জন্যই ত যথার্থ সুশিক্ষার প্রয়োজন। এখনো এতদূর ভুলপথে অগ্রসর হই নাই আশা করি, যে ফিরিবার উপায় নাই।

ষষ্ঠ অভিযোগ পঞ্চমেই সূচিত হইয়াছে। স্বার্থপরতা এবং বিদেশীয়তা, এই দুই ভাগে তাহা বিভক্ত করা যায়। একেলে ইংরাজী-শিক্ষিত মেয়েরা অপেক্ষাকৃত স্বার্থপর তাহা মানিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা হয়ত তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আগেই বলিয়াছি বয়ঃপ্রাপ্তিতে বিবাহ ও পাশ্চাত্যভাবের প্রভাবে একটু নিজস্ব গঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা ঠিক সমান কখনো থাকিতে পারে না। যদি মনে করি স্ত্রীশিক্ষার কোন সুফল আছে তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্য দুই একটি পরিবর্ত্তন অসুবিধা-জনক হইলেও গ্রহণ করিতে হইবে। "গাছেরও পাড়ব, তলারও কুড়াব" দুই দিক রক্ষা হয় না। অনভিজ্ঞর সারল্য ও সম্পূর্ণ অধীনতা, এবং শিক্ষিতার মার্জ্জিত জ্ঞানবুদ্ধি ও আত্মনির্ভর একাধারে আশা করা বৃথা। একটু নিজস্ব জীবনখণ্ড তাহাকে দিতেই হইবে। গহনাই একমাত্র স্ত্রীধন নহে। পূর্ব্বের তুলনায় কম হইলেও আজও তাহাকে নিতান্ত কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না,—সে যে নারীর স্বধর্ম্ম। আর চতুর্দ্দিকের অবস্থার যখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিবেই, তখন একমাত্র নারীকে ঠিক পূর্ব্বস্থানে অবিচলিত রাখা অসম্ভব। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সে একান্নবর্ত্তী পরিবার, সে সামাজিক বন্ধন এখন কই? সুতরাং নূতন তন্ত্রের সামাজিকতার [illegible]

সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরও কিঞ্চিৎ নূতন ছাঁদ দেখিয়া আপত্তি করা অসঙ্গত। বরং আশা করা যায় যে বর্ত্তমান অরাজকতার দিনে, যেমন অবস্থায় পড়িবে তাহার সহিত বনাইয়া লওয়া একমাত্র সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর পক্ষেই সম্ভব। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রচলিত আচার অনুসরণ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ভাঙ্গনের মুখে নিজেকে স্থির রাখিতে সুবুদ্ধির প্রয়োজন। তবে দেখিতে হইবে সে বুদ্ধি যেন সত্যই স্বাধীন হয়, কেবলমাত্র বিদেশীয়তার অন্ধ অনুকরণে পর্য্যবসিত নকলস্বাধীনতা না হয়। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে দেশের সহিত যথেষ্ট যোগ রাখা হয় না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এবং স্ত্রীশিক্ষার অনেক নিন্দার মূল কারণ। উচ্চতম শিক্ষাতেও এই দোষের ক্ষতিপূরণ হয় না। নিজের সন্তানকে যদি দেশের সুসন্তান করিতে না পারিলেন, তবে বঙ্গমাতার এমন সন্তানলালনে ফল কি? এবং নিজে যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বদেশের সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আচারব্যবহার ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ হইয়া থাকেন, তবে সন্তানকে কিরূপে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করিবেন? এবিষয় স্কুলকলেজের ক্রটি বাড়ীর শিক্ষায় কতকপরিমাণ সংশোধিত হইতে পারে অবশ্য, কিন্তু অন্তঃপুরই যদি কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া থাকে?—তাহার একমাত্র উপায় বোধহয় ঠেকিয়া শেখা। এইপ্রকার দায়ে-পড়া শিক্ষা এখনই চতুর্দ্দিকে আরম্ভ হইয়াছে; তাহা সুলক্ষণ। যতক্ষণ নিজের দোষ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহা খণ্ডনেরও আশা আছে। সাহেবিয়ানা বা বিবিয়ানা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, তবে অধিকাংশ সময়ে তাহার সহিত জড়িত থাকে বটে, কারণ আমাদের স্কুলকলেজমাত্রই ইংরাজী ভাব ও ভাষার পরিপোষক। মহাকালী পাঠশালায় এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম সূচিত হইয়াছে তাহার ফলাফল বিচারের সময় এখনো আসে নাই। ইংরাজী-অভিজ্ঞা ও ইংরাজী-অনভিজ্ঞার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ অনিবার্য্য, কেন না ইংরাজী ভাষা আমাদের নিকট নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে জন্য ভিন্ন-শিক্ষিত স্ত্রীলোকের মেলামেশার ত কোন বাধা দেখি না। কেবল আমার মনে হয় যদি দুই দলের বেশভূষা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রমশঃ একই ধরণের করিয় আনা যায়, তাহা হইলে মনের মিলেরও সাহায্য হয়। হিন্দু-সমাজ যেরূপ উদারতা দেখাইতেছেন তাহাতে শীঘ্রই অনাবশ্যক বাহিক স্বাতন্ত্র্যগুলি লোপ পাইবে মনে হয়। অবশ্য গতিশীল সমাজেরও মিলনের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। অর্থাৎ বিদেশী চালচলনের গতি মন্দ করা চাই। বাঙ্গালীরা যত শীঘ্র বাহিরের আচারব্যবহার পোষাকপরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে এমন ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ফলে বাঙ্গালীর মেয়েরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠশিক্ষিতা হইলেও অধিকমাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন বলিয়া স্ত্রীশিক্ষার মর্য্যাদারক্ষণে অক্ষম হইয়াছেন, এবং অল্পদিনেই সে শিক্ষার বিরুদ্ধে স্বদেশীর মন ফিরাইয়াছেন।

কিন্তু আর কেন? ছয় রিপুতেই

রক্ষা নাই, ছিদ্রান্বেষণেরও অন্ত নাই। এইবার দোষের তালিকা সমাপ্ত করিয়া গুণের ফর্দ্দ ধরা যাউক্। মধুরেণ সমাপয়েৎ। গুণের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, কেবল উল্লেখই যথেষ্ট। বোধহয় দেখিব যে ক্ষতিপূরণের নিয়মানুসারে প্রায় প্রত্যেক দোষেরই অপর পৃষ্ঠায় একটি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৌলের ভার জহুরীর হাতে।

(১) বুদ্ধির উদারতা বা সাম্যভাব। অর্থাৎ ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা, হিতাহিত, যৌক্তিকঅযৌক্তিক, বুঝিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা। অন্ধ সংস্কার বা অভ্যাসের সম্পূর্ণ বশীভূত না হওয়া।

(২) আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান। সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী বা অতিসঙ্কুচিতা ভীতা না হওয়া। সকল তুচ্ছ সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিচলিত না হওয়া।

(৩) সময়ের মূল্যবোধ, বা নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদন। গৃহস্থালীতে সুশৃঙ্খলার চেষ্টা। রন্ধনাদি ছাড়াও অপরাপর শিল্পকর্ম্মে মনোযোগ।

(৪) বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় অধিকতর পারিপাট্য। কেবলমাত্র শুচিতা নহে, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি। আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান।

(৫) গৃহ এবং পরিবারের বাহিরেও মনকে প্রসারিত করা, সকলপ্রকার সমাজে মিশিতে পারা, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখা। সামাজিক উন্নতিচেষ্টায় যোগ দেওয়া।

(৬) স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, বা সকল বিষয়ে তাঁহার সহকারী ও হিতকারী হইবার উপযোগিতা। নানা বিষয়ে একালের পরিবর্তনশীল সমাজের যোগ্য হওয়া। সন্তানের শিক্ষার সাহায্য করিবার ক্ষমতা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই,—কঃ পন্থা? কোন-দিকে যাইব? কাশী বা মক্কা, কোনটাই গম্যস্থান হইতে পারে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সেকেলে প্রাচ্যভাব, বা সম্পূর্ণরূপে নব্য পাশ্চাত্য ভাব, কোন দিকেই যাওয়া সম্প্রতি সম্ভব বা বিহিত নহে। মধ্যপথ অবলম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নয়। পুরুষরা যেরূপ গড়িতে চাহিয়াছেন, চিরকাল মেয়েরা সেইরূপই গঠিত হইয়াছে। তবে একটী স্বাভাবিক সংযমবশতঃ মেয়েরা নূতন স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে অনিচ্ছুক, ও সাধ্যমত পুরাতনের দিকে চলিতে সচেষ্ট। তাহাদের এই ভাবই সমাজের রক্ষাকবচ। ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া তথাপি অগ্রসর হইতেই হইবে। সেই পথে পুরুষদের সহায়তা আবশ্যক। আমাদের দেশের মনীষিগণ বলিয়া দিন্ ভারতরমণী কোন্ পথে কি প্রণালীতে অগ্রসর হইলে সমাজের কল্যাণ হইবে? পুরাতনের কোন অংশগুলি বর্জ্জনীয়, নূতনের কোন অংশগুলি বরণীয়, এবং কিরূপে দুইয়ের সঙ্গত সম্মিলন সম্ভব? সেকালে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না তাহা বলি না, কিন্তু সে শিক্ষা নানা কারণে এখন দুষ্প্রাপ্য। অথচ কোনপ্রকার স্ত্রীশিক্ষা দিতেই হইবে, সে বিষয় বোধহয় সকলে একমত। একেলে স্ত্রীশিক্ষার দোষ-গুলি সব অনিবার্য্য নহে, তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। একাধারে বাদী, প্রতিবাদী, কৌঁসুলী ও বিচারক হওয়ায় সম্ভবতঃ আমার লেখা ইচ্ছানুরূপ প্রাঞ্জল হয়

নাই। তবু সাধ্যমত বিশ্লেষণ করিয়াছি, কারণ শতদোষ স্বীকার করিয়াও আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে পৃথিবীর কি উপকার বা অপকার হয় তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইলেও এইটুকু বলিতে পারি যে সাহিত্য ও শিল্পকলা পুরুষের ন্যায় রমণীর পক্ষেও অতি সুখের সামগ্রী, অতি আদরের বস্তু। তাহা যে কত অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম, কত নির্জ্জনতার নিষ্কণ্টক সঙ্গী, কত নবরাজ্যের চিরোন্মুক্ত দ্বার, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নীরব প্ররোচক, কত সুখদুঃখের মমতাপূর্ণ বন্ধু, কত মাধুর্য্যের অমৃত প্রস্রবণ, তাহা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কেন না ইচ্ছা করিবেন যে, সকল নারীই সে সুধারস পান করুক্। করিয়া তাহাদের নারীত্ব মধুরতর, গভীরতর, উচ্চতর, উদারতর, স্নিগ্ধতর হউক্। যদি না হয় তাহা শিক্ষার দোষ নহে, শিখাইবার দোষ। আদর্শ ভিন্ন উন্নতি অসম্ভব। আমাদের বর্ত্তমান ভাবুকগণ, কবিগণ, আমাদের বর্ত্তমান কালের নূতন আদর্শ গড়িয়া দিন,—যাহা সময়োপযোগী হইবে, দেশকালপাত্রোচিত হইবে, আমরা তাহাই অনুসরণ করিব, অন্ততঃ চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রাচীন সমাজ যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া, নূতন সমাজে পরিণত হইতেছে তখন আদর্শ চাইই চাই—মেয়েদেরও চাই, পুরুষদেরও চাই,—যাহার নাগাল পাইবার চেষ্টায় আমরা মানুষ হইতে পারি।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে একেলে পুরুষরা একেলে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সহধর্ম্মিণীর পরিবর্ত্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগত ঠাকুরমা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন?

জনৈক আসামী।

সিন্ধুতীরে

দাঁড়িয়ে আছি বেলাভূমে সূর্য্য ডোবে সাঁঝে,
অতি দূরের অপার পারের অন্ধকারের মাঝে।
 ঢেউয়ের গায়ে মাথা কুটে
 মলিন আলো পড়্‌ছে লুটে,
হু হু করে আস্‌ছে ব'য়ে আঁধার তীরের রাতি;
আদর করে' ডাকি তারে বক্ষখানা পাতি।
 গর্জ্জি উঠে সিন্ধু ডাকে
 এ আঁধারে, হায়রে কাকে?
অপেক্ষিয়া আমি কারে দাঁড়িয়ে আছি একা?
অপার পারের কোথায় হবে কাহার সনে দেখা?
 পাইনি খুঁজে ফিরে ঘুরে,

দিবসব্যাপী জাগরণের কোলাহলের হাটে,—
আজ্‌কে দেখা হবে কি গো, সিন্ধুকূলের ঘাটে?
 ডুবিয়ে দিয়ে চোখের দৃষ্টি,
 ভুলে ফেলে সারা সৃষ্টি,
আজ্‌কে আমি ধরব তোমায় অন্ধকারের জালে;
অঙ্গপরে স্পর্শ তোমার নাচ্‌বে বুকের তালে।
 ঐ যে রাতি ঘনিয়ে আসে—
 আঁধার ঢেলে প্রাণের বাসে,—
এস তুমি, জাগো তুমি অনুভূতির তলে;
ঘুমিয়ে পড়ি সংজ্ঞাহারা তোমায় বেঁধে গলে।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

আহার সম্বন্ধে অপর কয়েকটি কথা।

আমি ইতিপূর্ব্বে একজন সহজ পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক বঙ্গবাসীর দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য (Fat, starch and sugar) মাংসপেশীর শক্তির যেরূপ বৃদ্ধিসাধন করে, মাংস প্রভৃতি অন্য জাতীয় খাদ্য হইতে তদনুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা মনে করেন যে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে আমরা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারি না, তাঁহাদিগের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য নহে। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ খাদ্যকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর খাদ্যাদি শারীরিক উপাদান (পেশী, অস্থি ইত্যাদি) গঠনের সহায়তা করে; মাছ, মাংস, ছানা (Casein) লবণ ও জল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর খাদ্যকে Tissue-former কহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য হইতে আমরা শারীরিক তাপ ও পরিশ্রম করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই। মাখন, চর্ব্বি, তৈল, ঘৃত, ভাত, রুটী, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতি তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য এই খাদ্যকে Energy and heat producer কহে। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিলে শারীরিক উপাদান সমূহের যে ক্ষয় সাধিত হয়, তাহার পূরণের জন্য মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিমাণের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইলেও তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সত্য ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে, মল্লভূমিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অপর যেখানেই পেশী সমূহের সমধিক চালনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তথায় অভ্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বয়সভেদে, স্ত্রীপুরুষভেদে, ঋতুভেদে, দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মভেদে ও রুচিভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের অল্পবিস্তর তারতম্য হইয়া থাকে। আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ২৫।৩০ বৎসরের পর আর আমাদিগের শরীরের বৃদ্ধি সাধিত হয় না, সুতরাং বালক ও যুবকদিগের শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির তাহার প্রয়োজন হয় না। এজন্য বালক ও যুবকদিগের যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের (বিশেষতঃ মাংসজাতীয় খাদ্য, যেমন মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, ডাল ইত্যাদি) অভাব হইলে তাহাদিগের দেহ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্যের পক্ষে তাহার সমস্ত খাদ্যের পাঁচ ভাগের একভাগ মাংসজাতীয় খাদ্য হইলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের খাদ্যের

হইলে তাহার শারীরিক অভাবের পূরণ হয় না। এই জন্য বালকদিগের আহার বিষয়ে আমাদিগের সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বয়সের প্রথম অবস্থায় যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাব জাতিগত দৌর্ব্বল্যের একটি প্রধান কারণ। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বালকদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করিলে তাহাদিগের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে শুদ্ধ যে অজীর্ণাদিরোগ উৎপন্ন হয় তাহা নহে, শরীরে অধিক পরিমাণ মেদ (Fat) সঞ্চিত হইয়া বালককে অত্যধিক স্থূল সুতরাং একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। অনেক সময়ে স্নেহাধিক্য বশতঃ বালকের জননী সন্তানকে অত্যধিক পরিমাণ লুচি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন খাইতে দিয়া তাহাকে চিরজন্মের মত দুর্ব্বহদেহ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলেন। অবশ্য বালকেরা স্বভাবতঃ মিষ্টান্ন খাইতে ভাল বাসে; তাহার কারণ এই যে তাহারা চঞ্চল স্বভাব, সুতরাং সর্ব্বদা অঙ্গ চালনা করে বলিয়া শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত তাহাদিগের শর্করাজাতীয় খাদ্যের অধিক প্রয়োজন হয়। কিন্তু বালকদিগের পক্ষে মিষ্টান্ন উপকারী হইলেও উহার অপরিমিত ব্যবহার প্রভূত অনিষ্ট উৎপাদন করে।

বৃদ্ধ বয়সে পরিশ্রমের কার্য্য কমিয়া যায় এবং শারীরিক যন্ত্রাদিও মৃদুভাবে স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এজন্য এ বয়সে খাদ্যের পরিমাণ আপনা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া আইসে।

স্ত্রী পুরুষ ভেদে খাদ্যের পরিমাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হইয়া থাকে। পুরুষেরা যত খাদ্য গ্রহণ করে, সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের আহার সম্বন্ধে গৃহস্বামীদিগের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে। সাহেবেরা স্ত্রী-পুরুষে একত্রে আহার করেন। আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতী সমাজের প্রথা অনুসারে প্রত্যেক খাদ্য-সামগ্রী অগ্রে স্ত্রীলোকের দ্বারা গৃহীত হইলে পর পুরুষেরা তাহার অংশ গ্রহণ করেন। আমাদিগের হিন্দু পরিবারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের একত্রে ভোজন করিবার প্রথা এখনও প্রচলিত হয় নাই। পুরুষদিগের আহার শেষ হইলে পর স্ত্রীলোকেরা ভোজন করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহা কিছু ভাল খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন থাকে, পুরুষদিগের ভোজনের সময় তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়; স্ত্রীলোকদিগের জন্য শাকান্ন ব্যতীত আর অধিক কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমাদিগের গৃহদেবীগণ যেমন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহা আমাদের ভোগের জন্য অকাতরে অর্পণ করেন, তাঁহাদের যথোপযুক্ত আহার হইল কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং তাহার যথোচিত বন্দোবস্ত করা আমাদিগের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। যে জননীকে স্তন্যদান করিয়া শিশুসন্তানকে পালন করিতে হয়, তাঁহার খাদ্য সবিশেষ পুষ্টিকর হওয়া উচিত; তাহা না হইলে মাতা ও শিশু উভয়েই শীঘ্র কৃশ, রুগ্ন, ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমাদিগের সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে।

আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা ভোজন বিষয়ে এত অধিক লজ্জাশীলা এবং উহা এত গোপনে সম্পাদন করিয়া থাকেন যে গৃহস্বামীগণ এ বিষয়ে প্রকাশ্য অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিলে সুফল লাভ করিবার আশা করিতে পারেন না। অনেক সময়ে খাদ্য-সামগ্রীর অপ্রচুরতা হেতু পুরুষদিগের অভাব মোচন হইয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য বড় কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বাজারের ভার স্ত্রীলোকদিগের হস্তে প্রায়ই ন্যস্ত থাকে; তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজন ভুলিয়া যাইয়া কেবল বাটীর কর্তৃপক্ষীয় ও বালকবালিকাদিগের উপর দৃষ্টি রাখেন মাত্র। মাছ, দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য যদি আমরা হিসাব করিয়া যাহাতে পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সঙ্কুলান হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করি এবং যাহাতে পাচক বা পাচিকা নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত সামগ্রী পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির জন্য যথাপরিমাণে বণ্টন করে, তদ্বিষয়ে অপ্রকাশ্যভাবে প্রত্যহ দৃষ্টি রাখি, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের আহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

দেশভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয় এবং বাহিরের প্রচণ্ড শীত হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের অধিক তাপের আবশ্যক হয়। এজন্য এই সকল স্থানে অধিক পরিমাণ তৈলজাতীয় খাদ্যের (Fat) প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংসের ব্যবহার যথোচিত পরিমাণে সংযত হওয়া উচিত; তাহা না হইলে অনেক সময়ে যকৃতের দুরারোগ্য পীড়া উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ঋতুভেদে পৃথক্ পৃথক্ খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এরূপ তত্ত্বের সূক্ষ্মভাবে মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করে নাই। অথচ এরূপ ব্যবস্থা যে কেবল কল্পনা-প্রসূত, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অনেকানেক ব্যবস্থা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থলে তাহাদের কারণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থা যে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ঋতুভেদে আহারের প্রভেদ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য এস্থলে আয়ুর্ব্বেদের মত উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্নের "চরকসার" নামক গ্রন্থ হইতে এই মতগুলি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

চরকের মতে ঋতুর উপযোগী আহার বিহারাদি সম্পন্ন হইলে মনুষ্যের বর্ণের স্ফুরণ হয় এবং বল ও আয়ুর বৃদ্ধি সংসাধিত হয়। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই ছয় ঋতুতে বৎসরটী বিভক্ত। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন সূর্য্য উত্তরায়ণ অবলম্বন করেন, তখন শরীরের রস শুষ্ক হয় এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। পুনশ্চ বর্ষা, শরৎ ও

করেন, তখন শরীরে রসের ও বলের আধিক্য হয়। চরকের মতে গ্রীষ্মকালের শেষে ও বর্ষাকালের প্রারম্ভে মনুষ্য হীনবল হয়, শরৎ ও বসন্তে মধ্যবল, এবং হেমন্তে ও শীতের প্রারম্ভে মানুষের বল সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

চরক বলেন, যিনি হেমন্তকালে প্রতিদিন ঘৃতদুগ্ধাদি গব্যরস, গুড়, বসা, মজ্জা, তৈল ও নবান্ন আহার এবং উষ্ণজল পান করেন, তাঁহার আয়ুষ্কাল কখন হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

শীতকালে জঠরাগ্নির উদ্দীপনা অধিক হয়, সুতরাং এ সময়ে আমাদিগের গুরুপাকদ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। শীতকালে অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিবার আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং জলজন্তু (মৎস কচ্ছপাদি) আনূপ মাংস (বন্য মৃগ, বরাহ ইত্যাদি) প্রভৃতির ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ হইয়া নানারোগের প্রাদুর্ভাব হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ অপেক্ষা শ্লেষ্মার প্রকোপ বিশেষ অনিষ্টকর মনে করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা বসন্তকালে গুরুপাক দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য এবং মিষ্টদ্রব্য বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময়ে শরভ, শশক প্রভৃতি প্রাণীর মাংসভক্ষণ প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে স্বাদু, শীতল, তরল ও স্নেহময় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করা উচিত। চরকের মতে শর্করামিশ্রিত ছাতু, জাঙ্গল পশু (মৃগ, শশক ইত্যাদি) ও পক্ষীর মাংস এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভোজন করিলে গ্রীষ্মে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য এই ঋতুতে একেবারে বর্জ্জন করিবে।

বর্ষাকালে দেহ ও অগ্নি (জঠরাগ্নি) উভয়ই দুর্ব্বল হয় এবং বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে অম্ল, লবণ ও স্নেহরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। যিনি বর্ষাকালে অগ্নি সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরাতন যব, তণ্ডুল, গোধূম ও জাঙ্গল মাংসের যূষ আহার করিবেন। এই ঋতুতে জল উত্তপ্ত করিয়া শীতল করতঃ পান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শরৎকালে শরীরে পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এজন্য এই ঋতুতে পিত্তদমনকারী খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সময়ে মধুর, লঘু, শীতল ও তিক্ত খাদ্যদ্রব্য এবং পিত্তপ্রশমনকারী অন্নপানাদি ব্যবহার করা উচিত। এণ, শশক, তিতির প্রভৃতির মাংস, যব, গোধূম এবং শালিধান্যের ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, মৎস্য, আনূপ মাংস ও দধিভক্ষণ এই ঋতুতে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

আজকাল আমরা দধি সকল ঋতুতে সকল সময়েই ব্যবহার করিয়া থাকি। দধি একটী উৎকৃষ্ট অম্লরসবিশিষ্ট সারবান খাদ্য। শর্করা ব্যতীত দুগ্ধের অপর সকল সারপদার্থ দধির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মেচ্‌নিকফের মতে দধি ভক্ষণ করিলে আমাদিগের অন্ত্রমধ্যস্থ

অনিষ্টকারী রোগোৎপাদক বীজাণুসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা বহুদিন সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারি এবং অকালবার্দ্ধক্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদমতে দধি একটী হিতকর খাদ্যসামগ্রী হইলেও সর্ব্বকালে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। চরক বলেন যে, রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না এবং দধি উষ্ণ করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। শর্করাসংযুক্ত দধিভোজন পিত্ত সংক্ষুভিত হইতে দেয় না, পরন্তু আহার পরিপাক এবং তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ করে। মধুযুক্ত দধি সুমিষ্ট ও অল্প দোষবিশিষ্ট হয়। আমলকীর রস মিশাইয়া দধিভক্ষণ করিলে উহা ত্রিদোষ নাশ করে।

শরৎকালে দধিভোজন নিষেধ করা হইয়াছে। অপরিমিত দধিভোজনে দধির অম্লরস (Lactic acid) দেহমধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া শর্দ্দি, কাশি, বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি সাধন করে।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা ঋতুভেদে বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা ব্যতীত ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা তিথি-ভেদে খাদ্যবিশেষ নিষিদ্ধ (তৃতীয়াতে পটোল, ষষ্ঠীতে নিম, ত্রয়োদশীতে বেগুন ইত্যাদি) বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার যথার্থ মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, এরূপ ব্যবস্থায় প্রত্যহ একরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলবায়ু Climate) এবং প্রাকৃতিক ও স্থানীয় অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে; এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

সকল বয়সেই অতিভোজন প্রভূত অনিষ্টের কারণ। ইহা অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ রোগ ও অকালমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে। এককালে অধিক আহার না করিয়া ৩।৪ বারে অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া ঘন ঘন আহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে পাকস্থলী যথোপযুক্ত বিশ্রাম করিবার অবসর পায় না। এককালে অধিক আহার করিলে পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত হয়, পাকস্থলী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহার পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয়। গুরুভোজনে শরীর জড়ভাবাপন্ন হয় এবং কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ে। কিছু হাতে রাখিয়া ভোজন করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য অর্থাৎ খাইয়া উঠিবার সময় মনে হয় যেন আরও কিছু খাওয়া যাইতে পারে। মিতাহার যে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের একটী প্রধান উপায়, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। লুই কর্ণারো নামক এক ব্যক্তি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত আহার ও পান সম্বন্ধে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কিন্তু ঐ বয়সে তিনি মিতাচার অবলম্বন করিয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন।

ভগবদ্গীতায় যুক্তাহার যোগীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অনুকূল। দিবসে ...

আহার করা উচিত, এ সম্বন্ধে কোনও একটী নির্দিষ্ট নিয়ম সকলের পক্ষে খাটে না। দেশ, সাংসারিক অবস্থা, দৈনিক কার্য্য এবং অভ্যাস ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়। দিবসে দুইবার ভোজন সকল জাতিরই মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে অনেকেই কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিয়াই সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে থাকেন। এই বিষয়ে এই একটী নিয়ম প্রতিপালন করা উচিত যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবারের খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক হইয়া না যায়, ততক্ষণ পুনরায় ভোজন করা উচিত নহে। আমরা যেরূপ খাদ্যসামগ্রী সচরাচর ভোজন করিয়া থাকি, তাহা পরিপাক হইতে অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগে। পরিপাক হইবার পর পাকস্থলীকে ২।১ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। কোন্ সময়ে আহার করা উচিত, ক্ষুধাই আমাদিগকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অনেক সময় আমরা লোভবশতঃ অথবা আত্মীয় স্বজনের উপরোধে অক্ষুধা বা ক্ষুধাতৃপ্তির উপর খাইয়া নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি।

দুগ্ধপায়ী শিশুগণকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ভোজন করাইবার এবং বালকদিগের ৪ ঘণ্টা অন্তর আহার করিবার আবশ্যক হয়।

রাত্রে স্বল্পাহারই প্রশস্ত। নিদ্রাকালে পরিপাক ক্রিয়া ধীরভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য রাত্রিকালে ভোজনের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া অবিধেয়। বালক ও যুবকদিগের পক্ষেও রাত্রে স্বল্পাহার প্রশস্ত, কারণ রাত্রে গুরু-আহার করিলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিবার সম্ভাবনা।

আহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মুখ ও হাত ধুইয়া ভোজন করা উচিত। আমরা কাঁটা চামচ ব্যবহার করি না; হাত দিয়াই খাই সুতরাং ভোজনের পূর্ব্বে আমাদিগের হাত ধুইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। নানা কারণে হাতে ময়লা লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, ভাল করিয়া হাত ধুইলে বাহিরের ময়লা অন্নের সহিত উদরে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। বাটীতে ওলাউঠা প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে যাহাদিগকে এই রোগের সংশ্রবে আসিতে হয়, তাহাদের ফেনাইল্ ও সাবান দিয়া রীতিমত হাত না ধুইয়া কোনও খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় স্পর্শ করা সমূহ বিপদের কারণ হইয়া থাকে। এই সকল ভয়ানক রোগের বীজ এইরূপ ছোঁয়া-লেপার দ্বারাই খাদ্য ও পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে এবং তদ্দ্বারা সুস্থ ব্যক্তি ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হয়। যে বাটীতে একটী ওলাউঠা রোগ দেখা যায়, তথায় শুশ্রূষাকারীদিগের অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশতঃ খাদ্য বা পানীয় এইরূপে সংক্রামিত হইয়া পরিবারস্থ একাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই বিষম বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায়।

মুখের মধ্যে সর্ব্বদা নানারূপ বীজাণু (Bacteria) বিদ্যমান থাকে। ভাল করিয়া কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া খাইলে এই বীজাণুগুলি খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইতে পায় না। ভোজনের পূর্ব্বে "গণ্ডূষ" নামক যে প্রাচীন

প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা যথারীতি আচরিত হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শুদ্ধ নামমাত্র জলে অঙ্গুলি নিমজ্জিত করিয়া মুখের ভিতর ছিটা দিলে প্রকৃত "গণ্ডূষ" করা হয় না। প্রকৃত "গণ্ডূষ" ভোজনের পূর্ব্বে উত্তমরূপে হাত ও মুখ ধুইয়া ফেলিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া অনুমিত হয়।

যে স্থানে আহার করা যায়, তাহা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। যে স্থানে অধিক আলোক ও বাতাস আছে এবং যেখানে কোনও দুর্গন্ধ আসিবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানেই ভোজনের পক্ষে প্রশস্ত। এইরূপ স্থানে ভোজন করিতে বসিলে শরীর ও মন উভয়ই স্বচ্ছন্দ থাকে। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও মনের প্রফুল্লতা সুপরিপাকের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বিশেষতঃ অন্ন-ব্যঞ্জনাদিতে যদি কোনও ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পতিত হয়, তাহা হইলে যথোচিত আলোকের অভাবে তাহা বাছিয়া লওয়া কষ্টকর হইয়া উঠে। অনেকে রান্নাঘরের মধ্যে ভাত খাইয়া থাকেন; ইহা স্বাস্থ্যকর প্রথা নহে। রান্না ঘর বড় গরম এবং উহা সর্ব্বদা ধূমপূর্ণ থাকে। সাধারণতঃ রান্নাঘরে বায়ু ও আলোকের অভাবও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। খাওয়া জিনিসটা একটা কাজসারা ব্যাপার বলিয়া মনে করা উচিত নহে, কারণ ইহার উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

বেশ করিয়া "জলছড়া" দিয়া স্থান মুছিয়া ভোজনের পাত্র রাখিবার যে ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত। অধুনা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে অধিকাংশ রোগের বীজ ধূলিকণার (Dust) সহিত মিশ্রিত থাকে। বাতাসের সাহায্যে ধূলি উড়িয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে পতিত হয় এবং তৎসাহায্যে ঐ সকল বীজ আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ উৎকট রোগ উৎপাদন করে। বাজারের খাবার যে বিশেষ অনিষ্টকর, তাহার কারণ যে শুদ্ধ ভেজাল দ্রব্যে ঐ সকল পদার্থ প্রস্তুত হয় বলিয়া, তাহা নহে। খাবার জিনিস দোকানে যেরূপ ভাবে রক্ষিত হয়, তাহাতে নানাবিধ রোগের বীজ-মিশ্রিত পথের ধূলি উহার উপর অনবরত পতিত হয়। সুতরাং রোগ উৎপাদন করিবার শক্তি বাজারের খাবারের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে বিদ্যমান থাকে। "জলছড়া" দিয়া মুছিয়া ভোজনের স্থান পরিষ্কার করিলে তথাকার ধূলি উড়িয়া অন্নব্যঞ্জনের সহিত মিশিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদিগের প্রবীণা গৃহিণীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। পাতের নীচে "জলছড়া" না দিলে তাঁহারা কখনই ভোজন পাত্র সেস্থানে রক্ষিত হইতে দেন না। কিন্তু আমাদিগের নবীনা গৃহিণীদিগের মধ্যে এই প্রথার বন্ধনটী ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শুদ্ধ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য নামমাত্র একটু জল ছিটাইয়া ভাতের থালা বসাইয়া দেওয়া হয়। আমি আশা করি প্রত্যেক গৃহিণী এই সুপ্রথার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া ইহার যথোপযুক্ত সমাদর করিবেন।

তাড়াতাড়ি ভোজন করা মহা অনিষ্ট-মূলক। সুপরিপাকের জন্য খাদ্যদ্রব্য অতি

সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি খাইলে যথোপযুক্ত চর্ব্বণের অভাবে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। খাদ্য যে কেবল চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইবার প্রয়োজন তাহা নহে, মুখের লালার সহিত উহার উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। মুখের লালা একটী পাচকরস। আমরা ভাত, রুটী, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার ঘটিত (Starchy) খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকি; উহারা মুখের লালার সাহায্যে শর্করায় পরিণত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেতসার-ঘটিত। অতএব যাহাতে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের উপর মুখের লালার ক্রিয়া অধিকক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি খাইলে ভক্ষ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পায় না এবং যথাপরিমাণ লালার সহিত মিশ্রিত হইবার সময় না পাইয়া অধিকাংশ শ্বেতসার (Starch) শর্করায় পরিণত না হইয়া পরিপাকের উপযোগী হয় না। খাদ্যদ্রব্য একবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে লালার পাচকক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়, সুতরাং শ্বেতসার-ঘটিত খাদ্য যত অধিকক্ষণ মুখের মধ্যে রাখিতে পারা যায়, ততই পরিপাকের সুবিধা হইয়া থাকে। তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে খাদ্য যে শুদ্ধ দুষ্পাচ্য হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারপদার্থ আমাদের দোষে এইরূপে অসার পদার্থরূপে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে ভোজন করা অজীর্ণ রোগের একটী মহৌষধ। ধীরে ভোজন করিলে আমরা যে অনেক রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি শুদ্ধ তাহাই নহে, খাদ্যের যে অংশ তাড়াতাড়ি খাইবার জন্য অসার পদার্থ-রূপে পরিত্যক্ত হয়, উক্ত অপব্যয়ও এই সুঅভ্যাস দ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হই।

আহারের সময় বা অব্যবহিত পরে অধিক জল বা বরফজল অথবা বরফদ্বারা শীতল করা কোনও পানীয় বা মালাই বরফ (Ice-cream) গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা পাকাশয়স্থিত পাচকরস অধিকতর তরল এবং ভুক্তদ্রব্য শীতল হইয়া পরিপাক কার্য্যের সবিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। আহারের সময় অল্পমাত্রায় জল পান করিয়া আহারের ২।১ ঘণ্টা পরে যথাপ্রয়োজন জলপান করিলে কোন ক্ষতি হয় না।

আর একটী কথা বলিয়া আহারের বিষয় শেষ করিব। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে তখন নিমন্ত্রণ-ভোজন একটা বড়ই আমোদের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজকাল লোককে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করা একটা মহাদায় বলিয়া অনেক সময়ে মনে হয়। যাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন তাঁহাদেরও বিপদ, আবার যাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, তাঁহারাও শরীরের ভালমন্দ লইয়া একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহার প্রধান কারণ ভোজনের আড়ম্বর বাহুল্য। নিমন্ত্রণ একটী অবশ্য পালনীয় সামাজিক প্রথা। সৌহৃদ্য, আত্মীয়তা, সদাচার, সৌজন্য, আতিথেয়তা প্রভৃতি সামাজিক জীবনের সদ্‌গুণাবলী নিমন্ত্রণ-প্রথা দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে এত অধিক আড়ম্বর উপস্থিত হইয়াছে যে ব্যয়বাহুল্য হেতু গৃহস্থ লোকে ২।১০ জন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকেও

বৎসরে একবার নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হয় না। আজকাল আমাদিগের ভোজে একপ্রস্থ খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আগে ভাতের যজ্ঞ হইলে ভাত, মাছ, তরকারী, দধি ও মিষ্টান্ন হইয়াই শেষ হইত। বড় লোকের বাটীতে ফলাহারের আয়োজনে লোকে লুচি ও তরকারী তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করিত। আজকাল অধিকাংশ স্থলেই ভোজের এরূপ সরল ভাবের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশী, বিলাতী, ফরাসী, মোগলাই, চীনা, জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের বিশেষ বিশেষ খাদ্য এক দিনের ভোজের জন্য আয়োজন করিতেই হইবে। সুতরাং যে খাইতে যায়, ভোজন তাহার পক্ষে সুখের না হইয়া নানা অসুখের কারণ হইয়া থাকে, এবং যে খাওয়ায়, খরচ ও আয়োজনের আড়ম্বরে তাহারও প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া উঠে। অথচ আমাদিগের অভিমান এতই প্রবল হইয়াছে যে আমরা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত না করাইলে নিজের হীনত্ব অনুভব করিয়া থাকি! কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাহিরে কোনও স্থানে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম প্রত্যেক আসনের উপর এক একখানি সুন্দর ভাবে মুদ্রিত পুস্তক রহিয়াছে। ঐ পুস্তকে সে দিনকার খাদ্য দ্রব্যের একটী তালিকা (Menu) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলাম সর্ব্বশুদ্ধ ১০২টী। খাদ্যসামগ্রী এত অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে আসনে বসিয়া হাত বাড়াইয়া সকল জিনিষ পাইবার উপায় ছিল না। ঐ সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। আমার একটী বন্ধু আমার পার্শ্বে ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "একবার পাতের দিকে চাহিয়া দেখুন, আর সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত একমুষ্টি অন্নবিহনে মৃতপ্রায় লোকদিগের কথা মনে করুন।" আমরা বাস্তবিক বৃথা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকি। ইহা কি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে যে অত সামগ্রী একজনে কেন, দশজনেও খাইয়া উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। আমরা নিশ্চয় জানি যে অধিকাংশ দ্রব্যই পাতে পড়িয়া থাকিবে এবং পরদিন আবর্জ্জনার গাড়ী বোঝাই করিয়া বিদায় করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি আমাদের অভিমান এতই প্রবল যে বহুক্লেশোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া এই বৃথা আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হই না! গৃহস্থ লোক যে এই ব্যয়বাহুল্যের জন্য নিমন্ত্রণরূপ সামাজিক প্রথা পালন করিতে সমর্থ হয় না, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। সামান্য ভোজের আয়োজনে যদি লোক সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে এই আত্মীয়তা রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় সমাজ হইতে লোপ প্রাপ্ত হয় না। এই বিষয়ে সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা "বড় মানুষ," তাঁহারা যদি নিমন্ত্রণে সামান্য ভোজের আয়োজন করেন, তাহা হইলে গৃহস্থ লোকেরা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে সাহসী হইবে এবং সামাজিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ নিমন্ত্রণ-প্রথা যথারীতি আচরিত হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিবে।

নিরামিষ ও আমিষ ভোজন। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে একটা মতভেদ

আবহমান কাল ব্যাপিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। "খাদ্য" নামক পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এ প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করি না। যাঁহারা বলেন যে মাংস ভোজন না করিলে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য লাভ করা যায় না অথবা যাঁহারা বলেন যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যলাভ নিরামিষ ভোজনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আমরা এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ ও তাহাদের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও আধ্যাত্মিকতা, আমিষ বা নিরামিষ ভোজী, কাহারো একচেটিয়া বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, সকল মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার আহার নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নহে। অনেকের মাংসভোজন একেবারেই সহ্য হয় না; কেহ বা মাংস যত সহজে পরিপাক করিতে সমর্থ হয়, অন্য খাদ্য সেরূপ নহে। এরূপ দুই ব্যক্তির পক্ষে এক প্রকার আহারের ব্যবস্থা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। মূল কথা এই যে আমিষ বা নিরামিষ ভোজন, কোনটীই অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়া উচিত নহে। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি অনুসারে, আমিষ বা নিরামিষ, যে কোন প্রকার খাদ্য হইতে শরীর রক্ষার উপযোগী সমস্ত উপকরণই যথাপ্রয়োজন সংগ্রহ করিতে পারি। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে, আমিষই হউক, আর নিরামিষই হউক, উহা প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। নিত্য নিয়মিত পরিমাণে মাংস ভোজন করিলে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায় না, তবে ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংসের ব্যবহার সবিশেষ সংযত হওয়া উচিত। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই আমিষ ও নিরামিষ দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভোজন করে; এইরূপ "মিশ্রখাদ্য" (Mixed diet) অনেকেরই পক্ষে তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্য-প্রদ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেরই আয় যৎসামান্য, এজন্য মাংসভোজন এদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব। ছাগমাংস বা মেষমাংস সুলভ নহে এবং সহজে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। একসের মাংসের মধ্যে যে পরিমাণ মাংসজাতীয় উপাদান (Proteids) আছে, তিন পোয়া ডালের মধ্যে তাহা অবস্থিতি করে। একসের ছাগ বা মেষমাংসের দাম আট আনার কম নহে, তিন পোয়া ডালের দাম ছয় পয়সার অধিক নহে। সুতরাং যে পরিবারে প্রত্যহ একসের মাংসের প্রয়োজন, তাহার আট আনা খরচের পরিবর্ত্তে ছয় পয়সার ডাল কিনিলেই সমান ফল লাভ হইতে পারে। শ্রমজীবিদিগের তো কথাই নাই, গৃহস্থলোকের মধ্যে কয়জন প্রত্যহ যথাপ্রয়োজন মাংস ক্রয় করিবার খরচের সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারেন? যাঁহারা বলেন যে মাংস সহজে পরিপাক হয়, ডাল বড় দুষ্পাচ্য, আমি তাঁহাদের কথা, একটী সাধারণ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। খাদ্য পরিপাক করা অনেক সময়ে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যাহাদের ডাল রুটী বা ডাল ভাত খাওয়া অভ্যাস, তাহারা যদি অতিরিক্ত

পরিমাণে ডাল না খায়, তাহা হইলে উহা পরিপাক করা তাহাদের পক্ষে আয়াস-সাধ্য হয় না। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ডাল বড় দুষ্পাচ্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এ দেশীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে বিনা বিচারে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। যাঁহারা মাংসভোজনে অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে ডাল দুষ্পাচ্য হওয়া অসম্ভব নহে; তেমনই যাঁহারা বংশানুক্রমে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া ডাল ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ মাংসভোজন করিতে দিলে তাঁহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত হইয়া তাঁহারা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। বহুমূত্র-রোগাক্রান্ত ভারতবাসী রোগীদিগের জন্য মাংস-ভোজনের ব্যবস্থা করিবার সময় কিরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন। অনেকে অনুমান করেন যে যাহারা পুরুষানুক্রমে ডাল খাইয়া আসিতেছে, তাহাদের পরিপাক-যন্ত্রাদি এরূপভাবে গঠিত হয় যে তাহারা সহজে উক্ত খাদ্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয়; এই অনুমান একেবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া মনে হয় না। আর একটী কথা এই, যে সামান্য ব্যয়ে ভারতবাসীগণ ডাল ভাত পেট পুরিয়া খাইতে পায়, কিন্তু তাহাদের জন্য মাংসের ব্যবস্থা করিতে হইলে শাস্ত্রনিষিদ্ধ "সুলভ মাংস" ব্যতীত অন্য মাংসের ব্যবহার তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। হিন্দু সমাজে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা যে নিতান্ত হাস্যাস্পদ, অপ্রীতিকর ও অসঙ্গত, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। শুদ্ধ হিন্দু কেন, বহুকাল হিন্দুস্থানে বাস করিয়া এবং হিন্দু-সমাজের সংশ্রবে থাকিয়া অনেক মুসলমানেরও "সুলভ মাংসের" প্রতি যথেষ্ট বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা প্রচার করেন যে এদেশে অবাধ মাংসভোজন প্রচলিত না হইলে জাতিগত স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের উন্নতি সাধিত হইবার উপায় নাই, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের ব্যবস্থা যদি লোকের ধর্ম্মগত বিশ্বাস, আচার, রুচি ও আর্থিক অবস্থার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে উহা কোন কালেই সাধারণের গ্রাহ্য ও কার্য্যকরী হইবে না। এরূপ বিফল চেষ্টায় সময় ও শক্তি অপব্যয় না করিয়া তাঁহারা যদি সংস্কারসম্মত সহজলভ্য যেসকল খাদ্য মাংসের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ, তাহাদিগের গুণাগুণ এবং কিরূপভাবে প্রস্তুত হইলে তাহারা "একঘেয়ে" না হয় অথচ সহজে পরিপাচ্য হয়, তৎসম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাইকেল ফ্যারাডে।

আমি যদি বলি যে, যে ছোট্টা বালক "বেঙ্গলি" বা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" কাগজ প্রত্যহ প্রাতে আপনার বাটীতে দিয়া আসে, সে বা তাহার দলের মধ্যে একজন কালক্রমে ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিয়াছেন, অথবা চাঁদনির চকে দপ্তরির দোকানে যে সকল ছোট ছোট ছেলে বহি ও খাতা বাঁধে তাহাদের মধ্যে একজন মন্ত্রশক্তি বলে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত একজন রাসায়নিক হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে আপনি হে পাঠক! আমার কথায় কি বিশ্বাস করিতে পারেন? আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—অদ্য আপনাদিগকে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত শুনাইব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাঁহার জীবনে এরূপ অসম্ভব বাস্তবিকই সম্ভব হইয়াছিল। দরিদ্র কামারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে বাল্যকালে দপ্তরি ও সংবাদপত্রবাহকের কর্ম্মই করিতেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনিই পৃথিবীর একজন অদ্বিতীয় রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিৎ বলিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। একজন চিন্তাশীল লেখক প্রতিভার (genius) স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "Genius consists in the capacity of taking unlimited pains" অর্থাৎ অশেষ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাই প্রতিভার লক্ষণ। কিন্তু মনে হয় যে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাতেই কেবল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আরও কিছু—দৈব, অতিমানুষিক মানসিক ও নৈতিক শক্তি—প্রতিভাতে প্রচ্ছন্ন আকারে বিরাজ করে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন প্রকার সুকৃতি না থাকিলে কামারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে কোন্ পুণ্যবলে আজ বিশ্বের এতগুলি নরনারীর পূজনীয় হইয়া গিয়াছেন?

মাইকেল ফ্যারাডে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সরে নামক কাউন্টিতে নিউইংটন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পর তাঁহার পিতা দেশ হইতে চিরদিনের জন্য লণ্ডনে উঠিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা এত বেশী ছিল যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের অন্নকষ্টের সময় তাঁহাদিগকে দাতব্য সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময় মাইকেলকে কখনও একখানি রুটি মাত্র খাইয়া সাত দিবস বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছিল। দরিদ্রের সন্তান মাইকেলের লেখাপড়া আর কি করিয়া হয়, তত্রাচ তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে স্কুলে দিয়াছিলেন। বালক মাইকেল স্কুলে লিখিতে, পড়িতে ও সামান্য অঙ্ক কসিতে শিখিয়াছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাইকেল ফ্যারাডে জর্জ্জ রিবো নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা ও দপ্তরির দোকানে সংবাদবাহকরূপে নিযুক্ত হইল। বাড়ী বাড়ী সংবাদ পত্র বহন করা তাহার প্রধান কাজ ছিল।

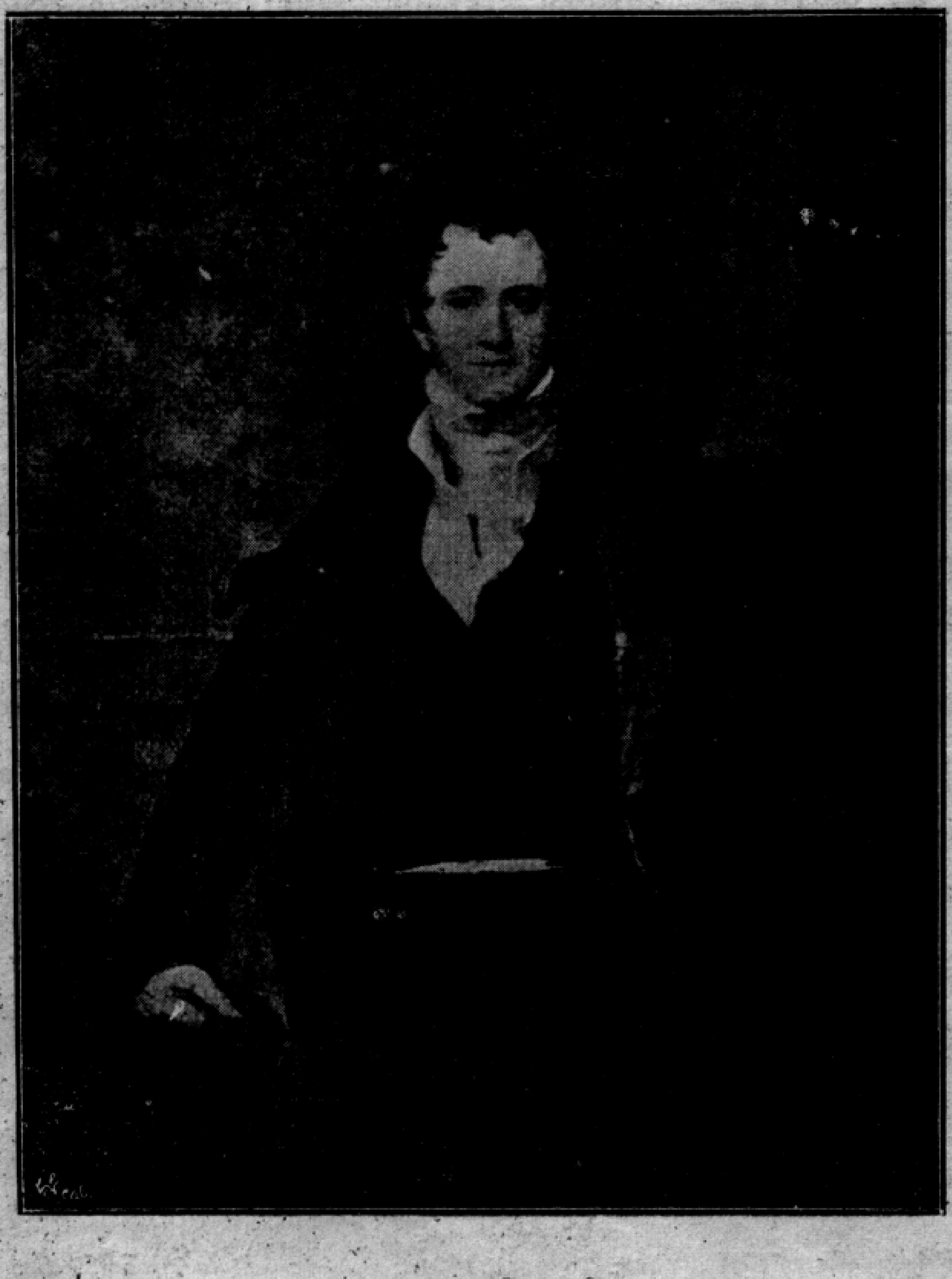
হয়ত একবাটী হইতে অপর বাটীর ব্যবধান এক মাইলেরও উপর হইবে। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে মাইকেল বই বাঁধার কার্য্যে শিক্ষানবিশভাবে নিযুক্ত হইলেন। বইত অনেকেই বাঁধে, কিন্তু সেই সকল বই পড়িবার প্রবৃত্তি ত সকলের থাকে না। মাইকেলের মধ্যে যে প্রতিভা ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা হইয়া রহিয়াছিল তাহাই তাহাকে এই সকল পুস্তক পাঠে নিয়োজিত করিল। মাইকেল বাঁধিবার জন্য বই পাইলেই উহা আগে পড়িয়া লইতেন। বিজ্ঞানের বই তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে ওয়াট্‌স্ সাহেবকৃত "মনস্তত্ত্ব" প্রথমে তাঁহাকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিল এবং মিসেস মার্সেট কৃত "রাসায়নিক কথাবার্ত্তা" ও "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের মধ্যে "বিদ্যুৎ" নামক প্রবন্ধ তাঁহার মনকে প্রথম বিজ্ঞানের দিকে চালিত করে।

যে বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সমুজ্জ্বল হইয়াছিল সেই বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় এইরূপ অতি দীনভাবেই ঘটিয়াছিল। মাইকেলের স্বভাবসুলভ সরলতা ও সুমিষ্ট কথাবার্ত্তার জন্য তাঁহার প্রভুর গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ভাল বাসিত। তাঁহাদের মধ্যে মিষ্টার ডন্স নামক এক ব্যক্তি রয়েল ইনষ্টিটিউশনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হামফ্রী ডেভীর বক্তৃতা শ্রবণের সুবিধা ফ্যারাডেকে করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা এক রয়েল ইনষ্টিটিউশন ভিন্ন [illegible] হইবার বন্দোবস্ত ছিল না। তখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদি হওয়া উচিত। এখন ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণকে বৈজ্ঞানিকজ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য নানা সভাসমিতি হইয়াছে। অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট এই সকল সভাসমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ডবাসীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন অপরে বিজ্ঞান শিখিবার সুবিধা আদৌ পায় না। যে সকল যুবক নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারে না তাহারা বিজ্ঞান শিক্ষালাভে যাহাতে বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মনে রাখা উচিত যে রয়েল ইনষ্টিটিউশন না থাকিলে মাইকেল ফ্যারাডের অভ্যুদয় সম্ভব হইত না। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই অভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞানের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার জন্য "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স" নামক বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কিন্তু ভরসা আছে কালক্রমে উহার সার্থকতা বর্দ্ধিত হইবে।

যে দিন মাইকেল ফ্যারাডে একখানি খাতা হাতে করিয়া রয়েল ইনষ্টিটিউশনে ডেভীর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, সে দিবস ফ্যারাডে ও রয়েল ইনষ্টিটিউশন—এই দুইয়ের—জীবনের

সহিত সম্পর্ক ফ্যারাডের সমগ্র জীবনে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযশ রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনকে সমগ্র ইউরোপে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত ডেভী ও ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাবলী ঐখানে সযত্নে রক্ষিত আছে বলিয়া রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পরম পুণ্যময় তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত।

ডেভী তখন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফ্যারাডের মতন তিনিও খুব হীনাবস্থা হইতে পরে স্বীয় প্রতিভার গুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালের অন্তঃপাতি পেন্‌জান্স নামক স্থানে ডেভীর জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি এক ডাক্তারখানায় শিক্ষানবিশী করিতেন এবং সেই অল্প বয়সেই মদের গেলাস, পুরাতন ঔষধের শিশি, তামাকের নল এবং একটা পিচকারি লইয়া নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেন। কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ডাক্তার বেডোজ নামক একজন চিকিৎসকের সহকারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে ডেভী, নাইট্রস্ অক্‌সাইড (nitrous oxide) নামক গ্যাস লইয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে এই গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল। তিনি সাহস করিয়া নিজ শরীরে ঐ গ্যাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ গ্যাস শুঁকিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি যেন অমরাবতীতে সুখে বিচরণ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে খুব হাসিতেছিলেন। খানিক পরে তিনি সুস্থাবস্থায় আবার উঠিয়া বসিলেন—তখন শরীরে আর কিছু মাত্র গ্লানি নাই। সেই অবধি এই গ্যাস "হাস্যোদ্দীপক গ্যাস" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই অদ্ভুত



সার হাম্‌ফ্রী ডেভী

গ্যাসের স্বরূপ আবিষ্কারের পর ডেভীর নাম বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিচিত হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ স্থাপিত হয় এবং কাউণ্ট রমফোর্ড (Count Rumford) তাঁহাকে ঐখানে সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি দিন দিন নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তড়িতের সাহায্যে কষ্টিক পটাশ (Caustic Potosh) এবং কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) নামক তীক্ষ্ণ ক্ষারদ্বয়কে বিশ্লিষ্ট করিয়া পোটাসিয়াম (Potassium) এবং সোডিয়াম (Sodium) নামক দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। ঐ উপায়ে মেগ্‌নিসিয়াম (Magnisium) বেরিয়ম (Barium) কেলসিয়াম (Calcium) ও ষ্ট্রন্‌সিয়াম (Strontium) নামক আরও চারিটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সেফ্‌টি ল্যাম্প (Safety Lamp)। পূর্ব্বে কয়লার খনিতে নানাপ্রকার দাহ্য গ্যাস থাকাতে তথায় কোনরূপ আলোক লইয়া যাওয়া বিপদজনক ছিল। ডেভী তাঁহার নূতন প্রদীপ আবিষ্কার করিয়া খনির কার্য্যে নিযুক্ত সহস্র সহস্র মানবের প্রাণরক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ডেভীর বক্তৃতা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে দলে পুরুষ ও মহিলা সমাগত হইতেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপকগণের বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ আবিষ্কারের বিষয়ই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পুরাতনেরই আলোচনা হইয়া থাকে, নূতনের সন্ধান শ্রোতৃবর্গ পান না। এই পার্থক্যের ফল স্বভাবতই পৃথক্ হইয়া পড়ে। একদিকে যেমন কেবল চর্ব্বিতের চর্ব্বণ, অধীতবিদ্যার অধ্যাপনা হইয়া থাকে, অপরদিকে নব নব তথ্য আবিষ্কারের জলন্তকাহিনীর অনিবার্য্য আকর্ষণ শ্রোতৃবর্গের মনে নব অনুরাগ জাগাইয়া তোলে। একদিকে রাশি রাশি "পুস্তকস্থ বিদ্যার" কণ্ঠস্থকরণ ভিন্ন অন্য সুফল দৃষ্ট হয় না, অপর দিকে বক্তার আদর্শের অনুকরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বতই শ্রোতৃবৃন্দকে আকুল করিয়া দেয়। ফ্যারাডে গ্যালারীর এককোণে বসিয়া একমনে ডেভীর স্বকীয় আবিষ্কারের ভাবভঙ্গিমাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ডেভীর বৈজ্ঞানিক আদর্শ তাঁহার মনেও জাগিতে লাগিল। দপ্তরির কাজ আর তাঁহার ভাল লাগিল না। কেমন করিয়া তিনি দপ্তরির কাজ ছাড়িয়া অতি দীনভাবেও বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারিবেন এখন হইতে সেই চিন্তাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে তিনি প্রত্যেক বক্তৃতার জন্য এক শিলিং খরচ করিয়াও ৫৩ নম্বর ডরসেট ষ্ট্রীটস্থ মিষ্টার টটমের বাটীতে রাত্রি আটটার সময় বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তাঁহার নিজের পয়সা ছিল না, তাঁহার ভ্রাতা রবার্ট এই সকল বক্তৃতা শুনিবার খরচ দিতেন। তিনি এই সকল বক্তৃতা কেবল শ্রবণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, তাহাদের সারমর্ম্ম খাতায় লিখিয়া লইতেন

এবং প্রদর্শিত যন্ত্রাদির চিত্রও অঙ্কিত করিতেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তাঁহার রিবোর নিকট শিক্ষাণবিশী শেষ হইল। তাহার পর তিনি নিজের নামে দপ্তরির ব্যবসা খুলিলেন। দিন কতক এইরূপে কাজ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার শিক্ষাণবিশীর সময় যতটা বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য সময় পাইতেন এখন আর তাহা পান না। অতএব এখন হইতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন যে যেমন করিয়া হউক এই দপ্তরির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ইতিপূর্ব্বে তিনি রয়েল সোসাইটি নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতি সার জোসেফ ব্যাঙ্কসকে স্বকীয় বিজ্ঞানচর্চ্চার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তথায় একটি চাকরির জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই দুঃসাহসের কি আর উত্তর দিবেন। এখন তিনি আবার সার হমফ্রী ডেভীকে একখানি পত্র লিখিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার ভাষায়,—"এই সময়ে আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ ও বিজ্ঞানের সেবা করিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে আমি সাহস ভর করিয়া সার হমফ্রী ডেভিকে একখানি পত্র লিখিলাম। আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে আমার নিজের কর্ম্ম নীচ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সদাশয় ও মহৎব্যক্তি। ঐ পত্রে আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে তিনি আমাকে একটি চাকরী দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। চিঠির সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা যে খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম তাহাও পাঠাইয়া দিলাম।" ডেভী ফ্যারাডের খাতাখানি পড়িয়া তাঁহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। ডেভী উত্তরে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।

মহাশয়,

আপনি আমার উপর বিশ্বাসের যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে আমি আদৌ অসন্তুষ্ট নহি এবং আমি উহাতে আপনার ঐকান্তিক আগ্রহ, প্রভূত স্মৃতিশক্তি ও মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। আমি সম্প্রতি সহরের বাহিরে যাইতেছি এবং সহরে ফিরিতে নাগাদ জানুয়ারী মাস হইবে। ফিরিয়া আসিলে আপনি যখন ইচ্ছা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। ইতি। ভবদীয়—হমফ্রী ডেভী।

ডেভীর এই উত্তরে ফ্যারাডের কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। এক দিবস রাত্রে ফ্যারাডে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে বাটীর দরজায় জোরে ধাক্কার শব্দ পাইলেন। দরজা খুলিবামাত্র একজন ভৃত্য একখানি পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া গেল। পত্রখানি খুলিয়া দেখেন যে উহা ডেভীর লিখিত—রয়েল ইনষ্টিটিউশনে একজন সহকারীর পদ খালি আছে, ফ্যারাডের মনের যদি পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ পদ তাঁহার হইতে পারে। তিনি এইরূপে তাঁহার চিরইপ্সিত বিজ্ঞানসেবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে ঐ পদের জন্য প্রার্থী হইলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ মাসের রয়েল ইনষ্টিটিউশনের পরিচালক-

গণের সভার কার্য্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে "সার হাম্‌ফ্রী ডেভী ইনষ্টিটিউশনের পরিচালকবর্গকে জানাইয়াছেন যে তিনি এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি উইলিয়ম পেনের পরিত্যক্ত পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। ইঁহার নাম মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁহার বয়স বাইস বৎসর, তাঁহাকে সৎস্বভাবসম্পন্ন, কর্ম্মঠ, প্রফুল্লচিত্ত এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। মিষ্টার পেন্ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সময় যে বেতন পাইতেন ইনিসেই বেতনেই কর্ম্ম কবিতে রাজী আছেন।

অতএব স্থিরীকৃত হইল যে মাইকেল ফ্যারাডে মিষ্টার পেনের পদে সেই বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" —ফ্যারাডে এতদিন যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। তিনি সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং বেতনে রয়েল ইনষ্টিটিউশনে সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং থাকিবার জন্য উপরতলায় দুইটি ঘরও পাইলেন।

ইউরোপ ভ্রমণ।

ফ্যারাডে আগ্রহ সহকারে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ডেভী এই সময়ে নাইট্রোজেন ক্লোরাইড নামক একটি অতি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটু অসাবধান হইলে হয়ত যন্ত্র ফাটিয়া গিয়া প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, এক্ষেত্রে ডেভী ফ্যারাডেকে সহকারী করিয়া লওয়াতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি ফ্যারাডের দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে কাচের বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া এই বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেন, এবং কোনও রূপ বিপদ না হওয়াতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ফ্যারাডে খুব সতর্কতা ও দক্ষতা-সহকারে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিলেন এবং ফ্যারাডেকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নানা দেশের প্রধান-প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের সহিত সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিবার সুবিধা, তাঁহাদের বিজ্ঞানাগার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ফ্যারাডে ছাড়িতে পারিলেন না। শুধু পুস্তক পাঠে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, তাই ইউরোপের কৃতী ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সমস্ত ইউরোপের প্রথিতযশা অধ্যাপকগণের বিজ্ঞানাগারে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া থাকেন। মহতের সংস্পর্শে যে পুণ্যের সঞ্চয় হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় এবং কার্য্যপ্রণালীতে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি, একটা উত্তেজনার ভাব আছে যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষার্থীও তদীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই ফ্যারাডের এই ইউরোপ ভ্রমণ প্রকৃত শিক্ষার কার্য্য করিয়াছিল।

যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ডেভীর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, ফ্যারাডে ও একজন ভৃত্য যাইবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে

ফ্যারাডের ডেভীর সহকারীরূপেই যাইবার কথা ছিল কিন্তু সঙ্গে ভৃত্য না যাওয়াতে তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভৃত্যের কাজও কিছু কিছু করিতে হইত। ফ্যারাডে ইউরোপ ভ্রমণকালে একখানি খাতায় ভ্রমণসম্বন্ধে স্মরণীয় ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। তাহা পাঠে জানা যায় যে ইয়োরোপপ্রবাস তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুখের হয় নাই। বিশেষতঃ ডেভীর পত্নী তাঁহার উপর কর্তৃত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহাকে নানারূপ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি এ সকলই সহ্য করিয়া দেড় বৎসরকাল ইয়োরোপে নানা দেশদর্শন ও অনেক বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানব প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে অনেক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। একদিবস আম্পিয়ার, ক্লিমেণ্ট ও ডেসরমে নবাবিষ্কৃত "আইওডিন" নামক মৌলিক পদার্থ ডেভীকে দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ডেভী প্যারিসে উহা লইয়া কতকগুলি পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। তথায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়া সকলে ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের গাড়ী পঁয়ষট্টি জন বাহকের দ্বারা আল্পস পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। প্রথমে সকলে টিউরিন সহরে পঁহুছিলেন, সেখান হইতে জেনেভা যাত্রা করিলেন। জেনেভাতে চলনশীল তড়িতের (Current electricity) আবিষ্কর্ত্তা বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানগরীয়ান ভল্টার (Volta) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। এইখানে আর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডিলা রাইভের (De La Rive) সহিত ফ্যারাডের পরিচয় হয়। তিনি ফ্যারাডের গুণের এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে একদিন ডেভী ও ফ্যারাডে উভয়কেই তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ডেভী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ ফ্যারাডে যখন কোন কোন বিষয়ে তাঁহার ভৃত্যের কার্য্য করিতেন তখন তাঁহার সহিত একসঙ্গে তিনি আহার করিতে পারেন না। ডিলা রাইভ এই উত্তরে দুঃখিত হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে আমাকে একটি ভোজের পরিবর্ত্তে দুইটি ভোজ দিতে হইবে"। ফ্যারাডে তাঁহার এই সৌজন্য কখনও বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার স্মৃতি চিরজীবন তিনি বহন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ডিলা রাইভের পুত্রকে ফ্যারাডে লিখিয়াছিলেন, "আপনার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তিনি স্বয়ং জেনেভাতে, এবং পরে চিঠিপত্রে আমাকে উৎসাহিত এমন কি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন"।

জেনেভা হইতে ডেভী সদলে ফ্লরেন্স্ সহরে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফ্যারাডে সবিস্ময়ে গ্যালিলিও (Galelio) কর্তৃক ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখিলেন। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে পুণ্যশ্লোক গ্যালিলিও নৈশগগনের তারকামণ্ডলীর সহিত রজনীতে সখ্যতা স্থাপন করিতেন। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচারের জন্য রাজদ্বারে সবিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র অতি সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফ্লরেন্সে প্রায় একমাসকাল অতিবাহিত করিয়া

সকলে রোমনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে নেপল্‌স্ সহর দিয়া ভিসুভিয়াস নামক আগ্নেয়গিরি দর্শন করিতে গেলেন। তাহার পরে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জেনেভাতে পঁহুছিলেন; তথা হইতে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ফ্যারাডে ফিরিয়া আসিয়া আবার রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু ডেভীর সহিত হাতেকলমে কাজ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ডেভীর ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা অল্পে অল্পে তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। বাস্তবিক উপযুক্ত গুরু লাভ না হইলে সাধনার পথ সুগম হয় না—তাই দেখি প্রহ্লাদের গুরু নারদ, শিবাজীর গুরু গুরুদাস, বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ, মাইকেলের গুরু মিল্‌টন, আর ফ্যারাডের গুরু ডেভী। এখন হইতে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক জীবন আরম্ভ হইল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী তিনি "সিটি ফিলজফিক্যাল" সোসাইটিতে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেন। ঐ বৎসরই তাঁহার প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতক্ষণ আমরা ফ্যারাডের প্রতিভা কিরূপে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাঁহারই পরিচয় দিলাম। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া তাঁহার কথা শেষ করিব।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

চয়ন

মাতৃঋণ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন।

পারিতে কোয়ে অগাস্তি'র মধ্য দিয়া যে সুদীর্ঘ সরু গলি গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে নূতন পুরাতন বিস্তর পুস্তকের দোকান আছে। সেই দোকানের সারির মধ্যে থামযুক্ত এক প্রাচীন অট্টালিকায় "ভবিষ্য জাতির আলোচনা" মাসিকপত্রের কার্য্যালয়।

অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া এই বাটীটি কার্য্যালয়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এ পাড়ায় নূতন মাসিক পত্রের কার্য্যালয় খাড়া করা পারি সহরের চিরপ্রচলিত রীতি। ইহাতে সুবিধাও বিস্তর। সহরের ঠিক বক্ষের উপর নানা বিচিত্র অক্ষরে নবপ্রকাশিত গ্রন্থরাজির মন-ভুলান বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে গ্রন্থ-পিপাসু পাঠকের সম্মুখে প্রলোভনের জাল পাতিয়া রাখিলে লাভের আশা বিলক্ষণ, তাই মরোভাঁ আর্জেন্তঁ কোম্পানি পত্রিকার কার্য্যালয় স্থাপনের জন্য এই স্থানটি নির্ব্বাচিত

"ভবিষ্যজাতির আলোচনার" কর্ত্তৃপক্ষগণ নবভাবের পুরোহিত। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার দ্বার নূতন লেখকগণের নিকট অবারিত ছিল। দেশের প্রাচীন মাসিকপত্র-গুলা ক্রূর হিংসা ও অবজ্ঞার সহিত যাঁহাদিগের রচনা দূরে নিক্ষেপ করিত, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়াই মরোভাঁ-আর্জেন্তঁ কোম্পানির প্রধান ব্রত ছিল। কার্য্যালয়ের বাটিটি মাসিকপত্রের গৌরব-ঘোষণার পক্ষেও যথেষ্ট অনুকূল ছিল—বালি-ঝরা দেওয়াল, অপরিচ্ছন্ন ঘরদ্বার, জীর্ণ মোটা থাম, সেঁতো জমি ও কাগজের একটা মিশ্র দুর্গন্ধ এবং পারিপাট্যের অভাব কাগজখানির সম্ভ্রমরক্ষার উপযোগী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা থাকিলেও কাগজের গ্রাহক জুটিতেছিল না। অক্ষম, বিতাড়িত লেখকগণের কোলাহলে কার্য্যালয় সারাদিন মুখরিত থাকিত। মলিনমুখ, জীর্ণবেশ, ও ছিন্ন পকেটে প্রকাণ্ড পাণ্ডুলিপি লইয়া কত শত লেখক কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহবচনসুধার আস্বাদগ্রহণে ধন্য হইয়া ফিরিত, তাহার সংখ্যা ছিল না।

এই সকল অক্ষম লেখক যদি প্রচুর অর্থসাহায্যে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের সুযোগ পায় ত তাহার ফল কিরূপ দাঁড়ায়! "ভবিষ্য জাতির আলোচনার" স্বত্বাধিকারী ছিল দুইজন—জ্যাক ও আর্জেন্তঁ। জ্যাকের অর্থে, যে দশসহস্র মুদ্রা বন্ধু তাহাকে দান করিয়াছিলেন,—সেই অর্থে, আর্জেন্তঁর উদ্যোগে এই পত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। সার্লটিকে সে বুঝাইয়াছিল, "এমন লাভের ব্যবসা আর দুইটি নাই! টাকাগুলা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিলে এই মাসিকপত্র বাহির করা যাক্—অদ্ভুত লাভ দেখাইয়া দিব। এত লাভের না হইলে কি ইহাতে আমারও টাকা ঢালি, আমি! জ্যাকের দশ হাজার, তাহাতে আমারও দশ হাজার, যোগ দিব—এই মূলধন বিশ হাজার—দেখ না, পাঁচ বৎসরে বিশ লক্ষ দাঁড় করাইয়া তবে ছাড়িব।"

কিন্তু লাভের অঙ্কে শূন্য পড়িলেও, ছয়মাসে আর্জেন্তঁর বারো হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। বাড়ী ভাড়া, লেখকগণের পারিশ্রমিক, ছাপাখানার বিল—তাহারা ছাড়িবে কেন? কার্য্যালয়ের চতুর্থতল কবি আপনার বাসের জন্য মনোনীত করিয়াছিল, উপরের ঘর হইতে মুক্ত নির্ম্মল আকাশ—চারিধারে নগরের বিচিত্র শোভা, চক্ষু ভরিয়া দেখা যায়—একবার বসিয়া উর্দ্ধে কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেই, ভাবের পাহাড় বহিয়া সে ফিরিবে! কি সুন্দর আয়োজন! রচনার পর রচনা ঝরিয়া পড়িবে, মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া সে রচনাসম্ভার নরনারীর চিত্তদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়াছে! চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে! ছয় বৎসর ধরিয়া বিজন পল্লীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া এত মাথা কুটিয়াও যে গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, এখানে আসিয়া নিমেষে সেই বড় সাধের "কষ্টের কন্যা" নাটকের 'যবনিকা পতন' হইয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প নিত্য লেখা হইতেছে—যেন পর্ব্বত গাত্র হইতে বিপুলবেগে খরস্রোতা নদী বহিয়া চলিয়াছে। বিরাম নাই, বাধা নাই, বন্ধ নাই! আবার পাণ্ডুলিপিতে পৌঁছিয়াই

ছাপাখানার কম্পোজিটারের দল, তাহা দেখিয়া একটির পর একটি করিয়া অক্ষর বসাইয়া চলিয়াছে—কি তাহাদিগের যত্ন, কি সে আগ্রহ! মুদ্রাকর তাহা লইয়া দ্রুত ছাপিয়া চলিয়াছে—দপ্তরী সে রচনা গাঁথিয়া দিতেছে। ছাপার অক্ষরে জ্বলজ্বলে হইয়া আর্জেন্তর রচনা নক্ষত্রপুঞ্জের মত ফুটিয়া উঠিতেছে! এ কি কম সুখ!

নিত্য বহু রচনা লিখিতে হইলে আর একজনের সহায়তা চাই। সে সহায়ও মিলিয়াছিল;—সার্লটি! আর্জেন্ত বলিয়া যাইত, সার্লটি পার্শ্বে বসিয়া তাহা লিখিয়া লইত। কবির এই সাহিত্য-সাধনায় সে যে এতটুকুও সহায়তা করিতে পারিতেছে, ইহাতে সে অন্তরে গর্ব্ব অনুভব করিত! সার্থক তাহার জীবন! একদিন যখন আর্জেন্তর সাহিত্য-সেবার ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন সে পৃষ্ঠায় তাহার নামটিও যে স্থানলাভে বঞ্চিত হইবে না, ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে! ফরাসী সাহিত্য, আর্জেন্ত ও সার্লটি—এই তিনটি নাম এক সঙ্গে গ্রথিত থাকিবে!

সেদিন সন্ধ্যার সময় কবির প্রাণে ভাব আসিয়াছিল। টেবিলের উপর কাগজের বোঝা ফেলিয়া সার্লটি লিখিতে বসিয়াছিল, কবি বাতায়ন পার্শ্বে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত-ভাবে অবস্থান করিয়া আকাশের দিকে ভাবোন্মাদময় চাহিয়াছিল! ভাব আসে-আসে, আসে না! যেন কবির সহিত সে একটা বিরাট লুকাচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিষ্ঠুর খেলা!

সহসা কবি কহিল, "নাও—লেখ। বড় করে মাঝামাঝি লেখ—'প্রথম পরিচ্ছেদ'—হল, প্রথম পরিচ্ছেদ?"

সার্লটি কহিল, "প্রথম পরিচ্ছেদ।" তাহার স্বর গম্ভীর, কণ্ঠ আর্দ্র। কবি বিরক্ত-চিত্তে সার্লটির দিকে একবার চাহিল, পরে কহিল, "নাও এবার আরম্ভ কর—'পিরেণির সুদূর উপত্যকা-সহস্র কাহিনীর গৌরবমণ্ডিত পিরেণির প্রশস্ত উপত্যকা-ভূমিতে—পিরাণির সেই সাধের উপত্যকা-ভূমিতে"—এরূপ পৌনঃপুনিক উক্তি আর্জেন্তর রচনার বিশেষত্ব! ইহাতে রচনাটুকু একেবারে পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করে—একটা বিরাট সূচনার আভাষ দেয়, ইহাই কবির ধারণা!

কবি কহিল, "লিখলে, পিরেণির সেই সাধের উপত্যকাভূমিতে—?"

"হাঁ—হয়েছে,"—বলিয়া সার্লটি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কবি কহিল, "ও কি? কাঁদছ! নাঃ, জ্বালালে তুমি! যেদিন আমার একটু লেখবার আগ্রহ হবে, সেই দিনই তুমি একটা না একটা গোল বাধাবে! এ সব মুহূর্ত্ত চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নাও, হল কি আবার? ও—সিডনাস্ জাহাজের খপর পাও নি, তাই! একটা বাজে গুজব শুধু—কোথায় কি—তার ঠিক নেই। খপরের কাগজওলাদেরও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—একটা উড়ো খপর নিয়েই পাতার পর পাতা ভরিয়ে দিচ্ছে! এ রকম ত হয়েই থাকে! জাহাজ টাহাজের খপর অমন মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না—এ ত নিত্যকার ঘটনা! তা ছাড়া ডাক্তার হার্জ নিজে

খপর আনবার জন্য। আগে তিনি ফিরুন—তারপর তাঁর মুখে যদি শোনো, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন না হয় যত পারো কেঁদো—নাও, এখন লেখো—কতটা হল—আবার খেই হারিয়ে গেল আমার,—পড় দেখি, যতটা লিখলে!”

চোখের জল মুছিয়া সার্লটি পড়িল,—“প্রথম পরিচ্ছেদ।”

কবি কহিল, “থাক্, ওটা আর পড়তে হবে না। তার পর থেকে যতটা লিখলে, পড়।” সার্লটি পড়িল, “পিরেণির সুদূর উপত্যকাভূমিতে—সহস্র কাহিনীর গৌরব-মণ্ডিত পিরেণির প্রশস্ত উপত্যকাভূমিতে—পিরেণির সেই সাধের উপত্যকা- ভূমিতে”—

কবি কহিল, “পড়ে যাও—থামলে কেন?”

সার্লটি কহিল,—“আর ত নেই—এইটুকুই লেখা হয়েছে!”

“এইটুকু!” কবি বিস্মিতভাবে কহিল, এইটুকু শুধু লিখেছ! এতখানি বলে গেলুম!”

কবির মনে হইল, এ কি ছলনা! অন্তরে এতখানি ভাব জমিয়া গিয়াছিল—শুধু এইটুকু তাহার বাহির হইয়াছে! এতক্ষণে দুই ছত্র মাত্র!

কবির বিরক্তি ধরিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, “শুধু তোমার দোষে! নিজেকে ভাবতে হচ্ছে না, কিছু না—শুধু লিখে যাবে—তাও পার না,—এ রকম হলে ত পারা যায় না!”

সার্লটি কহিল “যেটুকু শুনেছি—সেই-টুকুই লিখেছি—এমন ত নয় যে ভুলে গেছি—”

কবি কহিল “আবার তর্ক করছ! লজ্জা হচ্ছে না! ভাবের বোঝা একেবারে আমার মাথাটা তোলপাড় করে দিলে—আর কিছু বলিনি! জানো, কল্পনার পিছনে আবার কতখানি মাথাখোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে! উঃ, তার উপর মাথাটা আজ বেজায় ধরে আছে! কাজ, কাজ কাজ—নাঃ, আর পারা যাবে না, দেখছি। নানান ঝঞ্ঝাটে আমায় অস্থির করে তুললে!”

কবি উঠিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তার হারজ্ ও লাবাসাঁদর্ আসিয়া সকল দায় হইতে মুক্তিদান করিল।

সার্লটি ব্যগ্রভাবে কহিল, “কি খপর, ডাক্তার হার্জ্?”

কবি আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, “আঃ, লোককে একটু জিরুতে দাও! তোমরা ভারী স্বার্থপর। কেবল আপনাদের সুখটাই বোঝ!”

ডাক্তার হারজ্ কহিল, “নূতন খপর কিছু নেই! সেই এক কথা!”

“ওরা বলে কি?”

“বলবে আর কি?” লাবাসাঁদর্ কহিল, “সিডনাস জাহাজ ডুবে গেছে,—ভার্ডর কাছে আর একখানা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে—সমুদ্রের উপর ধাক্কা—সিডনাস ডুবে গেছে, তার লোকজনের কোন খপরই পাওয়া যাচ্ছে না -”

“পাওয়া যাচ্ছে না!” সার্লটি বাণবিদ্ধা হরিণীর মত কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। সেই জাহাজে তাহার জ্যাক, তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। সে তবে কোথায় গেল? হা ভগবান, কাহার পাপে আজ এ সর্ব্বনাশ ঘটিল

জ্যাক, জ্যাক, বাছা আমার, কোথায় তুই? সার্লটির নয়নে বাণ ডাকিল।

কবি কহিল, "অনেকক্ষণ ঘরে বসে পরিশ্রম করা গেছে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক!"

লাবাসাঁদর্ কহিল, "যাবে, কিন্তু ভয়ানক মেঘ করেছে—ঝড়বৃষ্টি যা হোক্ একটা খুব দাপটে নামল, বলে!"

হারজ কহিল, "কেঁদে আর কি হবে, বলুন? সবই ভবিতব্য!"

কবি লাবাসাঁদর্ ও হারজ কক্ষত্যাগ করিয়া বাহিরে গেল। সার্লটি প্রাণ খুলিয়া শোকের পশরা নামাইয়া দিল। তাহার জ্যাক, শত দুঃখে শত কষ্টে যে জ্যাকের মুখ চাহিয়া সে সকল সহ্য করিয়াছে, আজ তাহার কি হইল, এ? মা হইয়া শুধু, সন্তানের মঙ্গল চাহিয়া তাহাকে সে হীনকার্য্যে দেশান্তরে পাঠাইতে এতটুকু দ্বিধা করে নাই, আজ সেই সন্তান সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ দিল! না, না, ইহা কি সম্ভব! জ্যাক নাই—ইহা হইতেই পারে না। তাহার জ্যাক, প্রাণের জ্যাক! ওরে বাছা আমার, অনাদৃত, অবহেলিত, উপেক্ষিত দুঃখী পুত্র আমার কোথায় তুই! আয় জ্যাক, ফিরিয়া আয়, মায়ের বুকে ফিরিয়া আয়। আর তোকে দূরে পাঠাইব না, আর তোকে নয়নের আড় করিব না, তুই ফিরিয়া আয়! আয়, জ্যাক, ফিরিয়া আয়!

সহসা চারিধার কাঁপাইয়া প্রবল-বেগে ঝড় বহিল! ঘর-দ্বার নড়িয়া উঠিল! হা হা হো হো শব্দে মুক্ত বাতায়ন-পথে [illegible]

রাত্রির আঁধার নিবিড়তর হইয়া আসিল! মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। ঝিম ঝিম ঝিম! সমস্ত চরাচর যেন একটা গাঢ় বিপুল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সার্লটি তখনও শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল! আয় জ্যাক, নয়নের মণি আমার, হৃদয়ের আনন্দ আমার, আশা আমার, ভরসা আমার, সর্ব্বস্ব আমার, ফিরিয়া আয়!

কে ডাকিল, "মা!"

কে ও? জ্যাক, বাবা, ফিরিয়া আসিলি? কিন্তু না, কোথায় কে? মনের ভ্রম, শুধু! স্বপ্ন!

আবার কে ডাকিল, "মা!" ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট স্বর!

সার্লটি ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, কক্ষের বাহিরে আসিল—সম্মুখেই সোপান নামিয়া গিয়াছে। পার্শ্বের দেওয়াল দেখা যায় না, এমন অন্ধকার! সার্লটি আসিয়া আলো জ্বালিল; লণ্ঠন হাতে লইয়া আবার বাহিরে আসিল। সিঁড়ির রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া আলোর সাহায্যে সে দেখিল, একটা ছায়ামূর্ত্তি দেওয়ালে পিঠ দিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। সার্লটির বুক কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, "জ্যাক—"

"মা—"! ঐ ত জ্যাক! তবে ভ্রম নয়, স্বপ্ন নয়! এ যে সত্যই জ্যাক, আলো রাখিয়া সার্লটি ছুটিয়া গেল! জ্যাককে বুকে চাপিয়া ধরিল—জ্যাকের অবসন্ন দেহ তখন সিঁড়ির কোণে দেওয়ালের গায় লুটাইয়া পড়িতেছিল!

কথা নাই, আদর নাই—কিছু না! জ্যাকের মাথায় মুখ রাখিয়া সার্লটি কাঁদিতে লাগিল। আঃ—এ তপ্ত স্পর্শ আবার ফিরিয়া

রাত্রে ফিরিবার সময় আর্জেন্তঁর আশঙ্কা হইতেছিল, গৃহে ফিরিয়া আবার সেই কান্না-কাটির হাঙ্গামার মধ্যে তাহাকে বিপন্নভাবে পড়িতে হইবে, কিন্তু ফিরিয়া সে দেখিল, সার্লটি স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সার্লটি ধীর ভাবে কহিল, "চুপ, গোল করো না—ঘুমুচ্ছে একটু ও—"

"ও! কে?"

"জ্যাক। আমার জ্যাক। ফিরেছে সে! আজ আমার কি সুখ হয়েছে যে তা কি বলব? জাহাজ ডুবি হয়ে ওর খুব চোট লেগেছিল। অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছে। রিও জিনিরো থেকে আসছে। সেখানে তুমাস হাঁসপাতালে ছিল। এমন হয়ে গেছে যে, জ্যাককে চেনা যায় না, মোটে।"

আর্জেন্তঁ মৃদু হাসিল। কহিল, "যাক, বাঁচা গেল! জ্যাক ফিরেছে—আঃ!"

সত্যই আর্জেন্তেঁর উল্লাস হইয়াছিল! যে বেচারার অর্থে সে মাসিক পত্রের সম্পাদক রূপে আজ খাড়া হইতে পারিয়াছে, বহু লেখকের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে—তাহার অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া বহু লেখক তাহার দ্বারে ফিরিতেছে—তাহার প্রতি স্নেহ না হউক, এতটুকু কৃতজ্ঞতাও কি তাহার অন্তরে স্থান পাইবে না! আর্জেন্তঁ মানুষ ত!

আবেগোচ্ছ্বাসের আতিশয্যযুক্ত প্রথম কয়েকটি দিন কাটিয়া যাইলেও জ্যাকের প্রতি আর্জেন্তঁর ব্যবহার এবার তেমন কঠিন পরুষ হইল না। তাহাদিগের প্রাত্যাহিক সাহিত্যিক মজলিসে জ্যাকের জন্যও এক কোণে একটি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নব অভ্যাগত কেহ আসিলে সার্লটি সাগ্রহে পুত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিত, "এই জ্যাক-এটি আমার ছেলে, বেচারা বড় ভুগেছে। ওকে যে ফিরে পাব, তা মনে ছিল না।" সকলেই জ্যাকের দিকে একটু করুণার চোখে ফিরিয়া চাহিত!

জ্যাক কোণের আসনে বসিয়া দেখিত, মজলিসে সব কয়টিই আসিয়া জমিয়াছে, জিমনেসের সেই পুরাতন দলটি! এই সকল ভক্ত উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত না থাকিলে আর্জেন্তঁর চলে না। সে বলে, "এক সঙ্গে মিশে আমরা একটি দল করি এস—।" দলের প্রধান কার্য্য,—যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক তাহাদিগকে আমোল দিতে চাহে না, ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাদিগের ব্যক্তিগত কুৎসারটনা, যে সকল মাসিক পত্রের সম্পাদক তাহাদিগের রচনা আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের নীচ ঈর্ষা প্রবৃত্তিকে অভিশাপ প্রদান ও সেই সকল মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিকট সমালোচনা! সে কুৎসা-রটনা, সে সমালোচনার ভঙ্গী বা কেমন বিজ্ঞোচিত! আর্জেন্তঁ কোম্পানি প্রকৃতই বুঝিতে পারিত না, তাহাদিগের রচনা কেন এই সকল সম্পাদক ছাপিতে চাহে না—নিজেরা পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া যায়—অথচ তাহাদিগের এতটা বিরূপ হওয়ার কারণ কি! কেহ বলিত, 'আমাদের আমোল দিলে—আমাদের লেখার তেজে ওঁরা এবং ওঁদের রচনা একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে!' কেহ বা বলিত, 'শুধু তাই নয়—ওদের একটি দল আছে—সেই দলে বাহিরের লোক ভিড়াতে সাহসে কুলায় না!" জ্যাক এক পার্শ্বে বসিয়া এই সকল অলস জল্পনা কখনও শুনিত। কখনও বা সে আগাগোড়া আপনার জীবন-কাহিনী স্মরণ

করিয়া শিহরিয়া উঠিত! এমনভাবে তাহার জীবনটা নষ্ট হইয়া গেল! কেন, কাহার দোষে? ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রার ঘোরে সে ঢুলিয়া পড়িত। ভোজনকাল আসিলে সার্লট সস্নেহে তাহার গায় হাত দিয়া ডাকিত, "জ্যাক, জ্যাক"। জ্যাকের চমক ভাঙ্গিত। বন্ধুগণ চাহিয়া দেখিত—আর্জেন্ত দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রোষ চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিত, "একটা আস্ত জানোয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে!"

কিন্তু না—জ্যাক জানোয়ার নহে! বহু দিন পরে মাতার স্নেহ ও নির্ম্মল বায়ুর আস্বাদ পাইয়া তাহার প্রাণের রুদ্ধ কবাট আবার ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া আসিতেছিল, বায়ুতে ধীরে ধীরে তাহার লুপ্ত চেতনা আবার ফিরিয়া আসিতেছিল। আর কেহ কথা কহিলে তাহার চিত্ত সেদিকে আকৃষ্ট হইত না। শুধু মায়ের কথাগুলি তাহার দগ্ধ হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধার কার্য্য করিত। মার সহিত দুইদণ্ড নিরালায় কথা কহিতে পাইলে সে যেন বর্ত্তাইয়া যাইত। অধীর পিপাসিত ব্যক্তি যেমন আকুল আগ্রহে শীতল বারি পান করে, তেমনই ভাবে মার প্রতি কথাটি নিবিষ্ট চিত্তে সে যেন পান করিত! এ কোন্ নন্দনের সঙ্গীত, স্বর্গের স্মৃতি!

একদিন সে মাকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, ছেলেবেলায় কি কখনো আমি জাহাজে চড়েছিলুম?"

সহসা এ প্রশ্নে সার্লটের প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন, জ্যাক?"

"প্রথম যেদিন মা সিসনাস জাহাজে আমি পা দিলুম—সে আজ তিন বৎসরের কথা, আমার কেমন যেন কি মনে হল! মনে হল, এ সব যেন আমার কাছে নূতন নয়—কবে যেন কোথায় আমি জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ভেসেছিলুম! হাঁ, মা, সেটা কি স্বপ্ন তবে?"

"না, জ্যাক, স্বপ্ন নয়, সত্য। তোমার বয়স তখন তিন বৎসর—আমরা আলজিরিয়া থেকে আসছিলুম। তিনি মারা গেলে আমরা তুর্কে ফিরছিলুম।"

"তিনি, কে, মা? বাবা?"

"হাঁ, জ্যাক।"

"বাবার নাম কি ছিল, মা?"

এ কি কৌতূহল! সার্লট মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল। পরে আপনাকে সম্বরণ করিয়া সে বলিল, "সে কথা এতদিন তোমায় বলিনি, জ্যাক! পাপিনী আমি, ছেলের কাণে এ বিষ ঢালবো-তাই কখনও বলিনি! কিন্তু তোমায় না বলা আমার অন্যায়। তিনি ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। তিনি পিমবকদের আত্মীয়। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে অকূলে ভেসেছিলুম! সিঙ্গাপুরের রাজার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল, তাঁর সঙ্গেই আলজিরিয়া বেড়াতে এসেছিলাম আমরা। সেখানেই মারা যান—"

"তাঁর নাম কি ছিল?"

"মার্কুইস লাপান—"

জ্যাক তবে সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র! বিপথগামিনী মাতার পাপে—না মা,—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার বিচার করিবার অধিকার জ্যাকের নাই! কিন্তু জ্যাক এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র হইয়া জাহাজে সামান্য খালাসির কাজ করিয়াছে! হা অদৃষ্ট!

এমন সময় আর্জেন্ত আসিয়া কহিল,

"সাল´টি, একটা কথা আমি ভাবছিলুম। জ্যাক এখন ত ভালো হয়েছে—একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখা উচিত, ওর! এ বয়সে কুঁড়ের মত বসে থাকাটা ঠিক নয়—ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে যাবে, তা হলে। তা ষ্টীমারে কাজ করতে বলছি না, আমি! রেল এঞ্জিনের কাজে বিপদের আশঙ্কা তেমন নেই, তাই লাবাস াঁদর বলছিল—"

জ্যাক কোন কথা বলিল না। সাল´টি পুত্রের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "কিন্তু তুমি দেখছ ত, জ্যাক এখনও কি রকম দুর্ব্বল! চার তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হাঁপিয়ে অবশ হয়ে পড়ে, রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না! আর দেখেছ, কেমন খুকখুকে কাশী হয়েছে, তাত কৈ কিছুতে সারছে না। তা তুমি এই কাগজে একটা কাজ দিতে পারবে না? তাহলে বড় ভাল হয়।"

"বেশ, মরোভাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি, তাহলে।" পরামর্শান্তে স্থির হইল, জ্যাকের দ্বারা কাগজের আর কোন উপকার না হউক, কাগজ মোড়া ও ভাঁজা, ছাপাখানায় ও দপ্তরীর নিকট তাগাদা করা, প্রুফ বহা প্রভৃতি কাজগুলা চলিতে পারে। কাগজের আয় ত কিছুই নাই, ব্যয় প্রচুর, একটি মাত্র গ্রাহকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইয়াছে, সে গ্রাহকটি আর কেহই নহে সাল´টির পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু, যাঁহার দত্ত অর্থে কাগজের প্রতিষ্ঠা! এ ক্ষেত্রে কাগজের বৈতনিক বেহারাকে বিদায় দিয়া তাহার স্থলে জ্যাককে নিযুক্ত করিলে একটু তবু ব্যয়-সংক্ষেপ হয়!

তাহাই ঘটিল। জ্যাক কাগজের স্বত্বাধিকারী সে নিজে জানিত না, যে সে স্বত্বাধিকারী, সাল´টি জানিলেও আর্জেন্তঁর নিকট সে কথা তুলিবে এমন সাধ্য তাহার ছিল না।

সপ্তাহান্তে আর্জেন্তঁ বিরক্ত ভাবে কহিল, "নেহাৎ অপদার্থ! এ কাজ ওর দ্বারা হবে না!"

সাল´টি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "ক্রমে ক্রমে শিখতে পারবে না কি!" অবজ্ঞার সহিত আর্জেন্তঁ কহিল, "আর কবে পারবে? ভারীত কাজ! আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে ও মোটেই খাপ খাবে না। দেখছ না, ওর ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার ছোটলোকের মত কারখানার মিস্ত্রী-মজুরের ধরণের! তা ছাড়া ওর স্বভাব অবধি খারাপ হয়ে গেছে। ও মদ খায় দেখনি, ওর মুখে বিশ্রী মদের গন্ধ!"

সাল´টি কাঁদিয়া ফেলিল। সেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু কাহার দোষে আজ জ্যাক ইতর হইয়াছে, মদ ধরিয়াছে, তাহারাই কি ঠেলিয়া জ্যাককে অধঃপতনের বিরাট গহ্বরে নিক্ষেপ করে নাই? জ্যাকের দোষ কি!

আর্জেন্তঁ কহিল, "শোন, সাল´টি, এও আমি বুঝছি, আপাততঃ ওর যেমন স্বাস্থ্য তাতে কাজকর্ম্ম ওর পোষাবে না, এখন! আরও কিছুদিন বিশ্রাম করুক। তা সহরের এই ভিড়ে না থেকে ও কেন এতিয়োঁতে যাক্ না। আমাদের সে বাড়ীর কবুলতির মেয়াদও ত এখন দশ বছর বাকী আছে—সেখানে থেকে বাড়ীটা ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করুক, জ্যাক্! মাসে মাসে ওর খরচের টাকা এখান থেকে পাঠাব 'খন! সেখানে পল্লীগ্রামে ভালো হাওয়ায় নির্জ্জনে কিছুকাল থাকলে শরীরে বলও পাবে,

বেঁধে ভাড়া গুঁজি, কেন? তার জন্য একটা ভাড়াটে ঠিক করে ড্যাক্ আবার এখানে ফিরে আসবে! কি বল?”

সার্লটি সন্তুষ্ট চিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পরে এক দিন, শরতের এক শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতে, জ্যাক এতিঁয়োতে আসিল। শরতে সারা প্রকৃতি সেদিন ঝলমল করিতেছিল। চারিধারে সবুজ প্রাচুর্য্যের ঘন শোভা। স্থলে জলে জীবনের মৃদু কম্পন—কোন কোলাহল নাই,—নিস্তব্ধ প্রশান্ত গ্রাম! সবুজ পাতার রাশিতে গাছ ভরিয়া রহিয়াছে, ক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে—যেন কে একখানি বিস্তীর্ণ হরিদ্রাবর্ণের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। গাছের আড়হইতে পাখী গান গাহিয়া সারা আকাশ বাতাস মিষ্ট স্বরের প্লাবনে ভবাইয়া দিয়াছে! ফলে ফুলে, নদীর জলে, পাখীর গানে যেন পল্লীজননীর সুমধুর স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। জননী যেন দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাপদগ্ধ জ্যাককে সমাদরে আহ্বান করিতেছেন, আয়, বাছা, আয়, আমার কোলে আয়! এখানে কোন কোলাহল নাই, কোন জ্বালা নাই, আমার শীতল স্নেহের স্পর্শে আয়, তোর সকল দুঃখ নিবারণ করি—সকল দাহ ভুলাইয়া দিই! আয় জ্যাক, আমার কোলে আয়!

জ্যাক যখন পরিত্যক্ত কুটীর সম্মুখে আসিল, তখন কুটীর-গাত্রসংলগ্ন লতায় পাতায় রৌদ্রকিরণ ঝরিয়া পড়িয়াছে! সেই আলোক স্পর্শে কুটীরগাত্রখোদিত ফলকটি পাতার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন স্বর্ণবর্ণে কে লিখিয়া রাখিয়াছে, “আরাম-কুঞ্জ।” চারিধারে এই অমল শোভার মধ্যে দাঁড়াইয়া ফলকের অক্ষরগুলা জ্যাক একবার পড়িল “আরাম কুঞ্জ”। সত্যই আরাম-কুঞ্জ! এখানে জ্যাক সকল দুঃখ ভুলিবে, যথার্থই আরাম লাভ করিবে! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাগরের গান

(একটি ইংরাজী কবিতা অবলম্বনে)

জোয়ার ভাঁটায় ন্যাটাই নাটায়,
　　নাটায়ের নাট ভুবন জুড়ি’;
জোয়ার ভাঁটার নাট্যে মাতিয়া
　　দিকে দিগন্তে বাজাই তুড়ি!
তাল বনে তাল রোদে লাল হ’তে
　　দেখেছি,—এ নহে কথার কথা,
শুনেছি বিরলে তুফানের তলে
　　গলা-বরফের প্রগল্‌ভতা!
গুম্বজ আর খিলানের ছায়
　　ডিগবাজী সেথা ...

আমি সেথা ফিরি লাস্য-লীলায়
　　দিকে দিগন্তে অঙ্গ মেলে।
ঘর্ঘর-রবে ঘুরি গো কোথাও,—
　　হল্‌হলা তুলি বেগের বশে;
ভিতরে ভিতরে বরফ-পাথরে
　　সিন্ধুঘোটক দন্ত ঘষে।
ঘূর্ণী বাতাস তরণী ডুবালে
　　রচি দুখ-মনে শোকের গাথা,
কল-গানে ঘুম পাড়াই মরুতে

আমি মানুষের ব্যথার ব্যথী গো,
আমি কোনো দোষে নইকো দোষী,
বালিয়াড়ি জুড়ে খেলে বালকেরা
বালি নিয়ে;—আমি দেখেই খুসী।

ভালবাসি আমি মাতাল মাঝিরে,—
ভালবাসি তার গানের মধু;
জাহাজ ডুবার ঝড় দুরন্ত,
আমি কোলে পেলে দোলাই শুধু।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভিনাস্ চিত্র

প্রথম অঙ্ক

[দৃশ্য—শিল্পীর দোকান]

জর্জ্জ ও জর্জ্জের বালবন্ধু জন।

"সংসারে আমার মত দুর্ভাগ্য কেউ নাই, জন।"

"তুমি আস্ত পাগল!"

"মেরির পিতা আমার সঙ্গে মেরির বিবাহ দেবেন না কারণ আমি একজন সামান্য শিল্পী আমার অর্থ নাই। আমার আর কেউ নাই। আছে শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের ফল এই নারীমূর্ত্তিটী। কিন্তু কই, এই শীতল মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে তো এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখি না!—এত সুন্দর কিন্তু কি নির্দ্দয়!"

"আবার তুমি এই রকম বকতে আরম্ভ করলে!"

"ও, জন।"

"শোন জর্জ্জ, স্থির হয়ে শোন। তুমিই বল্‌ছিলে, মেরির পিতা ছ'মাস তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ছ'মাস ত তোমার হাতে আছে। এর মধ্যে কেন তুমি টাকা উপার্জ্জন করে নাওনা।"

"ঠাট্টা করোনা জন। ছ'মাস ত দূরের কথা, ছ' শতাব্দী ধরেও যদি চেষ্টা করি তবু তাঁর আকাঙ্ক্ষিত অর্থ উপার্জ্জন করা আমার সাধ্যে কুলাবে না। সহায়হীন, যশহীন, অর্থহীন এ সংসারে আমার মত আর কে আছে, জন।"

"মূর্খ, ভীরু, কাপুরুষ, তুমি জর্জ্জ। ছ' ছ' মাস সময় পড়ে আছে—এর মধ্যে টাকা সংগ্রহ করতে পারবে না! এ সময় কি যথেষ্ট নয়।"

"কি তুমি বলছ, জন।"

"আমি বল্‌ছি—ছ'মাস প্রচুর সময়। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক—আমি তোমায় টাকা পাইয়ে দেব।"

"এ কি বোল্‌ছ; কি এমন উপায় আছে, যে এত অসংখ্য অর্থ তুমি আমায় পাইয়ে দেবে?"

"বিশ্বাস কর আমায়। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তোমার রাখ্‌তে হবে।—এর ভার আমার উপর দিয়ে উচ্চবাচ্য না কোরে তোমার ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হবে। আমার ইচ্ছা মত আমি কাজ কর্ব্ব—তাতে তুমি এতটুকু প্রতিবাদ কর্ত্তে পাবে না—আমার দোষ দেখ্‌লেও না—কেমন? শপথ করতে পার?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যা' হোক আমি তোমার কথা মত শপথ কল্লুম।"

জন একটা হাতুড়ি লইয়া জর্জ্জের সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, মর্ম্মর মূর্ত্তিটীর নাকটা 'থুতড়িয়া' দিল। হাতের দুইটী অঙ্গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এক আঘাতে কিয়দংশ খসিয়া পড়িল; আর এক আঘাতে বামপদ খানা হাঁটুর নীচ হইতে একেবারে বিমুক্ত হইল। মূর্ত্তিটার ধ্বংসের কিছুমাত্র বাকী রহিল না।

জন টুপী লইয়া চলিয়া গেল।

অঙ্গীকারাবদ্ধ জর্জ্জ নিস্পন্দভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে এই ধ্বংস দেখিতেছিল।—তা'পর মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল।

জন শীঘ্রই একটা গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিল। এবং সেই ভগ্নপ্রাণ শিল্পী ও ভগ্ন দেহ মূর্ত্তিটীকে গাড়ীতে উঠাইয়া—নিশ্চিন্ত মনে শিস্ দিতে দিতে চলিল। জর্জ্জকে তাহার বাসায় রাখিয়া—মূর্ত্তিটী লইয়া সে কোথায় গেল কেহ জানিল না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—জর্জ্জের দোকানে জর্জ্জ একাকী]

"আজ দুটা বাজলে, সেই ছ'মাস পূর্ণ হবে। এই আমার শোচনীয় পরিণাম! যে কল্পনা বলে সুখের অট্টালিকা-স্থাপন করেছিলাম—আজ কয়েক ঘণ্টার ভিতর তা চিরদিনের জন্য চূর্ণ হবে। হায়! মৃত্যু কেন আমার সকল জ্বালা হরণ করে না। গত রাত্রি হতে আহার নেই নিদ্রা নেই। আর আহার নিদ্রা; হাতে একটী পয়সা নেই, আজ আমার জুতো ওয়ালাও আমাকে এতটুকু খাতির করে না। আমার দর্জ্জী আজ একটী পোষাকও ধারে দিতে চায় না, বাড়ী ওয়ালা প্রতিদিন চোখ্- আর জন্, সেতো একেবারে নিরুদ্দেশ। সে দিনের সে কাণ্ডের পর আর তাকে দেখ্‌তে পাই না। মেরি, পথে দেখা হলে, মৃদু মৃদু হাসে; চোখ দুটী তার করুণ সহানুভূতি জানায়। কিন্তু তার পিতার শাসন তাকে তেমনি দূরে রেখেছে। আঃ কে আবার বিরক্ত করতে এল। কি আপদ! কে!

"হুজুরের সৌভাগ্যের কথাই চারদিকে! পরমেশ্বর আপনার সৌভাগ্য শতগুণ বর্দ্ধিত করুন। প্রভুর জন্য এই নতুন জুতো জোড়া নিয়ে এলাম। মূল্যের জন্য ভাববেন না। কোন তাড়া নেই। যখন হয় দেবেন। যদি আপনি ভৃত্যকে পূর্ব্ব মত অনুগ্রহ করেন, যা যখন দরকার হয় তার জন্য আমাকেই আদেশ করেন—তবে কৃতার্থ হই। নমস্কার। আসি হুজুর।"

"নিজেই জুতো নিয়ে হাজির। মূল্যও চাচ্ছে না এখন! আমি খরিদ্দার থাকি—এই তার আন্তরিক ইচ্ছা! মাথা নুইয়ে চলে গেল, যেন কোন ধনকুবেরের কাছে এসেছিল! কি এ সব! সমস্তই যেন—কে!"

"মহাত্মন্, অসময়ে এসে অন্যায় করেছি,—আপনার জন্য এই নূতন 'সুট' তৈরি করে—"

"কে!"

"এ সময় এসে আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে হল, ক্ষমা কর্ব্বেন। আপনার জন্য উপরে দুইটী সুন্দর গৃহ সাজিয়ে এলাম। এ অন্ধকার ঘরটা আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে—"

"কে!"

"আমাদের বেঙ্কে যে আপনার দেনা ছিল তা' কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পেয়েছি। আমি

"কে !"

"স্নেহাস্পদ, মেরি তোমারই। এখুনি সে এখানে এসে উপস্থিত হবে। আমার ইচ্ছা তাকে গ্রহণ কর, বিবাহ কর। তকে ভালো-বেসো, সুখে রেখো। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল—"

"কে !"

"জন, প্রিয়তম, আজ আমরা কত সুখী !"

"মেরি প্রাণাধিকে, তুমি—আঃ ! !"

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—রোমের রাজপথ]

কয়েকজন মার্কিন ভদ্রলোক।

একব্যক্তি সংবাদ পত্র লইয়া পাঠ করিতে-ছিলেন :—"আশ্চর্য্য আবিষ্কার—প্রায় ছয় মাস গত হইল জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক জন স্মিথ, নাম মাত্র মূল্যে Scipio Samityর সমাধি শয্যার সন্নিকটবর্ত্তী একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। তিনি পূর্ব্বে জর্জ্জ আর্লও নামক তাহার জনৈক দরিদ্র শিল্পী বন্ধুর কোনও ক্ষতি করিয়াছিলেন, তাঁহারই পূরণ কল্পে ঐ ভূমিটী তিনি জর্জ্জকে দান করেন। অধিকন্তু নিজ ব্যয়ে তাঁহার বন্ধুর জন্য এই ভূমিটীর কর্ষণ আরম্ভ করান। কিছু দিন হইল ঐ ভূমিতে একটি উচ্চস্থান খনন করিতে করিতে, তিনি তথায় একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার অত্যাশ্চর্য্য শিল্প কৌশল ও কারুকার্য্য প্রাচীন রোমীয় কলাবিদ্যার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। একটী অতি সুন্দর নারীমূর্ত্তি এবং যদিও কালের প্রভাবে উহার নানাস্থানে নানাপ্রকার ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে, যদিও তাহার নাকটা হাতটী ও বাঁপাটী একেবারেই নাই তবু ইহা রোমীর শিল্পের গৌরবময় নিদর্শন।

"গবর্ণমেন্ট এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে মূর্ত্তিটী হস্তগত করিয়াছেন, এবং ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও মূল্যনিরূপণ মানসে, একটী কমিশন বসিয়াছে। ইহাদের পরামর্শ এতদিন গোপনে চলিয়াছিল। গতকল্য জানা গিয়াছে তাঁহারা বলিয়াছেন ইহা ভিনাসের পরিকল্পনা। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনও অজ্ঞাতনামা অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাশালী শিল্পীর রচিত। পৃথিবীতে কলাবিদ্যার এরূপ নির্দ্দোষ ও সুন্দর নিদর্শন আর পাওয়া যায় নাই। ইহার মূল্য প্রায় দশকোটী স্বর্ণ মুদ্রা ! রোমীয় আইন মত এইরূপে প্রাপ্ত মূর্ত্তির অর্দ্ধেকের মালিক গবর্ণমেন্ট অপরার্দ্ধ ভূস্বামীর প্রাপ্য। সুতরাং ভূমির বর্ত্তমান মালিক—পাঁচকোটী স্বর্ণ মুদ্রায় গবর্ণমেন্টের নিকট এ স্থান বিক্রয় করিতে পারেন। অদ্য জর্জ্জ আর্লওকে সেই অতুলধন দান করা হইবে।" ইত্যাদি।

সকলেই শুনিয়া বলিলেন—"জোর কপাল বটে ! "জোর কপাল !"

চতুর্থ অঙ্ক

[দৃশ্য—ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তি]

সম্মুখে জর্জ্জ ও মেরী।

"মেরি, প্রিয়তমে, এই সেই জগদ্বিখ্যাত ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তি। সৌন্দর্য্যে, কারুকার্য্যে, শিল্প নৈপুণ্যে এমন মূর্ত্তি পৃথিবীতে আর দুইটি নাই। ইহার দেহের যে সকল অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল রোমের প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ তা জুড়ে

তাঁদের নাম জগতে ধন্য হয়ে গেল। এই সেই স্থান—দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এখানে এসেছি তখন আমার এরূপ অর্থ এরূপ প্রতিপত্তি ছিল না। যার জন্য আজ রোম জগদ্বিখ্যাত—এই সেই মূর্ত্তি। এরই জন্য তখন আমাকে দিনরাত প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে!"

"এই সেই ভিনাস্! কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! কত মূল্যবান!—"

"হাঁ, এখন এটা মূল্যবান কিন্তু পূর্ব্বে তা, ছিল না। এখন এর সৌন্দর্য্যে জগৎ স্তম্ভিত পূর্ব্বে তো কেউ এর এতটুকু প্রশংসা করে নি। এর সৌন্দর্য্য ও মূল্যের কারণ সেই জন। জন যদি এর নানা স্থান ভেঙ্গে না ফেলত তবে কে আজ এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'ত। জন আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী—তার উপকার এ জীবনে আমি ভুলতে পারব না! এ ছুটীতে তাকে আস্তে লিখেছি। এঃ ছেলেটার কাশি হয়েছে যে—মেরি, এ জীবনে কি তুমি এদের যত্ন করতে শিখবে না!"

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীসীয় প্রভাব

নাটকীয় পাত্রগণ।—পাত্রগণের সংখ্যা সম্বন্ধে, ভারতীয় নাট্যরীতির সহিত গ্রীসীয় নাট্যরীতির বিলক্ষণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। গ্রীসীয় নাটকের পাত্র-সংখ্যা খুবই কম। পক্ষান্তরে, "মৃচ্ছকটিকায়" ২৯জন, "শকুন্তলায়" ৩০জন, "বিক্রমোর্ব্বশীতে" ১৮জন, "মুদ্রারাক্ষসে" ২৪জন, ভবভূতির "মালতী মাধবে" ১৩জন ও তাঁহার "উত্তরচরিতে" ১১জন পাত্রের অবতারণা আছে।

অন্যান্য নাট্যসাহিত্যের ন্যায় ভারতীয় নাট্যসাহিত্যেও উদার-চরিত ও হীন-চরিত—এই উভয় প্রকারেরই পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাত্রগুলি ভারতীয় সকল নাটকেই পুনঃ পুনঃ আভির্ভূত হইয়া থাকে;—প্রায়ই একই ধরণের,—পার্থক্য অতি সামান্য। নাটকের সর্ব্বপ্রধান পাত্র যে নায়ক ও নায়িকা, উহারা এতটা ভারতীয় ধরণের যে তৎসম্বন্ধে অন্য নাট্যসাহিত্যের সহিত তুলনা চলিতে পারে না। নায়িকার পরে, নাট্যসাহিত্যে যাহার দ্বিতীয় স্থান সেই ধর্ম্মপত্নীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া উইণ্ডিস সাহেব যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতীব মিশ্রধরণের। একদিকে যেমন ধর্ম্মপত্নীর পদগৌরব, Plaute ও Terence-এর Matronaকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনি আবার নায়কের খামখেয়ালি চপল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তদীয় ধর্ম্মপত্নীর যে যুঝাযুঝি তাহাতে কতকটা Senex-এর সহিত সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই সকল উদ্ভট সাদৃশ্যের টুক্‌রাগুলা যতই জোড়া দেওয়া যাক্‌না কেন, উহার দ্বারা আসল মূর্ত্তিটি গড়িয়া উঠে না—আসল পাত্রটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে এই চরিত্রের মর্ম্ম-ভাবটি বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না:—নায়ক স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীকে বরাবর ভালবাসিয়া

আসিয়াছেন, পরে নায়িকার রূপে মুগ্ধ হইয়া নায়ক স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীকে উপেক্ষা করিলেন। এই যে নায়িকার প্রতি অনুরাগ, ইহা অনুরাগেরই একটি প্রকার-ভেদ মাত্র। এইরূপ চিত্রে বর্ণের সূক্ষ্মভেদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কতকগুলি নূতন রেখাপাতে নায়কের চিত্র সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে। নূতন অবস্থায় পড়িয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নায়কের কতকগুলি নূতন গুণও প্রকাশ পায়। তাহার পর, ঈর্ষার দৃশ্যগুলি গল্পটিকে বেশ জমাট্ করিয়া তুলে, এবং উহার দ্বারা নাটকের কার্য্যও বেশ সজীব হইয়া উঠে। বহুবিবাহ প্রথারূপ মূলউৎস হইতে ভারতীয় নাট্যসাহিত্য, বেশ নিপুণভাবে নায়কের বিভিন্ন অবস্থা সংগ্রহ করিয়াছে।

বিদূষকের চরিত্রকল্পনা করিবার জন্য Servus Currensএর অনুকরণ করাও ভারতের আবশ্যক হয় না। যদি পাশ্চাত্যখণ্ডে বিদূষকের প্রতিরূপ অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে য়ুরোপের প্রাচীন যুগ হইতে বাহির হইয়া, মধ্যযুগ পর্য্যন্ত নামিয়া আসা আবশ্যক। ভারতের বিদূষক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কদাকার, বিকলাঙ্গ, মূর্খ ও ঔদরিক, কিন্তু তাঁহার প্রতিপালকের একান্ত অনুগত; তাঁহার গুপ্তপ্রেমে সাহায্য করিতে সতত প্রস্তুত। এই ভারতীয় বিদূষকের অনুরূপ ইটালীয় কমেডির গুপ্তপ্রেমের ঘটকচূড়ামণি মঠ-সন্ন্যাসীগণ; যথা—Mandragore নাটকের Frere Timothee এবং ফ্রান্সের প্রাচীন উপহাস-কবিতায় ও প্রাচীন নাটকে বর্ণিত পেটুক পাদ্রি। ইহারই জুড়ি—বৌদ্ধপরিব্রাজিকা; ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও, ইহারও সেই একই ব্যবসায়; কখন বা প্রকাশ্যভাবে—যেমন মালতীমাধবে, কখন বা প্রচ্ছন্নভাবে—যেমন মালবিকাগ্নিমিত্রে,—তিনি এই ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। কিন্তু যেমন একদিকে পরিব্রাজিকা বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা, দূরদর্শিনী, নিপুণা; তেমনি অন্যদিকে বিদূষক, নির্ব্বোধ, অনিপুণ, বাচাল, এবং নিজের বুদ্ধির দোষে অন্যকে সর্ব্বদাই বিপদে ফেলিতে তৎপর। এই দুই বিভিন্ন পাত্রের কথিত ভাষাতেও বিভিন্নতা আছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও বিদূষক ব্রাহ্মণের পবিত্র ভাষা সংস্কৃত কখনই ব্যবহার করে না; প্রাকৃত ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহে।

বিদূষক ও পরিব্রাজিকা—এই দুই চরিত্রই বাস্তব-জীবন হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখনও দেবমন্দিরাদির আশেপাশে এইরূপ চরিত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের অবগুণ্ঠন পরিয়া উহারা দুর্নীতির কাজে প্রবৃত্ত হয়। একটা শাস্ত্রীয় বচনের অন্তরালে থাকিয়া উহারা শান্তভাবে নায়কনায়িকার জন্য একটা সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; এবং মন্দির-সংলগ্ন উদ্যানভূমিতেই নায়ক-নায়িকারা তাহাদের উপযোগী মিলনাশ্রম প্রাপ্ত হয়।

অবশ্য, নিয়ম-ব্যভিচারী নাটকগুলা, রমণীর দুর্ব্বলতার আশ্রয়স্বরূপ চরিত্রদূষণকারী বিদূষককে (বি-দূষ) ঘন-ঘন নাট্যমঞ্চে আনিয়াছে; এই বিদূষক বেদ-ব্যাখ্যায় যত না নিপুণ তদপেক্ষা প্রেমের ঘট্‌কালীতে সমধিক দক্ষ। পক্ষান্তরে সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তর্ভূত বিশুদ্ধ নাটক, ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয়াধীনে, কিছুকাল পরে সংশোধিত

আকারে আর এক ছাঁচের বিদূষকের সৃষ্টি করিয়াছে। বিদূষককে একেবারে রহিত করা অসম্ভব। তাই নাটককারেরা উহাকে একটু উন্নত করিয়া তুলিল। উহাকে নায়কের বয়স্য ও নর্ম্মসখা বলিয়া বর্ণনা করিল। চিরপ্রচলিত বিদূষকের দোষগুলি অভিনব বিদূষকের ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠায় ঢাকিয়া গেল। নাগানন্দের আখ্যানবস্তু বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায়, উহাতে যে বিদূষকের অবতারণা আছে, সে বিদূষক ততটা সাহিত্যিক ছাঁচের নহে, ততটা ব্রাহ্মণভাবাপন্ন নহে, প্রত্যুত একটু আদিম ধরণের। নাগানন্দের তৃতীয় অঙ্কটি একটা দীর্ঘ প্রহসন বলিলেও হয়—বিদূষকই তাহার নায়ক। মধুকরের দংশন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বিদূষক আপাদমস্তক উত্তরীয়-বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে শেখরক নামক বিট্ কোন এক উৎসবের ভোজনশালা হইতে সুরাপান করিয়া প্রায় মত্তাবস্থায় বাহির হইল। অবগুণ্ঠিত আত্রেয়কে দেখিয়া শেখরক তাহার প্রণয়িনী বলিয়া মনে করিল। বিট্ তাহার গায়ের উপর গিয়া পড়িল, তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, তাহাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল। শেখরকের প্রণয়িনী দাসী নবমালিকা ইতিমধ্যে উদ্যানে নামিয়া আসিয়াছে। শেখরক তাহার প্রণয়িনীকে চিনিতে পারিল। বিদূষক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছে,—এই কথা বলিয়া শেখরক তাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিল, ইহার জন্য শীঘ্রই উচিত শাস্তি পাইবে বলিয়া তাহাকে শাসাইল এবং তাহাকে ধরিয়া তাহার দাসের জিম্মা করিয়া দিল। দাস তাহাকে ভাল করিয়া আট্‌কাইবার জন্য তাহার পৈতা ধরিয়া রহিল, কিন্তু পৈতাটা ছিঁড়িয়া গেল। তখন সে ব্রাহ্মণের উত্তরীয় দিয়া ব্রাহ্মণের গলা জড়াইয়া তাহাকে টানিতে লাগিল। বিদূষক নবমালিকার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। নবমালিকাঃ—"যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পায়ে মাথা নোয়াও, তাহলে ছাড়িয়ে দি।"—বিদূষক ঃ—(সরোষে কাঁপিতে কাঁপিতে) "কি আশ্চর্য্য, গন্ধর্ব্বরাজের মিত্র আমি ব্রাহ্মণ—আমি কিনা দাসী বেটীর পায়ে পড়ব ?" তাহার পর শেখরক বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ নবমালিকার আস্বাদিত সুরার চষক হইতে সুরাপান করিবার জন্য চষকটা বিদূষককে অর্পণ করিল। বিদূষক ঃ—(অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) "দেখ শেখরক, আমি ব্রাহ্মণ।" বিট ঃ—"যদি তুমি ব্রাহ্মণ হও,—তোমার পৈতা কোথায় ?" বিদূষক ঃ—"তোমার দাস আমার পৈতাটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে।" দাসী ঃ—(উচ্চ হাসিয়া) "তাই যেন হল, দু-চারটে বেদ-মন্ত্র পড় দেখি।" বিদূষক ঃ—"এই সুরাগন্ধে বেদ-মন্ত্র কি তিষ্ঠিতে পারে ?" অবশেষে বিদূষক পলাইয়া গিয়া তাহার প্রভু জিমূতবাহনের সহিত মিলিত হইল। জিমূতবাহন তাঁহার নবপত্নী মলয়াবতীর রূপ বর্ণনা করিয়া গান গাহিতেছিলেন। তখন দাসী বিদূষককে এইরূপ বলিলেন ঃ—"উনি দিদিঠাকরুণের বর্ণনা কেমন করলেন শুন্‌লে তো ? —এখন একবার আমি তোমার বর্ণিনেটা করি।" বিদূষক ঃ—"ওগো! তোমার কথা শুনে আমি বাঁচ্‌লেম। তা, আমার

প্রতি তুমি একটু অনুগ্রহ কর দিকি। এই বিট্ ছোঁড়াটা আবার না আমাকে বল্‌তে পারে—"তুমি হেন, তুমি তেন, তুমি কপিল মর্কট ইত্যাদি।"—দাসী :—"বাসর জাগাবার সময়, আমি তোমাকে দেখেছিলুম—ঘুমের ঘোরে তোমার চোখ বুজে গেছে—তাতে তোমাকে এমনসুন্দর দেখাচ্ছিল—সেই রকম করে' আর-একবার থাকো দিকি, আমি তোমার বর্ণিমেটা করি।" দাসীর কথামত বিদূষক চোখ বুজিয়া রহিল, তখন তাহার দাসী উঠিয়া একটা তমাল-পল্লব নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রসে বিদূষকের মুখ কালো করিয়া দিল। সকল লোক হাসিয়া উঠিল এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ সরোষে প্রস্থান করিল। অতএব, বিদূষকের ভূমিকাটি অন্য নাট্যসাহিত্য হইতে গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা স্থানীয় জিনিস বলিয়া,—ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের নিজস্ব জিনিস বলিয়াই সপ্রমাণ হয়।

নিউ-কমেডির Parasitus edax এর সহিত বিটের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য দুই বিভিন্ন সভ্যতা হইতে, যতটা অনুরূপ আদর্শের চরিত্র উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, সেই পরিমাণে সাদৃশ্য আছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। বিট্, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদের ব্যয়ে স্বীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহার বিনিময়ে সে ভালভাল রং-দার কথা বলে, রসিকতা করে; কিন্তু তাহার একটি বেশ সহজ-শোভন ভাব আছে, সততার ভাব আছে, একটা সুশিক্ষার গৌরব আছে—যাহাতে করিয়া Artrotrogus প্রভৃতির সহিত তাহার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, বিটের ভূমিকা কেবল মাত্র নাট্য সাহিত্যেই আছে এরূপ নহে; এই চরিত্রের অবতারণা অন্য জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেও আছে—কাহিনীর মধ্যে আছে, আখ্যায়িকার মধ্যে আছে। আবার এই চরিত্র বাস্তব-জীবনেও পরিদৃষ্ট হয়। লাম্পট্যদূষিত ও সৌখীন্-রুচি জনসমাজ, গ্রীসে,"Parasite"কে (পরপুষ্ট—পারিবদ) ও ভারতে "বিট্"কে উৎপাদন করিয়াছে। যে কল্পনা-জগৎ হইতে ভারতের স্থায়ীনাট্য-সাহিত্য (classic) স্বকীয় নায়কদিগকে নির্ব্বাচন করিত, বিটের ভাবভঙ্গী, ধরণধরণ সেই কল্পনা জগৎ হইতে বিট্‌কে একটু দূরে সরাইয়া দিয়াছে। কালি-দাস ও ভবভূতী স্বীয় নাটকে বিটের অবতারণা করেন নাই। শ্রীহর্ষ যদিও এই চরিত্র নাগানন্দে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি উহাকে মূল-আখ্যানের মধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই, একটা অবান্তর প্রসঙ্গে আনয়ন করিয়াছেন। কেবল মৃচ্ছকটিক নাটকেই বিটের একটা বাস্তব জীবন আছে। নির্ব্বোধ ও দুরাচার শকারের পাশাপাশি বিট্, নাটকে একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও মৃচ্ছ-কটিক-সদৃশ আর কোন সঙ্কীর্ণ-প্রকরণজাতীয় নাটক আমাদিগের নিকট এপর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই, তথাপি ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, ঐজাতীয় অন্যান্য প্রকরণ নাটকেও বিট্ ঐরূপ বৃহৎ স্থানই অধিকার করিত।

Miles Gloriosus-এর সহিত শকা-রেরও বেশ একটু সাদৃশ্যের আভাস আছে। কতকগুলি লক্ষণ উভয়েরই মধ্যে সমান; উভয়েই সমান দেমাকী, সমানলম্পট, উভয়েরই

সমান "মুখের জারি-জুরি", উভয়েই সমান ভীরু। কিন্তু সম্যক্ তুলনার জন্য আর কতকগুলি উপাদানের প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষার সুপ্রতিষ্ঠ নাট্যসাহিত্যে কেবল দুইবার মাত্র শকারের অবতারণা আছে। শকুন্তলার একটি গর্ভাঙ্কে শকার-ধরণের পাত্র কেবল একবার অল্পক্ষণের জন্য দেখা দিয়াছে। কবি তাহাকে লঘু-তুলিকায় অতি ক্ষীণরেখায় আঁকিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকায় বিটের ন্যায় উহা বিস্তার লাভ করে নাই। নাট্যকবিদিগের মধ্যে শূদ্রক যথার্থই একজন শক্তিশালী চরিত্র-স্রষ্টা। নিতান্ত সামান্যধরণের ব্যক্তিদিগকেও, অতি পুরাতন প্রচলিত পাত্রদিগকেও, এমন নিপুণ-ভাবে আঁকিয়াছেন যে, তাহাদের একটা স্বতন্ত্রতা, একটা বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংস্থানক-চরিত্রের খুঁটিনাটিগুলি অস্পষ্টভাবে ধরিয়া লইয়া তাহাদের সহিত গ্রীক্-রোমীয় Miles-এর চরিত্রগত লক্ষণগুলির তুলনা করিতে গেলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। আর এক প্রণালী অনুসরণ করিলে, এই ভ্রম নিবারিত হইতে পারে ঃ—ভরতমুনি, শকারের সাধারণ চরিত্র লক্ষণ কতকগুলি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

"শকার উজ্জল বেশভূষা ধারণ করিবে। অহঙ্কারী ও অমিতব্যয়ী ব্যক্তির ন্যায় তাহার আচরণ হইবে। নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে বড়লোক বলিয়া মনে করিবে। কথায় কথায় লোককে অপমান করিবে। অকারণে রুষ্ট হইবে, আবার অকারণে তাহার রোষ প্রশমিত হইবে।" এই লক্ষণধরিয়া বিচার করিলে miles gloreosus-এর সহিত শকারের কোনরূপ ঐক্য হয় না। শকারের ব্যবহৃত ভাষার দ্বারাই শকারের প্রকৃত কুলের পরিচয় পাওয়া যায়। শকার, শকারী নামক এক বিশেষপ্রকার প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। তাহাতে ক্রমাগত তালব্য- শ-য়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বৈয়াকরণেরা এই বিশেষ প্রকারের উচ্চারণের দ্বারা শকার-নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "শ-এর উচ্চারণকারী —'শকার'। স ও ষ-র পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই 'শ' উচ্চারিত হইয়া থাকে।" শকার, নাটকে যে শকারী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে উহা শকদিগেরও ভাষা। এই শকেরা খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভভাগে পঞ্জাবপ্রদেশে, সম্মিলিত গ্রীক্ রাজ্যের মধ্যে জাতি-বিশেষের আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া স্বকীয় প্রভুত্ব স্থাপন করে। শকার নিজে শকজাতীয়। জাতিবাচক শক শব্দের উত্তরে "আর" যোগ করিয়া এই শকার শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "উত্তর প্রদেশের জাতিরা এই "আর"-এর প্রচুর প্রয়োগ করিয়া থাকে।"(১) ললিত বিস্তারে শকারি-লিপির উল্লেখ আছে। যে সময়ে শকদিগের আধিপত্য টলমল করিতে ছিল, সেই সময়ে শকার-ভূমিকার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। দেশাক্রমণকারী শক্রর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে এইভাব পোষণ করিবার-মত পেট্রিয়টিজমের ধারণা, ভারত-বাসীদিগের নিকট একান্ত অপরিচিত হইলেও, তাহাদের এতটা গর্ব্ব ও শক্রর প্রতি অবজ্ঞা যে, স্বকীয় বিজেতা প্রভুদের প্রতি উপহাস-বাণ প্রয়োগ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। শকশক্র শতবাহনের সমসাময়িক লোকেরা শকারের ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়া যে সুখ পাইত,

(১) পাতঞ্জলী—মোক্ষমূলরকর্ত্তৃক উদ্ধৃত। India 295 "ভারতীয় নাট্য সাহিত্য।"

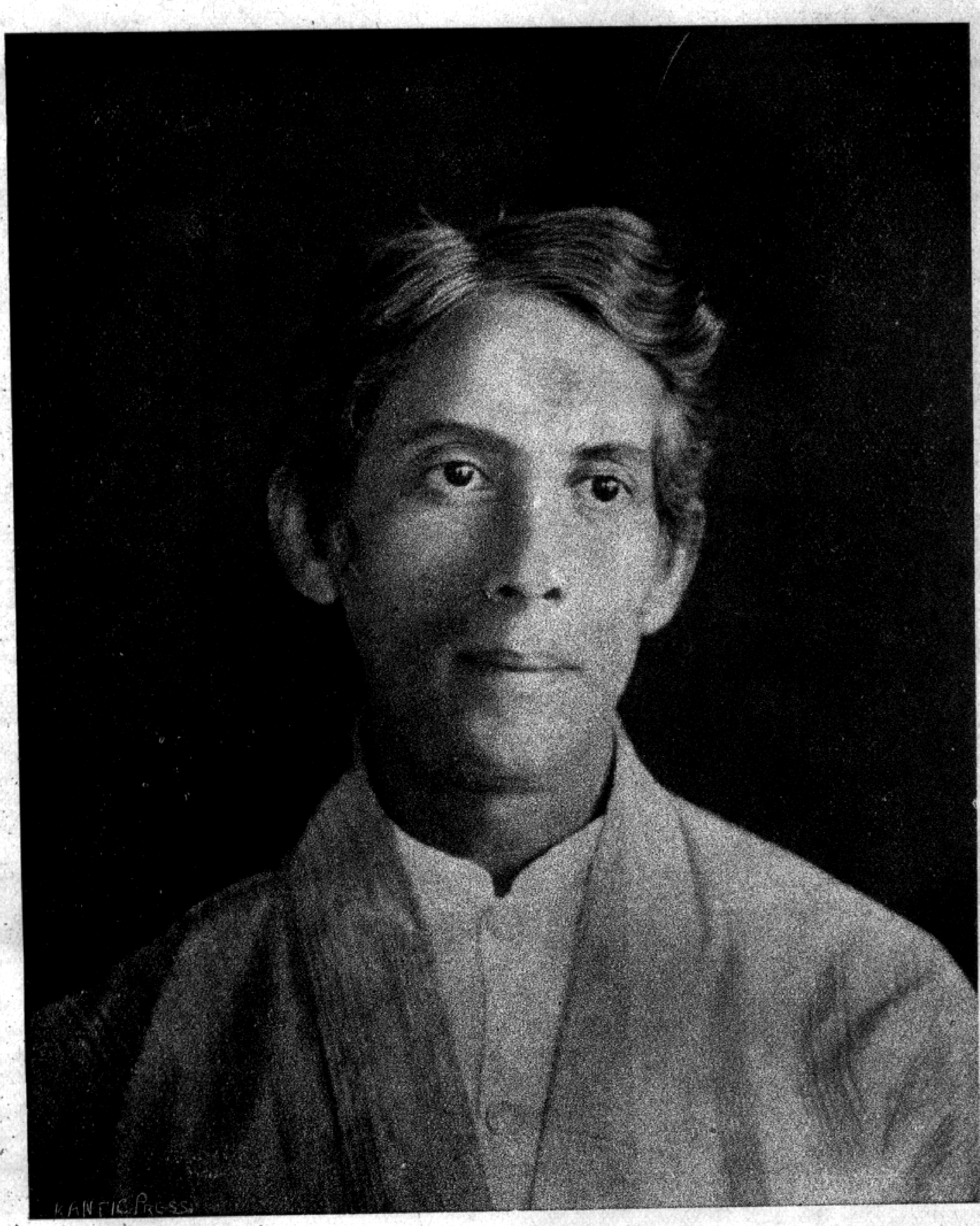
কলিকাতা-থিয়েটারের বর্ত্তমান দর্শকেরাও ইংরাজের অদ্ভুত চরিত্র-চিত্র দেখিয়াও সেইরূপ আনন্দ লাভ করে। থিয়েটারের রাজসভায় শকারের যে চিত্র দেখা যায় তাহা শুধু নাটকের একটা ধরা-বাঁধা আলঙ্কারিক চিত্র নহে, ইহা নিশ্চয়ই বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ। শক-নৃপতির অধীন ভারতীয় রাজারা, রাজাধিরাজের অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করিবার জন্য নিশ্চয়ই অনেকবার শক-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকিবে। হিন্দু-গ্রীকদিগের শেষ রাজা Hermaios, স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য kadphises-এর সহিত এক সিংহাসনে বসিতে কি স্বীকৃত হন নাই? এই অসভ্য রমণীগণ তাহাদের পতিদিগের নিকট যে সকল স্থূলরুচি, অর্থগৃধ্নু, অতিলুব্ধ আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে করিয়া আনিত, তাহারা এই সকল রাজার রাজ্যকে বিজিত দেশের ন্যায় অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। অজ্ঞজনের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তির যে অবজ্ঞা, অসভ্য বর্ব্বরের প্রতি সুসভ্য নাগরিকের যে অবজ্ঞা সেই অবজ্ঞার ভাব ভরত-মুনির দ্বারা চিত্রিত ও শূদ্রকের দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া শকারের মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে শকারের আদর্শ-চিত্র একটা বিশেষ সময়কে পরিচিহ্নিত করে। যে সময়ে শকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল সেই খৃষ্টোত্তর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই সম্ভবত এই নাট্যোল্লিখিত পাত্র শকারের সৃষ্টি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-রথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

২৯শে এপ্রিল ১৯২১, সোমবার। সন্ধ্যা ৬টার সময় জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে বাহির হইলাম। প্রায় ৬৷৹টার সময় তাঁহার নব নির্ম্মিত বাসভবনে উপস্থিত হইলাম। "মোরাবাদী" নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসভবন। পাহাড়ের উপরে একটি কোঠা-বাড়ী ও নিম্নে সানুদেশে ৩টি বাঙ্গলা। সেদিন বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, মাথার উপর নীলআকাশে চাঁদের বিমল জ্যোৎস্না, পায়ের তলে সবুজ ঘাস; দূরে অদূরে পার্ব্বত্যবৃক্ষগুল্মের উপবন; আর দূরে, আরও দূরে, প্রকৃতির চন্দ্রালোকিত এই নৈশবাসর-কক্ষের প্রাচীরের মত তরঙ্গায়িত কালো কালো পাহাড়ের শ্রেণী—একটানা, অচ্ছিন্ন, যেন অঙ্কিত। পাহাড়তলে মাঠের পথে মুণ্ডামজুরেরা গান করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। এ নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথে এদের কোলাহলেই প্রভাতের আলো ফুটে, আবার এদের কোলাহলেই দিনের আলো শেষ হয়। এরা গানের সুরে যেন বলিয়া যাইতেছে—এ নির্জ্জন নীরব পথে সেদিনের এই শেষ কোলাহল।

বাণীর ও কমলার বরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন সময়ে নীচের ঘরের বারান্দায় বসিয়া বাড়ীর লোকের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। বন্ধুবর একটু দূরে দাঁড়াইলেন, আমি একটু অগ্রসর হইয়া একজন ভৃত্যকে



শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলিলাম "বাবুকে বল, দুইজন বাবু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" ভৃত্য আমাদিগকে সেই স্থানেই লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু আমরা তাহার অভ্যর্থনা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলে সে বলিল, "তবে হামি বাবুকে বলিয়া দিচ্ছি, আপ্ লোগ্ ঠার্ করুন্।" ভৃত্য যেমন সংবাদ দিল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই জ্যোতিবাবু আমাদের নিকটে আসিলেন। আমরা যথারীতি অভিবাদন করিলে, তিনি আমাদিগকে লইয়া অন্য একটি কক্ষে গেলেন। সে কি সৌজন্য, কি স্নেহ! বহুদিন এমন স্নেহের কথা শুনি নাই বলিয়া তাঁহার স্নেহ যেন আমরা দ্বিগুণ পরিমাণে অনুভব করিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তায় সেখানে বাধা হইতে পারে বলিয়া তিনি আমাদের লইয়া আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়ের উপরের বাড়ীতে লইয়া চলিলেন। উপরের বাড়ীতেই তিনি আজকাল থাকেন, নীচে কোনও কাযে বা ভ্রমণের সময় নামিয়া আসেন। চলিতে চলিতে আমাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে আপনারা রবি ভাবেন নি ত?" আমরা সেরূপ ভুল করি নাই, জানাইলাম। তার পর তিনি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার কথা শুনিয়া, চিন্তা করিয়া তিনি একটু বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আপনার নাম জানি, মধ্যে মধ্যে আপনার লেখা দেখিয়া থাকি।" আমিও সাহিত্য-আফিসে যে একজন Apprentice এ সংবাদ মদীয় বন্ধুবর পূর্ব্বেই জ্যোতিবাবুর গোচর করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

উপরে উঠিয়াই তিনি আমাদিগকে তাঁহার উদ্যানবাটিকায় লইয়া গেলেন। সেখানে ছোট ছোট পুষ্পতরুগুলির তলদেশ সমাকার শ্বেত উপলখণ্ডে আলিপনার ন্যায় সজ্জিত; লতাগুলি উদ্যানমধ্যে, প্রাচীরগাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন,—নানাবিধ পুষ্পলতার বিচিত্র গন্ধে-বর্ণে পুষ্পবাটিকাটি তপোবনের মত সুন্দর, পবিত্র এবং মনোরম বোধ হইল। তিনি বলিলেন, কয়েকদিন হইল, বিহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশের মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর (Sir Charles Bayley) সন্ধ্যাভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হয়েন। জ্যোতিবাবু তখন নীচে ছিলেন। তিনি জানিতেনও না যে লাটসাহেব তাঁহার বাটীতে উপস্থিত। লাট বাহাদুর পুষ্পবাটিকা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন, এবং অবিনাশবাবু জনৈক অতিথি, যিনি লাটবাহাদুরকে এই সমস্ত দেখাইতেছিলেন তাঁহাকে লাটসাহেব বলেন, "I envy you Babu."

পাহাড়টির সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত উপাসনামন্দির আছে। মন্দিরটি সহরের প্রায় সমস্ত স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই মন্দিরটি করিতে অনেক অর্থও ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরটি ছোট; কেবল চারিদিকে চারিটি স্তম্ভ ও মাথায় একটি ছাতার মত ছাদ। লম্বে প্রস্থে মন্দিরটি ১২।১৪ ফুট বলিয়া মনে হইল। এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে জ্যোতিবাবু কাশী হইতে মিস্ত্রী ও প্রস্তর আনাইয়াছিলেন—এবং নীচে হইতে উপরে পাথর উঠাইতেও ২।৩ মাস বৃথা ব্যয় হয়। মিস্ত্রীরাও বসিয়া বসিয়া ২।৩ মাস বেতন লইয়াছিল,—ইত্যাদি নানা অসুবিধায় ন্যায্য যাহা ব্যয়িত হওয়া উচিত

ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাঁহাকে বড়ই জলকষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল—অদূরে একটি ঝরণা হইতে জল আনাইয়া, মিস্ত্রীর কায, এবং নিজেদের ব্যবহার চলিত।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া আমরা পাহাড়ের উষ্ণীষের মত এই মন্দিরটির নীচে বসিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

বর্ত্তমানকালের বঙ্গসাহিত্যের বিষয় তিনি বলিলেন, "আগের চেয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য এখন অনেক উন্নত। এখন লোকে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গবেষণামূলক সাহিত্যে প্রবৃত্ত। এ বড়ই শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এখন লেখকেরা নূতন নূতন স্থানের বিবরণ দিয়া নানা স্থানের কাহিনী, উপকথা, আচারব্যবহারের ইতিহাস দিয়া বঙ্গসাহিত্যকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিতেছেন।"

নূতন লেখকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান্ কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কবিতাও আমায় ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে।" গল্পলেখার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিস নহে—এতেও খুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের Plot রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক। তারপর মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই হয় না; এ হিসাবে গল্প ও উপন্যাসের মূল্য অল্প নহে।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আর যৌবনের তেজ ও ক্ষমতা নাই, এখন কোনও রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা—এ একটা ব্যাধির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, "প্রবাসী" "ভারতী" "বঙ্গদর্শনে" একটু একটু লিখিয়া থাকি।

ভাষার আলোচনায় তিনি বলেন, "আজ কাল দু'টো নূতন কথা উঠেছে "কী" আর "মতো"! অনর্থক শব্দ বিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—দুই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা হতে পারে আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে সেখানে শব্দটা বিকৃত না করিয়া, একটা হাইফেন - চিহ্ন বসালেই সব গোল মিটিয়া যায়। যেমন মনে কর—"তুমি কি বল্‌ছ?" এই বাক্যে, ঝোঁকের বা অর্থের ভিন্নতা-অনুসারে "তুমি কি বল্‌চ?" বা "তুমি কি-বল্‌চ?"—এইরূপ লেখা যাইতে পারে। প্রথম স্থলে, "তুমির" উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় স্থলে "কি-র" উপর ঝোঁক।

"মত" শব্দের অর্থ যেখানে "সদৃশ"—সেইখানেও আবশ্যক হইলে এইরূপ হাইফেন প্রয়োগে অর্থ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যথা "তোমার-মত লোক নাই!"

যাই হোক্, কোন বিশেষ চিহ্ন প্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, আরবী ও ফারসী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেন না তাহাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাযেই অর্থ না বুঝিয়া পড়া যায় না। এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাহাতে

আর সন্দেহ নাই। আমাদের বঙ্গভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য তিনি V লিপিতে "ভ" না লিখিয়া মারাঠী নিয়মে "হ্ব" লিখেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, "আহ্বানে" "হ্ব" অনেকটা Vর-মত, এই জন্য Venus লিখিতে তিনি "ভিনাস্ না লিখিয়া "হ্বিনাস্" লেখেন।

যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষর-নির্ব্বাসনসজ্জা দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এ কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রমমাত্র। তাঁহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।

তাহার পর আমাদিগকে লইয়া তিনি ছাদের উপর গেলেন—সেখানে বিজয়বাবুর (মজুমদার) কথা পাড়িলেন। বিজয়বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিজয় বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান!......তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।" বিজয়বাবুর বিষয় তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্র-নাথের ইয়ুরোপ ভ্রমণ স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্ততঃ ৩/৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমলহৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর

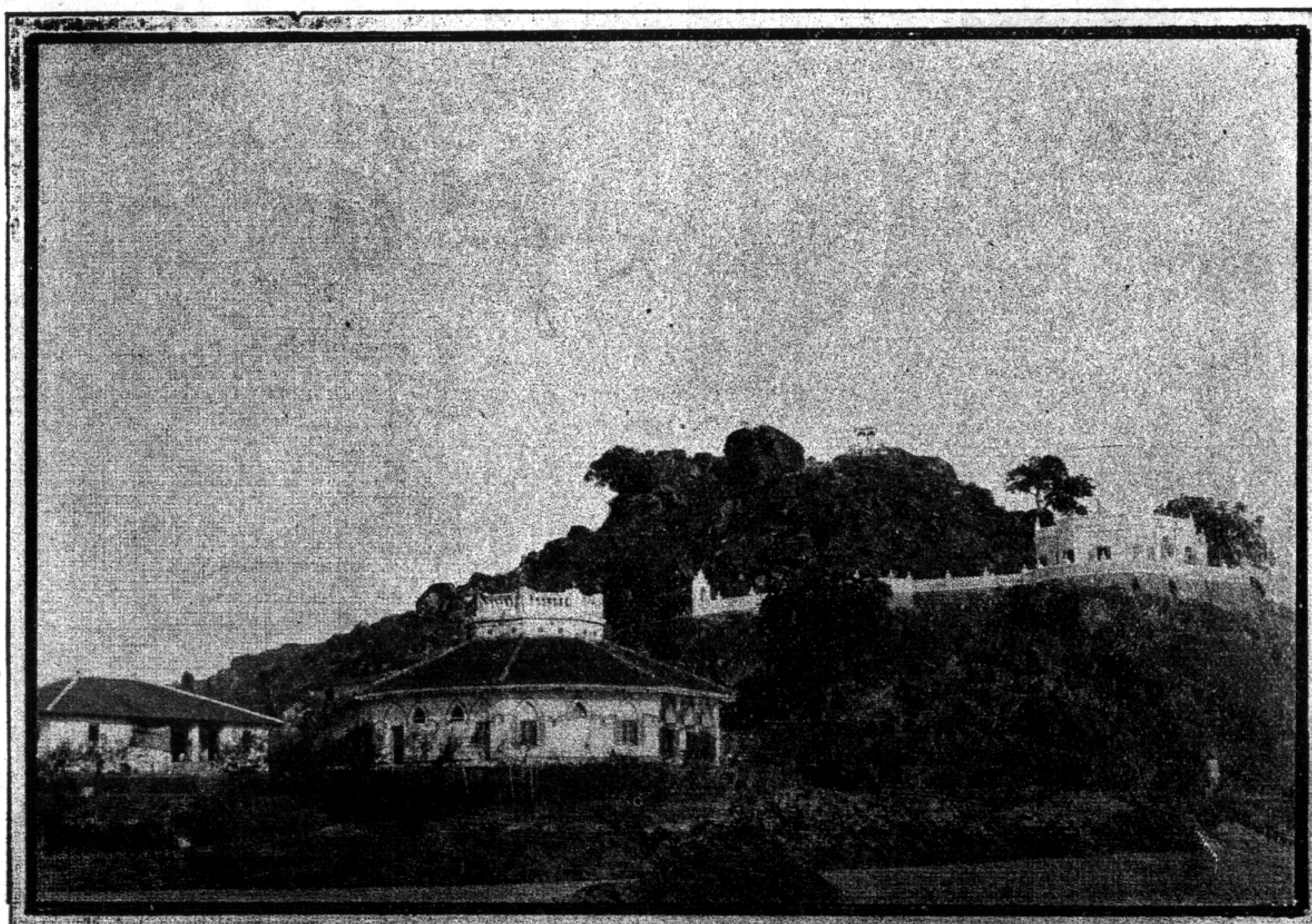
রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখপ্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হইয়াছে, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সেদু'টি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না এইজন্য আর একদিন একটু সকালে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ ভবনের নাম "শান্তিধাম"। শান্তিধাম বাস্তবিক শান্তিধামই বটে। আরও একটি বিশেষ জিনিষ এই যে ফটকের উপরে ধ্যানীবুদ্ধের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এইজন্য সেদিন একটি মজলিশ হইবে তিনি আমাদিগকে সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং আসিব কি না বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি "ভারতী"তে জ্যোতিবাবুর ও রবিবাবুর যে কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যের একখানিতে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা"য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর-সংযোগ করিয়া দিতেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী! ঘড়ির কাঁটার মত সময়টাকেও যদি ইচ্ছামত ঘোরাতে পারা যেত', তা'হলে সংসারটা কত



শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাঁচির বাড়ী।

(২)

৫ই মে, ১৯১২, রবিবার। নিমন্ত্রণ রক্ষাকল্পে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত ঠিক ৬।০টার সময় "শান্তিধামে" উপস্থিত হইলাম। নীচে হইতে পাহাড়ের উপরের ঘর পর্য্যন্ত দীপমালায় আলোকিত। ফটকে তিনচারিজন দ্বাররক্ষক ছিল—তাহাদেরই একজন আমাদিগকে উপরে লইয়া গেল। উপরে যাইবামাত্রই জ্যোতিবাবু সস্নেহে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজে যেমন মিষ্টমুখে আমাদিগকে অহ্বান করিলেন তেমনি আমাদিগকে বেশ মিষ্টমুখ করাইয়া দিলেন। সেখানে সহরের আরও অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় "বাল্মীকি-প্রতিভা" আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সারাংশটি তিনি মিষ্টমধুর ভাষায় বিবৃত করিয়া যেখানে যেরূপ হাবভাব প্রয়োজন ঠিক তেমনি করিয়া একে একে সমস্ত গানগুলি, গাহিয়া গেলেন। গান অপেক্ষা এখনও আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া আছে সেই "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বম্" শ্লোকটি! সে যে কি' গভীর ভাবাবেশে ও গম্ভীর স্বরে শ্লোকটি তিনি পড়িয়াছিলেন সে যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেই সুর যেন এখনও কানে বাজিতেছে। গৌরকান্তি শুভ্রকেশ, তপস্বীর মত—উজ্জ্বল দীর্ঘ ক্ষীণ দেহযষ্টি উত্তোলন করিয়া যখন তিনি শ্লোকপাঠ আরম্ভ করিলেন তখন মনে হইল যেন সত্যসত্যই বাল্মীকির মুখে সেই আদি কবিতা শুনিতেছি। বাল্মীকিপ্রতিভার পর সকলের অনুরোধে গীতবাদ্যাদিও আরম্ভ হইল।

আমাদের সম্মুখেই Dwarkinএর বিশাল Piano ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সে বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পিয়ানো, সেতার, তবলা, মন্দিরা, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতির সহযোগে কয়েকটি ঐক্যতান বাদ্য হইল,—এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক ভদ্রলোক একটি গান করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সভাভঙ্গ হইল—আমরাও হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

এ আসরে দেখিবার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল, সেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যবসায় এবং ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ। এক মুহূর্ত্তও না থামিয়া বাল্মীকি-প্রতিভার সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস নাই। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে যখন বেহালা, পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রকৃতিজয়ী একনিষ্ঠ সাধকের মত আপনার কায করিয়া চলিলেন। বার্দ্ধক্য ও ক্লান্তি পরাজিত হইল, দূরে পড়িয়া রহিল, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আপনার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আসিবার সময় তাঁহার কষ্ট হইল বলিয়া ক্ষমাভিক্ষা করায় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাদের ত আমোদ হ'ল!" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসিলেন, কিন্তু কথাটা ঠিক।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের সহিত জাপানের সম্বন্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রেসিডেণ্ট কাউণ্ট ওকুমার ভারতবাসীর প্রতি কতদূর অনুরাগ তৎসম্বন্ধে আর দুই একটি কথার অবতারণা করিয়াই ইন্দো-জাপানীজ এসোসিয়েশন-কাহিনীর পরিসমাপ্তি করিব।

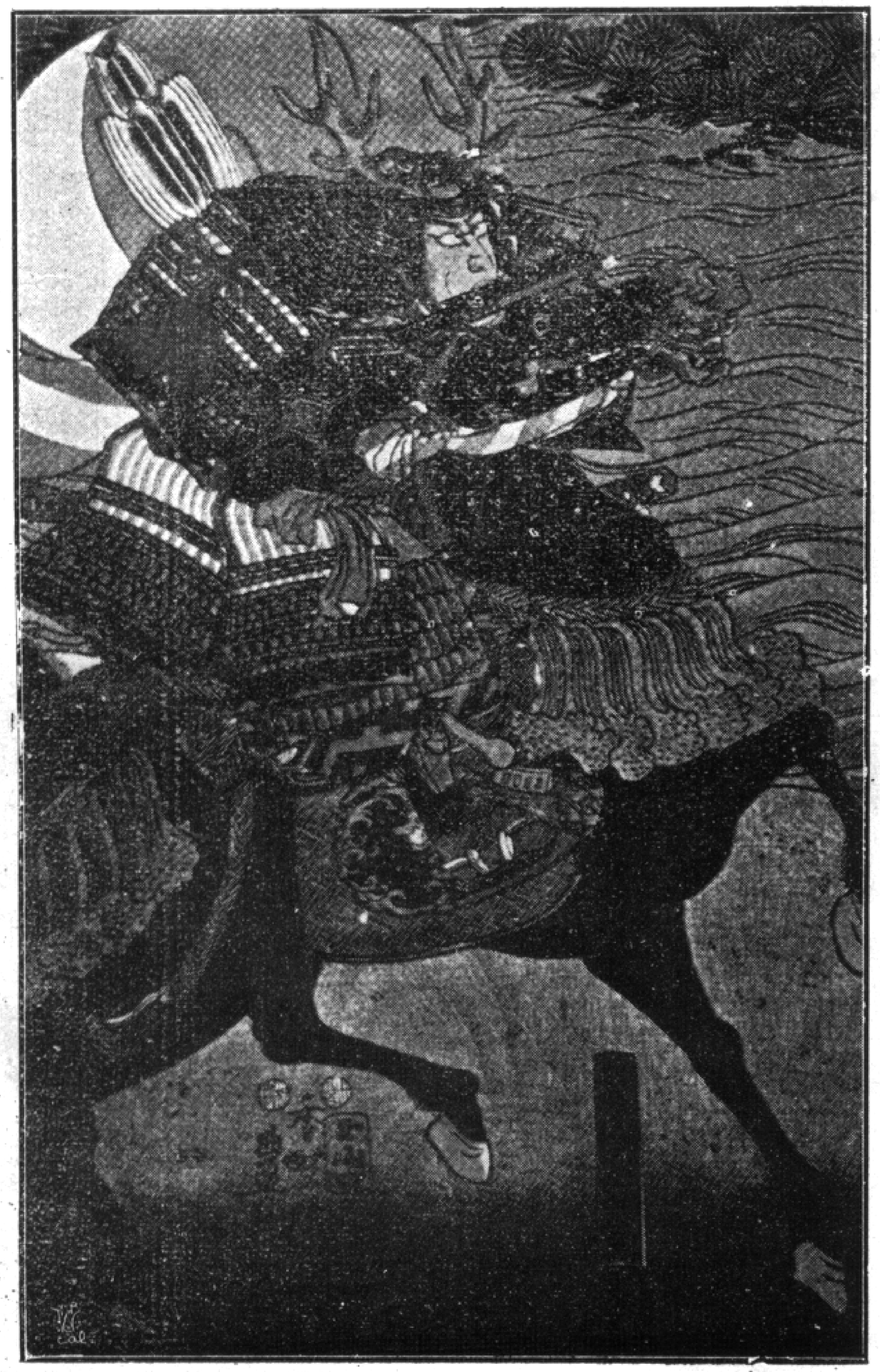
কাউণ্ট অনেক অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছেন—কখনও তাঁহার নিজপ্রাসাদে, কখনও পিয়ার্স ক্লাবে, আবার কখন বা বড় বড় ভোজনালয়ে; (Restaurant) সব জায়গাতেই টাকা দিয়া উপস্থিত হইতে হইত। জাপানের সভাসমিতি বলিলেই বুঝিতে হইবে তথায় খাওয়া দাওয়ার কিছু না কিছু বন্দোবস্ত আছেই, কাযেই বিল অনুযায়ী খরচ বহন করিতেই হইবে। প্রত্যেক অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট মহাশয় ভারতবাসীদের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে ভুলিতেন না। এমন কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগকেও অসভ্য বলিতে ত্রুটি করেন নাই। একদা চীনদেশীয় ছাত্রদের কোন সমিতির এক বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদে আসীন হইয়াছিলেন। ভারতসম্বন্ধে সে সভায় কিছুই উল্লেখ করিবার দরকার ছিল না; অথচ সেখানেও ভারতের প্রাচীন সুসভ্যতার উপর নানারূপ দোষের আরোপ করিতে ছাড়েন নাই। সে সভায় তিনি চীন ও জাপানের সভ্যতার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ভারত প্রকৃতপ্রস্তাবে কখনও তেমন সভ্য ছিল না বলিয়া উল্লেখ করেন, তিনি আরো বলেন ভারতবাসী চরিত্রবিহীন। আমরা পাশ্চাত্যজাতির সংশ্রবে তো আছিই,—তাছাড়া ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম, চীন, কোরিয়া ফিলিপাইন এবং জাপান প্রভৃতি এসিয়াটিক জাতির সংস্পর্শেও কয়েক বছর কাটাইয়া দেখিয়াছি যে চরিত্র বলিতে যাহা কিছু, আজ পর্য্যন্তও তাহার আদর্শ যদি ধরণীতলে থাকে তবে ভারতেই কিছু আছে। ভারতের ন্যায় সতীসাধ্বী স্ত্রীলোক এবং চরিত্রবান্ পুরুষ দুনিয়ার অন্যত্র নাই। কাউণ্ট যদি তাঁহার দেশের প্রাচীন ইতিহাসের দুইচারি পাতা উল্টাইয়া দেখেন তাহা হইলে আর যুক্তিতর্কের আবশ্যক নাই, তাঁহাকে মাথা হেঁট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাদের দেশ ও জাতিকে উন্নত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় ছিল, আমাদের পার্ব্বত্য-জাতির চেয়ে উন্নত ছিল কিনা সেবিষয়েও সন্দেহ।

দুই দেশের ভিতর বন্ধুত্ব সংস্থাপনকল্পে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ অসঙ্গত কথা প্রেসিডেণ্টের মুখে বাহির হইলে নিতান্ত অবিচার করা হয় এবং আমরা আমাদের দেশ ও জাতির অযথা নিন্দা শুনিতে এরূপ সমিতিতে আর যোগদান করিতে পারি না এইরূপ মৌখিক অনুরোধ এবং পত্রদ্বারা ও সংবাদপত্রের সাহায্যে কাউণ্টকে অবগত করাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

কোন কোন জাপানী আমাদের ইন্দোজাপ

এসোসিয়েশনের ফণ্ডের টাকায় জনৈক জাপানী বণিককে ভারতে বাণিজ্য প্রসারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মিশন প্রেরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আবার শুনিতেছি ইন্দো-জাপানীজ ট্রেডিং কোম্পানী নামে এসোসিয়েশন হইতে একটি কোম্পানী খোলা হইবে। তোকিও সহরে ঐ কোম্পানীর একটি মিউজিয়াম বা আজবঘর থাকিবে। তথায় জাপানের কারখানার ব্যবহারোপযোগী ভারতের খনিজ এবং কৃষিজ দ্রব্যের নমুনা এবং মুল্যাদির বিবরণ রক্ষিত হইবে আর ভারতে কি কি জাপ-শিল্পজ দ্রব্য রপ্তানী হইতে পারে তাহার নমুনা ও বিবরণী থাকিবে।

দেখিতে দেখিতে জাপানী পণ্য ক্রমেই আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। দলে দলে জাপানী বণিক ভারতে আসিয়া দোকান খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি রাজপুতানার এ সুদূর মরুভূমিপ্রদেশেও উহাদের হাত এড়াইবার যো নাই। ইয়োকোহামা ও কোবে বন্দরে অনেকগুলি ভারতীয় বণিক আমদানী-রপ্তানীর কারবার চালাইতেন। কিন্তু আজকাল জাপানীরা স্বয়ং ভারতে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান পর্য্যন্ত চালাইতে আরম্ভ করায় আমাদের বণিকগণ ফেল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই কয়েকটি করিয় কোম্পানী ফেল হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আমি কলিকাতার বাজারে জাপানী-পণ্যকে স্বদেশী জিনিসের ন্যায় গণ্য করিয়া আগ্রহের সহিত অনেককে ক্রয় করিতে দেখিয়াছি।



জাপানের প্রাচীন যোদ্ধা।

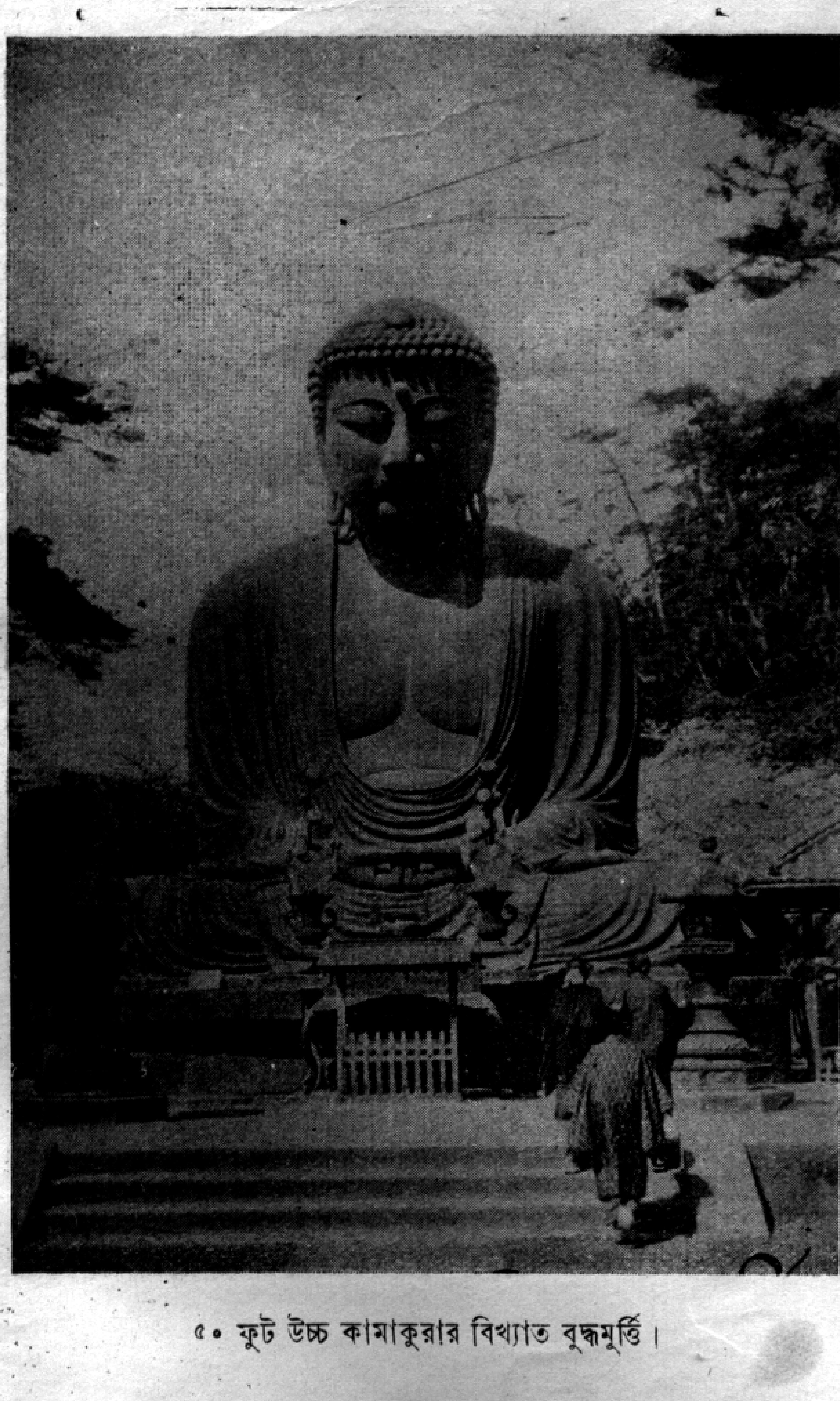
এ সঙ্গক্রমে একটি কথা মনে পড়িল, জাপান হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের ২।৪ দিনের মধ্যেই কয়েকটি জিনিসের জন্য বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। সার্টের উপর চাদর ঝুলাইয়া চলিলাম। কয়েক দোকান ঘুরিয়াও দুইটি জিনিস স্বদেশী মিলিল না। অগত্যা বিদেশী জিনিসই কিনিতে হইল। দোকানদার বলিল—জাপানী ও জার্ম্মান জিনিস তাহার দোকানে আছে, একজন ভদ্রলোক খরিদ্দার তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "মশায় জাপানী জিনিস আমাদের ঘরের জিনিস বলিতে হইবে; আমাদের ভায়েরাই উহা প্রস্তুত করিয়াছে; উহাই নিন, তুলনা করিয়া জার্ম্মান জিনিসই ভালো মনে হওয়ায় উহাই কিনিলাম। ভদ্রলোকটি চটিয়া আমাকে গালি দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এইরূপ ভদ্রবেশধারী স্বদেশদ্রোহীর দোষেই দেশটা উৎসন্ন গেল। ইহারাই স্বদেশী বক্তৃতা করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে চায়। ইহাদের গলায় দড়ি দিয়া মরা ভালো ইত্যাদি। ভদ্রলোকটির কথায় মনে মনে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিলাম।

আত্মগৌরব এবং দেশগৌরব রক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ একত্র এক বাড়ীতে অবস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইণ্ডিয়া হাউস স্থাপন করেন, কিন্তু এখনীং ভারতবাসীর প্রতি জাপানীদের যেরূপ ব্যবহার দেখা যাইতেছে;—জানিনা অর্থের নিস্পেষণে সে হাউস স্থায়ী হইতে পারিয়াছে কিনা। সে হাউসে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনার উপযোগী সুসজ্জিত বৈঠকখানা ছিল; টেনিশ মাঠ ছিল; লাইব্রেরী ছিল; সংবাদপত্র পড়িবার এক বিশেষ ঘর ছিল, বৈজ্ঞানিক বিশেষতঃ রসায়নিক শিল্প শিক্ষার জন্য এক ক্ষুদ্র লেবরেটরী ছিল। দেশে কলিকাতার ন্যায় সহরেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার এমন সুন্দর বন্দোবস্ত নাই। আমাদের এই বাড়ীতে মার্কিনদেশীয় শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে বাবা-ভারতী, ধনকুবের তাতা, কুচবেহারের যুবরাজ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ আগন্তুকরূপে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। পিয়ার্স স্কুল এবং কমার্শ্যাল কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ব্যারণখান্দা এম, এ, এই হাউসের পেট্রন্ বা মুরুব্বি। কলেজের অধ্যাপক, কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ এবং গণ্যমান্য ভদ্রলোক যাঁহারা কোন ভাবে আমাদের উপকার করিয়াছেন তাঁহারাই সময় সময় আমাদের এই হাউসে ভারতীয় ভোজে নিমন্ত্রিত হইতেন।

আন্তরিক ঘৃণা থাকিলেও ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি জাপানীদের বিশেষতঃ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাহ্যিক ব্যবহার বেশ সুন্দর। রাস্তায় হাসিয়া টিটকারী দেওয়া কিম্বা নিগ্রো বলিয়া ডাকা সাধারণতঃ নীচ লোকের ভিতরই বেশী দেখা যায়। সভা-সমিতিতে, স্কুলকলেজে, এবং কারখানার কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের ব্যবহারে আমরা প্রীত ছিলাম। তবে কিনা কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমরা যে কলেজে কিম্বা কারখানায় সমাদরে গৃহীত হইতাম, এখন তথাকার দ্বার একরূপ রুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্কুলকলেজে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের স্থানমাত্র আছে

বলিয়া সেস্থলে অতিরিক্ত ছাত্রের বন্দোবস্ত হইতে পারে না। জাপানে স্কুলকলেজে কার্য্যকরী বিদ্যার সমধিক প্রচলন। কাযেই প্রত্যেক ছেলের জন্য যন্ত্রাদি এবং রসায়নিক উপাদানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর খরচ বহন করিতে হয়। চীন গবর্ণমেণ্ট জাপানের কোন কোন স্কুলে অর্থব্যয়ে চীনদেশীয় ছেলেদের সুবিধার নিমিত্ত কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষার যন্ত্রাগারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় ছেলেদের তেমন কোন বন্দোবস্ত নাই। স্কুলকলেজের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি দুই একটি স্থান মঞ্জুর করেন তবেই আমরা সেখানে প্রবেশ করিতে পাই।

আর কারখানায় প্রবেশ করা দেখিতে দেখিতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি কোন কারখানা দেখিতে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া ক্রিয়াকলাপ বুঝাইয়া দিতেন এবং জলযোগ করাইয়া কারখানার ক্ষুদ্রত্বের দরুন নানারূপ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। তখন ইচ্ছা করিলে ঐ সকল কারখানায় অনায়াসে কায শিখা যাইত। আর এখন কেবলমাত্র একবার দেখিবার উদ্দেশ্যে সেই সকল কারখানায় গেলে দ্বারটি পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিতে চাহে না। প্রতিপত্তিশালী লোকের পাঁচ ছয় মাস চেষ্টায় হয়ত কোন কোন কারখানায় ঢুকিতে পারা যায়। ইউরোপ এবং আমেরিকার কারখানায় প্রবেশলাভ একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। জাপানে আজ পর্য্যন্ত ততটা হয় নাই। যত ছাত্র জাপানে গিয়াছেন কোন না কোন কারখানায় ঢুকিয়া কায শিখিবার বন্দোবস্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এমন কি ভারতীয়



৫০ ফুট উচ্চ কামাকুরার বিখ্যাত বুদ্ধমূর্ত্তি।

কোন কোন ছাত্র ইউরোপ কিম্বা আমেরিকায় পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন করতঃ অল্প মূলধনে এবং স্বল্পায়াসে কিরূপে কারখানা স্থাপন করিয়া কায চালাইতে হয় তাহা শিখার জন্য জাপানে আসিয়া কারখানায় যোগ দিয়াছেন। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাপানী কারখানার দ্বারও রুদ্ধ হইবার উপক্রমপ্রায়, জাপান যেরূপ পাশ্চাত্যজাতির নিকট হইতে নানাবিষয় শিক্ষা করিয়া এক্ষণে সেই অধীত বিদ্যার অনুশীলনে জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে যে কোন প্রকারে হউক আমাদিগকেও তেমনটি করিয়া লইতে হইবে।

জাপানে অধ্যাপকদের নিকট আমরা যেরূপ সদয় ব্যবহার পাইয়াছি দেশের স্কুলকলেজে ক্বচিৎ দুইএকটির নিকট তেমন ব্যবহার পাইয়াছি। তাঁহাদের ন্যায় আত্মীয়, সুহৃদ্‌ অভিভাবক ও উপদেষ্টা অতি দুর্লভ বলিয়া মনে হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকের ভিতর এতদূর মেশামিশি ভারতের ছাত্রগণ কল্পনাও করিতে পারে না। অধ্যাপকগণ সময় সময় আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন এবং আমরাও সময় সময় তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতাম। অধ্যাপকদের স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতি পরিবারের প্রত্যেকের ব্যবহারেই আমরা মুগ্ধ হইতাম। এস্থলে আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমাদের প্রতি অধ্যাপকের কিরূপ অনুরাগ প্রমাণ করিতে চাই। আমি তোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটীর কৃষিকলেজে পড়িতাম, বিজ্ঞানাচার্য্য অধ্যাপক আছো (Dr. Aso) আমাকে রসায়ন যন্ত্রাগারে (লেবরেটরিতে) কায শিখাইতেন। প্রতি বৎসর ১০ই জুলাই তারিখে কলেজের সেসন শেষ এবং ১১ই ১২ই তারিখে কনভোকেশন হইয়া দুই মাসকাল গ্রীষ্মের ছুটি হয়। কলেজসমাপ্তির পর কখন ভারতযাত্রা করিব স্থির ছিল না। ছুটির সময় বিখ্যাত পণ্ডিতগণ নানারূপ তত্ত্বানুসন্ধানে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিয়োজিত থাকেন, হয়ত অধ্যাপক আছোর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হইতে পারে তাই তিনি একদিন হঠাৎ পাঁচ মাইল দূর হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। তিনি হস্ত দ্বারা চিত্রিত নানারূপ লতাপুষ্পশোভিত দুইখানি সুন্দর মূল্যবান জাপানী রেশমবস্ত্র আমাকে উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন "স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ অতি সামান্য কিঞ্চিৎ লইয়া আসিয়াছি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ কর।" তারপর ঐ সঙ্গে আমার জন্য অতি সুন্দরভাবে লিখিত একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাও প্রদান করিলেন।

আমি উল্লিখিত জিনিসগুলি হস্তে লইয়া পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম এবং অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া শেষবিদায় গ্রহণ করিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ভারতে আমাদের স্বদেশী অধ্যাপকদের নিকট নিকট দশদিন ঘুরিয়া একখানা সার্টিফিকেট লাভ করা অনেক ভাগ্যের ফল বিবেচিত হয়; আর জাপানের অধ্যাপক কষ্ট স্বীকার করিয়া বাড়ীতে আসিয়া সার্টিফিকেট দিয়া গেলেন। দুই দেশে কত পার্থক্য।

কারখানায় ঢুকিতে পারিলে কারখানার

কর্তৃপক্ষও বেশ ভালো ব্যবহার করেন। আর কারখানার লোকজনকে সামান্য কিছু টাকা পয়সা কিম্বা খাবার জিনিস দিলে উহারা মনোযোগের সহিত নূতন বিষয় শিখাইয়া থাকে।

সহরের লোক যাঁহারা রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ তাঁহা। প্রত্যেকেই বৈদেশিক মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভারতবাসীকে তো ঘৃণা করিবার কথাই। তবে পল্লীগ্রামে গেলে এখনও অনেকস্থলে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিকট আমরা ভারতবাসী অর্থাৎ বুদ্ধদেবের দেশের লোক বলিয়া কতকটা সম্মান পাইয়া থাকি।

ভারতীয় ছাত্রদের সম্মান অন্যান্য অসিয়াবাসী ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী। বোর্ডিংয়ে চীনা এবং কোরিয়ান ছাত্রদের ন্যায় ভারতীয় ছাত্রদিগকে পূর্ব্বদিনের ভুক্ত্যাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট খাদ্য দেয় না। আমরা যে সম্মানটুকু পাই উহাও আমাদের দেশীয় গুণের জোরে নহে। আমরা ইংরাজীতে কথা বলি, ইংরাজী চালে চলি ইত্যাদি কারণে। বিদ্যালয়ে বা কারখানায় যাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয় তাহারা ভারতীয় ছাত্রদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া প্রশংসা না করিয়া পারে না।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে জুন মাসে ওরিয়েণ্টাল ষ্টুডেণ্টস্ সোসাইটি নামক আসিয়াবাসী ছাত্রদের একটি সমিতি তোকিও সহরে স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে জাপান, কোরিয়া, চীন, শ্যাম, ফিলিপাইন এবং ভারতের ছাত্রগণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন। মাসে একবার সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সমিতিতে কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ছাত্রেরা পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া যাহাতে পরস্পরের ভিতর মেশামিশি এবং বন্ধুত্ব প্রসারণ করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। সময় সময় বিভিন্ন দেশীয় গীতবাদ্যাদিতে বেশ নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা যায়। এ সমিতির সভ্য অধিকাংশই ছাত্র। এ সমিতিতে সকলেই সরলভাবে যোগ দিয়া থাকেন, সকল বিষয়ে সকলের সম অধিকার। এখানে ইন্দো-জাপানীজ এসোসিয়েশনের ন্যায় অরাজকতা নাই।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে জাপানের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার সাহায্যকল্পে এই সমিতি হইতে নাটকাভিনয় উপলক্ষে সহস্রাধিক টাকার টিকেট বিক্রয় হয়। ভারতীয় ছাত্রদের উদ্যোগ এবং প্রযত্নেই কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয়। ঐ দুর্ভিক্ষের সাহায্য-বাবদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও অর্থসাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাছাড়া গত রুষজাপান যুদ্ধের সময় ভারত হইতে সাধারণে চাঁদা তুলিয়া জাপানের সাহায্যার্থে অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতার কোন ভদ্রমহিলা নিজের স্বর্ণাভরণ খুলিয়া যুদ্ধ-সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের কোন না কোন প্রদেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইবার উপক্রম প্রায় হইয়াছে। কতিপয় ভারতীয় যুবক কাউণ্ট ওকুমা এবং আরো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহানুভূতিপ্রার্থী হইয়া ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির কেবলমাত্র সহানুভূতি সংশ্লিষ্ট

থাকিলেও তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট কোন এক নাটকের অভিনয় উপস্থিত করিতে এবং অভিনয়লব্ধ অর্থ দুর্ভিক্ষসাহায্যবাবদ ভারতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। নেতাগণ ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও বধিরের ন্যায় কথাগুলি কাণে শুনেন নাই। কেহ কেহ নাকি বলিয়াছিলেন যুদ্ধের খরচে তাঁহারা ঋণগ্রস্ত,—এরূপ অভিনয়ের দরকার নাই।

দৈনিক ক্রিয়াকলাপে আমরা ভারতবাসী ও জাপানীদের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাতে জাপানীরা আমাদের পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া নৃত্য করিবার কিম্বা আনন্দে আটখানা হইবার কিছুই নাই। তাহারা রুষযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এতদূর গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে যে ইউরোপের অনেক বড় বড় শক্তিকে নগণ্য মনে করে। এ সময় ভারত তাহাদের নিকট অসভ্য এবং বর্ব্বরের দেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! উহারা আমাদের ন্যায় পতিত জাতিকেও এই শিক্ষা দিতেছে যে আমাদের চেয়ে অতি ক্ষুদ্র এবং হীনজাতিও স্বদেশপ্রেম ও সুশিক্ষাকে মূলভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বচেষ্টায় জাতিসমূহের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিতে পারে।

শ্রী যদুনাথ সরকার।

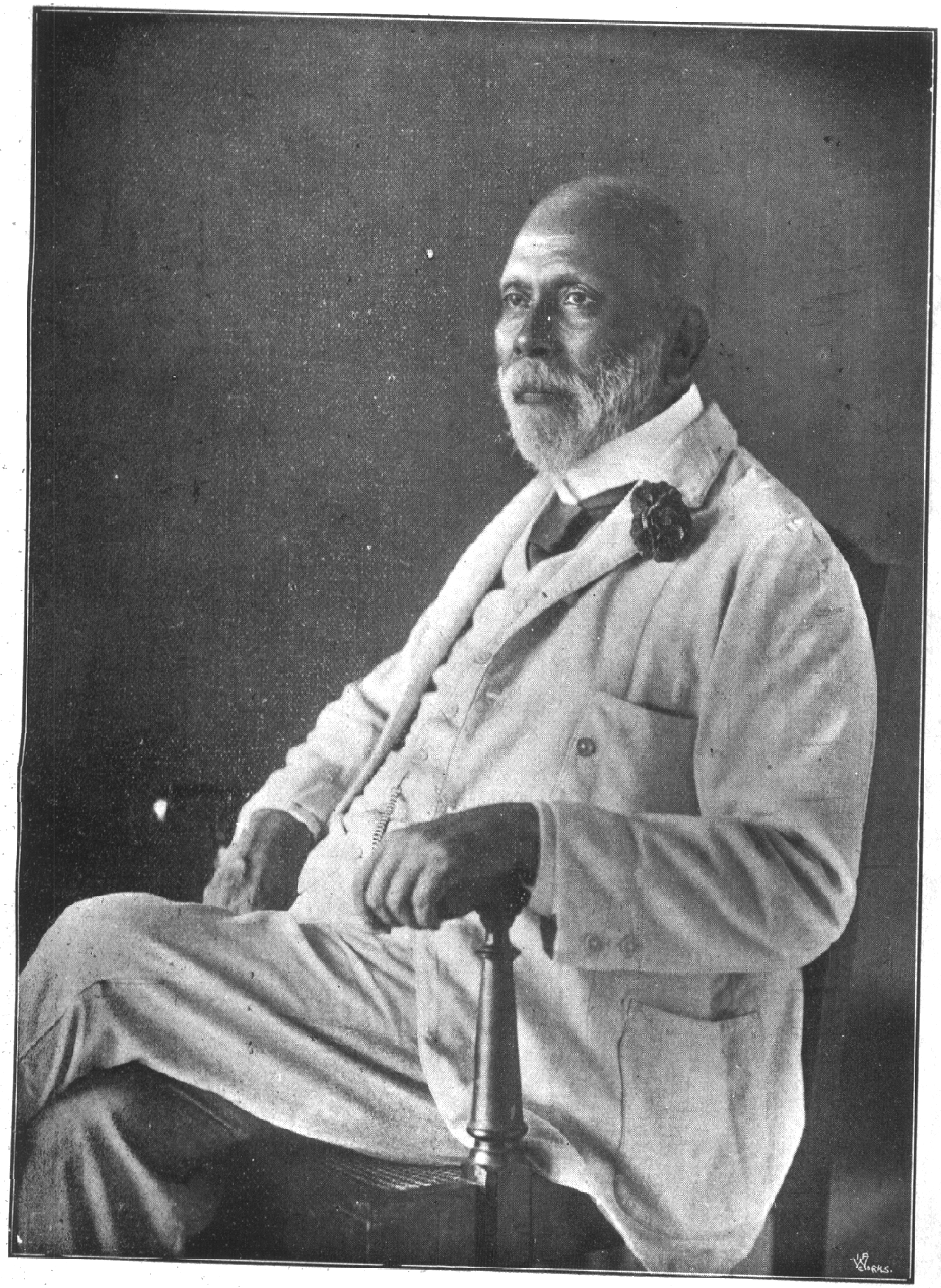
বিশ্ববিদ্যালয়ে দান ও মহাত্মা তারকনাথ পালিত

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় সম্প্রতি যে বিপুল সম্পত্তি বিজ্ঞান শাস্ত্রানুশীলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন, তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনি গৌরবের বিষয়। ইহাতে তাঁহার যে মহত্ব প্রকাশ পাইতেছে তাহা শুধু বঙ্গবাসীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর আদর্শ গৌরব।

পালিত মহাশয় এদেশে রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রচার মানসে নগদ চারি লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং ১২ বিঘা জমীসহ কলিকাতার পারসিবাগান বাড়ী—সর্ব্বসমেত সাত লক্ষ মুদ্রারও অধিক সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। নগদ টাকার সুদ হইতে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের দুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন এবং যে বাড়ী ও জমী দান করিয়াছেন সেইখানে বিজ্ঞানপরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দাতা তাঁহার দানপত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় শিক্ষকদ্বারা এতদ্দেশীয় যুবকগণকে শিল্প-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা এবং স্বদেশে শিল্প-বিজ্ঞান বহুল প্রচার করার অভিপ্রায়েই তিনি এই কার্য্যে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই দান গ্রহণ করিবার জন্য গত ২২শে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া মিঃ পালিতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি ডাঃ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, "যদিও ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাত্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষোন্নতির জন্য অর্থদান করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মত অধিক পরিমাণ অর্থ এপর্য্যন্ত কেহই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন নাই।"

এই বিজ্ঞানবিদ্যালয় হইতে যাহাতে ছাত্রগণ, বি, এস, সি অনার, এম, এস, সি, ও ডি, এস সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তদনুরূপ শিক্ষা তাহাদের প্রদান করা



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত (বর্ত্তমান সময়ে)

হইবে। এখানে কলেজের ছাত্রদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা (Elementary Teaching) দেওয়া হইবে না—ইহাই এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। বিজ্ঞান-জ্ঞান সম্বন্ধে যাহাতে ছাত্রগণ পারদর্শী হইতে পারে তজ্জন্য অধ্যাপকেরা মৌলিক গবেষণা করিবেন এবং ছাত্রগণকেও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করিবেন। কোন যুবক যদি বিজ্ঞান জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাঁহাকে এই পরীক্ষাগারে প্রবেশাধিকার দান করা হইবে।

দুইজন অধ্যাপকের ব্যয় নির্ব্বাহের পর যদি অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে ছাত্র বৃত্তি সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-বিদ্যালয় ও যন্ত্রাগারের নাম "তারকনাথ পালিত রাসায়নিক বিদ্যালয়" "তারকনাথ পালিত পদার্থ বিজ্ঞান বিদ্যালয়" ও "তারকনাথ পালিত যন্ত্রাগার" এইরূপ রাখা হইবে।

এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন গভর্ণমেণ্ট বঙ্গচ্ছেদের অভিপ্রায় ঘোষণা করেন তখন স্বদেশভক্তবৃন্দ মর্ম্মাহত হইয়া উঠেন। দেশের কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কামনায় সাধারণের সহিত অনেক ধনীও তখন নগ্নপদে দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে স্বদেশ-বৎসল শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের উদ্যোগ ও যত্নেই প্রধানতঃ কলিকাতায় একটি শিল্প-শিক্ষালয় (Technical Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত শিক্ষালয়ের ব্যয়স্বরূপ মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা সাহায্যদান করিতেন। কিন্তু এতদিনেও শিল্পশিক্ষালয়ে আশানুরূপ সুফল না পাওয়ায় তিনিই বড় মর্ম্মাহত হইলেন। এই দরিদ্র দেশে এতটা অর্থ অনর্থক নষ্ট হইতেছে দেখিয়া কিছুতেই তিনি নীরব থাকিতে পারিলেন না। ন্যাসনেল কাউন্সিলের মুখ্যব্যক্তিদিগকে বারম্বার বাটীতে আহ্বান করিয়া এই কথা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন এবং ইহার পর যখন গভর্ণমেণ্ট একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন উদ্দেশে কমিটি নিযুক্ত করিলেন তখন তাঁহাদের বিদ্যালয়টি গভর্ণমেণ্টের হস্তে দান করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া ন্যাসনেল কাউন্সিলের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে শিল্পবিদ্যালয়ে দান বন্ধ করিয়া দিলেন—। তাহার পর বিজ্ঞান অর্চ্চনার জন্য উল্লিখিত সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পণ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে—তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। এ জীবনী যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইবে—তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে এখনো তাঁহার জীবনী লিখিবার সময় আসে নাই ভবিষ্যৎ বংশের উপরই তাঁহার মহৎ জীবনের অমরকীর্ত্তি ঘোষণার ভার রহিল; এখন যেসব কথা বলিলে অতি স্তুতিবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে—তখন তাহা অনায়াসে কীর্ত্তিত হইবার সময় আসিবে।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের বয়স এক্ষণে প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। ইহার পিতা ৺কালিকিঙ্কর পালিত মহাশয়ও একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার বাসভূমি ছিল, হুগলি জেলার অন্তর্গত অমরপুর গ্রাম। তিনি অনেকগুলি বড় বড় আফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তখনকার দিনে মুৎসুদ্দির প্রচুর আয় ছিল। কালিকিঙ্কর একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জনই প্রায় তিনি দানধ্যানে ব্যয় করিতেন। বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারকে তিনি জমি ও অর্থদান করিয়া স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রামে ডিস্‌পেন্সরি, ভাল বাঙ্গলা পাঠশালা ও ইংরাজি স্কুল স্থাপিত করেন, এবং অমরপুর হইতে হুগলি পর্য্যন্ত তিনি বহু ব্যয়ে যে সুন্দর পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা আজও তাঁহার দানশীলতার অপূর্ব্ব সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার অমরপুর প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ তুল্য ছিল। অমরপুরের সে সমৃদ্ধি আজ নাই, কিন্তু

কালিকিঙ্করের নাম গ্রামের অধিবাসিগণের হৃদয়ে এখনও দীপ্ত তারকার ন্যায় জ্বলজ্বল করিতেছে! কেবল অমরপুরে কেন তাঁহার নাম, তাঁহার কীর্ত্তি এখনও দেশময় পরিব্যাপ্ত। দরিদ্রছাত্র শিক্ষার জন্য কালিকিঙ্করের দ্বারে হাত পাতিয়া কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরে নাই। বিপন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত লোকে কালিকিঙ্করের কৃপায় মহাদায় হইতে মুক্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিয়াছে।

নিম্নে তাঁহার দানশীলতার আমরা একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।

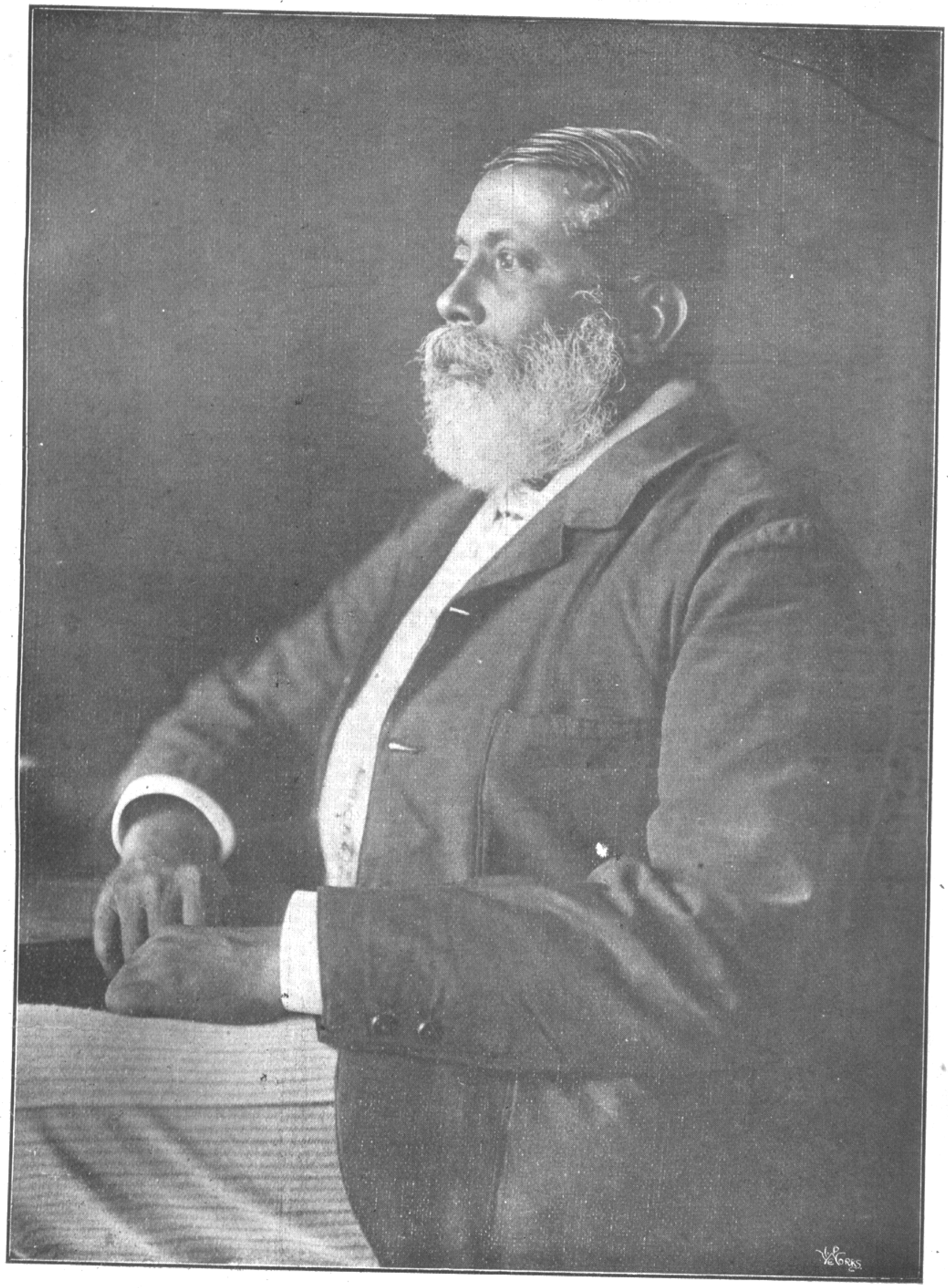
কলিকাতার জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ধনীর সহিত এক ব্রাহ্মণের কোন কারণে বিবাদ ঘটে। ব্রাহ্মণ উক্ত ধনীর নিকট দশ বার হাজার টাকা ধারিতেন। ব্রাহ্মণকে জব্দ করিবার নিমিত্ত ধনী নিতান্ত এক গর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রাহ্মণের পিতৃশ্রাদ্ধের দিন, ব্রাহ্মণ যখন শুদ্ধাচারে শ্রাদ্ধ করিতে বসিবেন, সেই সময় সুপ্রিম কোর্টের সারজন দ্বারা ওয়ারেণ্ট ধরাইয়া ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিবেন, তিনি এই সংকল্প করিলেন। কিন্তু ইত্যবসরে কালিকিঙ্কর এ সংবাদ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের ঋণের সমস্ত অর্থ আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ওয়ারেণ্টের পরিবর্ত্তে সহসা কোর্ট হইতে ঋণমুক্তির পত্র লাভ করিল, ধনী ব্যর্থমনোরথ হইয়া কালিকিঙ্করের শত্রু হইয়া পড়িলেন।

এখন ঠনঠনের যে বাড়ীটি দুর্গাচরণ লাহার সেই বাড়ীটি কালিকিঙ্করের কলিকাতার বসতবাড়ী ছিল। এই বাড়ীতেই তারকনাথ পালিতের জন্ম হয়। পুত্রের জন্মোপলক্ষে দানধ্যানে ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তারকনাথ কালিকিঙ্করের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। ইহার মাতা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ৺সীতারাম ঘোষের পৌত্রী।

অতি অল্প বয়সেই কালিকিঙ্করের মৃত্যু হয় তারকনাথ তখন দুই তিন বৎসরের শিশুমাত্র। উপার্জ্জন প্রচুর হইলেও অতিরিক্ত দানশীলতার জন্য কালিকিঙ্কর পুত্রের জন্য অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, রাখিয়া গিয়াছিলেন শুধু সদ্‌গুণের রাশি। তারকনাথ পিতার সেই গুণরাশি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। পিতার ন্যায়ই ইহার তেজস্বী উদার প্রাণ, করুণার্দ্র হৃদয়! পিতার বিষয় না পাইলেও ইনি মাতামহের সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

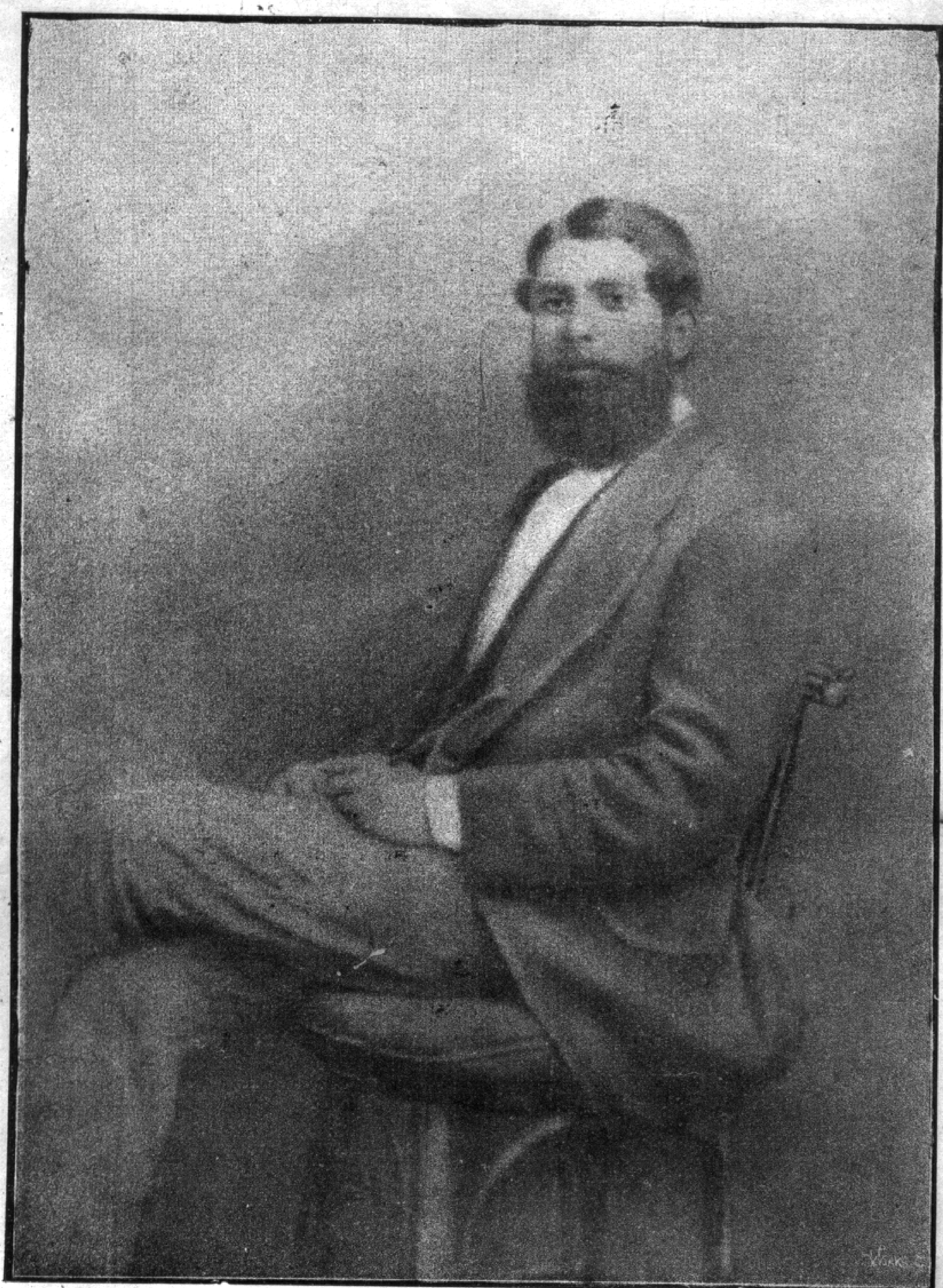
শৈশবে তারকনাথ হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সহপাঠী ছিলেন।

১৮৬৭ সালে তারকনাথ আইনশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে এখানে উকীলের বাড়ী আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৭১ সালের শেষ দিকে ব্যারিষ্টার হইয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার দক্ষতা কেমন অসামান্য ছিল, তাহার পরিচয় দান অনাবশ্যক। তেজস্বী তারকনাথ এতটুকু অন্যায় তর্ক সহ্য করিতে পারিতেন না—জজের সহিত প্রায়ই ইহার বাক্‌বিতণ্ডা হইত! এজন্য ইহাকে কত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি ইনি ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করেন নাই।



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত (৫০ বৎসর বয়সে)

তারকনাথ অসাধারণ বন্ধুবৎসল। যাঁহারা একবার ইঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন তাঁহারা চিরদিনই ইঁহার বন্ধু রহিয়া গিয়াছেন। খোসগল্পেই ইঁহার বন্ধুত্ব চরম সার্থকতা লাভ করে নাই। সময়ে সময়ে বন্ধুগণের জন্য ইনি যে পরিমাণ ত্যাগ



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত (ইংলণ্ডে অবস্থান কালে)

স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অনন্য-সাধারণ। এমন কি, দৈনিক দেড় হাজার দুই হাজার টাকা অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি বিনা অর্থে অক্লান্ত পরিশ্রমে বহুদিন ধরিয়া বন্ধুর মকদ্দমা করিয়াছেন। এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত নহে, এরূপ বহু দৃষ্টান্তে তারকনাথের

কর্ম্মময় জীবন সমুজ্জ্বল। ব্যবহারজীবীর পক্ষে ইহা অল্প পৌরুষের কথা ত নহেই উপরন্তু বন্ধুপ্রীতির ইতিহাসেও এমন দৃষ্টান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে একান্তই বিরল।

ভৃত্য কর্ম্মচারীবর্গের প্রতি এমন কি পশু পক্ষীর প্রতিও ইঁহার স্নেহ অপরিসীম। ভৃত্যদিগের মধ্যে কাহারও রোগ হইলে সেবা ও চিকিৎসার জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন না। পূর্ব্বে যখন সুস্থশরীর ছিলেন তখন তাঁহার কোন ভৃত্য শঙ্কটাপন্ন পীড়াক্রান্ত হইলে তিনি স্বয়ং তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। নিদ্রাসুখ বিসর্জ্জন দিয়া রাত্রিকালে পীড়িত ভৃত্যের মাথার নিকট বসিয়া রোগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, ঔষধাদি প্রদান করিতেন। সে সময়ে একজন বলিয়াছিলেন, "আপনার এত লোকজন রয়েছে কারো উপর ভার দিতেও পারেন, তা না করে নিজে এত কষ্ট করছেন কেন? তাহাতে ইনি উত্তর দিয়াছিলেন, "রোগ শঙ্কটাপন্ন, তদারকের এতটুকু ত্রুটি হলে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে এ অবস্থায় আমি যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন কোন কর্ম্মচারীর হাতে তদারকের ভার দিই, আর তাতে যদি ত্রুটি হয় ত নিজের মনে ত দারুণ অনুতাপ হবেই তা ছাড়া একটা প্রাণ যাবে!" এমন মহাপ্রাণ না হইলে কি জাতীয় শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ এরূপ মুক্তহস্ততা সম্ভব হইত?

ইঁহার শরীর এক্ষণে বিশেষ অসুস্থ তথাপি এ অবস্থাতেও ইনি বন্ধু বান্ধবের কুশল সংবাদ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন না। যখন শরীর সবল ছিল, স্বাস্থ্য হানি ঘটে নাই, তখন বন্ধুবান্ধবের গৃহে কাহারও শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে ইনি কত বিনিদ্র রজনী রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগীর সেবায় কাটাইয়া দিয়াছেন।

তারকনাথ বিলাতগমন করিলেও স্বদেশী ভাষা স্বদেশী ভাব ত্যাগ করেন নাই। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ইঁহার অনুরাগ যথেষ্ট। নূতন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তারকনাথ তাহা সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাম্প্রদায়িক কোনরূপ বিদ্বেষাদি নাই। সাহিত্যমত এমনই উদার হওয়া কর্ত্তব্য! একবার বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ইঁহার টেবিলে একখানি বাঙ্গালা প্রহসন পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি এ বইখানি পড়েছেন কি?" তারকনাথ কহিলেন, "হাঁ, থিয়েটারে খুব সুখ্যাতি পড়ে গেছে শুনছিলুম, তাই আনিয়ে পড়লুম!" আমি কহিলাম, "কেমন পড়লেন?" তিনি কহিলেন, "বড় ভালো লাগল না। রহস্যটুকু বেশ ধারালো নয়, কেমন tame, উপাখ্যানটাও বড় এলোমেলো, দুর্ব্বোধ্য, দু'এক জায়গায় একটু রস আছে কিন্তু—লেখকের অন্য রচনার মত নয়।" আমি কহিলাম, "নব্য সমাজের প্রতি বিদ্রূপ আছে বলে কি ভালো লাগল না, আপনার?" তিনি হাসিয়া কহিলেন, "তা কেন হবে? রহস্য ধারালো হলে সব সময়ই উপভোগ্য! তবে ব্যক্তিগত আক্রমণটা কুরুচিজনক! আমার তা মোটেই ভাল লাগে না।" এরূপ সাহিত্য-রসজ্ঞ কয়জন আছেন?

সর্ব্বোপরি ইঁহার ন্যায় অকপট স্বদেশানুরাগ আমাদের দেশে প্রকৃতই দুর্লভ! বক্তৃতার

ধূমে তারকনাথ ভারতের আকাশ কখনও আচ্ছন্ন করেন নাই, চটপটা করতালিধ্বনিতে তাঁহার দেশপূজা কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে নাই, তাঁহার সেবা নীরবে, তাঁহার পূজা একান্তে। স্বদেশের সকল সদনুষ্ঠানের মূলেই তিনি আছেন। দেশের সকলরূপ কার্য্যেই তিনি মুক্তহস্ত। কত ছাত্রকে যে তিনি শিক্ষার জন্য গোপনে অর্থদান করেন তাহার ঠিক নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিক্ষার দিকে যখন দেশের মতি ফিরিল, তখন তারকনাথ আনন্দে জ্ঞানহারা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরে যৌবনের শক্তি ফিরিয়া আসিল। লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া অর্থ সাহায্য ভিক্ষায় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিয়া জড়েরও চেতনার উদয় হইল। তাহার পরই Technical Institute স্থাপিত হইল। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যহ অন্যান্য সভ্যগণের বাটী গিয়া পরামর্শ, উন্নতির উপায় চিন্তা এই সকল ব্যাপারে তারকনাথের সমস্ত সময় কাটিতে লাগিল। এ সময় এমন হইয়াছে যে প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি আহার ত্যাগ করিয়া আরাম ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া নানাবিধ উপায় অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। এই শুভ পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একদিন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শয্যাগত অবস্থাতেও তিনি মহারাজ কুচবিহার, মহারাজা ময়ূরভঞ্জ, মহারাজা কাশিমবাজার প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। এখন আর বাটীর বাহিরে গিয়া কাজ করিতে পারেন না; তথাপি চিন্তার বিরাম নাই, ঘরে বসিয়াও কর্ম্মে বিচ্ছেদ নাই। দুএক সময়ে তাঁহার পীড়া এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর পুণ্যে সে দুর্ঘটনা ঘটে নাই, ভগবান করুন সেইদিন শীঘ্র না আসুক!

তারকনাথকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ কথা নিশ্চয় বলিবেন, হৃদয় ও মস্তিষ্কের এরূপ বিশালতা বড় একটা দেখা যায় না। কোন বিষয় পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত যদি কেহ ইহার সাহায্যপ্রার্থী হন, ইনি এমন সুমধুর স্নেহে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দান করেন যে নবাগতের সমগ্র চিত্ত শুধু উপদেশের মহিমাতে নহে তাঁহার ব্যবহারে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! তিনি যে পীড়িত তাঁহাকে দেখিলে তাহা সহজে বুঝা যায় না—সর্ব্বদাই এমনই প্রফুল্লমুখ, এমনই হাস্যালাপরত; কেহ দেখিতে আসিলে কত না আদরে স্বাগত করিয়া লন, শয্যাশায়ী হইয়াও আতিথ্য ধর্ম্ম তাঁহাকে কখনও ভুলিতে দেখি নাই। আগন্তুক অভ্যাগতগণকে খাওয়াইয়া যেন পরমানন্দ লাভ করেন। পুরাতন হিন্দুসৌজন্যের আদর্শ ইঁহাতে পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাই।

আজ তারকনাথের জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ মুখরিত! আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার জীবন দীর্ঘ হউক, শরীর নিরাময় হউক—বাঙ্গালীর আশা বাঙ্গালীর ভরসা স্বরূপ হইয়া নানাবিধ উপায়ে আরও বহু কাল ধরিয়া তিনি ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক হউন, তাঁহার আদর্শে ভারতবাসী অনুপ্রাণিত হউক, তাঁহার গুণাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের পরতে পরতে অঙ্কিত থাকিয়া বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তুলুক।

সমালোচনা

মৌনীবাবা। শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবঙ্কবিহারী কর। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ, ঢাকা। মূল্য আট আনা। এখানি স্বর্গীয় সাধু প্যারীলাল ঘোষের জীবন-বৃত্তান্ত। ভূমিকায় প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন, "মৌনীবাবার তীব্র ব্যাকুলতা, গভীর ধর্ম্মানুরাগ, অপূর্ব্ব বৈরাগ্য, নির্জ্জীব প্রাণে জীবনের সঞ্চার করে, নীরস শুষ্ক প্রাণে সরলতা আনিয়া দেয়।" গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এই কথার সার্থকতা আমরা সম্যক উপলব্ধ করিয়াছি। যে সকল ঘটনা-পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে প্যারীলালের জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অনন্য-সাধারণ নহে, তথাপি সে সকল ক্ষুদ্র ঘটনাদি হইতেও তাঁহার জীবন একটি সুমহান্ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেমন বিচিত্র উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া একটা কথা কেবলই আমাদিগের মনে উদয় হইয়াছে, আহার নিদ্রা ও অন্নচেষ্টার মধ্যেই পর্য্যবসিত হইবার জন্য মানবজীবন সৃষ্ট হয় নাই, তাহার মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তাহাকে পরিপূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে, সাধনার প্রয়োজন আছে। ভোগবিলাসই একমাত্র কাম্য পদার্থ নহে, তাহাতেই পার্থিব সুখ নিহিত আছে, ইহা মনে করা ভুল। ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা পরিচালিত জীবনই সুখলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। ভোগবিলাসে তৃপ্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার মাত্রা বাড়িয়াই যায়। ত্যাগ ও সংযমেই পরিতৃপ্তি লাভ হয়। সুগভীর জ্ঞানের উপদেশে প্যারীলালের জীবন-কাহিনী পরিপূর্ণ। সামাজিক ছোটখাট বিষয়েও তাঁহার লক্ষ্য সুতীক্ষ্ণ, সে বিষয়ে তাঁহার উপদেশও সমীচীন। তিনি আপনার ভগ্নীকে পত্র লিখিয়াছিলেন, "জীবনের লক্ষ্য ঠিক রাখিও এবং তদনুসারে চলিও। জীবন প্রস্তুত না করিয়া কখনই জীবনে প্রবেশ করিও না। যখন পিতার কৃপায় স্তুতিনিন্দা সমান হইবে, তখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অধিকার হইবে, নচেৎ পতন অবশ্যম্ভাবী।" এইরূপ বহু অমর উপদেশ-বাণীতে এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। বস্তুতঃ প্যারীলালের চিন্তা ও জীবন-যাপনের প্রণালী মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবর্জ্জিত এই পুণ্যাত্মার জীবন-বৃত্তান্ত সকলেরই একবার পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি ভালই হইয়াছে।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্রব্রাহ্মণ জমিদার। প্রথমখণ্ড। কুমার শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা সাথী প্রেস, ২১।১ পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড়টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে ময়মনসিংহ পরগণার বারেন্দ্রব্রাহ্মণ জমিদারগণের বংশবিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃতই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গ্রন্থকার দেশের ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সত্য-নির্দ্ধারণের জন্য তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। বিস্তর কালেক্টরীর কাগজ, প্রাচীন দলিল ও জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রাদি প্রমাণপ্রয়োগার্থ সংগৃহীত ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি নীরস নহে, সুখপাঠ্য। এ ইতিহাস নামের ফিরিস্তিমাত্র নহে। বাঙ্গলার বহু প্রাচীন অট্টালিকা, দেবমন্দির, গুহা, সুড়ঙ্গ, বারদুয়ারী প্রভৃতির বিবরণীও ইহাতে সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষাও ভাল—বেশ স্বচ্ছন্দ মুক্ত প্রবাহে ছুটিয়াছে, কোথাও রুদ্ধ বা আড়ষ্ট নহে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বরষা

প্রাচীন চিত্র হইতে

ভারতী

৩৬শ বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩১৯　　[৫ম সংখ্যা

আমার বাল্যকথা

৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)

ছেলেবেলায় বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মেশবার অধিকারী ছিলেন না। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়—কিন্তু হায়! এই দুই বিদ্যার কোনটিই তাঁর জীবনে স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী হল না। তাঁর বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছাসে দুইটি কাব্যরত্ন প্রসূত হয়—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্নপ্রয়াণ; তা ভিন্ন গুম্ফাক্রমণ কাব্য (১) ও অন্যান্য ছোটখাট কবিতা অনেক আছে যা সেই সময়কার ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি জানি কি কারণে, বাগ্দেবী চপলা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর নিকট হ'তে সহসা অন্তর্ধান হলেন, বড়দাদা কাব্যামৃতপান হতে বিরত হয়ে তত্ত্ববিদ্যানুশীলনের দুরূহ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হলেন, চিত্রকলার চর্চ্চাও ঐখানে থেমে গেল। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখীন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসল—বাক্সরচনা প্রণালী, আর রেখাক্ষর বর্ণমাল। এতে এত সময় নষ্ট করা হল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখবার বাক্স, পকেট বই—এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়—তাই লেখাপড়ায় দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দাদা লেখবার জিনিস তয়েরির কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাগজের কারুকার্য্য, অন্যদিকে লিখনপ্রণালী সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাক্ষর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্য ব্যবসায়ীর যাতে সময় সংক্ষেপ হয় তাই উদ্দেশ্য। এই দুই সখের বিদ্যায় তাঁর বিস্তর সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। তার জন্যে চিন্তা

---

(১) পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী ভারি ভারি, গোঁপের সেবা করি সুখে বিচরে॥

শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাক্যতত্ত্বের জন্য সমুদায় গণিত শাস্ত্র মন্থন ক'রে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে। সেই নব গণিতশাস্ত্র বারংবার সংস্কারের পর এইক্ষণে কোন এক আমেরিকান পণ্ডিতের হস্তে সমর্পিত হয়েছে, পরীক্ষার ফল কি হয় দেখবার জন্য বড়দাদা পথ চেয়ে আছেন। এই ত গেল বাক্য-প্রকরণ। রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্য্যাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এই রেখাক্ষর পদ্ধতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে—এ বিষয় কেহ জানতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর কোন ছাত্র রেখাক্ষর লেখায় এ পর্য্যন্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। এখনকার সময়ে কোন সুনিপুণ রেখাক্ষর লেখক পেলে আমরা অনেকে ভাগ্য মনে করি।

আমি বাল্যকালে রেখাক্ষর লিখনপদ্ধতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সঙ্কেত লিপিতে টুকে নিয়ে অনেকানেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে পিতৃদেব যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বলবার সময় আমি অমনি নোট করে নিতুম, পরে অবসর মতে বিস্তার পূর্ব্বক লিখে দিলে তিনি সংশোধন ক'রে ছাপাতে দিতেন, পর সপ্তাহে সেই ছাপা কাগজগুলি উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হত—সেইগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন; নূতন নূতন বক্তৃতা, নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রাহ্মসমাজে যেন নবজীবন সঞ্চার করেছে। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে ও আমার পিতা বাঙ্‌লায় উপদেশ দিতেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই লিপিবদ্ধ হয়। আমি ইংলণ্ড যাবার পর পিতৃদেবের বক্তৃতা তুলে নেবার কাজে হেমেন্দ্রনাথ আমার স্থান অধিকার করেন।

বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে কোন কোন সময় গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি আমাদের যুক্তরচনা, কতক বা আমাদের নিজস্ব রচনা।

তা ছাড়া বড়দাদা অনেকগুলি ভাল ভাল হেঁয়ালি রচনা করেছিলেন। তার অনেক ভুলে গিয়েছি দু একটি যা মনে আছে তা এই ঃ—

১—বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সবে যায় বাঁধা।
শেষ দু অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা।
সবটাতে দুই পারে—বেঁধা আর বাঁধা;
মূর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা।

২—বল দেখি দুটি ফল,—
তার ভিতরে পাওয়া যায়
ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সকল।

৩—ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানায় আপত্তি,
সবতাতে ঘাড়নাড়ে, বিষম বিপত্তি।

দু অক্ষরে ফলা এ কি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই। (২)

বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের অনেক ঘরাও কথা তাঁর কবিতার মধ্যে স্থান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে আমাদের ভাইদের এইরূপ বর্ণনা করেছেন :—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ;
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

পণ্ডিত মহাশয়।

এখন উপর হতে প্রচণ্ড পণ্ডিত
ডাকিতে লাগিল হ'য়ে বিষম কুপিত,
হাসি খুসী ঘুরে গেল তখন সবার
দল সাথে ম্লান মুখে চলেন সদ্দার।
পণ্ডিত মুহূর্ত্ত পরে আইল সেথানে।
চসমা বাহির করে পরে সাবধানে ॥
খসিবার ভয়ে তাহা পরিল কসিয়া,
তার পরে যুত ক'রে লইল বসিয়া।
শিষ্যদের আরম্ভিল পরে শিক্ষা দিতে ;
ভূত পালাইয়া যায় কথার ভঙ্গিতে।
"এস দেখি তোমাদের দেখি একবার।
তোমাদের সঙ্গে হ'ল পেরে ওঠা-ভার।
আজ কাল তোমাদের অনিয়ম ভারি,
বাবুকে না বলে আর থাকিতে না পারি ॥
"ভারি নাকি অনিয়ম" ছাত্র এক কয়।
পণ্ডিত হাসিয়া বলে "অনিয়ম নয় ?
লজ্জা করে না তোমার বলিতে ও কথা ?
পড়া শুনা ত্যাগ করি ছিলে সব কোথা ?
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে ব্যালা ?
ছি ছি ছি বিদ্যার প্রতি এত অবহেলা।
যাও প'ড়ে কাজ নাই, কর গিয়ে খ্যালা।
এই ব'লে ঘাড় ধ'রে দিল, এক ঠ্যালা ॥
কৈলাস মুখুয্যে ছিল ব'সে এক কোণে,
মুচকি মুচকি হাসি সব কথা শোনে।
একজন চুপে কহে "হাসিছ যে বড় ?"
কৈলাস ইঙ্গিতে কহে "কর্ত্তা খাপা বড়।"

তেতালায় দুপুর রাত্রি।

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে মজে চরাচর ॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছপালা ঝোপে ঝাপে লুকায় আঁধার ॥
কে কোথায় পড়ি আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই ॥
কীটপতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,
পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছয়ে জীবের লক্ষণ ॥

বরাহনগর উদ্যানে।

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥
দ্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেলা
হর্ম্ম্য হ'তে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
সনমুখ দিয়া সিন্ধু পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়
কেবা তার দুরবস্থা দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,

(২) পাঠকগণ এই হেঁয়ালিগুলি ভাঙ্গিয়া ভারতীতে উত্তর প্রেরণ করুন।

ঝোপ ঝাপে অন্ধকার, নভস্তল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময় ॥
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা,
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥
শাখা পত্র চুলাইয়া, জলপুঞ্জ ফুলাইয়া,
ঝুলাইয়া মাঠ ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান।

শান্তি নিকেতন।

শান্তি নিকেতন, শান্ত সুশোভন,
সুভদ্র হরিত ক্ষেত্র শ্যামকান্ত নিভৃত কানন।
বিমল শোভায়, সরোবর ভায়,
নভসীর বনশ্রীর স্বচ্ছ দরপণ ॥

আমি যে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদা তার কাছে পড়তেন না,—তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ' নাটক রচয়িতা। তাঁর শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃতকাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত পদ্যে একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা। তার কয়েকটি শ্লোক আমার যা মনে আছে তা এই :—

কলিকাতা।

ইংরাজ রাজরাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতং
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্ত্তি তৎ।
পয়ঃ পূরপ্রবাহিণ্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা।
রথ্যা রম্যাঃ সুগম্যাশ্চ যত্র ভান্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি নিবারিতরজশ্চ যা
শতঘ্নীশতযুক্তেন দুর্গেণ দুগ্র্হারিভিঃ
উদ্ভৎ বিদ্যুৎপ্রভাজাল সৈন্যশস্ত্রাস্ত্রশোভিনা।

ত্রিলোক বিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
সুবিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে!
পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনী সম ভায়।
সুরম্য সুগম্য যথা শত পথ ব্যাপি রয়,
চর্ম্মপাত্র গলদ্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।
শত শত তোপযুত দুগ্র্হ দুর্গ রক্ষিত,
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভা-সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত ॥

বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি!—

প্রভাত বর্ণনা।

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
পুষ্পদত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে!
মত্ত মধুপায়িদল আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

টঙ্কাদেবী।

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।

মন্দাক্রান্তা

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্ টা কোট্ টা ধুতি পিরহনে মান রয় না। ১
পিতা মাতা ভ্রাতা নব শিশু অনাথা ছুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কুর্ত্তা বুটপরি,

সিগারে উদগারে মুহুর মুহু ধূম্রলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি। ২
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে ফীমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে। ৩
ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
হুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে। ৪

শিখরিণী

(রেখাক্ষর বর্ণমালা হইতে)

বসন্ত।

মধু ঋতু এল ধরণী মাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধু মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুন্ গুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে পিক॥
ফুলের কে পায় কুল কিনারা
অগণন যেন গগন তারা॥
তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ
কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা গন্ধে মাতায়ে তোলে॥
কদম ছড়ায় কনক রেণু
রাখাল যথায় বাজায় বেণু॥
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চল আর না আজি॥

কৃষ্ণের বিরহে।

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে;
শুষ্কমুখ রাধিকার দুঃখে বুক ফাটে॥
আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার,
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি,
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি॥
কালিন্দীর কূলে ব'সে কাঁদে গোপনারী,
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী॥
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে,
সিন্ধি কাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে॥

মুখ-হস্তের অভিন্নতা।

মুখে হাতে ভেদ নাই সাক্ষী তার তিন।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ॥
ভুজঙ্গের মুখখানি (বরজিয়া দাঁত)
কি সুন্দর মনোহর সুকোমল হাত॥
সাপুড়ের তুম্বি যবে বাজে ঘুরি ঘুরি।
কেমন বুরায় হাত গোখুরা গোখুরী॥
হাতের কায়দা দেখি সবে বলে "বাজী!"
শেখাও করিতে কিন্তু কেহ নহে রাজী॥
বিহঙ্গের চঞ্চুহাত কম নহে বড়।
ছলা-কলা না জানুক কাজে খুব দড়॥
কেউটে গোখুরা আদি মহা মহা ফণী,
সারসের চঞ্চুহাতে খোঁড়া যায় বনি।
হস্তীর হস্তটি এ যে মুখেরই লেজুড়,
জানে না অবোধ লোকে তাই বলে শুঁড়॥
খগে নাগে সাক্ষী মানি লেখে তাই শাস্ত্রে—
ভেদ নাই মুখে হাতে, দশনে নখাস্ত্রে॥

মনুষ্য।

জাতিতে যদিও বনের টিএ
রতন মাণিক মনুষ্যাটি এ ॥
ছার কোএলিয়া ছার পাপিয়া।
মনুষ্যাটি মোর লাখ রুপিয়া ॥
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ।
গাহে রসভরে চাহে যা জিউ ॥
কাণে যাহা শুনে দু একবার,
মন থেকে তাহা নড়েনা আর ॥

পেন্সিল-প্রকরণ।

লেখনী গুজিয়া কাণে পেনসিল্ ধর।
এখন লেখ' যা বলি—লেখ "হর হর" ॥
পেন্‌সিল্ করিতে হয় অত কি ছুঁচালো?
অতিসূক্ষ্মে কোন কাজ উতরে না ভাল ॥
সহজ মধ্যম সুরে বাঁধিবে সেতার।
সপ্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার ॥
বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জিল।
না সরু না মোটা করি কাটিবে পেন্‌সিল্ ॥
রেখাক্ষর হবে তবে আজ্ঞার অধীন।
চাপ দিলে মোটা হবে—ঢিল দিলে ক্ষীণ ॥
পেন্‌সিল্ খণ্ড তোমার মাসেক দুমাস—
নলপত করিয়া চলিবে যেন হাঁস ॥
কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা ॥
ঐ জন্তুটির মত মাস চারি পাটি
নূতন পেন্‌সিল্ দণ্ড লবে যবে কাটি'
তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ ॥

সাধন-পদ্ধতি।

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে;
শিষ্য যুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কাণে ॥
শিষ্যটিরে কাছে ডাকি সম্ভাষিয়া মিষ্ট
সারস্বত যোগাসনে হ'য়ে উপবিষ্ট—
লেখনী করিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
শিষ্যটি হইবে আর উত্তর সাধক ॥
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র ॥
ছিটা ফোঁটা দিবে না রেখাই যাবে টানি।
সঙ্গগুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী ॥
রেখার পোকামাকড় কৃমি বিটকাল,
উচ্চিংড়ি ফড়িং পিঁপড়া পালে পাল,
ক্ষান্ত হো'ক রোসো আগে করি কিলিবিলি;
ধীরে সুস্থে কোরো শেষে ফুটকুনি বিলি ॥
এক মেটে করিয়া করিবে কাজ ফতে।
দো মেটে করিবে শেষে অবকাশ-মতে ॥

সিদ্ধিলাভ।

প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাকাইবে হাত।
দ্বিতীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাত ॥
মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার।
হস্তকে করিবে তার তুরুক সোয়ার ॥
হইবে লেখনী ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া ॥

বড়দাদা গদ্যেও প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সমস্ত একস্থানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাঁর গদ্য-লেখা সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সামাজিক। তাঁর সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে অনেক-কালের কথা, গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস ধ'রে 'গীতাপাঠ' নামক যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী' মাসিকপত্রিকায় আমরা ঔৎসুক্যসহকারে পাঠ করেছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব্ব মৌলিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অবয়বে যখন বেরবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। 'তত্ত্ব-বিদ্যা' হতে আরম্ভ করে এই 'গীতাপাঠ' যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—

এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার লিখিত বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, যেমন "সার সত্যের আলোচনা", "বিদ্যা এবং জ্ঞান", "হারামণির অন্বেষণ" দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তবাদ (evolution) বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত ইত্যাদি—এদের কতক ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কতক বা সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। উহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ—হয়ত কোন একটা বিষয়ের অবতারণা করে তার আদ্যোপান্ত লিখে শেষ করা হয়নি, কোনটা অর্দ্ধাঙ্গ, কোনটা বিকলাঙ্গ, ভগ্নাবস্থায় অমনি পড়ে আছে—এ সকল ভাল করে দেখে শুনে গড়েপিটে নেওয়া আবশ্যক। দার্শনিক ছাড়' সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন সোনার কাটি রূপোর কাটি, আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা, একটি প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। বড়দাদার এই লেখাগুলি উদ্ধার হয় আমার অনেকদিনকার সাধ—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই রইল—তা পূর্ণ হবার কোন পন্থা দেখছিনে। আসল কথা হচ্ছে—এ ভার নেয় কে? দুটি লোক আমার মনে হচ্ছে—তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধীমান্ সুধীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ, এঁরাই এই ভারগ্রহণের অধিকারী এবং উপযুক্ত পাত্র। উভয়েই সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যজগতে স্বনামখ্যাত,—উভয়েরই সময় আছে, সামর্থ্য আছে, এই কার্য্যে যা যা চাই সকলি আছে—এঁরা বড়দাদার লেখাগুলির সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ। এ অনুরোধ কি ইঁহারা রক্ষা করবেন না? সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বহুমূল্য রত্নগুলি প্রলয়সাগরে ডুবিতে দেওয়া কি লজ্জার কথা নহে?

পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার যে একটী মাধুর্য্য, প্রসাদগুণ, একটী বিশেষত্ব, একটী মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁর লেখা সকল যে পর্য্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হতেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ভাবগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটী পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ ক'রেছিল), আমরা সকলে তাকে কাল' দাই বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে একটী কবিতা শোনাচ্ছিলেন; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়দাদার কাছ থেকে কার্য্যগতিকে অনেক দিন পৃথক্ হয়ে পড়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস, শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ, ক্ষণে

তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণ' সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায় ? 'তে হি নো দিবসাগতাঃ'—সত্য কিন্তু মনোরাজ্যে সে সব দিন চিরদিনই জ্বলন্ত রয়েছে। আমাদের সে কালের দু একটি ঘটনা এখনি মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটী ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তাঁর উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে ; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হল না তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এ দিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হস্তে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতি-পূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালি গালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।—বড়-দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোকে বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এ দিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড় দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেক-ক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড় দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পীঠ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন। বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যেমন সাধু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউল খাকী আয়না ঠোকরাণী' এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তার গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইঁদুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড় কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলস্থূল বেধে গেল! সে কোথায় খোঁজ্ খোঁজ্। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হল, তারা দ্যাখে সে কাক কোন্ একটা দূরের গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

বড়দাদার যা নিত্য নিয়মিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—তা চিরকালই সমান চলছে—শীতে গ্রীষ্মে রোগে অরোগে তার আর বিরাম নাই। তাঁর জ্বর কি কোন অসুখ হলে সেই



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

স্নান বন্ধ করবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা অনুনয় বিনয় করা যায় কিন্তু ভোরে উঠেই সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। ঠাণ্ডার বদলে গরম জল কোন কালেই তার মনোনীত হয় না। বড়দাদাকে ব্যামোর সময় ঔষধ পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখায় মগ্ন হয়ে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার নিয়ম ভুলে যান —এই বয়সে তাঁর শরীরে আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না। এখন শরীর সেবায় বিশেষরূপে মনোযোগ দেবার সময় এসে পড়েছে। তিনি নিজেই তা বুঝতে পেরেছেন;—এক একবার বলেও থাকেন—আর না! কিন্তু কাজে এ কথার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগদত্তা

(৯)

শচীকান্তের মাসিমা গিরিজাসুন্দরী অনেক পয়সার মালিক। গ্রামের মধ্যে তাঁহারা এক রকম জমিদারের মতনই ক্ষমতাপন্ন। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ দোল দুর্গোৎসব সবই হয়। জেলাকোর্টে মামলাটা আস্‌টা তদারকের জন্য একজন উকিলও নিযুক্ত আছে। দেহুড়িতে দ্বারবান ও বাহির মহলে গোমস্তা নায়েব সরকারেরও অভাব নাই।

বিষয়ের মধ্যে অধিকাংশই নীলজমি, নদীর চরে ফসলও বড় মন্দ ফলে না, ধানের ক্ষেতে প্রতি বৎসর মা কমলা নিজে আসিয়া আঁচল পাতিয়া দেন। সেই সোনা-ফলা জমীগুলির উপর চারিদিককার লোকেরই শ্যেনদৃষ্টি কিন্তু গিরিজা সুন্দরীর কড়া তদারকে এপর্য্যন্ত কেহ ইহার মধ্যে কড়ে আঙ্গুলটিও গলাইতে সক্ষম হয় নাই। একবার নায়েবটা কিঞ্চির টাকা লইয়া কি একটা ফেসাদ বাধাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কর্ত্তাঠাকুরাণী পিঠের আঁচল মাথায় তুলিয়া দিয়া দৃঢ়পদ বিক্ষেপে সম্মুখীন্ হইয়া অবিচলিতকণ্ঠে আদেশ করিলেন 'খাজনার বাকি টাকা কোথায় আছে শীঘ্র এনে দেও" সেই মুহূর্ত্তেই যাদু বশীভূত আত্মার ন্যায় ধূর্ত্ত নায়েব বাক্‌শক্তিহীন শিশুর মত নিঃশব্দে তহবিল ভাঙ্গা টাকাগুলা নিজের ক্যাসবাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল। গিরিজা তাহাকে একটী ভর্ৎসনা করিলেন না, বা স্বামীর নিকটেও কোন কথা জানাইলেন না। ভীত নায়েব প্রতি মুহূর্ত্ত সংশয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিল। না তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, না পুলিস-সোপর্দ্দ করা হইল! একি অদ্ভুত দয়ার দণ্ড!

কিন্তু এই যে সুযোগটুকু তাহাকে দেওয়া হইল ইহা তাহার জীবনের একটা মাহেন্দ্র-যোগে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘটনা হইতেই মানুষটা অসম্ভব রকম বদলাইয়া গেল। সে নিজের মহাপাতক আজীবনের অনুতপ্ত প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইল। তাহারই যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা নদীর সঙ্গে একটা খালের পুরাতন সংযোজককে পুনরুদ্ধার করিবার পর রত্নপুকুরে রত্ন ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহায়তায় বুদ্ধিমতী বিধবাকে কোন রূপ বৈষয়িক হাঙ্গাম পোহাইতে হয় নাই।

গিরিজাসুন্দরীর পুত্রসন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা কল্যাণীর বড় লোকের বাড়ী বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার ঘরের সে যেমন একমাত্র মেয়ে সে ঘরেরও সেইরূপ সে একটি মাত্র বউ। কাজেই মায়ের কাছে থাকা কাহার বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। গিরিজাসুন্দরীর সাধ মেয়েটি ছয় মাস বা শ্বশুরবাড়ী রহিল, ছয় মাস বা তাঁহার কাছে রহিল, কিন্তু বেহাই ইহাতে একেবারে নারাজ। তিনি এবার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার বউকে তিনি হাড়ি ডোমের মত কথায় কথায় হট করিয়া পাঠাইতে পারিবেন না।

গিরিজাসুন্দরী রাগ করিয়া দিন কতক ফুলের রাশি ও চন্দনের ভার দেবতার উপর অধিক পরিমাণে চাপাইয়া পূজার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন "আমার কি আমি কাকে চাই? তুমি তো আর কোথাও যাবে না ঠাকুর, তোমাকে পেলেই আমার হলো।" পদ্মবীজের মালাগাছা জপের ঘটায় দেখিতে দেখিতে চকচকে হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের ঝোঁক মানুষ খুব বেশি দিন ধরিয়া রাখিতে পারে না আর পরিবর্ত্তিত হওয়াই প্রকৃতির ধর্ম্ম। চক্র যখন ঘুরিয়া আসিল হঠাৎ তাঁহার মৌন-বিদ্রোহ ভঙ্গ করিয়া প্রবল রজঃশক্তি আপনার বিজয় ঘোষণা করিল। আগা-গোড়া তেতালা বাড়ীটা বর্ষার বাতাসে হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া তাঁহার নিকটে নালিশ রুজু করিল, বলিল একজনকে—অন্ততঃ একজনকে চাই। তা নইলে ঘর সংসার এমন কি ঠাকুরের আরাধনায় পর্য্যন্ত বুঝি ব্যাঘাত পড়ে।

দ্বারে দ্বারে কুলুপ লাগাইয়া নায়েব মহাশয়ের হাতে চাবি ও সংসারের ভার অর্পণ করিয়া একদিন ভোরের ট্রেনে দাসী ও সরকার সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। গঙ্গামণির সঙ্গে বহুদিন সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু তাঁহার ছেলেরা সর্ব্বদাই তাহাদের মাসিমার গৃহে যাওয়াআসা করিত। ছোট শচীকান্তের উপরেই তাঁহার বিশেষ একটু টান, কেননা ছুটীর সময়টা সে বরাবরই প্রায় পিতৃগৃহের দৈন্যাপেক্ষা মাসিমার ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য পছন্দ করিত। ইদানীং বৎসরখানেক হইতে যাওয়া আসা কিছু কম পড়িয়াছিল।

গঙ্গামণি বোনের দাবী শুনিয়া মনে মনে অনেকখানি সন্তুষ্ট হইলেও একটুখানি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। উমাকান্ত কিছুক্ষণ চিন্তা-যুক্তভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন, তার পর ডাকিলেন "ভক্তিনাথ!"

"আজ্ঞে!" বলিয়া উত্তর দিয়া ভক্তিনাথ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, "তোমার মাসিমার প্রস্তাব শুনিয়াছ?"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি ইচ্ছা?"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "আমার তো ভালই

মনে হয়। উঁহাকেও তো একজনের দেখা উচিত, শচীই মাসিমাকে দেখাশোনার ভার লউক্।"

উমাকান্ত পুত্রের উত্তরে একান্ত প্রীত হইলেন। তাহার মুখের উপরে দৃষ্টি রাখিয়া প্রসন্ন মুখে কহিলেন, "তবে তাঁকে এই কথাই বলি? তিনি ওকে কিছু বিষয়ও লিখে দিতে ইচ্ছে করছেন, তুমি কি তাও ভাল মনে করো? শচীর ধরণ ধারণ কত বদলে যাচ্ছে তাকি লক্ষ্য করেছ?"

ভক্তিনাথ তাহা বিশেষরূপেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার নিকট ভ্রাতারদোষের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র কহিলেন, "এখনকার দিনে চাকরীর তেমন সুবিধা নাই, ও ইংরাজী পড়ে ওর তো কিছু একটা সুবিধা পাওয়া চাই। মাসিমা ভাল কথাই বলেছেন।"

উমাকান্তও এবিষয়ে আর কিছু বলিলেন না। তিনি ভাবিলেন সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে গঠিত হয়, প্রথম হতে বাধা দিয়েও ত আমি কিছুই করতে পারিনি। গিরিজাসুন্দরীকে গিয়া কহিলেন "একটা কথা শুনবে?"

গিরিজা দন্তদ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন করিলেন, "ওমা সে কি কথা! আপনার কথা শুন্‌বো না!"

"শচীকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন তার হাতে বেশি ক্ষমতা দিওনা, টাকাকড়ি ইচ্ছামত যেন সে খরচ করতে না পারে এইটুকু লক্ষ্য রেখো।"

গিরিজা কহিলেন "এতো ঠিক কথাই।"

নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিল। এ কি রকম ব্যবস্থা হইল! ইহাকে একচোখোমী ভিন্ন কী বলা যাইতে পারে! কর্ত্তাগৃহিণীর ছোটছেলেই সব, বড় যেন কেহই নহে। আজন্ম ধরিয়া বড়র সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছেন এবারও তাহাই করিলেন। ইংরাজী শিখিল ছোট, কলিকাতায় থাকিবে, ভাল চাকরী করিবে সেই, আবার মাসির অতটা বিষয় সে-ই ভোগ করিতেও চলিল! কেন তাহারা কি বাণের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? রাত্রে স্বামীকে কহিল 'এবার মাসিমার সঙ্গে দিনকত তুমিই কেন যাও না! তাঁর শরীর-অসুখ ছোটবাবুর দ্বারাতো আর সেবাযত্ন ঘটবে না, উল্টে তাঁরি যত্ন করতে হবে। ওঁকেও তো দেখা উচিত।'

স্বার্থপর পত্নীকে পরের জন্য ভাবিতে দেখিয়া ভক্তিনাথ একটু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যে তাঁহার ভাইএর প্রতি যে একটা খোঁচা ছিল সত্য হইলেও ইহা ভক্তিনাথের ভাল লাগিল না। গম্ভীর মুখে কহিলেন "না। সেই বরঞ্চ আমার চেয়ে মাসিমাকে বেশি যত্ন করতে পারবে, বরাবর ওঁর কাছে সেই থাকে।"

কণ্ঠস্বরে স্বামীর মনের খবর পাইয়াও আজ বড়বধূ আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। একটু ঝাঁকিয়া কহিলেন, 'গেলে নিজেরি ভাল হতো, গলায় এই সংসার করে দুদশটা বিদায়ের টাকায় কি চিরকাল চলবে? বলে মানুষের কুটুম এলে গেলে। সে সকল দিকেই জিতে গ্যালো।" বড়বধূর যে মন ভাল নয় ভক্তিনাথ ইহা প্রথম হইতেই

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষিও চলিত। তিনি স্ত্রীর স্বভাব যে বদল করিতে পারিবেন এ আশা তাঁহার মনে ছিল না—কারণ তিনি জানিতেন, যে যেরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে তাহা তাহার জন্মান্তরীন্ কর্ম্মসূত্রে পাওয়া, নিজের প্রবল চেষ্টা ভিন্ন অপরে এ ইচ্ছা করিতে গেলে তাহার ভাগ্যে নিরাশালাভ অনিবার্য্য। কিন্তু স্ত্রী নিজের সঙ্কীর্ণ মত তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবে ইহা তিনি কোনদিনই সহিতে সম্মত ছিলেন না। কহিলেন "সেতো সুখের বিষয়! শচী আমার ছোট ভাই তার উন্নতির জন্য আমার চেষ্টা করবার কথা! তোমার মনটা একটু ভাল করবার চেষ্টা কর বড় বৌ, ছোট দেওরের উপর অত হিংসা থাকা ভাল নয়।"

বড়বধূ অভিমানে ছল ছল চোখে রুদ্ধস্বরে কহিলেন 'আমার যেমন পোড়াকপাল তাই ভাল ভেবে একটা কথা বল্‌তে যাই। বলি আর তো কেউ পোহাতে আসবে না, সেই আমাকেই তো চার চালের ভার মাথায় করতে হবে? ওই যে আইবড় একটা মেয়ে খেয়ে খেয়ে হাতী হচ্চে, ওটাকেও তো পার করা চাই, দু'পয়সা না সংস্থান হলে কেমন করে কি হবে? তুমি মনে কর আমি কেবল নিজেরি জন্যে ভাবি।'

'সেজন্যে তুমি ভেবো না। গৌরীর বিয়ে শচীও তো দিতে পারবে, ওসব পরের কথা পরে—এখন কেন মিথ্যে ভেবে মাথা খারাপ করচো?' ভক্তিনাথ উঠিয়া গেলেন। এই সব ছোট বিষয় লইয়া স্ত্রীর সহিত কথা কাটাকাটি করা তাঁহার ইচ্ছা নয়, কিন্তু স্ত্রীর মন এখনও

বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, এমন ঘরের বধূ, এতগুলি ছাত্রের মাতৃস্থান যে একদিন অধিকার করিবে তাহার কতখানি উদার হওয়া প্রয়োজন!

(১০)

মণীশ ও শচীকান্ত কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া প্রথমাবধি এক বাসাতেই থাকিত কিন্তু মধ্যে একবার মণীশের অসুস্থতার জন্য কিছুদিন তাহাকে পড়াশোনা বন্ধ রাখিতে হয় সেই সময় শচীকান্ত মেসে বাসা লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে কলিকাতায় ফিরিয়া মণীশ একটা ছোট রকম বাড়ী খুঁজিয়া তাহার লগেজপত্র একখানি গাড়ীতে তুলিয়া পুরাতন ভৃত্য পাঁচকড়িকে নুতনবাসায় চালান করিয়া দিয়া নিজে পায় হাঁটিয়া শচীকান্তের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন স্নানের সময়, ছেলেরা কলের চৌবাচ্ছা ঘেরিয়া কেহ কৃষ্ণঅঙ্গে ঘনঘন সাবান ঘষিতেছে, কেহ তোয়ালের ঘর্ষণে গৌরমুখ লাল করিয়া তুলিয়াছে, আবার কেহ কেহবা জানু পর্য্যন্ত খাটো ধুতী পরিয়া অঙ্গে দিব্য করিয়া তৈল মর্দ্দন করিতেছে। রান্নাঘর হইতে ছ্যাক্ ছ্যাক্ করিয়া মাছভাজার শব্দ আসিতেছিল, বুড়ো ঝি বামুনঠাকুরের উদ্দেশে বকিতে বকিতে মুড়োঝাঁটা দিয়া স্বল্পপরিসর দালানটুকু ঝাঁটাইতেছে, সেইখানে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া কয়জনে ঠাকুরের রান্না কৃষ্ণবর্ণ জলবৎতরলং ডাল ও অর্দ্ধভাজিত

সারাদিনের কাজ সারিয়া লইয়া কলেজ বা আফিস ছুটিবে।

শচীকান্ত স্নান সারিয়া একখানা হাত আয়না ধরিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, এমন সময় মণীশ আসিয়া বলিল "শুনে যাও।"

শচীকান্ত আয়না চিরুণী রাখিয়া সার্টটা গায়ে দিয়াই সিঁড়ি দিয়া মণীশের সঙ্গে উপরে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল 'কি?' মণীশ কথা না কহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া দুইটা ঘর পার হইয়া শচীকান্তের গৃহে প্রবেশ করিল। শচীও তাহার সঙ্গে ছিল। কহিল "আমাকে এবারও কি একা ফেলে রাখবে?"

শচীকান্ত কহিল "সে তোমার ইচ্ছা। তাহার স্বর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। 'আমার ইচ্ছা!' মণীশ বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ হইল। "তুমি কি ভেবেছ জানিনা, কিন্তু আমি তোমার কাছে যথার্থ বলছি আরবারে তোমায় আমি---আমি লজ্জায় বল্‌তে পারিনি; ভাই আমায় ক্ষমা করো—" লজ্জাজড়িত বেদনায় সে বন্ধুর হাত ধরিল। "তুমিতো জানো ইচ্ছা না করেও আমাকে অনেক সময় বোঝবার ভুলে অনেক দোষ করে ফেলতে হয়, তাবলে রাগ করে থেকোনা ভাই চলো।"

শচীকান্ত একটু ভাবনায় পড়িল। তাহার অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। বাড়ী হইতে যে সাহায্য পায় তাহাতে তাহার এমন কি এই ক্ষুদ্র মেসের ঘরটিতে বাস করাও ক্লেশসাধ্য। অথচ আশৈশব হইতেই স্বাচ্ছন্দ্য জিনিষটার উপরে এম্‌নি একটা তীব্র আকর্ষণ আছে যে এই অভাবগ্রস্ত জীবন তাহার মণীশের সহিত একবাসায় কাটাইয়া আসিয়াছে। খাওয়া শোয়ার সেখানে কোন খরচই নাই। নিজের টাকাটা শুধু পরার উপর ব্যয় করিতে পারায় সে পক্ষেও যথেষ্ট সুবিধা ছিল। বাঁধান কবিতা-পুস্তক কিনিবার প্রয়োজন হইলেই সে বন্ধুর কাছে বরাবর উপহার পাইয়া আসিয়াছে সেখানেও সুবিধার সীমা ছিল না।

সেইজন্যই মণীশের সঙ্গছাড়া হইয়া তাহাকে প্রথম প্রথম কিছুদিন অত্যন্তই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। মেসের কদন্ন এবং বায়ুরুদ্ধ ক্ষুদ্র গৃহ হইতে মোটা কাপড়, ছেঁড়া জুতা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে তাহার প্রকৃতি অসহায়রূপে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার চেয়ে বেশি এই পয়সার মধ্যে ঘটিয়া উঠা দায়। দাদাকে জানাইয়া দুইটিমাত্র টাকা বাড়িল এবং এক পত্র আসিল তাহাতে চিরদিনের বাঁধা গৎ—দীর্ঘচ্ছন্দে উপদেশ যথেষ্ট ছিল, তাহার সারমর্ম্ম এই যে ছাত্রজীবনে কঠোরতা শিক্ষা প্রয়োজন, বিলাসিতা নয়। ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া শরীর ও মন দৃঢ় করিয়া লইবার এই শুভাবসর! ইত্যাদি কথাপূর্ণ পত্রখানা সে তাচ্ছিল্যের সহিত দূরে নিক্ষেপ করিল। এসব কথা সে ঢের শুনিয়াছে!

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুদিনের পর এক বড়লোকের বাড়ী একটা মাষ্টারি যোগাড় করিল। ইহাতেও অনেক অসুবিধা, যদি বন্ধুবান্ধবেরা তাহার এই ক্ষুদ্র কার্য্যগ্রহণ টের পায় তবে আর তাহার আসল অবস্থা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না, এই ভয়ে

করিতে লাগিল। কিন্তু সেই আট বছরের আদুরে ছেলেটিকে ফাষ্ট বুক পড়ান যত সহজ ভাবিয়া সে মাসিক দশটি টাকাকে উপরিলাভ মনে করিয়াছিল হাতে কলমে লাগিয়া দেখিল ব্যাপার তেমন সোজা নয়। হপ্তা ঘুরিয়া আসিলেও প্রথম দিনের পড়াটুকু ছাত্রটির নিখুঁৎরূপে তৈরি হইল না; ধমক ধামক করিতে গেলেই ছাত্রটি চোখমুখ রাঙ্গাইয়া উল্টা ধমক দেয় 'আমার মনে থাকে না আমি কি কর্‌বো?' আরও দুপাঁচদিন চেষ্টা চরিত্র করিয়া শচাকান্ত তাহার অভিভাবককে গিয়া বলিল 'আমিতো কিছুই করতে পারছিনে, মিথ্যে কেন আপনাদের টাকা নষ্ট করাই!

সে একটু বাজাইতে পারিত, সঙ্গীত সম্বন্ধেও কতকটা জ্ঞান ছিল,—দ্বিতীয় স্থানে জুটিল একটি সঙ্গীত শিক্ষার্থিনী বালিকা। সা' রে' গা' মা' অভ্যাস করিতে করিতে কচি অঙ্গুলি কয়টি বিস্তৃত করিয়া দিয়া বালিকা করুণ দুটি চোকে জল আনিয়া রোজই তাহাকে বলিত 'আজ ছুটী দিন মাষ্টার মশাই, আজ আঙ্গুলে বড় ব্যথা।" যেদিন ছুটী না দিয়া শিক্ষক শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ছাত্রীকে ছুটীর অপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে যাইত সেদিন চোখের জলে বাজনাটা ভিজিয়া উঠিত ও গলা ধরিয়া ক্ষীণস্বর মিলাইয়া পড়িত। দেখিয়া শুনিয়া সে চাকরী এবং চাকরীর চেষ্টা দুইই ছাড়িয়া দিল। তৃতীয় স্থানে আর পরখ করিয়া দেখিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এই সময় হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটিল। তাহার লিখিবার ক্ষমতা আছে কাহার কাছে জানিতে পারিয়া বেশ [illegible] হঠাৎ একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাঁহার কাগজে লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সহসা সে একটা ফন্দি আঁটিয়া ফেলিল, কহিল "আমার সময় ভারী কম, লেখার বিশেষ সুবিধা দেখিনে। অমুক কাগজের সম্পাদক আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চাইচেন, তাই-ই আমার সুবিধা হয়ে ওঠে না।

সেই কাগজখানা এই সম্পাদকের বিপক্ষে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকায় উভয়তঃই একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল। সম্পাদক নিজেকে তাহার চেয়ে বাড়াইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ঝাঁ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তার আর কি, আমি আপনাকে ওদের চেয়ে বেশি দেবো।"

এমনি করিয়া শচীকান্তের অনেকখানি গুছাইয়া চলিতে হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ মণীশের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। এ সাদর আহ্বানলিপি সে কোন মতে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। একবার মনে হইল যে পূর্ব্ব অভ্যাসটা সে একটু একটু ভুলিয়া আসিয়া একটা স্বাবলম্বনের সুখ সম্ভোগ করিতেছে তাহাকে আবার সেই ধীবরের গল্পের দৈত্যটার মত কলসীর আবদ্ধ মুখ খুলিয়া জাগাইয়া তোলা কেন? মণীশ তাহার দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরের খবর তাহার মুখের ভাবেই পাঠ করিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্ন-ভাবে কহিয়া উঠিল, "আপত্তি করবে কিনা তাই ভাবছ? কেন শচী আমি কি দোষ করেছি!" শচীকান্ত আর থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ মণীশের হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগের সহিত কহিয়া ফেলিল,

মণীশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বাহিরে একটা গোলযোগ উঠিল। বহুকণ্ঠের উচ্চহাস্য ও একসঙ্গে সিঁড়ির উপর অনেকগুলা দ্রুত পদধ্বনি একটা কিছু নূতন ঘটনার সংবাদ দান করিল বিস্মিত দুইবন্ধু বাহির হইয়া আসিতে না আসিতে অনেকগুলা উল্লাস অভিনন্দনের সহিত যে সংবাদটা জানাগেল তাহা এই—

শচীকান্তের মাসি তাহাকে পুত্রস্থানীয়রূপে তাঁহার নিকটে রাখিতে চাহেন অবিলম্বে একবার যাইতে হইবে, তার আসিয়াছে।" সকলেই জানিত এইমাসিটি অসাধারণ ধনবতী।

(১১)

বৈচিত্র্যময় জগতের বিবিধ বিচিত্রতার মধ্য দিয়া কখন কোন্ একটি প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগ্রত করিয়া,প্রকৃতি ঠাকুরাণীর যাদুকরী তির্য্যকগতি বায়ুস্রোতের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া যায় তাহা কেহ ধরিতে না ধারণা করিতেও পারে না। মণীশ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে নিজেকে জনস্রোতচঞ্চল রাজপথে বাহির করিয়াছিল তখন হস্তে সদ্যপ্রাপ্ত স্বর্ণপদক এবং অঙ্গে কনভোকেসনের সম্মান পোষাক। কিন্তু সেই বেশে দেশের দশের নিকট আদৃত হইয়া আসিয়া সার্থকতার সুখ ও বিজয়গৌরবের মাঝখানেই হঠাৎ তাহার মনে উঠিল এখানে প্রবেশ এই তাহার শেষবার। জনকোলাহলমুখরিত রাজপথের দৃশ্যটি তাহার অন্তঃকরণের মধ্যস্থ একটি সুপ্তস্থানকে যেন সোনার কাঠির স্পর্শ দ্বারা চকিতে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, এই যে বইএর বোঝা গুলা সে নিত্য বহিয়া বেড়ায় যাহার জ্ঞান তাহার সমস্ত জীবনব্যাপী কালের মধ্যেই হয়ত কোন কাজে লাগিবে না। মনের সঙ্গে এবং মতের সহিতও যাহাদের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই সেই গুলাকেই ইহজীবনের চিরসঙ্গী রূপে গ্রহণ করিয়া রাত্রির পর রাত্রি ও দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেই কি এই দুর্ল্লভতর মানব জীবন লাভ ঘটিয়াছে।

সেদিন বাসায় ফিরিয়া গিয়াও এই কথাটাই সে ভাবিতে লাগিল। যেটুকু প্রয়োজন ছিল তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন নিজের ঘরের জানালা দ্বার খুলিয়া দিয়া আকাশের ছড়ানো আলোককে নিজের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইতে হইবে, বাতির আলোক মাগিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন আর নাই।

বাড়ী ফিরিয়া শিবনারায়ণকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি দুইহাতে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মস্তকে চুম্বন করিলেন। আনন্দাশ্রু গভীর শোকাশ্রুর মতই চাপিয়া রাখিয়া কোন মতে বলিলেন, "সুপুত্রের দ্বারায় কুলধন্য হয়। মণীশ দুঃখ শুধু দাদা আজ নেই।" মণীশ খুল্লতাতের গভীর স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ের বিচলিত রুদ্ধস্বরে অতুল আনন্দ কৃতজ্ঞতায় যেন দ্রবীভূত হইতেছিল। সে শিশুর মত সহসা আপনার মস্তক তাঁহার সুখ দুঃখের আলোড়নে যুগপৎ আলোড়িত বক্ষে রাখিয়া মন্ত্রাবিষ্টের মত বলিয়া ফেলিল 'তিনিতো আছেন।' শিবনারায়ণ হঠাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখের উপর যেন একটা সূর্য্যালোকের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন 'মণীশ এই জন্যই শাস্ত্রে পুত্রকে নরকত্রাতা বলেছে।

তুমি আমাকে আজ মস্ত জ্ঞান দিয়েছ।' মণীশ হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, খুড়ার কথায় সে আরো লজ্জা পাইল।

দয়াময়ী কহিলেন 'বাবামণি! তুমি এলে, আমি বাঁচলুম বাবা, অস্থির হয়ে উঠেছি। তুমি ওকে কি করবে কর।"

মণীশ খুড়িমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "হ্যাঁ এইবার তার বিচারভার আমিই নেবো খুড়িমা, তোমার আজ থেকে ছুটি।"

কথাটার আসল মানে না বুঝিলেও খুড়িমা মনে মনে প্রীত হইলেন।

দুচারদিন কাটিয়া গেলে একদিন শিবনারায়ণ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন "এবার তুমি কি করবে স্থির করেছ?" মণীশ কয়দিন ধরিয়া এই কথাটাই তুলিবে তুলিবে মনে করিতেছিল, হঠাৎ গায়েপড়াভাবে গুরুজনের নিকট নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। এখন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল "যে রকম আদেশ কর্বেন।" "সেতো বটেই, তবু তুমি কি ভাল মনে করো বলো দেখি, পরামর্শ করে দেখা যাক।"

মণীশ নতমুখে কহিল "কলেজে না পড়ে এইবার সার্ব্বভৌম মশায়ের কাছে কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করলে হয় না?"

ঠিক এই কথাটাই শিবনারায়ণের নিজের মনেও অনেকবার উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি অতি যত্নেই তাহা মনের ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ শিবনারায়ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে তাঁহার ইচ্ছা মণীশের নিকট বাসনা অবলীলায় পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাধ পূর্ণ করিতেই ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। মনটা বড়ই প্রফুল্ল হইল। তাঁহাদের বংশে সকলকারই প্রায় একরূপ মন,—ইহা বংশাভিমানী আর্য্য সন্তানের পক্ষে বড় কম গৌরবের বিষয় নয়। কহিলেন "আমার মনে হয় তোমার ইচ্ছার চেয়ে কোন বড় ইচ্ছা আর কারু হতে পারে না। এসো আজই আমরা সার্ব্বভৌম মশায়কে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি চেয়ে নিই গে। কিন্তু তোমার খুড়িমারও তো মত নিতে হবে।"

মণীশ খুড়িমার উদ্দেশ্যে উঠিয়া গেল।

কিন্তু দয়াময়ীর সম্মতি বড় সহজে আদায় হইল না। তিনি কথাটা এমনি ছোট করিয়া ধরিলেন যে, যেন মণীশ এইরূপ প্রস্তাব তুলিয়া তাহার ফলনোন্মুখ আশালতার একেবারে গোড়া ধরিয়া কাটিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি কহিলেন এও কখন হতে পারে। ভট্টচায্যি মশাই দেবতা, স্বয়ং ভগবান,—কিন্তু তাই বলিয়া মণীশ—ওরে বাপরে তাঁহার দুধের ছেলে সে কোন দুঃখে টোলে বসিয়া পূজার মন্ত্র শিখিবে! কতদিন ধরিয়া আশা করিয়া রহিয়াছেন সে তাহার কাকার মত একটা বড় চাকরী করিবে, তিনি নূতন চণ্ডীমণ্ডপে মাকে আনিয়া জন্ম সফল করিবেন। অকাতরে কাঙ্গাল অতিথি আনিয়া পেট ভরাইয়া চিঁড়ে দধির আহার দিয়া প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া লইবেন। তাহার পর আবার কোন একটি বড় মানুষের চাঁদের মতন মেয়ে বধূরূপে গৃহে আনিয়া পাড়ার লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিবেন। এও কি আবার একটা কথার মত কথা হইল—সে

কিন্তু মণীশের খুড়িমা নারী হইলেও হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্নেহময়ী মাতা এবং সতী স্ত্রী কাজেই স্বামী পুত্রের ইচ্ছার মধ্যে নিজের তীব্রবাসনাকে বিসর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার হইল না। কহিলেন "তোদের যাতে সত্যিকার ভাল হয় তাতেই আমি সুখী আমার আবার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিসের!"

(১২)

অপরাহ্ণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চণ্ডী মণ্ডপে সে দিন একটি ছোট রকম সভা বসিয়াছিল। টোলের ছাত্রগুলি তো আছেই তদ্ভিন্ন প্রতিবেশী দুচারজন বিজ্ঞলোকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি নবদ্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিয়া উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কয়দিন তিনিও প্রভাতে অপরাহ্ণে ছাত্রদের লইয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন। কথা প্রসঙ্গে দুই পণ্ডিতের মধ্যে একটু তর্কও উঠে, শ্রোতার দল বিস্ময়কৌতুকে আগ্রহের সহিত বিচার শ্রবণ করিয়া যায়। শ্রোতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল।

সেদিন শ্রীপতি বাবু সাকার নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় কহিয়াছিলেন নিগুর্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞান পাইয়াছে তাহার সাকার উপাসনার প্রয়োজন নাই, নতুবা যাহার ব্রহ্ম সম্বন্ধে শুধু গোটা কয়েক কথা মাত্র শোনা বা পড়া আছে তাহার প্রতিমাদি পূজা ত্যাগ করিয়া দুইকুল হারাইলে লাভ কি হইবে? নিগুর্ণ নিরাকারকে ধারণা করিতে পারিবার জন্য পূর্ব্বে তপস্যার প্রয়োজন, চিত্ত স্থির ও অন্তর শুদ্ধি প্রভৃতির জন্য শম দম ইত্যাদির অভ্যাস এবং স্বতঃ চঞ্চল মনকে কোন একটি অবলম্ব দিবার জন্য দেবপ্রতিমায় চিত্ত স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বনিয়াদ দৃঢ় না হইলে তাহার উপরকার অট্টালিকা দৃঢ় হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার পর পূজাদি সাকার উপাসনা কেবল অজ্ঞানীগণের দৃষ্টান্তের জন্য।"

শ্রীপতি বাবু কহিলেন "কিন্তু মনে করুন কোন উপাসক সাকার উপাসনায় বেশ ফল লাভ করিলেন, কিন্তু সেই বিশেষ মূর্ত্তি তাঁর চিত্তে এমনি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত যে তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইয়া নিরাকার নিগুর্ণকে ভাবনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না, চিরদিনই সেই মূর্ত্তির উপাসক হইয়াই তাঁহাকে কাটাইতে হইল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় কহিলেন "তাহাতে ক্ষতি কি হইল? যিনি তাঁহার উপাস্য মূর্ত্তি তিনিই চিৎস্বরূপ পরব্রহ্ম। যাহার চিত্ত যেরূপে যে নামে তাঁহার যে বিভূতিতে আকৃষ্ট হয় তাহার পক্ষে সেই সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভগবান যে বলিয়াছেন পরধর্ম্মো ভয়াবহ—সে পরধর্ম্ম এইরূপ। আত্মবোধপ্রাপ্ত প্রকৃত নিগুর্ণ উপাসক এ জগতে কয়জন আছেন? কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তিলীলাদর্শনে বিস্ময়াপ্লুতচিত্ত ভক্ত সাধক খৃষ্টান মুসলমান ও হিন্দুর ভিতরে অনেক আছেন! ভক্তি ও প্রেমের পথ সহজ, তাই এই পথেরই যাত্রী অধিক এবং এ পথও ভুল পথ নয়।"

শ্রীপতি বাবু এই দেড় বৎসর দুই বৎসর ধরিয়া গীতাপাঠ ও পূজার্চ্চনা করিতেছেন, সর্ব্বদাই প্রায় তাঁহাকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

নিকট আসিতে দেখা যায়, এবং ভাইএর সহিত মোকর্দ্দমাটাও তিনি তাঁহার সহিত সেই কথাবার্ত্তাটার পরই উঠাইয়া লইয়াছিলেন দেখিয়া শুনিয়া পাঁচজনে বলাবলি করিত, লোকটা এখন বাঁচলে হয়।

শ্রীপতি বাবু কহিলেন, "কিন্তু নির্গুণ উপাসনায় ব্রহ্মকে পাওয়ার কথা আছে, সাকার পূজায় তো মুক্তির সম্ভাবনা নাই।"

উমাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া ডিবা হইতে নস্য গ্রহণ করিলেন, কহিলেন, "সাকার পূজায় মুক্তি নাই থাকুক, উপাস্যের প্রাপ্তি আছে তো? শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, উপাস্যের ভাবে ভাবিত না হইলে উপাসনা করা যায় না। 'শিব ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ'—(শিব হইয়া শিবার্চ্চনা করিতে হয়)। তবেই দেখচ উপাসক যদি শিবত্ব প্রাপ্ত হইলেন তবে তাঁহার আর ব্রহ্মকে পাইতে বিশেষ বাধা রহিল না। মোট কথা এই যে, যাহা করিবে তাহা কায়মনোবাক্য দ্বারা যথার্থরূপে করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার কারণ জ্ঞান যতক্ষণ পরিচ্ছিন্ন থাকে ততক্ষণ তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না, যখন জ্ঞান বৃহৎ বা অপরিচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়ায়,—সমুদায় জাগতিক জ্ঞানের সমষ্টি অর্থাৎ বিশ্বের যতকিছু ব্যাপারের সমষ্টিভূত জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যাহাকে ভাবনা করা যায় তাহার ভাবে ভাবিত না হইতে পারিলে তাহা পাওয়া যায় না,—হওয়া ও পাওয়া একই কথা। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে হইলে সাধককে ব্রহ্ম হইতে হইবে; 'স যো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বহুজন্মের তপস্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়া ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মহিমাময় ঈশ্বরের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে তাহা বৃহৎ কিন্তু বৃহত্তম নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

"ক্লেশোধিকতরস্তেষা মব্যক্তা শক্ত চেতসাম্।"

শিবনারায়ণ ও মণীশ এক পার্শ্বে বসিয়া এই আলোচনা শুনিতেছিলেন। ব্যাখ্যার গভীরতা উভয়কেই বিস্ময়ানন্দে যেন অভিভূত প্রায় করিয়া তুলিতেছিল।

শিবনারায়ণ এই সময় একটু সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে কি ব্রহ্মোপাসনা চেষ্টা সঙ্গত নয়?"

"সঙ্গত নয়! অধিকারী ভেদে উপাসনা ভেদ। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান পাবার যোগ্য হয়ে জন্মেছেন তিনি সেই দিকে নিজে হতে অগ্রসর হবেনই হবেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এঁদের কি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন? বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এঁদের সকলকার আবির্ভাবেই দেখবে যে, যে কর্ম্মের জন্য এঁরা সৃষ্ট, সহস্র বাধার মধ্য দিয়ে সেইদিকেই এঁদের গতি। নদীর স্রোত কেবলি পাথর ঠেলে সমুদ্রের দিকে চলে, আবার সমুদ্রবাষ্পের উর্দ্ধমুখেই গতি।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার্চ্চনার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্যক্তিগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মণীশ ও শিবনারায়ণ এক

আশীর্ব্বাদ করিয়া সহাস্যে মণীশের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "খুব তো যশস্বী হয়ে উঠেছ! এখন থেকে আমাদেরি হয়ত ডবল অনারপাশ মণীশ বাবুর সঙ্গে কথা কইতে ভয় হবে, অ্যাঁ?"

মণীশ লজ্জাসঙ্কোচে জড় সড় হইল, শিবনারায়ণ বিনম্র ভাবে কহিলেন—

"আপনারি আশীর্ব্বাদের জোরে—"

উমাকান্ত কহিলেন, "আহা না, ওর কীর্ত্তিটুকু তুমি অমন করে নষ্ট করো না শিব! বেচারা ছ' ছ' বৎসর ধরে খাটলে আর এখন তোমরা আমাকে এর ফলভাগী করে তুল্লে ত ঠিক হবে না। কি বলো মণীশ, তোমার নিজগুণে এবং তোমার পিতৃ পিতৃব্যের পুণ্যে।— এখন দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করে কৃতার্থ হও।"

শিবনারায়ণ অতঃপর মণীশকে তাঁহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা জানাইলে প্রবীণ অধ্যাপক সানন্দে সম্মতি দান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া উভয়কে বিদায় দিলেন। মণীশ যে সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিল উমাকান্তের নিকট হইতে তাহা একান্ত দৃঢ় করিয়া লইয়া ফিরিল। তাঁহার প্রশান্ত মুখের গম্ভীর ছবিখানি ও জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি তাহার সমস্ত হৃদয়কে যেন আজ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলে স্তব্ধ জগৎ সংসার যেন, তাহার অন্তরের মতই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া তাহার চিত্তে একটি নবীন ভাবের তুলিকা বুলাইয়া দিল, সে যেন আজ এই চির পরিচিত সখাদের নিজের ভিতরকার নূতনত্ব দিয়া মণ্ডিত করিয়া দেখিল।

মণীশ যুক্তকরে জ্যোৎস্নাস্নাত রজতাম্বরা-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে দৃষ্টি তুলিয়া দূরে বহু উচ্চে তাহা স্থাপন করিল। তাহার নিকট অনিত্য নিত্য ও তুচ্ছ মহৎ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন একটা শুভ তিথির সংবাদ পঞ্জিকার পাতে লেখা ছিল, সে স্নানান্তে শুচি বস্ত্র ধারণ করিয়া তার পর খুড়া ও খুড়িমাকে প্রণাম পূর্ব্বক একসাজি ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া উমাকান্তের পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মণীশ একেবারে চিত্ত স্থির করেই ফেলেছ নাকি? আরও কিছুদিন ভেবে দেখলে ভাল হতো না? অর্থকরী বিদ্যার সেবা ভিন্ন তো অর্থ লাভ হবে না। দেবভাষা দেবসামীপ্য দিতে পারে, কিন্তু সংসারে ওই বস্তুটাকেও তো নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলা চলে না।"

মুখ নত করিয়া মণীশ কহিল, "ভেবে দেখলাম, যে বিদ্যা ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মাবার জন্য সচেষ্ট চিরজীবন তার ব্যর্থ অনুসরণ করার চেয়ে যে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয় তারই সাধনা করা শ্রেয়।"

উমাকান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "খুব ভাল কথা।" মণীশ কহিল, "কাকার এবং আপনার আশীর্ব্বাদে আমি মনুষ্য জন্মের প্রধান সুযোগটাকে প্রধানতঃ সফল করে নিতে চাই। তাঁহারও ইচ্ছা আমি চিরদিনই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করি। বেশি উপার্জ্জনের সাধ মনে কখনও নাই।"

কথাটা বলিয়াই সে কটাক্ষ দ্বারা উমাকান্তের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া লইল। তাঁহার মুখের উপরে যে একটা প্রসন্নতা

অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন "তোমার মতন মন আমার দেশের সকল ছেলের হোক্।"

মণীশ এইবার নিজকে নিজের কল্পনার মত করিয়া গড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সে প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া পট্টবস্ত্রপরিধৃত হইয়া নিজেদের পূজাগৃহে সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার সময় সত্যকেও নিজের পার্শ্বে বসাইতে আরম্ভ করিল। পূজার পর গীতাপাঠ কালে খুড়িমাকে তাহার অর্থ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া শুনাইত। তারপর যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী পাণিনীর লঘুকৌমুদী ও ন্যায় দর্শনবৈশেষিকাসূত্র লইয়া পড়িতে যাইত তখন সত্যর সমস্ত পড়া ঠিক করিয়া দিয়া যাইত। ফিরিয়াই আবার তাহার তৈরি পড়া গ্রহণ করিত। এইরূপে সমস্ত দিনটাই তাহার বিবিধ কর্ম্মের মধ্য দিয়া কাটিয়া যায়, দ্বিপ্রহরে শিবনারায়ণ তাহাকে লইয়া 'কাণ্ট' হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের দর্শন আলোচনা করিতেন। খুড়া ভাইপোর পুস্তক সংগ্রহের মস্ত বাতিক ছিল। ঘরে ছোট খাট লাইব্রেরী তৈরী হইয়া উঠিতেছে। ইহার পর এক বা দুইঘণ্টা তাঁহারা নিজের গৃহোদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে অধীত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতেন। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানের কোথায় কোন্ সামঞ্জস্য আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেন। এই সময় অনেক রকমই আলোচনা চলিত। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মণীশ কহিল "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধগুলি যে কেবলমাত্র অর্দ্ধসভ্যজাতির কুসংস্কারমাত্র নহে বরং সম্পূর্ণ উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত ইহা দেখাইয়া একটা বই লিখিতে ইচ্ছা করে।"

শিবনারায়ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন "সার্ব্বভৌম মশায় তোমার এতে খুব সাহায্য করতে পারবেন, বেশতো লেখনা। ঋষিরা যে কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন দু'একটা সামান্য বিষয় থেকে তা সভ্যজগত এইবার একটু একটু জানতে পারচেন। তবে এখনও তাঁদের বিজ্ঞান অতখানি উন্নত হয়নি, তাই এখনও তাঁদের ক্ষমতা বুঝতে লোকের অনেক বিলম্ব আছে। প্রাতঃস্নান, গোময় ও ধূপধূনার ব্যবহার এমনি গোটাকত জিনিষ ওরা ভাল বলেচে বলেই না লোকে আদর করতে আরম্ভ করেচে। যে যুগের যে ধর্ম্ম।"

মণীশ দিনে দিনে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের মহৎচরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে যতই সম্পূর্ণরূপে দেখিতে লাগিল ততই সে নিজের অন্তরের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতে থাকিল। তাঁহাকে অনুসরণ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা তাহাকে নিজের গণ্ডী হইতে যেন সবলে ঠেলিয়া বাহির করিতে লাগিল, সে প্রতিদিনই তাঁহার আশীর্ব্বাদটুকুকে দেবনির্ম্মাল্যের মত তাহার মনের উপর নিঃশব্দে বুলাইয়া আপনার অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া লইত। প্রতিদিনই সে অধিকতর পরিতৃপ্তির দীপ্তি মুখের উপর লইয়া স্নিগ্ধচিত্তে ফিরিয়া আসিত। ঘরে সত্যকে লইয়া অনেক সময় যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ উপস্থিত হইলেও, সে এখন অধিকাংশ সময়ই মনকে সংযত রাখিয়া

তাহাকে ধীরতা ও মৃদুতার সহিত সহ্য করিয়া যাইত। সে যে প্রতিদিন নিজের চোকে দেখিয়া আসিতেছে, শিষ্যকে কতটা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিলে যথার্থ গৌরবান্বিত গুরু হওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ ভুল করিয়া চাষাভুষাদের মূর্খ ছেলেগুলা যখনি তাহাদের ছিন্ন মলিন প্রথম বা দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয়খানি সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে "এ'টা কি হবে ভট্চায্মশাই, আবার কও তো!" অমনি একটুখানি শান্তস্নিগ্ধহাস্যদ্বারা সেই সৌম্য-মুখখানিকে করুণামণ্ডিত করিয়া বিরক্তিহীন শিক্ষক পাঠ বলিয়া দিতেছেন। যতবারই ভুল হউক একটুও অসন্তোষ বা ক্লান্তি নাই, কেহ কিছু বলিলে বলেন, ওরা পুরুষানুক্রমে কোন রকম মাথা খাটানর কাজ করেনি, স্মৃতিশক্তিতে মরচে পড়ে গ্যাছে, ঘস্‌তে ঘস্‌তে তবে না ঝক্‌ঝকাবে। হঠাৎ কি কিছু হয়?"

মণীশ এই কথাটাকে মনের সঙ্গে মানিয়া লইল। শুধুই যে মানিল তাহা নয় সে হঠাৎ একদিন প্রস্তাব তুলিয়া বসিল যে সে তাহার পড়াশোনা কাজকর্ম্মের অবসরে দেশের গরীবগুরবোদের জন্য একটা পাঠশালা খুলিবে। দেশের সকল লোকেরি একটু আধটু বিদ্যালাভ করা কর্ত্তব্য, অন্ততঃ নিজের নামটা সহি করিতে জানিলেও কত সময় কত উপকার হয়। সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিল "আপনাকে এখানের সকলেই দেবতার মতন সম্মান করে, আপনি আদেশ করিলে সকলেই তাহা মানিবে।"

উমাকান্ত কহিলেন "দেবাদেশ যদি সবাই শোনে তবেতো আর তাদের শেখবার কিছুই বাকি থাকে নাগো! যত কিছু ভাল কাজ সে সবই তো দেবাদেশ, কিন্তু মান্‌চে ক'জন? তবে তুমি যদি বলো তবে দেবতা না হয় আদেশ করে দেখতে পারেন, কলির দেবতা বলেই কিনা কিছু ভয় হয়।"

(ক্রমশঃ)

আমার ঘর

সুখের কথায় চম্‌কে উঠি, দুঃখ নিয়ে ঘর করি;
দিনের আলো ঠেলে ফেলে, টেনে আনি শর্ব্বরী।
দুঃখ আমার নিজের সৃষ্টি;
নিজের ধন সে বড় মিষ্টি!
পরের দেওয়া সুখকে আমি মনে মনে তাই ডরি!
বেড়ে উঠুক দুঃখের দাহ শীর্ণ-দেহ জর্জ্জরি'।
গণ্ডে বক্ষে রেখা কাটি,
ভিজিয়ে দেহের শুষ্ক মাটি,
ঘন-ধারায় অশ্রু যখন গড়িয়ে পড়ে ঝর্ঝরি,
মনের বনের শুষ্ক পাতায় গাথা উঠে মর্ম্মরি।
সুখের স্মৃতি রেখে দূরে—
দুঃখ পুষি বক্ষ পূরে;—
কঠোর প্রাণে কেমন করে আপনজনা হতে সরি?
বেঁচে থাকুক দুঃখ আমার ওকে নিয়েই ঘর করি॥

শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী।

হাফেজের সহিত একদিন

বিশ্বের গোলেস্তাঁয় যে সকল বুলবুল তাঁহাদের গানে লাজ-রক্ত গোলাপের হৃদয়কে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, হাফেজ তাঁহাদের মধ্যে একজন। কামনাকে হোমানলে পূত করিয়া, যাঁহারা তাহাকে সাধ্বীর সীমন্তে সিন্দূর বিন্দুর মত মনোমোহন এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলেন, তাঁহারাই প্রকৃত কবি, এবং এ হিসাবে হাফেজের স্থান অতি উচ্চে। কামনাকে তিনি শুধু তাহার বীভৎসতার দিক দিয়া না দেখিয়া, তাহার মধ্যে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের যে একটা ছায়া প্রকটিত হয়, তাহারই ধ্যানে মুগ্ধ হইতেন, তাই পান পাত্র, সুরা এবং রমণী, এই তিনটি তাঁহার বর্ণনার প্রধান বিষয় হইলেও, কোনটিকেই তিনি বিলাসী বা মণ্ডপের বর্ণনায় পর্য্যবসিত করেন নাই। আনন্দের তিনি চির ভক্ত ছিলেন, এবং এই তিনটির মধ্য দিয়া আনন্দের অনুভূতিই তাহাদিগকে তাঁহার নিকট বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। হেয়ের মধ্যে প্রেয়ের এই অনুভব করিবার শক্তির অভাবই আমাদিগের মধ্যে অনেককে, হাফেজকে যথার্থরূপে বুঝিতে কষ্ট দেয়। বস্তুতঃ কোন জিনিষই তাঁহার নিকট হীন ছিল না—যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হইলে, আমরা যে, সকল বিষয় হইতেই আনন্দের পূর্ণাস্বাদ পাইতে পারি, ইহাই হাফেজের কাব্য জীবনের মূলমন্ত্র।

হাফেজ পড়িতে পড়িতে স্কচ্ কবি বার্ণস্ এবং বাঙ্গালার কবি চণ্ডিদাসকে কেমন আপনিই মনে পড়িয়া যায়। তিনজনেই যেন একজনের মুখের কথা আর একজন বলিয়াছেন। কিন্তু হাফেজ আনন্দের পূর্ণাবতার। চণ্ডিদাসের বীণা বিষাদের সুরে বাঁধা, চণ্ডিদাস পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে স্বতই কেমন একটা হাহাকার জাগিয়া উঠে—মনে হয় যেন আমাদের জীবনটা একটা ব্যর্থতার দিকে ছুটিতেছে, যেন "অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"। হাফেজের 'দিবানে' যে এরূপ কবিতা নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা একটি উল্লাসপূর্ণ প্রাণের দিব্যনৃত্য দেখিতে পাই। সে উল্লাস, সংযত অসংযত ভাবের মধ্য দিয়া নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা কখনই বীভৎসতার সৃষ্টি করে নাই; এবং আমার বিশ্বাস হাফেজের বাহাদুরী এইখানেই! হাফেজ এবং বার্ণ্সের সম্বন্ধ—একজন যেন আর একজনের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। বার্ণ্সের এক একটি কবিতা পড়িয়া মনে হয় যে, নাতিশীতোষ্ণ দেশবাসী এই রাজকবির বীণার তারে যে গান বাজিতেছিল তাহাই যেন তুহিনদেশবাসী কৃষক-কবি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক স্থলে হাফেজ ও বার্ণসের কবিতার মধ্যে ভাষায় পর্য্যন্ত যে রকম ঐক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নিতান্তই অদ্ভুত! বার্ণসের 'Give a ruse' কবিতার সহিত হাফেজের কত কবিতার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু মায়ার কল্পনা রাজ্য গড়িতে হাফেজ

কবিই বোধ হয় এ বিষয়ে হাফেজের সহিত তুলিত হইতে পারেন না !

"যাহা কিছুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর" হাফেজ এ মতের পরিপোষক ছিলেন না। বিশ্বে চলিতে হইবে, নিত্য নূতন পথ আবিষ্কার করিতে হইবে, এবং তাহা হইতেই নিত্য নূতন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, হাফেজ বহুবার এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"পথের নেশা আমার লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।"

কিন্তু কিসের জন্য ? উত্তরে বলিতেছেন, বোধ হয়—

"নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক,
অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে।"

এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু হাফেজের মত বোধ হয় ইহা কেহ বলেন নাই। বিজ্ঞ এমার্সন এ সম্বন্ধে সত্য সত্যই বলিয়াছেন,—"A law or statute is to him what a fence is to a nimble school-boy—a temptation for a Jump. Wrong shall not to wrong to Hafiz for the name's sake".

হাফেজ ভণ্ডামী দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, তিনি ভণ্ডদিগের চিরশত্রু ছিলেন। হাফেজের সময়ে ধর্ম্ম আধর্ম্মাচরণের একটা নিরাপদ আবরণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইছিল এবং এই বকধার্ম্মিক দল হাফেজের নিত্য বিদ্রূপের স্থল ছিল। একমাত্র প্রেমই মানুষকে স্বর্গের দিকে টানিয়া তুলিতে সক্ষম, হাফেজ ইহা বিশ্বাস করিতেন তাই তিনি নিজ প্রিয়াকে বলিয়াছেন "দরবেশ বা মঠাশ্রয়ী মোহান্তে যাহা নাই, একমাত্র প্রেমিকের হৃদয়েই সেই ধার্ম্মিক এবং সন্ন্যাসীর যথার্থ বীজ নিহিত আছে ; বেশভূষা বা মন্ত্রতন্ত্র যাহা দিতে পারে না, তাহার সরল দৃষ্টিই মনুষ্যকে সেই ত্যাগীর গুণ দান করে।" হাফেজের সাহসিকতা আরও শতরূপে প্রকাশ পাইত। প্রেমকে তিনি সমীকরণের মহাস্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতেন, এবং তাহার 'সকলকে সবার সমান' করিবার অদ্ভুত ক্ষমতায় তিনি নিত্য বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি সেই ধর্ম্মান্ধতার যুগেও স্বয়ং আল্লাকে তদীয় প্রিয়ার ভৃত্য এবং স্বর্গকে তাঁহার বিহারভূমি বলিয়া বর্ণনা না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই।

সৌন্দর্য্য যে আকারেই আসুক না কেন হাফেজ তাহাকেই পূজা করিতেন। তিনি বিশ্ব সংসারের সমস্ত বস্তুতেই সৌন্দর্য্যের অংশ দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। এই অদ্ভুত সৌন্দর্য্যবোধই তাঁহাকে, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, ফল ফুল, নারী বালক প্রভাত সন্ধ্যা, সুরা সঙ্গীত প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সহিতই সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহাকে বিষয় নির্ব্বাচনে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্যই দেখিতে পাই যে তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতার গুণগ্রাম কিরূপ সহজ এবং সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এই জন্যই

দেখিতে পাই যে তিনি একটি সুন্দর যুবককে দেখিয়া বলিতেছেন :—

হে সিরাজি, হে সুন্দর, হে তরুণ সাথী
এ মম হৃদয়, বন্ধু, মোহিয়াছ তুমি ;
তব কপোলের ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিল লাগি
বুখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।

এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তাহা এই স্থানে দিলাম। কবির এই পদ্যটি ক্রমে টাইমুর সার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। সমরকন্দ ও বুখারা এই দুইটি নগরী সজ্জিত করিতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাই তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দুইটি নগরীকে সমৃদ্ধ করিতে আমায় কত কষ্ট করিয়া কত দেশ জয় করিতে হইয়াছে, তুমি তাহাকে এত হীন করিলে কেন?" হাফেজ তদুত্তরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু এরূপ অপব্যয়ী না হইলে কি এরূপ দরিদ্র হইতাম?"

হাফেজের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল না, কিন্তু তিনি তজ্জন্য নিজেকে হীন জ্ঞান না করিয়া, কাব্যপ্রতিভায় তাহা কিরূপে পূর্ণ হইয়াছে তাহাই দেখাইতেন। এ সম্বন্ধে 'দিবানে' অসংখ্য পদ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটির অনুবাদ এইখানে দিলাম—

হে হাফেজ যদিও তোমার
নাহি স্বর্ণ নাহি রৌপ্য খনি
কিবা ভয়? বল না তাহাতে
কবিতারে পেয়েছ যে তুমি!

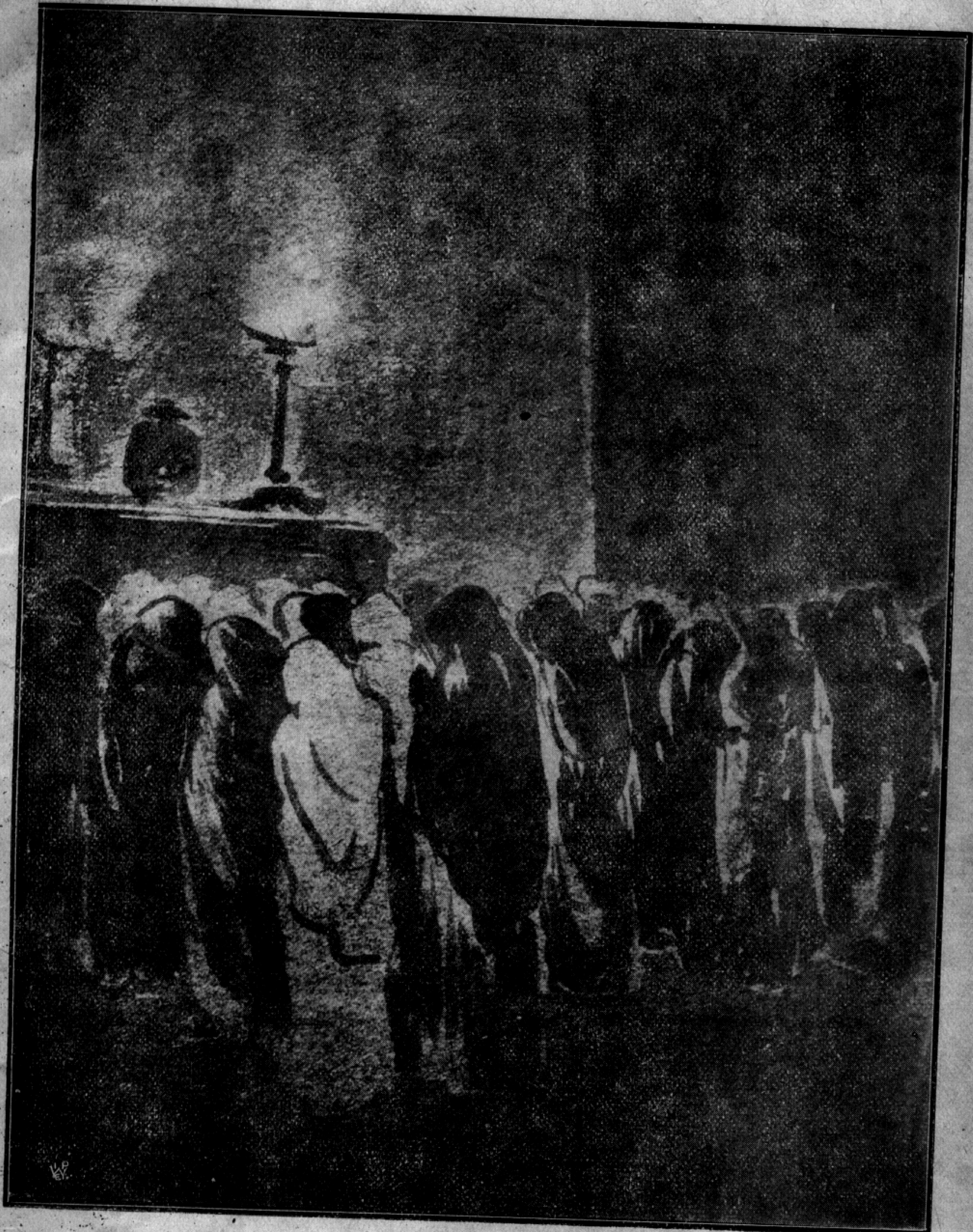
আর এক স্থলে এই সুরেই কহিয়াছেন যে, হে হাফেজ এই সকল পদাবলী যদি তোমার হয় তাহা হইলে তুমি আর কোন অভাবের কথা বলিও না। পাঠক! এই সকল পদের সুর কি বার্ণসের 'For a' that, for a' that'এর অনুরূপ নহে?

হাফেজের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা আমার নাই—আর কোন্ কবিকেই বা বর্ণন করা যায়? সুতরাং সমালোচকের দায়িত্বপূর্ণ আসন পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তের চির মধুর অধিকার গ্রহণ করিলাম। দুই একটি কথায় হৃদয়ের মধ্যে একটি মধুর রাগিণী সৃজন করিতে হাফেজ সিদ্ধহস্ত। দুই একটি তুলিকাস্পর্শে হাফেজ নয়নসমক্ষে যে একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন তাহা অতি অপূর্ব্ব। হাফেজ চিরজীবন গীতি কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন, এবং গীতি-কবিতার মাধুর্য্যে তাঁহার হৃদয়টি পূর্ণ ছিল। হাফেজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও—ইংরাজীতে যাহাকে Epigram কহে—অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র পদও তাঁহার রচনা-ভঙ্গীতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

হাফেজ যে বীণায় গান গাহিয়াছেন তাহার সুর অতি কোমলে বাঁধা। জনকোলাহলে সে সুরের মাধুর্য্য শ্রুত হয় না, নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া সে সুরের মাধুরী বুঝিতে হয়। 'আজি কোন কাজ নাই' বলিয়া সব ফেলিয়া দিয়া যদি হাফেজকে লইয়া 'নিশি-নির্জ্জনে' বসিতে পার, তাহা হইলেই তিনি তোমাকে তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দেখাইবেন—তখনই তুমি তাঁহাকে যথার্থ বুঝিতে পারিবে।

কবিরচিত একটি গান একটি সুন্দরী গাহিয়াছেন, কবি তাই শুনিয়া বলিতেছেন—

"আমার গানের মাঝে যদি, লুকাইতে পারিতাম আমি,
প্রত্যেক নিশ্বাসে তাহা হ'লে ওষ্ঠ দুটি লইতাম চুমি!"



মন্দিরে

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে



হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে কামনা মর্ম্মরিয়া উঠে, হাফেজ দু একটি পত্রে তাহা কিরূপ স্পষ্ট এবং কবিজনোচিত ভাবে ব্যক্ত করেন, এইটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। হাফেজের নিপুণ হস্তে কামনা এইরূপেই 'কাম-গন্ধ' শূন্য হইয়া একটা স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে! ইংরাজ-কবি টেনিসনও Millar's daughter নামক সুন্দর কবিতায় এইরূপ একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু দুইটিতে কত তফাৎ, সে বিবেচনার ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিলাম।

প্রেমের কবিতাই হাফেজকে অমরতা প্রদান করিয়াছে এবং তিনি তাঁহার প্রিয়া জুলেখাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, বিশ্ব-সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। প্রিয়া সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"ছড়ায় রাজার পথে তারা
মণি মুক্তা কতই না জানি,
আমি কিন্তু মোর প্রিয়া লাগি
আঁখিতে বাঁধাব পথ খানি।"

সুন্দরকে কে না পূজা করে? পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক—সকলেই সুন্দরের উপাসক। সুন্দরকে দেখিবার যে একটা ঔৎসুক্য আমাদের অন্তরে চির সজাগ হাফেজ এই কয়টিতে তাহা কিরূপ পরিষ্কারভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা প্রেমের একটি বিশেষত্ব। হাফেজ তাই গাহিয়াছেন—

"তব কৃষ্ণ কেশ-পাশে ডুবি
দিন মোর রাত হয়ে যায়—
ওষ্ঠের বেষ্টনী মাঝে পড়ি
আত্মা মম প্রার্থনা হারায়।"

হাফেজের কল্পনাশক্তি স্থান এবং সময়ের বন্ধনকে কিরূপে ছিন্ন করিয়া, একটা কল্পনা-রাজ্যের সৃজন করিত উপরের পদটিতে তাহা দেদীপ্যমান। প্রেমিকার উপযুক্ত স্থান যে আজি তারকায় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিতেছেন—

"মামুদের প্রাসাদের চেয়ে
বড় করি গড়িলাম বাড়ী,
একি দেখি? অয়ি তারকায়
বাসা নিলে সে সবারে ছাড়ি!"

বাস্তবিক হাফেজ প্রত্যেক বর্ণনাতেই কেমন একটা অপার্থিবতার সংযোগ রাখিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে এ বিশ্বের হইতে দেন নাই। এমার্সন এই বিষয়টির লক্ষ্য করিয়াই, হাফেজের কাব্য-প্রতিভা বর্ণনকালে বলিয়াছেন—"Hafiz is the Prince of Persian poets, and in his extraordinary gifts, adds to some of the attributes of Pindar, Anacreon, Horace and Burns, the insight of a mystic, that sometimes affords a deeper glance at Nature than belongs to either of these bards." অর্থাৎ হাফেজ নিজের মধ্যে পিণ্ডার, আনাক্রিয়ান, হোরেস্ এবং বার্ণসকে সম্মিলিত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে একটা দার্শনিকের ভাব আছে, তাহা তাঁহার নিজস্ব।"

হাফেজকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারি

এরূপ সৌভাগ্য আমার নাই। তথাপি যাহা বুঝিয়াছি, বঙ্গীয় ভ্রাতাভগিনীদিগকে তাহাই দান করিলাম এবং পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, কেহ যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে একমাত্র হাফেজই তাঁহার সে শ্রমের পূর্ণ মূল্য প্রদান করিবেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র।

অতির গতি

শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী ঢাকায় থাকিয়া কলেজে এফ, এ পড়িত। শ্মশ্রুগুম্ফে সমস্ত মুখখানি আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ রেহাই হইতেছিল না। কলেজ ছাড়িলেই চাকুরিতে ঢুকিতে হইবে,—বাঁধা মাহিনার চাকর হইলে আরাম-বিলাস ও স্বচ্ছন্দ-স্বেচ্ছাচারিতায় আঘাত ত লাগিবেই, তদ্ভিন্ন পঁচিশ ত্রিশ টাকার অতিরিক্ত মাসিক বেতন মিলিবারও সম্ভাবনা ছিল না। তাহা অপেক্ষা হোষ্টেলে থাকিয়া কলেজে নামটা লিখাইয়া সুবিধা ও অবসরমত সপ্তাহে তিনচারি ঘণ্টামাত্র কায়ক্লেশে ক্লাশে পশ্চাতে কোণের বেঞ্চে বসিয়া ঢুলিয়া নিদ্রা দিয়া ও গল্প করিয়া সময়টাও নেহাইৎ মন্দ কাটে না—বাকী অবসরটুকু খোসগল্প ও আমোদআহ্লাদেও দিব্য কাটাইয়া দেওয়া যায়। শুধু এই কারণেই স্বল্পবয়স্ক ছাত্রগণের সহিত কলেজের খাতায় নাম লিখাইতে শ্রীনিবাসের এতটুকু দ্বিধা ছিল না। পাঁচবার পরীক্ষার আসনে বসিয়াও যখন কৃতকার্য্য হওয়া গেল না, তখন ষষ্ঠবার বসিতেই বা আপত্তি কি থাকিতে পারে?

এমন সময় সমস্ত দেশ চকিত করিয়া স্বদেশীর ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। বিলাতী বস্ত্র দাহ, ও গগনভেদী বক্তৃতার ধূমে যখন বাঙ্গালার আকাশ ভরিয়া উঠিল, তখন আমাদিগের পরিচিত শ্রীমান শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তীও আসিয়া আসরে নামিলেন।

বক্তৃতা-মঞ্চ-গঠনে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা এবং বিলাতী পণ্য ও কলেজের লেকচারে যুগপৎ অগ্নিসংযোগ-ব্যাপারে তাহাকে অসাধারণ শক্তি ও অবসর প্রয়োগ করিতে দেখিয়া নেতৃগণ 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন—নবপ্রকাশিত 'সম্মার্জ্জনী' পত্রের সম্পাদক চাকুরিজীবিগণকে গালি দিয়া এবং এই উদীয়মান স্বদেশসেবীর জয়গীতে আপনার কলেবর পরিপূর্ণ করিয়া নগদ উপার্জ্জনেরও বিশেষ সুবিধা করিয়া লইল।

শ্রীনিবাস যখন আপনাকে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির পকেট সংস্করণ ভাবিয়া আত্মহারা হইবার উপক্রম করিয়াছে, সহসা তখন কয়েকটি বিপথগামী যুবকের রাজদণ্ড ও পুলিশকর্ত্তৃক অত্যাচারকারার বাট-তল্লাসের ঘটায় শ্রীনিবাসের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। সে নিমেষে আপনার মনের গতি—অশ্বের রশ্মির মত টানিয়া সংযত করিয়া লইল এবং মৃদু হাসিয়া দুই চারিজন নিরীহ লোককে পুলিশ নিগ্রহের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া

স্বদেশীর পঙ্ক মুছিয়া মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ফলে অচিরাৎ শ্রীনিবাসের লক্ষ্মী ফিরিল এবং সব্‌ইন্‌স্পেক্টরের পদে পাকা হইয়া মনস্থরগঞ্জ থানার চার্জ্জ বুঝিয়া লইবার জন্য সরকার হইতে তাহার নামে আদেশপত্র আসিল।

২

স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যতখানি উৎসাহ সে প্রদর্শন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেও তাহার ঠিক ততখানি উৎসাহই দেখা গেল।

এক নিরীহ বেকার কয়েকখানা মিলের মোটা কাপড় আনিয়া ছোট দোকান খুলিয়া বসিয়াছে, শ্রীনিবাস তাহাকে চালান দিল, পার্শ্ববর্ত্তী বিলাতী বস্ত্র-বিক্রেতার সহিত সে দাঙ্গা করিয়াছে। বেচারা বরদা অসুখের দায় চাকুরি হারাইয়া সুযোগ বুঝিয়া দেশী শাঁখা এবং 'বন্দে মাতরম্' আলুর চুড়ি ও কুলি মাথায় হাঁকিয়া বেড়ায়, শ্রীনিবাস তাহাকে চালান দিল, সে মদ খাইয়া রাস্তায় হল্লা করিতেছিল। দোলগোবিন্দ সেন বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়াছিল,—অল্প আয়ে সংসার প্রতিপালন হয় না, তাই সে ছোট একটি পাঠশালা খুলিয়া বসিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধেও শ্রীনিবাসের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এক ধারা ছুটিল,—ছাত্রদিগকে বয়কটে উত্তেজিত করিয়া সে পল্লীর বিলাতী পণ্যের দোকান লুট করাইয়াছে। করিমুদ্দি সেখ নীলকুঠির পিড্রু সাহেবের নিকট পাঁচকুড়ির দামের তাগাদা করিতে গিয়াছিল,—সাহেব হাঁকাইয়া দেওয়ায় দেওয়ানীতে নালিশ রুজু করিবে বলিয়া সে শাসাইয়া আসিয়াছিল। সে কথা ভুলিয়া বেচারা রাত্রে শয্যায় নিদ্রার কোলে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের লোক আসিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া তুলিল, কহিল, তাহাকে থানায় যাইতে হইবে। পিড্রু সাহেবকে সে বোমা ছুড়িয়া মারিতে গিয়াছিল, সাহেব নাকি ডায়েরি করাইয়া গিয়াছে!

এমনই বিবিধ কাল্পনিক উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া সে গ্রামখানিকে জ্বালাইয়া তুলিল। গ্রামের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই শ্রীনিবাসের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। নিরীহ গ্রাম—বক্তৃতার উপদ্রব ছিল না, কোন বালাই ছিল না, তথাপি কি উপায়ে এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই গ্রামের লোকের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

৩

সনৎ চাটুয্যে কলিকাতায় বি, এ পরীক্ষা দিয়া অবকাশ-যাপনার্থ গ্রামে ফিরিয়াছিল। ফিরিয়া সে শুনিল, শান্ত গ্রামে এক নূতন উপদ্রব!

কলিকাতার কলেজে পড়িবার দরুণই হউক কিম্বা রীতিমত সংবাদ-পত্রাদির সহিত পরিচয় থাকার দরুণই হউক, তাহার বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটা মৎলব ঠিক করিয়া রাত্রে মণ্ডলদিগের আটচালায় গোপনে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিল। দ্বারে লক্ষ্মণ নস্কর পাহারায় খাড়া রহিল। ভিতরে কাগজ কলম কালী লইয়া গভীর গবেষণা চলিতে লাগিল।

এমন সময় দূরে লণ্ঠনের আলোক দেখিয়া লক্ষ্মণ আসিয়া সংবাদ দিল, "দারোগা বাবু রোঁদে বেরিয়েছেন! এই দিকেই আসছেন!"

অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে সনৎ কহিল, "এই যে চারিধারে ভীষণ দাঙ্গা-গোলযোগ চলেছে—আমাদের গ্রামে সে সব বালাই যে নাই, এর জন্য ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয় ত শ্রীনিবাস বাবুকে।"

নারাণ গ্রামের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। সে কহিল, "বটেই ত—তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর সতর্কতার জোরেই না বদমায়েস গুলো শায়েস্তা হয়েছে।"

রাসবিহারী একটি ছোট ড্রগিষ্টস্ হল্ খুলিয়া নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। সে কহিল, "তা না ত কি,—পিক্র সাহেবটা ত মরেই গেছল, সে কি বাঁচত! করিমুদ্দি বেটা ত আর একটু হলেই সাহেবকে সাবাড় করেছিল—"

দীনু মোক্তার কহিল, "সাহেবকে যদি সাবাড় করত,তাহলে গ্রামে কি শান্তি থাকত! রেগুলেশন লাঠি আর স্পেশাল কনষ্টেবলের চাপে গ্রামের মেটে রাস্তা তিন হাত বসে যেত—"

সনৎ কহিল, "সেই জন্যই ত আমার ইচ্ছা একটা বিশেষ সভা আহ্বান করে শ্রীনিবাস বাবুকে আমরা অভিনন্দন দিই। আমরা গ্রামের লোক এ অভিনন্দন দান করলে শুধু যে আমাদেরই কর্ত্তব্য পালন করা হবে, তা নয়, শ্রীনিবাস বাবু যে সরকারের নিমক খেয়ে এত পরিশ্রম করেন, সে পরি- [illegible]"

দীনু মোক্তার কহিল, "বটেই ত! তাঁর প্রোমোশন হয়ে যেতে পারে এতে।"

নারাণ কহিল, "এমন লোকের প্রোমোশন হলেই না গুণের আদর হয়!"

সনৎ কহিল, "এতে শ্রীনিবাস বাবুর উৎসাহ বেড়ে যাবে কত! কালে হয়ত তিনি—"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। সকলে শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "কে?"

"আমি শ্রীনিবাস—"

সনৎ দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল, "আরে, আপনি! আসুন, আসুন—আমাদের পরম সৌভাগ্য—"

হাতের হুঁকা নামাইয়া, আটচালার কোণে বাঁশের গায় সেটি ঠেশ দিয়া রাখিয়া, দীনু কহিল, "এই আপনার কথাই হচ্ছিল—"

"ধন্য আপনার উৎসাহ!"

"কিবা অধ্যবসায়!"

"আপনার গুণের কি তুলনা আছে!"

অপ্রতিভভাবে হাসিয়া শ্রীনিবাস কহিল, "আমার আর কি গুণ আছে, বলুন—"

সনৎ কহিল, "নেই! বল্লেন কি, মশায়? এইত এত লোক সরকারের নিমক খাচ্ছে, কিন্তু এমন পরিশ্রম, এত কর্ত্তব্য-বোধ আর কার আছে, বলুন! আমরা ত সেই কথাই বলছিলাম—আপনি রাজী হন বা না হন, আমরা এক প্রকাণ্ড সভা করে আপনার জয় গান করব, এতে আপনি যত আপত্তিই করুন, আমরা তা শুনছি না—এ কিন্তু স্পষ্টই বলে রাখছি—তখন যেন দূষবেন না, বা unlawful assembly বলে চালান দেবেন না।"

শ্রীনিবাস কহিল, "হাঁ, হাঁ, বলেন কি আপনি—বলেন কি আপনি?" অপ্রতিভ কাষ্ঠ হাসি দারোগা বাবুর স্বল্প বিকশিত দন্তপংক্তির উপর দিয়া, বিদ্যুতের মত মৃদুভাবে খেলিয়া গেল।

পথ হইতেই আটচালার ভিতর আলোক ও লোক-কোলাহলের পরিচয় পাইয়া ভিতরকার কথাবার্ত্তার আভাষ পাইবার আশায় শ্রীনিবাস চুপিচুপি দ্বারে কর্ণ পাতিয়া শুনিল, ভিতরে তাহারই প্রসঙ্গ চলিয়াছে! কৌতূহলের সহিত অভিনিবেশও বাড়িয়া উঠিল—এবং শ্রবণে এক নূতন রাগিণী আজ ধ্বনিয়া উঠিল! তাহার নিন্দা নহে, গালি নহে, জয়গান! আনন্দের আতিশয্যে দ্বারে করাঘাত করিয়া সকলকে তাই সে দর্শন দিবার দারুণ প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া অভিনন্দনে সম্মতি দান করিয়া শ্রীনিবাস যখন আটচালা পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইল, তখন ভিতরে সকলের মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল এবং নয়ন-প্রান্তে সঙ্কেতের উত্তেজনা সহস্র চেষ্টাতেও রোধ করা গেল না।

৪

বারোয়ারির মাঠে সামিয়ানা খাটাইয়া প্রকাণ্ড সভার আয়োজন হইয়াছে! পূর্ব্বধারে মঞ্চোপরি সভাপতির আসন। তাহার পশ্চাতে ফুলের অক্ষরে "বন্দে মাতরম" লিখিত। মণ্ডপের তোরণে লালনীল কাগজের উপর জরির পাড় বসাইয়া প্রকাণ্ড অক্ষরে 'বন্দে মাতরম্' লিখিত হইয়াছে। বাঁশের থামগুলা বিচিত্র বর্ণের কাগজে মণ্ডিত। পল্লীগ্রামে সাজসজ্জার পক্ষে আয়োজন যতদূর সম্ভব, তাহা করা হইয়াছে, কোন ত্রুটি নাই। শোভায় সজ্জায় সভামণ্ডপ ঝলমল করিতেছে। সভাপতির আসনের দক্ষিণে, চিকের আড়ালে, মহিলাগণের জন্য যথোচিত স্থান হইয়াছে।

তোরণ-দ্বারে সনৎ-প্রমুখ উদ্যোগীগণ দণ্ডায়মান—শ্রীনিবাস এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। ভিতরে বালকগণের কোলাহল,—সভাপতির আসন-সম্মুখে বসিয়া নীলু গায়েন পাখোয়াজে বোল ফুটাইবার উদ্দেশ্যে ময়দা মাখাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে তাহার অঙ্গে চাঁটি লাগাইয়া ধ্বনি পরীক্ষা করিতেছে।

ক্রমে শ্রীনিবাস আসিয়া পৌঁছিল। মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি করিলেন—চিকের মধ্য হইতে লাজবৃষ্টি হইল। দেখিতে দেখিতে মণ্ডপ লোকারণ্যে পরিণত হইয়া উঠিল।

সভা বসিল। প্রথমেই শ্রীনিবাসের গুণ গান করিয়া তাঁহাকেই সভাপতি বরণ করিবার জন্য প্রস্তাবাদি হইল। তজ্জন্য প্রস্তুত না থাকিলেও আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে শ্রীনিবাস সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিল। তখন রীতিমত সভার কার্য্যারম্ভ হইল। প্রথমেই "বন্দে মাতরম্" গীতে সভার উদ্বোধন! আপত্তিতে শ্রীনিবাসের প্রাণখানা ভরিয়া উঠিল, কিন্তু দায় পড়িয়া বেচারা নিবৃত্ত হইল। তাহার পরই ঢাকার প্রসিদ্ধ স্বদেশী বক্তা রঞ্জিনীমোহন নিয়োগী বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী হইয়াও স্বদেশের সেবায়, কর্ত্তব্যের আহ্বানে শ্রীনিবাস বাবু সমস্ত দ্বিধা-ভয় দূরে ঠেলিয়া যে আজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ইহাতে শুধু

তাঁহারই ঐকান্তিক স্বদেশ-প্রীতি যে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, মনুষ্যত্ব আজ বাঙ্গালার মাটিতে কিরূপ পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, স্বদেশী আন্দোলনের মূল সূত্রটি দেশবাসী আজ কি সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে—ইত্যাদি। শ্রীনিবাসের ললাটে ঘর্ম্ম বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। এ কি কাণ্ড! তাহার অভিনন্দন-সভায় স্বদেশীর দুন্দুভি-নিনাদ করিবার কি এমন প্রয়োজন ছিল! পুলিশে তাহার শত্রুর সংখ্যা ত অল্প নাই। তাহার অকালপক্ক উন্নতিতে অনেকেরই মন ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত—তাহারা যদি শুনিয়া ফেলে—সাহেবের কর্ণে যদি ইহার রঞ্জিত বিবরণীর কণামাত্র প্রবেশ করে—তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! তাহার অন্ন মারা যাইতে যে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিবে না! কিন্তু স্পষ্ট বাধা দিতেও তাহার রসনা সরিতেছিল না! এ কি ভীষণ বিপদে ফেলিলে, ভগবান! কম্পিত দেহে শঙ্কিত প্রাণে শ্রীনিবাস চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পুলিশের লোক কেহ আছে কি না! ঐ না একজন,—ঐ! না, মনের ভ্রম! ঐ না একটা টুপিওয়ালা শির দেখা যাইতেছে। না—!

যখন বক্তৃতার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, বক্তার মুখের বাণী যখন অগ্নির মত দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন সনৎ আসিয়া শ্রীনিবাসের কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি কহিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্ত সাহেব এসেছেন, ঐ কোণে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছেন—কে খপর দিলে?" সমস্ত পৃথিবী যেন সহসা ভূমিকম্পের বেগে কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীনিবাস কহিল, "এ্যাঁ! তাই ত! কি হবে—সনৎ বাবু, আমায় রক্ষা করুন! আমি এ সবের কিছু জানি না—এ কি করলেন, আপনারা?"

"তাই ত মশায়, রোহিণী বাবু আমাদের কথা না বুঝে, সভার মর্ম্ম না বুঝে কি বেমক্কা ধরণে বক্তৃতা সুরু করে দিলেন—আমাদের শুদ্ধ ভয় হচ্ছে।" কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীনিবাস উঠিয়া দাঁড়াইল। কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সবেগে মঞ্চ হইতে নামিয়া যেমন বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, অমনই একটা পতিত বংশখণ্ডে পা লাগিয়া সশব্দে সে পড়িয়া গেল। চারিধারে হাস্য ও করতালি বৃষ্টি হইয়া গেল!

* * *

সাহেবকে বুঝাইবার সকল চেষ্টাই শ্রীনিবাসের ব্যর্থ হইল। সাহেব একটা জরুরি তদারকে এদিকে আসিয়াছিলেন। পথে বিশ্রামার্থ মনসুরগঞ্জ থানায় আসিয়া সব-ইনস্পেক্টরকে দেখিতে না পাইয়া সন্ধান করিলে একজন জমাদার বলে, ভারী জাঁকালো স্বদেশী সভা আছে; তিনি সেইখানে গিয়াছেন। সাহেব স্বদেশী সভায় আসিয়া দেখিলেন, সভাপতি অপর কেহই নহেন, সব্‌-ইনস্পেক্টর শ্রীনিবাস বাবু!

তিনদিন পরে সব্‌-ইনস্পেক্টরের নামে On H. M. S. খামে মোড়া এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীনিবাসের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে পত্র খুলিয়া সে দেখিল, সেখানি বিভাগীয় আদেশ-পত্র! ঝাঁপাকাটি আউট্‌পোষ্টে জমাদার করিয়া তাহাকে বদলি করা হইয়াছে, দুই দিনের মধ্যে

নূতন সব্-ইনস্পেক্টরকে চার্জ্জ বুঝাইয়া তাহাকে সেখানে রওয়ানা হইতে হইবে। সমস্ত পৃথিবীটা শ্রীনিবাসের চক্ষের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র নীলবর্ণের গোলার মত ঘুরিতে লাগিল।

গোরুর গাড়ীর উপর পেঁটরা ট্রাঙ্ক ও বিছানার মোটঘাট চাপাইয়া শ্রীনিবাস সপরিবারে যেদিন অপরাহ্ণে মনসুরগঞ্জ ছাড়িল, সেদিন গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতিতে বিশেষ সমারোহ পড়িয়া গেল। মন্দির-প্রাঙ্গণে ডাবচিনির পাহাড় জমিয়া গেল। সঘন শঙ্খ-রোলে নিকটস্থ বনের শৃগালগুলা অবধি সন্ধ্যাসঙ্গীত সমাপ্ত না করিয়াই বন ছাড়িয়া সভয়ে সুদূরে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রবাসে

যেথায় আছে লতায় ঢাকা
ক্ষুদ্র আমার ঘর,
চৌদিকে তার খোলা বাতাস
বইছে নিরন্তর।
লতার আড়ে পাতার ফাঁকে
দিনের বেলায়, শত
সূর্য্য সেথা উঁকি মেরে
ফোটায় তারা কত।
মায়ের শ্যামল আঁচলখানি
চারদিকে তা'র মেলা ;
সেথায় কত পুষ্প হাসে
সকাল সন্ধ্যা বেলা !
সেথায় কত মুক্তা ফলে
দূর্ব্বা দলের 'পরে ;
সেফালি দেয় শয্যা পেতে
ঊষা রাণীর তরে !

সাঁজের বেলা তারার মালা
ফুটিয়ে আকাশ-গায়,
তুলসী তলে প্রদীপ জেলে
সন্ধ্যাবধূ চায়।
লজ্জাশীলার ঘোমটাখানি,
জ্যো'স্না বালা এসে
নম্র-হাতে নামিয়ে দিয়ে
ফিনিক্ ফোটে হেসে।
সেথায় কত কানন-ছায়ে
লুকিয়ে আপন কায়,
দোয়েলে দেয় সুমিষ্ট শিস্,
বুলবুলি গান গায়।
সকাল সন্ধ্যা কুহুস্বরে—
কানন উঠে ভ'রে—
সেই ত স্বদেশ দেখ্‌ব বলে'
প্রাণটি কেমন করে !

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুঃষষ্টি কলা

প্রাচীন ভারতে কলাবিদ্যা কিরূপে বিকাশ পাইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চতুঃষষ্ট কলার নাম ও তাহাদের প্রত্যেকটির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, পাশ্চাত্য প্রভাব যখন ভারতে অপরিচিত, সেই সুদূর অতীতেও নিপুণ শিল্পবিদ্যা, নৃত্যগীতাদি, খনিজ বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতিও ভারতবাসীর সুবিদিত ছিল। দুরারোহ শৈলমালা ও কলনাদী সমুদ্রবেষ্টিত নিসর্গশোভাভূষিত ভারতের সভ্যতা ধীরে ধীরে বিবিধ বিদ্যার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যার অসাধারণ পুষ্টি সঙ্ঘটিত করিয়াছিল। সেই বিবিধ আপণিসজ্জিত কোলাহলমুখরিত উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র ও মথুরা এই সকল কলাবিদ্যাকে সজীব রাখিয়াছিল। ভারতের অতীব বৈভব ও গৌরবকে সার্থক করিয়াছিল। ইতিহাস আজ নীরব বটে কিন্তু বিবিধ গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে তাহা হইতে অন্ধকারকক্ষে আলোকরশ্মিপাতে কক্ষাভ্যন্তরের ন্যায় দুএকটি স্থল উজ্জ্বলভাবে দীপ্ত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্ট কলার বিবরণ সঙ্কলিত হইল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বুঝিতে হইলে ঐতিহাসিকমাত্রেরই ইহা প্রণিধানযোগ্য।

১। গীত। সঙ্গীতশাস্ত্রে ভারতবর্ষ যে অসাধারণ নিদর্শন রাখিয়াছে তাহা সমস্ত জগতের অনুশীলন যোগ্য। শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকর, দামোদরকৃত সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশদ পরিচয় দান করি- রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতির সাক্ষী।

২। বাদ্য। প্রধানতঃ চারিভাগে এই বাদ্য বিভক্ত। বীণা প্রভৃতি যন্ত্র তত নামে, মৃদঙ্গ প্রভৃতি আনদ্ধ নামে, বংশী প্রভৃতি শুষির নামে ও কাংসতাল প্রভৃতি ঘন নামে কথিত হয়। বিবিধ প্রকারের বীণা রবাব, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদ্য-বিষয়ে ভারতের নিপুণতার নিদর্শন।

৩। নৃত্য। নৃত্যের বিবিধ কৌশল সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। 'নৃত্যাঙ্কুর' গ্রন্থে কতক-গুলি ভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে নৃত্য দ্বিবিধ। পুরুষের উদ্দাম নৃত্যের সহিত রমণীর ললিত চরণক্ষেপের প্রভেদ তাণ্ডব ও লাস্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। আলেখ্য। চিত্রবিদ্যায় প্রাচীন ভারত অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত নাটকাদিতে এই চিত্র বিদ্যার বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অভিজ্ঞান শকুন্তলে দুষ্মন্ত ভ্রমর আক্রমণের আশঙ্কায় পরাবর্ত্তিতমুখী চকিতনয়না শকুন্তলার চিত্র অঙ্কিত করিয়া-ছিলেন। তাহার পশ্চাতের দৃশ্য অঙ্কিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া হংসমিথুনভূষিতপুলিনা মালিনী নদীর পর হরিণ-হরিণীশোভিত হিমালয় প্রদেশ অঙ্কিত করিবেন বলিতেছেন। রত্নাবলী নাটিকায় উদয়ন ও রত্নাবলীর প্রতিকৃতি লইয়া যে রহস্যের উদ্ভব, মালতীমাধবের প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শনে যে অনুরাগের উন্মেষ, তাহার মূল এই আলেখ্য অঙ্কনের অপূর্ব্ব কৌশল। (Painting.)

৫। তিলকরচনা। ভূর্জ্জ প্রভৃতি পত্র উপাদানে ললাটে বিবিধ প্রকারের তিলকরচনার কৌশল। কাহারও মতে তিলক ধারণের মূল উদ্দেশ্য ভ্রূমধ্যে বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবার সহায়তা করা। [কালীবর বেদান্তবাগীশ পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য] কেহ বা বলিবেন বদনের শোভা সম্পাদনার্থ টিপ, তিলক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

তণ্ডুল অপূর্ব্ব কৌশলে ভূমিতলে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কখনও বা বিবিধ বর্ণের পুষ্প এইরূপে বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষেপ এরূপ নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হয় যে নানাপ্রকারের রেখা অঙ্কিত হইয়া বিবিধ শোভা বিকাশ করে। হয়ত কোন প্রাণীর মূর্ত্তি, অথবা কোনও তোরণ প্রভৃতি এইরূপে অঙ্কিত হয়। কেরলদেশে রমণীগণ বিবিধ চূর্ণ প্রক্ষেপদ্বারা নিজ নিজ ভবনের সম্মুখ অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। ইহার মূলে ভারতের এক প্রাচীন রীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এখন যেমন তণ্ডুলচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ প্রভৃতি বিবিধবর্ণে রঞ্জিত চূর্ণ সকল কেরলে বিক্ষিপ্ত হয়, পূর্ব্বে দেবালয় প্রভৃতিতে সেইরূপ বিচিত্র বর্ণের কুসুম ও রঞ্জিততণ্ডুল স্থাপিত হইত।

৭। পুষ্পাস্তরণ। বিবিধ বর্ণের পুষ্প সূত্রগ্রথিত হইয়া শয্যার ন্যায় সভাস্থল, দেবালয় প্রভৃতিতে স্থাপিত হয়। এইরূপ শয্যারচনাই পুষ্পাস্তরণ কলা।

৮। দশনবসনাঙ্গরাগ। দন্ত, বস্ত্র, ও অঙ্গের বিবিধ রঞ্জন কৌশল। কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন প্রভৃতি লেপনে প্রাচীন ভারতীয়গণ দেহ রঞ্জিত করিত। দন্ত ও বস্ত্রের শোভাবৃদ্ধির জন্যও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত। (Dyeing)

৯। মণিভূমিকাকর্ম্ম। বিবিধপ্রকারের প্রস্তরাদির দ্বারা কক্ষতল নির্ম্মিত করার কৌশলই মণিভূমিকাকর্ম্ম। যে সময়ে যেরূপ উপাদান উপকারী সেইরূপ উপাদানে ইহার নির্ম্মাণ যুক্তিযুক্ত।

১০। শয়ন রচনা। শীতগ্রীষ্মভেদে বিবিধপ্রকার উষ্ণতা বা শীতলতাজনক শয্যাবিন্যাস। ইহাতেও নৈপুণ্যের প্রয়োজন।

১১। উদকবাদ্য। জলে মৃদঙ্গাদিবৎ বাদ্যধ্বনি করা। গ্রীস্‌দেশে পূর্ব্বে এইরূপ ক্রীড়া ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক জলপূর্ণ পাত্রের কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তস্থিত এক পাত্র হইতে জল নিক্ষেপ দ্বারা ধ্বনি উৎপন্ন করিতে হইবে। জলতরঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যও আমাদের দেশে সুপরিচিত।

১২। উদকাঘাত। প্রাচীন ভারতে জলবিহার এক প্রধান আমোদ ছিল। বাস্তবিকই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলকেলি প্রীতিপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীতেও ক্রীড়ার অভাব নাই। বিভিন্ন দেশের স্নানাগার এ বিষয়ে উদাহরণ। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের জলক্রীড়ার কথা তাঁহার জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই ক্রীড়ার সময় বিবিধ প্রকারে সলিল তাড়না ও সলিল নিক্ষেপই উদকাঘাত কলা।

১৩। চিত্র যোগ। ইহা দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট ঘটাইতে পারা যায়। বিবিধ উপায়ে শত্রুর কেশ শুক্ল করণ বা কোন রোগ উৎপাদন করা যাইতে পারে। অথর্ব্ববেদে অভিচার মন্ত্র বিদ্যমান। ইহা দ্বারা প্রাচীন ভারতবাসীগণের একপ্রকার বিশ্বাসের উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে।

১৪। মাল্যগ্রন্থন। বিবিধপ্রকার মাল্যরচনা এ কলার বিষয়।

১৫। শেখর ও আপীড়ক যোজন। মস্তকের মাল্য রচনা এ কলার বিষয়। কোনও মালা শিখাস্থলে, কোনমালা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরিধৃত হইত। বেশবিন্যাসে ইহার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। নানাবর্ণের পুষ্পে রচিত মাল্য মস্তকের অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিত।

১৬। নেপথ্য প্রয়োগ। দেশ ও ঋতুভেদে বিশেষ বিশেষ বস্ত্র, মাল্য প্রভৃতি পরিধান। পরিচ্ছদ ও ভূষণবিন্যাসে সুনিপুণ হওয়ার আবশ্যকতা সে কালেও প্রথিত ছিল। উদ্ভট শ্লোকে আছে সমুদ্র মন্থনে পীতাম্বরধারী হরি লক্ষ্মীকে পাইলেন কিন্তু দিগম্বর মহাদেবের অদৃষ্টে গরল উঠিল।

১৭। কর্ণপত্র রচনা। দন্ত, শঙ্খ প্রভৃতির দ্বারা কর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মিত হইত। ইহাও বেশভূষার অন্তর্গত কলা।

১৮। গন্ধযুক্তি। বিবিধ সুরভি প্রয়োগ।

১৯। ভূষণ যোজন। কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার বিন্যাস।

২০। ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়াদি। ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রাচীন ভারতে কত সমাদৃত ছিল তাহা রত্নাবলী নাটিকা দশকুমারচরিত প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়।

২১। কৌচুমার যোগ। কুচুমার কর্ত্তৃক কথিত দেহরঞ্জনাদির বিষয়ে বিবিধ উপায়।

২২। হস্তলাঘব। সমস্ত কার্য্য ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত করা।

২৩। বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকার ক্রিয়া। বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করণ। রন্ধনবিদ্যাও একটি কলাবিদ্যা। (cookery)

২৪। পানকরসরাগাসবযোজন। বিবিধপ্রকার পানীয় মদ্যাদি প্রস্তুত করণ।

২৫। সূচীকর্ম্ম। নূতন পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণ বা পুরাতন বস্ত্রাদির সংস্কার সূচীকার্য্যের বিষয়। এটি প্রয়োজনীয় কলা।

২৬। সূত্রক্রীড়া। সূত্র ছিন্ন করিয়া বা দগ্ধ করিয়া সেই সূত্র পুনর্ব্বার অচ্ছিন্ন বা অদগ্ধ অবস্থায় প্রদর্শন। হস্তকৌশলে অঙ্গুলিবিন্যাসে বকুল প্রভৃতি দর্শন। ক্রীড়াবিষয়ে এই কলার অনুষ্ঠান।

২৭। বীণাডমরুকবাদ্য। বীণা, ডমরু প্রভৃতি বাদ্য।

২৮। প্রহেলিকা। ধাঁধা, হেঁয়ালি প্রভৃতি।

২৯। প্রতিমালা। হেঁয়ালির ন্যায় বিচিত্র উপায়ে রচিত শ্লোক। ইহার অন্ত্য অক্ষরসকল পাঠ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে অন্ত্যাক্ষরিকাও বলে।

৩০। দুর্ব্বাচক যোগ। যে সকল কথা বহু ক্লেশে উচ্চারিত হয়। শ্রুতিকটু শব্দবিন্যাস।

প্রহেলিকা, প্রতিমালা ও দুর্ব্বাচকযোগ ক্রীড়ার্থ ও তর্কচ্ছলে ব্যবহৃত হয়।

৩১। পুস্তক বাচন। উপযুক্ত স্বরে পুস্তক পাঠ। ইহাকে আবৃত্তি কলা বলা যাইতে পারে। (Recitation.)

৩২। নাটকাখ্যায়িকাদর্শন। গদ্য আখ্যায়িকাদি পাঠ ও নাটকাদির অভিনয় দর্শন।

৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণ। সংস্কৃতে এই সমস্যা পূরণ বহু আদৃত হইয়া রহিয়াছে।

৩৪। পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প। বেত্র দ্বারা আসন প্রভৃতি নির্ম্মাণ। এক্ষণে আমরা যেরূপ বেত নির্ম্মিত চেয়ার প্রভৃতি দেখি পূর্ব্বেও বেত্রনির্ম্মিত শয়ন ও আসনাদির সেইরূপ প্রচার ছিল।

৩৫। তক্ষকর্ম্ম। কাষ্ঠ কুঁদিয়া যে সকল দ্রব্য

৩৬। তক্ষণ। কাষ্ঠের খট্বা প্রভৃতি নির্ম্মাণ।

৩৭। বাস্তুবিদ্যা। গৃহাদিনির্ম্মাণ শাস্ত্র। কোন স্থলে কিরূপ ভিত্তিতে কিরূপ গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে তাহার বিবরণ। (Architecture).

৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা। দীনার প্রভৃতি মুদ্রা ও বিবিধ রত্নাদির দোষ, গুণ, মূল্যাদি নির্দ্ধারণ।

৩৯। ধাতুবাদ। বিবিধপ্রকার ধাতুর শোধন ও মেলন প্রণালী।

৪০। মণিরাগ ও আকরজ্ঞান। মণিতে বিবিধ বর্ণসঞ্চার ও খনিজ বিজ্ঞান।

৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ। উদ্যানে বৃক্ষাদি রোপণ ও বর্দ্ধনের নিয়ম শিক্ষা। (Horticulture).

৪২। মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধ। ইহা একটি প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব দেখাইতেছে। মেষ, কুক্কুট ও লাবক (পক্ষীবিশেষ) পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত। ঘোড়-দৌড়ের বাজীর ন্যায় এই সকল যুদ্ধেও জয়পরাজয়ের উপর বাজী রাখা হইত। সাঁওতালগণ এখনও কুক্কুট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

৪৩। শুকসারিকাপ্রলাপন। শুক, সারিকা প্রভৃতিকে মনুষ্য ভাষা শিক্ষাদান।

৪৪। উৎসাদন, সংবাহন ও কেশমর্দ্দন। পদদ্বারা মর্দ্দনের নাম উৎসাদন। হস্তদ্বারা মস্তক মর্দ্দনের নাম কেশমর্দ্দন। অন্যান্য অঙ্গে হস্তদ্বারা মর্দ্দনের নাম সংবাহন।

৪৫। অক্ষরমুষ্টিকাকথন। এক প্রকার গুপ্ত সঙ্কেত। যথা দ্বাদশ রাশির নাম না বলিয়া "মেবৃমিক-সিংকতুবৃধমকুমী" এই বলা হইল। ইহাতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই কয়েকটির আদ্য অক্ষর গৃহীত হইয়াছে।

৪৬। ম্লেচ্ছিতবিকল্প। ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান। ইহাতে রাজনীতিশাস্ত্রে বিশেষ উপকার হয়। দূতগণের ইহা অবশ্য শিক্ষণীয়। মহাভারতে বিদুর কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে জতুগৃহ বিষয়ে সংবাদ প্রেরণের বিষয় বোধ হয় সকলে অবগত আছেন।

৪৭। দেশভাষাজ্ঞান। দেশীয় বিভিন্ন ভাষায়

৪৮। পুষ্পশকটিকা। পুষ্পের বিবিধ কৌশল নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ।

৪৯। নিমিত্তজ্ঞান। পূর্ব্বে পক্ষীর রব প্রভৃতি শুনিয়া কোন কার্য্যের শুভাশুভ নির্ণয় হইত। গ্রীকদেরও এ বিশ্বাস ছিল। ইলিয়দ প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। শকুনশাস্ত্র নামেও ইহা কথিত হয়।

৫০। যন্ত্রমাতৃকা। বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ-প্রণালী। প্রথিত আছে বিশ্বকর্ম্মা ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

৫১। ধারণমাতৃকা। পুস্তকাদি স্মরণরাখা। মুখস্থবিদ্যার বলেই আজ আমরা বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাইতেছি, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রভাব ভারতে সুবিদিত।

৫২। সংপাঠ্য। অনেক ব্যক্তির মিলিত হইয়া পাঠ।

৫৩। মানসী কাব্যক্রিয়া। পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ বন্ধে শ্লোক রচনা ও তাহার পাঠ।

৫৪। অভিধানকোষ। বিবিধ প্রকার শব্দ ও তাহার অর্থ জ্ঞান।

৫৫। ছন্দোজ্ঞান। বিবিধ ছন্দের অভিজ্ঞতা।

৫৬। ক্রিয়াকল্প। সাহিত্যে অলঙ্কারাদি জ্ঞান।

৫৭। ছলিতকযোগ। ছদ্মবেশ ধারণ শিক্ষা।

৫৮। বস্ত্রগোপন। সুকৌশলে পরিচ্ছদ পরিধান রীতি। বৃহৎ বস্ত্রও কৌশলে পরিলে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে।

৫৯। দ্যুতবিশেষ। বিবিধ দ্যূতক্রীড়ার জ্ঞান।

৬০। আকর্ষক্রীড়া। পাশা খেলা শিক্ষা।

৬১। বালক্রীড়নক। বালকগণের পুতুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ

৬২। বৈনয়িকী বিদ্যা। হস্তিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, প্রভৃতি জ্ঞান।

৬৩। বৈজয়িকী বিদ্যা। অস্ত্রজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষ

৬৪। ব্যায়ামিকী বিদ্যা। বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষা।

এই চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ বাৎস্যায়ন কৃত কামসূত্র নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। বাৎস্যায়নকে অনেকে চাণক্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে এই গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শ্রীধর স্বামী রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাতেও চতুঃষষ্টি-কলার উল্লেখ আছে। পূর্ব্ববর্ণিত তালিকার সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই। কোন স্থলে দুইটি বিভিন্ন কলাকে এক করা হইয়াছে। কোথাও বা একটিকে দুইটি করা হইয়াছে। যেমন "মানসী কাব্যক্রিয়া" এইটিকে দুইভাগ করিয়া 'মানসী' ও 'কাব্যক্রিয়া' দুই কলা হইয়াছে।

এক্ষণে আর একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টিকলার বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে। এ গ্রন্থখানির নাম শুক্রনীতিসার। ইহা শুক্রাচার্য্যের বিরচিত। ইহার কতকগুলি কলা পূর্ব্ববর্ণিত তালিকার সহিত এক বটে কিন্তু অনেকগুলি পৃথক্।

হাবভাবযুক্ত নৃত্য, বিবিধ বাদ্যকরণে জ্ঞান, বস্ত্র ও অলঙ্কার বিন্যাস, বিবিধ বেশধারণ, শয্যা আস্তরণ নির্ম্মাণ ও মাল্য-গ্রন্থন, দ্যূতাদি ক্রীড়া ও বিবিধ রতিবন্ধ, এই সাতটি কলা গান্ধর্ব্ববেদের অন্তর্গত।

বিবিধ মদ্যপ্রস্তুতপ্রণালী, ব্রণ প্রভৃতি শস্ত্রদ্বারা ছেদন (Surgery), রন্ধনবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ধাতুপ্রভৃতি ভস্মকরণ, ইক্ষুর বিকারকরণ, ধাতুসংযোগ ও ঔষধাদি প্রস্তুতকরণ, ধাতুর মেলন ও পার্থক্য-করণ (Analysis and Synthesis) ধাতুমিশ্রিত করণ ও দ্রব্যসকল হইতে ক্ষার বহিষ্করণ, এই দশটি কলা আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

বিবিধ ভঙ্গীতে শস্ত্রনিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ, দূরে স্থিত লক্ষ্যে যন্ত্রাদিদ্বারা গোলা প্রভৃতি নিক্ষেপ, বাদ্যসঙ্কেতে সৈন্যগণের বিবিধ বিবিধ শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হওয়া (Drill) গজ অশ্ব ও রথের যুদ্ধে প্রয়োগ, এই পাঁচটি কলা ধনুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

বিবিধ আসন ও মুদ্রা অবলম্বনে দেবতা তোষণ, সারথ্য ও গজাশ্বের গতিশিক্ষা, মৃত্তিকা কাষ্ঠ ও প্রস্তরের পাত্রাদি নির্ম্মাণ, চিত্র অঙ্কন, কূপ প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ, ঘটিযন্ত্র নির্ম্মাণ, রঞ্জন বিদ্যা (Dyieng) জল বায়ু ও অগ্নিযোগে বাষ্পীয়যন্ত্রের ক্রিয়া, নৌকারথাদিনির্ম্মাণ, রজ্জুপ্রস্তুতপ্রণালী, বস্ত্রবয়ন, রত্নক্রিয়া, ধাতুবিজ্ঞান, কৃত্রিম-স্বর্ণাদিরচনা, প্রলেপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, চর্ম্মাদির মার্দ্দবকরণ (Tanning), পশুর অঙ্গ হইতে চর্ম্ম উন্মোচন (Skinning), দুগ্ধদোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃতপর্য্যন্ত করণ, সীবনকার্য্য, সন্তরণ, পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ, বস্ত্রমার্জ্জন (কাপড় কাচা), ক্ষৌরকর্ম্ম, তিল প্রভৃতি হইতে তৈলপ্রভৃতি আবিষ্কার, লাঙ্গল করা, বৃক্ষারোহণ, সেবানুষ্ঠান, বংশ বা তৃণদ্বারা পাত্রাদি রচনা, কাচপাত্রনির্ম্মাণ, জলসেচন ও জলরোধ, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, গজ ও অশ্বের পল্যাণ (জিন্) প্রভৃতি নির্ম্মাণ, শিশুরক্ষণে ও শিশুক্রীড়নে জ্ঞান, অপরাধীকে তাড়নজ্ঞান, বহুবিধ ভাষার বর্ণলেখন প্রণালী, তাম্বুলরক্ষা, ক্ষিপ্রকারিত্ব ও বিলম্বকারিত্ব এই চতুঃষষ্টি কলার বিষয় প্রদর্শিত হইল।

এখন দেখা যাক এই চতুঃষষ্টিকলা প্রাচীন ভারতে প্রয়োগ হইত—না কেবল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে? নিপুণভাবে সমস্ত নাটকাবলী ও কাব্য পাঠ করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, কলা সমস্তই প্রয়োগে অবলম্বিত হইত। আমরা বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি। গীত ও বাদ্যের উল্লেখ বহুস্থলে আছে। কেবলমাত্র একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। মলয়াবতীর বীণাবাদন প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিতেছেন—

"কি চমৎকার গান—কি চমৎকার বাদ্য।
দশবিধ প্রকরণে
স্বরধাতু করি প্রকটিত,
দ্রুত মধ্য বিলম্বিত
ত্রিধা লয় করি প্রদর্শিত,
গোপুচ্ছ প্রমুখ যতি তিনরূপ হইলেও
যথাক্রমে করি সম্পাদন,
বীণাযন্ত্র-অনুগত বিবিধ বাদ্যের বিধি
করিছেন দিব্য প্রদর্শন॥" [নাগানন্দ-প্রথম অঙ্ক

মৃচ্ছকটিকে রেভিল সম্বন্ধে চারুদত্তের উক্তিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। নৃত্যের একটি বর্ণনা এই—

"ওই চারু বাম হস্ত-স্থলগ্ন-কঙ্কন—
করিয়াছে আহা কিবা নিতম্বে স্থাপন।
দক্ষিণ হস্তটি দেখ কিবা অবস্থিত
মুক্তভাবে শ্যামা-শাখা যেন বিলম্বিত।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া পুষ্প আকর্ষণ করে
দৃষ্টি নিপতিত সদা কুট্টিম উপরে।
ঋজুভাবে অবস্থিত নৃত্য ভঙ্গিমায়
দীর্ঘীকৃত অর্দ্ধ বপু কিবা শোভা পায়॥"

[মালবিকাগ্নিমিত্র ২য় অঙ্ক]

ঐ নাটকের পঞ্চম অঙ্কে বিদর্ভরাজপ্রেরিত সঙ্গীতকলায় শিক্ষিতা দুই শিল্পকারিকার উল্লেখ আছে।

নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ প্রিয়দর্শিকা নাটিকার তৃতীয় অঙ্কে বিদ্যমান, যথা—

"আজ রাত্রে দেবীর সমক্ষে উদয়নচরিত নামক নাটকটির অভিনয় হবে।"

এই প্রকার নাটকের মধ্যে নাটক অভিনয় উত্তরচরিতেও আছে। নাট্যাভিনয়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নেপথ্যবিধানের উল্লেখ রাজশেখরকৃত কর্পূরমঞ্জরী নামক সট্টকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"আমাদের কুশীলবদের পরিজনবর্গ নাট্যোদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়েচে না কি? কেননা কেহ বা দেখছি বস্ত্র বেছে নিচ্চে; কেহ বা ফুল দিয়ে মালা গাঁথচে, কেহ বা পাগড়ীর কাপড় বিছিয়ে রাখচে, কেহ বা কাষ্ঠফলকে রং ফলাচ্চে কেহ বা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে শব্দ বার কচ্চে; কেহ বা বীণার পর্দ্দা ঠিক করচে। কেহ বা মৃদঙ্গগুলি বাদ্যের জন্য সজ্জিত করচে, এই মাজাঘসা চক্‌চকে কাংস্য করতাল হ'তে ঝন্‌ঝন্ শব্দ বেরচ্চে। আর এই ধ্রুবগীতের আলাপ চল্‌ছে।"

[কর্পূরমঞ্জরী প্রথম যবনিকান্তর]

আলেখ্যের উল্লেখ নাটকসমূহে বহুস্থলে দেখা গিয়াছে। আলেখ্য অঙ্কনের রং সম্বন্ধে নাগানন্দে বিদূষক বলিতেছে—

"দেখ সখা! তুমি আমাকে একটা রং আন্‌তে বলেছিলে, আমি দেখ, পাঁচ রকম রং এনেছি। এই নেও ছবি আঁকো।"

[দ্বিতীয় অঙ্ক] তুলি প্রভৃতির উল্লেখও বহুস্থলে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি এবিষয়ে দ্রষ্টব্য।

মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে অনেকগুলি কলার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে লোকের গা টিপিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই সংবাহনকলার উদাহরণস্বরূপ মৃচ্ছকটিকের সংবাহকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে এইরূপে নিজ পরিচয় দিতেছে—

"ঠাকরুণ, পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি, আমি গৃহস্থ

[দ্বিতীয় অঙ্ক] দ্যূতক্রীড়ার পরিচয়ও ঐ নাটকে বিদ্যমান। একজন জুয়ারি বলিতেছে—

"পড়িলে 'তিয়া'র দান সরবস্ব যায়,
'দোয়া' দান পড়িলে গো শরীর শুখায়,
'এক্কায়' খেলার মার্গ করে প্রদর্শন
'চারি' দানে বিনিপাত—করে পলায়ন॥" [২য় অঙ্ক

উদ্যানরচনার বর্ণনাও ঐ নাটকে পাওয়া যায়, যথা—

কি সুন্দর বাগানটি! কত রকমের গাছ; আর কি চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে।...স্বর্ণ জুই, শিউলি, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা কুরুবক, মাধবীলতা হতে অজস্র ফুল আপনা আপনি ঝরে পড়ছে। [৪র্থ অঙ্ক]

শুকসারিকাপ্রলাপনকলারও উল্লেখ আছে।

"খাঁচার মধ্যে শুকপাখী দই ভাতে উদর পোরা ব্রাহ্মণের মত যেন বেদমন্ত্র পাঠ করচে। এদিকে আবার কতকগুলি ময়না-শালিক প্রভুর আদুরে দাসীর মত ক্রমাগত কি বিড়বিড় করে বক্‌চে।" [৪র্থ অঙ্ক]

রত্নাবলীর সারিকার কথা পাঠক স্মরণ করিবেন। [২য় অঙ্ক]

রূপ্যরত্নপরীক্ষা, মণিরাগ, ভূষণযোজন প্রভৃতি কলার উদাহরণও ঐ অঙ্কে রহিয়াছে। যথা—

"শিল্পীরা প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্ন বাছাই করচে। সোনা দিয়ে মাণিক বাঁধচে। লাল সুতো দিয়ে সোণার অলঙ্কার গড়চে। মুক্তা গেঁথে আভরণ তৈরি করচে বৈদূর্য্যমণি ধীরে ধীরে গুঁড়ো করচে। শাঁখ কাটচে, প্রবাল শানে ঘস্‌চে।"

গন্ধযুক্তি কলার উদাহরণও ঐখানে বর্ত্তমান—যথা,—

"ভিজে কুঙ্কুম শুখোতে দিয়েছে, কস্তুরি পরিষ্কার

বস্ত্র প্রভৃতি সুবাসিত করা সেকালে প্রচলিত ছিল।

"চারদত্তের প্রিয়সখা চূর্ণ বৃদ্ধ জাতিকুসুমবাসিত এই উত্তরীয়টি পাঠিয়েছেন।"

[১ম অঙ্ক] রন্ধনকলার উল্লেখও রহিয়াছে।

"এই পঞ্চম মহলটা দেখছি হিং তেলের গন্ধে ভরপুর ...নানাপ্রকার খাবার জিনিষ তৈরি হচ্চে...ওদিকে আবার কসাই বালক কাটা পশুর উদরের মাংস ছেঁড়া কাপড়ের মত কচলে ধুচ্চে। পাচক নানাপ্রকারের খাদ্য সামগ্রী রাঁধচে—মোয়া তৈরি করচে—পিঠে ভাজ্চে।"

পুস্তকবাচন ও আকর্ষক্রীড়াকলা সম্বন্ধে এই বাক্য দেখা যায়—

"তথ তার উপর অর্দ্ধপঠিত পুস্তক ও মণিময় পাশার গুটি সব পড়ে আছে।"

বস্ত্ররঞ্জনকলার পরিচয় সংবাহকের কথায় জানা যাইতেছে।

"এই কাপড়টা গেরুয়া রঙে ছোপান গেছে।" [৮ম অঙ্ক]

বালক্রীড়নক নির্ম্মাণ কলার উল্লেখ ষষ্ঠ অঙ্কে রহিয়াছে—যথা

"আমাদের প্রতিবাসীর একটি ছেলে সোনার খেলনা-গাড়ি নিয়ে খেলা করছিল।"

ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ারূপ কলা রত্নাবলীর চতুর্থ অঙ্কে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাদুকর চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতেছে—

"হরিহর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ
আর ওই দেবরাজে করি যে দর্শন
সিদ্ধ বিদ্যাধর আদি, সুরবধূ সাথে
ওই দেখ শূন্যে সব নৃত্যামোদে মাতে।"

পরে অলীক অগ্নি প্রদর্শন প্রভৃতি অদ্ভুত ক্রীড়া আছে। বিবিধ লিপিজ্ঞানের উল্লেখ বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কে রহিয়াছে। যথা—

"আমরা অষ্টাদশ প্রকারের লিপি জানি।"

ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান, বেদভাষাজ্ঞান ও ছলিতক-যোগ কথাগুলির উদাহরণ মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

"নানা দেশের ভাষাভিজ্ঞ ও বেশাভিজ্ঞ, আচার-ব্যবহারজ্ঞ বিবিধ চিহ্নধারী গুপ্তচর নিযুক্ত করা গেছে। (প্রথমঅঙ্ক)

চিত্রযোগ কলার উদাহরণও ঐ নাটকে আছে। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে বধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। অভয়দত্ত নামক একজন বৈদ্য "চন্দ্রগুপ্তের জন্য বিষচূর্ণমিশ্র ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু দুর্ম্মতি চাণক্য কনক পাত্রে তার বর্ণান্তর উপলব্ধি করে চন্দ্রগুপ্তকে বল্লে বৃষল, বৃষল, এ ঔষধে বিষ আছে পান করো না।" [২য় অঙ্ক]

প্রহেলিকা, প্রতিমালা প্রভৃতি হেঁয়ালির উল্লেখ কাদম্বরীতে আছে। যথা—

"কদাচিদক্ষরচ্যুতকমাত্রাচ্যুতক বিন্দুমতী গূঢ়চতুর্থপাদ প্রহেলিকা প্রদানাদিভিঃ......দিবস মনৈষীৎ।"

ধাতুবাদকলা পূর্ব্বে আদৃত ছিল। ইউরোপে অ্যালকেমিষ্টদিগের প্রভাব একসময়ে সমধিক হইয়াছিল। ভারতের রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ চর্চ্চা হওয়া অসম্ভব নয়। ক্ষেমীশ্বর নিজ নাটকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

"গুটিকা, অঞ্জন, বজ্র, দৈত্যাঙ্গনা, রসায়ন
ধাতুবাদ আছে বিধি যত,
সে সব বেতালসিদ্ধি শোনো ওগো মহারাজ
আছে মোর করতলগত।"

[চণ্ডকৌশিক নাটক ৪র্থ অঙ্ক

শেখর, আপীড়ক যোজন, মাল্যগ্রন্থন ও কর্ণভূষণ রচনা সংস্কৃতে বহুকাব্যে পাওয়া যায়। ঋতুসংহার দ্বিতীয় সর্গে আছে—

"শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং
বিকসিতনবপুষ্পৈযু থিকাকুণ্ডলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎকাল এষঃ॥"

কর্ণভূষণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞানশকুন্তলে আছে—

"ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং।

('প্রমদাগণ সদয়ভাবে শিরীষপুষ্প দ্বারা কর্ণভূষণ করিতেছে।)

কৌচুমারযোগের উদাহরণস্বরূপ মেঘদূতের এই পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈঃ"

[পূর্ব্বমেঘ] ইহাতে রমণীগণ ধূপদ্বারা কেশসুরভি করিত তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

হস্তিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, ছন্দ, অভিধান প্রভৃতি শিক্ষার উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিচিত্র মেষকুক্কুটলাবক যুদ্ধের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। এই বিষয়টি এখনকার কালে কৌতূহলজনক। লাবকযুদ্ধ সম্বন্ধে মৃচ্ছকটিকে আছে "লাওয়া পাখীরা লড়াই কচ্চে।"

[চতুর্থ অঙ্ক] মেষ ও কুক্কুটযুদ্ধের বর্ণনা দুইখানি ভাণ নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সকল বাক্যাবলী সংস্কৃত নাটকসমূহ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদ। এক্ষণে আমরা যে দুইখানি ভাণগ্রন্থ হইতে উদাহরণ দিব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার অনুবাদ করেন নাই। এই গ্রন্থদ্বয় তত সুপরিচিতও নহে। সেইজন্য অনুবাদের সঙ্গে মূলও উদ্ধৃত হইল।

মেষযুদ্ধবর্ণনা শৃঙ্গার-ভূষণ নামক ভাণগ্রন্থে বিদ্যমান। এই গ্রন্থ বামনভট্টবাণবিরচিত। সেই শ্লোকটি এই—

"পশ্চাৎ কিঞ্চিদিবোপসৃত্য মিলিতৌ তির্য্যঙ্নমৎকন্ধরৌ
শৃঙ্গাগ্রাহিতলোহশৃঙ্খলখলাৎকারক্রুধা মেষরৌ।
কূটাস্ফালনঘোরমস্তকযুগব্যাঘাতভীমারবৌ
কুর্ব্বাতে প্রহকিং বিটপ্রণিহিতৌ মেষৌ সরোষাবিমৌ॥"

কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার গ্রীবা বাঁকাইয়া ছুটিয়া আসিয়া মিলিত হইতেছে। শৃঙ্গের অগ্রভাগস্থিত লৌহশৃঙ্খলের খন্ খন্ শব্দ হইতেছে। ক্রুদ্ধ মেষদ্বয়কে বিটগণ যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। উভয় মেষের আস্ফালনের পর যুগল মস্তক আহত হইয়া ভীম শব্দ উৎপাদন করিতেছে।]

শ্রীনল্লাকবিরচিত শৃঙ্গারসর্ব্বস্ব ভাণে কুক্কুটযুদ্ধ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"কিঞ্চিচ্ছিদ্রোপলম্ভাদভিপততি জবাদুন্নমৎ কণ্ঠনালো
ভূয়ো বৈরিপ্রহারান্ পরিহরতি পরিভ্রাম্যতি প্রান্তমেতি।
উড্ডীয়োড্ডীয় চঞ্চৎপাকতুরূমরুদুদ্ধূতপর্য্যন্তধূলী
পালীকং কুক্কুটেন্দ্রঃ পদনখশিখরৈরন্যমঙ্গে নিহন্তি॥"

কোন ছিদ্র পাইয়া কণ্ঠ উন্নত করিয়া দ্রুত আক্রমণ করিতেছে। প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেছে। ঘুরিতেছে, একধারে যাইতেছে। উড়িয়া উড়িয়া বায়ু কর্তৃক উদ্ধৃত ধূলিধূসরিতকায় অন্য কুক্কুটকে পদনখ দ্বারা অঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে।

এখন স্পষ্টই দেখা গেল যে এই চতুঃষষ্টি কলা প্রাচীনভারতে সুপ্রচলিত ও সমাদৃত ছিল। বহু প্রাচীনকালের লুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল দেখিয়া যেমন তাহার আকার কল্পনা হইয়া থাকে, তেমনি এই কলানিচয় হইতে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা অনুমিত হইতে পারে। আজ সকলই অন্তর্হিত, মৃত্তিকাভাণ্ড নির্ম্মাণেও বৈদেশিক শিল্পভবনে শিক্ষা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধে কি আর বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম, এ।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত

(২৬) দেহাত্মবাদ খণ্ডন।

দার্শনিক জগতে শঙ্করের প্রধান কীর্ত্তি চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ খণ্ডন। চার্ব্বাক বলিতেছেন :—

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বার্য্য নিলানলঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলুভূতেভ্যশ্চৈতন্য মুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥
অহং স্থূলঃ কৃশোস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ সএবাত্মা নচাপরঃ।
মম দেহোহয়ং ইত্যুক্তিঃসম্ভবেদৌপচারিকী"
ইতি (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)॥

ভূমি, বারি, অনিল এবং অনল এই চারিটী স্থূলভূত। কিণ্বাদি সুরাবীজের পৃথক অবস্থানকালে তাহাদের মধ্যে কোন মাদকত্ব গুণ থাকে না। কিন্তু সে সকল পরস্পর মিশ্রিত হইলেই মাদকত্বগুণ লাভ করে। ভূমি-বারি প্রভৃতি স্থূল ভূতেরও সেইরূপ পৃথক্ অবস্থানকালে তাহাদের চৈতন্য গুণ থাকে না, কিন্তু এ সকল পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত হইলে, চৈতন্যরূপ গুণবিশেষ লাভ করে। আমরা বলিয়া থাকি 'আমি স্থূল' বা 'আমি কৃশ'—ইহা দ্বারা স্থূলত্বের সহিত আমিত্বের সমানাধিকরণতা (যেই স্থূল সেই আমি) বুঝায়। স্থূলত্বাদির সহিত দেহেরই যোগ। স্থূলত্ব-কৃশত্ব দেহেরই ধর্ম্ম। স্থূলত্বাদি দেহধর্ম্মের সহিত আমিত্বের সামানাধিকরণ্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমিত্ব বা আত্মত্বও দেহেরই ধর্ম্ম-বিশেষ। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। তবে যে সময়ে সময়ে আমরা "আমার দেহ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা ঔপচারিক অথবা কথার কথা মাত্র। পাঠক দেখিতেছেন যে চার্ব্বাকের মতে আত্মা দেহেরই ধর্ম্ম-বিশেষ (Cf. "Function of the brain"), শঙ্করের মত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শঙ্করের মতে দেহ এবং সমস্ত দৃশ্যজগৎ এক আত্মারই উপাধি বা গুণ বিশেষ মাত্র। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী এক ভূমা মহান্ আত্মারই প্রকাশ-ভেদ মাত্র।

চার্ব্বাকের মতে "না প্রত্যক্ষং প্রমাণং"। প্রত্যক্ষ ভিন্ন তিনি কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না। আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এজন্য তিনি প্রসিদ্ধ পঞ্চভূত হইতে আকাশকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ভূতচতুষ্টয় মাত্র স্বীকার করিতেছেন। চার্ব্বাক্ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না :—"তস্মাদবিনাভাবস্য দুর্ব্বোধতয়া নানুমানস্যাবকাশঃ।" অতীত এবং অনাগত যখন কেহ জানে না, তখন ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবের (Uniformity of nature) জ্ঞান সম্ভবপর নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞান যখন অসম্ভব তখন অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি আজ আছে, কিন্তু কল্য যে থাকিবে, অথবা লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে যে ছিল, কে বলিবে? অতএব অগ্নিতে হাত দিলেই যে হাত দগ্ধ হইবে, এমন কথা বলা যায় না। অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া চার্ব্বাক্ কিন্তু নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছেন, কারণ কিণ্বাদি সুরা-বীজের মদ-শক্তিলাভ দৃষ্টে দেহাকারপরিণত ভূতচতুষ্টয়ের চৈতন্য-

শক্তি-লাভ অনুমান করা তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না।

শঙ্করের দেহাত্মবাদ খণ্ডনের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। শঙ্কর তাহার সূত্র ভাষ্যে (অ ৩। পা-৩। সূ-৫৪) বলিতেছেন :—"রূপাদি দেহ-ধর্ম্ম যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ থাকে, কিন্তু মৃতাবস্থায় দেহ থাকা সত্ত্বেও প্রাণনাদি চেষ্টা থাকে না। আবার একজনের রূপাদি দেহধর্ম্ম আর একজনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, কিন্তু চৈতন্য-স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম জীবিতকালেও একজনের আর একজনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না।" এজন্য কিম্বাদি অথবা অন্য কোন জড় বস্তুর গুণের সহিত চৈতন্য-স্মৃতি প্রভৃতির তুলনা হয় না। অতএব মৃত্যুর পরে চৈতন্যের অপ্রত্যক্ষত্বরূপ যে হেতু অবলম্বন করিয়া চার্ব্বাক্ চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করিতেছেন, দেহের জীবিতকালেও সেই চৈতন্য অপ্রত্যক্ষ থাকাতে সেই হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ, অর্থাৎ তাহা দ্বারা পক্ষে কি বিপক্ষে কোনরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—"যদিও জীবিতাবস্থায় দেহ থাকিলে চৈতন্য স্মৃতি প্রভৃতির সদ্ভাব নিশ্চয়রূপে অনুমান করা যায়, কিন্তু দেহ জীবিত না থাকিলে চৈতন্য-স্মৃত্যাদির অভাব নিশ্চয়রূপে অনুমান করা যায় না, কারণ এই দেহ পতিত হইলেও, চৈতন্য-স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম অন্যত্র কিম্বা দেহান্তরে সঞ্চারিত হইয়া থাকিতে পারে; শুধু এই সংশয় দ্বারাও পরপক্ষ প্রতিবিদ্ধ হইতেছে। যাহারা ভূত সকল হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় বলিতে চায়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে চৈতন্য কিংস্বরূপ? লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাক্) ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা মৌলিক পদার্থেরই সত্তা স্বীকার করে না। "চৈতন্য" পূর্ব্বভাবী (Antecedent) রূপে আছে বলিয়াই তদ্দ্বারা ভূত এবং ভৌতিক গুণ সকলের অনুভব জন্মে। ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে যেহেতু ভূত এবং ভৌতিক গুণ সেই চৈতন্যেরই বিষয় (objects of consciousness) এবং উত্তর ভাবী (Consequent), অতএব সেই পূর্ব্বভাবী চৈতন্য উত্তরভাবী ভৌতিকের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ভৌতিক গুণের নিজের উপরে নিজের ক্রিয়া কথাই বিরুদ্ধ। অগ্নি দাহ করে বলিয়া অগ্নি নিজেকে কখনও দাহ করে না। চৈতন্য যদি ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম্ম হইত, তবে ভূত এবং ভৌতিকের ধর্ম্ম তাহার বিষয় হইত না, —যেমন রূপ কখনও নিজের বা পরের রূপ দেখে না। কিন্তু চৈতন্য বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক সকল বস্তুকেই আপনার জ্ঞানের বিষয় করে। আবার যেমন আমরা চৈতন্যকে ভূতভৌতিক বিষয়ের উপলব্ধিকারক বলিয়া জানি, সেইরূপ আবার ভূত-ভৌতিক হইতে আত্মা যে পৃথক তাহাও আমরা জানি,—কারণ আমরা বুঝি যে আমাদের আত্মা উপলব্ধৃ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ, কিন্তু ভূত-ভৌতিক সেরূপ নয়,—জ্ঞেয় মাত্র। এতদ্দারাও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তত্ব এবং নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়, কারণ উপলব্ধির স্বরূপ বা জ্ঞাতৃত্ব সর্ব্বদাই একরূপ। আবার 'আমি উহা দেখিয়াছিলাম', এইরূপ কালান্তর বা অবস্থান্তর যোগ হইলেও আমরা নিজেকে সর্ব্বদা উপলব্ধৃরূপে অনুভব করি। স্মৃতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্ভাবনা দ্বারাও আত্মার

দেহ-ব্যতিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়। অপরদিকে প্রদীপ প্রভৃতি উপকরণ বা সাহায্যকারী থাকিলেই উপলব্ধি হয়, না থাকিলে উপলব্ধি হয় না,—তাহা বলিয়া উপলব্ধিকে যেমন প্রদীপাদি-ধর্ম্ম বলা যায় না,—সেইরূপ দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়, দেহ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না,—বলিয়া উপলব্ধি দেহধর্ম্ম হইবে না। প্রদীপাদির ন্যায় দেহ ও উপকরণ বা সাহায্যকারীর স্থানীয় মাত্র হইতে পারে। আবার উপলব্ধির সহিত দেহের কোন অচ্ছেদ্য যোগ দেখা যায় না। স্বপ্নকালে দেহ যখন নিশ্চেষ্ট থাকে, তখনও নানা প্রকার উপলব্ধি দর্শন হয়। অতএব দেহ হইতে পৃথক আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সংশয় নাই।"

স্বপ্নপ্রত্যক্ষ ঘটনা সকল সম্বন্ধে শঙ্কর আরও বলিতেছেন *;—"লোকে যখন নিদ্রা যায় তখনও (জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়) বড় ছোট নানারূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, এবং জাগরিত হইবার পূর্ব্বে সে মনে করে যে, সে সকল তাহার নিশ্চিত বিজ্ঞান (Perception),—জাগ্রৎ-প্রত্যক্ষেরই মতন নিশ্চিত,—স্বপ্নকালে সে মনে করে না যে, জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের ছায়া স্বরূপ স্বপ্নকালে সে সর্প-দংশন, এবং উদক-স্নানাদি কার্য্য প্রত্যক্ষ করে। যদি বল এ সকল কার্য্য মিথ্যা তাহার উত্তরে বলিতেছি ঃ—যদিও স্বপ্নকালের সর্পদংশন এবং উদকস্নানাদি কার্য্য স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইলে পর, জাগ্রতের তুলনায়, মিথ্যা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, তথাপি স্বপ্নদ্রষ্টা যে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিল তাহা সত্য ; কারণ জাগরিত হইলে পরেও সেই স্বপ্ন-প্রত্যক্ষের ফলভূত অবগতি (বা স্মৃতি) বাধিত হয় না। স্বপ্ন হ'তে উত্থিত ব্যক্তি যদিও মনে করে যে স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন এবং উদক-স্নানাদি মিথ্যা, কিন্তু সে যে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহাও মিথ্যা এরূপ মনে করে না। স্বপ্ন-দ্রষ্টার স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ-জনিত অবগতি অবাধিত থাকাতে, দেহমাত্রাত্মবাদ দূষিত হইল।" (অ-২। পা-১। সূ-১৪ ব্রহ্ম-সূত্র)। জাগ্রৎ কালে যেমন জাগ্রৎকালীন দেহাদি-সম্বন্ধী অবগতি বাধিত হয় না, বা সত্য বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালেও স্বপ্নকালীন দেহাদির অবগতি বাধিত হয় না, বা সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলে পরেও সকলেই মনে করে যে স্বপ্নে সে সকল দর্শন হইয়াছিল, কেহ মনে করে না যে দর্শন হয় নাই। অবগতির অবাধিতত্ব বা সত্যত্ব স্মৃতি স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদি সম্বন্ধে যেরূপ, জাগ্রদ্দৃষ্ট দেহাদিরও সেইরূপ। এই কারণে স্বপ্ন-দৃষ্ট দেহাদি হইতে যেমন আত্মাকে বা 'আমাকে' পৃথক্ মনে করা হয়, জাগ্রদ্দৃষ্ট দেহাদি হইতেও আত্মা বা 'আমি' পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে।

অনেক সময়ে স্বপ্ন-ব্যাপারকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না,—কারণ বহুদূরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঘরে বসিয়া স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইতে শোনা যায়। দূরদেশে স্বামী পরলোক গমন করিতেছে, ঠিক্ সেই সময়ে

---

*স্বপ্ন বিষয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয়কারিকায় এবং তাহার শাঙ্কর ভাষ্যে যে আলোচনা আছে তাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ঘরে থাকিয়া স্ত্রী তাহা স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করিতেছে। আবার অনেক সময়ে স্বপ্নে ভাবী ঘটনার পূর্ব্বাভাস লাভ হয়।

সে যাহা হউক, চার্ব্বাক্ যেরূপ ব'লতেছেন, "আমি স্থূল", "আমি কৃশ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আপাততঃ দেহের সহিত 'আমি' বা আত্মার সামানাধিকরণ্য বুঝায় বটে, কিন্তু স্বপ্নকালে সেই সামানাধিকরণ্য থাকে না,—কারণ তখন দেহজ্ঞান থাকে না, কিন্তু আমি-জ্ঞান থাকে। বস্তুতঃ 'আমি শব্দের নানা অর্থ। পঞ্চদশী বলিতেছেন "অহং" শব্দের তিনটী অর্থ,—একটি মুখ্য আর দুইটি গৌণ। অজ্ঞ সংসারী লোকেরা কূটস্থ-চৈতন্য (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত বা তুরীয় ব্রহ্ম), আভাস-চৈতন্য বা জীব, এবং শরীর এ তিনটি একত্র করিয়া, এবং ভ্রম বশতঃ একটাতে আর একটা আরোপ (অন্যোন্যাধ্যাস) করিয়া, 'অহং' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাই মুখ্য অর্থ বলা যায়। (২) তত্ত্বজ্ঞানীরা কখন কখনও আভাস-চৈতন্য বা জীবকে পৃথক্ ভাবে 'অহং' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ইহাকে গৌণ অর্থ বলা যায়। (৩) তত্ত্বজ্ঞানী কখন কখনও কূটস্থ-চৈতন্য বা তুরীয় ব্রহ্মকে পৃথক্ ভাবে 'অহং' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন ("ব্রহ্মাহমস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি)। ইহাও গৌণ অর্থ।" * অজ্ঞ লোকেরা আবার অনেক সময়ে বিশেষ বিচার না করিয়া, অনাত্মা পরিবর্ত্তনশীল দেহাদি উপাধি-সমষ্টি-মাত্রের প্রতিই 'অহং' বা 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। 'আমি স্থূল হইয়াছি' ইত্যাদি বাক্যে 'আমি' শব্দে দেহাদি উপাধি-সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ 'আমি' শব্দ বাচ্য উপাধি-সমষ্টির মধ্যে স্থূলত্বরূপ উপাধির যোগ হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেহাত্মবাদের কোন প্রমাণ হয় না। অনেক সময়ে আবার লোকে 'আমার দেহ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, "আমি" হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া থাকে।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে জড় চেতনের (Matter and spirit) মধ্যে এতকাল যে প্রাচীর ছিল, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানাচার্য্যদিগের অনুশীলনের ফলে সেই প্রাচীর বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রকাশিত (kinetic) হউক, বা অপ্রকাশিত (Potential) হউক, যাহা যেখানে আছে,—জড়ত্বই হউক, আর চেতনত্বই হউক, তাহাই সেখানে প্রকাশ পায়, যাহা যেখানে নাই, তাহা সেখানে প্রকাশ পায় না। তিল হইতেই তৈল হয়, বালি হইতে হয় না। আধুনিক দর্শন এবং বিজ্ঞান যে মৌলিক পদার্থের আভাস প্রদান করিতেছে, তাহা জড় (Matter), এবং চেতনের (Spirit), অথবা গ্রাহ্য (object)

---

* একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থ স্ত্রিবিধোঽহমঃ ॥৯॥
অন্যোন্যাধ্যাস-রূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্বপুঃ।
একীভূয় ভবেন্ মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে ॥১০॥
পৃথগাভাস-কূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ।
পর্য্যায়েণ প্রযুঙ্ক্তেঽহং শব্দং লোকে চ বৈদিকে॥১১

এবং গ্রাহকের (Subfect) মিলিত আধার। অথবা চুম্বকের (magnet) উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের ন্যায়, জড় এবং চেতন, অথবা গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয় সেই একই মৌলিক পদার্থের দুইটি কেন্দ্র মাত্র। সেই মৌলিক পদার্থই বেদান্তে ব্রহ্মনামে অভিহিত (২৮)। Compare Hegels "Identity of contraries."

সে যাহা হউক, আমরা চার্ব্বাকের কথারই আলোচনা করিতেছিঃ— আত্মা বা চিৎপদার্থ যদি নাই থাকে, এবং জড় মাটি-জল-বায়ু গঠিত দেহমাত্রই যদি আত্মা বা 'আমি' হয়, তবে স্মৃতি কিরূপে সম্ভবপর? শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"স্মৃতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্ভাবনা দ্বারাও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়"—৩—৩৫৪॥ আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ বিশদরূপে প্রদর্শন করিতেছি। দেহের পরমাণু সকল নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অস্থি-দন্ত-কেশ-নখাদি যে সকল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে কোন চৈতন্য লক্ষিত হয় না, অথবা অস্থি-দন্ত-কেশ-নখাদিতে কেহ বিশেষভাবে আমিত্বও আরোপ করে না। প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) বা দেহ-সার নামীয় যে জড় পদার্থ, চৈতন্যের ভৌতিক আধার বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে (physical basis of life), এই দেহরূপ রাসায়নিক আগারেই তাহা জীবন লাভ করিয়া ক্ষণকাল মাত্র তথায় অবস্থানান্তে মৃত্যু দশাপ্রাপ্ত হইয়া, রূপান্তরিত, এবং নিয়ত শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইতেছে। শরীর যথার্থই 'করি-কর্ণ-লোল'। দৈহিক পরমাণু-সকলের গতাগতি নদীর স্রোতোবেগ হইতেও দ্রুতগামী। এজন্য আজ আমার যে শরীর আছে, কাল আমার ঠিক্ সেই শরীর থাকে না। রাসায়নিক সংযোগের গুণে, দৈহিক পরমাণু সকলই ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া, আত্মা নামের যোগ্য হয়,—চার্ব্বাকের একথা সত্য হইলে,— যে দৈহিক পরমাণু-নিচয় যে ব্যাপারের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বদ্ধ, সেই ব্যাপার সম্বন্ধেই মাত্র সেই পরমাণু-নিচয়ের চৈতন্যগুণ সম্ভবপর। কিন্তু সেই পরমাণু-নিচয় সেই ব্যাপারের সহিত সম্বদ্ধ হইবার পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে, তাহার পক্ষে চৈতন্য বা জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? দশ-বৎসর পূর্ব্বের দৈহিক পরমাণু (protoplasm) আজ একটীও তোমার শরীরে নাই, অথচ তুমি কিরূপে দশবৎসর পূর্ব্বের ঘটনা আজ স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছ? অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ কিরূপে তাহার বাল্য-জীবনের ঘটনা সকল স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছে? এই স্মৃতি কার্য্য কাহার? স্মৃতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া, এই দৈনন্দিন দৈহিক বিপ্লব হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইতেছে? যে পরমাণুচয় যে ঘটনা দেখে নাই, সেই পরমাণুচয় সেই ঘটনা স্মরণ করিবে কিরূপে? যদি বল যে এক পরমাণু-সমষ্টির সহিত সম্বদ্ধচৈতন্য-স্মৃতি, তাহার স্থলাভিষিক্ত ভিন্ন পরমাণুসমষ্টিতে সংক্রামিত হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এইঃ—কিরূপে তাহা সম্ভব? যদি জ্ঞান-স্মৃতি প্রভৃতি এক পরমাণু-সমষ্টি হইতে ভিন্ন পরমাণুসমষ্টিতে গমন করিতে সক্ষম হয়, তবে সেই চৈতন্য আর গুণ (Abstract quality) রহিল না। গুণী (Concrete thing) হইল, একটি পৃথক্

বস্তু হইল, দেহ হইতে আত্মা পৃথক হইল। যদি বল যে চৈতন্য এই দেহেরই স্থান-বিশেষের গুণ, এবং যে পরমাণু সেই স্থান অধিকার করে, সেই পরমাণুই সেই চৈতন্য লাভ করে। তাহার উত্তর এই :—চৈতন্য যদি গুণ (Abstract quality) মাত্র হয়, তবে গুণীকে (Concrete thing) আশ্রয় না করিয়া নিরধিষ্ঠানভাবে থাকিতে, অথবা এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে গমনাগমন করিতে পারে না। দৈহিক পরমাণু সকলের দৈনন্দিন বিপ্লবের মধ্যে চৈতন্য-স্মৃতি যে গুণীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই দেহ হইতে ভিন্ন, এবং তাহাই আত্মা। অতএব দেহের অথবা দৈহিক পরমাণুর বিনাশে আত্মার চৈতন্যের বিনাশ হয়, মনে করা যাইতে পারে না। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" চার্ব্বাকের এই আশঙ্কারও কোন ভিত্তি থাকে না।

প্রত্যক্ষ-অনুভূতি সকলের নিকটেই "শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।" এখন দেখা যাউক প্রত্যক্ষ দেহাত্মবাদ বিষয়ে কি বলে? ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানের নামই 'প্রত্যক্ষ।' অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আমি একটী বৃক্ষ দেখিতেছি। এস্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞাত বস্তু কি? আমার চক্ষু এখানে, বৃক্ষ তাহা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কোথায়? তুমি হয়ত বলিবে সেই বৃক্ষ হইতে আলো প্রতিভাত হইয়া আমার চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আমার দর্শন-স্নায়ুর উপরে সেই বৃক্ষের ছবি অঙ্কিত করে। সেই ছবিই কি প্রত্যক্ষ? বরং বিপরীত সেই ছবি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানত দূরের কথা, তাহার সম্বন্ধে কাহারও কোন রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানই নাই। সেই বৃক্ষছবি ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র, বৃক্ষ প্রকাণ্ড। সেই ছবির সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইল, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মিল না। বৃক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইল না, অথচ বৃক্ষের জ্ঞান জন্মিল। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় বৃক্ষ প্রত্যক্ষ নয়, বৃক্ষজ্ঞানই মাত্র প্রত্যক্ষ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বৃহদারণ্যক ভাষ্যে তাঁহার প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর আপত্তি বর্ণন করিতেছেনঃ—"বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ ঘট বা প্রদীপাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। যে বস্তু ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই অন্য বস্তু, সেই বস্তু-মাত্রাত্মকই দৃষ্ট হয় (যথা মৃত্তিকা এবং ঘট)। স্বপ্নবিজ্ঞান-গ্রাহ্য ঘট-প্রদীপাদি বস্তুর স্বপ্ন-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না বলিয়া যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদি স্বপ্নবিজ্ঞান মাত্রই জানা যায়, সেইরূপ জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদিরও জাগ্রদ্বিজ্ঞান ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, অতএব তাহাও জাগ্রদ্বিজ্ঞানমাত্র হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত"। পৃঃ—৭৩৮। Compare "esse percipii)। শঙ্কর তাঁহার প্রতিপক্ষের এই আপত্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন :—"বাহ্যবস্তু যে আপনিও একান্তই স্বীকার করেন না, তাহা নয়।" স্বপ্নে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরের অভাব হইলেও জাগ্রৎ-কালে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরের সম্ভাব দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারাই জাগ্রৎকালে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরও সিদ্ধ হয়," ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (২৫-৬) যে শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা-ভিন্ন কোন বস্ত্বন্তর নাই, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে

জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তু সকল যেখানে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপই আছে।

শঙ্কর বলিতেছেন ঃ "যেমন আদিত্য-জ্যোতি বস্তুভেদ সকল প্রকাশ করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হয়, এবং স্বয়ং অবিভক্ত থাকিলেও হরিত-নীল-পীত-লোহিতাদি বর্ণ ভেদে, সেই সেই বস্তুর আকারে প্রকাশিত হয়, আত্মার জ্যোতিও সেইরূপে এই নিখিল জগতের এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশকরূপে তাহাদেরই আকার ধারণ করে।" শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী (Idealist) নহেন, কারণ তিনি ব্যবহারিক (Phenomenal) দৃষ্টিতে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন, যদিও পারমার্থিক দৃষ্টিতে (Noumenal) এক আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ-বিজ্ঞান-বাদী (Idealist) আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এজন্য শঙ্কর তাহাদের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞানের বিচিত্রতা মাত্রই প্রত্যক্ষগম্য।* বার্কলে (Berkeley) এবং হিয়ুমের (Hume) বিজ্ঞানবাদের সহিত বৌদ্ধ মতের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমরা বলিয়া থাকি বটে যে চিনি সুমিষ্ট, গোলাপ ফুল সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত, বরফ সুশীতল, সঙ্গীত সুললিত। কিন্তু মিষ্টত্ব, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ, শীতলতা ইত্যাদি জ্ঞাতারই অনুভূতি মাত্র। জ্ঞাতাই সেই অনুভবের একমাত্র আশ্রয়। প্রকৃতপক্ষে চিনিতে মিষ্টত্ব নাই, কারণ চিনি কখনও আপনাকে সুন্দর বা সুগন্ধি বলিয়া অনুভব করে না। সেইরূপ বরফে কোন শীতলতা নাই। সঙ্গীতেও কোন মাধুর্য্য নাই, কারণ তাহাদেরও অনুভব-শক্তি নাই। বস্তু থাকুক বা না থাকুক, কলকৌশল দ্বারা (Bioscope) দর্শনস্নায়ুর উপরে অনেক সময়ে এইরূপ ক্রিয়া করা যায়, যে বস্তু নাই, অথচ বস্তুজ্ঞান জন্মিতেছে। মনোযোগের অভাবেও আবার আমরা যাহাকে বস্তুর ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ বলি, তাহা সত্ত্বেও তজ্জনিত কোন জ্ঞানোদয় হয় না। এই সকল কারণে মিল্ (Mill) প্রভৃতি প্রাচ্য দার্শনিকগণ বহু অনুশীলনের পর চার্ব্বাকের ভূত-চতুষ্টয়কে "অনুভবের স্থায়ী সম্ভাবনা" মাত্র সংজ্ঞা (Permanent possibilities of sensation) প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা আরও অগ্রসর হইতেছেন। তাহারা ভৌতিক পদার্থকে শক্তির কেন্দ্র (Centers of energy) মাত্র বলিতেছেন। শক্তি বলিতে আমাদের পুরুষকার ভিন্ন অন্য কোন শক্তিরই ধারণা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। চার্ব্বাকের ভূত-চতুষ্টয় এইরূপে এক বিশ্বপুরুষের পুরুষকারের প্রকাশ মাত্র। দেশ এবং কালকেও তাহারা অন্তঃকরণ-বৃত্তি (Forms of thought) বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন,—দেশ (space) অর্থে সহভাবিত্ব-বুদ্ধি (Notion of co-existence), এবং কাল অর্থে পারম্পর্য্য বুদ্ধি

* মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে কাশ্মীরে শারদাপীঠে আরোহণ কালে শঙ্করের প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল ঃ—বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদের সহিত তোমার মতের কি পার্থক্য বল, "বিজ্ঞানবাদস্য চ কিং বিভেদকং ভবন্মতাদ্ব্রূহি।" তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ—বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্ব এবং বহুত্ব স্বীকার করে। বেদান্তবাদীর মত যে সম্বিৎ নিত্য এবং এক। ইহাতেই মহাপার্থক্য। "বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্বমেষামঙ্গীকরোতি বহুত্বমেষঃ। বেদান্তবাদী [illegible]

(Notion of sequence)। এইরূপে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও আমরা পরিণামে আত্মাতেই উপনীত হইতেছি। চার্ব্বাকের "ভূমির্বার্য্যনিলানলঃ" পরিণামে আত্মারই উপাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে। আত্মা বা চৈতন্য আর তবে কিরূপে তাহাদের ধর্ম্মবিশেষ হইবে ?

এখন পাঠকের মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে আমাদের গৃহাদি দৃশ্য বস্তু যদি দর্শকের বিজ্ঞান মাত্র হয়, তবে আমরা যখন বিদেশে যাই, যদি আমাদের গৃহের নিকটে দর্শক কেহ না থাকে, তখন কি আমাদের গৃহ নাই ? তাহার উত্তর বার্কলে (Berkeley) দিতেছেন :—সেই বিশ্বাত্মা ঈশ্বর আছেন, তাঁহার জ্ঞানেতে তোমার গৃহ থাকিলেই তোমার গৃহ আছে। যদি ঈশ্বর, কি দেবতাবিশেষ, কি কোন প্রেতাত্মাও না মান, তখন কিরূপ হইবে ? গৃহ অর্থই দর্শন-ব্যাপারের বিষয়-বিশেষ ; দর্শক না থাকিলে দর্শন নাই, দর্শন না থাকিলে দৃশ্য—তোমার গৃহও নাই। দর্শক নাই, অথচ দৃশ্য গৃহ আছে, এরূপ কথা আকাশ-কুসুমের সুগন্ধির ন্যায় বিরুদ্ধ। তবে পূর্ব্ব-দর্শনের স্মৃতি আমাদিগের থাকে। যতক্ষণ গৃহ নাই বলিয়া না জানিয়াছি ততক্ষণ,—কেহ দেখুক আর না দেখুক,—পূর্ব্ব স্মৃতি-বশতঃ গৃহ আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা থাকিবে। সেই ধারণা হয়ত মিথ্যা। হয়ত ইতিমধ্যে আগুন লাগিয়া আমার গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, অথচ আমার ধারণা যে গৃহ আছে। প্রকৃতপক্ষে গৃহ থাকার অর্থ মিলের (Mill) মতে এই, যে দর্শক কেহ উপস্থিত থাকিলে গৃহ দেখিতে পাইবে। জ্ঞাতা থাকিলে জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয়। এইরূপে আত্মাই জড়-জগতেরও ভিত্তিভূমি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যে কথা, অনুমান, উপমান, অথবা শাব্দ,—সকল প্রকার প্রমাণ সম্বন্ধেই সেই এক কথা। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি-সিদ্ধ, ব্যবহারিক বা সাপেক্ষ (Relative) রূপে সকলই সত্য হইলেও, পারমার্থিক (Absolute) রূপে সকলই চিদাত্মার উপাধি মাত্র;—এবং চিদাত্মার সত্তা সাপেক্ষ। শঙ্কর বলিতেছেন, পরব্রহ্ম "পৃথিব্যাদেরাকাশান্তস্য সত্যস্য সত্যং" পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত তাবৎ সত্য পদার্থেরও সত্য।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে ভূ-তত্ত্ববিৎ ভূগর্ভস্থ স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষের জন্মের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও জড়-জগৎ ছিল,—অতএব জড় জগৎ কিরূপে আত্মার উপাধিমাত্র হইবে ? তাহার উত্তর এই :—মানুষেতেই আত্মার আরম্ভ,—কেহ বলে না। প্রত্যক্ষজাত জড় বস্তু যদি আত্মার উপাধিই হইল, অনুমানগম্য,—ভূবিদ্যারই হউক আর যে বিদ্যারই হউক,—জড় বস্তু অন্য কিছুই হইতে পারে না। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" জড়-বস্তু প্রত্যক্ষই কর, আর অনুমানই কর, আজ কালের সম্বন্ধেই কর, আর লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের সম্বন্ধেই কর, অনুমানকারীকে সেই সঙ্গেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই অনুমানের পূর্ব্ববর্ত্তীরূপে জ্ঞাতা বা আত্মারও কল্পনা করিতে হইবে। ঈশ্বরই হউক, অথবা জীবই হউক,—যদি কেহ জানিবার থাকিত, তবে এইরূপ দেখিতে পাইত,—ইহার বেশী ভূ-তত্ত্ববিদের বলিবার অধিকার নাই। স্বপ্ন-

কালীন দৃষ্ট জড় বস্তুর ন্যায়, জাগ্রৎকালীন দৃষ্ট জড় বস্তুও পরমার্থতঃ চিদাত্মার উপাধি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিবার কারণ নাই। জ্ঞাতা বা আত্মাতেই জগতের উৎপত্তি, জ্ঞাতাতেই স্থিতি, জ্ঞাতাতেই তাহার লয়। শঙ্করের মতে জ্ঞেয় ব্রহ্মাণ্ড পরমার্থতঃ এক ভূমা জ্ঞাতাতেই পর্য্যবসন্ন। শঙ্কর তাঁহার সূত্র-ভাষ্যে বলিতেছেন ঃ—"আত্মত্ব হেতুই আত্মার নিরাকরণ-শঙ্কা হইতে পারে না। আত্মা কাহারও আগন্তুক না, কারণ স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা কখনও আত্ম-সম্বন্ধী প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অপ্রমাণিত কোন বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইলেই আত্মাকে পূর্ব্ববর্ত্তীরূপে গ্রহণ করা হয়। আকাশাদি কোন বস্তুই প্রমাণ-নিরপেক্ষ স্বয়ং-সিদ্ধ নয়। কিন্তু আত্মা প্রমাণাদি-ব্যবহারের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং তাহার আশ্রয়ভূত,—অতএব প্রমাণ ব্যবহারের পূর্ব্বেই স্বয়ংসিদ্ধ। এরূপ বস্তুর নিরাকরণ সম্ভব হয় না। আগন্তুক বস্তুই নিরাকৃত হয়, স্বরূপ কখনও নিরাকৃত হয় না, কারণ যে নিরাকরণ করিবে, আত্মা তাহারই স্বরূপ। অগ্নির উষ্ণতা কখনও অগ্নিদ্বারা নষ্ট হয় না। (সেইরূপ, আমা দ্বারা 'আমির'ও নিরাকরণ সম্ভব হয় না)। আমিই এখন বর্ত্তমান বস্তু জানিতেছি, আমিই অতীত অথবা অতীততর বস্তু জানিয়াছিলাম, আমিই অনাগত এবং অনাগততর বস্তু জানিব। অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান,—কালভেদে জ্ঞাতব্য বস্তুর অন্যথাভাব (পরিবর্ত্তন) হয়। জ্ঞাতার কোন অন্যথাভাব হয় না। আত্মা-সদা-বর্ত্তমান-স্বভাব। বর্ত্তমানস্বভাবত্ব হেতু আত্মার অন্যথা-স্বভাবত্ব কল্পনা করা যায় না।" (ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য-অ-২। পা-৩। সূ-৭॥)

চার্ব্বাক্ জ্ঞাতা বা আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া তাহার ভূত-চতুষ্টয় লইয়া প্রসিদ্ধ "দশম ন্যায়" ভ্রমেরই অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। কোথায় চার্ব্বাক্ আত্মাকে দেহের ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আর কোথায় শঙ্কর আসিয়া স্রোত ফিরাইয়া দিয়া, এই বহির্জগৎ-কেই এক পরমাত্মার মধ্যে প্রকটিত জ্ঞানের বিচিত্রতা মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। দেহাত্মবাদই আধুনিক সভ্য জগতের মহাব্যাধি, দেহাত্মবাদই সয়তানের চিরন্তন দুর্গ। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণংকৃত্বা ঘৃতং-পিবেৎ"—সভ্যতার ইহাই মূলমন্ত্র। সেই দেহাত্মবাদ খণ্ডন করিয়া, সয়তানের কেল্লা অধিকার করিয়া শঙ্কর নিশ্চয়ই সমস্ত মানব-জাতির কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

ব্রত মন্ত্র

(২)

গত শ্রাবণ মাসে আমি "কুল-কুলতি" ব্রতের ছড়াটা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম। এবারেও কতকগুলি ব্রতের মন্ত্র বা ছড়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। "শিব-পূজা-ব্রত" প্রায় বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানেই চলিত আছে। এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি

পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। কেহ কেহ আবার সারা জীবন ধরিয়া শিব-পূজা-ব্রত করে।

বালিকারা প্রতিদিন গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়া (অভাবে পুষ্করিণীর মাটী দিয়া), একটী করিয়া শিবলিঙ্গ তৈয়ার করে। পরে ঐ শিবলিঙ্গটীকে তাম্রকুণ্ডে বসাইয়া, নিম্ন লিখিত ছড়াটী বলিয়া স্নান করায়ঃ—

স্নানের মন্ত্র

"কাঁচ পানা গঙ্গা কটিকপানা জল।
তাই পেয়ে তুষ্ট হ'লেন ভোলা-মহেশ্বর॥"

উল্লিখিত ছড়াটী বলিয়া মহাদেবের মাথায় পান শাঁথে * করিয়া জল দেয়। এইরূপ তিন বার করে। ইহার পর মহাদেবের মস্তক হইতে মৃত্তিকার মঞ্জরিটী নামাইয়া লইবার সময় বলে ঃ—

"নমঃ হরায় নমঃ হরায় বজ্রায় নমঃ।"

তৎপরে বিল্বপত্র, ফুল, দূর্ব্বা, আতপ চাউল, চন্দন এই সকল একত্র করিয়া বাম হস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত চাপা দিয়া নীচের ছড়াটী বলেঃ—

পূজার মন্ত্র।

শিল শিলাটন শিলে বাটন শ্রীলে আছেন ঘরে ;
স্বর্গ থেকে মহাদেব বলেন, গৌরী কি ব্রত করে ?
আঁস পাড়ন, পাঁশ পাড়ন, পাড়ন খাটের সাড়ী ;
আকন্দ, বিল্ব পত্র তোলা গঙ্গার জল
তাই পেয়ে তুষ্ট হউন ভোলা মহেশ্বর।"

কোন কোন বালিকা আবার উপরের ছড়াটীর সহিত নীচের দুটী ছত্রও যোগ করিয়া দেয়।

"ভোলা গেছে ফুল তুলতে, সুধাই লতা পাতা।
শিব-দুয়ারে দেখা হ'ল সন্ন্যাসীর গলায় পা'টা।"

পরে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া প্রণাম করে।

প্রণামের মন্ত্র।

"হর হর শঙ্কর দিনকরনাথ।
কথন না পড়ি যেন মুর্খের হাত॥"

প্রার্থনা

"হর তুমি যাও ঘর।
আমার যেন হয় উত্তম বর॥"

ব্রাহ্মণ-বালিকাদিগের শিবের ধ্যান ঃ—

"ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশং রজতং গিরিভং চারুচন্দ্রবতাং সং।
রত্ন-কল্পা পরশু-মৃত ভরাভীতি প্রসানাং পদ্মাসীনাং
ত্রিনেত্রাং॥"

রেণু

"যমপুকুর ব্রতের ছড়াটী এইরূপ ঃ—

"শুষ্‌নি কলমী ল ল করে।
রাজার বেটা পক্ষ মারে॥
মরণ পক্ষ শুকোর বিল।
সোনার কৌট রূপোর খিল॥
খিল খসাতে হাতে ছড়।
আমার স্বামী যেন হন লক্ষেশ্বর॥"

"মঙ্গল-চণ্ডী-ব্রতের" ছড়াটী দিয়া আমি এবারকার মত প্রবন্ধ-শেষ করিব।

"আষ্টকাটী অষ্টমুটী:
সোনার মঙ্গলচণ্ডী, হীরের বালা।
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা ?
হাসতে, খেলতে,
পাটের দোলায় দুলতে,
পাটের শাড়ী পরতে,
নির্ধনের ধন দিতে,

---

* যে শাঁখ বাজে না তাহাকে পানশাঁখ বলে।

অপুত্রের পুত্র দিতে
অন্ধের চক্ষু দিতে,
খোঁড়ার পদ দিতে,
পোলোনা পোলোনা প্রতি মঙ্গলবার।
অভয়ামঙ্গলচণ্ডী কারে দিলে বর?
ধানে, ধনে, রত্ন-সিংহাসনে।"

বারান্তরে "মঙ্গল-চণ্ডী-ব্রতের" নিয়ম এবং "মঙ্গল-চণ্ডী-ব্রত কথা" লিখিবার বাসনা রহিল।

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী।

তুরুপ

(গল্প)

কলিকাতা চৌধুরীপাড়ার চৌধুরীবাবুদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পাশের বাড়িতে থাকিত বিনোদিনী। বিনোদিনী পতিতা নারী। বাড়ির সামনে একজন পতিতা নারী চোখের উপর কলঙ্কের ধ্বজা উড়াইয়া বাস করিবে ইহা চৌধুরীবাবুদের ভালো লাগিত না—সেই জন্য তাঁহারা বিনোদিনীকে সেখান হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বিনোদিনীর পয়সার জোর ছিল বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই কারণে চৌধুরীবাবুদের সহিত বিনোদিনীর একটা রেষারেষি চলিত;—চৌধুরীবাবুরা যতই তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেন বিনোদিনী ততই জেদ করিয়া বসিত—কিছুতেই উঠিব না! বাড়িটা বিনোদিনীর নিজের। চৌধুরীবাবুরা একবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে বিনোদিনীর বাড়িটা না হয় তাঁহারা কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। বিনোদিনী সে কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠায়—তাহার জন্য যদি চৌধুরীবাবুদের এ পাড়ায় বাস করা অসহ্য হইয়া থাকে তো তাঁহারা উঠিয়া যান—বিনোদিনী তাঁহাদের বাড়িখানা কিনিয়া লইতে পারি— বিনোদিনীর এখনও এমন দুর্দ্দশা হয় নাই যে সে নিজের বসত বাড়ি বিক্রয় করিবে!

চৌধুরীবাবুরা তাহার এই অহঙ্কারে জ্বলিয়া উঠিতেন;—তাহাকে জব্দ করিবার জন্য সর্ব্বদা সুযোগ অন্বেষণ করিতেন, কিন্তু বিনোদিনীকে পারিয়া উঠা শক্ত। বিনোদিনী শিষ্টভাবে থাকিত;—তাহার বাড়িতে কোনোরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, কোনোরূপ গোলোযোগও ঘটিত না—সেই জন্য তাহাকে জব্দ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। চৌধুরীবাবুদের ইঙ্গিতে তাঁহাদের বাড়ির চাকরবাকর, দ্বারবান, মেথর প্রভৃতি বিনোদিনীর বাড়ির উপর গোপনে অত্যাচার করিত;—ঢিল ছুঁড়িয়া, ময়লা ফেলিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিত। বিনোদিনী চৌধুরীবাবুদের কিছু না বলিয়া একেবারে আদালতে নালিশ করে, তাহাতে চৌধুরীবাড়ির কয়েকজন চাকরের জরিমানা হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। সেই অবধি চৌধুরীবাবুদের আর কিছু করিতে সাহস হইত না। বিনোদিনীর নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহারা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো মনে মনে গর্জ্জন করিতে থাকিতেন। বিনোদিনীর উপর

তাঁহাদের এমনি রাগ হইয়াছিল যে তাহাকে হাতের মধ্যে পাইলে বোধ হয় টিপিয়া মারিতেন।

বিনোদিনী বুঝিত বাবুরা চটিতেছেন, তাহাতে সে আমোদ উপভোগ করিত। সেইজন্য সুযোগ পাইলে সে এই অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিতে ত্রুটি করিত না। বাবুরা যতই চটিয়া উঠিতেন এবং কোনো প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া যতই গুমরাইতে থাকিতেন, বিনোদিনী মনে মনে ততই হাসিত—এবং যাহাতে বাবুরা উত্তরোত্তর আরো চটিয়া উঠেন তাহার জন্য ফন্দি আঁটিত। বাবুরা ক্রমেই আগুন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহারা জমীদার,—জমীদারীতে যাহার উপর যাহা খুসী বরাবর করিয়া আসিয়াছেন—কাহাকেও জব্দ করিতে, শাসন করিতে কখনো কোনো বাধা পান নাই;—এখানে বিনোদিনীর নিকট পরাভূত হওয়াতে তাঁহাদের আত্ম-অভিমানের উপর বড় জোর আঘাত পড়িয়াছিল, সেই জন্য তাঁহাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটা প্রধান কাজ ছিল—কি করিয়া বিনোদিনীকে জব্দ করা যাইতে পারে তাহার পরামর্শ করা। প্রায় প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যার মজলিসে এ সম্বন্ধে একবার করিয়া আলোচনা হইয়া যাইত; কিন্তু কোনো উপায় কিছুতেই স্থির হইত না।

বিনোদিনী কোনো বিষয়ে চৌধুরীবাবুদের নিকট হীন হইয়া থাকিতে চাহিত না। যদিও সে একলা মানুষ তবুও সে টেক্কা দিয়া চৌধুরীবাবুদেরই মতো বাড়িতে চাকর, দাসী, দ্বারবান নিযুক্ত রাখিয়াছিল। বাবুরা যে রকম ধূমে দুর্গোৎসব করিতেন, বিনোদিনী সেই রকম ধূমে কার্ত্তিক পূজা করিত। তাহার কার্ত্তিক পূজাতে কাঙ্গালীভোজন ও দান বিতরণ চৌধুরীবাবুদের চেয়েও যে বেশি হইত সে কথা পাড়ার সকলেই বলিয়াছে। চৌধুরী বাড়ির ছোটো বাবুর বিবাহের সময় একমাস কাল ধরিয়া নানা উৎসব চলিয়াছিল। এমন জমকালো বরযাত্রা কলিকাতার সহরে কেহ কখনো দেখে নাই;—দলে দলে গড়ের বাজনা—দলে দলে রোসনচৌকি, বাইনাচ—সারি সারি খাস গেলাস, তার মধ্যে হাতী, উঠ, পাহাড় পর্ব্বত, ঘোড়সওয়ার, ময়ূরপঙ্খী আরো কত কি! এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য না কি নানাস্থান হইতে লোক আসিয়াছিল;—কলিকাতার রাস্তায় এমন ভিড় আর কখনো দেখা যায় নাই। বিনোদিনী এই সব দেখিয়া কি করিয়া ইহার টেক্কা দিবে প্রথমে ঠিক করিতে পারে নাই—তাহার তো ছেলেপুলে নাই যে বিবাহ দিবে, কাজেই তাহাকে প্রথমটা একটু বিমর্ষ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একটা ফন্দি বাহির করিল। বিনোদিনীর একটা পোষা বাঁদর ছিল, এই সুযোগে সে তাহার বিবাহের আয়োজন করিয়া বসিল। ছোটো বাবুর বিবাহের পর সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই বিনোদিনীর বাড়ি হইতে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া, শিকল বাঁধা বর গড়ের বাদ্য আলোকমালা লইয়া বাহির হইল—ছোটো বাবুর চতুর্দ্দোলার দুইপাশে দাঁড়াইয়া যেমন দুইজন সখী চামর ঢুলাইয়াছিল—এ বরেরও দুইপাশে তেমনি দুইজন সখী চামর ঢুলাইতে লাগিল! সকলে এ দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইল,—উচ্চরোলে হাসিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিল যে ইসারায় চৌধুরীবাড়ির

ছোটোবাবুকে বাঁদর বলা হইয়াছে। একথাটা চৌধুরীবাবুদের যে কেমন লাগিয়াছিল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। এ অপমান তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না;—যেমন করিয়াই হউক ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের মনের মধ্যে অগ্নিহোত্রীর অগ্নির মতো দিবারাত্রি জ্বলিতে লাগিল।

* * *

চৌধুরীবাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন বৈকালে বাড়ির সামনের পার্কে হাওয়া খাইতে যাইত। সেদিন বৈকালে বড়বাবুর ছোটো মেয়েটিকে লইয়া এক চাকর পার্কের দিকে চলিয়াছে—সামনে একখানা গাড়ি আসিয়া পড়িল। পথ না পাইয়া চাকরটা তাড়াতাড়ি বিনোদিনীর ফটকের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি আসিয়া লাগিল বিনোদিনীর ফটকে; কাজেই গাড়িখানা চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত চাকরটাকে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে হইল। গাড়ি থামিতেই বিনোদিনী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। চাকরের কোলে ছিল খুকী, বিনোদিনীকে দেখিয়া কি জানি কি তাহার মনে হইল, সে 'মা মা!' বলিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। বালিকা তখন সবেমাত্র 'মা' কথাটি শিখিয়াছে;—সেই নূতন শেখার উৎসাহেই হউক অথবা মায়ের মতো সাড়িপরা নারী দেখিয়া তাহাকে মা বলিয়া বিশ্বাস হওয়াতেই হউক খুকী চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনী কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ আধ আধ স্বরে 'মা মা!' শুনিয়া

ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া আবার 'মা, মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর সমস্ত বুকের ভিতরটা সেই শব্দে কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিল;—মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা পিপাসার মতো বুকের ভিতর জাগিয়া উঠিল। গাড়ি তখন সামনে হইতে সরিয়া গিয়াছে—চাকরটা তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া পার্কের দিকে চলিয়াছে—বিনোদিনী বিহ্বল নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল—সে দিক হইতে চোখ যেন আর ফিরিতে চাহে না। খুকী যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল সে ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে কেবলই শুনিতে লাগিল কানের পাশে যেন সেই "মা, মা!" শব্দটা গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। বিনোদিনীর মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—সেই বালিকা যেন তাহার আপনার ধন;—সে যেন একবারমাত্র মাতৃসম্বোধনেই তাহাকে চিরদিনের মতো মাতৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছে। বসিয়া বসিয়া সে কেবলই ভাবিতেছিল—সে আমাকে মা বলিয়াছে! মা বলিয়াছে! এই 'মা' বলাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

বিনোদিনী ঘরে থাকিতে পারিল না—ছুটিয়া বারান্দায় আসিল—বালিকাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনিবার সময় আর একবার দেখিবে। আকাশে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল—বৈশাখী সন্ধ্যার ঝড় উঠিবার উপক্রম করিতেছিল—বিনোদিনীর বুকের

মতো আকুলতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না।

বিনোদিনী অন্যমনে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো একটা চমকানি লইয়া বালিকা তাহার সামনে দিয়া চলিয়া গেল। সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ঘুমন্ত মুখের উপর গোধূলির আলো আসিয়া পড়িয়াছে। বালিকার সেই মুখখানি বিনোদিনীর কোন্ এক গোপন মর্ম্মস্থলে যেন কিসের চেতনা জাগাইয়া তুলিল। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল—হৃদয়ের মধ্যে আজ এ কী নূতনতর স্পন্দন! বিনোদিনীর কেবলই বোধ হইতেছিল তাহার বুকের ভিতরটা যেন থাকিয়া থাকিয়া হাহাকার করিয়া উঠিতেছে—হৃদয়টা যেন অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে। সে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিল—হারমোনিয়মটা হাতের কাছে লইয়া একটা গান গাহিতে আরম্ভ করিল;—প্রাণ হইতে বাহির হইল একটা মর্ম্মস্পর্শী করুণ রাগিণী—তাহার হৃদয়টা যেন সেই করুণ সুরের মধ্যে আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতে লাগিল—বিনোদিনী গাহিতে গাহিতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

প্রতিদিন বৈকালে বিনোদিনী কোথাও নড়ে না—বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে,—কখন খুকীকে লইয়া যায়। এক একদিন ঝড় বৃষ্টির জন্য খুকীকে যখন বাড়ির বাহির করা হইত না, তখন বিনোদিনীর সমস্ত সন্ধ্যা ও রাত্রিটা যে কি কষ্টে কাটিত তাহা বলা যায় না। সে তখন মনে মনে বারম্বার প্রশ্ন করিত—কেন পরের মেয়ের জন্য তাহার এ ব্যাকুলতা। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজিয়া পাইত না! মন কেবল চায়—কেন চায় তাহা তো বলে না; থাকিয়া থাকিয়া কেবল মা! মা! ধ্বনিটাকে আকুলভাবে খুঁজিয়া বেড়ায়! বিনোদিনীর অনেকগুলি আদরের পশুপক্ষী ছিল, এক একবার মনটা যখন বড়ই পাগল হইয়া উঠিত তখন সে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের কোলে করিয়া বসিত। ইচ্ছা হইত তাহারা মা! মা! বলিয়া ডাকিয়া উঠুক! কিন্তু হায়! সে শব্দ কি এতই দুর্লভ!

বিনোদিনী দূর হইতে মেয়েটিকে দেখিত; তাহাতে তাহার প্রাণের আশা মিটিত না;—বুকের কাছে তাহাকে পাইবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিতে থাকিত। কিন্তু সে কেমন করিয়া হয়? সে যে চৌধুরীবাড়ির মেয়ে! চৌধুরীবাবুরা মেয়েকে জলে ফেলিয়া দিতে পারেন, তবু প্রাণ থাকিতে বিনোদিনীর কোলে একবার তুলিয়া দিতে পারিবেন না—ইহা নিশ্চিত। তাহার উপর তাঁহাদের ক্রোধ তো সামান্য নয়! সে মনে মনে ভাবিত, আহা কত পথের লোকে মেয়েটিকে কোলে লইতেছে—কেবল সে একবার পায় না!

যাহাকে সহজে পাওয়া যায়—যাহাকে লাভ করিবার পথে কোনো বাধা নাই তাহার জন্য মানুষের তেমন ব্যাকুলতা থাকে না। খুকীকে বুকের কাছে পাওয়া সহজ ও বাধাহীন নহে বলিয়াই বোধ হয় তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটা বিনোদিনীকে জোর করিয়া পাইয়া বসিয়াছিল। যদি সহজে তাহাকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইত না;—কিন্তু তাহার মন এখন কিছুতেই ধৈর্য্য মানে না—

সে কেবলই চীৎকার করিয়া উঠে -এখনই চাই! এখনই চাই এখনই যে পাওয়া যাইবে না সে কথা সে কিছুতেই শুনিবে না! মন যাহা চাহিতেছে তাহা না পাইয়া সময় সময় এমন বিদ্রোহ করিয়া উঠিত যে বিনোদিনী তাহাতে পাগলের মতো হইয়া যাইত!

চৌধুরীবাড়ির সব ছেলেমেয়েরা সেদিন একে একে বেড়াইতে চলিয়া গেল, কেবল খুকীকে দেখা গেল না। বিনোদিনী ভাবিল, বোধ হয় তাহাকে এখনও দুধ খাওয়াইতেছে, কাপড় পরাইতেছে, তাই এত বিলম্ব। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল—ছেলে মেয়েরা সকলে বাড়ি ফিরিয়া গেল। বিনোদিনী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। কেবলই মনে হইতে লাগিল—কেন আজ সে আসিল না! ইচ্ছা হইতেছিল একবার সন্ধান লয়। কিন্তু কেমন করিয়া? কোনো উপায় না দেখিয়া বিনোদিনী চৌধুরীবাড়ির তেতালার ঘরের জানালার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল;—মনে হইতেছিল যদি একবার কেহ তাহাকে কোলে করিয়া আসিয়া ঐখানে দাঁড়ায়! কিন্তু কই? কেহ তো আসে না! সে তখন মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল—বোধ হয় ঐ জানালার ঠিক নীচেটিতে বসিয়া খুকী খেলা করিতেছে—খেলা করিতে করিতে বোধ হয় এতক্ষণে ঘুম আসিয়াছে—এতক্ষণে বোধ হয় সে ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়াছে! রাত্রি অনেক হইয়া আসিল—তেতালার ঘরের জানালা বন্ধ হইয়া গেল;—অন্ধকারের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিনোদিনী নিজের ঘরে উঠিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতে বিনোদিনীর মনে কেমন একটা আশা হইতে লাগিল যে আজ নিশ্চয়ই সে খুকীর দেখা পাইবে। তেতালার ঘরের জানালায় ছোট মেয়ের কাপড়চোপড় শুকাইতেছিল, তাহা দেখিয়া বিনোদিনীর মনে আনন্দ হইতে লাগিল—ঐ আমার খুকীর কাপড়! ঐ আমার খুকীর জামা!

সমস্তদিন সে আশা করিয়া বসিয়াছিল—কিন্তু সে দিনও বৈকালে খুকী বাহির হইল না! দিনের আলো যখন নিবিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আশার প্রদীপও নিবিয়া গেল তখন বিনোদিনী যেন কেমনতর হইয়া পড়িল। সে বাড়ির মধ্যে তিষ্টিতে পারিল না—মনের উদ্বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল—একেবারে চৌধুরী বাবুদের দরজার সামনে হাজির! সে যে কেন বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না—কে যেন তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে! চৌধুরীবাড়ির দেউড়ির সামনে দ্বারবানদের দেখিয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মনে হইল আর বেশি দূর গেলে এখনই তাহারা দূর করিয়া দিবে। বিনোদিনী কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না - খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল;—তারপর ধীরে ধীরে নিজের বাড়িতে ফিরিয়া গেল। সে রাত্রে সে ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যেন খুকী তাহার কাছে আসিয়াছে—তাহার বুকের উপর পড়িয়া খেলা করিতেছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বিনোদিনী স্বপ্নের ঘোরে বিছানার মধ্যে খুকীকে খানিকক্ষণ আকুলভাবে খুঁজিতে লাগিল—তারপর উষার আলোকে

দেখিল তাহার বুক শূন্য করিয়া খুকী কোথায় পালাইয়া গেছে!

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল চৌধুরী-বাড়ির সকলকার মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া; —চারিদিকে লোকজন ব্যস্তভাবে আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু কাহারো মুখে কথা নাই;—একটা গভীর নীরবতা যেন একখানা প্রকাণ্ড কালো মেঘের মতো আসিয়া বাড়িখানার উপরে আঁধার ছড়াইয়া দিয়াছে। আজ খুকীর বড় অসুখ। শুনিয়া বিনোদিনীর প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। সে থাকিয়া থাকিয়া কেবলই উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল বাবুদের বাড়ির লোকেদের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না! কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে কোথা হইতেও সে এতটুকু আশার নিদর্শন দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বিষণ্ণতাটাও ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আজ চৌধুরীবাড়িতে ভালো করিয়া আলো জ্বলিল না—অন্যদিন এতক্ষণ গানবাজনার শব্দ পাওয়া যায়; আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা বিভীষিকার মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল। বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল।

আজ সমস্ত দিন বিনোদিনী অন্তরের সহিত কামনা করিয়াছে—হে ভগবান! আজ স্বপ্নে আমার খুকীকে একবার দিয়ো। কিন্তু হায়! রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল বটে কিন্তু খুকী তাহার মধ্যে নাই! বিনোদিনী বারবার ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিতে লাগিল;—একটা অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুক দুর দুর করিতে লাগিল। সে চাহিয়া থাকিতে পারিল না—চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন চৌধুরীবাড়িতে কি একটা গোলমাল উঠিয়াছে—সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বারান্দায় গেল। কিন্তু কোথাও কিছু নাই—চারিদিক নিস্তব্ধ! উপরে তেতালার ঘর হইতে একটা আলোক-রশ্মি বাহিরের অন্ধকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; বিনোদিনী খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে সেই আলোর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর ক্লান্তভাবে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একটু তন্দ্রা আসিতেছিল এমন সময় হঠাৎ যেন একটা কান্নার রোল বিনোদিনীর কানে গেল;—সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আলুথালু বেশে একেবারে বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। চৌধুরীবাড়ির ফটক তখন বন্ধ। বিনোদিনী বন্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো একবার দরজা খোলো—দরজা খোলো!" তাহার সেই চীৎকারে একজন দ্বারবান ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো শিগ্‌গির দরজা খোলো—আমি খুকীকে একবার দেখবো।"

দ্বারবান অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিল না—তাহার কথাও ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না;—মনে করিল, বুঝি কে এক পাগলী ভিখারী। সে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনীকে তাড়া দিল। বিনোদিনীর

দ্বারবান তখন একটা লাঠির গোঁজা দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। বিনোদিনী মাটিতে পড়িয়া গেল—আঘাত ও অপমানের বেদনায় তাহার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া একবার আকুলভাবে তেতালার ঘরের দিকে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেই রাত্রেই বিনোদিনীর জ্বর আসিল—চার পাঁচ দিন সে অচেতন হইয়া রহিল।

সংজ্ঞালাভ করিয়া বিনোদিনী প্রথমেই খবর লইল খুকীর। যখন শুনিল মহা বিপদ কাটাইয়া সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে তখন বিনোদিনী যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিনোদিনী সুস্থ হইয়া যেদিন প্রথম বারান্দায় গিয়া বসিল খুকীও সেইদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দূর হইতে চাকরের কোলে খুকীকে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল—একটা উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার দুর্ব্বল শরীরের উপর দিয়া একটা কম্পন বহিয়া গেল। সে ঘাড় তুলিয়া বসিতে পারিল না—চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল;—স্বপ্নের দৃশ্যের মতো খুকী তাহার সামনে দিয়া চলিয়া গেল। তারপর সন্ধ্যার সময় যখন দেখিল খুকী আবার ফিরিয়া আসিতেছে তখন তাহার অবসন্ন শরীরটাকে নাড়া দিয়া কে যেন তাহাকে উঠাইয়া দাঁড় করাইল। সে টলিতে টলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিতে লাগিল—সিঁড়ির পথে দুইবার পড়িয়া গেল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। ... দাঁড়াইতেই দেখিল সম্মুখে

খুকী! সে ঝড়ের মতো ছুটিয়া গিয়া চাকরের কোল হইতে খুকীকে কাড়িয়া লইয়া বুকের মধ্যে ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার গাল ভরাইয়া দিল। চাকরটা হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল।

চাকরের কোলে খুকীকে ফিরাইয়া দিতে গিয়া বিনোদিনীর চিত্ত একটা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি হাতের আংটি খুলিয়া ভৃত্যের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—"এই নে। কাউকে বলিসনি—বুঝেছিস্?"

সেই অবধি চাকরের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সে যেদিন সুবিধা পাইত খুকীকে গোপনে বিনোদিনীর কোলে তুলিয়া দিত, তাহার পরিবর্ত্তে বিনোদিনীর নিকট হইতে তাহার রীতিমত উপরি-পাওনা লাভ হইত। এত সহজে যে খুকীকে পাইবার উপায় ছিল তাহা এতদিন তাহার বুদ্ধিতে আসে নাই বলিয়া বিনোদিনীর মনে মনে আপশোস হইতে লাগিল।

খুকীকে পাইয়া বিনোদিনীর মনে হইত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। তাহাকে লইয়া সে যে কি করিবে ঠিক করিতে পারিত না;—কখনো কোলে তুলিয়া, কখনো বুকে তুলিয়া, কখনো মুখের কাছে তুলিয়া আদর করিত;—যখন বুকের মধ্যে তাহাকে চাপিয়া ধরিত তখন কিছুতেই সেখান হইতে নামাইতে তাহার মন চাহিত না। খুকী তাহার কোমল বাহু দিয়া বিনোদিনীকে এক একবার আঁকড়াইয়া ধরিত;—বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া যাইত;—এ কী আনন্দ! এ আনন্দের স্পর্শ সে তো জীবনে কখনো অনুভব করে নাই।

খুকী যখন তাহার নিজের ভাষায় আলাপ করিত, বিনোদিনী তন্ময় হইয়া শুনিত ;—মনে হইত যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছে। সে বলিত 'বা' 'দা' 'কা'—তারপর যখন 'মা' বলিয়া উঠিত তখন বিনোদিনীর সমস্ত হৃদয়টা কি-একটা অনির্ব্বচনীয় চাঞ্চল্যে তোলপাড় করিয়া উঠিত—সে চুম্বনের পর চুম্বনে খুকীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত,—এমন করিয়া বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিত যে কাহার সাধ্য কাড়িয়া লয়!

খুকীকে বুকে লইলে বিনোদিনীর বুকের ভিতরের চারিদিকটা যেন কেমনতর হইয়া উঠিত ;—দিকে দিকে যেন কিসের সাড়া পড়িয়া যাইত—তরঙ্গের পর তরঙ্গ—উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস—স্পন্দনের পর স্পন্দন চারিদিক হইতে উঠিয়া তাহাকে যেন কী রকম করিয়া তুলিত—সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিত—এ কী! এ কী!

তাহার পর যখন চাকর খুকীকে তাহার কোল হইতে লইয়া যাইতে চাহিত তখন তাহার সমস্ত দেহ ও মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিত—না! না! কিন্তু হায়! তাহাকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে! চাকরের কোলে খুকীকে ফিরাইয়া দিবার সময় তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইত—একটা বিরাট অতৃপ্তি, মরুভূমির শুষ্কতা লইয়া, তাহার বুকের মধ্যে হা হা করিয়া ফিরিতে থাকিত।

খুকীকে পাইয়া অবধি বিনোদিনীর আর কোনো দিকে কোনো খেয়াল ছিল না ; চৌধুরী বাবুরা তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, কোন কাজে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছেন সে দিকে সে আর লক্ষ্যই রাখিত না। বড়বাবুর বড় ছেলের খুব ধুমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল ;—পাড়ার সকলে আশা করিয়াছিল বিনোদিনী নিশ্চয়ই এবারও তাহাদের কোনো অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইবে ;—কিন্তু তাহার কোনো উদ্যোগ না দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে কতবার এমন ঘটনা ঘটিয়া গেছে যে চৌধুরী বাবুদের দ্বারা বিনোদিনীর অপমানের একশেষ হইয়াছে কিন্তু বিনোদিনী কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। সকলে অবাক হইয়া ভাবিত—এ কি! কিন্তু চৌধুরীবাবুরা ইহাতে বিস্মিত হইতেন না,—তাঁহারা ভাবিতেন এ বিনোদিনীর স্পর্দ্ধার পরিচয়। তাঁহারা সেই অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না—ছোটোবাবুকে সে যে প্রকারান্তরে বাঁদর বলিয়াছে এ অপমান তাঁহাদের মর্ম্মের মধ্যে শেলের মতো বিঁধিয়াছিল। বিনোদিনীকে এত করিয়া অপমান করিয়াও তাঁহাদের ক্ষোভ নিবৃত্তি হইতেছিল না। যে ঝগড়া করে না তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া কি মনের তৃপ্তি হয়? বিনোদিনী এখন আর তাঁহাদের অপমান গায়ে মাখে না বলিয়া তাঁহাদের আরো রাগের বৃদ্ধি হইতেছিল। বিনোদিনী যদি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইত তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের এতটা ক্ষোভ হইত না। সে কি চৌধুরী বাবুদের এতই তুচ্ছ মনে করে যে তাঁহাদের অপমান পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইতে চায় না! একথা মনে হইলে চৌধুরীবাবুরা রাগে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহারা মনে মনে

করিতে হইবে—তাহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিতে হইবে, তবে তাঁহাদের রাগ যাইবে!

সেদিন বড়বাবু ছাদে বেড়াইতেছিলেন; হঠাৎ দেখিলেন, চাকরের কোল হইতে খুকী বিনোদিনীর কোলে উঠিল। দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিতে লাগিল,—মনে হইল একখানা ইট মারিয়া চাকরের মাথাটা এখনই চূর্ণ করিয়া দেন—এতবড় বেয়াদবি তার! তিনি তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন;—আসিতে আসিতে হঠাৎ একটা ফন্দি তাঁহার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তিনি খুকীর চাকরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়বাবুর ধমকানিতে চাকর অনেকটা কাবু হইয়া আসিল, তার পর যখন নানা স্পষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল, তখন সে হতভম্ব হইয়া গেল—অপরাধ অস্বীকার করিতে পারিল না। বড়বাবু তখন বলিলেন—"যা তোর ভয় নেই। আমি যা বলি এখন শোন্।" বলিয়া তিনি তাহাকে গোপনে কি কতকগুলা কথা বলিলেন। চাকর সব কথাতেই 'হাঁ' বলিয়া ঘাড় নাড়িল। বড়বাবু বলিলেন—"জানিস্ তো আমাদের সকলকে, বিশেষত ছোটো বাবুকে কি রকম অপমান করেছে! বুঝেছিস্ ত?"

চাকর বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।" তাহার বুকটা ধড়ফড় করিতেছিল—কি হয়! কি হয়! এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল! বাবুর নিকট হইতে ছাড়া পাইয়া সে সিঁড়িতে লাফের পর লাফ দিতে দিতে নীচে নামিয়া আসিল।

* * *

সেদিন বিনোদিনী আনন্দে আত্মহারা। খুকীর চাকর বলিয়াছে আজ তাড়াতাড়ি খুকীর বাড়ি ফিরিবার তাগাদা নাই—বাড়ির সকলে আজ কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে—এই অবসরে বিনোদিনী প্রাণ ভরিয়া খুকীকে কাছে রাখিতে পারিবে। অন্যদিন চকিতের মতো দেখা হয়—একবার কোলে তুলিতে—একবার চুম্বন করিতে না করিতে সময় ফুরাইয়া যায়—প্রাণের আশা মেটে না। আজ খুকীকে সে অনেকক্ষণ কাছে রাখিতে পারিবে। এই আনন্দে সে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিন খুকীকে বাড়ির মধ্যে আনিবার অবসর পায় না—আজ সে একেবারে তাহাকে নিজের ঘরে আনিয়াছে;—তাহার মনে হইতেছে খুকী যেন তাহার নিজের ধন! যেন সে চিরদিন এমনি করিয়া তাহার ঘর আলো করিয়া আছে। অন্যদিন সে খুকীকে কেবল আদর করিয়াই ক্ষান্ত হয়,—আজ আর শুধু আদরে তাহার মন উঠিতেছে না। সে তাহাকে লইয়া কাপড় পরাইতেছে, মুখ মুছাইতেছে, দুধ খাওয়াইতেছে ঘুম পাড়াইতেছে—কত কী করিতেছে! বাড়ির সামনে দিয়া একজন খেল্‌নাওয়ালা যাইতেছিল—বিনোদিনী তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া খুকীর সামনে হাজির করিল। খুকী যত পারিল দুইহাতে তুলিয়া লইল—বিনোদিনীর তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—সে নিজে খেল্‌না লইয়া খুকীর হাতে জোর করিয়া গুঁজিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া সে খুকীকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল;—খুকীর উপর যে তাহার স্বাধীনতা আছে

খুকী যে তাহার নিজের ধন, তাহা সে আজ প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে চাহে!

খেলা করিতে করিতে খুকী ঘুমাইয়া পড়িল। বিনোদিনী নিজের হাতে শয্যা রচনা করিয়া মায়ের মতো স্নেহের সহিত তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল। নিজে পাখা-হাতে বসিয়া রহিল, পাছে মশা মাছি আসিয়া গায়ে বসিলে খুকীর ঘুম ভাঙিয়া যায়।

খুকী ঘুমাইতেছে, বিনোদিনী পাশে বসিয়া আছে, এমন সময় পাশের সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেক লোকের পদশব্দ শোনা গেল। বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল—কাহারা এমন করিয়া খুকীর ঘুম ভাঙাইতে আসে! দরজার বাহিরে আসিয়া দেখিল, সামনের বারান্দা পুলিশের লোকে ভরিয়া গিয়াছে;—তাহারা তাহার ঘরে প্রবেশ করিতে আসিতেছে। পাছে গোলমালে খুকীর ঘুম ভাঙিয়া যায় সেই ভয়ে বিনোদিনী দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইল, বলিল—"খবরদার। গোল কোরো না—ঘরে যেয়োনা!"

বিনোদিনীর কথা তাহারা কানে না তুলিয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সকলকে থামাইতে গেল—অবরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল —"চুপ! আস্তে!"

পুলিশের লোকেরা সে কথা গ্রাহ্য করিল না;—ঘরের চারিদিক খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ বিছানার নিকট যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই যে! এখানে! পাওয়া গেছে!" বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি খুকীকে উঠাইয়া লইল;—খুকীর ঘুমন্ত শরীর এলাইয়া পড়িয়াছে—তাহার মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহা দেখিয়া বিনোদিনী অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"আহা হা! বাছারে।"

কেহ তাহার সে মর্ম্মান্তিক কাতরতা অনুভব করিল না;—কেহ তাহাতে সহানুভূতি দেখাইল না। ইন্‌স্পেক্টর বাবু আসিয়া বিনোদিনীর নাম ইত্যাদি খাতায় লিখিয়া লইতে লাগিল। তারপর গম্ভীর স্বরে বলিল—"তোমায় থানায় যেতে হবে।"

বিনোদিনী বলিল—"কেন? অপরাধ?"

—"অপরাধ চুরি।"

বিনোদিনী বিস্মিত হইয়া বলিল—"চুরি!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল—"হাঁ চুরি। মেয়ে চুরি।"

কথাটায় বিনোদিনী কেমন চমকিয়া উঠিল। মেয়ে চুরি! হায় হায়, এ কথাটা একটু আগে তাহার কানে আসে নাই কেন! তাহা হইলে সে এতক্ষণে খুকীকে বুকে লইয়া—কিন্তু আর সময় নাই! সময় নাই! ঐ খুকীকে লইয়া যাইতেছে! বিনোদিনী সেই দিকে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

সেই রাত্রেই চৌধুরীবাড়িতে এক মহা ভোজের আয়োজন হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হাসি, গানের উচ্চরোল বিনোদিনীর অন্ধকার নিস্তব্ধ বাড়ির মধ্য হইতে একটা কাতর প্রতিধ্বনি ফিরাইয়া আনিতে লাগিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রয়াগের কয়েকটি মন্দির

প্রয়াগতীর্থ মন্দিরে মন্দিরে পরিপূর্ণ। এখানে রাস্তাঘাটে সহরে মাঠে যেখানে সেখানে মন্দির। এত মন্দিরেও এদেশের লোকের আশ মিটে নাই। যে স্থানটি একটু নির্জ্জন সুদৃশ্য, সেইখানেই ইট বা পাথরবাঁধান একটি গাছের তলায় একখানা সিঁদুর-মাখান পাথর—অন্ততঃ পক্ষে একটা মাটীর ঢিবিও দেবতারূপে বিরাজিত। বলিতে কি এখানে এমন একটা বড় গাছতলা বা নির্জ্জন সুদৃশ্য স্থান দেখিলাম না যেখানে একটি স্বষ্টি-ছাড়া মূর্ত্তি পড়িয়া নাই। আর যেখানেই এরূপ মূর্ত্তি—সেখানেই একটা নিশান পোঁতা,—নিশান দেখিলেই বুঝিতেই হইবে ইহা একটি দেবস্থান। এইরূপ এক একটি মূর্ত্তি পূজার একটা নির্দ্দিষ্ট দিন আছে,—সেদিন দূর হইতে সেখানে লোকজন জমে,—দোকান পসারি বসে, একটা মেলা হয়। তার পর যে যেখানে চলিয়া যায়, মূর্ত্তিটি একা পড়িয়া থাকে।

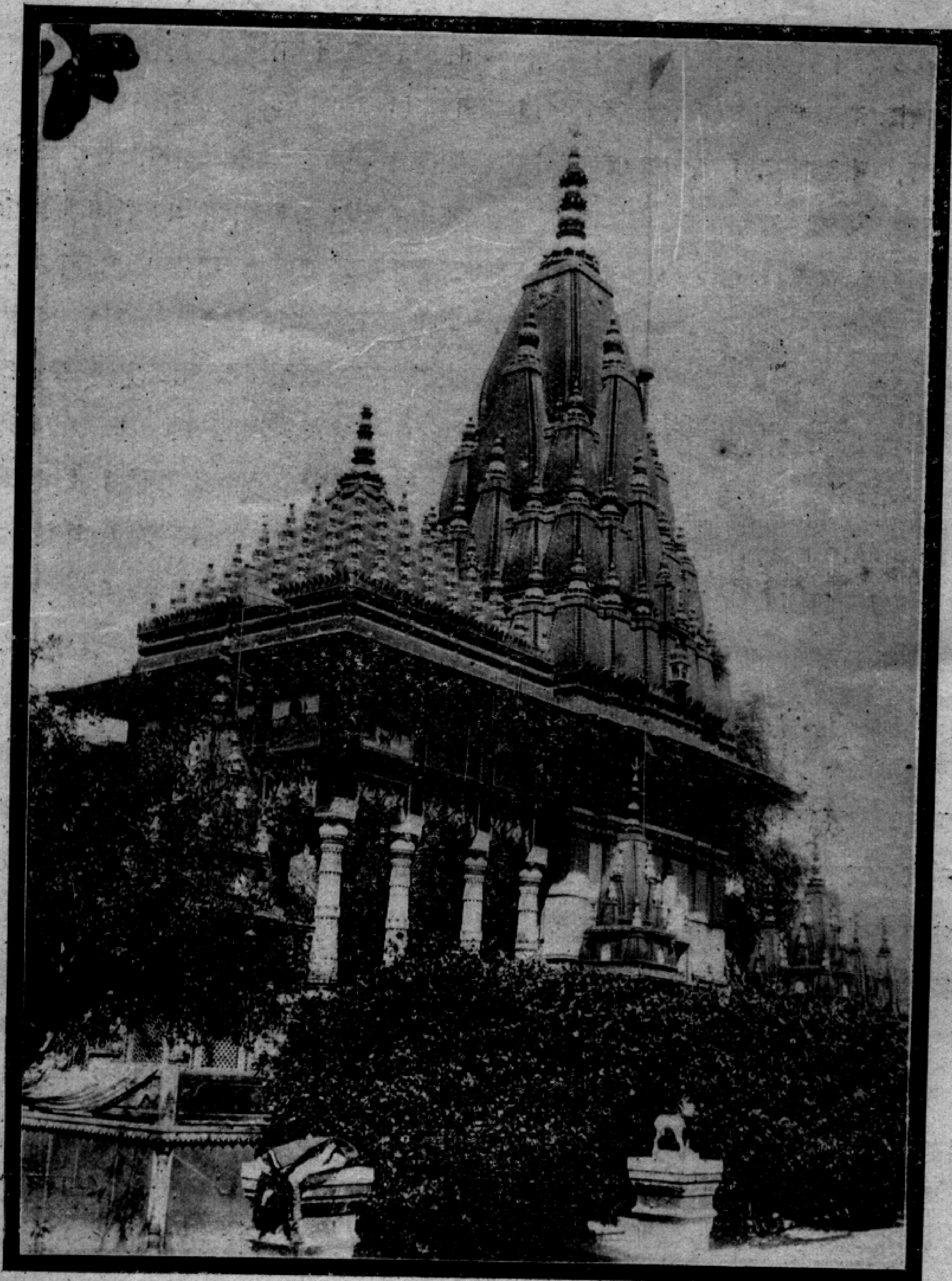
আমার মনে হয় সৌন্দর্য্য পূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই প্রথমতঃ এরূপ স্থলে দেবাবির্ভাব কল্পনা করা হইয়াছে। বলিতে কি, আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি পূজা করিতে, স্বভাব সৌন্দর্য্যে দেবত্ব আরোপ করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।—

প্রয়াগের সকল মন্দিরই যে আমরা দেখিয়াছি তাহা নহে,—আমরা সর্ব্ব প্রথম দেখিতে যাই **ভরদ্বাজের মন্দির**।—প্রবাদ এই, রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় এইখানে তিন দিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। মন্দির দর্শনে যাইবার সময় মনে করিলাম, নাজানি কিরূপ একটি নির্জ্জন পবিত্র স্থান দেখিতে যাইতেছি। কিন্তু লোকালয়ের ভিতর দিয়া ধূলায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা হট্টগোলময় অপরিষ্কার কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম—ইহাই ভরদ্বাজের মন্দির। পরে যত মন্দির দেখিয়াছি এমন অপরিষ্কার ধূলিময় কোনটি নহে। এখানে দুইটি মন্দির ঘর—এক ঘরে রাম লক্ষণ সীতার মূর্ত্তি, অন্য ঘরে একটি শিবমূর্ত্তি। দুইটি ঘরের ভিতরে দুইটি সিঁড়ি পথ আছে—সেইখান দিয়া নীচের অন্ধকার গহ্বরে নামা যায়। ইহার একটি গহ্বর বশিষ্ঠ মুনির, একটি ভরদ্বাজের তপঃস্থান বলিয়া কথিত। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে না করিতে জনকতক পুরুষ-মূর্ত্তি স্ত্রীপাণ্ডা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ করিয়া দিল! মন্দির দেখিব কি—আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত। মনে হইল আজ বুঝি এইখানেই কয়েদী হইয়া পড়ি। কমপাউণ্ডের মধ্যে কাছাকাছি আরও অনেক মন্দির;—সকল মন্দিরের লোকেরা এক সঙ্গে জুটিয়া নিজের নিজের দেবতার জন্য পয়সা চাহে, নিজের নিজের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য চীৎকার করে, ঘন ঘন হাত নাড়িতে নাড়িতে কাছে আসে, অতি কষ্টে আমাদের প্রহরীরা তাহাদের সরাইয়া রাখে। যাহা হৌক খানিকক্ষণ তাহাদের চীৎকারের বড়শিতে চুবানী খাইয়া অবশেষে অনেক কষ্টে ছিপ কাটিয়া পলাইলাম। গাড়ীতে উঠিয়াও নিস্তার নাই,—অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা মিলিয়া চীৎকার

করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। এমন বিপদে আর কখনও পড়ি নাই। যদি ভরদ্বাজ মুনি জানিতেন—তাঁহার শান্তির আশ্রম একদিন এমন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিতে পারে; তাহা হইলে বোধ করি ইহার চিহ্নমাত্রও রাখিয়া যাইতেন না।

অলোপীবাগের স্বর্ণচূড় মন্দির।

এ মন্দিরটি পুরাতন মন্দির নহে—ইহা প্রস্তর



অলোপীবাগের স্বর্ণচূড়মন্দির—এলাহাবাদ।

নির্ম্মিত লাল্‌বর্ণের নূতন একটি মন্দির। ইহার চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত। যে দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়—তাহা সুবৃহৎ। দ্বারদেশে একটি জলের ঘড়ি

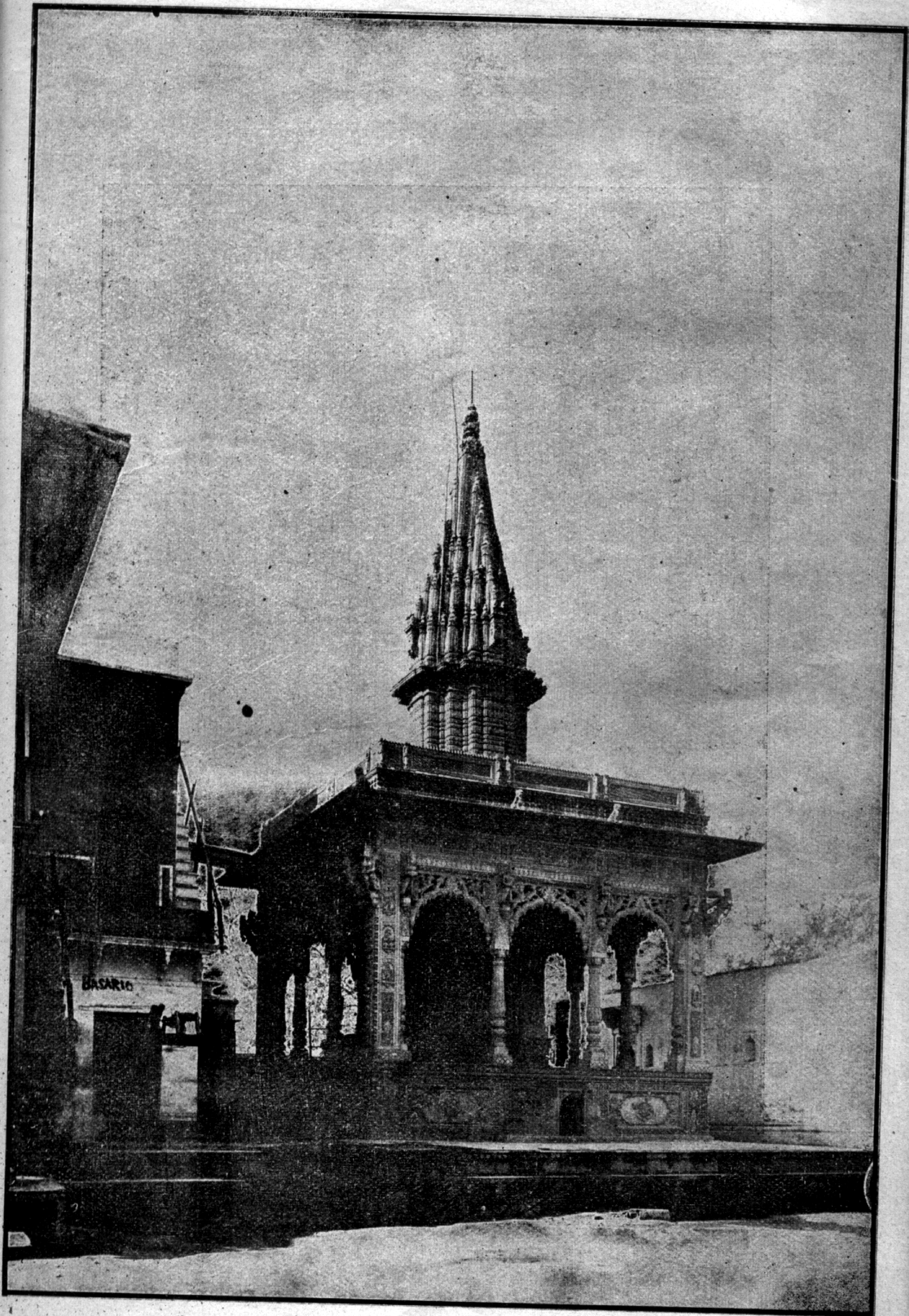
স্থাপিত,—একটা নল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল একটা পাত্রে গিয়া পড়িতেছে, জলে বাটীটির কতখানি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—তাহা দেখিয়াই সময় ঠিক হয়। বাটীটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিলে তখন জলটা ফেলিয়া দিতে হয়। মন্দিরটি শিবমন্দির। মন্দিরের চারিধারের বারান্দার দেয়ালে দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত, মন্দির মধ্যে অনেক দেবদেবীর চিত্র। কমপাউণ্ডের মধ্যে একটি একতালা গৃহে কৃষ্ণরাধার মূর্ত্তি। সেই গৃহের ছাতে কৃষ্ণরাধার মাথার উপর কয়েকটি বিলাতী মূর্ত্তি (Statue) দণ্ডায়মান। এই মূর্ত্তিগুলি বেশীর ভাগ স্ত্রীমূর্ত্তি,—পুরুষও আছে; একজন 'নাইট' একটা হরিণ পৃষ্ঠে লইয়া দণ্ডায়মান। দেবমন্দিরে এইরূপ বিলাতী দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম, বুঝি বা বাল্মীকি লক্ষ্মী স্বরস্বতী আজ এই বেশে শিবের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। আশ্চর্য্যই বা কি! শুনা যায় আজকাল কোনকোনও দেবতারি পাঁউরুটি বিস্কুটের ভোগ নহিলে চলে না।

খুলদাবাদের মন্দির। ইহাও দর্শনযোগ্য একটি আধুনিক শিবমন্দির। এখানেও ভাস্কর শিল্পের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

দারাগঞ্জের দশাশ্বমেধ। দারাগঞ্জ গঙ্গার উপকূলে স্থাপিত। বড় বড় বাড়ী ইমারত মন্দিরে মন্দিরে ইহা ভরা। নদী হইতে এই স্থানটি দেখিতে বড় সুন্দর, ঠিক যেন ছবির মতন। দারাগঞ্জের প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধের ছবি আমরা এখানে দিলাম।

দারাগঞ্জের বাসুকী মন্দির। এ মন্দিরের ছবি পাই নাই। মন্দিরটি একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। গঙ্গার বাঁধান ঘাট হইতে উপরে বারান্দা পর্য্যন্ত দুই পাশে দেয়াল গাঁথা। আমরা ঘাটের সুবিস্তৃত সু-উচ্চ সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া—সর্পরাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বর্ষাকালে সম্মুখের প্রসারিত মাঠ ঢাকিয়া এই ঘাটে জল আসে। কিন্তু এখন গঙ্গা, শুষ্ক হরিদ্রাবর্ণ ক্ষেত্রাকাশের এক পাশে একখানি ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মত শুইয়া আছে। তাহার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত আকাশ আর চারি পাশে অনন্ত প্রসারিত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। মাঠের সীমান্তস্থিত বড় বড় বৃক্ষাবলী মন্দিরের উচ্চভূমি হইতে ঈষদুচ্চ সমতল হরিৎক্ষেত্রের মত দেখাইতেছে। বিকালের প্রশান্ত কনক আভা প্লাবিত হরিদ্রাবর্ণের এই ক্ষেত্রাকাশ চারিদিকে কেমন একটা গম্ভীর বৈরাগ্যের তান তুলিতেছে—বাসুকীদেব সহস্রফণা তুলিয়া যেন তন্ময়চিত্তে সেই বৈরাগ্য সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন।

শিবকোটির মন্দির। এই মন্দিরটি দেখিতে গিয়াছিলাম—আমরা রাত্রিকালে। মন্দিরের নাম হইতে সমস্ত স্থানটির নাম হইয়াছে. শিবকোটি। স্থানটি একবারে সহরের বাহিরে গঙ্গার তীরে,—বড় নির্জ্জন। মন্দিরের পুরোহিতগণ ছাড়া এখানে আর কাহারো বসতি নাই। সেদিন পূর্ণিমা; সাদা ধবধবে গম্বুজওয়ালা ছোট্ট মন্দিরের উপর, কাল পাথরের ঘাটের উপর, মন্দিরের নীচে ধূধূকারী বালির চড়ায় উপর,—দূরে গঙ্গার অস্পষ্ট কাল একটা রেখার উপর জ্যোস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই ঘুমন্ত



খুলদাবাদের মন্দির—এলাহাবাদ



দশাশ্বমেধ—দারাগঞ্জ—এলাহাবাদ

জ্যোৎস্নাকে কম্পিত করিয়া পুরোহিতদিগের স্তবগান মন্দিরের মধ্য হইতে স্তব্ধ আকাশে উথলিয়া উঠিতেছে, চারিদিক গম গম করিতেছে, চারিদিক পবিত্র হইয়া উঠিতেছে। মনে হইতে লাগিল আমি ঋষি আশ্রমে সামগান শুনিতেছি। সেই স্তব শুনিতে শুনিতে পূতঃ হইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বালির চড়া ভাঙ্গিয়া নদীর ধারের দিকে চলিলাম। পুরোহিতদিগের স্তুতিগান ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতে লাগিল, যখন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম কেবল একটা গুণগুণানি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এখানে কি নিস্তব্ধ ভাব! নিজের নিশ্বাস শব্দ পর্যান্ত যেন শোনা যায়। এই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধ রজনীতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াই যেন বিস্মিত হইতে লাগিলাম। বিস্ময়ে স্তব্ধভাবে গঙ্গাতীরের বালুকার উপর আসিয়া বসিলাম। গঙ্গার উপরে যেখানে পূর্ণচাঁদ তল তল ঢল ঢল করিতেছে, তাহার কাছেই আকাশের একখানা কাল মেঘ পড়িয়া ঘনঘোর করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষের হৃদয়ের মত গঙ্গার হৃদয়েও যেন একই সঙ্গে হাসি কান্না গাঁথা রহিয়াছে। একদিকে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গহাসি কুলু কুলু শব্দে আমাদের পায়ের কাছের তটদেশ আঘাত করিতে লাগিল,—আবার অন্য দিকে—ওপারের পাড় ভাঙ্গিবার শব্দ মুহূর্তর হইয়া তাহার শোক সঙ্গীতের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। পূর্ব্বদিকে মেঘের মত আবছা আবছা গাছ পালার মধ্যে একটি মাত্র আলো টিপ টিপ করিতেছিল, পশ্চিম-দিগন্তে গাছ পালার ভিতর সন্ধ্যার তারা জল জল করিয়া উঠিল। প্রিয়জনবেষ্টিত হইয়া তীরে বসিয়া অতি সুখের আধিক্যে মনে হইতে লাগিল, যদি মরিতে হয় ত এই সময় এই গঙ্গার বুকে।

পাড়িলামন্দির। শিবকোটির মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম শুনিয়া আমার একটি মহিলাবন্ধু সোৎসাহে সানন্দে হাস্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, "একদিন চল পাড়িলামহাদেব দেখিয়া আসি; তাঁহার মাহাত্ম্য কথা অনেক শুনিতে পাই।" তাঁহার উৎসাহে সকলেই উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিয়া, হাসিতে হাসিতে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিলাম। হায়! কে জানিত তখন আমাদের এই হাসির মধ্যে কিরূপ কান্না লুক্কায়িত রহিয়াছে। যাত্রী আমরা চারিজন স্ত্রীলোক সঙ্গে দরোয়ান চাকর বাকর। ঘরের গাড়ী গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গেল—তারপর গঙ্গার কাঁচা পুলের পরপারে উবড়ো খাবড়ো গ্রাম্য পথ, এ পথে ঘরের গাড়ী চলে না, আমাদের জন্য এক্কা প্রস্তুত ছিল, আমার এক্কা বাহনে চলিলাম। পশ্চিমে খাঁচার মত দুচাকার একরূপ ঘোড়ার গাড়ীর নাম এক্কা। এক্কা চড়িবার সুখ যে কিরূপ—তাহা পশ্চিমপ্রবাসী মাত্রেই জানেন। এক্কা চড়িয়া আমাদের আনন্দ দেখে কে? ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে, দোল দিতে দিতে পুল পার হইয়া যখন এক্কাখানি আয়েসে হেলিয়া দুলিয়া চলিল তখন আমাদের প্রাণের যত সুখের কাহিনী সেইরূপ ভাবেই উথলিয়া উঠিতে লাগিল; হাসিতে খুসিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পুলটা পার হইয়া গ্রাম্য রাস্তায় আসিয়া পড়া গেল। মনে হইল এইবার মন্দিরে আসিয়া পৌছিলাম। কিন্তু যতই যাই শুনি আরও যাইতে হইবে। ...

ভৃত্য যাহারা সঙ্গে ছিল তারা ঠিক পথ জানে না, মাঝে মাঝে রাস্তার লোক ধরিয়া তাহারা পাড়িলা গ্রামের সন্ধান লয়। কেহ বলে এ রাস্তায় যাও, কেহ বলে ও রাস্তায়। পথের না আছে একটা ঠিক, না আছে একটা কথার ঠিক, গাড়োয়ানেরা একবার এ রাস্তায়, একবার ও রাস্তায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলিতে দুলিতে অবশেষে একটা মাঠের পথে গাড়ী আনিয়া ফেলিল। শুনিলাম এই পথে গেলে শীঘ্র যাওয়া যাইবে,—তখন বুঝিলাম মহাদেবের মন্দিরে কিন্তু তারপর বুঝিলাম আর খানিকটা এরূপ পথে গেলে শীঘ্রই শেষ স্থলে যাইবার সম্ভাবনা। মাঠের সেই পথহীন আঁকা বাঁকা ঢিবি ঢাবা উঁচু নীচু পথে বারবার স্বর্গ হইতে রসাতলে দুমদাম করিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ী চলিতে লাগিল। এক একবার সমুখে একটা উঁচু ঢিবি দেখি,—কি করিয়া এটা পার হইব এই ভাবনায় প্রাণটা চমকিয়া উঠে; ভৃত্যেরা গাড়ীটার দুইদিক ধরিয়া মজেমে মজেমে (ধীরে ধীরে) করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে অবশেষে দুম করিয়া নামাইয়া দেয়—আমাদের মনে হয় মজাটা যথেষ্ট হইয়াছে একটু কমিলে বাঁচি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা চারিজন যাত্রী। এই বিপত্তিতে পড়িয়া আমাদের প্রৌঢ়া সখীটি বলিতে লাগিলেন, তিনি আহার করিয়া শিবদর্শনে আসাতেই যত অনর্থ ঘটিল। আর কখনও এরূপ করিবেন না বলিয়া তিনি মাননা করিতে লাগিলেন। কোন রকমে যখন মাঠের ভবনদীটা পার হইয়া মন্দিরে আসা গেল তিনি বলিলেন, তিনি মাননা না করিলে, কখনই আজ মন্দিরে আসা ঘটিত না।

এতটা সুখে রাস্তা পার হইয়া মন্দির দেখিয়া চক্ষু স্থির। একটা গলি খুঁজির মধ্যে একটা এঁদো পচা জায়গায় ছোটখাট একটি মন্দির—ইহাই দেবনিকেতন। যাহা হোক, দুপুরের সময় বাড়ী ছাড়িয়া বেলা চারিটার সময় আমরা মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে দেখিবার বেশী কিছু ছিল না—আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেবদর্শন শেষ করিয়া পুনরায় একারোহণ করিলাম। অমন উঁচু নীচু পথে রাত হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে মাঠেই রাত কাটাইতে হইবে। সঙ্গে আবার একটা আলোর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত নাই। দিন দুপুরে বাড়ী ছাড়িয়া কার মনে অন্ধকার রাত্রির বিপদ মনে আসে। অন্ততঃ আমাদের আসে নাই। এবার সে রাস্তা না ধরিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা ধরা গেল! শীতকাল, বিকাল হইতে না হইতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়ে, সন্ধ্যা না আসিতে আসিতে অন্ধকার হয়। শীঘ্রই ঘোর ঘোর হইয়া আসিল; গাড়োয়ানদিগের বহু চেষ্টাতেও গাড়ী মাঠ ছাড়াইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। বেচারা ঘোড়ারাই বা আর কত পারে। তবু তাহারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল, বাবলা গাছের নোয়ান ডালপালার কাঁটায় আঁচড় খাইয়া, নীচে তৃণগুল্মের উপর তার প্রতিশোধ লইয়া গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল—আর খানিকটা গেলেই আমরা মোহনগঞ্জের গ্রাম্য রাস্তায় আসিয়া পড়িব, সকলের মনে এই মাত্র ভরসা। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া আমরা মাঠের দিকে চাহিতে

চাহিতে চলিলাম—সহরের মত এখানে হিমময় ধুম নাই তাই অন্ধকারেও চারিদিক একটু একটু নজরে পড়িতেছিল। কন্‌কনে শীত, সজোরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে—ক্ষেত্র সীমান্তের গাছপালাগুলা অনুচ্চ মেঘধূমের ন্যায় দেখাইতেছে, যেদিকে চাই ত্রিসীমায় একটা লোক নাই, লোকালয় নাই, একটা পথ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে বিপথে এক একটা শেয়াল আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া যাইতেছে। যত অন্ধকার হইতে লাগিল আমাদের প্রাণ শুকাইয়া আসিতে লাগিল, রাত্রি আসিলে আর উপায় নাই। সমস্ত আমোদ প্রমোদ গল্প গুজব ফুরাইয়া গেল, আমরা নিঃঝুম হইয়া পড়িলাম। এই সময় আমার মনে হইয়াছিল—নভেললেখকগণ কত সহজে পথিককে পথহারা করিয়া ফেলেন; আশীর্ব্বাদ করি, দিক্‌হারা অবস্থাটা যে কি ভয়ানক তাহা তাঁহারাও একবার হৃদয়ঙ্গম করুন! যাহা হউক কোন জন্মের নিতান্ত পুণ্যফলে আমরা শীঘ্রই গ্রামের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম—আর ভাবনা রহিল না—বুঝা গেল যত রাত্রেই হোক বাড়ী পৌঁছিব। তাহার পর যে বাড়ী ফিরিয়াছি—তাহা বলা অনাবশ্যক। এখন ঘরে বসিয়া সেদিনকার কথা মনে করিতে বড়ই ভাল লাগে—মনে হয় সে যাত্রার মতন আমোদ আর কোন যাত্রায় হয় নাই।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

পানীয়।

শরীর ধারণের জন্য যেমন খাদ্যের আবশ্যক হয়, সেইরূপ কিয়ৎ পরিমাণ জলেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে গড়ে শতকরা ৭০ ভাগ জল আছে। রক্ত, রস প্রভৃতি শরীরস্থিত তরল পদার্থের মধ্যে জলের ভাগই অধিক। এতদ্ব্যতীত পেশী, চর্ম্ম, তন্তু, মেদ এবং মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রাদির মধ্যে, এমন কি অত্যন্ত কঠিন অস্থিসমূহের মধ্যেও অল্লাধিক পরিমাণে জল বিদ্যমান থাকে। এই জল আমাদের প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মলের সহিত অনবরত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছে। তৃষ্ণা দ্বারা শরীর মধ্যে জলের অভাব আমরা অনুভব করিয়া থাকি এবং শীতল জল পান করিয়া অথবা দুগ্ধের ন্যায় তরল খাদ্য কিম্বা চা, কফি, সোডা-ওয়াটার, লেমনেড্ প্রভৃতি বিবিধ জলীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত অভাব পূরণ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, রুটি, ভাত, ডাল প্রভৃতি যে সকল কঠিন খাদ্য আমরা ভক্ষণ করি, তাহাদের মধ্যেও অল্লাধিক পরিমাণ জল বিদ্যমান থাকে। এইরূপে নানা উপায়ে শরীর রক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনমত জল সংগ্রহ করিয়া লই।

আমাদিগের রক্তকে যথোচিত তরল

রাখিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। রক্ত গাঢ় হইলে উহা শিরার মধ্য দিয়া অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে না, সুতরাং অধিক পরিমাণ দূষিত রক্ত শরীর মধ্যে সঞ্চিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রদর্শন করে; এরূপ অবস্থায় শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগে তরল মলের আকারে রক্ত হইতে অত্যধিক পরিমাণ জল নিঃসারিত হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত গাঢ় হইয়া শ্বাসকষ্ট উৎপাদন করে। অনেক রোগী এই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে রোগীর শিরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ঈষদুষ্ণ লবণাক্ত জল যন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করাইয়া রক্তকে স্বাভাবিক তরল অবস্থায় আনয়ন করা হয়। এতদ্দ্বারা রোগীর যন্ত্রণা নিবারিত হয় এবং অনেক রোগী এই চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

খাদ্যকে পরিপাক করিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। খাদ্য কোমল না হইলে উহার উপর বিভিন্ন পাচক রসের ক্রিয়া যথোচিতরূপে প্রকাশ পায় না এবং জীর্ণ খাদ্য যথোচিত তরল না হইলে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইতে পারে না। জল কঠিন খাদ্যকে কোমল ও তরল করিয়া পরিপাকের ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার উপযোগী করে।

ভুক্ত খাদ্যের যে অংশ জীর্ণ হয় না তাহাকে, এবং পরিশ্রমঘটিত ও শারীরিক বিবিধ স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন নানাবিধ দূষিত পদার্থকে মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের আকারে শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জলের আবশ্যক হয়। এই সকল দূষিত পদার্থ শরীরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলে নানাবিধ উৎকট রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত খাদ্য পরিপাকের জন্য যে সকল পাচক রসের আবশ্যক হয়, তাহাদিগকেও প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কিয়ৎ পরিমাণ জলের আবশ্যক হয়।

সকল প্রকার পানীয় দ্রব্যের মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ। দুগ্ধ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইলেও উহা খাদ্যশ্রেণীভুক্ত। দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ জল আছে, এজন্য দুগ্ধপায়ী শিশুগণকে অন্য উপায়ে জল সংগ্রহ করিতে হয় না। জলই একমাত্র স্বভাবজ পানীয়; আমরা উহা সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে অযাচিতভাবে পাইয়া থাকি। আর যে কোনপ্রকার পানীয় হউক না কেন, উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণ জল মিশ্রিত থাকে বলিয়াই উহা পানীয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

আমরা যে জল পান করি, তাহা নির্ম্মল স্বচ্ছ, গন্ধ ও বর্ণবিহীন এবং সুস্বাদু হওয়া উচিত। কিন্তু জলের এই সকল গুণ থাকিলেই যে উহাকে নিরাপদে পান করা যাইতে পারে, তাহা নহে। সময়ে সময়ে কলেরা বা টাইফয়েড্ জ্বরের বীজাণু অতি সামান্য পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলে উহার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ বা স্বচ্ছতার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না, কিন্তু এরূপ জল পান করিলে ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ জ্বর, রক্তাতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ অপরিষ্কৃত জল পান করিয়া উৎপন্ন হয়। এজন্য যে জল আমরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া

জল ও অপরাহ্নে ঘোল পান করিলে বৈদ্যের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয় না।

ঘোলের ন্যায় ডাবের জলও একটী উপাদেয় পানীয়। ইহার মধ্যে খাদ্যের গুণও কতক পরিমাণে আছে। আহারের পর ডাবের জল পান করিয়া অনেকের অজীর্ণ রোগ সারিয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে কচি ডাবের জলে হিক্কা ও বমি বন্ধ হইয়া যায়। সমুদ্রযাত্রা করিলে অনেকের বিষম বমি (Sea sickness) হইয়া থাকে; ডাবের জল ব্যবহার করিয়া এই বমি একেবারে স্থগিত হইতে দেখা গিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে এদেশে নানাবিধ ফলের লেবু, তেঁতুল, মিছরি ও চিনির সরবৎ অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে এই সকল সরবৎ পানীয় ও খাদ্য উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে। অধিক সরবৎ পান করিলে ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সোডাওয়াটার্, লেমনেড্ প্রভৃতি কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ মিশ্রিত পানীয় (Aerated waters) যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শরীর মধ্যে বিষের কার্য্য করে কিন্তু কোন পানীয়ের সহিত উদরস্থ হইলে কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না। নিয়মিত পরিমাণে এই সকল পানীয় গ্রহণ করিলে কোন দোষ ঘটিতে দেখা যায় না, তবে ভোজনের অব্যবহিত পরেই অনেকে অধিক সোডাওয়াটার্ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে পরিপাকের সুবিধা না হইয়া ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে অপরিষ্কৃত জলে এই সকল পানীয় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদির অপরিচ্ছন্নতা হেতু ধাতুবিশেষ দ্বারা ইহারা দূষিত হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা অনেক সোডাওয়াটারের মধ্যে টাইফয়েড্ জ্বরের বীজাণু যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এইরূপ সোডা ওয়াটারের ব্যবহার দ্বারা টাইফয়েড্ জ্বর বিস্তার লাভ করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও নিতান্ত বিরল নহে। মফঃস্বলে এই সকল পানীয় যে জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা প্রায়ই দূষিত। কলিকাতা সহরেও সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদারের নিকট হইতে এই সকল পানীয় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

চা, কফি ও কোকো আজকাল শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এ স্থলে বলা উচিত যে সহজ শরীরে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য ইহাদিগের একটীরও প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ কিছুদিন ব্যবহার করিলে এমনই অভ্যাস হইয়া যায় যে সহজে ইহাদিগকে আর পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। তবে নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে ইহাদিগের মধ্যে কোনটীই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরঞ্চ পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া স্ফূর্ত্তি ও আরামদায়ক হইয়া থাকে। তবে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের পক্ষে চা বা কফি কোনটীই ভাল নহে—তাহাদিগকে কোকো খাইতে দিলে কোন অনিষ্ট হয় না। চা অপেক্ষা কফির উত্তেজনা-শক্তি অধিক; কোকোর উত্তেজনা-শক্তি চা ও কাফি অপেক্ষা অনেক কম। চা ও কফির মধ্যে খাদ্যের গুণ কিছু মাত্র নাই; কোকোর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ তৈলজাতীয়

এবং ১৫ ভাগ মাংসজাতীয় খাদ্য অবস্থিতি করে, সুতরাং ইহা কতক পরিমাণে খাদ্যেরও কার্য্য করিয়া থাকে। চকোলেট নামক পদার্থ কোকো হইতে প্রস্তুত হয়। ছোট ছোট ছেলেরা চকোলেট্ খাইতে বড় ভাল বাসে এবং ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা উপস্থিত হয়। চায়ের মধ্যে ট্যানিন্ (Tannin) নামক একটী কষায় পদার্থ আছে, ইহাই কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ উৎপাদন করে। চা যত "কড়া" হয়, ততই ট্যানিন্ অধিক পরিমাণে উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এজন্য "কড়া" চা পান করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাঁহাদের কোনরূপ হৃদ্‌রোগ আছে, যাঁহারা হৃৎস্পন্দনে কষ্ট পান অথবা যাঁহারা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগে আক্রান্ত, তাঁহাদের চা বা কফি সেবন করা উচিত নহে।

অতিশয় পাতলা চা পান করাই সঙ্গত। ফুটন্ত জল চায়ের পাতার উপর ঢালিয়া ৩।৪ মিনিট রাখিলে যে অল্প লাল রঙের জল হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ছাঁকিয়া পান করিলে কোন দোষ হয় না। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি মাংসজাতীয় খাদ্যসামগ্রীর সহিত চা পান করা সঙ্গত নহে—ইহাতে ঐ সকল পদার্থের পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে।

চা এবং কফির অহিফেন ও সুরার মাদকতা নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, এইজন্য ঐ সকল মাদক দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে চা ও কফির ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। চা ব্যবহার করিয়া অনেকে সুরাপান অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে; ইহা চায়ের পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পল্লীগ্রামের অপরিষ্কৃত জল অল্প পরিমাণ চায়ের পাতার সহিত ফুটাইয়া লইলে জল হইতে কতকগুলি দূষিত পদার্থ দূরীভূত হয়।

সুস্থ শরীরে সুরা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। সহজ শরীরে সুস্থ অবস্থায় সুরার একেবারেই কোন আবশ্যকতা নাই। ইয়ুরোপীয় সমাজে সুরাপান অতি বিস্তৃতভাবে প্রচলিত দেখিয়া বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্মদাতা ইংরাজ ডাক্তার পার্ক্‌স্ (Parkes) বলিয়াছেন যে পূর্ণ স্বাস্থ্য, সামর্থ্য এবং মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার জন্য সুরাপানের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

তিনি আরো বলেন যে যাহারা মোটেই সুরা স্পর্শ করে না, তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নহে। পূর্ব্বে অবস্থাবিশেষে সুরাপানের উপকারিতা সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যেও যে সকল ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এক্ষণে বিবিধ পরীক্ষার সাহায্যে সেই সকল ভ্রান্ত সংস্কার ক্রমে দূর হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে সুরা শরীরকে গরম রাখিয়া শীত নিবারণ করিতে সমর্থ, এজন্য ইহা শীতপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। এক্ষণে অভ্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে শীত নিবারণ করা দূরে থাকুক, সুরামাত্রেই শীত নিবারণ না করিয়া শীতাধিক্য উৎপাদন করে। বরফাবৃত মেরু প্রদেশের আবিষ্কারকগণ এবং আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের আরোহীগণ ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ঐ সকল স্থানে সুরা ব্যবহার করিলে বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। উহা দ্বারা শীত নিবারিত

না হইয়া দেহের উত্তাপ আরো কমিয়া যায়, এজন্য শীতের প্রকোপ অধিক হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। মেরুপ্রদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য যে সকল লোক তথায় গিয়াছেন, তাহারা তাঁহাদের সঙ্গীগণকে কখনই সুরাপান করিতে দেন নাই। এরূপ দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে সুরাপান করিয়াছে, সে শীতে জমিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুরা ব্যবহার করিলে বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাতে গ্রীষ্মের কষ্ট ত মোটেই নিবারিত হয় না, পরন্তু ইহার সেবনে শর্দ্দিগর্ম্মি, যকৃতের প্রদাহ প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগের আবির্ভাব হয়।

সুরাপান অপেক্ষা সুরাপান না করিয়া অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারা যায়। সুরা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও অধিক পরিশ্রম করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় না; কিছু অধিক মাত্রায় পান করিলে পেশী সমূহের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় সুতরাং পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। আরো অধিক পান করিলে মানুষ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিখ্যাত ডাক্তার পার্কস্ এ বিষয়ের যথারীতি পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অল্প মাত্রায় সুরা ব্যবহার করিলে ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয় বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ইহার বিপরীত ক্রিয়া (Reaction) উপস্থিত হইয়া শরীরকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

মানসিক পরিশ্রমের জন্য সুরার মোটেই আবশ্যক হয় না। ...

কিছুক্ষণের জন্য ভাবিবার ও ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অবসাদ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া পড়ে। একটু বেশী মাত্রায় সুরাপান করিলে কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বিচার শক্তি কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সুরাব্যতিরেকে সৈন্যেরা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য ও কষ্টসহ্য করিতে পারে। সুরাপান করিলে শীতোষ্ণতা, রাত্রি জাগরণ, অধিক দূর পদব্রজে গমন, অনাহার প্রভৃতি সৈনিক জীবনের অপরিহার্য্য কষ্টগুলি সহ্য করিবার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়।

সুরা প্রকৃত খাদ্যের স্থান অধিকার করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুরা সামান্যভাবে খাদ্যের কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও উহা যে একটী বিষাক্ত পদার্থ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং সুরা অপেক্ষা সুলভ ও সহজ প্রাপ্ত রসনাতৃপ্তিকর অসংখ্য খাদ্য সামগ্রী থাকিতে এরূপ মাদকতাগুণসম্পন্ন পদার্থ খাদ্য রূপে ব্যবহার করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। একজন ইংরাজ চিকিৎসক হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে আট বোতল বীয়ার্ (Beer) নামক মদ্যে যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকে, তাহা একটুকরা মিছরির সহিত সমান। অতএব খাদ্য হিসাবে ৩৲ টাকার বীয়ার্ এক পয়সার মিছরির সহিত সমান!

অনেকে বলেন যে সুরা খাদ্য না হইলেও উহা খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা করে। সুরা ...

না হইয়া দেহের উত্তাপ আরো কমিয়া যায়, এজন্য শীতের প্রকোপ অধিক হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। মেরুপ্রদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য যে সকল লোক তথায় গিয়াছেন, তাহারা তাঁহাদের সঙ্গীগণকে কখনই সুরাপান করিতে দেন নাই। এরূপ দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে সুরাপান করিয়াছে, সে শীতে জমিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুরা ব্যবহার করিলে বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাতে গ্রীষ্মের কষ্ট ত মোটেই নিবারিত হয় না, পরন্তু ইহার সেবনে শর্দ্দিগর্ম্মি, যকৃতের প্রদাহ প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগের আবির্ভাব হয়।

সুরাপান অপেক্ষা সুরাপান না করিয়া অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারা যায়। সুরা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও অধিক পরিশ্রম করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় না; কিছু অধিক মাত্রায় পান করিলে পেশী সমূহের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় সুতরাং পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। আরো অধিক পান করিলে মানুষ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিখ্যাত ডাক্তার পার্ক্‌স্‌ এ বিষয়ের যথারীতি পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অল্প মাত্রায় সুরা ব্যবহার করিলে ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয় বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ইহার বিপরীত ক্রিয়া (Reaction) উপস্থিত হইয়া শরীরকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

মানসিক পরিশ্রমের জন্য সুরার মোটেই আবশ্যক হয় না। অল্প মাত্রায় পান করিলে কিছুক্ষণের জন্য ভাবিবার ও ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অবসাদ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া পড়ে। একটু বেশী মাত্রায় সুরাপান করিলে কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বিচার শক্তি কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সুরাব্যতিরেকে সৈন্যেরা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য ও কষ্টসহ্য করিতে পারে। সুরাপান করিলে শীতোষ্ণতা, রাত্রি জাগরণ, অধিক দূর পদব্রজে গমন, অনাহার প্রভৃতি সৈনিক জীবনের অপরিহার্য্য কষ্টগুলি সহ্য করিবার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়।

সুরা প্রকৃত খাদ্যের স্থান অধিকার করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুরা সামান্যভাবে খাদ্যের কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও উহা যে একটী বিষাক্ত পদার্থ,সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং সুরা অপেক্ষা সুলভ ও সহজ প্রাপ্য রসনাতৃপ্তিকর অসংখ্য খাদ্য সামগ্রী থাকিতে এরূপ মাদকতাগুণসম্পন্ন পদার্থ খাদ্য রূপে ব্যবহার করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। একজন ইংরাজ চিকিৎসক হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে আট বোতল বীয়ার (Beer) নামক মদ্যে যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকে, তাহা একটুক্‌রা মিছরির সহিত সমান। অতএব খাদ্য হিসাবে ৩৲ টাকার বীয়ার এক পয়সার মিছরির সহিত সমান!

অনেকে বলেন যে সুরা খাদ্য না হইলেও উহা খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা করে। সুরা পাকস্থলীতে

উত্তেজনা হয়, এজন্য পাচকরস (Gastric juice) কিঞ্চিদধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহাতেই অনেকে মনে করেন যে সুরা, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা করে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হইবে যে এই ধারণা ভ্রমশূন্য নহে। পাচকরস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলেই উহা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অধিকতর তরল হইবে অর্থাৎ উহার মধ্যে জলের অংশ অধিক এবং পাচক দ্রব্যাদির ভাগ কম থাকিবে। সুতরাং উহার পরিপাক করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়। অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলে পাকস্থলীর যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা দ্বারা পাকস্থলীর দুরারোগ্য প্রদাহ উপস্থিত হয়; মদ্যপায়ীকে সর্ব্বদা যে বমন করিতে দেখা যায়, পাকস্থলীর প্রদাহই তাহার প্রধান কারণ।

ইয়ুরোপীয় সমজে বালকদিগের বীয়ার্ পান করিবার প্রথা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। অল্প বয়সে সুরার ব্যবহার প্রভূত অনিষ্টের কারণ। ইহা শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে বিঘ্ন সাধন করে। বিশেষতঃ বালককাল হইতে যে কোন আকারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলে ঐ কুঅভ্যাস সারাজীবনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে কোন কালে উহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই কুঅভ্যাসের ফলস্বরূপ ইয়ুরোপীয় সমাজে সুরাপানের যেরূপ প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না। ইয়ুরোপে যত দুঃখ কষ্ট, তাহা স্ত্রীপুরুষের এই অবারিত সুরাপান হইতে উৎপন্ন। সুরাপান দ্বারা নিজের, পরিবারের, সমাজের এবং দেশের কি ভয়ানক অনর্থ সাধিত হইতেছে, সুরাপান আরম্ভ করিবার সময় মদ্যপায়ীর যে তাহা জানা থাকে না, তাহা নহে। তখন তাহার মনে হয় যে অল্পমাত্রায় সুরাপান করিয়া যদি স্ফূর্ত্তি ও আমোদ উপভোগ করা যায়, তবে এরূপ নির্দ্দোষ আমোদ ভোগ করিবার আপত্তি কি? সে তখন বুঝে না যে সুরার মাত্রা নিয়মিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য। অনেকেই খাদ্য-পরিপাকের সুবিধা হইবে এই ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ হয়ত চিকিৎসকের মত লইয়া অল্পমাত্রায় সুরাপান করিতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই প্রকৃত মাতাল হইয়া পড়ে। ইয়ুরোপে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিষম দারিদ্র্য ও পশুত্ব লক্ষিত হয়, সুরাই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

প্রত্যহ সুরাপান করিলে শরীরের সমস্ত যন্ত্রই হীনবল হইয়া পড়ে। হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা হেতু রক্তবাহিকা শিরাসমূহ অধিকতর স্ফীত হয় এবং সময়ে সময়ে বিদীর্ণ হইয়া পক্ষাঘাত প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। পাকাশয়ের দুরবস্থার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। জড়তা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ মাতালের সঙ্গের সাথী। ক্রমাগত উত্তেজনা হেতু প্রথমতঃ যকৃতের প্রদাহ উপস্থিত হয়; পরে উহা সঙ্কুচিত হইয়া (Cirrhosis of the liver) সাংঘাতিক উদরী রোগ উৎপাদন করে অথবা যকৃতের স্ফোটক (Liver abscess) উৎপাদন করিয়া অকাল মৃত্যু সাধন করে। সুরা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অতি ভীষণভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করে। একটু বেশী মদ খাইলেই কথা অস্পষ্ট হয় এবং হাত

পায়ের ঠিক থাকে না, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে এই সকল কার্য্য যে সকল পেশীর ক্রিয়াসাপেক্ষ, মস্তিষ্কের আজ্ঞায় সেই সকল পেশী সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকে। সুরাপান করিলে মস্তিষ্ক এরূপ জড় ভাবাপন্ন হয় যে পেশীর কার্য্যের উপর উহার প্রভাব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত মস্তিষ্কের কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি যে সকল ঈশ্বরদত্ত উচ্চতর ক্ষমতা আছে, তাহারাও ক্রমে হীনবল হইয়া অবশেষে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়। তখন মানুষ যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন বহন করিতে হয়। নরহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপে সমাজ সর্ব্বদা কলঙ্কিত হয়, অনেক সময় অতিরিক্ত সুরাপানই ঐ সকল পাপকার্য্যের মূলে অবস্থান করে। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এবং বহুক্লেশোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া যাঁহারা ঐরূপ পশুত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা যথার্থই দয়ার পাত্র! এই অপব্যয়ের অর্থে কত দরিদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন, কত শিক্ষার্থীর শিক্ষা, কত রোগার্ত্তের রোগ-মুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে, এবং সাধারণ মানুষের সুখ সচ্ছন্দতা যে কত পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুরার ব্যবহার কিছু প্রবলভাবে প্রচলিত দেখা যাইতেছে। আবার বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে বরণীয়া ভারত-রমণীগণের মধ্যেও কোথাও কোথাও এই কুঅভ্যাস ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই গৌরবমণ্ডিত প্রাচীন জাতির অধঃপতন যে পূর্ণভাবে সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যদি এ বিষয়ের আলোচনা একটু বিস্তৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন।

এস্থলে বলা উচিত যে সুরা একটী মহোপকারী ঔষধ। সুতরাং যেমন সকল ঔষধই চিকিৎসকের মত লইয়া ব্যবহার করিতে হয়, ইহার সম্বন্ধেও সেই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। চিকিৎসকদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সামান্য মাত্রাতেও সুরা-ব্যবহারের ব্যবস্থা না করেন। অনেক সময়ে চিকিৎসকের লঘুচিত্ততা হেতু অনেক পরিবারের সুখ, সম্পদ ও প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

চয়ন

ভারতের আধুনিক থিয়েটার

(Sylvain Levi-র ফরাসী হইতে)

প্রাচীন ঐতিহ্যের উদ্বোধনে, কৃষ্ণ-যাত্রার ক্রমবিকাশে, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে, ভারতীয় নাট্যসাহিত্য আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইল। বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বেই প্রচুর নাট্য-সাহিত্য উৎপন্ন হয়। খুব আধুনিক কালে, নীলদর্পণের গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ—(১৮২৯—১৮৭৩)। নীল-কর ইংরাজেরা অতিমাত্রায় নীলের চাষ করায়, তাহার, ফলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একটা আর্থিক বিভ্রাট উপস্থিত হয়—তাহাতে বাণিজ্য-প্রতিপত্তির একটু হানি হইয়াছিল। নীল-দর্পণ অতি কঠোরভাবে নীলকরদিগের সমস্ত অত্যাচার প্রকাশ করিয়া দেয়। রেভেরেণ্ড জেম্‌স্ লং নামক একজন বিশ্বহিতৈষী ইংরাজ, ইংরাজিতে উহার অনুবাদ করায়, মিথ্যা অপবাদ দিবার অপরাধে অর্থদণ্ডে ও কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হন। এইরূপে বঙ্গদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ সংক্রান্ত সাময়িক ব্যাপারসকল, নাট্য চেষ্টার আরম্ভকাল হইতেই বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া আসিতেছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন-রচিত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক ঐ একই প্রেরণা হইতে সমুৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার কুলীন-সম্প্রদায় অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারে। যদি কেহ এইরূপ অবৈধ বিবাহ করে, এই অবৈধতা খণ্ডন বা লাঘব করিবার একমাত্র উপায় বহুত মুদ্রা। কুলীন বরের আদর ও সম্মান সর্ব্বত্র,—ক্রমে কৌলীন্য কুলীনের উপ-জীবিকা হইয়া দাঁড়াইল। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায়, কুলীনেরা, বহুবিবাহ করিয়া পণ গ্রহণে ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিল। রংপুরের একজন ধনাঢ্য জমিদার ঘোষণা করিলেন, কুলীনের বহুবিবাহসম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক লিখিয়া রামনারায়ণই এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন (১৮৫৭)।

এই সময়ে আর একটি সামাজিক সমস্যা লইয়া সমাজসংস্কারকেরা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সে সমস্যাটি বিধবা-বিবাহ। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক বিধবা-বিবাহ-নাটক রচিত হয়। বিবাহ-যোগ্য বয়সের বহুপূর্ব্বে বিবাহিতা, অল্প বয়স্কা বালিকারা বিধবা হইলে, স্বামীসহবাস লাভ না করিলেও, দেশাচার ও কুসংস্কার বশত তাহাদিগকে চিরবৈধব্যক্লেশ ভোগ করিতে হয়। বিধবা বিবাহ নাটকে ইহারই কু-ফল প্রদর্শিত হইয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক নাটকের যেরূপ আদর, প্রহসনেরও সেইরূপ আদর। প্রহসন-রচনার নিয়মটি খুব সোজা। হাস্যোদ্রেক করিবার সহজ উপায়,—রাজ-সরকার ও রাজকর্ম্মচারীদিগেকে উপহাস করা, রাজপুরুষগণ অর্থের বশীভূত এইরূপ

প্রদর্শন করা, খেতাব ও উপাধি লাভের চেষ্টাকে বিদ্রূপ করা ইত্যাদি।

যে ধর্ম্মান্দোলনের ফলে, সংশোধিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিঃসৃত হয় এবং পরে উহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেই ধর্ম্মান্দোলনের প্রতিধ্বনি রঙ্গমঞ্চেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক, চৈতন্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কেশবচন্দ্র সেন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াত্মক নববিধানের মত প্রচার করিবার জন্য থিয়েটারের সাহয্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধেই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, "নববৃন্দাবন" নাটক রচনা করেন। এই নাটকের অভিনয়ে স্বয়ং কেশব চন্দ্র বাজীকরের ভূমিকা গ্রহণ করেন। দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে তিনি কতকগুলি রূপকাশ্রিত বাজি দেখাইলেন—যথা, একটি মাত্র সাংকেতিক আকারের ভিতর,—মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্রুস, অর্দ্ধচন্দ্র, ওঁকার, শৈবদিগের ত্রিশূল ও বৈষ্ণবদিগের খুন্তি—এই সমস্ত একত্র সম্মিলিত হইল। আর একটি মুমূর্ষু কপোত প্রদর্শিত হইল; "১৮০০ বৎসর হইল, এই পবিত্র কপোতটি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল; এবং আজ উহা মানব-বুদ্ধির শরাঘাতে ধরাশায়ী হইয়াছে।" হঠাৎ এই পাখীটি অন্তর্হিত হইল, এবং আর একটি পক্ষী আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, তাহার কণ্ঠলগ্ন একটি কাগজের টুক্‌রায় লেখা আছে;—"নববৃন্দাবনের জয়"!

আজিকালি, প্রাচীন প্রস্তাবনার পরিবর্ত্তে, অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন ও ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়, তাহাতে য়ুরোপীয় প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে। 'গালভরা' ঘোরাল শব্দ ও পরিষ্কীত বিশেষণাদি প্রয়োগ করিয়া কিরূপে নাটকের দর্শক আকর্ষণ করিতে হয় তাহা ভারতীয় নাটকের পরিচালকেরা বিলক্ষণ বুঝেন। (১) তাহার সাক্ষী, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের "আনন্দরহো" নাটকের বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের আর একটি নাটকও খুব উৎরাইয়াছে। তাহার নাম "চৈতন্যলীলা।" এই নাটকে বুদ্ধকে একটি সম্মানের আসন দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাচীন প্রতিপক্ষকে এইরূপ সম্মানিত করায় আধুনিক বাঙ্গালীর উদার সমদর্শিতা ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর নাট্যরচনার প্রাচুর্য্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নাট্যসাহিত্যের অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিতেছে। ১৮৮৭ অব্দের ভারতীয় গ্রন্থপ্রকাশের সরকারী বিবরণীতে কতকগুলি মৌলিক রচনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশিত রাজপুতদিগের সাহস ও দেশানুরাগের গৌরব বর্দ্ধিত করিবার জন্য, গুজরাট্‌ প্রদেশে প্রকাশিত "পুরুবিক্রম" নাটকে (২) সেকেন্দর শা ও পুরুর যুদ্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি-উৎসব উপলক্ষে একজন হিন্দুস্থানী গ্রন্থকর্ত্তা "ভারত-সৌভাগ্য" রচনা করিয়াছিলেন। যে সকল নাটক পঞ্জাবে

(১) এই স্থলে, নমুনা স্বরূপ লাহোর সংবাদ পত্রাদিতে G. C. Ghose, Director—স্বাক্ষরিত, "আনন্দরহো" নাটকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ আমি আর দিলাম না। শ্রীজ্যো—

(২) বঙ্গভাষা হইতে অনূদিত—শ্রীজ্যো।

সচরাচর অভিনীত হইয়া থাকে তাহা অন্যত্র হইতে গৃহীত। M. Campbell Oman দীর্ঘকাল লাহোরে বাস করিয়া পঞ্জাবীভাষায় অভিনীত অনেকগুলি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি নাটক স্পষ্টই দেখা যায়, য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণ।

"আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ"—এই সহস্র-এক-রজনীর গল্পটি, পাশ্চাত্যখণ্ডে, পরীনাট্যে পরিণত হয়; উহাই আবার এই নূতন আকারে তাহার নিজ জন্মভূমি প্রাচ্যখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

যাদুকর, দৈত্য, পরী, অপচ্ছায়া, রূপ-পরিবর্ত্তন, চোরা-দরজা, প্রকৃত দ্বার, কল্-কবজা, নাটকীয় সাজ-সরঞ্জাম, অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ—এই সমস্ত, লাহোর জনসাধারণের নয়ন মন মুগ্ধ করিবার পূর্ব্বে, য়ুরোপের সমস্ত থিয়েটারে আবির্ভূত হয়। এই আলাদিনের অভিনয়ের জন্য লাহোরে একটা বৃহৎ একচালা ঘর নির্ম্মিত হয়। ঘরের মধ্যস্থলে একটা চার-ডেলে ঝাড় বিলম্বিত, আর দেয়ালের ধারে দুইটা রিফ্লেক্টর-ল্যাম্প খুঁটির গায়ে বসানো। আলো নিতান্তই কম। রঙ্গমঞ্চের ধারে একসারি আলোক-মালা। নাট্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত দশজন পার্শি, একটিমাত্র রমণী—তাও আবার য়ুরোপীয় রমণী। আধুনিক য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দেশীয় রমণীদিগের রঙ্গমঞ্চে আসা নিষিদ্ধ। নাটকটি উর্দ্দু ভাষায় অভিনীত হইল এবং প্রায় সকলেই সারঙ্গী ও বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গায়িল।

"ইন্দ্রসভা" নাটকটি—পারস্যদেশীয়, ভারতীয়, ও য়ুরোপীয় উপাদান-সমূহের একটা অদ্ভুত 'খিচুরী'। পরী-"সবজ" ভারতের রাজকুমার "গুল্‌ফামের" প্রেমে উন্মত্ত। পরী একজন যাদুকরের শরণাপন্ন হইল। সেই যাদুকরের মন্ত্রপ্রভাবে, গুল্‌ফাম পরীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুল্‌ফাম পরীর প্রেমে ততটা মুগ্ধ নহে; সে বলিল,—ইন্দ্রসভা বা স্বর্গদ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত না করিলে সে তাহার প্রণয়িণীর সহিত একত্র বাস করিবে না। এই ইন্দ্রসভা মর্ত্ত্যমানবের দুরধিগম্য। পরী প্রথমে ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু প্রেমের টানে সে আর থাকিতে পারিল না। সে গুল্‌ফামের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া, দেবতাদের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিল। অবশেষে সে স্বর্গ-অপ্সরাদিগের অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক দৈত্য এই অনধিকার-প্রবেশকারীকে চিনিতে পারিয়া, ইন্দ্রের নিকট নালিস্ করিল। ইন্দ্র, রাজকুমারকে পাতালপুরীর কারাগারে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অপরাধের সহকারিণীকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। স্বভাবতঃ শেষ অঙ্কেই এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইল। একদা ইন্দ্র, একজন তপস্বিনীর রূপলাবণ্য, মধুর কণ্ঠস্বর ও তপশ্চর্য্যার কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার প্রসাদস্বরূপ বিবিধ বহুমূল্য সামগ্রী তাহাকে প্রদান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তপস্বিনী অস্বীকৃত হইল। ইন্দ্র বলিলেন, তুমি আমার নিকট কি বর চাও বল। তপস্বিনী-ছদ্মবেশী পরী উত্তর করিল—"আমি গুল্‌ফাম্‌কে চাই।" ইন্দ্র অগত্যা তাহার প্রণয়ীকে তাহার নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন।

"ইন্দ্রসভা"কে নাটক না বলিয়া বরং গীতিনাট্য (opera) বলা যাইতে পারে। ইহা অনেকটা বিক্রমোর্ব্বশীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য, যে সকল গুণ থাকায় কোন আধুনিক গ্রন্থ লোকের মনোরঞ্জন করে, ইহাতেও সেই সকল গুণ আছে। "ইন্দ্রসভা" যে এত লোকপ্রিয়, ইন্দ্রসভার দৃশ্যই তাহার প্রধান হেতু। সভাসদ্‌ ও অনুচরবর্গে বেষ্টিত দেবরাজ সিংহাসনে আসীন। সেই স্বর্গদেশ, সূর্য্য নক্ষত্র ও বিদ্যুৎমালায় ভূষিত। ধারে-ধারে বিচিত্র আকারের ভূধরশ্রেণী। সময় কাটাইবার জন্য, তিনি এক অপ্সরাকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। অমনি, চুম্‌কি-বসান স্বচ্ছ 'গজ'-কাপড়-পরা, নূপুর-বলয়াদি ভূষিতা একটি পরী চোরাদরজা দিয়া বাহির হইল। অর্দ্ধ-ইঞ্চি পরিমাণও মাটি হইতে পা উঠিতেছে কিনা সন্দেহ—এইরূপ ভাবে, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া, এবং অতীব শোভন-ভাবে বাহু আন্দোলিত করিয়া, বিলম্বিত ছন্দের তালে পরী নৃত্য করিতে লাগিল। "ভারতীয় নর্ত্তকীর পরিচ্ছদ, নৃত্যগতি, সাজ-সজ্জা এবং য়ুরোপীয় রঙ্গমঞ্চের খাটো ঘাগ্‌রা-পরা নর্ত্তকীর নৃত্যগতি ও বেশভূষা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আর একটা প্রভেদও বড় কম নহে—সে প্রভেদটা এই:—সেই শোভন-ভঙ্গিম নর্ত্তকী একজন পুরুষ;—প্রোগ্র্যামে তিনি Master Homi নামে অভিহিত।" (৩)

M. Osmun বলেন, যতগুলি লোকপ্রিয় নাটক আছে তন্মধ্যে "প্রহ্লাদ নাটক" একটি। ইহা খাঁটি হিন্দুকল্পনা হইতে প্রসূত এবং ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। গ্রন্থকার, বিষ্ণুর এক অবতারকে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়াছেন। প্রবলপরাক্রান্ত দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত। তাহার পিতা বিষ্ণুর আরাধনা হইতে তাহাকে বিরত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উপরোধ-অনুরোধেও কোন ফল হইল না, ভয়প্রদর্শনেও কোন ফল হইল না। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুদণ্ড আদেশ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু, নরসিংহরূপে প্রাসাদের এক স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন। পুরাণ-কাহিনীর অতিলৌকিক ব্যক্তিদিগকে রঙ্গমঞ্চে, মানবাকারে আনীত হইয়াছে। এই নাটকে, প্রচলিত হিন্দুজীবনের আদর্শে, দেবতা ও দৈত্য রচিত হইয়াছে। প্রহ্লাদ এক কুম্ভকারের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় একটা বিড়াল প্রসব করিয়া বাচ্চা-দিগকে একটা উনানের ভিতর রাখিয়া দেয়। বেচারা বাচ্চাদিগের উপর প্রহ্লাদের দয়া হইল; পাছে উনানের আগুনে পুড়িয়া যায় এইজন্য প্রহ্লাদ কুম্ভকারকে ডাকিয়া বাচ্চাগুলিকে অন্যত্র লইয়া যাইতে বলিলেন। কুম্ভকার-গৃহিণী উত্তর করিল;—"কেন? ইচ্ছা করিলে রামজি (বিষ্ণু) উহাদিগকে বাঁচাইতে পারেন।" প্রহ্লাদ তাহার এতাদৃশ অন্ধবিশ্বাস দেখিয়া উপহাস করিলেন। কুম্ভ-কার-গৃহিণী কোন উত্তর করিল না। সে উনানে আগুন জ্বালিল—সে আগুন চারিদিন পর্য্যন্ত রহিল। পরে যখন আগুন নিবিয়া গেল, তখন বাচ্চাগুলি উনান হইতে বাহির

(৩) Campbell Osman. P. 191.

হইয়া আসিল। তাহাদের একটি লোমও দগ্ধ হয় নাই। এই অদ্ভুতকাণ্ড দেখিয়া প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়া পড়িল। সে, জ্বলন্ত উৎসাহ-সহকারে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রহ্লাদের জননী তাহা শুনিয়া প্রহ্লাদকে একজন ব্রাহ্মণের পাঠশালায় শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন।

প্রহ্লাদ সেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে লাগিল। তাহার সহপাঠীরা গুরু-মহাশয়ের উপর নানা উপদ্রব করিত, তাঁহার সহিত চালাকি করিত, নানাপ্রকার দুষ্টামি করিত। কিন্তু প্রহ্লাদ তাহাতে যোগ দিত না—সে কেবল ভগবানকে ডাকিত। গুরুমহাশয়ের সমস্ত আক্রোশ, সমস্ত শাস্তি প্রহ্লাদের উপরেই বর্ষিত হইত; কিন্তু প্রহ্লাদ তাহাতে বিচলিত হইত না। পুরাণ-কাহিনীর অনুরূপ, এই নাটকেরও অবসানে পাপের শাস্তিদাতা বিষ্ণুর আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এই প্রহ্লাদ-নাটকের অভিনয় বিনামূল্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। স্বকীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি ভগবান সুদৃষ্টিপাত করায়, একজন ধনশালী বণিক ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই ধর্ম্মমূলক ও ভক্তিপূর্ণ নাটকের অভিনয় আপনার দেশবাসীদিগকে বিনামূল্যে প্রদর্শন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। দর্শকেরা মুক্ত আকাশে মাটির উপর বসিয়াছিল। অভিনেতৃগণ নিতান্ত 'আনাড়ী'ভাবে অভিনয় করিলেও, দর্শকেরা বাস্তবিকই মুগ্ধ ও ভাবে গদগদ হইয়াছিল। "প্রম্‌টার" রঙ্গমঞ্চের বামদিকে প্রচ্ছন্ন ছিল। পাত্রগণ একে একে কথা

দাঁড়াইতেছিল। উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে পাত্রগণ গম্ভীরভাবে এইরূপ গমনাগমন করিতেছিল।

M. Oman আর একখানি নাটকের উল্লেখ করেন, তাহার নাম "পূরণ ভগৎ"। পঞ্জাবের সকল লোকেরই মুখে এই নাটকের কথা শুনা যায়। অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের জয় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকের গল্পটি এই:—

শেয়ালকোটে শলিবন নামে এক রাজা ছিলেন। লোনা নামে এক চর্ম্মকার-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে তাঁহার রাণী করেন। লোনা পরমা সুন্দরী ও সর্ব্বগুণে বিভূষিতা। লোনার গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই। পাটরাণীর গর্ভজাত, রাজার একটিমাত্র পুত্র। তাহার নাম পুরণ। রাজা লোনার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতিই আসক্ত ছিলেন, পূরণের মাতাকে ভালবাসিতেন না। একদিন রাজা সৎমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূরণকে আদেশ করিলেন। রাজকুমার পিতৃআদেশ পালনে উদ্যত হইলে, তাহার মাতা তাহাকে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, তাহার সৎমা বড়ই কুচক্রী। রাজকুমার মাতার পরামর্শ না শুনিয়া পিতৃআজ্ঞা পালন করিল। লোনা তাহাকে খুব আদরযত্ন করিল। রাজকুমারের মনে হইল, তাহার সৎমা বড়ই স্নেহশীলা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোনা তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়াছিল, এবং এই কথা তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেও লজ্জিত হইল না। পূরণ, ঘৃণার সহিত তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। লোনা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া উল্টা রাজকুমারের নামে

এইরূপ দোষারোপ করিল যে সে তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শলিবন স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী শোকাকুলা। রাজা, রাণীর কথায় বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া, পূরণের কারাদণ্ড আদেশ করিলেন। লোনা, পূরণের প্রেমে উন্মত্তা হইয়া তাহার চিত্তহরণে আবার সচেষ্ট হইল। পূরণকে নীতি উপদেশ দিবার ছুতা করিয়া, কারাগৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজার নিকট অনুমতি চাহিল। কারাগৃহে গিয়া লোনা আবার তাহার মনের বাসনা রাজকুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল। রাজকুমার আবার তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। লোনা রাজার নিকট তাহার নামে আবার পূর্ব্ববৎ দোষারোপ করিল। রাজা এইবার ক্রোধান্ধ হইয়া পূরণকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিলেন। পূরণের গর্ভধারিণী রাজমহিষী তাহার হইয়া মহারাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজমহিষীকেও বনে নির্ব্বাসিত করিলেন। একদল তাপস পূরণকে দেখিতে পাইয়া অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিল। পূরণ সেই তাপসদের দলে মিশিয়া গেল। একদা পূরণ, সন্ন্যাসীর বেশে সহরে প্রবেশ করিয়া, এক ব্যক্তির গৃহদ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। এই গৃহে পরমা সুন্দরী ঐশ্বর্য্যশালিনী একজন অনাথা রমণী বাস করিত। তাহার নাম সুন্দরা। সুন্দরা এই সন্ন্যাসীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত হইল। সন্ন্যাসী তাহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইল। এই সময়ে পূরণের দীক্ষাগুরু আসিয়া পূরণকে বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দিলেন। সুন্দরা হতাশ হইয়া, সন্ন্যাসিনীর বেশে, পূরণের অনুসরণে বনে প্রবেশ করিল। একদিন রাত্রে, রাজা শলিবন স্বপ্ন দেখিলেন, পূরণের দীক্ষাগুরু যেন বলিতেছেন, লোনাই অপরাধিনী, পূরণের কোন অপরাধ নাই। রাজা বিনা অপরাধে পূরণকে শাস্তি দেওয়ায় সেই অপরাধে গুরুদেব রাজাকে অন্ধ করিয়া দিলেন এবং লোনার শোণিতে স্বীয় হস্ত অভিষিক্ত করিলে তবে তাঁহার পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে, এইরূপ বিধান দিলেন।

বনে, রাজমহিষী ও সুন্দরার সাক্ষাৎ ঘটিল। দুইজনেই ছদ্মবেশী, পরিচয়ের পর দুইজনেই পরস্পরকে চিনিতে পারিল। কিন্তু এইখানে আর এক কথা বলা আবশ্যক।

রাজা স্বীয় ভ্রম অবগত হইয়া, এক্ষণে লোনার উপর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সময়ে পূরণ আসিয়া অপরাধিনীর জন্য রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। দীক্ষাগুরু বলিলেন, দুশ্চারিণীকে বধ করাই শ্রেয়; কিন্তু পূরণের সাগ্রহ অনুরোধে, অবশেষে রাজা লোনাকে ক্ষমা করিলেন। লোনা অনুতপ্তা হইয়া স্বীয় দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল। দীক্ষাগুরু রাজার চক্ষু ভাল করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং স্বীয় জননীর অনুসন্ধানে পূরণকে অরণ্যে পাঠাইয়া দিলেন। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে পূরণ তাহার মাতাকে খুঁজিয়া পাইল। পরে সমস্ত পাত্রগণ একত্র সম্মিলিত হইল। রাজার সমস্ত দুঃখের শান্তি হইল। তিনি সুন্দরার সহিত পূরণের বিবাহ দিলেন। একটি সুললিত গীতের তান-সহকারে যবনিকা-পতন হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃঋণ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিসিল।

"কি! আগাগোড়া তোমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে বেড়িয়েছে—আর সে-ও কি রকম মিথ্যা! চোর অপবাদ! পাঁচ বৎসর আমি এই দুঃসংবাদ নিয়ে ভেবে সারা হয়ে রয়েছি! কি ভয়ানক লোক! তাই এত আগ্রহ করে এ সংবাদ আমাকে দিতে এসেছিল! তার পর য ন তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হল, তখন কৈ সে খবরটুকু ত দিতে এল না। দাও ত দেখি, তোমার ম্যানেজারের সার্টিফিকেটখানা।"

"এই নিন, ডাক্তার রিভাল।"

"বাঃ চমৎকার! ম্যানেজারটিকে খুব ভাল লোক বলতে হবে। দেখে আমার বড় আনন্দ হল, জ্যাক! আমি এ পাঁচ বৎসর কেবলই ভেবেছি,—আমার হাতে-গড়া জ্যাক চোর হবে! টাকা চুরি করবে, সে! দেখ দেখি, হঠাৎ যদি আজ আর্কার এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হত, তাহলে এ ভুল ধারণা, এ মিথ্যা সন্দেহ ত আমার মন থেকে কখনও যেত না!"

আর্কার ক্ষুদ্র কুটিরে ডাক্তার রিভালের সহিত জ্যাকের আবার বহুদিন পরে আজ দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আজ দশদিন জ্যাক এতিয়োঁতে আসিয়াছে। তপস্যারত ব্রাহ্মণের মত সে এ কয়দিন নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিতেছিল। প্রকৃতির বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, শরতের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করিতেছে—চারিধারের এই শান্ত শোভার মধ্যে অতীতের সুমধুর স্মৃতিতে মণ্ডিত থাকিয়া জ্যাক ধীরে ধীরে হৃত স্বাস্থ্যসম্পদ্ ফিরিয়া পাইতেছিল! শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিলে চক্ষু ভরিয়া যায়—হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হয়,—নৈরাশ্যের হাহাকার ঘুচে! মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, উজ্জ্বল আলোকরাশিতে পরিপূর্ণ—সে আলোকের স্নিগ্ধ বিমল ধারায় জ্যাকের অন্তরের গ্লানি পঙ্কিলতা ক্রমে ধৌত হইয়া আসিতেছিল!

একদিন এই একান্ত নিঃসঙ্গতা নিতান্তই অসহ্য বোধ হওয়ায় সে পুরাতন বন্ধু আর্কার কুটিরে বেড়াইতে আসিল। আর্কাকে দেখিলে মাকে জ্যাকের মনে পড়ে। গৃহকর্ম্মে মাতার সে সঙ্গিনী ছিল—তাই আর্কার কুটিরে আসিয়া পুরাতন স্নেহের আস্বাদ লাভ করিয়া সে যেন আবার তাহার অতীত দিনগুলাকেই ফিরিয়া পাইল।

আজ জ্যাক আর্কার বাটী আসিয়া দেখিল, আর্কার স্বামী বাতের যন্ত্রণায় শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে। রোগীর পার্শ্বে শুভ্রশির এক বৃদ্ধ বসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন! এই বৃদ্ধই আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত ডাক্তার রিভাল। বহুদিন পরে এই নূতন দর্শনে উভয়েই একটু বিচলিত হইয়া পড়িল! জ্যাক আপনার সামাজিক অধঃপতনের কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহারই জন্য সে কোনদিন ডাক্তারের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। ডাক্তারের সঙ্কোচের

কারণ, জ্যাককে দেখিতেই রুডিক-গৃহের চুরির কথা তাঁহার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল! জ্যাক আজ চোর—সেই জ্যাক!

এক্ষণে জ্যাকের কলঙ্ক-মুক্তির সংবাদ পাইয়া ডাক্তারের প্রাণ শান্ত হইল। ডাক্তার কহিলেন, "এখন তুমি এখানে এসেই যখন বাস করতে লাগলে, তখন আমাদের বাড়ী যাবার কোন সঙ্কোচ আর রেখ না! ওরা কজনে মিলে তোমার জীবনটা একেবারে নয় ছয় করে দিলে! তোমার শরীর যা দেখছি, তাতে রীতিমত যত্ন-নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ী তুমি তেমনই ভাবে আবার আসা যাওয়া কর, এই আমি দেখতে চাই। সব সেইরকম আছে,—কেবল আমার স্ত্রী আজ আর ইহলোকে নাই! চার বৎসর হল, তাঁর মৃত্যু হয়েছে! শোকেই বেচারী মারা গেল—সিসিল এখন আমার বাড়ীর গিন্নি—সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে—তোমায় দেখলে ভারী খুসী হবে, সে! তোমার কথা প্রায়ই সে বলে। তুমি আসবে ত, জ্যাক?"

জ্যাক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। একটা দ্বিধায় তাহার কথা সরিতেছিল না! রিভাল তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি কহিলেন, "কোন সঙ্কোচের কারণ নাই, জ্যাক! সিসিলকে কিছু বোঝাতে হবে না—কোন কৈফিয়ৎ না! রুডিকদের বাড়ীর চুরির কথা সে কিছুই জানে না—শুধু আমিই এ সংবাদটুকু জানতাম—কারুকে বলিনি। কাজেই আসতে তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না! আসছ, ত—বল। আজ আর থাক্—কতক্ষণই বা থাকবে? রাত্রে কুয়াশা নামবে—কুয়াশা লাগানোটা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। কাল তুমি এস—আমাদের বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন ভোজন করবে—তোমার নিমন্ত্রণ রইল! কেমন—আসবে ত?"

কৃতজ্ঞতায় জ্যাক ডাক্তারের পানে চাহিল। সস্নেহে জ্যাকের কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তার কহিলেন, "না এলে আমি গিয়ে ধরে নিয়ে আসব, তা কিন্তু বলে রাখছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে চিমনির পার্শ্বে বসিয়া জ্যাক অনেক কথা ভাবিল—আপনার জীবন নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠার উপর দিয়া সে দ্রুত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল! সেই মধুর কৈশোর-প্রারম্ভে ডাক্তারের স্নেহে সে কি এক বিচিত্র সুখের অধিকারী হইয়াছিল! হাস্যকৌতুকময়ী ক্রীড়াসঙ্গিনী সিসিলের সহিত এককালে সে কি সোনার দিনগুলি কাটাইয়াছিল! তাহার পর কোন্ দৈত্যের অভিশাপ লাগিল—জীবনটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল—সে ক্ষতের দাহ যেমন ভীষণ, তেমনই গভীর! সে ক্ষত-চিহ্ন কি জীবনে মিলাইবার সম্ভাবনা আছে?

পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে আসিয়া জ্যাক রিভালের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। এক দাসী আসিয়া কহিল, "ডাক্তার সাহেব বাড়ী ফিরেন নাই—মাদামোসেল একলা আছেন।" দাসীটি নবাগতা; জ্যাককে সে চিনিত না। একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল—নিমেষে কুকুরটা লাফাইয়া জ্যাকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরাতন বন্ধুকে কুকুরটা চিনিল। জ্যাকের পদলেহন করিয়া, অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, লাঙ্গুল

নাড়িয়া বাক্‌হীন পশু আনন্দের পরিচয় দানে জ্যাককে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দুইদিন চক্ষের আড় হইলে বন্ধুকে মানুষ অনেক সময় চিনিতে পারে না, কিন্তু বাক্‌হীন ইতর পশু হৃদয়হীন নহে—স্নেহের মর্য্যাদা রক্ষায় তাহার কোন ত্রুটি হয় না!

"এস, জ্যাক।" ভিতর হইতে সুমধুর স্বরে কে ডাকিল! যেন স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল। এ কণ্ঠ সিসিলের—কি মধুর, কি প্রাণারাম! জ্যাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে কিশোরী সিসিল! যৌবনস্পর্শে সিসিলের সুগঠিত তনুখানি লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে—পুষ্পতরু যেন আজ কুসুমগুচ্ছে সজ্জিতা হইয়া উঠিয়াছে! অমল তাহার শোভা, বিচিত্র তাহার বর্ণ! সিসিল নিকটে আসিয়া জ্যাকের হাত ধরিল। উভয়ে যাইয়া ভিতরে বসিল। সিসিল কহিল, "তোমার জীবনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে,—দাদার কাছে আমি শুনেছি, সব। আমাদেরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, জ্যাক, দিদিমা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন! তোমার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।"

জ্যাক কোন কথা কহিল না। তাহার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল! এই পবিত্র দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে লাঞ্ছিত শির তুলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বিপুলতার সমক্ষে আপনার রিক্ত দৈন্যের কঙ্কালসার মূর্ত্তিটা খাড়া করিয়া সে দারুণ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছে! এই স্বর্গের সুধা-সমুদ্রের তীরে পূতিগন্ধময় নরকের পঙ্ক সে টানিয়া আনিয়াছে,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই যে! এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। হাত দুইটা কর্কশ, কঠিন দেহের হাড়গুলা অবধি বস্ত্রের আবরণ ভেদ করিয়া একটা কুৎসিত বীভৎসতা প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। বসন্ত শ্রীর পার্শ্বে হিম-জর্জ্জর শুষ্ক প্রকৃতির শীর্ণতা যেমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার সৃষ্টি করে, সিসিলের পার্শ্বে জ্যাক ঠিক তেমনই হেয়, ঘৃণ্য অস্পৃশ্য!

এমন সময় দাসী আসিয়া সিসিলের হস্তে একখণ্ড কাগজ দিয়া কহিল, "ঔষধ চাই—লোক আসিয়াছে!"

সিসিল কাগজ-হস্তে বিদ্যুৎশিখার মত ক্ষিপ্র গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে টেবিলের উপর শিশিতে নানাবিধ বোতল ছিল। সে উঠিয়া ঔষধ তৈয়ারী করিতে লাগিল। হাঁফ ছাড়িয়া জ্যাক তখন একবার সিসিলকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর পাইল। কি সুন্দর, এই সিসিল! যৌবন আপনার বিচিত্র মায়া-তুলিকাস্পর্শে সিসিলের দেহটিকে ললিত রাগে ফুটাইয়া তুলিয়াছে! কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই! সজ্জিত সুন্দর বেশে অনুরূপ, ভাস্বর মূর্ত্তি! অপূর্ব্ব মধুরিমার চরম বিকাশ!

জ্যাকের আত্মা আজ প্রবুদ্ধ হইতেছিল, অশ্রুস্নাত হইয়া নীরবে পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিতেছিল,—সে নিজে তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। একবার সে ভাবিল, কেন এখানে আসিল, আসিল যদি ত, এখন পলাইবে কি বলিয়া! এস্থানে তাহার অবস্থিতি যে একান্ত অশোভন, নিতান্ত বিসদৃশ! সিসিলের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় জ্যাকের চিত্ত আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যথার্থ ই শ্রদ্ধার যোগ্যা, এই মহীয়সী অনুপমা ললনা!

ক্রমে দুই চারিজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ঔষধ চাই, পুরিয়া চাই, মালিশ চাই। সিসিলের অভ্যস্ত করে কর্ম্ম বাধিত না।

এক কৃষক রমণী ঔষধ লইয়া চলিয়া যাইবার সময় জ্যাকের সম্মুখে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাহর করিয়া তাহাকে দেখিল! দেখিয়া কহিল, "বাঃ, এই যে রেজন্তেঁদের জ্যাক সাহেব! এবার তবে ডাক্তারের নাতনীর বিয়ের জোগাড় হল! একেবারে পাত্র হাজির—এতদিন ধরে জ্যাক সাহেবের জন্য ডাক্তার 'হা পিত্যেশ' করে বসেছিল! বাঁচা গেল!"

জ্যাক বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সিসিল দেবী—জ্যাক তাহাকে গ্রহণ করিবে, এমন স্পর্দ্ধা জ্যাকের মনে নিমেষের জন্যও উদিত হয় নাই, যে! সিসিলও ঈষৎ বিচলিত হইয়া পড়িল! চাঞ্চল্যটুকু কোনমতে গোপন করিয়া সিসিল ডাকিল, "ক্যাথরিন, দাদা আসছে, খাবার তৈরি ত, সব?"

যথার্থই ডাক্তার রিভাল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন, "জ্যাকের শরীর একেবারে গেছে—দেখেছ, সিসিল, ওকে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না।"

সেদিন ডাক্তার-গৃহ হইতে বাহির হইয়া জ্যাক যখন পথ চলিতেছিল, তখন পান্থগণ জ্যাকের গতিতে একটা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া মনে ভাবিল, তাহার গৃহে বুঝি কাহারও শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে, তাই ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া ব্যস্তভাবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে দ্রুত সে ফিরিয়া চলিয়াছে।

পথে চলিতে চলিতে সমস্ত জগতের উপর জ্যাক চটিয়া সারা হইল। "কারিগর—কারিগর! সারা জীবনটা যেন কে কাল কালিতে দাগিয়া দিয়াছে! আজেঁস্ত ঠিক বলে। অসভ্য, বেয়াদব, আমি—আমার উচিত, আমার সমযোগ্য লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করা—ভদ্রসমাজে আমার স্থান নাই, হবেও না।" উত্তেজনায় আজ জ্যাকের চিত্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু তরঙ্গাহত নদীর জল যেমন পরতে পরতে অজস্র চন্দ্রের ছবি আপন বক্ষে প্রতিফলিত করে, তাহার ক্ষুব্ধ পীড়িত চিত্ত তেমনই চিন্তার পরতে পরতে সিসিলের মধুর ছবিটিকেই প্রতিবিম্বিত করিয়া তুলিতেছিল। সিসিল, সিসিল! পবিত্র, সুন্দর, নির্ম্মল সিসিল! দেবী, অভাগা মলিন দীন জ্যাককে তুমি পবিত্র নির্ম্মল করিয়া তোল! তোমাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা শক্তি তাহার নাই—তাই বলিয়া তোমার করুণার কণা হইতে তাহকে বঞ্চিত করিও না, দেবী! কৃষক রমণীটা কি ইঙ্গিত করিল?—সিসিলের সহিত জ্যাকের বিবাহ!—অসম্ভব! দুষ্ট-রসনা নারী—এ বিষম কথা উচ্চারণ করিতে তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না—?

না, না, সিসিলের সহিত তাহার মিলনের কোন আশা নাই,—কোন সম্ভাবনা নাই! এই একটি মাত্র চিন্তা জ্যাকের সমগ্র চিত্তটুকুকে সেদিন প্রবলভাবে নাড়া দিতে লাগিল! অবশেষে সন্ধ্যার পর চারিধার যখন অন্ধকারে ছাইয়া গেল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্যাক আসিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার বাতাস তাহার চিন্তাতপ্ত ললাটে মাতার স্নেহাঞ্চলের মতই দিব্য স্পর্শ দান করিল। নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে দুই

হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—অনুচ্চ গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "ভগবান, ভগবান, আমাকে পাগল করিয়া দাও, চিত্তকে অবশ করিয়া দাও! এ অধৈর্য্য, এ চাঞ্চল্য যে, আর সহ্য হয় না, প্রভু।"

সামাজিক সহস্র বিঘ্ন আজ এ মিলনের অন্তরায়! সে কারিগর, নীচ কারিগর মাত্র, ভদ্রসমাজে আজ কি বলিয়া সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে? তাহার পর, মাতার চরিত্র-দোষ! অসহ্য, এ জ্বালা! দারুণ, এ যন্ত্রণা!

সেল্ফের উপর একটা ছোট বোতল ছিল। জ্যাক তাহা হইতে একটা তরল পদার্থ গ্লাশে ঢালিল। গ্লাশটা টেবিলের উপর রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া জ্যাক আবার ভাবিতে লাগিল—সমস্যা! চারিদিকে সমস্যা! এ বিপুল সমস্যা-সমাধানের কি উপায় আছে!

চিন্তা করিতে করিতে জ্যাকের চক্ষে কখন নিদ্রা আসিল, সে তাহা জানিতেও পারিল না। স্বপ্ন তাহার নিদ্রাতুর চিত্তে কত বিচিত্র চিত্র রঞ্জিত করিয়া তুলিল! কারখানা—অজস্র লোকের কোলাহল—নদীর তীর—নদীতে তরী বাহিয়া সে চলিয়াছে! নদীর জল ছল-ছল করিয়া তরীর কাণে কাণে যেন কি গোপন কথা বলিয়া চলিয়াছে! কোথায়, যেন, কে ঐ গান গায়—ঢালো সুরা, ঢালো, আরও ঢালো!—বিস্মৃতি—গভীর বিস্মৃতির সাগরে ডুব দাও—কিছু চাহি না—চাহিবার আর কিছু নাই! কোন কামনা নাই! শুধু বিস্মৃতি আনিয়া দাও!

তরল রূপ উছলিয়া উঠিয়াছে!—ঢল-ঢল নয়নে, ওরে পিয়ালা, চাহিয়া তুই কি দেখিতেছিস্? শান্তি আনিয়াছিস? বিস্মৃতি আনিয়াছিস? কৈ, দে, দে, দে, পিয়ালা! না, না, ও কে, তুমি—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,—সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, করে কনক-দণ্ড, এ যে সিসিল! মধুর স্বরে ও কি গান গাহিতেছ, তুমি?- "জ্যাক, তুমি মদ খাও—ছি!"

জ্যাকের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! কোথায় কে! তরী, নদী, দেবী - কোথায়? কেহ নাই, কিছু নাই,—শুধু এই পিয়ালাটা—! সর্ব্বনাশী, কুহকিনী, দূর হ', তুই!

সজোরে জ্যাক সুরাপূর্ণ কাচের গ্লাশটা বাহিরে ছুড়িয়া দিল! ঝন্ঝন্ শব্দে কাচের গ্লাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! দুই হস্তে নয়ন-প্রান্ত মুছিয়া জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তাই হবে, দেবী, তাই হবে - তোমার কথাই থাকবে! এ জীবনে জ্যাক আর কখনও সুরা স্পর্শ করবে না!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরোগ্য-লাভ।

তাহার পর জ্যাক কতদিন রোগ ভোগ করিল, ডাক্তার হারজ্ আসিয়া তাহার চিকিৎসা-ভার লইয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বার-সান্নিধ্যে আনিয়া ফেলিল, কি করিয়া ডাক্তার রিভাল, আসন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া, বল পূর্ব্বক জ্যাককে আপনার গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে আরোগ্য দান করিলেন, সে সকল কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আরোগ্য-লাভের পর জ্যাক ডাক্তারের গৃহেই স্থান গ্রহণ করিল। সিসিলের

অক্লান্ত শুশ্রূষা, ডাক্তারের সস্নেহ সেবা - কেবল ইহার গুণেই জ্যাক এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

দুঃখ যেন আবার চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণের উপক্রম করিল। মধুর সাহচর্য্যে স্বাস্থ্য ও শান্তি শীর্ণ মনেও ফিরিয়া আসিতেছিল। সিসিল বহি পড়িত, জ্যাক শুনিত—কখনও বা জ্যাক পড়িত, সিসিল ও ডাক্তার রিভাল উভয়ে বসিয়া তাহা শুনিত। এমনই উপায়ে জ্যাক ও সিসিলের হৃদয় দুইটি এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িতেছিল। কে জানে, ইহার পরিণাম কি? ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিলেও, তাহাতে বাধা দিলেন না। তাঁহার মনে কি গভীর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তিনিই জানেন।

জ্যাক রিভালের গৃহে বাস করিতেছে, শুনিয়া আর্জেন্ত রোষে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রিভালের গৃহে,—কেন? আর্জেন্তঁর কি পয়সা নাই—গৃহ নাই? ইহাতে তাহাকে রীতিমত অপমান করা হইতেছে!

অগত্যা সার্লটকে পত্র লিখিতে হইল। সার্লট লিখিল, "তুমি ওখানে থাক, এটা এঁর পছন্দ নয়। লোকে মনে ভাবিতে পারে, আমরা তোমায় খরচ দিই না বা তোমাকে দেখি না। ইহাতে আমাদের অপমান হয়।" তাহার পর,'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে – এটুকু কবির হস্তাক্ষর,—কবি স্বয়ং লিখিয়াছে —"তোমার চিকিৎসার জন্য হারজকে পাঠাইলাম, কিন্তু নবাবিষ্কৃত, গবেষণাপ্রসূত, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তোমার মনঃপূত হইল না। পাড়াগাঁয়ের একটা হাতুড়ে ডাক্তার তোমার ইষ্টদেবতা হইল! তোমার এ ব্যবহারে ত আমি যথেষ্টই বিরক্ত হইয়াছি—তাহার উপর, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াও, শুনিতেছি, রিভালের বাটিতে আছ। এখন আর তোমার সেখানে থাকা ভাল দেখায় না। দুই দিনের মধ্যে তুমি নিজের বাটিতে আসিবে, নহিলে আমাদিগের সহিত তুমি সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাই আমরা জানিব। বুঝিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয়, সেইমত কার্য্য করিবে। ইতি—"

তথাপি যখন জ্যাক রিভাল-গৃহ পরিত্যাগ করিল না, তখন সার্লটকে আসিতে হইল। ডাক্তার রিভাল সাদরে আর্জেন্তঁ-গৃহিণীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর জ্যাকের কথা উঠিলে, ডাক্তার বলিলেন, "আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে ফিরতে দিইনি, মাদাম। ওর শরীর যে রকম খারাপ, তাতে খুব সতর্ক তদারকে ওকে না রাখলে তুমি ওকে কোনমতে ধরে রাখতে পারবে না। হারজ্ এসে কতকগুলো মৃগনাভি আর উগ্র ঔষধ দিয়ে ওর মাথা গরম করে দিয়ে ছিল—সে অবস্থায় আর দু তিন দিন থাকলে জ্যাককে আর দেখতে পেতে না! ভাগ্যে আমি সময়মত ওকে নিয়ে এসেছিলাম। এখন বিপদটা কেটে গেছে, বটে; তবে এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা নয়। ওকে আর কিছু দিন আমার কাছে রেখে যাও তার পর যখন আমি বুঝব, ও বেশ সেরে উঠেছে, তখন আমিই ওকে 'আরাম-কুঞ্জে' পাঠিয়ে দেব—তার জন্য কোন কথা ওকে আর লিখতে হবে না।"

"কিন্তু, কিন্তু, ডাক্তার, লোকে পাঁচ রকম কথা বলবে।"

"ছেলেকে বাঁচাতে চাও যদি ত, লোকের কথায় কাণ দিও না।"

জ্যাক কহিল, "মা, আমায় তা হলে নিয়ে যাবে, তুমি?"

"না, না, জ্যাক, যেখানে তুমি ভাল থাক, সেইখানেই থাক। ডাক্তার রিভাল তোমার ধাত বুঝেন, তাঁর চিকিৎসায় তুমি নিশ্চয় বিশেষ উপকার পাবে।"

মাকে ছাড়িয়া জ্যাক যে কখনও সুখী হইতে পারিবে, এখানে এই সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে আসিবার পূর্ব্বে জ্যাক নিজেই তাহা অনুভব করে নাই। এ সুখের কল্পনাও তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। অপূর্ব্ব, হৃদয়প্লাবী সুখ!

সিসিলকে আদর, ডাক্তারকে ধন্যবাদ ও পুত্রকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দুই দিন পরে সার্লটি বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় পুত্রকে একান্তে ডাকিয়া সার্লটি কহিল, "জ্যাক, তুমি আমায় নিয়ম-মত চিঠি লিখো। যখন কিছু চাইবার দরকার হবে, তখন পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় আমার নামে চিঠি দিও, আমি তা গোপনে পাবার ব্যবস্থা করব। অনেক সময় তোমাকে চিঠিতে যে সব কথা লিখি, তা বাধ্য হয়েই আমাকে লিখতে হয়—সে আমার মনের কথা নয়, জ্যাক। উনি বলেন, আমাকে সামনে বসে তাই লিখতে হয়। এবার থেকে সে রকম চিঠির তলায় কোণে একটা লাইন টেনে দোব। লাইন টানা চিঠি পেলে তুমি জেনো, আমি সে চিঠি ওঁর কথামতই শুধু লিখেছি। তার জন্য মিছে মন খারাপ করো না।"

সার্লটি আপনার অবস্থা আর গোপন করিতে পারিল না। এ দাসত্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাহা হইতে মুক্তি-লাভের এখন আর কোন উপায় নাই। কি দুর্ব্বিসহ, ভারগ্রস্ত, এ জীবন! তবু বহিতে হইবে,—গত্যন্তর নাই।

সার্লটি চলিয়া যাইলে, ডাক্তার একদিন বন-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল, জ্যাক ও সিসিল প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে, রোগী-দর্শনান্তে ডাক্তার আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিবেন।

জড়তা ত্যাগ করিয়া প্রভাতে তখন ধরিত্রী সুন্দরী জাগিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে, সূর্য্যের আলোকে, যামিনীর নিরানন্দ ভাব ঘুচিয়া চারিধারে আনন্দ বিকশিত হইতেছিল। এমনই সময়ে জ্যাক ও সিসিল পথে বাহির হইল। গ্রামের পথ ক্রমে ফুরাইয়া আসিল,—ক্ষেত্রের বুক চিরিয়া, সিঁথির মত, সরু পথ চলিয়া গিয়াছে, জ্যাক ও সিসিল ক্রমে সেই পথে চলিল। কৃষকের দল তখন ক্ষেত্রে চলিয়াছে, কারিগরের দল ব্যস্ত-ভাবে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে,—ধীরে ধীরে কর্ম্মকোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে। ক্রমে তাহারা ক্ষেত্র ছাড়িয়া, পাহাড় ঘুরিয়া, নদীর ধার দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া পৌঁছিল।

ফুলের রাশিতে বর্ণ-গন্ধ উৎসারিত, বিহঙ্গের কল-কাকলীতে চারিধার মুখরিত,—এ যেন দ্বিতীয় নন্দন! জ্যাকের মনে হইল, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোথাও আর কেহ নরনারী নাই, তাহারা যেন সেই আদিমযুগের আদম ও ঈভ্! এ সৌন্দর্য্য, এ শোভা, যেন তাহাদিগেরই চিত্তবিনোদনের জন্য! এমন স্থান, এমন ক্ষণ, এমন আবেশ-কম্পিত মিলন-প্রার্থী দুইটি তরুণ তৃষিত প্রাণ! সিসিল মৃদু দৃষ্টিতে শ্যামল প্রান্তরের পানে

চাহিয়াছিল। জ্যাক ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিল—সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "সিসিল—"

"জ্যাক—"

কাহারও মুখে আর কথা সরিল না। জ্যাকের দুই হাতের মধ্যে সিসিলের হাত—উভয়েরই হাত কাঁপিতেছিল! কি এক আনন্দের মূর্চ্ছনায় উভয়েরই হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল! এ কি মোহ! প্রাণের ভিতর এ কি দারুণ উত্তেজনা! ভাবোদ্বেল চিত্ত যেন আজ সকল বন্ধন ছিন্ন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে!

জ্যাক সিসিলের গৌর হস্তের কোমল অঙ্গুলিগুলির দিকে চাহিয়া রহিল! কচি কিসলয়ের মত এই অঙ্গুলির মোহন স্পর্শে কি তাহার বক্ষের দারুণ ক্ষতের দাহ শান্ত হইবে না—ইহা কি নিতান্ত দুরাশা, ভগবান! একটা লালিমা ফুটিয়া উঠিয়া সিসিলের সুন্দর মুখখানিকে লাজরক্ত সদ্য-বিকশিত গোলাপের মত, ললিত, মনোরম করিয়া তুলিল।

বহু চেষ্টায় সিসিলের মুখে কথা ফুটিল। স্বর গাঢ়, কম্পিত। সিসিল কহিল, "কেন, জ্যাক, বল—কি বলবে, বল। তোমার কি কিছু কষ্ট হচ্ছে?"

জ্যাকের ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। জ্যাক কহিল, "কষ্ট! না, সিসিল, এ অপূর্ব্ব সুখ! এমন সুখ জীবনে কখনও আমি উপভোগ করিনি, কল্পনাও করি নাই।"

তাহার পর আবার উভয়ে নীরব রহিল। এমনভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা অদূরে ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে উভয়ের চমক ভাঙ্গিল! উভয়ে ত্রস্তভাবে কানন-কুটীরে আসিল।

তখন তিনজনে নানা বিষয়ে কথা হইল। সুন্দর দৃশ্য, চারিধারে কি অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা!

ভোজনের পর ডাক্তার কহিলেন, "তোমার কোন অসুখ কচ্ছে না ত, জ্যাক?"

অসুখ! না,—অসুখ নয়, তবে অস্বস্তি! এমন মধুর দিন,—ফুরায়, কেন? এমন স্বপ্নময় ভাবময় মুহূর্ত্ত অবিরাম নহে, কেন?

জ্যাক আজ স্পষ্ট বুঝিয়াছে, সে সিসিলকে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসার পরিণাম কি? তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান! কিন্তু সিসিল কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বৈ কি! নহিলে তাহারও মুখে কথা সরিতেছিল না, কেন? তবে কি, সিসিলকে—?

না, তাহা হইবে না। সরলা বালিকার সরল হৃদয়ের সহিত আর এ নিষ্ঠুর খেলা সঙ্গত নহে! তাহার অদৃষ্টে যত দুঃখ আছে, পূর্ণ মাত্রায় সে তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু বেচারী সিসিল—তাহার পায় কুশাঙ্কুরটিও যেন না বিদ্ধ হয়! সিসিলের সম্মুখে জ্যাক আর মোহের জাল বিস্তার করিবে না! ভাল থাক, সুখে থাক, তুমি সিসিল, নন্দনের অপ্সরী, স্বর্গের দেবী,—তোমার কেশাগ্র-স্পর্শ-করিতে-অযোগ্য, হতভাগা জ্যাক আর তোমার সুখে বিঘ্নের সৃষ্টি করিবে না। সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে।

তাহাকে যাইতেই হইবে! যেমন করিয়া হউক, সে চলিয়া যাইবেই!

একদিন প্রভাতে রিভালের নিকট

আসিয়া জ্যাক আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

রিভাল কহিলেন, "ঠিক বলেছ, জ্যাক। এখন তুমি বেশ সুস্থ হয়েছ, কার্য্যক্ষমও হয়েছ, আর বসে থাকা উচিত নয়। একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখা দরকার!"

মুহূর্ত্তের জন্য জ্যাক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তারের দৃষ্টিতে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া সে একবার বিচলিত হইল!

সহসা ডাক্তার বলিলেন, "আমায় আর কিছু বলবার নাই, জ্যাক?"

জ্যাকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তবে, কি—তবে কি, ডাক্তার—? সে কহিল, "না, আর কিছু ত না—"

"কিন্তু জ্যাক, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে আরও কিছু তোমার বলবার আছে। আমি ছাড়া ত সিসিলের আর কেউ নাই—তার সম্বন্ধে কোন কথা কি আমাকে বলবার নাই, জ্যাক? বল, সঙ্কোচ কিসের?"

জ্যাক কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ডাক্তার সস্নেহে কহিলেন, "কেঁদোনা, জ্যাক—কোন জিনিস অসম্ভব বলে মনে করো না! বল!"

জ্যাক কহিল, "তা কি সম্ভব হতে পারে, ডাক্তার? আমার মত লক্ষ্মীছাড়া কারিগর—ছোটলোকের সামিল যে"—

"এত অধীর হচ্ছ, কেন, জ্যাক? চেষ্টায় কি না হয়? পরিশ্রম কর, জীবনের গতি ফেরানো খুব সহজ! যদি বল, কিসে আবার উঠতে পারবে,—আমার মত চাও যদি—?"

বাধা দিয়া জ্যাক বলিল, "না, না, শুধু তাই নয়—ডাক্তার! আপনি জানেন না, কি গভীর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আমাদের দুজনের মধ্যে—। আমি—আমি—আমার মা—"



জ্যাক কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

শান্ত অটল অকম্পিত, স্বরে ডাক্তার কহিলেন, "জানি, জ্যাক, সে আমি সবই জানি—"

"তবে,—তবে—?"

"তবে—? তবে আর এক নূতন কথা শোন, জ্যাক! সিসিলের ভাগ্য তোমারই মত—না, আরও মন্দ! তবে শোন, তার জন্ম-বৃত্তান্ত—সে এক শোচনীয় কলঙ্কের কি মর্ম্মভেদী ইতিহাস!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



রঙ্গালয়ের রাজা
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

অর্থনীতি *

অর্থকে আজিকালিকার দিনে আর অনর্থ বলা চলে না। কুব্যবহারে অর্থ বহু অনর্থ ঘটাইলেও সুব্যবহারে প্রভূত মঙ্গলের সৃষ্টি করে। দরিদ্রসেবা, দান, পরোপকার প্রভৃতির মূলে অর্থের প্রয়োজন ত আছেই, তদ্ভিন্ন জীবন-যাপনের পক্ষে অর্থের মত অনুকূল সহায় আর কোথায়? বানপ্রস্থাবলম্বীর কথা বলিতেছি না। গৃহীকে লইয়া সংসার। তাহাকে লইয়াই পার্থিব সুখ-দুঃখের মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে হয়। নিস্পৃহ বানপ্রস্থাবলম্বীকে আইনও—অক্ষম অর্থাৎ লোকনয়নে অস্তিত্বহীন বলিয়া স্বীকার করে। সন্ন্যাসীর অন্ন জোগাইবে গৃহী,—সেকালে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। গৃহী অবস্থাপন্ন না হইলে সন্ন্যাসীকে পুষিবে কি করিয়া? কাজেই দেখা যাইতেছে, সংসারে জীবনধারণ করিয়া থাকিতে হইলে অর্থকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না—তাহাকে সাধনা করিবার প্রয়োজন আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, অর্থ আসিবে কোথা হইতে? যাহার সে অর্থের সংস্থান সেরূপ নাই, কোথা হইতে তাহার সংস্থান হইবে? যাহার তাহা আছে, সে বসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া থাইলে কিয়ৎকালের মধ্যেই ত তাহা নিঃস্ব হইবে। কুঁজার জল গড়াইতে গড়াইতেই ফুরায়। অর্থও সেইরূপ। সুতরাং অর্থ কি ভাবে রক্ষা করিতে হয়, কি করিয়াই বা বাড়াইতে হয়, তাহা জানিবার বিলক্ষণ আবশ্যক আছে।

ত্যাগ-পরায়ণ প্রাচ্য দেশে অর্থের প্রতি লোকের তেমন মায়া-মমতা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে কাল ও অবস্থা ভেদে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সর্ব্বপ্রকার উপায় আমাদিগকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে—অর্থনীতির আলোচনাতেও যে সেইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু আধুনিক নূতন প্রণালী অনুসারে বঙ্গভাষায় অর্থনীতি-আলোচনার সেরূপ প্রয়াস হয় নাই—অথচ অর্থ-উৎপাদন, অর্থ-বিভাগ-রাজস্বের সহিত দেশের শান্তি ও সামাজিক উন্নতির সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি যে সকল নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, সকলের সেগুলি জান একান্ত কর্ত্তব্য! ইহাতে জীবন-ধারণের প্রণালী সমধিক উন্নত হয়, সামাজিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদিও পরম সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হয়।

শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে—তাই তিনি অর্থ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মনস্বী পাশ্চাত্য লেখকগণের অশেষ চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থরাজি অবলম্বনে বঙ্গভাষায় 'অর্থনীতির' সঙ্কলন করিয়াছেন।

যদিও পূর্ব্বে অর্থনীতি-বিষয়ক দুই এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি ভারতীয় অর্থনীতি ও তৎসঙ্গে বৈদেশিক অর্থনীতির সমালোচনা ও সামঞ্জস্য করিয়া ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার যোগীন্দ্রনাথের উদ্যম সমধিক প্রশংসনীয়। তিনি একজন উদীয়মান লেখক। প্রায়

* (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৫৮—১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।)

সকল মাসিকেই তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে। বিশেষতঃ ভারতীর পাঠকগণের নিকট তিনি সুপরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থে ভূমি, পরিশ্রম, মূলধন খাজনা, বেতন, লাভ, রাজকর, পণ্যের মূল্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভারতবর্ষে সুদের হার, ধর্ম্মগোলা, অবাধবাণিজ্য ও সোনার টাকা প্রভৃতিরও পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুন্দররূপে সহজ ভাষায় আলোচিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপকারে লাগিবে। দেশের ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে কি কি বিষয় প্রত্যেক দেশবাসীর জানা কর্ত্তব্য, তুর্ব্বিসহ ভারতীয় সুদের হারে প্রজাবৃন্দের কি দারুণ কষ্ট হইতেছে এবং কি প্রকারে এই কষ্ট দূরীভূত হইতে পারে, শিক্ষা-বৃদ্ধির সহিত দেশের উন্নতি কিরূপ জড়িত, মুদ্রার আবশ্যকতা, রাজকর কি জন্য গৃহীত হয় এবং কি ভাবে গৃহীত হওয়া আবশ্যক, অবাধ বাণিজ্যের উপকারিতা এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি গ্রন্থকার স্বদেশী ও বিদেশী গ্রন্থকারগণের মতের সুনিপুণ আলোচনদ্বারা প্রণিধানযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নহে। গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহাকে যে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, গ্রন্থের প্রতি পত্রেই তাহা দেদীপ্যমান। ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এই প্রথম। সেই জন্যই আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধে ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহাস্পদ বন্ধু ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রকে সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া, আমাদের দেশবাসীর যাহাতে এ দিকে অধিকতর দৃষ্টি পতিত হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও অধ্যাপকপ্রবরের এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। অর্থনীতিশাস্ত্রে যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যের এ অভাব পূরণের তাঁহারা উদ্যোগী লউন।

এই শ্রেণীর গ্রন্থ আরও রচনা করিয়া যোগীন্দ্র বাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমলঙ্কৃত করুন, ইহাই আমাদিগের কামনা।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। সাহিত্যানুরাগী মাননীয় 'কাশীমবাজারাধিপতি নবীন গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিবার জন্য গ্রন্থের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ হইতে মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।



অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

K. V. Seyne & Bros.

সমালোচনা

নিবেদিতা। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। কলিকাতা, ১২, ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন হইতে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। ভগিনী নিবেদিতার নাম আজ ভারতবাসীর নিকট শুধু যে সম্যক বিদিত তাহা নহে, একান্ত শ্রদ্ধার সহিত পূজিত। আমাদিগের দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধনে পাশ্চাত্য মহিলা হইয়াও তিনি কি ভাবে আপনার কায়মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সুমধুর স্মৃতিতে ভারতবাসীর অন্তর আজ পরিপূর্ণ। দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বন্যাক্লিষ্ট নরনারীকে আহার ও আশ্রয় প্রদান, দুরারোগ্য রোগীর সেবা প্রভৃতির ভার গ্রহণ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, প্রাচ্য আদর্শ মতে আমাদিগের কুলনারীগণকে শিক্ষাদানের জন্য, নূতন স্ত্রী বিদ্যালয় ও অভিনব শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবনে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহাকে নিতান্তই আত্মীয়ার মত দেখিতাম। তাই তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনায় আমরা আজ এত অধীর। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ভারতবাসীর আদর্শ স্থানীয়। আজীবন ব্রহ্মচারিণীর ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুর পাদপদ্মে মতি রাখিয়া তিনি যে মহত্বের চিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে বরেণ্য। এই গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার কর্ম্মময় জীবনের আভাস সুললিত ভাষায় বেশ আন্তরিকতার সহিত লিখিত হইয়াছে,—ইহা সেই আদর্শ নারীর চরণে যোগ্য পুষ্পাঞ্জলি। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেখিকার রচনা-কুশলতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মূলসূত্রটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার ঋণ অন্তরে অনুভব করিয়াছি। এ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব, ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হইবার যোগ্য। ত্যাগশালিনী ব্রহ্মচারিণী রমণীর পুণ্যকাহিনী ভারতের গৃহে গৃহে পঠিত হউক, ভারতবাসী নির্জীব শরীরে চেতনা পাইবে। এ গ্রন্থ শুধু ভগিনী নিবেদিতার কাহিনী নহে, ইহা মনুষ্যত্বের পূর্ণ ইতিহাস।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। বর্ত্তমান ভারতের প্রায় সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ-প্রদর্শক রাজা রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। অল্প পরিসরের মধ্যে রাজার জীবনের মূল ঘটনাগুলির পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিষয় সুবিন্যস্ত, ভাষা ভালো, পড়িতে কোথাও বাধে না। রাজার জীবনের আদর্শ বেশ কুশলতার সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে।

ধ্রুব। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত, কটন লাইব্রেরী, ঢাকা। ঢাকা আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থের ছাপা-বাঁধাই কাগজ ও চিত্র পরিপাটি হইয়াছে,—শিশুদিগের মন ভুলাইবে। মূল্যও সামান্য। ধ্রুবের পৌরাণিক কাহিনী উপন্যাসের ধরণে সঙ্কলিত হইয়াছে। বালকদিগের সম্মুখে যাঁহারা এইরূপ আদর্শ চিত্র উপস্থাপিত করেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, কিন্তু বর্ণনায় রসটুকু ভালো ফুটে নাই; ভাষার গতি, বেশ স্বচ্ছন্দ নহে, এইটুকুই ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

প্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। নিউআর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের লিখিত ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রায় চতুর্দ্দশটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি ভাষা ও যুক্তির গুণে এমন সুমধুর হইয়াছে যে গল্পের মতই তাহা সুললিত, উপভোগ্য। ভাষায় এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে পাঠকের চিত্ত অনায়াসে লুব্ধ মুগ্ধ হইয়া পড়ে অথচ যুক্তিতর্কের বিন্যাসও সুন্দর সুনিপুণ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ নাই, তাহা বিশ্ব মানবের চিত্ত অপূর্ব্ব ভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলিবে। কঠিন প্রশ্ন ও সমস্যাদির এমন যোগ্য সমাধান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্যিক প্রবন্ধে

পাই—আবার সামাজিক প্রবন্ধগুলিতেও ভূয়োদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার গভীরতা দেখি। "বনিয়াদি জমিদারদিগের অধঃপতন" প্রবন্ধটি দেশের অভিজাতবর্গের অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। যাঁহারা সুধীন্দ্রবাবুকে শুধু একজন উৎকৃষ্ট গল্প-লেখক ও কবি বলিয়া জানেন, তাঁহারা "প্রসঙ্গ" পাঠে লেখকের গবেষণা-শক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় গ্রহণ করুন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি চমৎকার হইয়াছে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, লোটাস লাইব্রেরী, ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। প্রবন্ধগুলি ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ক, সুলিখিত। ভাষা সহজ ও সুন্দর, তর্ক যুক্তি সরল অনাড়ম্বর, কাজেই বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের নিকট সুবোধ্য। গ্রন্থের মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত ভূমিকাটি অমূল্য। ভূমিকায় কৃষ্ণধন বাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। হীরেন্দ্র বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "হিন্দু দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সেইজন্য অতি দুর্ব্বোধ তত্ত্ব সকলও তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির নিকট পরিস্ফুট হইত এবং অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি তাহা পাঠককে বুঝাইতে পারিতেন। এ অন্তর্দৃষ্টি শুধু শাস্ত্রাধ্যায়নের ফল নহে; তিনি শাস্ত্র শুধু অধ্যয়ন করিতেন না, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতেন।" হীরেন্দ্রবাবুর কথার যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। এ গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্ম সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ।

নারীর ভাগ্যচিত্র। (প্রথম খণ্ড) জনৈক মহিলা প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, এম, এ। সোল এজেণ্ট অতুল লাইব্রেরী ইসলামপুর ঢাকা। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত দেখিলাম না। দুইটি বড় গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পের আদর্শ উচ্চ, কিন্তু রচনা নিতান্তই কাঁচা। লেখিকার ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর, কিন্তু লিপিকুশলতার অভাবে উপাখ্যান দুইটি ফুটে নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। ভট্টাচার্য্য সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কয়েকটি উপাখ্যান অবলম্বনে ললিতবাবু ছয়টি গল্প ও চারিটি ছড়া রচনা করিয়া শিশুদিগের হস্তে উপহার দিয়াছেন। রচনার গুণে সেগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মার্জ্জিত মিষ্ট ও সরল হাস্যরসে ছড়া ও গল্প আগাগোড়া ঝলমল করিতেছে। উপদেশ-টুকুও কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। ভাষা যেমন সুললিত, বর্ণনার ভঙ্গীও তেমনই বিচিত্র, মধুর। ছাপা কাগজ ছবি উৎকৃষ্ট, অথচ মূল্য অত্যন্ত সুলভ। এ গ্রন্থ যে শিশুদিগের খেলাধূলা ভুলাইবে, সে বিষয়ে আমা-দিগের এতটুকু সন্দেহ নাই। কভারের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব, একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানদান করিবে। এক কথায় কভারের ছবি হইতে শিশুচিত্তে যে কৌতুহল উদ্রিক্ত হইবে, তাহা সমভাবে গ্রন্থের শেষ ছত্র অবধি জাগরূক থাকিয়া তাহাকে উদ্বেল বিহ্বল করিয়া রাখিবে।

গৌড়রাজমালা। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ প্রণীত। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে শ্রীসুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা' লিখিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়। উপক্রমণিকা, গ্রন্থখানির সূত্রের কার্য্য করিবে। বঙ্গের একাংশের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকার দেশবাসীকে বিপুল ঋণে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার সুগভীর গবেষণা, প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও অপূর্ব্ব অভিনিবেশ এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। অসংখ্য ধ্বংস-স্তূপ ও শিলালিপি হইতে ইতিহাস-উদ্ধারে কি বিপুল শক্তি, অসাধারণ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই সহজে বুঝা যায়। লেখক সেই গুরু শ্রম করিয়া ইতিহাসের যে উপাদান সংগ্রহ করিলেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে সগৌরবে রক্ষিত হইবে। বঙ্গবাসীর জীবনে এক নূতন যুগ আসিয়াছে, বাঙ্গালায় সুপবন বহিতে

আপনার প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনীর উদ্ধার-সাধনে যে ব্রত আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সফল হইলে বঙ্গদেশ ধন্য হইবে, বাঙ্গালীর কল্যাণ হইবে। প্রমাণ-প্রয়োগের প্রাচুর্য্যে, তথ্যের পরিপূর্ণ ভারে, "গৌড়রাজমালা" ইতিহাস-সাহিত্য গৌরব-মণ্ডিত করিবে।

ডালি। সৈয়দ এমদাদ্ আলী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, এলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাকা। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। অনেকগুলি কবিতাই ভাবে ভাষায় উপভোগ্য। ছন্দে লেখকের অধিকার বেশ। 'ঈদ', 'সেকেন্দ্রা', 'কাহিনী', 'নিবেদন' 'বিবি ফিতিম' প্রভৃতি কবিতাগুলি সুন্দর, মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত। প্রেমের হা হুতাশও বিরহের জ্বালা ছাড়িয়া কবি যে উচ্চ আদর্শের সাধনায় রত হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষার কল্যাণ হইবে, বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই পরিপাটি হইয়াছে।

সোনাবিবি। (ঐতিহাসিক উপন্যাস) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা আশাহত হইলাম। লেখকের ভাষা বেশ সহজ ও সরল, রচনাভঙ্গীও মন্দ নহে, কিন্তু ঘটনার জটিলতায়, উপন্যাসে রীতিমত জোট পাকাইয়া গিয়াছে।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ প্রণীত। ঢাকা ভারত মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য এক টাকা। এ গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড়ের ধারাবাহিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখকের এই প্রথম উদ্যম। কাছাড়ের প্রাকৃতিক বিবরণ, পৌরাণিক যুগের কাহিনী ও ইতিবৃত্ত সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইতিহাসের কঙ্কাল খাড়া হইয়াছে—এইবার গুছাইয়া বিষয়গুলি সুবিন্যস্ত করিয়া ইতিহাস রচনা করিলে তবে কাজটি সম্পূর্ণ হয়। কাছাড়ের ইতিবৃত্ত এই প্রথম প্রকাশিত হইল। লেখককে পরিশ্রম অল্প করিতে হয় নাই—এ জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। দেশের চারিধারে ইতিবৃত্ত-সঙ্কলন ও লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে,- দেশের পক্ষে ইহা বিশেষ সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই।

রত্নাবলী। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী সংস্কৃত সাহিত্যে মধুর রসাশ্রিত একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার আখ্যানটি যেমন সরল, তেমনই চিত্তাকর্ষক। সেই নাটক অবলম্বনে এই উপাখ্যানটি সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা এ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মূলের সৌন্দর্য্যের কতক আভাষ পাইবেন, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত ও সরল,—গল্পটিও বেশ গুছাইয়া বলা হইয়াছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "প্রাচীন সাহিত্যে এমন সমস্ত কথা অবাধে চলিত, যাহা এখন রুচিদুষ্ট অশ্লীল বলিয়া পরিগণিত।" গ্রন্থকার সেই অংশগুলি পরিহার করায় গ্রন্থখানি বালকবালিকাগণের হস্তে অসঙ্কোচে দেওয়া যায়। পাঠে প্রাচীন সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের সহিত পরিচয় ও তাহাদিগের কল্পনাবিকাশের বিশেষ সুবিধা হইবে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতিও পরিপাটি হইয়াছে।

সদালাপ। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বারাণসী, মহামণ্ডল শাস্ত্র-প্রকাশক সমিতি প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থের মুখবন্ধটুকু চমৎকার। এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থের মূল সূত্রটি সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। "সদালাপে সংগৃহীত রত্নগুলির অধিকাংশই প্রাচীন কাল হইতে মানবের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে ভূমণ্ডলের একাধিক ভাষায় মুদ্রিত আছে; তবে এই সংগ্রহে সকল কথাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। * * এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রতি প্রীতিপোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাল কথা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে।" এই

গৌরবের দেড়শতাধিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; কাহিনীগুলি কাল্পনিক নহে, অতিরঞ্জিতও নহে। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে কাহারও দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখা যাইতেছে না, আদর্শের সন্ধান নাই, সম্মান নাই, অন্নচিন্তা ও স্বার্থ সিদ্ধিই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইতে চলিয়াছে, তখন ভ্রান্ত বিপথগামী নরনারীকে সচেতন করিয়া তুলিতে এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে সকল সদ্‌গুণ মানবকে পশু হইতে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ করিয়াছে, সেই সকল গুণ মানবের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—চেষ্টা বা সাধনার অভাবে তাহা সুপ্ত আছে মাত্র, তাহাকে জাগরূক সচেতন করিয়া তুলাই মানবের ধর্ম্ম তাহার উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সেই বিরাট সত্য উপলব্ধ হয়। গ্রন্থখানি বহু মহাপুরুষের চরিত্র-রশ্মির রেখাপাতে উজ্জ্বল সুতরাং সুচরিত্র গঠনের পক্ষে এবং জাতীয় জীবনীশক্তি-সম্বর্দ্ধনে যে বিশিষ্ট সহায়ক, এ কথা আমরা দৃঢ়চিত্তে বলিতে পারি। গ্রন্থের আয় 'সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে উৎসর্গিত।

বাজে কথা। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী প্রণীত। ১০৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাজে কথা গল্পের বহি। চারিটি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি ক্ষুদ্র নহে। রচনার ভঙ্গীটি আশাপ্রদ। ছোট ছোট কথায় সহজ ভাষায় গুছাইয়া গল্প বলিবার ক্ষমতা লেখিকার আছে; তবে অনাবশ্যক কথার ভারে রচনা উৎপীড়িত। এই দোষটি কাটাইতে পারিলে লেখিকার রচনা ভবিষ্যতে ভালই হইবে এরূপ আশা হয়। ভাষার দিকেও লেখিকাকে অবহিত হইতে হইবে। রচনাভঙ্গীটি আশাপ্রদ মনে হইল বলিয়াই এত কথা, অপ্রিয় হইলেও, বলিলাম।

সিদ্ধার্থ। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত। ২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। বাণবিদ্ধ হংস দেখিয়া সিদ্ধার্থের মনে করুণার আবির্ভাব, এই কাহিনী হস্তের পরিচয় না পাইলেও নাটিকাখানি বালক বালিকাগণের অভিনয়োপযোগী হইয়াছে। মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে, তবে উপাখ্যানের সকরুণ সুরটি সর্ব্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয় নাই। তথাপি আমরা এই নাটিকাখানি বালকবালিকাগণের হস্তে সানন্দে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতে পারি।

বন-তুলসী শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। এখানিও কবিতা গ্রন্থ। কবিতাগুলি আগাগোড়া উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ। পাঠ করিয়া আনন্দ হয়। ছন্দে লেখকের বেশ অধিকার আছে—ভাবও ফুটিয়াছে ভাল। আমরা এই নবীন কবির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। মহাপুরুষগণের অমূল্য উপদেশ সংসার-তাপদগ্ধ নরনারীর চিত্তে বিপুল সান্ত্বনা বহন করিয়া আনে, প্রাণ স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। কবি তাহারই কতকগুলি ছন্দোবন্ধে আপন ভাবের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়াছেন। গ্রন্থনে পারিপাট্য আছে। 'বনতুলসী' নামটি সার্থক হইয়াছে।

রূপকথা। শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু বি, এল, প্রণীত। ৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ইউনিভারসেল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উইলকিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি কৌতুকনাট্য—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। রাজপুত্র ও রাজকন্যার সেই চিরপুরাতন রূপকথা বিলাতী প্যাণ্টোমাইমের ছাঁচে রচিত হইয়াছে। প্যাণ্টোমাইম রচনায় লেখকের বিকাশোন্মুখ শক্তির পরিচয় ইহাতে বেশ পাওয়া যায়—তবে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোষ ঘটিয়াছে। উকিল ও দালালের দ্বৈতগীত, ও ঘুমপাড়ানিয়া গানে হাস্যরস দিব্য উছলিয়া উঠিয়াছে—চাষার প্রেমের গানটি বেশ শান্ত মিষ্ট রসে ঝলমল করিতেছে—এই তিনটি গান আমাদিগের ভাল লাগিয়াছে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গীতে কোথাও আড়ষ্টতা নাই—তবে বচনবিন্যাস স্থানে স্থানে দীর্ঘ হওয়ায় রসভঙ্গ হইয়াছে। ব্যোমকেশ বুকুশীর অবতারণায় হাস্যরসের পরিবর্ত্তে আদিরসের প্রস্রবণই ছুটিয়াছে—শিক্ষিত গ্রন্থকারের

বৈজ্ঞানিক জীবনী

মাইকেল ফ্যারাডে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিবিধ গ্যাসকে তরলীকরণ।
(Liqnefaction of gases)

ফ্যারাডে একাধারে রাসায়নিক ও পদার্থ-তত্ত্ববিৎ ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৮১৬ সালে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তত মূল্যবান নয়, উহাতে টস্কানীদেশ জাত চূণের একটি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত—এই চারি বৎসরে—ফ্যারাডে সাঁইত্রিশখানি মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ফ্যারাডে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাহা তখনও আরম্ভ হয় নাই।

অনেকে তরল বায়ুর (liquid air) কথা শুনিয়া থাকিবেন। এখানে আমরা চর্ম্মচক্ষে এখনও তরল বায়ু দেখি নাই, কিন্তু বিলাতে তরল বায়ু বিজ্ঞানাগার সমূহে বোতল বোতল ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বায়ুকে খুব বেশী চাপ (pressure) দিলেও প্রায়—২০০ ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা করিলে বায়ু জলের মত তরল হইয়া যায়। উহা এত ঠাণ্ডা যে এক ফোঁটা হাতে পড়িলে হাতে ফোস্কা উঠে। ফ্যারাডে অবশ্য তরল বায়ু আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু উহার প্রস্তুতপ্রণালীর পন্থা সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নানাবিধ গ্যাসকে তরল করিবার পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে ক্লোরিন গ্যাসকে তরল করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। তিনি একটি কাঁচনলের একমুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে ক্লোরিন হাইড্রেট (chlorine hydrate) নামক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরে অপর মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যে মুখটিতে ক্লোরিন হাইড্রেট ছিল সেই মুখে অল্প অল্প উত্তাপ প্রদান ও অপর মুখটি বরফে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখিলেন যে খালি মুখে খানিকটা পীত তৈলের মত তরল পদার্থ জমিয়াছে। তাঁহার আগে নর্থমোর নামে একজন রাসায়নিক এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্যারাডে এই তরল পদার্থের স্বরূপ সম্যক অবধারিত করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেন যে এই তরল পদার্থ তরলীভূত ক্লোরিন গ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ পরীক্ষায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে কোনও গ্যাসকে তরলীভূত করিবার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন—১) অত্যধিক চাপ ও (২) অত্যধিক ঠাণ্ডা। বদ্ধকাচনলের ভিতর ক্লোরিন হাইড্রেট উত্তপ্ত হওয়ার সময় প্রথমে ক্লোরিন গ্যাস বহির্গত হয়, কিন্তু উহা বাহির হইতে না পারায় স্বতই প্রভূত চাপ উৎপাদন করে এবং বরফের দ্বারা ঠাণ্ডা করায় উহা তরল আকারে পরিণত হইয়া থাকে।

ক্রমে এইরূপ উপায়ে তিনি আরও অনেক-গুলি গ্যাস তরল

ডাইঅক্সাইড্ (Sulphur dioxide), এমোনিয়া (Ammonia), সাইয়ানোজেন (Cyanogen) প্রভৃতি। কিছুকাল পরে ফ্যারাডে একটি ছোট পম্পের সাহায্যে চাপ বৃদ্ধি করিয়া ও বরফের সহিত লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য মিলাইয়া শীতলতা বৃদ্ধি করিয়া কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস (Carbonic acid gas), হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস (Hydrocloric acid gas); ও হাস্যোদ্দীপক গ্যাস—এইগুলিকে (nitrous oxide) তরল অবস্থায় আনিতে সক্ষম হইলেন। এইরূপে সেই সময়ে জানিত প্রায় তাবং গ্যাসই ফ্যারাডের হস্তে তরলতা প্রাপ্ত হইল। বাকি রহিল কেবল ছয়টি গ্যাস—অম্লজান, উদজান, নেত্রজান, কার্ব্বন মনক্সাইড্ (Carbon monoxide), মার্স গ্যাস (marsh gas) এবং নাইট্রিক অক্সাইড (nitric oxide)। অনেক দিবস পর্য্যন্ত কেহই এই কয়েকটি গ্যাসকে তরল-করিতে সক্ষম হন নাই এবং উহারা "চিরস্থায়ী গ্যাস" (permanent gas) নামে অভিহিত হইত। যে কার্য্য ফ্যারাডে আরম্ভ করিয়াছিলেন বহুপরে তাহার সমাপ্তি হইয়াছে। এখন চাপ ও ঠাণ্ডা বৃদ্ধি করিবার জন্য বড় বড় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে এই "চিরস্থায়ী গ্যাস" গুলিও তরলীভূত হইয়াছে। পিক্‌টে, ক্যালিটে, রোব্লোস্‌কি, ওলসেব্‌স্কি, ডেয়োয়ার, লিণ্ডে, হ্যাম্‌সন প্রভৃতি ইংরাজ, ফরাসী, রুসীয়, ও আমেরিকান রাসায়নিকগণের জীবনব্যাপী চেষ্টায় ফ্যারাডের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।



মাইকেল ফ্যারাডে।

বেঞ্জিন আবিষ্কার।

ফ্যারাডের অন্যতম রাসায়নিক আবিষ্কার—বেঞ্জিন (benzene)। পোরটেবল গ্যাস কোম্পানির দ্বারা তৈল হইতে প্রস্তুত গ্যাস পরীক্ষা কালে তিনি এই তরল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র জানেন যে এই বেঞ্জিন হইতে জৈব (organic) রসায়নের এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে এই বেঞ্জিন হইতে অসংখ্য জৈব পদার্থ

আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাজারে আজ কাল খুন-খারাপি প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র বর্ণের যে শত শত রং পাওয়া যায় তাহার সকলগুলিই এই বেঞ্জিন হইতে প্রস্তুত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতেছি। ফ্যারাডে যখন ক্লোরিন প্রভৃতি গ্যাসকে তরলীভূত করিতেছিলেন তখন তাঁহার কোনকোনও বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "এ কাজে পৃথিবীর কি উপকার হইবে? যে কাজে পৃথিবীর কোনও উপকার হইবে না তাহাতে সময় নষ্ট করা উচিত নহে।" এরূপ প্রশ্ন এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস যে বিশুদ্ধ রসায়ন পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির শাস্ত্রে গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা ঘটি, বাটি, ছাতা, জুতা, কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি "প্রয়োজনীয়" দ্রব্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক্লিন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেন "ছেলে মানুষ করিয়া কি লাভ?" যাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিশুদ্ধ রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার উন্নতি না হইলে এই সকল "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কারের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকটা নিষ্কাম সাধনার মত। আরব্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীর কোন কাজে আসিবে কি না—এ চিন্তা করিবার অবসর বৈজ্ঞানিকের নাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিকের গবেষণার উপর পৃথিবীর তাবৎ "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের উৎপত্তি নির্ভর করিতেছে। ফ্যারাডে যখন এতটুকু তরল ক্লোরিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তী কালে তাঁহার প্রস্তুত তরল ক্লোরিন শত সহস্র বোতল স্বর্ণের খনিতে ব্যবহৃত হইবে? ফ্যারাডের দূরদৃষ্টি কখনও দেখিতে পায় নাই যে তাঁহার আবিষ্কৃত বেঞ্জিন হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বিচিত্র বর্ণের শত শত প্রকার রং প্রস্তুত করিবে। ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক গবেষণা পাঠ করিয়া কে বলিতে পারিত যে তাঁহারই গবেষণার ফল স্বরূপ আজ বিশ্বে বিদ্যুৎ একটি পরমা শক্তিরূপে বিরাজ করিবে?

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আবিষ্কার।

আজ বিদ্যুৎ যে সভ্যজগতে একটা প্রধান শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে, মানবের উন্নত বুদ্ধিকৌশলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া আজ তড়িৎ "নিরন্তর ভৃত্যভাবে" পাখা টানিতেছে, আলোক জ্বালিতেছে, ট্রামগাড়ি চালাইতেছে, বড় বড় কল যন্ত্রাদি সবেগে ঘুরাইতেছে—বিদ্যুৎকে মানবের এত কাজে লাগাইবার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের স্থান খুব উচ্চে। তিনি এই সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পরিবর্ত্তীকালের বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল মূল সূত্র যন্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে লাগাইয়া কত বিচিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। যখন বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত হর্ম্ম্যরাজিমধ্যে বৈদ্যুতিক পাখা সঞ্চালিত বায়ু সেবনে সুখানুভব করিবেন তখনই আপনারা একবার কামার সন্তান মাইকেল ফ্যারাডেকে স্মরণ

করিবেন—তিনিই যাবতীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়া আপনাদের চিত্তবিনোদনের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

ফ্যারাডে যখন দপ্তরির কাজ করিতেছিলেন তখন হইতেই তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেন। সাত খণ্ড দস্তা ও সাতখানি আধপেনী লইয়া তাহাদের মধ্যে লবণের জলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়া তিনি ভল্টার বৈদ্যুতিক ঘট (Voltaic pile) প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেন। রয়েল ইনিস্‌টিউশনে ডেভীর সহিত তিনি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করিয়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহার জীবনের একমাত্র সারসম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বৈদ্যুতিক সমস্ত আবিষ্কারের পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়, এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব মাত্র।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন।
(Induction)

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা ফ্যারাডের পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অষ্টার্ড ও আমপিয়ার অনেক পরীক্ষা করিয়া বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ফ্যারাডের পূর্ব্বে জানা ছিল যে একটা লৌহ শলাকার উপর তামার তার জড়াইয়া সেই তারের ভিতর তড়িৎ প্রবাহ (electric curr_nt) চালনা করিলে

বৈদ্যুতিক প্রবাহসংযুক্ত একটি তামার তারের নিকটস্থ অপর একটি তামার তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করা যায় কি না ফ্যারাডে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দশ দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে প্রায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ফ্যারাডে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রথম। ফ্যারাডে রেশমের সূতার দ্বারা জড়ান তামার তার জড়াইয়া সূতার কাটিমের মত একটা বেষ্টন (coil) প্রস্তুত করিলেন। তারের দুইটিমুখ তড়িৎ প্রবাহ চালনা করিবার জন্য একটি বৈদ্যুতিক কোষের (electriccell) সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত তারের কাটিমের উপর আর একটি তারের বেষ্টন প্রস্তুত করিয়া উহার দুইটি মুখ একটি বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের (galva nometer) সহিত লাগাইয়া দিলেন। তাহার পর ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে যেমন তড়িৎ প্রবাহ চালাইয়া দিলেন অমনি বাহিরের বেষ্টনের ভিতর বিপরীত দিকে একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। আবার যখনই ভিতরকার বেষ্টনের তড়িৎ প্রবাহ থামাইয়া দিলেন তখনই বাহিরকার বেষ্টনের ভিতর দিয়া আর একটি তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত হইল। এবারকার প্রবাহ প্রথম প্রবাহের বিপরীত দিকে। বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের লৌহশলাকার গতির দ্বারা প্রবাহের দিক নির্ণিত হইয়া থাকে। ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে ঠিক যে সময়ে তার খুলিয়া বা লাগাইয়া তড়িৎ প্রবাহ থামান বা চালান হয়, ঠিক সেই সময়েই বাহিরকার বেষ্টনে তড়িৎপ্রবাহ

মধ্যে যখন অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকে তখন বাহিরের বেষ্টনে তড়িৎ প্রবাহ চলে না।

দ্বিতীয়। বাহিরের বেষ্টনের মত আর একটি বেষ্টন প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর এক-খানা চুম্বকশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। চুম্বক প্রবেশ করাইবা মাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বেষ্টনে প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাই-লেন। যতক্ষণ চুম্বক ভিতরে স্থির ছিল ততক্ষণ কোনও প্রবাহ লক্ষিত হইল না। আবার যখন চুম্বকশলাকাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লওয়া হইল তখনই অপর দিকে আর একটি প্রবাহ বেষ্টনে প্রবাহিত হইল। এইরূপে ফ্যারাডে বিদ্যুৎ ও চুম্বক উভয়ের দ্বারাই বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন।

তৃতীয়। ফ্যারাডে ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে পৃথিবী একটি অতি বৃহৎ চুম্বকের কার্য্য করে, সেইজন্য সাধারণ চুম্বকের মুখ সতত উত্তর দিকে থাকে। তিনি ভাবিলেন যে যখন সাধারণ চুম্বকলৌহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তখন পৃথিবী হইতেই বা কেন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে না? সেইজন্য তিনি একটা তামার তারের বেষ্টন চুম্বকীয় সূচিপতনের (magnetic dip) ক্ষেত্রে রাখিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন যে বেষ্টনটি ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বারেই একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বেষ্টনের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চতুর্থ। ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন যে কেবল একটা তড়িৎ প্রবাহ নিকটবর্ত্তী অপর একটি তামার তারে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে এমত নহে, যে তারের ভিতর দিয়া সেই প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে সেই তারেই একবার খুলিবার সময় ও একবার দিবার সময় দুইটি তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই প্রবাহের নাম দিলেন "এক্‌স্ট্রা কারেণ্ট" (extra current)।

ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎজননের কতকগুলি নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যুৎকোষের (elctric cell) দ্বারাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত, কিন্তু সেই সকল কোষে যে মূল্যবান দ্রব্যসকল ব্যবহৃত হইত, সেইগুলি দিনকতকের পর ফেলিয়া দেওয়া হইত বলিয়া বিদ্যুৎজনন অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারকে মূল সূত্র করিয়া অধুনা বৃহৎ বৃহৎ ডাইনামো প্রভৃতি বিদ্যুৎজননের যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই সকল যন্ত্রজাত বিদ্যুতের সাহায্যে আলোক জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, ট্রাম এবং কল চলিতেছে।

বিদ্যুতের রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিয়ম। (Law of Electrolysis)

বিদ্যুতের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে তাহা ফ্যারাডের পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিকলসন এবং কার্লাইল নামক দুই ব্যক্তি তাড়িতপ্রবাহের দ্বারা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উদ্‌জান ও অম্লজান গ্যাস প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ডেভী তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা কষ্টিক সোডা ও পটাস নামক তীক্ষ্ণ ক্ষারদ্বয়কে বিশ্লিষ্ট করিয়া

ফ্যারাডে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের ভিতর তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করিয়া বিবিধ পরীক্ষার পর একটি পরিমাণাত্মক নিয়ম (quantitative law) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে সমপরিমাণ তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা ১ ভাগ ওজনের উদ্‌জান, ৮ ভাগ অম্লজান, ৩৫,৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩,৫ ভাগ সীসক, ১০৮ ভাগ রৌপ্য, ও ৬৫,৩ ভাগ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে যে এই ৮ ভাগ অম্লজান, ৩৫,৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩,৫ ভাগ সীসক প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ ১ ভাগ ওজনের উদ্‌জানের সহিত রাসানিকভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক সংযোগের ওজনকে "তুল্য ওজন" (equivalent weight) বলে। সেইজন্য ফ্যারাডে তাঁহার নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন—সমপরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ বিভিন্ন যৌগিক হইতে তুল্য ওজনের মূল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকে। সোনা রূপার গিল্টি করার আধুনিক প্রক্রিয়া বিদ্যুতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

চুম্বকত্ব ও অচুম্বকত্ব (Paramagnetism and diamagnetism)।

ফ্যারাডের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার দ্রব্যসমূহের চুম্বকত্ব ও অচুম্বকত্ব। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারাডে দেখাইলেন যে যাবতীয় দ্রব্য সাধারণ চুম্বকের দ্বারা হয় আকৃষ্ট (attracted) হয়, না হয় বিতাড়িত (repelled) হয়। তিনি কঠিন তরল ও বায়বীয় এই তিন প্রকার দ্রব্য লইয়াই পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে ধাতু সকলের মধ্যে লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতু চুম্বকজাতীয় এবং দস্তা, টিন, পারদ, সীসক, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু অচুম্বক জাতীয়। ধাতু ভিন্ন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়—অনেক প্রকারের কাগজ, গালা, গ্রেফাইট, ফ্লুরস্পার, কাঠের কয়লা ইত্যাদি এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চুম্বকের দ্বারা বিতাড়িত (repelled) হয়—ফটকিরি, কাঁচ চিনি, রুটি, গন্ধক ইত্যাদি। ফ্যারাডে তরল দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি দ্রব্যের জলীয় দ্রব (solution) চুম্বকাত্মক যথা—লৌহ ও কোবাল্ট ধাতুর যৌগিক সমূহ। অপরদিকে জল, রক্ত, দুগ্ধ, সুরা, তার্পিন তৈল, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থ অচুম্বক-জাতীয়। তাহার পর তিনি বায়বীয় পদার্থের চুম্বকত্ব বা অচুম্বকত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে বাতির আলো চুম্বকের দ্বারা সজোরে বিতাড়িত হইয়া থাকে কিন্তু অম্লজান চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাবতীয় দ্রব্যের চুম্বকত্ব বা অচুম্বকত্বের গুণ আবিষ্কার করিয়া ফ্যারাডে এক নূতন শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। অম্লজানের চুম্বকত্বের দরুণ পৃথিবীর চুম্বকত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ফ্যারাডে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার নানাবিধ পরীক্ষা তাঁহাকে অদ্বিতীয় পরীক্ষাকুশল বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

ফ্যারাডের আরও অনেক মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। বাস্তবিক এক নিউটন ভিন্ন অপর কোনও বৈজ্ঞানিক এতগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়।

তিনি নিজে একখানি খাতা তৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং সেই খাতায় যখন যে বিষয়ে কোনও প্রস্তাবনা মনে উদয় হইত তাহা লিখিয়া রাখিতেন। তিনি সকল বৈজ্ঞানিককে এইরূপ একখানি নোটবহি রাখিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সুবিধা অনেক আছে। অন্ত হঠাৎ একটা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার কথা মনে উদিত হইল, হয়ত কাজের ভিড়ে তাহা লিখিয়া না রাখার দরুণ ভুলিয়া যাইতে হইল। এইরূপ একখানি খাতা থাকিলে সেরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

তাঁহার শিক্ষাগুরু ডেভীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব ক্রমেই কমিতে ছিল। ফ্যারাডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যতই খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন ততই ডেভী তাঁহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়—প্রথমে গুরুশিষ্যে বেশ হৃদ্যতা থাকে, পরে যখন প্রতিভাশালী শিষ্য স্বীয় প্রতিভার গুণে গুরুর সমকক্ষ হইয়া উঠেন তখন গুরুর আর শিষ্যের প্রতি পূর্ব্বভাব থাকে না, একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতারভাব আসিয়া দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও ডেভীর অবস্থা কতকটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছিল। যখন ফ্যারাডের নাম বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সদস্যরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তখন ডেভী উহার সভাপতিরূপে তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দিবস ভোট লওয়া হইয়াছিল, ব্যালট বাক্সে একটি মাত্র কাল বল দেখা গিয়াছিল – অবশ্য এই কাল বলটি কাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা ফ্যারাডের বুঝিতে বাকি ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে কোনও বৈজ্ঞানিক জীবিতকালে স্বদেশ ও বিদেশ হইতে ফ্যারাডের মত এত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই—ফ্যারাডে সর্ব্বসমেত পঁচানব্বইটি সম্মানসূচক পদবী ও খেতাব লাভ করিয়াছিলেন।

ফ্যারাডের চরিত্র অতি পবিত্র এবং স্বভাব অতি মধুর ছিল। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মিস সারা বার্ণার্ডকে বিবাহ করেন। বিবাহের আটাইশ বৎসর পরে তাঁহার খাতায় তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন আমি বিবাহ করিয়াছি – এই বিবাহ অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা আমাকে সমধিক মানসিক আনন্দ ও পার্থিব সুখ প্রদান করিয়াছে। আমাদের বিবাহ বন্ধন আজ আটাইশ বৎসর চলিয়া আসিয়াছে, ইহার মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের গাঢ়তা বৃদ্ধি ভিন্ন উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।" বিবাহের পর রয়েল ইনষ্টিটিউসানে আলাহিদা ঘর পাইয়াছিলেন, সেইখানেই সপরিবারে তিনি বাস করিতেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান সচিব সার রবার্ট পিল ফ্যারাডেকে ৩০০ পাউণ্ড বাৎসরিক পেন্‌সন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে প্রথমে উহা লইতে রাজি হন নাই, কারণ তিনি বলিতেন যে স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা তাঁহার তখনও ছিল। শেষে বন্ধুবান্ধবদিগের উপরোধে তিনি রাজি হইয়াছিলেন। সার রবার্ট পিলের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লর্ড মেলবোর্ন প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। নূতন সচিব ফ্যারাডের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ফ্যারাডে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। লর্ড মেলবোর্ন ফ্যারাডেকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই—ফ্যারাডের স্বভাব

বালকের ন্যায় সরল হইলেও তাঁহার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দৃঢ়তা যথেষ্ট ছিল। প্রধান সচিবের কথাবার্ত্তায় ফ্যারাডে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন; লর্ড মেলবোর্ন কথাপ্রসঙ্গে খুব সম্ভবত বলিয়াছিলেন যে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকগণকে পেন্‌সন প্রদান করার প্রথাকে তিনি অর্থের অপব্যয় মনে করেন। ফ্যারাডে বাটী আসিয়াই লর্ড মেলবোর্নকে একখানি পত্র লিখেন—তাহাতে তিনি সেদিন-কার কথাবার্ত্তায় নিজের বিরক্তি জ্ঞাপন করেন এবং প্রস্তাবিত পেন্‌সন গ্রহণে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন। পরে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পান। ফ্যারাডে তাঁহাকে বলেন যে যদি লর্ড মেলবোর্ন তাঁহার কথাবার্ত্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন তাহা হইলে এ বিবাদ মিটিয়া যাইবে। লর্ড মেলবোর্ন এই সংবাদ পাইয়া আন্তরিক দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফ্যারাডেকে পত্র লিখেন এবং এইখানেই এই ব্যাপারের শেষ হয়। ফ্যারাডে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পেন্‌সন ভোগ করেন। এই ঘটনায় ফ্যারাডের উন্নত মনুষ্যত্বের পরিচয় বেশ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয়া মহামান্যা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স কন্‌সার্টের অনুরোধে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া হ্যাম্‌টন কোর্টে একখানি বাটী ফ্যারাডেকে বাস করিতে দেন। এই বাটীতে তিনি জীবনের শেষকাল অতিবাহিত করেন। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫এ আগষ্ট তারিখে সাতাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে বিনা আড়ম্বরে তাঁহার সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং একখানি সামান্য সমাধিফলকে তাঁহার শেষ বিশ্রাম স্থানের পরিচয় ঘোষিত হইতেছে। অদ্য এই উন্নতচেতা, বালকবৎ চিরসরল, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজের সমাধিফল-কের উপর সুদূর বিদেশবাসী একজন ভক্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

যোগাযোগ

মাটি বলে আমি মাটি জল আমি নয়,
জল বলে আমি বিনা মাটি কোথা রয়?
আমি যদি নাহি থাকি মাটি যাবে ফাটি,
গগনে উড়িবে ধূলা ধরা হবে মাটি।
জলযোগে ভোগে লাগে মাটি সবাকার,
ভোগ বিনা আর কিবা গুণ মৃত্তিকার?

জল বলে আমি কভু না হই অগুণ,
আগুনে নিভাতে পারি ধরি হেন গুণ।
অগ্নি বলে আমি যদি গোপন না হই,
সৃষ্টি মাঝে জল তুমি কোথা পাও থই?
মুহূর্ত্তে হইবে শূন্য এ মহা আকাশ,
দশদিকে যদি আমি হই হে প্রকাশ।

আপনারে রাখিয়াছি করি সঙ্গোপন,
তাই তুমি আছ জল হইয়া শোভন।
অগ্নি বলে, অগ্নি আমি, নহি আমি বায়ু,
আপনার তেজে আমি রাখি নিজ আয়ু।
বায়ু বলে নাহি যদি হই বহমান,
জ্বলিতে শকতি তব আছে কি শ্রীমান?
না জ্বলিলে আছ তুমি কেবা হেন বলে,
জ্বলিতে নারিবে যদি বায়ু নাহি চলে।
বুঝিয়া দেখিল তবে এ চারি জনায়,
যোগাযোগ বিনা তারা প্রকাশ না পায়।
কিন্তু যদি নাহি রহে আলো ও আঁধার
দেখিবে এ চারিজন অকূল পাথার।
আলো ও আঁধার দোঁহে সৃষ্টি করি কোলে,
অসীম শূন্যের পথে নিশিদিন দোলে।
দিনরাত যাতায়াত আঁধার আলোক,
ঘটাইছে যোগাযোগ দ্যুলোক ভূলোক,
সেথা আসি মিলাইল সসীমের বাঁধ,
সৃষ্টি করি যোগাযোগ অসীমের সাথ,
দৃষ্টি এবে নাহি যায় সৃষ্টি হ'ল থির
অন্তরে বাহিরে যোগ আনন্দ গম্ভীর।

শ্রীহেমলতা দেবী।

অন্তঃপুর কলাভবন

(সাপ্তাহিক সম্মিলনী)

কয়েক বৎসর হইল অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে মহিলাশিল্পসমিতি কর্তৃক অন্তঃপুর-কলাভবন নামে কলিকাতায় একটী শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহিলাশিল্পসমিতি শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই সমিতির অন্তর্গত হিন্দু বিধবাশ্রম তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এবং অন্তঃপুর-কলাভবনও তাঁহারই যত্ন ও উদ্যোগে স্থাপিত।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখন কাহারও মতভেদ নাই এবং তাহার আয়োজনও অনেক প্রকার হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে সকল বালিকা ও মহিলারা রীতিমত স্কুল কলেজে পড়িতেছেন তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এ শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য নহে, অন্তঃপুরমধ্যে কি প্রকারে সৎশিক্ষা প্রচলন হইতে পারে তাহাই আমাদের চেষ্টার বিষয়। অন্তঃপুর কলাভবনের দৈনিক ক্লাশে সাড়ে এগারটা হইতে সাড়ে তিন ঘটিকাকাল পর্য্যন্ত লেখাপড়া ও রীতিমত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং মহিলাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। যে সকল বালিকারা বিবাহের পর সাধারণ বিদ্যালয়ে যাইতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই ইহার বিশেষ উপযোগিতা। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা এরূপ অন্তঃপুরশিক্ষালয়েও আসিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বাড়ী বাড়ী শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার উদ্দেশ্যও সমিতির ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমে কয়েকটী রমণীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু এখন ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই কার্য্য হস্তে লওয়ায় শিল্পসমিতি ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে বলা আবশ্যক ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রবর্ত্তিকা শ্রীমতী সরলা দেবী এবং শিল্পসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী উভয়েই পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। বস্তুতঃ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতি নামক সমিতির দুইটী উদ্দেশ্যই দুই ভগিনীতে ভাগ করিয়া লইয়া তাহা সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে দুইটী উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করায় ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছে।

আমাদের কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতায় বাস্তবিক পক্ষে ভদ্রপরিবারের রমণীগণ নিরক্ষরা এখন কেহই নহেন। অথচ এই জন্যই স্ত্রীশিক্ষার উপর অনেক লোকের শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা বলেন একালের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা বেশ বিন্যাসে পটু, আমোদনিরতা, —থিয়েটার নবেলের পক্ষপাতী; আমাদের দিদিমাদের

মত গুণসকল তাঁহাদের নাই, দয়া ধর্ম্ম নাই, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাটা কি ঠিক? দেশকালভেদে অবস্থার-পরিবর্ত্তন ঘটে এবং শিক্ষাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে হয়। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আগে রেলগাড়ী ছিল না যাত্রীদের সদাসর্ব্বদা গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে হইত—তখন গৃহিণী রাত্রি দ্বিপ্রহরে উঠিয়া অতিথির পরিচর্য্যা করিতে বা আপনার অন্নের থালা অতিথিসেবায় দিয়া অনাহারে দিন কাটাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এখন তাহার দরকার নাই—তাই এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু রমণীহৃদয় এই দয়া প্রকাশের জন্য সেইরূপই প্রস্তুত আছে। নূতন অবস্থায় তাহা নূতন ভাবে শত দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইতেছে। অনেক নবীনা রমণী আপনার অলঙ্কার দেশের কার্য্যে দান করায় প্রবীণাগণ কর্ত্তৃক কত না তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। আর এই যে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস—ইঁহারা স্বদেশীয়া ভগিনীগণের উন্নতির জন্য, অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে শরীর মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার তুলনা কোথায়? শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী কলিকাতার স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকা। বস্তুতঃ রমণীরা অনেকস্থলে সুযোগাভাবেই হৃদয় বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন না। তাঁহাদের দোষী করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ সে সুযোগটুকু তাঁহাদিগকে দেওয়া চাই। সাধারণতঃ তাঁহারা যেটুকু অল্প লেখাপড়া জানেন তাহাতে বাজে নভেল পড়া ছাড়া আর কিছু কুলায় না। আমোদ-প্রিয়তা একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মের অবসরে আবশ্যক। গৃহে আমোদ পাইবার তাঁহাদের কি উপায় আছে? শিল্প বা সঙ্গীত কিছুতেই অধিকার নাই। এরূপ স্থলে থিয়েটারে যাওয়া ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর কি? এইরূপে নভেল পাঠ ও থিয়েটার যাওয়ার যে সুফল তাহা তাঁহাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা ত জানা কথাই। ইহার একমাত্র উপায় এমন কোন বন্দোবস্ত করা যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি সুপথে চালিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই অন্তঃপুরকলাভবনের সৃষ্টি। পূর্ব্বে ২৫নং লান্‌সডাউন রোড ও ৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রতি সপ্তাহে ইহার অধিবেশন হইত। নানা কারণে ইহার কার্য্য-কিছুকাল স্থগিত ছিল। এখন হইতে প্রতি শনিবার বিকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ৬নং নলিন সরকারের ষ্ট্রীটে মহিলাশ্রম বাটীতে ইহার অধিবেশন হইবে। কলিকাতার মহিলাগণ ইহাতে যোগ দিলে বিশেষ আপ্যায়িত হইব। এই সম্মিলনে কি ধনশালিনী কি কি গৃহস্থপত্নী কি শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা কি স্বদেশীয়া কি বিদেশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীগণের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়া মনের উৎকর্ষসাধন হইবে ইহার কার্য্যবিবরণ এইরূপ;—

১ম ঘণ্টা। যাঁহারা কোনরূপ শিল্প শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহাদের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। যাঁহারা তাহা না চাহেন তাঁহারা লাইব্রেরী গৃহে কোন পুস্তক পাঠ করিতে পারেন বা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন।

২য় ঘণ্টা। বিশুদ্ধ সঙ্গীত বা কোন শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের পাঠ এবং ধর্ম্মালোচনা।

শিল্পসমিতির একজন সদস্যা।

পরলোকগত হিউম

ভারতবাসী যদি ভারতমাতার সেবায় প্রাণপণ করেন, সেই সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া এবং সেই সংকল্প সাধনায় প্রাণপাত করেন, তবে তাহা প্রশংসাযোগ্য হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়, এ স্বদেশ-প্রীতি সহজসংস্কারের মত স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত ব্যবহারই নিন্দনীয়। মাতা সন্তানের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করেন, পত্নী স্বামীর জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য আত্মত্যাগ করেন, স্বদেশের উন্নতি কল্পে দেশবাসী নিয়ত চেষ্টা করিবেন ইহাই আমরা স্বভাবতঃ প্রত্যাশা করিয়া থাকি, ইহার ব্যত্যয়ে

আমাদিগকে পীড়া দেয়। কিন্তু বিদেশবাসী যখন ন্যায় সত্যের প্রীতিতে জীবনের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন করিয়া, অক্লান্ত চেষ্টায় অশ্রান্ত অধ্যবসায়ে বিদেশী ভ্রাতা-ভগিনীদের উন্নতিকল্পে তপশ্চর্য্যা করেন তখন এই নিঃস্বার্থ আত্মদান এই বিশ্বপ্রাণতায় আমরা বিমুগ্ধ হই, ভক্তিনম্র-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে অভিবাদন না করিয়া থাকিতে পারি না। এইজন্যই আর্য্যা নিবেদিতাকে এবং লর্ড রিপনকে স্মরণ করিয়া হৃদয় প্রীতিতে অভিষিক্ত হয় এবং স্বর্গগত আল্যান হিউমকে পূজনীয় জ্ঞান করি। মহোদয় হিউম ইণ্ডিয়ান সিভিলসার্ভিস লইয়া এদেশে আসেন, তাঁহার বুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চিরকালই আদর্শস্বরূপ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ সালের মে মাসে কয়েকজন পাঠান বিদ্রোহী যশোবন্ত নগরের হিন্দু-দেবমন্দির অধিকার করিয়াছিল, হিউম তখন এটাওয়ার তরুণ ম্যাজিষ্ট্রেট; সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ড্যানিয়েল এবং পাঁচজন রাজভক্ত সিপাহীর সাহায্যে তিনি এই দুর্দান্ত পাঠানদিগকে পরাভব করেন এবং তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই বিপদসঙ্কুল কাজে তাঁহাকে কতদূর সাহস ধৈর্য্য এবং বীরত্বের পরিচয় দিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জুনমাসে গোয়ালিয়ারে আবার যখন সিপাহী সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল তখন কর্ম্মচারীগণ সঙ্গে তাঁহাকে আগ্রা দুর্গে আশ্রয় লইতে হয় কিন্তু তাঁহার মানসিক এবং নৈতিকশক্তি এমনি প্রবল ছিল যে তাঁহার অনুপস্থিতি কালেও এটোয়াবাসিগণ বিদ্রোহীদিগের কোনরূপ সহায়তা করে নাই। ১৮৫৮ সালে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গিয়া দুইশত পদাতিক একশত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী, পাঁচটি কামান ও পঞ্চাশজন কামানচালক সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এই স্বল্পবল সহায়ে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। অসীম সাহস ও ধৈর্য্য বলে এই বিষম যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েন। তাহার ফলে সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারী না হইয়াও সম্মানসূচক কমাণ্ডার অব বাথ, C. B. পদবী অর্জ্জন করেন।



আল্যান হিউম

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সংকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ভারতহিতকর কার্য্যে জীবনের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন। এই কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় তাঁহাকে স্বদেশবাসীদিগের অপ্রীতি-ভাজন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এই স্বজন-

বিরাগ তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। তাঁহারি আগ্রহ এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতে জাতীয় মহাসমিতির জন্ম হয় এবং ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বুদ্ধিবিদ্যাশক্তিশালী পুরুষগণ একত্র হইয়া যে দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়া এই সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসরব্যাপী সাধনায় দেশের যে সকল মঙ্গললাভ হইয়াছে তাহা তাঁহারি আয়োজনের গুণে। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৯৩ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন, অতদূরে থাকিয়াও তাঁহার ভারতের হিত সাধনা একদিনের জন্যও শিথিল হয় নাই। ভারতবাসী আজ যে সকল রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়াছে, ভবিষ্যতে আরো যাহা লাভ করিবার আশা রাখে তাহা তাঁহারি যত্নের সুফল। বিজেতার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিজিতের জন্য এমন সহানুভূতি, এমন জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিশ্চল ন্যায়বুদ্ধি অতি অল্প মানবেরই দেখা যায়। দুর্ব্বলের সহায়তায়, প্রবলের অত্যাচার দমনে, ন্যায় প্রসারে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর ছিলেন। মানবের চিরন্তন যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবুদ্ধি যাহা দেশকালজাতি নিরপেক্ষ, যাহা করুণা, ন্যায় এবং উদারতায় সুপ্রতিষ্ঠিত, এই বিদেশী ভারতপ্রেমিকের মন তাহা দ্বারাই চিরদিন অনুপ্রাণিত ছিল। আজ তাই শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক ব্যথিত—এবং এমন সহৃদয় বন্ধুর অভাবে নিতান্ত নিঃসহায়। ভারতবাসী, আজি এই পরম হিতৈষী বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহার প্রতি কথঞ্চিৎ প্রীতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করুন, ইহাই আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা।

বরষা

ঘন বিরচিত চিকুর গুচ্ছ
লুণ্ঠিত হের চরণে,
নবীন-শষ্প-হরিতাঞ্চল
দুলিছে মুক্ত পবনে।
বিদ্যুৎ দ্যুতি খেলিছে অঙ্গে,
ঈষৎ দৃষ্টি ললিতাপাঙ্গে,
ইন্দ্র চাপের মুকুট শীর্ষে,
হাস্য-মুখর বদনে,
হের আজি ঐ বর্ষা এসেছে,
তাহারি বঙ্গ ভবনে।

দর্দ্দুর-রব-মঞ্জির বাজে
শ্রীপাদপদ্মে হরষে,
স্বচ্ছ মুকুরে শোভে বরাঙ্গ
পদ্মখচিত সরসে।
গুরুনিতম্বে পদ্মা মেখলা,
কণ্ঠে জড়িত বলাকার মালা,
নাচে গৌরবে মত্তা শিখিনী,
কর বল্লরী পরশে,
খেলে কুরঙ্গ চুম্বিয়া চারু,
চরণাম্বুজ রভসে।

ঘন অঞ্জন আঁখিপল্লবে,
স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী,
সন্ধ্যা মণির-রাগ-রঞ্জিত,
কর পল্লব দু'খানি।
জলদ ঢালিছে শীতল অম্বু,
বাজে গুরু গুরু আহ্বান কম্বু,
দিক্ তরুণীর কণ্ঠে ধ্বনিছে,
মেঘমল্লার রাগিনী,
ভূধর শৃঙ্গে হেলায়ে অঙ্গ,
দাঁড়াইয়া প্রিয় ভাগিনী।

বিজড়িত কিবা কুন্তল জালে,
শেফালী কুন্দ কেতকী,
সজল পঙ্কে পরশে বক্ষ,
তৃষিত কণ্ঠে চাতকী;
যূথি-পরিমল-নিশ্বাস-বায়
সুপ্ত-হৃদয় জাগি উঠে হায়,
লোধ্র পরাগে অরুণ কপোল,
বিভূষিতা দিবা যামিনী,
দিয়াছে জড়ায়ে ধারা-কঞ্চুক
অঙ্গে রূপসী কামিনী,

মুগ্ধ নেত্র অবশ অঙ্গ
নিখিল বিশ্ব পুলকে,
হেরিতেছে অই বরবর্ণিনী,
দুর্লভ এই ভূলোকে।
স্বর্ণ বীণার মূর্চ্ছনা তার,
অযুত কর্ণে পশে অনিবার,
এসেছে তন্বী বরষের পরে,—
তুষার শুভ্র বরণী;
আদরে তাহারে লতেছে বরিয়া,
পুলকাঙ্কিতা ধরণী।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



গোকল ব্রত

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

৯

মনীশ নিজের গ্রামে আসিয়া বসিতে দেশের দশজনে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই নিরীহ স্বভাব যুবকটিকে সকলেই একটু স্নেহ করিত। তারপর সে যখন একটি পাঠশালা খুলিয়া যত রাজ্যের অকেজো হতভাগা ছেলেগুলকে জড় করিয়া তাহাদের অনাসৃষ্টি অত্যাচার হইতে বাড়ী, পাড়া এবং রাস্তাটাকে সুদ্ধ ঘণ্টা দুই করিয়া নিরুপদ্রব করিতে লাগিল তখন তো মনীশ বা তাহার খুড়াখুড়ির সম্মানের দায়ে পথ চলা ভার হইয়া উঠিল। বাগদি বউএর চাল হইতে ছাঁচি কুমড়া ও দুলে গিন্নির লাউডগা প্রভৃতি বিচিত্র সওগাদও ক্রমে তাঁহাদের ভাণ্ডারের চাঙ্গারিতে উঠিতে আরম্ভ হইল। বারণ করিলেও কেহ শুনে না, হাত-যোড় করিয়া বলে, তেনার নাম লিয়ে এনেচি ওকি আর খদকুড়ে ফেলতে পারি, দেবতার দৃষ্টি করিয়ে দিও!"

খুড়িমা হাসিয়া মনীশকে ডাকিয়া বলেন 'ও মনী তুই যে দেখতে দেখতে একেবারে দেবতা হয়ে উঠলিরে, দেখিস বাছা দেবতার মা হতে আমার সাহস নেই, তাদের মায়া দয়া থাকে না।"

মনীশ হাসিয়া চলিয়া যায়। রাস্তাঘাটে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের ধূমে কর্ণমূল লাল করিয়া সে বিব্রত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভাবে এ রকম করিলে পাঠশালা চালান তো দায় হইবে।

কেবল সত্য বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে। ছিপ বড়সি সব মজুদ অথচ দাদার জন্য মাছ ধরা বন্ধ, বোতল চুরের মামজা দেওয়া নাটাই ভরা সুতা ঘরের কোনে পড়িয়া,—রাখাল বিষ্ণু পা টিপিয়া টিপিয়া দিনের মধ্যে সাতবার জানালায় উঁকি দিয়া দ্বারে টোকা মারিয়া যাইতেছে। দূর হইতে কত রকম সাঙ্কেতিক শৃগাল কুকুরের ডাক শোনা যাইতেছে এমন কি স্বয়ং গৌরী দু দুবার আসিয়া মলের চঞ্চল রবে কক্ষ মুখর ও কক্ষাধিকারীর বক্ষতলে একটা চঞ্চলতর নিক্কন প্রতিধ্বনিত করিয়া দিয়া গেল, তথাপি ছুটী নাই। দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় সে বইগুলা আছড়াইয়া কলমটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মনের দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে! আর মনীশ তাহার সম্মুখে নিজের চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া নীরবে হাসে। বরং সে রাগ করিলে, বকিলে ব্যাপারটা ইহাপেক্ষা সহজ হইত, কিন্তু তাহার এই নিতান্ত নির্লিপ্ততায় সত্যর মনে আর কিছুমাত্র আশা জাগিতে পায় না। সে সক্রোধে কাগজের উপরে পেন্সিল

বুলাইয়া নিঃশব্দে জলিতে জলিতে ইংরাজী তরজমা করিয়া যায়।

সন্ধ্যার পর সায়াহ্নকৃত্য সমাধা করিয়া কিছুক্ষণ সত্যকে পড়াইবার পর দুই ভাই শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া পাশাপাশি বসিত। আলো অন্ধকার পাশাপাশি দাঁড়াইলে যেমন পরস্পরের অনৈক্য প্রকাশ পায় এই দুই ভায়ের মধ্যেও সেই রকম একটা প্রকাণ্ড অমিল ছিল। মনীশ যেমনি শান্ত সংযত স্বভাব, সত্য ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহাদের তখন যে সমস্ত আলোচনা হইত তাহার মধ্যে সত্যকে শিক্ষা দিবার চেষ্টাই অধিক, কাজেই সেগুলার রস তাহার নিকটে তিক্ততর হইয়া উঠিত। শিবনারায়ণ যখন তাহাকে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অথবা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ প্রভৃতি সৌরজগতের মানবাবিষ্কৃত জ্ঞান সমূহ গিলাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন সে তখন কেমন করিয়া দাদাকে ফাঁকি দিয়া গৌরী প্রভৃতি সঙ্গীদের সঙ্গে হল্লা করিতে যাইবে তাহারি বিবিধ কৌশল উদ্‌ভাবনে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিত। ইহার উপর আবার আজকাল বাগানের গাছে নারকেলি কুল ডাঁসিয়া উঠিয়াছে, কাজেই তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না।

মনীশ প্রাচ্য-বিজ্ঞান নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীনকালের বহুদর্শী বৈজ্ঞানিক ঋষিগণের গভীর জ্ঞানবিজ্ঞানের কতটুকু এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহাই সে তুলনায় প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছিল। বাস্তবিকই যেন একজন জ্ঞানসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন এবং অন্যে তাহার তীরে বসিয়া উপল কুড়াইতেছে। মনে করিতে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিত, কোথা হইতে আজ তাহারা কোথায় নামিয়াছে!

মনীশ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া এই পুস্তকখানির রচনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। জগতে যদি কোন কিছু তাহার নিজের জন্য প্রার্থিত থাকে তবে তাহা এই লেখক নামটুকুই।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের আসনই যে প্রতিভার আসন ইহা সে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিত।

এমনি করিয়া প্রায় বৎসর কাটিয়া গেল মনীশের সযত্নলিখিত পুস্তক সমাপ্ত হইয়া আসিল। সত্য দায়ে পড়িয়া যতটুকু সম্ভব পড়ায় মন দিয়াছিল কিন্তু তাহার দাদা তাহাতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

এই সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধা গৃহিণী অল্পে অল্পে ভঙ্গস্বাস্থ্য হইয়া এবার সম্পূর্ণরূপে শয্যাশ্রিতা হইয়াছেন। বড়বধূই এখন বাড়ীর গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা। দেশের রাজা পরিবর্ত্তনের সহিত সংসারে গৃহিণী পরিবর্ত্তনের বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না, তেমনি বিদ্রোহ বিপ্লব সকলি ঘটিতে থাকে। কখনও কখনও ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। এ বাড়ীর নূতন গৃহিণীটি পুরাতনের সঙ্গে এপিট ওপিঠ বিভিন্ন! একজন সুনম্র স্নেহশীল অন্যজন কঠোর রুক্ষস্বভাব। দাসী চাকররা ঠাণ্ডা মেজাজের মুনিবের চেয়ে কড়া হাতে অনেকটা ঢিট থাকে কিন্তু আড়ালে রাজার মাকেও যখন ডাইন বলা চলে তখন ঘাটে বাগানে ভট্টাচার্য্য বধূর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা কেনই বা না চলিতে পারিবে? আর জন্ম

হইয়াছিল গৌরী। বড়মামী তাহাকে কোনদিন যদিও শুভদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই তবু এতদিন দিদিমার সহায়তায় এবাড়ীতে তাহার কতকটা জোর ছিল ; কিন্তু এখন নব-গৃহিণী তাঁহার নূতন অধিকার হাতে পাইবামাত্র সকল কার্য্যের প্রথমে এই বুড়টে কি মেয়েকে শোধরাইয়া তুলিবার মহাভার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "কেবল খেয়ে খেয়ে যে মেয়ে দিন দিন হাতি হচ্চেন ! সংসারের একটি কুটি ভেঙ্গে দুখান করেন না এ ধিঙ্গি মেয়ে নিয়ে ভুগতে তো হবে আমাকেই, লোকের কি, লোকে কেন আদর দেবে না ?"

ননদকে কহিলেন "তোমাকেও বলি ঠাকুরঝি, অসৈরণ দেখে না বল্লেও থাকতে পারিনে, এ কি রকম শিক্ষা তুমি দিচ্চো ? অত-বড় মাগী যে দিনরাত ছিপ ঘাড়ে করে গাঙ্গুলী-দের ছেলেটার সঙ্গে নেচে বেড়ায়, ঘরকরণার একটা কাজে নেই কর্ম্মে নেই এই কি ভাল হচ্চে ? শ্বশুরঘরে গেলে তারা অমন বউকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় যদি না করে তো আমি কি বলেছি।"

বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতি বিশিষ্ট, তিনি ভ্রাতৃজায়াকে একটি উত্তর করিলেন না, সরিয়া আসিয়া গৌরীকে ডাকি-লেন। 'রাণু!"

গৌরী তাহার মুক্তবেণী দোলাইয়া ছুটিয়া আসিল "কি মাসিমা ?"

"পানগুলো সেজে রাখগে না মা !

"হুঁঃ হুঁঃ, এক্ষণি ! এখন যে আমি সত্যদের বাড়ী যাচ্চি মাসিমা !"

বিন্ধ্যবাসিনী এবার রাগ করিবার চেষ্টা করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন "ফের দুষ্টুমি ! খপরদার তুমি সত্যদের ওদিকে যাবে না, যা পান সাজ্ গে।"

গৌরী ঈষৎ ভীতনেত্রে মাসিমার মুখের দিকে চাহিল, যাহাদের সহজে রাগিতে দেখা যায় না, তাহারা যখন রাগ করে তখন লোকের শীঘ্রই ভয় পাইতে হয়। তাহার মুখখানি ছোট হইয়া গেল, প্রকৃতিসিদ্ধ আব্দারের ভাব ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তটস্থভাবে ভাণ্ডারের দিকে চলিয়া গেল, যাইবার সময় একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস হয়ত তাহার নিজেরও অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র একটি মাতৃ-হারা পিতৃত্যক্তা শিশুর ক্ষুব্ধ চিত্তের একটুখানি ভার মাত্র এই বাতাসটুকুতে মিশ্রিত ছিল, কিন্তু ইহা তাহার মাসির বক্ষে যেন তপ্ত শেলের মত বিঁধিল। এই বনবিহঙ্গিনীকে কেমন করিয়া তিনি খাঁচায় পুরিয়া রাখিবেন, লোহার শিকলদিয়া চঞ্চল হরিণশিশুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইতে পারে কিন্তু তাহার সুদূর পলায়িত মনের অনুসরণ করিতে পারিবে কে ? বিন্ধ্যবাসিনী জোর করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন, মনে করিলেন, বা এত কি মায়া ! সত্য সত্যই কি শেষে আমি মেয়েটার স্বভাব আদর দিয়া বিগড়াইয়া দিব নাকি ? তিনি কঠিন ভাবে তাহার সম্মুখ দিয়া গিয়া জলন্ত উনানে ডালের হাঁড়ি চাপাইয়া দিলেন, গৌরীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। বড়বধূ একটু পরেই রোরুদ্যমান ছেলেকে নাচাইতে নাচাইতে আসিয়া রান্না-ঘরের দ্বারের ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া কহিলেন "দুধ জ্বাল হলোগো ? ছেলেটাতো আর না খেয়ে থাকতে পারেনা, কেঁদে কেঁদে পাগল করে দিলে।"

বিন্ধ্যাবাসিনী থতমত খাইয়া গেল, চমকিয়া উঠিয়া কহিল "এই ভাই উনন পেড়ে এক্ষণি দুধ গরম করে দিলুম বলে। আহা কাঁদবেই তো, এমনি পোড়া মন হয়েছে! ওমা গয়লাবৌ এখনও দুধ দ্যায়নি যে, দেখেচ একবার আক্কেল!"

"আক্কেল সবারি সমান! হতভাগা ছেলে চুপকরে থাক্! কে তোকে সাত সকালে খেতে দেবেরে বাঁদর! এই বলিয়া ছেলেটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়া পুত্রের জননী চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালেও ননদকে একটু বিঁধাইয়া যাইতে ভুলিলেন না, কহিলেন "গয়লাবৌকে সকাল করে দুধ দিতে বল্লে কি আর দেয় না, বলে কে! এত আর কারু আদরের রাণী নয়, মরলেই কি তরলেই কি?"

শিশু পঞ্চমের সুর সপ্তমে চড়াইয়া তুলিল, অপ্রতিভ বিন্ধ্যবাসিনী তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া শিশুকে কুলুঙ্গি হইতে একখানা বাতাসা পাড়িয়া দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঠাকুরদের রান্না রাঁধিতে রাঁধিতে আকাচা জামাসুদ্ধ ছেলেকে ছুঁইতে পারেন না, অগত্যা ডাকিলেন 'রাণী!'

গৌরী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া দেখিয়া বিন্ধ্য কহিলেন 'খোকাকে একবার নে' তো মা, পান সাজা হয়েচে?"

"সব হয়নি।" বলিয়া গৌরী তাহার অঙ্গুলিলিপ্ত খদিরের ছাপ আঁচলে তুলিয়া ক্ষীণ দুটি হাতে পরিপুষ্টশরীর শিশুটিকে একটু কষ্ট করিয়া উঠাইয়া লইল, তখন তাহার মুখে আর বিষাদের কোন চিহ্নই ছিল না, সে আচমকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিন্ধ্যবাসিনী ডাল সাঁতলাইয়া কাঁসিতে ঢালিয়া রাখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরে?" এতক্ষণে তাঁহার বুকের বোঝা যেন এই সরল হাস্যস্রোতে ভাসিয়া গেল। গৌরী হাসিতে উচ্ছসিত হইয়া কহিল 'খোকা কি রকম ভারী মাসিমা, দাদু যেমন গন্ধমাদন তোলার গল্প বলেন, আমি ওকে ঠিক তেমনি করে মাটি থেকে তুললুম।" —বলিতে বলিতে উপমেয় বস্তুটাকে স্মরণ করিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল। বিন্ধ্যবাসিনী কিন্তু এতবড় একটা কবিত্ব পূর্ণ উপমার মধ্যে হাস্যরসাপেক্ষা এমন কোন একটা রসাস্বাদ পাইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহাকে একবার চকিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে হইল, পরে স্বর খাটো করিয়া কহিলেন "ওকথা বলতে আছে!"

"কেন থাকবে না, আমার পাথরের ছেলে শানে আছড়ালেও মরে না, যে যত পারেন 'খুড়ুন', চক্ষু থাকে কেন? ওমা একেই বলে গো মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্ষস, হায়রে আমার কপাল! এই মেয়ে আমি ভাল করবো!"

বড়বধূ এই সময় তৈলভাণ্ড লইয়া রন্ধনের জন্য তেল দিতে আসিতেছিলেন, এই কথা বলিয়াই স্তম্ভিত গৌরীর কোল হইতে ছেলে ছিনাইয়া লইয়া ননদকে লক্ষ্য করিয়া—'ওগো বেন্ন নে অতকরে তেল না ঢেলে একটু দরদ করে রেঁধো, একটা মানুষের হাড়ে নৈলে আর কতো হয়—বলিয়াই গমনোদ্যত হইলেন। গৌরী দৌড়াইয়া গিয়া ক্রন্দনপরায়ণ

শিশুর হাত ধরিল, বিষণ্ণ মুখে কহিল "মামিমা আমার দোষ হয়েচে, আমায় ওকে দাও।"

বড়বধূ মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন "রক্ষা কর বাছা ,ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ! যাও তুমি খেয়ে দেয়ে সত্যর সঙ্গে খেলতে যাও, নবাবের কন্যে নবাবের বধূ হবে! তারা যদি না তোমায় থ্যাংরা মেরে বিদায় না করে ত আমার নামই মিথ্যে!"

গৃহিণীপনার সমুদয় অধিকারটুকু দুইটি অসহায় প্রাণীর উপরে প্রয়োগ করিয়া নূতন গৃহিণী দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার শরীর ভাল নয়, দুইবার ভাঁড়ার বাহির করিয়া দেওয়া, শ্বশুরের আহার কালে একবার পাখা হাতে করিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিয়া শাশুড়ির রোগবৃদ্ধির জন্য হাহুতাশ করা ও ভক্তিনাথকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া তাঁহার মায়ের গায়ে একবার হাত বুলাইয়া আসা ভিন্ন তাঁহার উপর হইতে নামা বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কেনই বা ঘটিবে! এ বাড়ীর তিনি এখন গৃহিণী গৃহিণীতো আর সকলের সঙ্গে সমান হইতে পারে না? আর কচি-কাচার মা কাজেই শ্বশুরের আহারের পরেই আহার করিয়া একটু নিদ্রা দিবার প্রয়োজন আছে। শরীর অসুস্থ অগত্যাই বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় থাকা দরকার। মধ্যে মধ্যে অবুঝ ভক্তিনাথ তাঁহার এই একাধিপত্য অধিকারের সীমানায় আসিয়া ঈষৎ গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন গৃহস্থের বাড়ীর বড় বউ কোথায় পাঁচজনকে যত্ন আদর করিবে সকলকে কাছে বসিয়া খাওয়াইবে, তাহা না করিয়া তুমি সর্ব্বদা নিজেকে লইয়াই বিব্রত ইহা তোমার পক্ষে উচিত হয় না। তাছাড়া এইসব বিলাসিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে কেন? ছেলেদের ছিটের দোলাই তো বেশ ছিল, জর্ম্মানি র‍্যাপার কিনিবার কি আবশ্যক! পায়ে বিলাতি জুতা হইবে না, গায়ে সকল সময় গেঞ্জি কামিজ বাবুলোকেই পরে, এ সকল ঢঙ্ ভট্টাচার্য্য গৃহের সন্তানের জন্য নয়। সাদা সিধা কাপড় ছাড়িয়া এখন হইতে রঙ্‌চঙ্গে পোষাক পরা অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে আদর্শ খারাপ হইয়া যাইবে, তাহাতে ত্যাগ-শীলতা সংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ হারাইয়া নিতান্ত সাধারণ প্রবৃত্তি হইয়া পড়িবে। তুমি নিজে যেরূপ ইচ্ছা চলিতে পারো কিন্তু ছেলেদের আমাদের বংশের মত হইতে দাও। দোহাই তোমার উহাদের পরকাল খাইওনা।"

এই সকল উপদেশ বড়বধূ উপেক্ষা করিয়া ঝিকে দিয়া বাজার হইতে বিলাতি ছিটের পেনিফোর কিনিয়া আনিয়া ছেলে সাজাইতে ত্রুটি করিতেন না। মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে ইহা লইয়া তুমুল বাক্ বিতণ্ডা হইয়া যাইত। মোটের উপর সংসারটা বেশ সুখে চলিতেছিল না।

সেদিন আঘাতটা একটু গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর অনেক সহ্য করা অভ্যাস থাকিলেও আজ কেমন তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। মা মরা মেয়ে, জগতে আসিয়া কিছুই যে পায় নাই, সংসারের একটি প্রান্তে এতটুকু একটু স্থান লইয়া এক পাশে পড়িয়া আছে, তাহাকে লইয়া এত মাথা ব্যথা লোকের কেন হয়? পাঁচ বছরের একটি শিশু যেটুকু বোঝে সেটুকু বুদ্ধিও যাহার মাথায় নাই, সেই নির্ব্বোধ মেয়েকে ইহারি মধ্যে অতখানি

তিনি কেমন করিয়াই বা বুঝাইবেন। হায় হায় কেমন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী প্রাণ ধরিয়া তাহার এই নিরপরাধে অপরাধক্ষুণ্ণ শুষ্ক মুখ অবিচলিত চিত্তে দেখিবেন! কেমন করিয়া এই ফুলটির মত ছোট্ট সরল সরস হৃদয়-টুকুকে শাসনের নাগ পাশ দিয়া আড়াগোড়া করিবেন, ইহাকে বাঁধিতে হাত উঠে কি?

ঘণ্টের জন্য মোচাগুলি হাঁড়ির মধ্যে ঢালিয়া দিয়া মুখখানা যথাসাধ্য ভারী করিয়া বিন্ধ্য কহিলেন ‘যা খোকার দুধ দিয়ে আয়।” আজ্ঞা পালিত হইলে পুনশ্চ কঠিন স্বরে আদেশ করিলেন ‘বাসনগুলো ধুয়ে রাখ, আর দেখ আজ থেকে তুই বাড়ী থেকে এক পা নড়তে পাবিনি, এই বলে রাখলুম, যদি না শুনিস তা হলে—”

বিন্ধ্যবাসিনী কথাটা অসমাপ্তই রাখিয়া দিলেন। ‘তাহলে’ তাঁহার দ্বারা আর যে কিছু হয় এমনও বোধ হয় না। এই শাসনের ছলটুকুই তাঁহার অপরিসীম স্নেহের নিকটে যথেষ্ট অপরাধী হইয়া উঠিতেছে। গৌরী বাসন ধুইতে ধুইতে হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, “ও মাসিমা, ও মাসিমা ভারী একটা মজা হয়েচে, মঙ্গলা গাইটা দড়িছিঁড়ে পালিয়ে এসে তোমার সব বড়িগুলো খেয়ে ফেল্লে।” বলিতে বলিতে সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, “কি রকম করে খেয়ে নিচ্চে দেখ!”

বিন্ধ্যবাসিনী সবেগে বেড়ি আছড়াইয়া ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন, গরু তাড়াইয়া অবশিষ্ট বড়ি উদ্ধার করিয়া আনিয়া সক্রোধে কহিলেন “হতভাগা মেয়ে তোমার সব তাতেই হাসি, বউ কি বলবেন বল দেখি।”

দুপুর বেলা কাজ কর্ম্ম করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী রুগ্ন মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া একটু বেলা পড়িতেই গৃহকার্য্যের জন্য উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। মার কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিলে আর কাছ ছাড়া হইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু কি করিবেন ঠাকুর দেবতা আছেন, বাপ ভাই আছেন—সমস্তই তো দেখা চাই। গৌরী অন্য কোন কাজেই মন লাগাইতে পারে না, কিন্তু দিদিমার সেবা সে অনন্যচিত্তে খুব যত্নের সঙ্গেই করিতে পারে। এই একটি মাত্র স্থানে তাহার ঘুমন্ত নারীমহিমা অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে দিদিমাকে পাখা করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে পাখা নামাইয়া কচি হাতখানি তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে আস্তে আস্তে বুলাইতেছিল গভীর বিষাদের একটি ছায়া তাহার অকারণ হাস্যে উৎফুল্ল মুখখানিকে এখন যেন প্রৌঢ়ার মুখের মত গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। চোখে অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেবলি একটা জলের আভাষ ভাসিয়া উঠিয়াছে।

রোগী কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাইয়াছিলেন ঘুম ভাঙ্গিতেই পাশ ফিরিয়া হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন “কে’রে শচী এলি?” উত্তর হইল ‘না দিদিমা আমি।” “আমার রাণীদিদি! কতক্ষণ ধরে তুমি হাওয়া করচো, রেখে দাও হাত ব্যথা করবে যে!” দৃঢ়স্বরে “না” বলিয়া গৌরী আরও জোরের সঙ্গে পাখা চালাইয়া জানাইতে চাহিল তাহার হাত অত দুর্ব্বল নয়।

কিছুক্ষণ পরে আবার গঙ্গামণি একটা গভীর ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-গত কহিলেন “বাবা শচী!” গৌরীর মত বুদ্ধিলেশহীন শিশুও তাঁহার সেই সুগভীর

ব্যথা যেন অনুভব করিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ কহিল ছোট মামাকে আসতে লেখাও না কেন দিদিমা ?" গঙ্গামণি সহসা ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন, আবার নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "সে সুখে আছে থাক, কেন তাকে আমার জন্য কষ্ট দোব দিদি ? সে যদি আপনি একবার আসতো, দেখে যেতুম।"

"দিদিমা, ছোটমামা তোমাদের কাছে আসে না কিছুই না, তবু তুমি তাকে কত ভালবাস ?" গঙ্গামণি দুই কালিমালিপ্ত নেত্র বিস্তার করিয়া চাহিলেন, যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিবর্ণ অধরে ঈষৎ হাসি বিষাদের রেখা ফুটাইয়া তুলিল, ক্ষীণস্বরে কহিলেন "যদি কখনও মা হোস্ রাণী, তবে মায়ের মন বুঝবি। এতবড় যন্ত্রণা জগতে মা হওয়ার মত আর নেই রে !"

মনীশের খুড়িমা প্রতিদিনই প্রায় গঙ্গামণিকে দেখিতে আসিতেন। আজ আসিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, কারণ আজ মনীশের জন্মতিথি, পাঁচজন লোককে সেই উপলক্ষ্য করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কাজেই আহারাদি শেষ হইতে বেলা গিয়াছে। দয়াময়ী আসিয়া গৌরীকে ছুটী দিয়া পাখা লইয়া বসিলেন। কথায় কথায় তিনি কহিলেন, আগামী চৈত্রে পূর্ণগ্রাসী সূর্য্য গ্রহণ হইবে শোনা গিয়াছে, কাশী যাইতে পারিলে বেশ হইত। শুনিয়া গঙ্গামণি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন তারপর সহসা একটু উৎসুকভাবে মাথা ফিরাইয়া কহিয়া উঠিলেন, আমাকেও তোমরা অমনি বিশ্বনাথের পাদপদ্মে রেখে এসো। যদিও জানি আমারই ঘরে প্রত্যক্ষ বিশ্বনাথ অধিষ্ঠান করে আছেন, তাঁর পায়ের ধূলোই আমার গয়া গঙ্গা, কাশী; তবু মা, মানুষের মন যে বড় বিশ্রী জিনিষ সে কেবলি লোভ বাড়ায়।"

দয়াময়ী চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু মুমূর্ষুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠিল।

গৌরী বাহিরে আসিতেই বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া প্রদীপের সলিতা তৈরি করিতে বসাইলেন। তখনি জানালার বাহির দিক হইতে একটা শব্দ উঠিল "গৌ গাবো গাবঃ—"

"ঐ সত্য !" বলিয়াই সদ্য বিকশিত প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখে বালিকা তৎক্ষণাৎ হাতের সলিতা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিন্ধ্যবাসিনী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিলেন 'খবরদার যাস্‌নে, সারাদিন কি শেখালুম ?"

"না মাসিমা সে আমি পারবো না ! কেন তুমি আমায় খেল্‌তে দেবে না, খালি খালি কাজ করাবে ?"

বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষে এই তীব্র তিরস্কার আঘাত করিল, তথাপি একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন "এখন বড় হচ্চো, যার তার সঙ্গে কি খেলে ? ঘরে বসে পুতুল খেলো।"

মাথা নাড়িয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বিদ্রোহী গৌরী ঝঙ্কার করিয়া কহিল "এক্ষুণি এক্ষুণি আমি এত কি বড় হয়ে গেলুম বা—রে ! আর সত্য বুঝি যে সে হলো ! খুব বিজ্ঞে হচ্চে তোমার ! ও আমাকে কত ভালবাসে, সব ভাল পেয়ারা কুল বেচে বেচে আমায় দেয় আমি ওর সঙ্গে একটু খেলা করতে পাবোনা বৈকি, আমি যাবোই। আমি ওকে খু—ব ভালবাসি।

ক্রমশঃ

খর্জ্জুর ও পাট

গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে বিঘা প্রতি পাট ও ধান্যের আয় সম্বন্ধে একটা হিসাবকিতাব লইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা মফঃস্বলের জমিদারদিগের নিকট হইতে জানিতে চাহেন যে পাটে বেশী আয় না ধানে বেশী আয়। এ ধানের অর্থ আশু ধান বা আউস ধান। কারণ পাটের জমিতে আউস ধান ভিন্ন অন্য ধান হয় না। তাই সেবার স্বদেশী মাসিক পত্রে আমি 'পাট ও ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া ছিলাম যে পাটের জমির পাইট, সার, টাকায় ২টা করিয়া মজুর এবং পাট কাচার পর ক্ষেতওয়ালার চিকিৎসা খরচ ধরিলে তাহার কিছুই লাভ থাকে না। চিকিৎসার কথা বলিলাম কেন, না পচা জলে পাট কাচার পর কৃষাণকে নিশ্চয়ই একটা না একটা রোগ ভোগ করিতে হয় ইহা আমাদের নিত্য পরীক্ষিত। বিশেষতঃ ধান বাঁধা ফসল হয়ত ২৫ বৎসর পরেও গৃহস্থের সমূহ উপকারে আসে আর এক বৎসর পাটের দর না উঠিলে দ্বিতীয় বর্ষে পাটের কোন দরই প্রায় থাকে না।

যাই হউক বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি দেখাইব যে পাট আসিয়া নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও চব্বিশপরগণা জেলার একটা দুর্লভ ফসল—গৌরবের জিনিষ ধ্বংস করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ কৃষাণকে যাদু করিয়া ফেলিতেছে।

খেজুর গুড়ের সুমিষ্ট আস্বাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে কার না লালসা হয়? এই খেজুর গুড়ের জন্মস্থান খুলনা, যশোহর নদীয়া ও চব্বিশপরগণার কতক অংশ। [illegible] সভার মাসিক পত্র সাহিত্যসংহিতায় একবার 'আমাদের ইচ্ছামতী' শীর্ষক কবিতার একস্থানে লিখিয়াছিলাম

> "বল কোথা অষ্ট বক্র খর্জ্জুর হরষে—
> প্রদানিছে সুধা নীর নিজ কণ্ঠ চিরে;
> ওগো এস দেখে যাও সাধ থাকে যদি—
> আমাদের কাক চক্ষু ইছামতী তীরে।"

একদিন সেই অষ্টবক্র খেজুরগাছ পঙ্গপালের ন্যায় মধ্যবঙ্গের সরস মাঠ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলই বা কেন? আবার সেই ৬০।৭০ বৎসরের আওলাত এক্ষণে বাঙ্গালার মাঠ হইতে অন্তর্ধ্যান হইতেছেই বা কেন?

যখন এদেশের কৃষাণ পাট চিনিত না, ডাঙ্গার জমীতে আউস ধান বুনিত, ললিতা কুণ্ডের বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা আসিয়া সমগ্র মাঠ ডুবিয়া যাইত। কৃষাণ আধ পাকা আউস ধান্য কাটিয়া মনে ভাবিত এই পলিপড়া উর্ব্বর জমিতে রবিশস্যের সহিত আর কোন আবাদ লাগান যায় কি না?

শেষে তাহারা হরিতের সহিত ডাঙ্গার জমিতে খেজুরের আঁটি পুঁতিয়া দিত। খেজুর বীজ খুব ফাঁক ফাঁক করিয়া পুঁতিতে হয়। যে জমিতে খেজুর চারা লাগান হয় সেই জমীতে আউস ধান ও রবিশস্যের আবাদের কোন ব্যাঘাত হয় না; কারণ খেজুর, তাল সুপারি ও নারিকেল এক জাতীয় গাছ। তাল ও নারিকেল হইতে খেজুরের শিকড় সরু ও স্বল্পবিস্তৃত। খেজুর গাছ যত দীর্ঘ ও আয়কর হইয়া সাবালক হইতে থাকে ততই আওতা কমিয়া যায়। ইহার সামান্য আওতাতেও যেটুকু ক্ষতি হইবার কথা বানের [illegible] তাহা পূর্ব্বে নিবারিত হইত। খেজুর

গাছ ছাগল গরুতেও কম খায়, বিশেষতঃ গাছ দুই বৎসরের হইলে হোলি বৃক্ষের ন্যায় তাহার কণ্টকময় পত্রের নিকট কোন পশুই অগ্রসর হয় না, কাজে কাজেই খেজুরের আবাদ করিয়া কৃষাণকে আর পাড়াপড়সীর গরুছাগল ধরা পাগ্‌ড়া করার জন্য অনর্থক বিবাদের সৃষ্টিপাত করিতে হয় না।

এই প্রকারে অতীতকালে কৃষকগণ ডাঙ্গার জমিতে খেজুরগাছ লাগাইয়া ৬।৭ বৎসর উত্তমরূপ হরিৎ ও আশু ধান্য উৎপন্ন করিয়া লইত। খেজুর গাছ ৬।৭ বৎসরের মধ্যে সাবালক অর্থাৎ কণ্ঠ চিরিয়া সুমিষ্ট রস দিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে। এই গাছ সাবালক হইলে সেই জমিতে কৃষক প্রথম ভাদ্রে কলাই ও আশুধান্য বপন করে আবার গাছ বেশী ঘন হইয়া গেলে কেহ কেহ ধানের পরিবর্ত্তে কেবলই ভাদ্রে, কাত্‌কে, অড়হর, তেওড়া প্রভৃতি লাগাইয়া শেষে শীতের দীর্ঘ আবাদ-গাছ কাটিয়া গুড় তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। চাষীগণ আশ্বিনের শেষ হইতে চৈত্রের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গাছ কাটিয়া থাকে। একবার খেজুর গাছ লাগাইতে পারিলে কৃষক ৪।৫ পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে।

প্রকৃতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভগবানের কেমন একটা অনুগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা না থাকিলে সে পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইতে পারে না।

যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার ললিতাকুণ্ডের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এ অঞ্চলে প্রবল বন্যা আসা বন্ধ হইয়া গেল, অমনি কোথা হইতে পাট উড়িয়া আসিয়া মাঠ জুড়িয়া বসিল

আবার পাটের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি বৎসর বন্যা আসা বন্ধ না হইলে এ দেশের প্রজাগণ পাট বুনিলেও কাচিবার ভয়ে উক্ত আবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত; কারণ বন্যা আসিলে এ অঞ্চলের মাঠ ঘাট প্রায় সমস্তই প্রখর স্রোতে তৃণশূন্য হইয়া পড়িত, সে সময় কখনও খানা ডোবা বা পচা পুকুরে পাঠ পচান সম্ভবপর হইতে পারিত না।

অনূন ২৫ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি. তখন আমাদের শৈশবকাল, তখন আমরা এরূপ গ্রামব্যাপী ম্যালেরিয়ার কথা জানিতাম না। কেবল গদখালী উলা ও বর্দ্ধমানের মহামারীর কথা উপকথার মতন শুনিতে পাইতাম। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে সেবার ৺ পিতা-ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার বাসায় মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন "ডাক্তারবাবু ১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই যে দেশের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্বরের ভয়ে শেষে আপনাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।"

পাট না বুনিতেই ব্যাপারী আসিয়া ক্ষেত-ওয়ালার দ্বারে দ্বারে নূতন নোট দাদন দিয়া যাইতে লাগিল। প্রজারা মহাজন ও জমিদারের বাড়ী পাতিপুকুরের ছাপ দেওয়া মড়্‌মড়ে টাটকা নোটের তাড়া আনিয়া বহুদিনের ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। জমিদারও প্রজার নিকট হইতে বাকী বকেয়া সব আদায় করিয়া লইয়া প্রজাকে পাট বুনিবার পরামর্শ দিয়া কলিকাতাভিমুখে পাড়ি দিতে লাগিলেন। প্রজা পাটের

প্রলোভনে পড়িয়া নূতন করিয়া খেজুরের চারা লাগাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া যাহাতে বাপ ঠাকুরদাদার আমলের খেজুর বাগান সব লোপাট হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তাই আজ দিন দিন এদেশের মাঠ খেজুরবাগানশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ইছামতীর উর্ব্বর শ্যামল তীরে আর খর্জ্জুর বৃক্ষগুলিকে শালতরুর ন্যায় উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় না। প্রজাগণ ক্রমশঃ সস্তা দরে কামার কুমার ও গৃহস্থের নিকট জ্বালানীর জন্য খেজুর গাছ বিক্রয় করিয়া তাহাতে পাটের আবাদ করিতেছে। যখন খেজুরের আবাদ এ দেশে বেশী ছিল তখন এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে অনেক বড় বড় চিনির কারখানা ছিল। চিনি তখন এখানে কত সস্তায় পাওয়া যাইত। এক্ষণে কেবল গোবরডাঙ্গা ও কোটচাঁদপুর প্রভৃতি ২।১টী গঞ্জে সামান্য ২।৪টা কারখানা মিটি মিটি করিতেছে মাত্র।

ইচ্ছামতী তীরে চান্দুড়িয়া চন্দনপুরের নাম অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে শীত কালে এই চান্দুড়িয়ার হাটে ১০।১২ ক্রোশ হইতে হাট বসিবার পূর্ব্বে তিন দিন দিন রাত ধরিয়া অনবরত গুড় বোঝাই গাড়ী আমদানী হইত এবং কলিকাতা হইতে বহু ব্যাপারী আসিয়া সেই সব গুড় কিনিয়া দেশ বিদেশে চালান দিত। বর্ত্তমানে চান্দুড়িয়ার সেই হাটে শীতকালে হাটবারে ৫০ খানি গুড়ের গাড়ী আমদানী হয় কিনা সন্দেহ। খেজুর গাছের আবাদ যখন বেশী ছিল তখন স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও গ্রামের যথেষ্ট উপকার ৪।৫ মাস পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে ৫।৬ ঘণ্টা ধরিয়া রস জ্বালাইয়া গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য বনজ লতাপাতার দপ্‌দপে আগুন সমভাবে প্রজ্বলিত হইত। তদ্দ্বারা সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু অনেক ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কৃষকগণ রস জ্বালানির জন্য বর্ষার অব্যবহিত পরেই গ্রামের বন জঙ্গল আদাড় বিধাড় কাটিয়া ফেলিত। গ্রামগুলি নিবিড় অরণ্য এবং মশা সর্প বরাহ প্রভৃতির অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া শীতের প্রারম্ভে যেন হাসিতে থাকিত। পাকা খেজুর ফল খাইয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ধানের টানাটানির সময় অনেক গরীব চাষা এক বেলার আহারের কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিত। খেজুরের পাতা দ্বারা বেদে জাতি অতি সুন্দর পাটী তৈয়ার করে তাহাকে এদেশে বেদেপাটী কহে। বেদেপাটী এ অঞ্চলের গরীব লোকের শীতলপাটী হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করে। খেজুরের পাটী হইতে চিনি রাখা উত্তম বস্তা প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে চালান যায়। সম্ভবতঃ কাঁঠালের বীজের ন্যায় খেজুরের বীচি হইতেও একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে। খেজুর গাছ গৃহস্থের আরো অনেক উপকারে আসে। গরুর খাবারের আকাল উপস্থিত হইলে কেবলমাত্র খেজুরের পাতা কাটিয়া খাওয়াইয়া অনেক গৃহস্থ গরু বাঁচাইয়া রাখে।

পাটের দৌলতে ধানের চাষ কম হইয়া পড়িতেছে, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া জীবন আয়ুহীন হইয়া যাইতেছে, পানীয় জল দূষিত হইয়া প্রতি বৎসর গ্রামে মহামারীর সৃষ্টি হইতেছে, আর আমাদের অঞ্চলের—কেবল আমাদের

বড় আদরের—বড় গৌরবের—আয়কর দুর্লভ জিনিষ, তাহার জন্মস্থান হইতে চিরদিনের জন্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে গুড়ের মণ দুই টাকা ছিল এক্ষণে তাহা পাঁচ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে, আর কিছুদিন পরে খেজুর গুড়ের কথা দূরে থাকুক খেজুর গাছের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ পাইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট একদিন মাটী খুড়িয়া শিকড়ের নিদর্শন দেখিয়া খেজুর গুড়ের আবাদ এককালে ছিল বলিয়া হয় ত তাঁহাদের খাতার একপাশে লিখিয়া রাখিবেন। বস্তুতঃ কৃষকগণ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খেজুর বাগান কাটিয়া ফেলিয়া দিতেছে তাহা দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যায়। মৎস্য আইনের মতন খেজুর গাছ রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটা আইন পাস না করিলে কিছুদিন পরে খেজুরের গুড় আর এদেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে না! যাহা একবার ধ্বংস হইয়া যায় তাহা আর সহস্র চেষ্টা করিলেও পরে ফিরিয়া আসে না।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বঙ্গোপসাগরে তিন দিন

রবিবার প্রাতঃকাল সাতটার সময় কয়লাঘাটে মেকেঞ্জি কোম্পানির 'প্যারিগোলা' নামক জাহাজে উঠিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

দেখিলাম, জাহাজে তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে। প্রথম শ্রেণীতে একটি করিয়া ক্ষুদ্র ক্যাবিন্। যাঁহারা সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যা'ন তাঁহাদের এই শ্রেণীতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দোবস্তও বেশ সন্তোষজনক। তার এক কামরায় অনেককে একসঙ্গে থাকিতে হয়। জাহাজেও য়ুরোপীয় ও দেশীয় যাত্রীর জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত রহিয়াছে। অনেকে এই পার্থক্য পসন্দ করেন না। কিন্তু আমার মতে নানা কারণে ইহাই ভাল।

যাত্রীজাহাজে সচরাচর দুই প্রকারের ডেক্ থাকে। প্রথম, খোলা ডেক্। ইহার মাথার উপর নীল আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই ডেকের উপর জাহাজের নোঙ্গর, মুর্গি ছাগল, হাঁস প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য; আর একদিকে খালাসিদিগের থাকিবার ও রন্ধনাদি করিবার স্থান, তাহারই এক কোণে হিন্দু হালুইকর মহাশয়ের দোকান; অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের মুখ হাত ধুইবার ও স্নানের স্থান। গ্রীষ্মকালে অনেক ডেক্‌যাত্রী এই খোলা ডেকে আশ্রয় লইয়া থাকেন। তবে ঝড়ের সময় উহাদিগকে নীচের ডেকে সরাইয়া দেওয়া হয়, কারণ অধিক ঝড়ের সময় ঐ উন্মুক্ত ডেকের উপর সমুদ্রপ্রবাহ গমনাগমন করিতে থাকে। নীচের ডেক একটি বৃহৎ দালানের মত। ইহার চারিদিক আবৃত। বায়ু ও আলোক গমনাগমনের জন্য চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ রক্ষিত আছে। এই ডেকে যাইতে হইলে উপরের খোলা ডেক হইতে নামিয়া যাইতে হয়—ইহা ভিন্ন অপর দ্বিতীয় পথ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝড়ের সময়

উপরের ডেক হইতে সকলকে নীচের ডেকে নামাইয়া দেওয়া হয়। সকলে চলিয়া গেলে নীচের ডেকের সমস্ত গবাক্ষ ও সিঁড়ির প্রধান দ্বার এমন সুনিপুণভাবে বন্ধ করা হয় যে, এক বিন্দু জল, উহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ ডেকের তাড়িতালোক ও এঞ্জিন-ঘর হইতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রেরণ করিবার বড় বড় নল আছে। দ্বার প্রভৃতি বন্ধ করিবার পর ঐ সকল আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয় ও হাওয়া পাঠান হয়। পরবর্ত্তী ঘটনা যাহাতে পাঠক ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহারই জন্য এসকল কথা এমনভাবে বর্ণনা করিতে হইল।

এখন খাইবার কথা। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা সেলুনে বসিয়া আহারাদি করেন। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আমি নিজের ঘরে বসিয়াই খাবার আনিবার হুকুম দিলাম। খাবারের বন্দোবস্ত ভাল বলিয়াই মনে হইল। নানা প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য, মাংস, জেলি, ফল, মূল কিছুরই অভাব দেখিলাম না। সামুদ্রিক মাছ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও খাই নাই,—এজন্য মাছগুলি বেশ স্বাদযুক্ত হইলেও খাইবার প্রবৃত্তি হইল না। ফলগুলির অধিকাংশ preserved; আমার সহযাত্রী পঞ্জাবী মহাশয় হোটেলে খান না বলিয়া জাহাজের লুচি খরিদ করিয়া আহার করিলেন।

আহারের পর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের অবস্থা দেখিবার জন্য লোয়ার ডেকে গমন করিলাম। অনুমানে বোধ হইল, তথায় প্রায় ১০০ জন যাত্রী স্থান পাইয়াছে। তাহারা সকলে আপনাপন অবস্থানুযায়ী ঢালা বিছানা পাতিয়াছে। সাধারণতঃ, সমুদ্রভ্রমণ রেলভ্রমণ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল। রেলেতে যেমন একটি কক্ষে ১২।১৩ জন যাত্রী বসিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, এখানে তাহার সম্ভাবনা নাই। দেখিলাম, কোনও স্থানে দলবদ্ধ হইয়া সুবিস্তৃত শয্যার উপর আরামের সহিত উপবিষ্ট কয়েকজন যাত্রী গীতবাদ্যে নিযুক্ত। একজন গান গাহিতেছে, দুইজন সংগত করিতেছে, অন্য সকলে তাহাদিগকে নানা প্রকার ভাবে উৎসাহিত করিতেছে। অন্যত্র একজন বেশ সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছে, দশ পনর জন লোক তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া নানা প্রকার টীকা টিপ্পনির সহিত উহা উপভোগ করিতেছে। কোথাও বা একজন তামাক্ টানিতে টানিতে খোসগল্প জুড়িয়া দিয়াছে, কয়েকজন তাহার প্রসাদপ্রার্থী একমনে উহা শুনিতেছে। সত্য বলিতে কি, লোয়ার ডেকের এই ভাব দেখিয়া আমার মনে হইল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী অপেক্ষা ইহারা অধিক সুখে আছে। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখি, একদিকে তিনটি বাঙ্গালী বালক উপবিষ্ট। উহাদের মধ্যে একজন একটা বক্স হারমোনিয়ম বাজাইতেছে, আর একজন রবিবাবুর 'এখনো তারে চোখে দেখিনি' গানটি গাহিতেছে।

ঐ দিবস বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা গঙ্গা সাগরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গঙ্গার বিস্তৃতি এত অধিক যে, আমাদের জাহাজ নদীর দক্ষিণকূল ঘেঁসিয়া নোঙ্গর ফেলাতে আমরা অপর তীর দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম, নদীর ঐদিকে ভারত বিশ্রুত সুন্দর বন। কিন্তু আমরা তাহার কোনও

অস্তিত্ব জানিতে পারিলাম না। কেবল উদাস ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, একদল সামুদ্রিক পক্ষী উত্তরের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন এই সঙ্গম স্থানে অনেক হিন্দু যাত্রীর সমাগম হয়। কথিত আছে যে, ষষ্টি সহস্র সাগর সন্তান এই স্থানেই পাতালে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি কপিলের কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েন। সাগরের প্রপৌত্র ভগীরথ কঠিন তপস্যার পর স্বর্গ স্রোতস্বিনী সুরধুনীকে ভূতলে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণকে ঋষির কোপানল হইতে উদ্ধার করেন। প্রাচীন আর্য্য পিতামহগণ অনেক বিষয়ে গঙ্গা নদীর নিকট ঋণী। তাঁহাদের অপূর্ব্ব কল্পনা বলে নদীকে এইরূপ ভাবে দেবত্ব ও অমরত্ব প্রদান করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

আমাদের জাহাজ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারই অদূরে কপিলেশ্বরের মন্দির। যাত্রীগণ স্নানান্তে কপিলেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু রমণীগণ তাঁহাদের মাননা উপলক্ষে এই সাগর সঙ্গমে আপনাপন প্রথম সন্তানকে বিসর্জ্জন দিত। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের পবিত্র নামে আমাদের মধ্যে যে সকল আসুরিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহার জন্য কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তি তজ্জন্য চিরদিন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন।

সন্ধ্যার সময় পাইলট্ মহাশয় আমাদের জাহাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখন জাহাজ পরিচালনের ভার কাপ্তেন গ্রহণ করিলেন। এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে, জাহাজ যতক্ষণ নদীবক্ষে থাকে, পাইলট্ উহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। নদীর জল সব জায়গায় সমান গভীর নয় বলিয়া নদীতে সমুদ্রগামী জাহাজ চালিত করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য বিবেচিত হয় বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে জাহাজ অগভীর জলের মধ্যে 'বাণ-চাল্' হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা কখন সাগর সঙ্গমে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জাহাজ কখনও নদীর দক্ষিণ তট কখনও বাম তট কখনও বা মধ্য স্থল দিয়া চালিত হইতেছে। নদীর জল সর্ব্বত্র সমান নয় বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার পর আমরা সাগরে প্রবেশ করিলাম। সেদিন রাত্রির প্রথম ভাগ অন্ধকার বলিয়া ভাল করিয়া সমুদ্র দর্শন হইল না। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর তাড়াতাড়ি জাহাজের খোলা ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম—কি দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড সুবর্ণগোলকের মত দিনমণি সমুদ্রের নীল জল ভেদ করিয়া উঁকি মারিতেছেন। সূর্য্যোদয় অনেক স্থানে অনেকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এমন মনোরম, এমন মধুর সূর্য্যোদয় আর কখনও দেখি নাই। বিশ্বদেবতার ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ

দেখিবার ও বুঝিবার, প্রকাশ করিবার নহে। আর্য্য ঋষিরা যে কি জন্য সূর্য্যকে ‘বিশ্বদেবতা’ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, তাহা আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম। সাগর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যাইতে পারে। নীল অনন্ত আকাশের নীচে অনন্ত সমুদ্র যে সেই অনন্ত দেবতার কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা বুঝি মহাকবিরও ভাষার অতীত।

“সাগর চাহিয়া থাকে আকাশের পানে,
আকাশ সাগরে চায় অবাক্ নয়নে।”

যেদিকে চাও, কেবল মনোমুগ্ধকর নীল রঙের সমাবেশ। উপরে নীচে নীলে নীলে সমস্তই নীলাকার। সৃষ্টি যে কি মহান, কি বিশাল, কি অনির্ব্বচনীয়—তাহা সাগর দর্শন না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। কি বিপুল জলরাশির একত্র সমাবেশ! যতদূর চাহিয়া দেখি, জলের পর জল যেন আনন্দের কোলে যাইয়া মিশিয়াছে! আর আমাদের জাহাজখানি সেই সলিল শাহারার মধ্যে এক বিন্দু ক্ষুদ্র ওয়েশিসের মত অবস্থিত! সেদিন প্রাতঃকালে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়,—মনে মনে গাঁথিয়া যায়, কিন্তু সামান্য মানবিক ভাষায় প্রকাশ হয় না।

দিগন্তব্যাপী সাগর ঐ সময়ে নিতান্ত শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। মনে হইল যেন একটা বিশ্বব্যাপী মহাসুর নিতান্ত অবসন্নভাবে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যেন প্রভাত-পবন কেবল অতি

ব্যজন করিতেছে। জলের দিকে চাহিয়া দেখি, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে flying fish বলে।” কিন্তু আমার মনে হইল, ইহাদিগকে ‘উড়ন্ত’ না বলিয়া লম্ফমান্ মৎস্য বলাই সুসঙ্গত। ইহারা বেগে লম্ফ দিতে দিতে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করে কিন্তু উড়ে না। উহাদের পাখা নাই, কিন্তু পাখনা আছে। উহারা অতিশয় ক্ষুদ্র; বড় বড় মৎস্যেরা যখন উহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হয়, তখন উহারা আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করে।

দ্বিতীয় দিন দেখিলাম, আমাদের সহযাত্রীগণের মধ্যে অনেকে সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হইল। ভগবানের কৃপায় আমি কিন্তু ঐ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার হস্ত হইতে নিরাপদ ছিলাম। জাহাজে সার্জ্জন বলিলেন যে, এই অবস্থায় সামান্য সোডার সহিত ব্রাণ্ডি একটু একটু পান করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই বলিয়া এবিষয়ে কোনও মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

রেঙ্গুনগামী সমস্ত জাহাজেই চট্টগ্রামবাসী মুসলমানেরা খালাসীর কাজ করিয়া থাকে। শুনিলাম, সমগ্র ভারতের মধ্যে তাহাদের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাবিক আর নাই। বর্ম্মার ইরাবতী নদীতে অনেক ষ্টিমার প্রত্যহ যাতায়াত করে। উহাদের অধিকাংশ খালাসী ঐ জাতীয়। তাহার জন্য কোম্পানিকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত, বা ষ্টিমারকে কোনদিন বিপদে পড়িতে হয় নাই। সমুদ্রগামী জাহাজের বড় কর্ম্মচারীরা

কিন্তু সকলেই য়ুরোপীয়। এ দেশীয় কাহাকে কখনও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না। নিযুক্ত করিলে তাহারা যে ঐ কার্য্য যথেষ্ট যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সহিত পরিচালনা করিতে পারিত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় দিবস রাত্রি নয়টার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল ও ঝড় আরম্ভ হইল। আমি তখন লোয়ার ডেকে পূর্ব্বোক্ত বালক তিনটির নিকট বসিয়া ছিলাম। আমাদের সুকণ্ঠ গায়ক মহাশয় তখন 'সে কেন চুরী ক'রে চায় ? এই গানটি হারমনিয়মের সহিত গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ যেন একটা গোল উঠিল বলিয়া মনে হইল। প্রথমে গ্রাহ্য করিলাম না। কিন্তু যখন উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হইল, তখন গান থামাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইল। অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইলাম তাহাতে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। শুনিলাম, খুব ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। খোলা ডেকের সমস্ত লোককে লোয়ার ডেকে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে! নীচের ডেকের সমস্ত গবাক্ষ ও প্রবেশদ্বার 'ওয়াটার টাইট' করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। এখন আর এস্থান হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঝটিকা নিবৃত্তি হয়, ততক্ষণ আমাকে এইখানে থাকিতে হইবে।

ব্যাপারটা যখন বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম তখনএবিপদের সময় একা ক্যাবিনের মধ্যে থাকা অপেক্ষা কয়েকজন পরিচিত স্বদেশবাসীর সহিত ডেকের উপর থাকা অনেকাংশ ভাল বোধ করিলাম। রাত্রি যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ঝড়ের বেগও তত বাড়িতে লাগিল। বারটার সময় জাহাজ এমন দুলিতে লাগিল যে, ঢালা বিছানার উপর বসিয়া থাকা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সহসা ঝড় বোধ হয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। যাত্রীগণের জিনিস পত্র সেই প্রকাণ্ড ডেকের মধ্যে যেন 'ভাঁটা' খেলিতে লাগিল। কাহার জিনিস যে কোথায় যাইয়া পড়িতে লাগিল, কোনও স্থিরতা রহিল না। লোয়ার ডেকের ছাত প্রায় ৭০।৮০টা মোটা মোটা লৌহ দণ্ডের উপর দণ্ডায়মান ছিল। কয়েকজন অভিজ্ঞ যাত্রীর দৃষ্টান্তানুসারে সকলে আপনাপন দ্রব্যাদি ঐ লৌহ দণ্ডের সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, যাত্রীরা আপন দেহও ঐরূপ ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। যাহারা ঐ পন্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিল, তাহারা যে কি ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব।

কি প্রকারে ঠিক বলিতে পারি না, এই সময়ে জাহাজডেকের একটা গবাক্ষ খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে সমুদ্রজল ডেকের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে উহার ভিতর প্রায় ছয় ইঞ্চি জল জমিয়া গেল। সে সময় আমাদের এমন সাধ্য কাহারও ছিল না যে, উঠিয়া ঐ গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিই। জাহাজের কোনও কর্ম্মচারীও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল না। আমরা ভীত হইয়া উঠিলাম, ভাবিলাম যে রকম ভাবে মধ্যে জল প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে আরও কয়েক ঘণ্টা যদি এই প্রকার ঝড় চলিতে থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে ডুবিয়া মরিতে হইবে। অথচ নিরুপায়—এবিপদে ভগবান ভিন্ন আর

অন্য ভরসা নাই। সেদিনকার বিপদের কথা চিরদিন মনে থাকিবে।

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় রাত্রি তিনটার পর ঝড়ের বেগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রাতঃকালে ঝড় একেবারে নিবৃত্ত হইল। একজন সাহেব কর্ম্মচারী আমাদের অবস্থা দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন খালাসী নিযুক্ত হইল। অনতি বিলম্বে সমস্ত জল পরিষ্কার করিয়া ফেলা হইল। আমি নিজের ক্যাবিনে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলাম। অনুসন্ধানে শুনিলাম রাত্রি একটার সময় একজন খালাসী ভাসিয়া গিয়াছে। জাহাজের আর কোনও অনিষ্ট হয় নাই।

আজ আমাদের তৃতীয় দিবস। আজ সমুদ্রসলিলের ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সাগরের সে সুনীল ভাব বিলুপ্ত হইয়া এক্ষণে গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সহসা দেখিলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম বঙ্গোপসাগরের এই অংশ একবারে অতল স্পর্শ বলিয়া জলের বর্ণ ঐপ্রকার হইয়াছে। হাতে লইয়া দেখিলে আর ঐ বর্ণ দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব বাসীরা এই স্থানকে কালাপানি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের জাহাজ যখন সমুদ্রসলিলকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া সবেগে ধাবিত হইতেছিল তখন মনে হইল যেন আমরা অনন্ত বিস্তৃত তরল পাথুরে কয়লার উপর দিয়া গমন করিতেছি। রত্নাকরের এই বিচিত্র মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা এ জীবনে কখনও মুছিবে না। যতদূর

জল দৃষ্টি অভিভূত করিয়া ফেলিল। বেলা একটার পর জলের রঙ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সমুদ্রে আমি যে উড়ন্ত মাছ দেখিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, দুই একটা হাঙ্গরও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতাম। তাহারা প্রায়ই জাহাজের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। জাহাজ হইতে কোনও দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উহা গিলিয়া ফেলিত। তামাসা দেখিবার জন্য আমরা মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড উহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিতাম। সর্ব্বভুক মহাশয় অবিলম্বে উহা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেন। খালাসীরা মাঝে মাঝে সমুদ্রে জাল ফেলিয়া নানা প্রকার মাছ ধরিত। পুঁটি মউরলার ন্যায় ছোট ছোট মৎস্য হইতে ৫।৭ সের পর্য্যন্ত মাছ জালের মধ্যে দেখিতে পাইতাম। এতবড় সমুদ্রে অমন ছোট ছোট মাছ যে কি প্রকারে জীবিত থাকে তাহাই আশ্চর্য্য!

ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরাকানের পর্ব্বতমালা মেঘের ন্যায় আমাদের নয়নে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। শুনিলাম উহা প্রায় ৩৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে অত দূরের বস্তুও দেখা সম্ভব হইয়াছিল। একটা ছোট দূরবীণ দিয়া পরে উহা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। রাত্রি এগারটার সময় বেসীন সহরের আলোক স্তম্ভ দেখা গেল। জোৎস্নাময়ী রজনী বলিয়া স্তম্ভ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। প্রকাণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তরময় স্তম্ভ অজেয় দানবের মত সমুদ্র বক্ষ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া

আলোক বিকীর্ণ করিতে করিতে তীব্র ভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যেমন বিশাল স্তম্ভ তাহার উপযুক্ত আলোক বটে! এই স্থানে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি জাহাজ জলমগ্ন পর্ব্বতে লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়াতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অনেক অর্থ ব্যয়ে এই আলোক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উহার উপর একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী সপরিবারে বাস করেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন দেশীয় লোকও আছেন। তাঁহারা সকলেই ঐ স্তম্ভের উপর বাস করেন। ইহার জন্য কত জাহাজ যে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

পরদিবস বেলা নয়টার সময় আমরা ইরাবতীর খাড়ীমুখে উপস্থিত হইলাম। দূরস্থ রেঙ্গুন সহরের কোনও কোনও অংশ আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল। এই তিনদিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র ও আকাশ দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ তাহার অবসান হইল মনে হইয়া বড়ই আহ্লাদিত হওয়া গেল।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

আমার চাকরী

মামার অনেক খোসামোদ করিয়া একটি চাকরী পাইলাম। কটকে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। হাজার হাজার লোক মরিতেছে। সরকার হইতে তাই চাউল বিতরণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আমার উপর সমস্ত জিনিস পত্রের ভার থাকিবে।

বাড়ীতে চাকরী হওয়ার সম্বাদ দিতে সকলেই উৎফুল্ল হইল, মা দেবীর পূজার বন্দোবস্তে মন দিলেন। পরিবার নূতন গহনা পরিবেন এই কল্পনায় মত্ত হইলেন। ছোট ভাই বলিল "দাদা, পুরী বেশ যায়গা, আপনি যান, কিছুদিন পরে আমিও একবার হাওয়া বদ্‌লাইয়া আসিব।" প্রতিবেশীরা বলিল "বিমল, খাইয়ে দাও হে। চাক্‌রী হ'লে ত খাওয়াবার কথা ছিল।" আনন্দে সকলকেই যথোচিত সম্ভাষণ করিলাম।

অবশেষে যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাঙালী ...

ষ্টীলট্রাঙ্কে সহধর্ম্মিণী বহু যত্নে থানকতক কাপড় ও দুচারটি জামা বারবার নানারকমে সাজাইতে লাগিলেন। আমাদের মতন লোকের আর আসবাবই বা কি? একখানা থালা একটা গেলাস হইলেই চলে। মাহিনা ত' ২৫৲ টাকা। তা বলিলে কি হয়? প্রথম চাকরী পাইয়াছি। ঐ টাকাতেই কত কি করিব তাহার বন্দোবস্ত মনে মনে করিতে লাগিলাম। অন্নকষ্ট ত' ঘুচিলই—হাতে কিছু টাকা জমিবে, পরিবারের অলঙ্কার হইবে, ভাইটির লেখাপড়ার খরচ চলিবে ইত্যাদি কল্পনায় বেশ সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ চলিতে লাগিল। সবে তখন একুশ বছরে পড়িয়াছি কি না!

যথাসময়ে 'দুর্গা' বলিয়া যাত্রা করা গেল। মায়ের আশীর্ব্বাদ বাণী সহধর্ম্মিণীর কাতর মুখখানি তখনও মনে জাগিতেছিল। ভ্রাতা সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে আসিলে তাহাকে

হলে টেলিগ্রাম করো। চলে আস্‌বো।” গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

বাঙ্গালীর ঘরের প্রতি টান যে কতদূর তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সাহেবেরা নিশ্চিন্তমনে চুরুট টানিতে টানিতে গাড়ীতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে। কিন্তু আমার অনন্ত চিন্তা। নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছি। অপরিচিত দেশ, অপরিচিত অধিবাসী। সেখানে আপনার বলিতে কেহ নাই। বাড়ীর কথা মনে পড়িল। এতক্ষণে আমার ভাই হয়ত বাড়ীতে ফিরিয়াছে। আজ সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। আমার সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি আজ শূন্য। আমি চলিয়াছি—কোথায় ? তথায়, নিয়মিত সময়ে মায়ের স্বহস্ত প্রস্তুত অন্ন আমার জন্য অপেক্ষা করিবেনা, সহধর্ম্মিণীর শত ক্ষুদ্র সেবার অভাব প্রতিপদে পরিলক্ষিত হইবে, ভ্রাতার অসীম অনুরাগ ও আনুগত্য শত ভাষায় ফুটিয়া উঠিবে না ত!

কিন্তু চিন্তার স্রোত দেহের কাতরতাকে রোধ করিতে পারে না। তাই বহুক্ষণ পরে তন্দ্রাতুর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়া দেখি আমার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীও একজন বাঙ্গালী। তাঁহার অধীনে আমাকে মালপত্র হিসাবমত রাখিতে হইবে। দৈনিক যাহা বিতরণ হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। কাজ এমন বিশেষ কিছু নয়।

অনেক জিনিস রহিয়াছে। যাহারা অনেকদিন খাইতে পায় নাই তাহারা একেবারে ভাত খাইলে মারা যাইবে এইজন্য দুধের বন্দোবস্ত। বিলাতী ব্যবসাদারগণের কৃপায় গাঢ় দুধের অভাব নাই। এইরূপ গাঢ় দুধের বহু কৌটা সঞ্চিত ছিল। এতদ্ব্যতীত স্তূপাকারে চাউলের বস্তা, ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদিও সংগৃহীত।

আমি তখনও পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর মূর্ত্তি দেখি নাই। চাঁদা উঠিত তাহাই দেখিতাম। বুঝিতাম অনাহারে অনেকে হাহাকার করিতেছে। কিন্তু চক্ষের সম্মুখে কোনও ছবি ফুটিয়া উঠিত না।

আজ সকালে বিতরণের বহুপূর্ব্ব হইতে আমাদের ঘরের সম্মুখস্থ মাঠে লোক জমিতেছিল। শুনিলাম মধ্যরাত্রি হইতে এইরূপ লোক আসিতেছে। আমি তখন নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছিলাম। সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি—অতি শোকাবহ দৃশ্য। শত শত ক্ষীণ কঙ্কালসার নরনারী ও বালকবালিকা। অনেকে চলৎশক্তিরহিত। প্রাণপণ চেষ্টায় গৃহসম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিলাম এক রমণী একদিকে মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া হাঁপাইতেছে। তাহার পার্শ্বে একটি সাত আট বৎসরের ছেলে বসিয়া শূন্যনেত্রে চাহিয়া আছে। শুনিলাম নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে জলরাশি শত শত গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই এত লোক আজ সর্ব্বস্বান্ত।

এ করুণ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী হলধরবাবু তখন প্রাতর্ভোজনে রত। ষ্টোভের উপর কেটলি হইতে ধূম উঠিতেছে। সুগন্ধি চা, পেয়ালা, চামচ কিছুরই অভাব নাই। দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জন্য প্রেরিত গাঢ় দুধের কৌটা খোলা হইয়াছে। হলধরবাবুর চায়ে তাহা ব্যবহৃত হইবে।

হলধরবাবু সহাস্যে বলিলেন "এই যে বিমলবাবু। আসুন, এক পেয়ালা চা খান।" সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশীকে হুকুম হইল "বুদ্ধু, বাবুর একটা পেয়ালা বাহির কর।"

আমার সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত তীব্রবেগে বহিতে লাগিল। বাহিরে অনশনক্লিষ্ট নরনারী পূর্ব্বদিন রাত্রি বারটা হইতে তৃষিত নয়নে গৃহদ্বারে চাহিয়া আছে, কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ মৃতপ্রায়; আর গৃহাভ্যন্তরে তাহাদের খাদ্য-দুগ্ধে সুরভি চা প্রস্তুত করিয়া হলধরবাবু, নিরুদ্বেগে সহাস্যমুখে বলিতেছেন "বিমলবাবু এক পেয়ালা চা খান।" আমার মাথা গোলমাল হইয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে হলধরবাবুকে কি বলিলাম তাহা মনে নাই কিন্তু উত্তরে হলধরবাবু যে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে। শুনিলাম "এখনও আপনি ছেলেমানুষ। আমি বিশবছর এই রিলিফ্ ওয়ার্কের কাজ চালিয়ে আসছি আমার কথা শুনুন। আপনি যে রকম ভাব দেখাচ্ছেন, তা কবিতায় শোভা পায়। সংসারে ওরকম কথা চলে না। আপনি যদি নিজে কিছু না খেয়ে শুকিয়ে মরেন, তাহলে এদের সাহায্য হবে কি?"

আমি ভাবিলাম "তা হতে পারে। কিন্তু তবু—তবু এরকম হৃদয়হীনতা এরকম ঔদাসীন্য—"

বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। একজন চাপরাসী আসিয়া বলিল "রেয়ৎ সব ঠেলাঠেলি কচ্ছে।" হলধরবাবু চা চুমুক দিতে দিতে বলিলেন "হাঁ। পুলিশের সাহায্য চাই। বুদ্ধু তুমি থানায় যাও, বল দশজন চৌকিদার চাই, নইলে আমাদের ঘর লুটে নেবে।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম "বলেন কি ম'শায়? এরা নিজেরা দাঁড়াতে পারে না এরা আবার লুট করবে। একে ত' না খেয়ে মরছে আবার কেন পুলিসের অত্যাচার বাড়াচ্ছেন?"

হলধরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "বিমলবাবু, আপনার বড় কোমল হৃদয়। আমার কথা শুনুন, ও রকম করলে কাজ চালাতে পারবেন না। নিজের ভাবনা ভাবুন। দুপয়সা রোজগারের চেষ্টাতেই ত' বিদেশে এসেছি। অন্নসত্র খুলতে ত' আর আসি নি। যাতে দুপয়সা হয় তারই যোগাড় দেখুন। বুদ্ধু—যাও—শীগ্গির থানায় যাও।"

বুদ্ধু চলিয়া গেল।

প্রায় দুইঘণ্টা কাটিয়া গেল, বুদ্ধু ফিরিল না। হলধরবাবু হুকুম দিলেন "পুলিস না আসিলে চাউল বিতরণ হইবে না।" বাহিরে জনতা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। তখন রৌদ্র ফুটিয়াছে। অনাহারে শীর্ণ দুর্ব্বলদেহ নরনারী তখন ক্ষীণ বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে কি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। মনুষ্যকণ্ঠে সেরূপ স্বর কখনও শুনি নাই। হলধরবাবু বাহিরে গিয়া বিকট গর্জ্জনে বলিলেন "চুপ্ রও। চিল্লাওগে ত' এক মুঠাভি চাউল নেহি মিলেগা।"

জনতা নীরব হইল বটে কিন্তু সে কি দৃশ্য। কেহ অবসন্নকলেবরে ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, কেহ উদর দেখাইয়া ক্ষুধা জানাইতেছে কথা বলিবার শক্তি নাই। সন্তানের পার্শ্বে জননী উদাসীনভাবে বসিয়া আছে। সন্তান কাঁদিতেছে সেদিকে মনোযোগ নাই।

কেহ রৌদ্রতাপে পীড়িত হইয়া গাছের ছায়ায় বসিয়াছে। সেখানে বসিবার জন্য অনেকেই ঠেলাঠেলি করিতেছে।

পশ্চাদ্দিক হইতে একটা গোল উঠিল। ব্যাপার কি কিছুক্ষণ বুঝা গেল না। পরে দেখা গেল বেত্রহস্তে জমাদার ও তৎপশ্চাৎ চৌকিদারের দল সদর্পে আসিতেছে। বল-পূর্ব্বক ধাক্কা দিয়া জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে হলধরবাবু চাউল বিতরণের হুকুম দিলেন।

চাপরাসীরা চাউল দিতে লাগিল। চৌকি-দারগণ জনতাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল। আসন্ন ভোজনের প্রত্যাশায় মুমূর্ষু অনাথের প্রাণেও শক্তি সঞ্চার হইল। যে পড়িয়াছিল—সেও উঠিল। বৃদ্ধ, বালক, যুবক, রমণী, শিশু সকলেরই মুখে একটা অস্ফুট ধ্বনি।

কিন্তু হলধরবাবুর উপদেশমত চাপরাসীরা যে পরিমাণ চাউল প্রত্যেককে দিতেছিল তাহাতে কাহারও উদর পূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। সরকার হইতে প্রত্যেককে যে পরিমাণ চাউল দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল—তাহার অর্দ্ধেকও হইবে না। প্রথমে উদরপূর্ণ করিয়া আহারে অনিষ্টের সম্ভাবনা তাই সরকার হইতে অল্প করিয়া বিতরণের আদেশ ছিল। এক্ষণে হলধরবাবু তাহারও অর্দ্ধেক বিতরণের হুকুম দিলেন। আমি একবার বলিলাম “আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। এত পরিমাণ চাউল দিবার হুকুম আছে।” তিনি বলিলেন “আমি কি বেশী খাইয়ে এদের মেরে ফেল্‌ব না কি ?”

বিতরণের পর জনতা তাড়াইবার আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। অনেকে সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরেই থাকিতে চায়। হলধরবাবু তাহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। এখানে অত লোক থাকিলে স্থান অপরিষ্কার হইবে। রোগের প্রাদুর্ভাবও হইতে পারে। কাজেই দণ্ডচালনায় পুলিস লোক তাড়াইতে লাগিল।

কিন্তু সে খাদ্যে তাহাদের কি হইবে ? লোভ বাড়িবে উদর ভরিবে না। নরকে বুভুক্ষুর সম্মুখে খাদ্য রাখিয়া প্রলোভন দেখান হয় শুনিয়াছিলাম—এও সেইরূপ! অত্যন্ত-ব্যথিত চিত্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

প্রায় বেলা দুইটার সময় একজন স্থূলকায় উড়িষ্যাবাসী হলধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। হলধরবাবু তাহাকে বলিলেন “কেমন, আপনি ঐ দরে দিতেই রাজি ত ?” তিনি বলিলেন “হাঁ, কিন্তু দেখুন গাড়ী খরচ করিয়া লইয়া যাইতে আমার অনেক টাকা পড়িবে। কি আর লাভ থাকিবে বলুন ?”

হলধরবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন “লাভ থাকিবে না ? বলেন কি ? মণকরা বোধ হয় দুটাকা আপনার থাকিবে। আমি কি চাউলের দরের সন্ধান রাখি না। যে আকাল পড়েছে—এতেও যদি চাল বেচে লাভ না থাকে তবে কখন আর থাক্‌বে বলুন ?” তারপর চুপিচুপি বলিলেন “এই বাবুটিকেও কিছু দিতে হবে।”

আমি বুঝিলাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলা হইল। ব্যাপার কিছু বুঝিলাম না। উড়িষ্যাবাসী বলিলেন “আমি আর এক পয়সাও দিতে পারিব না। আপনি ইঁহাকে যাহা হয় দিবেন।” হলধরবাবু তখন

আমার কাণে কাণে কতকগুলি কথা বলিলেন।

কথাটা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সরকারী চাউল যাহা দুর্ভিক্ষে বিতরণজন্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন! তাই সকালে অত অল্প চাউল বিতরিত হইয়াছে। আমাকে খাতায় লিখিতে হইবে যথোপযুক্ত চাউল বিতরিত হইয়াছে। তাই আমাকেও কোন অংশ না দিলে চলে না।

এ কি চাকরী। মুমূর্ষুর শেষ গ্রাস কাড়িয়া অর্থোপার্জ্জন! আমি বলিলাম "আমি কিছু চাহি না। আমা দ্বারা এ কাজ হবে না।" আমি বাহিরে চলিয়া গেলাম।

কিছুদূর গিয়া দেখি এক বৃক্ষমূলে এক রমণী উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পার্শ্বে এক বালক। দেখিয়াই চিনিলাম। সকালে মাঠে যাহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়াছিলাম এই সেই। বালকটি কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম "তোমরা খাও নাই?" বালক বলিল "রাঁধিব কিরূপে? চাল যেমন পাইয়াছি তেমনি রহিয়াছে। কিছু কাঁচা চিবাইয়া খাইয়াছি মাত্র।" আমি তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া বলিলাম "বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আন।"

বালক বলিল "আপনি অনুগ্রহ করে একটু এখানে দাঁড়ান। মা ভির্মি গিয়াছে। খাবার এনে খাওয়াব।" আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বালক চলিয়া গেল।

রমণী মৃতবৎ পড়িয়া ছিল। অনাহারে ক্ষীণ কঙ্কালসার দেহ কোনও মতে প্রাণটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘ কেশরাজি মলিন ও জটাকার। বস্ত্রও শতছিন্ন। মধ্যে মধ্যে এক একটা নিশ্বাস তাহার সর্ব্বদেহ কাঁপাইয়া বাহির হইতেছে। মনে হইতেছে যেন এই পরিশ্রমেই তাহার মৃত্যু হইবে।

আমি দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম—একদিন হয়ত এ রমণী গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত ছিল। কালবন্যায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় আজ ইহার এই দশা। মানুষ মানুষের জন্য কেন যে অনুভব করে না তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। একদিন ছিল যখন অন্যান্য ধনীদের মত আমিও সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষকাহিনী পড়িয়া একটু চিন্তার স্বরে বলিতাম "ও—ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।" ঐ পর্য্যন্ত। এ সংবাদে প্রাণ কাঁদিত না। বিপন্নের সাহায্যার্থ ছুটবার জন্য আগ্রহ হইত না। আজ একদিনে আমার চিত্তের কি পরিবর্ত্তন। যতদিন এ দেহে জীবন থাকিবে কোথাও দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। সুভোজ্য সম্মুখে রাখিয়া যখন বসিব —তখন এই অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর মূর্ত্তি নয়নসম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। পত্নীপুত্রকে যখন সাদর সম্ভাষণ করিব তখন উন্মুক্ত অম্বরতলে তৃণশয়নে পতিত অনাহারমৃত রমণী ও শিশুদের মনে পড়িবে। ভগবান্! ধনীদের ঐশ্বর্য্যের এক এক কণা দান করিলে এ দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়, কেন তাহাদের হৃদয়ে সে করুণার স্থান নাই?

বালক ফিরিয়া আসিল। মৃত্তিকাভাণ্ডে জল ও বস্ত্রের প্রান্তদেশে খাদ্য বাঁধিয়া আনিয়াছে। জলসেকে বহুযত্নে জননীর চৈতন্য সম্পাদন করিল। তাহার পর খাইতে দিল। রমণী কথা কহিল না। সাগ্রহে খাইতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।

হলধরবাবু সেদিন আমার সহিত কোন কথা কহিলেন না। ভাবে বুঝিলাম তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমিও নীরব রহিলাম।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ভাত খাইয়া কলাপাত নিজেই বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। দেখিলাম একটি ছায়ামূর্ত্তি অন্ধকারে আসিয়া পাতটি তুলিয়া লইল। আমি একটু দাঁড়াইয়া দেখিলাম আমার উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত যে দুই একটি অন্নকণা ছিল সে তাহা সাগ্রহে খাইতেছে। আমার চোক ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিলাম "কে?" মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিলাম—সেই বালক। সে বলিল "বাবুজি, আমি?" সে বলিল "বাবুজি, মা তিনদিন খায় নাই। যা কিনেছিলুম, মাই খেয়েছে। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিলাম "দাঁড়া।" গৃহমধ্যে যাহা কিছু ছিল আনিয়া দিলাম। বালক খাইতে লাগিল।

এই সময় একজন চৌকিদার সেখানে আসিল। বলিল "বাবু, করছেন কি? খবর পেলে এখনি হাজার কাঙ্গালী জুটবে। আপনি ক'জনকে খাওয়াবেন। এই দেখুন—এই হট্ হট্—"

সত্যই এক দীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া বালকের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে লাগিল। বালক নীরবে বসিয়া রহিল। চৌকিদার দ্রুতপদে গিয়া—আমি নিবারণ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে এক ধাক্কা দিল। সে ধাক্কার বেগ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিয়া সে ভূপতিত হইল।

বালক কাঁদিয়া উঠিল। "বাবুজি, আমার মাকে মেরে ফেল্লে।" আমার শোণিতপ্রবাহ স্থির হইয়া গেল। এ কি দেখিলাম! মাতা পুত্রের খাদ্য কাড়িয়া খাইতেছে!

অগ্রসর হইয়া রমণীকে তুলিলাম। তাহার দেহ স্পন্দহীন! ছাড়িয়া দিতেই লুটাইয়া পড়িয়া গেল। মৃত্যু তাহাকে আশ্রয়দান করিয়াছে! তাহার যন্ত্রণা ফুরাইয়াছে!

কাতরকণ্ঠে বালক কাঁদিয়া ডাকিল—"মা—মা—"!

তাহার পরদিনই চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল।

ব্যথিতের প্রার্থনা

যদি, জীবনপুষ্প বিকাশের কালে মধুর প্রভাত বেলা
কঠোর হস্তে ভেঙে চুরে দিলে আমার সাধের খেলা,—
ঐহিক সুখ পুলক ভরসা কাড়িয়া লইলে সবি,
হৃদয়ের মাঝে রেখে দিলে শুধু নিরাশা গহন ছবি।
আননের মাঝে মলিনতা আর তপ্ত সলিল ধারা
রেখে দিয়ে, মোরে জগতের মাঝে করিলে শান্তিহারা।
তবে, করিও না প্রভো, অকরুণ মনে ব্যর্থ জীবন মোর,
তোমার আলোক জ্বালাইয়া দাও ঘুচুক নিরাশা ঘোর!
তোমারি আলোক-পুলকে পূর্ণ হউক্ আমার বুক,
তোমারি আভায় ফুটুক্ সেথায় তোমারি সহাস মুখ।
অন্তর দেশে প্রেমময় বেশে চির বিরাজিত থাক;
প্রেমের মদিরা পিয়াইয়া মোরে বেদনা ভুলা'য়ে রাখ।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

রূপকথার রূপান্তর

ভারতীর গত আষাঢ় মাসের সংখ্যায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলাদেবী মহোদয়া 'রূপকথার রূপান্তর' নামক প্রবন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের একটী রূপকথার সহিত পঞ্জাবী একটী রূপকথার সৌসাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া উভয়ের জন্মনক্ষত্রের পরিচয় ও সৌভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছেন।

ভারতের সর্ব্বত্রই যে এরূপ সৌসাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে আছে,—কেবল গানে কাব্যে, আখ্যান উপাখ্যানে নয়, এমন কি, শিশু ভোলান রূপকথার আবোল তাবোল গল্প ছড়ায় মধ্যেও আছে,—তাহা আমি বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি।

বাংলা দেশের গোপীচন্দ্র ও ময়নাবতীর ইতিহাস মহারাষ্ট্র দেশে গোবিন্দচন্দ্র ও মীনাবতী রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া একটী সরস উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে আসল কোনটি, কোনটি নকল তাহা স্থির করিতে গেলে ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে নিশ্চয় কিঞ্চিৎ গোলে পড়িতে হইবে।

ঐতিহাসিক ঘটনাও গল্পবক্তার অতিরঞ্জনের ফলে উপাখ্যানে পরিণত হয়।

একখানি অতি প্রাচীন গুজরাতি গ্রন্থে সিংহ পরাক্রমী গুর্জ্জররাজ জয়সিংহ দেবের বাঙ্গালী দেশান্তর্গত মহোবক-পুর (মহোৎসব-পুর) আক্রমণের কথা লিখিত আছে, এবং তত্রত্য অধিপতি মদনবর্ম্মা অক্লেশে ও নিতান্ত অবজ্ঞাসহকারে ৮০ কোটী স্বর্ণমুদ্রা গুর্জ্জর রাজকে প্রদান করিয়া ছিলেন। কাজেই তৎপরবর্ত্তী গল্পবক্তারা কুবেরের দুর্গম ধনভাণ্ডারের অস্তিত্ব বাংলা দেশেই কল্পনা করিত।

এক দেশের কথা বিভিন্ন স্থানে যাইয়া কল্পনায় বিভিন্ন আকার ধারণা করে,—এবং সেই সব স্থানের ভাব চিন্তা ও প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করে। অতিরঞ্জন গল্পবক্তার স্বাভাবিক মোহ; কিন্তু ভারতবর্ষের উপকথাগুলির আভ্যন্তরিক পরিচয় প্রায় সমস্তগুলিতেই এক প্রকার। বিমাতার হিংসা, রাক্ষসের পুরী, বন্ধুর আত্মত্যাগ, ইতর প্রাণীর মনুষ্যপ্রীতি ইত্যাদি গল্পের ভাব সমস্তই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠক ও শ্রোতাদের মানসছায়া হইতে কল্পনার তুলিতে রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি গল্পে সমাজের প্রতিচ্ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশু ভোলান কতকগুলি গল্পে অনেক সময় সুসংবদ্ধ প্রণালী দৃষ্ট হয় না, কিন্তু শিশু চিন্তা যাহাতে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে এরূপ ভাবে গল্পগুলি রচিত হয়। রামায়ণ হইতেই বোধহয় ভারতের উত্তর অর্দ্ধাংশে রাক্ষসের গল্পটা কিছু প্রবল। আরব ও পারস্য দেশে তদ্রূপ পরীর গল্পের আধিক্য দৃষ্ট হয়, কারণ আমাদের দেশের রাক্ষসের মত আরব ও পারস্যে পরীর ব্যাপারের একটা অদ্ভুত কুসংস্কার বহুদিন বদ্ধমূল ছিল—এখনও সেটা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। পরীর অদৃষ্ট অদ্ভুত বহুসংখ্যক

চিত্র, গল্পবক্তার অনির্দ্দিষ্ট রহস্যকে আকার দান করিয়াছে।

অর্দ্ধপরিজ্ঞাত কিংবা একেবারে অপরিজ্ঞাত স্থানগুলির উপর গল্পের অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা অতি সহজসাধ্য সেইজন্যই বর্ত্তমান সময়ের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক আফ্রিকার অপরিজ্ঞাত অংশভূমি সমূহ তাহাদের উপন্যাসের লীলাভূমি করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানগুলি কোন প্রদেশবাসীই সম্যকরূপে অবগত ছিল না, কাজেই রাক্ষসের রাজ্য দৈত্যের পুরী, নাগের দেশ, ইত্যাদি তাহাদের কল্পনায় অতি সহজেই স্থান পাইত।

শিশু-ভোলান আবোল তাবোল গল্পগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য দেখা যায়; ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

বাংলা দেশের ঠাকুরমা ও দিদিমার বহু-গল্পের সহিত মহারাষ্ট্র ও গুজরাতি রূপকথার মিল লক্ষ্য করিয়াছি। স্থান ও প্রকৃতি ভেদে যা একটু পরিবর্ত্তন।

টুনটুনির গল্পের অনুরূপ একটী গল্প গুজ-রাতেও প্রচলিত আছে সৌভাগ্যক্রমে আমিও একদিন শিশুদিগের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া সেটি পড়িয়াছিলাম।

সেদিনের গল্প ছিল চড়ুই পাখীর বিপদ। ধান থেকে চাল বেছে খেতে গিয়ে তার খোসাটা চড়ুইয়ের গলায় বিঁধে গেল। চাল খাওয়া আর হলোনা, সে ছুটে বকের কাছে গেল। বক তখন তপস্যায় রত; চড়ুইয়ের গলা থেকে খোসা বের করা—এই হীন কার্য্য করাতে বক কিছুতেই রাজি হলোনা। অগত্যা চড়ুই লাঠি, আগুন, জল, উঠ, ইঁদুর, বিড়াল, বাঘ সিংহ সকলের কাছে নিরাশ হয়ে শেষে বোলতার শরণাপন্ন হল। বোলতার তাড়নায় একে একে সকলেরই চৈতন্য হল। তাড়াতাড়ি স্বীয় সাহায্য প্রদানে উদ্যত হলে বকেরও তপস্যা ভাঙ্গলো; সে যাত্রা চড়ুইও রক্ষা পেলে।

গুপ্ত ও সেনবংশের রাজত্বের পর পাঞ্জাবের একদল গুজর মালবও সৌরাষ্ট্রের "অমল" (সিংহাসন) অধিকার করিয়া লয়। মালব এবং সৌরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে তাহারা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের রাজত্বকালেই তৎ-প্রদেশের নাম গুর্জ্জর দেশ বা গুর্জ্জর ভূমি হয়।

এখনও গুজরাতের জনসংখ্যার মধ্যে বহু সংখ্যক গুজর বেনে, গুজর কামার, গুজর গোয়ালা দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্বারা মনে করা যাইতে পারে, বীর গুজরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বদেশীয় গল্প গুলিও স্থানান্তরে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে চড়ুই পাখীর বিপদের অনুরূপ যে একটী গল্প প্রচলিত আছে তাহা কি তবে গুজরাতি গল্পের প্রতি-চ্ছায়া বলিয়া মনে করিব?

ত্রিহুত সীমান্তে বেতিয়া রাজ্য অবস্থান কালে কোন বিহারীর নিকট টুনটুনির গল্পের অনুরূপ একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। ধারা-বাহিকরূপে গল্পটীর অতি সামান্যই স্মৃতি পথে উদিত হয়, তবে তাহাতেও যে লাঠি আগুন ও জলের একটা প্রতিযোগিতা আছে তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে।

ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের শিশুভোলান গল্প গুলি একত্রে সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত গল্প

গুলির আদিম বাসস্থান ও জন্ম নক্ষত্রের কাল নির্ণয় করিতে যাওয়া ঠিক যুক্তিযুক্ত হইবে না। গল্পগুলি স প্রদেশেই প্রচলিত আছে, সামঞ্জস্যও প্রচুর—প্রণালীও এক ;—কাজেই তাহাদের একত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লিগ্রামের আশে পাশে এমন কি গৃহ পশ্চাতের হলুদ বা ছোট ভেরেণ্ডা গাছের পাতায় টুনটুনির বাসা আর জল, আগুন, ইঁদুর, বিড়াল, এ গুলি ত গৃহ দ্রব্য। হাতী দেখাও পল্লিগ্রামে দুর্লভ নহে ; কিন্তু গুজরাতে কিংবা পঞ্জাবে হস্তী বড় একটা দেখা যায় না, উষ্ট্রই এ স্থলে যোগ্যতম জীব। গুজরাতের গল্পে চড়ুই ও কাঠবিড়ালীরই স্থান অধিক, বাংলা দেশের টুনটুনি বা বাবুই পক্ষীর সে গল্পে প্রবেশাধিকার নাই। গুলেল গুলিখেলা পঞ্জাবেই প্রবল, অন্যত্র এক প্রকার দুর্লভ।

প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে গল্পেরও অবস্থান্তর হয়। সমতল ভূমি হইতে পাহাড়ের রাজ্যে গল্পের আকার স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে। মরুভূমি হইতে শস্যশ্যামল দেশে গল্পের আকৃতি পৃথক্ হইয়া পড়ে। বহু উপকথায় দেশের ভাব, প্রকৃতি ও চরিত্রের আভাষ পাওয়া যায়। বীর বিজেতার গল্প হইতে দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতির গল্পাকৃতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

অজন্তার প্রাকৃতিক শোভা

অজন্তার গুহাচিত্রের প্রতিলিপি করবার জন্য আমরা গত বর্ষে দুইবার অজন্তা গিয়েছিলুম। সেখানকার অনেককথাই পূর্ব্বে ভারতীতে লিখেছি কিন্তু তবুও বলবার অনেক কথা বাকী আছে। তাই সে সম্বন্ধে আর কিছু লিখলে আশা করি, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না।

অজন্তা যাবার পথে জালগাঁও ষ্টেশন থেকে ৩৫ মাইল প্রায় তরুবিহীন জন-শূন্য মরু !—অনেক দূর ব্যবধানে এক একটি ছোট গ্রাম ;—তরঙ্গায়িত পার্ব্বত্য পথ। আশৈশব কল্‌কাতার ইটের বেড়া জনকোলাহল ও কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ থেকে যখন সেই চির-নগ্ন মাঠের চিরোন্মুক্ত পথে এসে পড়লুম, তখন আমাদের আর আনন্দ দেখে কে ! গুহাগুলি বিন্ধ্যাচল গাত্রে খোদা। পথে যেতে যেতে দু এক যায়গায় বহু পুরাতন ইটের তৈরী বৌদ্ধ স্তূপ এবং স্তম্ভ চোখে পড়ে। সেগুলি যেন প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য-স্বরূপ, কিম্বা শিল্প-তীর্থযাত্রীদের পথসমুদ্রের কাণ্ডারীর মত শতজীর্ণ দেহভার নিয়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। তাতেও শিল্পকলার নিদর্শন অল্পবিস্তর এখনও পাওয়া যায়। পথে যে সকল গ্রাম অতিক্রম করলুম সেগুলি প্রায় একভাবে গঠিত—অর্থাৎ প্রতিগ্রামে এক একটি হনুমানজীর মন্দির, সেখানকার জমীদার বা "পাটেল" সাহেবের একটি প্রাসাদ আর ১০।২০ ঘর লোকের কুটীর বা ক্ষুদ্র পাকা ইমারৎ। কোন কোন গ্রামে অতিরিক্তের মধ্যে একটী বাজার ! অন্য

অন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক সেখানে গিয়ে বেচা-কেনা করে। হনুমানজীর মন্দির গুলো অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপের নকলে তৈরী। দেশবাসী লোকগুলিকে বেশ সরল-চিত্ত ব'লে মনে হয়। আমি গতবৎসর ১৯১০ সালে ডিসেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয়বার অজন্তা যাই, —পথে, টাঙ্গাগাড়ীর ঘোড়া ২৪ মাইল ক্রমান্বয়ে চলে এসে একটা নদী পার হবার সময় অত্যন্ত অবাধ্য হয়ে উঠ্‌ল;—কিছুতেই নদী পার হবে না। মহা বিপদ! এমন সময় ভাগ্যক্রমে সেই নদীতে একজন মহারাষ্ট্রীয় বৃদ্ধ স্নান কর্‌ছিলেন তিনি আমাদের অবস্থা দেখে টাঙ্গাচালককে বল্লেন "ভাই আমার দুটো বড় বড় 'বয়েল' আন্‌চি—ঘোড়া খুলে ফেল, নদীর অপর পারে রাস্তার উপর তোমাদের গাড়ী উঠিয়ে দিচ্চি।" স্নান অসমাপ্ত রেখেই তৎক্ষণাৎ পুত্র সমভিব্যাহারে তিনি দুটো 'বয়েল' এনে উপস্থিত কর্‌লেন। তাঁদের অযাচিত উপকারে আমরা মুগ্ধ হলুম! বৃদ্ধ গাড়ীর চাকা ঠেলে, পুত্র বয়েল চালিয়ে, সানন্দে আমাদের গাড়ী নদী পার করে, রাস্তায় তুলে দিলেন। আমি তাঁদের পারিশ্রমিক দিতে যাওয়ায় তাঁরা আমায় অপ্রস্তুত করে ফেল্লেন। বল্লেন "আরে রাম! রাম! আপনি কি জানেন না এ রকম উপকার জীবের জন্যে জীব না করলে জগৎপিতার কাছে দণ্ড পেতে হয়।" ষ্টেশন থেকে গুহার পথে আমাদের অশ্ব-চালিত টাঙ্গাগাড়ী যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রান্তর পথে ছুটেচে, কতকগুলি হরিণও রাস্তার অপর পাশে আমাদের টাঙ্গাগাড়ীর আগে কে হারে কে জেতে—বাজিরদৌড়! বুনো পাখী গুলো সময় সময় পথের উপর গাড়ীর সাম্‌নে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে এসে বসত যে আমাদের ভয় হ'ত—এই বুঝি চাপা পড়ে!

ষ্টেশন থেকে বারো মাইল পথ অতিক্রান্ত হ'লে আমাদের আর একটা নদী পার হ'তে হ'য়েছিল। নদীর ঠিক্ উপরে একটা বেশ বড় গ্রাম; সেই গ্রামটি যেন ছবিটির মত সুন্দর! নদীর ধারে দূরে সারি সারি মন্দির, মন্দিরের সাম্‌নে বাজার; বাজারে বহু নরনারী তাদের দেশের স্বাভাবিক নয়নতৃপ্তিকর বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে বেচা-কেনা করচে। সেখানকার লোকেরা মহারাষ্ট্রীয়। রমণীদের বসন-ভূষণ আমাদের চক্ষে বেশ সভ্যভব্য ও আদর্শস্থানীয় বলে বোধ হ'ল। বিশেষ, পরিচ্ছদের বর্ণে এবং রচনা পরিপাট্যে তাদের স্বাভাবিক শিল্পবোধের পরিচয় দিচ্ছিল। সেখানে কি দীন-দরিদ্র, কি ধনী, সকল রমণীদের দেহ কঞ্চুলিকাবৃত থাকে। একজাতীয় রমণী দেখ্‌লুম তাদের বেশভূষা বৈষ্ণবকবিবর্ণিত ব্রজবাসিনীদের মত মনোরম। কাঁচুলী, ওড়না ঘাগরাগুলি চিত্রে আরোপ-যোগ্য। তাদের বর্ণ গৌর, গঠন সুন্দর; প্রত্যেকের পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধা, আর গায়ের জামাতে ছোট ছোট আর্শি বসান। এই জাতীয় স্ত্রীলোকদের সেখানে "বান্ধারীণ" বলে। বান্ধারীণদের বেণী রচনা প্রণালী একটু বিচিত্র ধরণের। সিঁথী করা চুল দুভাগে বিভক্ত।—কপালের উভয় পার্শ্বের কেশ ঈষৎ কপালের দিকে ফেলা, আর দুদিকে ঘুঙ্গুরের মত দুটো গহনা ঝোলান। তা'তে তাদের ছোট্ট সুন্দর

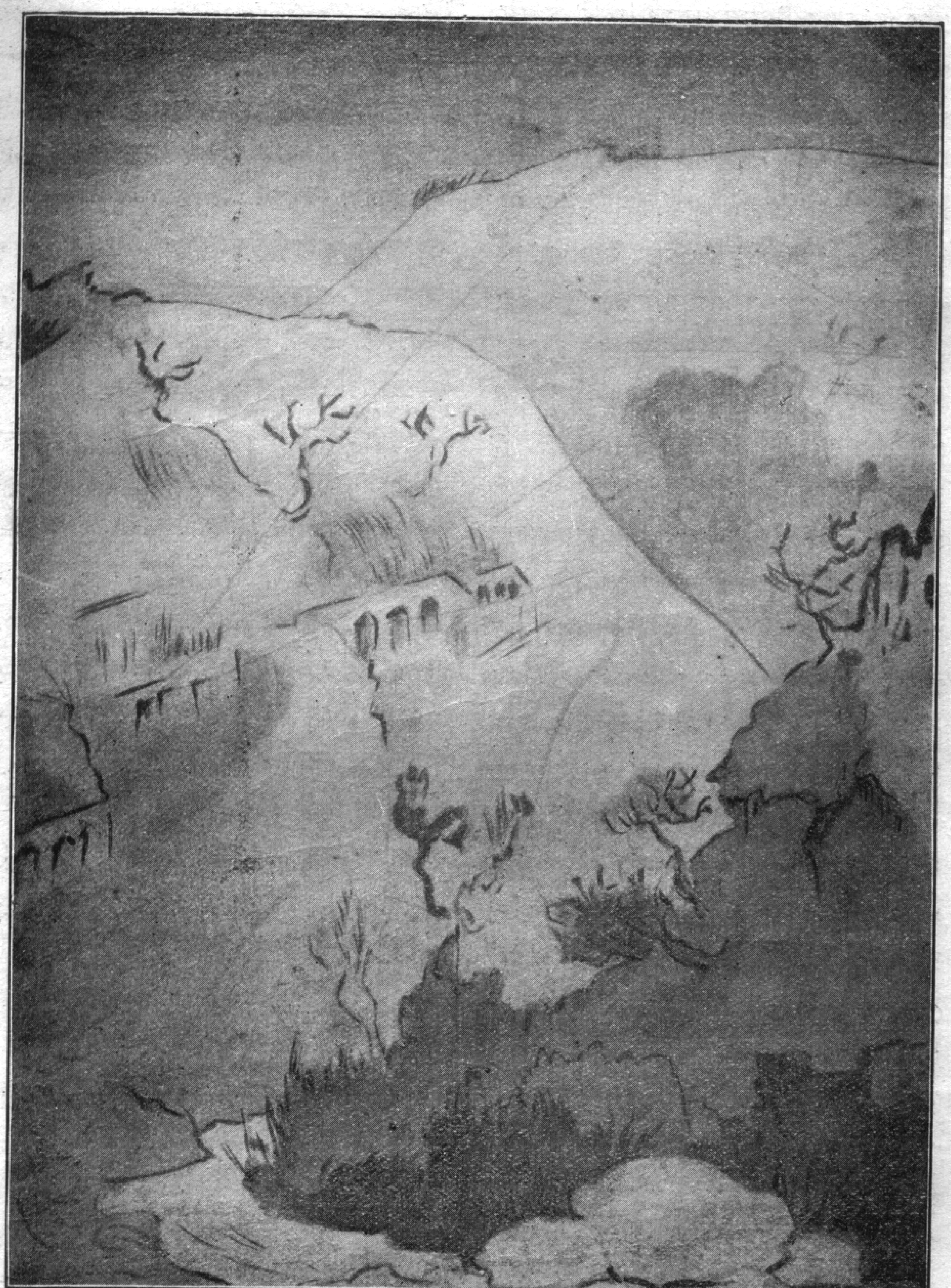
তুলেচে! মাথার উপর খোঁপাটী স্তম্ভের ন্যায় আকাশ পানে উঁচু করা আর সেটার উপর দিয়ে ওড়নার অবগুণ্ঠন পড়ায় অনেকটা বরক'নের টোপরের মত দেখায়। তাদের পরিচ্ছদের অনুরূপ পরিচ্ছদ অজন্তার ছবিতে কোন কোন জায়গায় দেখেচি। ১°নং গুহায় বুদ্ধমূর্ত্তির সাম্‌নে মাতা ও পুত্রের ছবিতে অজন্তার শিল্পী যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে-চেন তার সঙ্গে অনেকটা মেলে। কিন্তু বাঙ্করীণদের পোষাকের চেয়ে এগুলি কিছু উঁচু ধরণের। বাঙ্কারীণ রমণীদের যখন কলসী মাথায় ঝরণার ধারে সারিবদ্ধ ভাবে গান গাইতে গাইতে জল আন্‌তে যেতে দেখতুম, তখন হঠাৎ বৈষ্ণবকবিবর্ণিত বৃন্দাবনের কথা আমাদের মনে হ'ত।—শুধু যেন গোপীমোহনের বেণু বাদনেরই অভাব!

সেখানকার গ্রামের একটা আশ্চর্য্য ভাব এই যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় জনহীন "পোড়োগাঁ!" আসলে তাদের ঘরের ছাদ আমাদের দেশের মত খড়ে 'ছাওয়া' নয়;—মাটীর ছাদ। তাই, তাদের মাটীর ঘরগুলি আমাদের পরিত্যক্ত কুটীরের প্রাচীরের মত দেখায়। তাদের পুরানো ঘরগুলির ছাদে, পাঁচিলের উপর ধারে ধারে একরকম সরু লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়; তাতেই লোকালয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা—আমি, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, Mrs. Harringham প্রভৃতি সকলে অজন্তাগুহার সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী যে গ্রামটীতে ছিলুম, তার নাম 'ফর্‌দাপুর'। বোধহয় গ্রামটীর পূর্ব্বে অন্য কোন নাম ছিল, পরে কোন মুসলমান রাজা গ্রামটিকে এই নামে অভিহিত ক'রে থাকবেন; অথবা মুসলমানদের আমলে স্থাপি এটী একটী নতুন গ্রাম। সেখানে প্রধান দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন (আরঙ্গজীবের আমলের) বাদ্‌শাহী সরাই। পান্থনিবাসটী একটা চকমেলান ঘরের শ্রেণী; মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌকো মাঠ বিস্তৃত। প্রকোষ্ঠগুলি এই প্রাঙ্গণটীকে ঘিরেই সারি সারিভাবে তৈরী। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটির মধ্যে একটী মস্‌জিদ্‌। সরাইএর উত্তর ও দক্ষিণে ৬টী তোরণদ্বার দুর্গদ্বারের মত বড়। এই দ্বার দুটীর দুপাশে ছাদে ওঠ্‌বার দুটী সিঁড়ি।—ছাদের উপরে চার-কোণে চার্‌টে উঁচু মঞ্চস্থল; সেখান থেকে নীচের ও দূরের দৃশ্য বড় সুন্দর ও স্পষ্ট দেখায়! আমাদের বাসস্থান ফরদাপুর গ্রাম থেকে তিন মাইল দুরবর্ত্তী উচ্চ বিন্ধ্যাচল শ্রেণীর শীর্ষভাগে। গ্রাম থেকে আট মাইল দুরে ঐ পাহাড়ের উপর অজন্তা নামধেয় একটী প্রাচীন সহর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ফর্‌দাপুর গ্রাম থেকে সেখানে যাবার "বাদশাহী পথ" বহুপূর্ব্ব হ'তেই আছে। শোনা যায়, আওরাঙ্গজীব বাদশাহ সসৈন্যে ঐ পথ দিয়ে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে গিয়েছিলেন, পথে মধ্যে মধ্যে দুএকটা বাদ্‌শাহী প্রবেশদ্বারের জীর্ণ কঙ্কাল এখনও বর্ত্তমান। সেখানে ফর্‌দাপুরের মত একটা সুবৃহৎ সরাইও আছে। সে সরাইটী ফরদাপুরের সরাই অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ! সেটী একটী সমবাহু অষ্টভুজাকৃতি। সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠগুলি একএকটী অষ্টকোণ্‌ প্রাঙ্গণক্ষেত্রের সীমা রেখা। প্রবেশদ্বার দুটি। অজন্তাগুহা, অজন্তাগ্রাম, ফরদাপুর প্রভৃতি নিজামরাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত। জালগাঁও ষ্টেশন থেকে ফরদাপুরে যাবার পথে পূর্ব্বে যে একটী (নেরী) গ্রামের উল্লেখ করেছিলুম সেই গ্রামের নদী পার হ'লে ফর্দাপুরের দিক্‌টা নিজামের আর জালগাঁও ষ্টেশন প্রভৃতি নেরীর দিকের গ্রামগুলি বম্বে গভর্ণমেণ্টের অধীনে। অজন্তা গ্রামই পূর্ব্বথানদেশের) **নিজাম**রাজের 'সদর' বা সহর। সেথানকার সদাশয় তশিলদার সাহেব (Magistrate) আমাদের ওখানকার হাট বাজার, কাছারী, জেলখানা প্রভৃতি যেথানে যা দেখ্‌বার ছিল দেখিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। এই সব দেশের গ্রামের বা সহরের পথগুলি সঙ্কীর্ণ বা "গলি-ঘুঁজি নয়।—রাস্তাগুলি এক একটী প্রান্তর বল্লেও চলে। ১০।১২টা হাতী পাশাপাশি একসঙ্গে অনায়াসে চ'লে যেতে পারে। আমরা তশিলদার সাহেবের কাছারীবাড়ী দেখবার সময় বাড়ীটার পিছনে যে একটা স্বভাবের সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে শোভা আমরা কাছারীবাড়ী প্রবেশের সময় বা কাছারীর সাম্‌নে অবস্থানকালে কল্পনাও কর্‌তে পারিনি!—প্রথমে আমরা কাছারীবাড়ীর এজলাস-ঘর ও অন্যান্য ঘর দেখে হাকিমের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করলুম্। বস্তুতঃ, এটী একটী দস্তুর-মত শয়নকক্ষ! আমরা যেমন আমাদের ঘরের যেথানে-সেথানে একটা খাট বা কিছু বিছিয়ে শয়ন করি, এ তা' নয়। শোবার ঘরটীর একটু বিশেষত্ব আছে। শোবার ঘরের প্রবেশদ্বারের ঠিক্ সাম্‌নে "দরী" বিছান; আর তারই পশ্চাতে দেয়ালের মধ্যে পরদা টাঙ্গান একটী বিশেষ শয্যাপ্রকোষ্ঠ। পালঙ্কটী তারই ভিতরে স্থাপিত, অর্থাৎ, ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের নয়নতৃপ্তির জন্যে সাজান শয়নকক্ষের দৃশ্য! শয়নকামরা থেকে যথন আমরা পশ্চাতে বাইরের বারাণ্ডায় এসে পড়্‌লুম তথন, একটা পাঁচিলঘেরা উঠান ও ইঁদারা কিম্বা খুব বেশী সুন্দর জিনিষের যদি আমরা আশা কর্‌তুম ত' হয়ত একটা ফুলের বাগিচা!—কিন্তু এসবের পরিবর্ত্তে আমরা মোগলস্থপতিবিজ্ঞান-অনুমোদিত সুগোল থামের উপর গোল খিলেন দেওয়া বারাণ্ডার উন্মুক্তপথে যেন ঠিক একখানি ফ্রেমের মধ্যে কোন দেবশিল্পীর অঙ্কিত একটী মনোহর চিত্রের সাম্‌নে এসে পড়্‌লুম। হঠাৎ যেন রঙ্গমঞ্চের শয়নকক্ষের দৃশ্য যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে আবার এক অভিনব দৃশ্য প্রকাশিত হ'ল। ধূর্জ্জটীর মত ধূসর ও উদার-গম্ভীর অচলমূর্ত্তি আর তার মাথা বেয়ে একটী ক্ষীণ রজত জলধারা ধূর্জ্জটীর জটা-নিঃসৃত সুরধনীর মত ঝর ঝর শব্দে অতল-তলে ঝরে পড়্‌চে! আশেপাশে হরিণ-হরিণীরা শান্তিতে বিচরণ কর্‌চে! আমরা সেই দৃশ্যটী ভালরূপে দেখবার জন্যে একবার কাছারী-বাড়ীর ছাদে উঠ্‌লুম। যতই দেখি যেন আশ আর মেটেনা! আমরা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য সুন্দর দৃশ্য দেখে শুধু অবাক্ হ'য়ে রইলুম!

পর্ব্বতশিখর থেকে নীচের পার্ব্বত্য তরঙ্গায়িত পরিসর ভূমিসকল হঠাৎ বহুদূরের কুহেলি আচ্ছাদিত তরঙ্গায়িত পারাবারের মত দেখায়। মনে হয়, আমরা সমুদ্র-তীরে শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে!—এ যেন এক ঐন্দ্র-জালিক কাণ্ড।

ষ্টেশন থেকে ফর্‌দাপুরের পথ বেশ ভাল; কিন্তু ফরদাপুর থেকে প্রত্যহ যে তিন মাইল



অজন্তাগুহার বহির্দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচলের পথে গুহাভিমুখে আমাদের যেতে হ'ত, সেই গুহা যাবার পথটী অত্যন্ত বন্ধুর! পথ এত জঘন্য যে কখন কখন আমাদের গোশকটের চাকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের উপর একবার উঠে একবার পড়ে আমাদের যেন "হেঁটেল বনদিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে" কোনগতিকে গুহায় নিয়ে যে'ত! সেখানকার গোযান ধন্য! আশ্চর্য্য এই, এইরকম কদর্য্য পথেও তারা প্রত্যহ দুইবেলা অতি সহজে গাড়ী বহন কর্‌ত! আমরাও প্রকৃতপ্রস্তাবে পথ কদর্য্য বা দুর্গম হ'লেও তা'তে আমোদ ছাড়া অশান্তি বোধ করতুম না। অজন্তার পথে পাহাড়ের গায়ে ছায়াপ্রধান বনস্পতি না থাক্‌লেও, মঞ্জুল শেফালি কুঞ্জে তার অঙ্গভরা! স্থানে স্থানে ঠিক পদ্মের মত দেখ্‌তে সোনার বরণ ফুলের গাছ! পর্ব্বতের কোন কোন জায়গা প্রাচীরের মত খাড়া ও এত মসৃণ যে তৃণ পর্য্যন্তও জন্মাতে পায়নি। এই সব স্থানের পর্ব্বতগুলো একএকটী আস্ত পাথরের স্তূপ। অর্থাৎ, পাহাড়টার ভিতর ফাঁপা বা মাটীভরা নয়। গুহাগুলি সব এইরকম একটা পাহাড়েই খোদাই করা হ'য়েছিল।

আমরা ফর্‌দাপুর গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রত্যহ সমতলপ্রদেশ অতিক্রম ক'রে যতই গুহা যাবার পার্ব্বত্য পথে এসে পড়তুম, দূরের পাহাড়গুলো যেন সরে সরে আমাদের কাছে ততই এগিয়ে আস্‌ত! ক্রমে যতই গুহার নিকটবর্ত্তী হ'তুম ততই দুপাশ থেকে গিরিপ্রাচীর গগনতল ভেদ ক'রে যেন বেশী ঘনবদ্ধ হ'য়ে এসে কারাপ্রাচীরের মত

পথটী সর্পাকারে কখন পাহাড়ের উপরে উঠে, কখন নেবে, কখন বেঁকে, কখন বা সোজা ভাবে বিচিত্রগতিতে গুহার দিকে চলে গেছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের সমতল পথে চলা অভ্যাস, তাই সেখানকার সেই বিচিত্র বক্রগতিতে আমাদের বেশ কৌতুক জন্মাত।

অজন্তা পাহাড়ের নির্জ্জনপ্রদেশ হ'তে বিনিঃসৃত একটী সুনির্ম্মল স্বচ্ছ জলধারা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিভিন্নগতিতে এঁকে বেঁকে সমুদ্র দিকে ব'য়ে গেছে। আমাদের প্রত্যহ গুহায় যাবার সময় সেটিকে ৪।৫ বার অতিক্রম কর্‌তে হ'ত। আমরা যখন সেখানে ছিলুম তখন শীতকাল; কাজেই শীতকালে জল কম থাকে ব'লে আমাদের গাড়ী সহজে নদীবক্ষ দিয়েই পার হ'য়ে যেত। নদীর ধারে,—কোথাও বা পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে সুগোল পাথরের কিম্বা শুভ্রোজ্জ্বল স্ফটিকের টুক্‌রো একত্রিত ভাবে শিলাবৃষ্টির শিলগুলির মত ইতস্ততঃ ছড়ান আছে!—দেখ্‌লে মনে হয়, কোন মানুষের খেয়ালের কাজ। পাহাড়ের উপর আলোছায়ার মিলন একটা দেখবার জিনিষ! পর্ব্বতশিখরের স্থানে স্থানে শীতশুষ্ক সোনালী তৃণের উপর অরুণাভা—উজ্জ্বল রতন কিরীটির মত গিরিশিরে শোভা পেত। আবার কখন কখন গিরির ধূসর শীর্ষদেশে মেঘের ছায়া সম্পাত মহেশের ঘন-পিঙ্গল জটার মত দেখাত! সত্য সত্যই সেই নিভৃত-রাজ্যের তাপস সেই অচলরাজ!

গুহাগুলি পর্ব্বতের এমন একটী নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত যে, সেখানে গেলে আমাদের

যেন সেই নির্জ্জন স্থানটীকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপস্যার জন্যে বিশেষভাবে পাহাড়পর্ব্বত নদনদী দিয়ে দুর্গেরমত প্রাচীরপরিখায় গড়বন্দী ক'রে রেখেচেন। আমাদের এই জগৎ-প্রসিদ্ধ সুসভ্য কল্‌কাতা সহরের ক্ষণভঙ্গুর ইটের ৪।৫ তলা হর্ম্ম্য দেখে যাঁরা মুগ্ধ হন, তাঁরা যদি এই রকম স্বাভাবিক দৃশ্যসৌন্দর্য্যের রমণীয়তার মধ্যে এরূপ পর্ব্বত পঞ্জর খোদিত শৈল হর্ম্ম্য-শোভা সন্দর্শন করেন তবে নিশ্চয়ই বিমোহিত হ'য়ে যাবেন! বস্তুতঃ সেখানে গেলে কি ভাবের উদয় হয় তা প্রত্যক্ষকালে নিজে যতটুকুও অনুভব করতে পেরেছিলুম এখন তার কণামাত্র অক্ষরে প্রকাশ করতে অক্ষম! আমাদের প্রথমেই যখন বহুদূরের সারি সারি বিহারগুহাগৃহের বারাণ্ডাগুলির থাম আর গোল গোল সুবৃহৎ চৈত্যগুহার খিলানের আকৃতি চখে পড়লো তখন, বিস্ময়ের আর সীমা রইল না! গুহাগুলি পাহাড়ের গায়ে ঠিক্ মাঝামাঝি যারগায় খোদা। গুহাগুলির একেবারে ধারে কোন পথ নেই। গুহায় যেতে হ'লে গুহার সামনা-সাম্‌নি একটা জায়গায় গাড়ী থেকে নাবতে হয়। সেখানে দাঁড়ালে দূরে পাহাড়ের মাঝে সারি সারি গুহাগুলো ছোট ছোট পায়রা'র খোপের মত দেখায়। সেখান থেকে গুহার ঝরণায় প্রস্তুত নদীর বক্ষ দিয়ে গুহা পর্য্যন্ত ১০।১৫ মিনিটের পথ হেঁটে যেতে হয়। বর্ষায় যখন নদীটী জলে প্লাবিত থাকে তখন সেখানে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব! গুহাগুলির মুখ সব প্রবাহের দিকে। সেখানে স্রোতস্বতী দুপাশের গিরিপদমূল ধৌত ক'রে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে যেখানে নদীর দুপাশের পাহাড় দুটী একত্র এসে মিলেচে, সেই নিভৃত অচল-কোণের সীমা বেয়ে ঝরে পড়চে! গুহার দিকে মুখ করে সেই প্রবাহের বক্ষে দাঁড়ালে মাথার উপর সুনীল গগন, পদ-নিম্নে নির্ঝরিণীর কল্-মধুর গান, আর চারি পাশে অত্যুচ্চ শৈল-প্রাচীর ঘেরা বন-তল; তারই এক দিকে আমাদের অটুট অসীম প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ সারি সারি সুচারু গুহাগুলি দেখলে যেন প্রাণ জুড়ায় ও জাতীয়গরিমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে! জলপ্রপাতটী তার বিমল জলরাশি অবিরল-ধারে ঢেলে যেন জাতীয় গরিমায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আনন্দে কলগান গেয়ে অনন্তকাল ধরে ভারত শিল্পের মহিমা কীর্ত্তন করচে!

সে দেশের লোকে গুহাগুলিকে মানুষের তৈরী বলে মনে করে না। বাঙ্গলা দেশে ছেলেবেলায় 'দুর্গেশনন্দিনী' বর্ণিত গড়-মান্দারণের ভগ্নাবশেষের কাছে একটী বহু পুরাতন দীর্ঘিকা সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলুম যে, দৈত্যেরা সেটী রাতারাতি খুঁড়ে ফেলেছিল। এই গিরিগুহা সম্বন্ধেও প্রবাদটি সেই একইরূপ। "কোন স্মরণাতীত যুগে ভগবান বিষ্ণু বিন্ধ্যাচলের নিভৃত বক্ষে গিরিপ্রাসাদ খুদে গুহাগুলি গঠিত করে সুষুপ্ত রজনীযোগে স্বর্গধামে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন। বিষ্ণুর আদেশ মত বিশ্বকর্ম্মা গুহানির্ম্মাণ কাজে নিযুক্ত হলেন। পরে দৈব-ক্রমে গুহাগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'তে না হ'তেই প্রভাত দেখা দেবার উপক্রম হল। পর্ব্বতের প্রান্ত ভাগে নিবিড় আঁধারের পাশে ঈষৎ রক্ত আভা ফুটে উঠল। জীবের সুপ্তি ভঙ্গের সময় উপস্থিত দেখে বিষ্ণু তাঁর বাহন

গরুড়কে গিরিপ্রাসাদগুলি অতি সত্বর স্বর্গে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। ভগবৎ আজ্ঞায় গরুড় ত্বরান্বিত হ'য়ে অসমাপ্ত গুহাগুলি সমেত গিরিবরকে তাঁর পক্ষপুটে বহন করে নিয়ে যেই গগনমার্গে উঠবেন অমনি কুক্কুটবৃন্দ প্রভাতআগমনী সংবাদ ঘোষণা করায় পক্ষীরাজ গুহাগুলি যথা-স্থানে পরিত্যাগ ক'রে সত্বর লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে যেতে বাধ্য হলেন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

নেপালে বঙ্গনারী *

স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দুরাজ্য নেপালের ইতিহাস অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। দুর্ভেদ্য গিরিমালার অন্তরালে হিমানী-পরিবৃত এই প্রাচ্য ভূখণ্ড না জানি কি রহস্যের খনি আপন বক্ষে লুক্কায়িত রাখিয়াছে! হিমালয়ের



লেখিকার অল্প বয়সের ছবি।

ক্রোড়ে অবস্থিত এই সুবিস্তৃত প্রদেশ যেন প্রকৃতির রম্য কানন, বিবিধ নৈসর্গিক শোভা এবং সম্পদে মণ্ডিত।

এই নেপালের কাহিনী যে স্বভাবতই পাঠকের চিত্ত-রঞ্জন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই,—তাহার উপর যদি আমাদিগেরই শিক্ষিতা পুরমহিলা স্বয়ং সেইস্থান দেখিয়া তাহার বিচিত্র বিবরণী ফোটোর মত ভাষায় ফুটাইয়া দেখাইতে পারেন ত সে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

এই গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। বিপিনবাবু একসময়ে রাজডাক্তার হইয়া সপরিবারে নেপালে বাস করিতেন, সেই সুযোগেই পুস্তকখানি রচিত। লেখিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা। মাসিক পত্রাদিতে ইনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। শ্রীমতী হেমলতা প্রণীত একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত। সম্প্রতি তিনি আরও একখানি নূতন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেখানির নাম "মিবার-গৌরব-কথা।" অন্যত্র তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইল।

নেপালে বঙ্গনারী গ্রন্থখানি আগাগোড়া কৌতুহলো-দ্দীপক তথ্যরাজিতে পরিপূর্ণ। ভাষা মিষ্ট ও সরস—কোথাও সে সরসতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অর্থহীন বা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসে গ্রন্থের একখানি পৃষ্ঠাও মসীলিপ্ত করা হয় নাই। গ্রন্থখানি দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্য্যায়ে কাটামুণ্ড, নেপালের অধিবাসীগণের প্রধানতীর্থ, ধর্ম্মরীতি, পূজা পার্ব্বণ ও জাতীয় উৎসবাদি, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রাকৃতিক বিবরণ, কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান, পুরাবৃত্ত, গুর্খা-বিজয়,

---

* শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান গুর্খা রাজগণের বিবরণী এমন দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে পাঠকালে মনে হয় আমরা যেন নেপালের উপত্যকাভূমিতে বিচরণ করিতেছি।

লেখিকা বলিতেছেন, নেপালের আয়তনের তুলনায় ইহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতিসমুদায়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। একটি দেশে এরূপ বিভিন্ন জাতির সমাবেশ অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়ী গুর্খাগণ বর্ত্তমান নেপালের প্রধান অধিবাসী হইলেও জনসংখ্যায় পূর্ব্বতন অধিবাসী নেওয়ারগণই অধিক। গুর্খা এবং নেওয়ার ভিন্ন মগর, গুরুম, লিম্বু, কিরাটি ভুটিয়া এবং লেপচাগণও এই প্রদেশের অধিবাসী। গুর্খাগণ অধিকাংশই দেখিতে সুশ্রী। নেপালের উচ্চ-বংশীয়া মহিলাগণ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী। ব্রাহ্মণগণ কৃশ ক্ষিপ্র এবং আর্য্যলক্ষণযুক্ত। স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং সুসঙ্গত। বাহ্যিক বেশ-বিন্যাসে নেওয়ার এবং গুর্খার পার্থক্য কিছুই নাই। আজকাল পুরুষ-দিগের মধ্যে অনেকের দেহে বিলাতী ছাঁটের কোট দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দীনদরিদ্র পথের ভিখারীর পর্য্যন্ত সমুদয় দেহ বস্ত্রাবৃত। তাহা শত ছিন্ন ধূলিধূসরিত হউক কিন্তু অর্দ্ধনগ্ন দেহ এ দেশের রাজপথে কখনও দেখা যায় না। নারীগণ সচরাচর কটিদেশে বিশ ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিধান করে। হিন্দুস্থানী মেয়েদের ন্যায় সম্মুখে কোঁচা, তাহা প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। উদ্ধাঙ্গে জামা আর প্রায় দশহাত লম্বা নাতিপরিসর কাপড় শাড়ীর উপর কোমরে জড়ান; দেহের উপরার্দ্ধ আবরণের জন্য চাদর বা ওড়না ব্যবহৃত হয়। কুমারী সধবা কি বিধবা কাহারও মস্তকে আবরণ নাই। হিন্দুস্থানী কিম্বা বাঙ্গালী রমণীর ন্যায় নেপালনারীর অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই। রাজপরিবারের এবং ধনী মহিলাগণ সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কোঁচা করিয়া বস্ত্র পরিধান করেন না। তাঁহারা পাজামা জ্যাকেট এবং ওড়না ব্যবহার করেন।

নেপালে দাসত্বপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তবে এই প্রথা ইউরোপীয় দাসত্ব-প্রথার ন্যায় নহে। দাসদাসীরা সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হয়। নেপালে গণক ও বৈদ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ও বিচারালয় আছে বটে কিন্তু বিচারের কোন পুঁথিলিখিত আইন আছে কি না তাহা লেখিকা জানেন না। মোটের উপর বিচার মন্দ হয় না। পশুপতিনাথ নেপালীর প্রধান দেবতা। এক্ষণে নেপালের অধিবাসীগণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ, অবশিষ্ট হিন্দু। দুর্গোৎসব নেপালের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। তদ্ভিন্ন সেখানেও এ দেশের মত বারমাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা আছে।

এইরূপ বিবিধ তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। আমরা স্থানাভাব বশতঃ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নেপালের সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা জানিতে পারিবেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন, ইহাই আমা-দিগের ঐকান্তিক কামনা।

গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ প্রভৃতিও বেশ পরিপাটি হইয়াছে। আমরা লেখিকাকে সানন্দচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহার লেখনী অমর হউক। ভ্রমণকাহিনী-বর্ণনায় তাঁহার শক্তি অসাধারণ, তাঁহার অধিকতর পরিচয়-লাভের জন্য আমরা উদগ্রীব রহিলাম।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গেলিলিও।

ভারতে যত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে—এমন বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্য ও বিবাদ পুরাণাদি পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এককালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষে ভারতে ঘোরতর ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্প্রদায়-পীড়িত ভারতে ইউরোপের লোমহর্ষণ ধর্ম্ম-

বিপ্লবের সাদৃশ্য মিলিবে না। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নরকের যে দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও সভ্যসমাজকে লজ্জা দিতেছে। ধর্ম্মের নামে, ভগবানের নামে শত শত নরনারীকে জীবন্ত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে বিপক্ষ-পক্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, চিরশান্তশীতল বিজ্ঞান-তরুচ্ছায়াশ্রিত সুধী ব্যক্তিকেও মধ্যযুগের ইউরোপ নিপীড়িত করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে কোপার্ণিকাস প্রচার করিলেন যে পৃথিবী সচলা, সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন সূর্য্যের গতির নির্দ্দেশক নহে, পরন্তু পৃথিবীর ভ্রমণ জন্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্বে সকলের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রবর্গ পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোপার্ণিকাসের মত বাইবেলের মতের বিরোধী। পিতৃপুরুষগণের পুণ্যের বলে তাঁহাকে বিশেষ কোন নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বী অনেকেই সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী টাইকো ব্রাহি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, ব্রুনোকে রোমনগরীতে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ করার পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জ্বলন্ত অগ্নিতে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। বিচিত্র রামধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকর্ত্তা এণ্টোনিও ডমিনিসের কারাগারে মৃত্যু হওয়াতে জ্বলন্ত অগ্নির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। এই প্রবন্ধে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইবে তিনিও রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুর চিরশীতল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অপরাধ এই যে ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন তাহাই লোকসমাজে নির্ভয়ে প্রচার করিয়াছিলেন। এখন বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালক পৃথিবীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে যে ইহা প্রচার করিতে গিয়া কাহাকেও কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, কাহাকেও দস্যুতস্করের ন্যায় দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে, এমন কি কাহাকে কাহাকেও জ্বলন্ত অনলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে পৃথিবীর সচলতা কোপার্ণিকাসের বহুপূর্ব্বে আর্য্যভট্টের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। উহা পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী ছিল না এমন নহে। কিন্তু ভারতের চিরউদার ধর্ম্মভাব কখনও বিজ্ঞানের সেবককে উৎপীড়ন করে নাই। যে সকল মহাপুরুষ বিজ্ঞানের সেবায় লাঞ্ছনার বন্ধন জয়মাল্য বলিয়া নতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাত্মা গেলিলিও তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান। শেষবয়সে তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাঁহার উজ্জ্বল নয়নজ্যোতি নৈশগগনের অতুল সৌন্দর্য্যের ভিতর বিশ্বজগতের কত গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

গেলিলিও গেলিলি (Galileo Galilei) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তঃপাতী পিসানগরে

জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভিন্‌সেনজো উচ্চকুলোদ্ভূত কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; অঙ্কশাস্ত্রে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার প্রবল অনুরক্তি ছিল। গেলিলিও এই দুইটি বিদ্যায় আসক্তি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই গেলিলিওর বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বালক গেলিলিওকে এটা সেটা ছোট ছোট খেলানা, যন্ত্র প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদাই দেখা যাইত। পুত্রের এইরূপ বিজ্ঞানাসক্তি দেখিয়া পিতা কিঞ্চিৎ ভীত হইতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে অঙ্কশাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের সেবা করিলে অন্ন-সংস্থান হওয়া বড়ই সুকঠিন হইবে। তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপকের বাৎসরিক মাহিনা ছিল ২০০০ স্কুডি (প্রায় ৬৫০০৲ টাকা), আর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের মাত্র ৬০ স্কুডি বা ২১৫৲ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০৲ টাকারও কম। সেইজন্য তিনি গেলিলিওকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু গেলিলিও বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িতে পারিলেন না। পিতার অজ্ঞাতসারে অসটিলিও রিচ্চি (Ostillio Ricci) নামক একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের নিকট ইউক্লিডের জ্যামিতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ইউক্লিড শেষ করিয়া আর্কিমিডিসের গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই সংবাদ পিতার নিকট পঁহুছিলে, তিনি পুত্রের বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিয়া অগত্যা পুত্রের মতেই মত দিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া বালক গেলিলিও অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা আন্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই ঐ দুই শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শেষে তাঁহার পিতা যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—ছাব্বিশ বৎসর বয়সে গেলিলিও নির্দ্দিষ্ট ২০৲ টাকা মাসিক বেতনে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এখানেও দেখিতে পাইতেছি "যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। গেলিলিও পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হয়ত কালে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে অর্থই কি জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা? তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া যে অমূল্য সামগ্রী—অক্ষয় কীর্ত্তি—লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কুবেরের সমগ্র ভাণ্ডারের বিনিময়েও পাওয়া যায় না।

পেণ্ডুলামের নিয়ম আবিষ্কার।

পঠদ্দশাতেই গেলিলিওর মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পেণ্ডুলামের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলাম সকলেই দেখিয়াছেন; এই পেণ্ডুলামের গতির উপর ঘড়ির ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে। গেলিলিও একদিন গির্জ্জায় আরাধনা করিতে গিয়াছেন, গির্জ্জার কড়িকাষ্ঠ হইতে যে বড় আলোকাধার ঝুলিতেছিল তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। আলো সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছে এবং তখনও ল্যাম্পটা দুলিতেছিল। গেলিলিও এক হস্তের দ্বারা অপর হস্তের

নাড়ীর স্পন্দন গুণিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে ল্যাম্পটা কত সময়ে একবার দোলে তাহাও দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দেখিতে পাইলেন যে ল্যাম্পটা প্রথমে জোরে ক্রমে আস্তে আস্তে দুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু দেখা গেল, জোরেই হউক আর আস্তেই হউক ল্যাম্পটা ঠিক সমপরিমাণ সময়েই এক দিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে। নাড়ীর স্পন্দন গুণিয়া তিনি সময় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। তিনি বাটী আসিয়া একগাছি দড়িতে একটা ভারী জিনিস বাঁধিয়া দোলাইতে লাগিলেন এবং গির্জ্জায় যাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণ করিলেন। এইরূপে পেণ্ডুলামের সমগতিত্ব (isochronism) আবিষ্কৃত হইলে প্রথমে উহা ঘড়ির নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয় নাই, প্রথম প্রথম নাড়ী স্পন্দনের গতি নির্ণয়কল্পে ব্যবহৃত হইত; পরে হিউজেন্স উহা ঘড়ির নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহার করেন।

পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম আবিষ্কার।

আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, তাহার উত্তর বলুন ত। একটা দশ সেরা আর একটা এক সেরা ওজন লইয়া কলিকাতার মনুমেণ্টের উপর হইতে দুইটাকে এক সময়ে ছাড়িয়া দিলাম। বলুন দেখি কোনটা কোন সময়ে নীচে পঁহুছিবে। আপনি যদি গেলিলিওর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন—কেন, দশ সেরা ওজনটা এক সেরা ওজনের দশগুণ আগে মাটিতে পড়িবে। গেলিলিওর আগে লোকে এইরূপই জানিত। বিখ্যাত প্রাচীন দার্শনিক এরিষ্টটলও (Aristotle) দশসেরা ওজন একসেরা ওজনের অপেক্ষা দশগুণ ভারি বলিয়া দশগুণ শীঘ্র মাটিতে পড়িবে তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরিষ্টটল অবশ্য পরীক্ষা করিয়া একথা লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তিনি যখন এই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন তাহা অভ্রান্ত বেদবাক্য। গেলিলিও বলিলেন—না, তা হইতে পারে না; দুইটা ওজনই **একসঙ্গে** মাটিতে পড়িবে। তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার মতের জন্য তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে উপহাস করিতে ত্রুটি করিলেন না। একদিবস তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়া পিসার সুবিখ্যাত "লিনিং টাওয়ারে" (Leaning tower) উপস্থিত হইলেন। এই বৃহৎ স্তম্ভটি আটতালা উচ্চ ও একদিকে হেলিয়া আছে। তিনি একটি পঞ্চাশ সের আর একটি আধ সের ওজনের গোলা লইয়া এই স্তম্ভের উপরে উঠিলেন এবং উপরে গিয়া একই সময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল যে গেলিলিও এই ব্যাপারে হাস্যাস্পদ হইয়া যাইবেন; কিন্তু যখন সকলে দেখিতে পাইলেন যে গোলা দুইটি একসঙ্গে ধমাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল তখন তাঁহারা নিজেরাই বোকা বনিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্ট দিবালোকে ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখিয়াও গেলিলিওর কথায় বিশ্বাস করিলেন না; নানারূপ বাক্যজালে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণারই পোষকতা করিতে লাগিলেন। অন্ধবিশ্বাস প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়ই অচল; জ্ঞানের খরস্রোতে না পড়িলে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া বড়ই দুষ্কর। একথা যেমন সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে

সত্য, বিজ্ঞানসম্বন্ধেও যে অসত্য তাহা নহে।

দশ সের ও এক সের ওজনের দ্রব্য একসঙ্গে কেন মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহা অতি সহজে পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। মনে করুন আপনি এক সের ওজনের এগারটি বল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই এগারটি বলকে একসঙ্গে একজায়গা হইতে ফেলিয়া দিলেন। অবশ্য সকলগুলিই একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তাহার পর উহাদের দশটি একসঙ্গে জুড়িয়া দিলেন এবং এই জোড়া বল ও বাকি বলটিকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে উহারা একসঙ্গে পড়িবে না কেন? যে দশটি বলকে একসঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে এখন জোড়া হইয়াছে বলিয়া কি দশগুণ আগে পড়িবে? কখনই না। সেইরূপ একখণ্ড কাগজ ও একটা টাকা একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তবে এক্ষেত্রে বাতাসের দরুণ কাগজখণ্ড বাতাসে উড়িতে থাকিবে। যদি বায়ুনিষ্কারণ-যন্ত্রে (air pump) বায়ুকে নিষ্কাষিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে টাকাটি ও কাগজের টুকরা ঠিক একই সঙ্গে পড়িয়া যাইবে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্র এই পরীক্ষাটি কলেজে দেখিয়া থাকেন।

গেলিলিও পিসায় অবস্থানকালে পতনশীল দ্রব্যের (falling bodies) পতন সম্বন্ধে আরও অনেক গবেষণা করিতে লাগিলেন—ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু যতই তিনি নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহার উপর ততই খড়্গহস্ত হইতে লাগিলেন। তিনি তিন বৎসরের জন্য অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন বৎসর শেষ হইতে না হইতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সংসারে একটি ভ্রাতা ও তিনটি ভগিনী। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যবশতঃ ভেনিসের মন্ত্রণাসভা তাঁহার সুনাম শুনিয়া ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পতুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তিনি আঠার বৎসরকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি দিক্-দর্শনযন্ত্র (telescope) আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

গেলিলিও পতুয়াতে মাত্র দুই বৎসর অধ্যাপকতা করিয়াছেন এমন সময়ে বিজ্ঞানজগতে একটি লোমহর্ষণ ঘটনার অভিনয় হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে কোপার্ণিকাস প্রচার করিলেন যে পৃথিবী সচলা ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সূর্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষীগণ এবং বাইবেল উপদেশ দিয়াছেন যে পৃথিবীই এই জগতের কেন্দ্রস্থল। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কোপার্ণিকাস তাঁহার প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইবার অল্পকাল মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন, নচেৎ এই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশের প্রতিকূল মতের আবিষ্কর্ত্তাকে

নিশ্চয়ই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর বিখ্যাত জ্যোতির্বী টাইকো ব্রাহী তাঁহার মতের পোষকতা করিতে গিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। টাইকো ব্রাহী, কেপলার ও গেলিলিওর সমসাময়িক গিওর্ডানো ব্রুনো (Giordano Bruno) নামক একজন তেজস্বী ইতালীবাসী সর্ব্বসমক্ষে কোপার্নিকাসের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন, ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি বাইবেলের বিরোধী মত প্রচার করিতে নিষিদ্ধ হইলেন, তখন তিনি উত্তর করিলেন যে বাইবেল মানুষকে ভগবানকে ভালবাসিতে ও পবিত্রজীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের রহস্য নির্দ্ধারণকল্পে রচিত হয় নাই।

রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত হইতেছেন রোমের পোপ। তখনকার দিনে ধর্ম্মদ্বেষীদের বিচারের জন্য "ইনকুইজিশন" (Inquisition) নামক এক বিচারালয় ছিল। এখানকার বিচারকগণ উচ্চপদস্থ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। এই বিচারালয়ে ধর্ম্মদ্বেষী ব্রুনোর বিচার হয়। বিচারের ফলে তাঁহাকে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ করা হয়। তখনও নির্ভীক চিত্তে নিজের মতের পোষকতা করাতে তাঁহাকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

গেলিলিও যৌবনকাল হইতে কোপার্নিকাসের মতের পরিপোষক ছিলেন। সেইজন্য ব্রুনোর এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে তিনি নিজে যে বিচলিত হন নাই এমন বোধ হয় না। গেলিলিও বহুদিবস যাবৎ কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করিবার জন্য নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বী কেপ্লারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমি প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি সংগৃহীত করিয়াছি, কিন্তু সে গুলি প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি না; কারণ আমার ভয় হয় যে তাহা হইলে আমাদের গুরু কোপার্নিকাসের দশাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদিও তিনি কয়েকজনের নিকট অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ নির্ব্বোধ ব্যক্তির নিকটই উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।"

কোপার্নিকাসের মত কেবল বাইবেলের মতের বিরোধী বলিয়া সকলের নিকট উপহাস ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়াছিল তাহা নহে। তাহার প্রধান কারণ মানব চরিত্রের এক প্রধান গূঢ় রহস্য। কোপার্নিকাসের শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এরিষ্টটল, টলেমে, হিপার্কাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার বিপরীত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঋষিস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহাদের মতের ভ্রান্তি কল্পনা করাও মহাপাপের কার্য্য। কোপার্নিকাসের ও গেলিলিওর সমসাময়িক পণ্ডিতেরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে বিজ্ঞানের লোকবিচার করিবার অবসর নাই। অমুকে বলিয়াছেন বলিয়া সত্য সত্য নহে, সত্য সত্য বলিয়াই সত্য। বাগভটের উক্তি—

ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্ ॥

তাঁহাদের জানা থাকিলে এত অনর্থ ও

রক্তপাত হইত না। "তস্মাৎ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্"—যাহা সুভাষিত তাহাই গ্রাহ্য। স্বাধীন চিন্তা, বিকাশ, বিস্তৃতি, বিজ্ঞানের প্রাণ। যদি পুরাতন ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বিজ্ঞান সমূলে উৎপাটিত করিবেই করিবে, উহার জন্মদাতা অমুক বলিয়া তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। বিজ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহার সেবকেরা সত্যের মহিমায় দীপ্ত হইয়া পৃথিবীর অত্যাচারকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই কোপার্ণিকাস, টাইকো, ব্রুনো, কেপ্‌লার, গেলিলিও লোকলজ্জা ও উপহাসকে ভয় না করিয়া অকুতোভয়ে বিজ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কোপার্ণিকাসের পর কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত অভিজ্ঞতা পৃথিবী অর্জ্জন করিয়াছে, এখনও কি এই প্রাচীনের প্রতি অহেতুকী ভক্তি গিয়াছে? সেদিন যখন চার্লস ডারউইন মানবের ক্রমবিবর্ত্তনের সংবাদ প্রচার করেন তখনও তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বেষী বলিতে অনেকে বিরত হন নাই। আমাদের দেশেও কত অসত্য প্রাচীনত্বের দাবী করিয়া অবাধে চলিয়া যাইতেছে। যদি কেহ বলেন যে "স্বর্ণবটিত মকরধ্বজ" সোণার পাথরবাটীর মত একটি অবাস্তব পদার্থ, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি "তাণ্ডবনৃত্য" বলিয়া পরিচিত করিবার লোকের অভাব নাই। প্রাচীনের প্রতি সম্মান করিব, কিন্তু উহা প্রাচীন বলিয়াই অভ্রান্ত, একথা স্বীকার করিয়া লইব না—এই শিক্ষা আমরা কোপার্ণিকাস ও গেলিলিওর জীবনচরিত হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোপার্ণিকাসের মতের পোষকতা করিবার জন্য গেলিলিও প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। এতদিন কোপার্ণিকাসের মত অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছিল। গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহার চাক্ষুস প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূরবীক্ষণের আবিষ্কার একটু বিচিত্র। হলাণ্ড দেশে জ্যানসেন ও লিপারসে নামক দুইজন চশমাবিক্রেতা বাস করিত। প্রবাদ এই যে জ্যানসেনের ছেলেপিলেরা একদিবস দুইখানা আতসী কাচ লইয়া খেলা করিতে করিতে দেখিত পাইল যে কাচ দুখানা এক ভাবে ধরিলে সম্মুখের গির্জ্জার চূড়াটা খুব নিকটস্থ ও উল্টা দেখা যায়। তাহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের পিতাকে সংবাদ দিল। এই সংবাদ পাইয়া জ্যানসেন ও লিপারসে কাচদুইখানি একখানি কাষ্ঠে বসাইয়া চশমার দোকানে নূতন খেলানা বলিয়া রাখিয়া দিল। একদিন মার্কুইস স্পিনোলা দোকানে গিয়া খেলানাটি ক্রয় করিয়া আনিয়া যুবরাজ মরিসকে দেখাইলেন। যাহা হউক এই চশমাবিক্রেতাদের খেলানার সংবাদ অস্পষ্টাকারে গেলিলিওর নিকট পঁহুছিয়াছিল। গেলিলিও এই সংবাদে এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সমস্ত রাত্রি তিনি এই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। প্রাতে উঠিয়া আতসী কাচ লইয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে যখন এই খেলানায় দূরের গির্জ্জার চূড়া নিকটে দেখায় তখন বহুদূরস্থিত আকাশের নক্ষত্রাবলী কি এই যন্ত্রের সাহায্যে নিকটস্থ

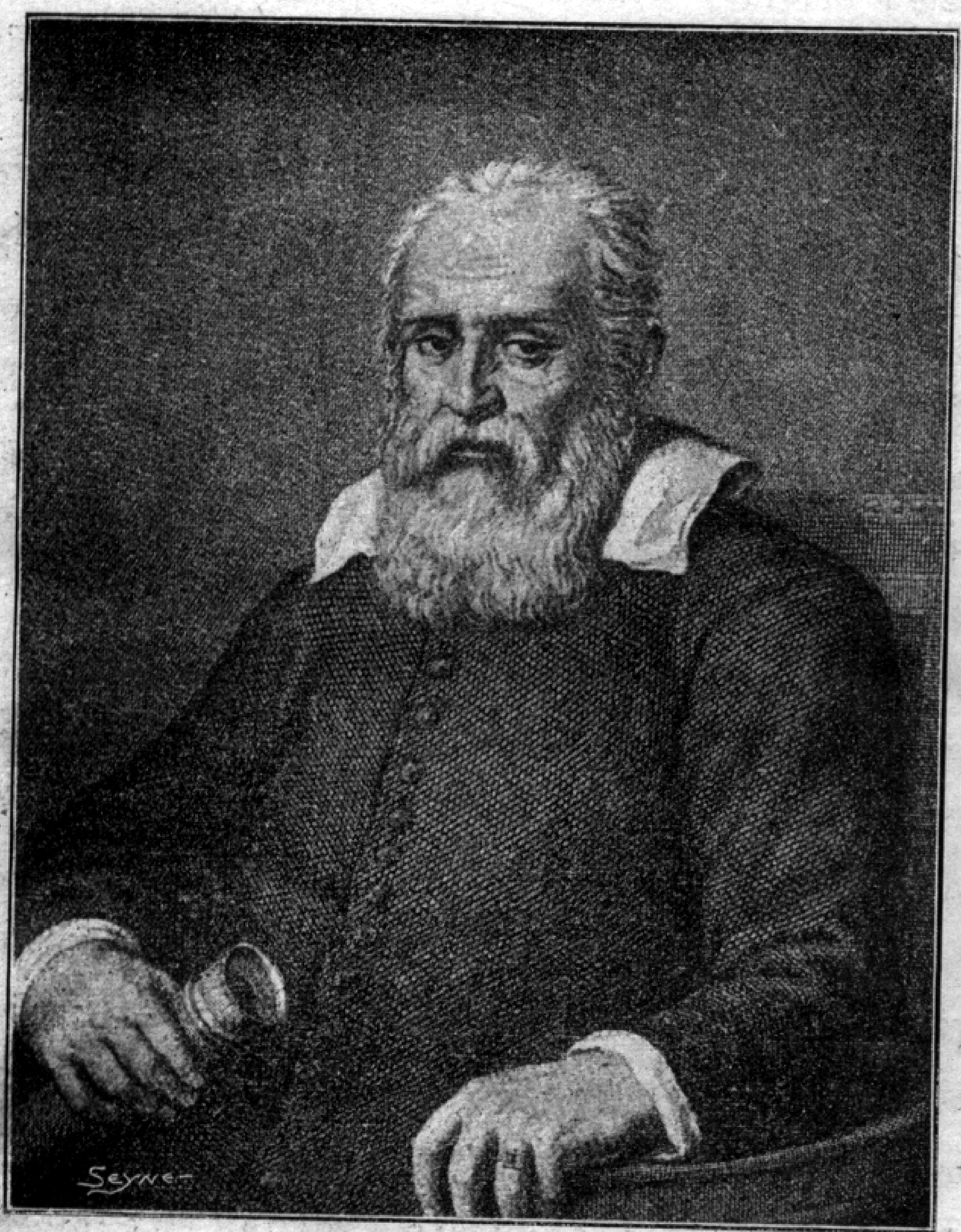
দেখাইবে না? তা যদি হয়, তাহা হইলে আকাশমার্গের কত গূঢ় রহস্যই না প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কত অজানিত জগৎ সম্মুখে দেখা যাইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রের কত নূতন অদ্ভুত সংবাদই না গৃহীত হইবে। এইরূপ ধারণা তাঁহাকে একেবারে চঞ্চল করিয়া ফেলিল। তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার নিকট অর্গান বাজাইবার একটা নল ছিল, অনেক চেষ্টার পর নলের একমুখে একখানি উন্নতোদর (Convex) লেন্স ও আর এক মুখে একখানি নতোদর (Concave) লেন্স বসাইয়া দিয়া তার ভিতর দিয়া, সোৎসুকনেত্রে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। তাঁহার যন্ত্রে দূরের জিনিস খুব নিকটস্থ ও তিনগুণ বৃহৎ দেখাইতে লাগিল। উপরন্তু চশমা বিক্রেতার খেলানার ন্যায় ইহাতে পদার্থ সকল উলটা না দেখাইয়া সবই সোজা দেখাইতেছিল। তখন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। বাস্তবিক কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করার পর মনে এত আনন্দের উদয় হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ তাহা অনুভব করিতে পারে না। অনেক সময়ে অনেককে হাসিতে, নাচিতে, এমন কি আনন্দে ক্ষণিক অপ্রকৃতিস্থ হইতে শুনা যায়। আর্কিমিডিসের বিষয় কথিত আছে যে তিনি স্নানাগারে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা কল্পিত বিষয়ের মীমাংসা মনে উদয় হওয়াতে তিনি এমনই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া "আমি পাইয়াছি! আমি পাইয়াছি!" এই বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া বাটী পঁহুছিয়াছিলেন।

গেলিলিও এই অদ্ভুত যন্ত্র লইয়া তাড়াতাড়ি ভেনিস নগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত করিতে লাগিলেন। প্রবীণ বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত যষ্টিতে ভর করিয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া সুদূরস্থ জাহাজ সকল নিকটস্থ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে তাঁহার নাম ব্যক্ত হইয়া পড়িল। "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—কিবা রাজদ্বারে, কিবা রাজবর্ত্মে সর্ব্বত্রই তিনি পূজা পাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার মাহিনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অধ্যাপকতা আজীবনস্থায়ী করিয়া দিলেন।

তাহার পর তিনি যাহাতে উহা অপেক্ষা কার্য্যকরী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নিজেই লেন্স ঘসিয়া স্বহস্তে আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। এই যন্ত্রের দ্বারা এখন তিনি রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় নীল অম্বরের সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রই গেলিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রিয়া অবগত আছেন। সাধারণ পাঠককে দুই এক কথায় মোটামুটি অনেকটা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। সাধারণ আতসী কাচ সকলেই দেখিয়াছেন—তাহা উন্নতোদর লেন্স। যদি আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি সংযত করা যায় তাহা হইলে, সূর্য্যের একটি ছোট গোল সাদা ছবি অপর দিকে পড়িয়া থাকে। উহা উল্টা। এই নিকটস্থ উল্টা ছবি আর একখানি

উন্নতোদর লেন্সের ভিতর দিয়া দেখিলে উল্টা এবং বড় দেখায়। দিক্‌দর্শনযন্ত্রে একখানি উন্নতোদর ও একখানি নতোদর লেন্স ব্যবহৃত হওয়াতে সোজা ছবি পাওয়া গিয়াছিল। চশমাবিক্রেতা দুইখানিই উন্নতোদর লেন্স ব্যবহার করাতে ছবি উল্টা হইয়াছিল। আজ যে সকল বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ভ্রমণশীল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, অনন্ত সৌরজগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় সংবাদ মানবের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসিয়াছে, সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশ যে রত্নপ্রসূ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।



গেলিলিও।

চন্দ্র

স্বভাবতই গেলিলিও চন্দ্রের প্রতি তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম ফিরাইলেন। হায় কবি! তুমিই বিজ্ঞানের প্রধান শত্রু। তুমি চন্দ্রকে ধরিয়া আনিয়া রমণীর সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা দিয়া থাক, তাহাতে আপত্তি করিব না (যদিও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিটোল, চাকা থালার ন্যায় সুগোল, থ্যাব্‌ড়ানো বদন কয়জন পাঠক পছন্দ করিবেন তাহা আমি জানি না—)কিন্তু তুমি কবি নেশার ঝোঁকে চন্দ্রের মধ্যস্থিত পর্ব্বত উপত্যকাকে শশীর কলঙ্ক, বুড়ির চরকা প্রভৃতি আজগুবি ব্যাপার কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানের পথ একেবারে রোধ করিয়াছ। তুমি বিচিত্র রামধনুকে বাসবের বা রামের ব্যবহৃত ধনু বলিয়া লোক-সমাজে প্রচার করিয়াছ। তুমি নক্ষত্রবর্গকে সুর-সুন্দরী সাজাইয়া চন্দ্রকে রোহিণী প্রভৃতি সাতাইশ সুন্দরীর বহুপত্নীক স্বামী গড়িয়াছ। তোমারই বাক্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিয়া অবাধে গ্রহণ

করিয়া লইয়াছে। এ ঘটনা শুধু ভারতেই ঘটিয়াছে তাহা নহে। সমগ্র আদিম মানব-সমাজে এইরূপ কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয় না। তাই যখন গেলিলিও তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন যে পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেও পর্ব্বত, উপত্যকা, সমতলক্ষেত্র প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তখন সে সংবাদ কেহই বিশ্বাস করিল না। তাহাও কি কখন হয়? ঐ স্বর্গীয়, শান্তশীতল, সুধাময় চন্দ্রবদন কখনও কি পাহাড় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ হইতে পারে? তিনি আবার এই সকল পাহাড়ের উচ্চতাও মাপিয়াছিলেন—কোনও পর্ব্বত পাঁচ মাইল, কোনটি বা সাত মাইল উচ্চ। তাঁহার অপরাধের সংখ্যা এখনও শেষ হয় নাই—তিনি প্রচার করিলেন যে যেমন চন্দ্র সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া কিরণ বিতরণ করে, সেইরূপ পৃথিবীও কিরণ বিতরণ করিয়া থাকে। সকলেই তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদে দেখিয়া থাকিবেন, যে কাস্তের মত চাঁদের উজ্জ্বল কলার সঙ্গে চাঁদের অপর অংশ অস্পষ্ট দেখা যায়। গেলিলিও বলিলেন এরূপ দেখা যাইবার কারণ আর কিছুই নহে—পৃথিবীর কিরণ চাঁদে পড়িয়া চাঁদে "পৃথিবীজ্যোৎস্নার" উদয় হইয়া থাকে। আমরা যেমন পৃথিবী হইতে চাঁদ দেখি, চাঁদে যদি কোনও জীব থাকিত তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ আলোকময় পৃথিবী দেখিত। কেবল পৃথিবী তাহাদের কাছে চাঁদের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল ও প্রায় ষোলগুণ বড় দেখাইত।

গেলিলিওর এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ তাৎকালিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কাটা ঘায়ে নুণের ছিটার মত পড়িল। জ্ঞানের বৃদ্ধির প্রয়োজন কি—যদি চন্দ্রকে এইরূপে স্বর্গের দেবতার আসন হইতে পদচ্যুত হইতে হয়। কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধ-বাদীরা বলিতেন যে পৃথিবী একটি গ্রহ হইতে পারে না, কারণ অন্যান্য গ্রহের ন্যায় উহার কিরণ নাই। গেলিলিও "পৃথিবী-কিরণ" আবিষ্কার করাতে তাঁহাদের আর একটি অবলম্বন খসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮)

মুখশুদ্ধি ও ধূমপান।

আহারের পর মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু, বৈরাগী প্রভৃতি যাঁহারা সাংসারিক ভোগ-সুখের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারা মুখশুদ্ধির জন্য হরিতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অশৌচ অবস্থায় যখন আমরা বিলাসিতার দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিয়া থাকি, তখন আমরাও আহারের পর হরিতকী ব্যবহার করি। অপর সময়ে আমরা পান

অথবা সুপারি, লবঙ্গ, এলাইচ প্রভৃতি মসলা আহারের পর নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি।

আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতাগণ হরিতকীর গুণের এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে তাঁহারা এই ফলকে "প্রাণদা," "সুধা," "ভিষক্‌প্রিয়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটী সাধারণ বচন প্রচলিত আছে যে বরঞ্চ মাতাকেও কখন কুপিতা হইতে দেখা যায়, কিন্তু উদরস্থ হরিতকী কখনই উগ্রস্বভাব ধারণ করে না অর্থাৎ হরিতকীর ব্যবহারে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে আহারের পর মুখের মধ্যে ভুক্তদ্রব্যের একটা আস্বাদ ও গন্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিলেও এই গন্ধ বা স্বাদ একেবারে দূরীভূত হয় না। নিজে অনুভব করিতে না পারিলেও কাহারো সহিত কথা কহিলে ঐ ব্যক্তি উক্ত গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। যে কোন প্রকার মুখশুদ্ধির ব্যবহারে ঐ গন্ধ ও স্বাদ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়।

অনেকের মুখে স্বভাবতঃই একটা দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে খাদ্যের সুপরিপাক না হইলে অথবা যকৃতের ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন না হইলে মুখে বিজাতীয় দুর্গন্ধ অনুভূত হয়; ইংরাজীতে ইহাকে foul breath কহে। যাহার মুখে দুর্গন্ধ, অনেক সময়ে সে নিজে তাহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি উহার নিকট থাকে অথবা উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকে কিরূপ একটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। যাহাদিগের মুখে দুর্গন্ধ, তাহাদের সহবাস লোকে সাধ্যমত পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। পান বা হরিতকী নিয়মিতভাবে মুখশুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হইলে এই নিন্দনীয় রোগের সবিশেষ উপশম হইয়া থাকে।

পান বা সুগন্ধি মসলা মুখের ভিতর রাখিলে ঈষৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অধিক পরিমাণে লালা (Saliva) নিঃসারিত হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেত-সার-ঘটিত। লালার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেত-সার অংশ শর্করায় পরিণত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মুখশুদ্ধি করিবার পদার্থ দ্বারা গৌণভাবে খাদ্য-পরিপাকের সহায়তা হইয়া থাকে।

আহারের অব্যবহিত পরে যাহাদের অম্লোদ্গার নির্গত হয়, পান খাইলে তন্মধ্যস্থিত চূণের দ্বারা উহা নিবারিত হয়। অম্লাধিক্য-যুক্ত অজীর্ণ রোগে পানের নিয়মিত ব্যবহারে উপকার সাধিত হইতে দেখা যায়।

আমরা পানের সহিত লবঙ্গ, এলাইচ, মৌরি, যমানী, রাঁধুনি, কাবাবচিনি, দারুচিনি, জৈত্রী, কর্পূর প্রভৃতি যে সকল সুগন্ধি মসলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদিগের সকল গুলিরই কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু-নিঃসারক ও পচননিবারক গুণ আছে। ইহাদিগের ব্যবহারে ভুক্তদ্রব্যের অসাময়িক বিকার (Fermentation) নিবারিত হইয়া পেট ফাঁপা, পেটের মধ্যে দুর্গন্ধময় বাষ্পের সঞ্চার, উদরাময় প্রভৃতি অজীর্ণঘটিত নানাবিধ উপদ্রব হইতে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। তবে পানের সহিত অধিক পরিমাণে সুপারি ব্যবহার করিলে

ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয় এবং সুপারির দোষ থাকিলে মাথা ঘোরা, বমি প্রভৃতি হইয়া শরীর অসুস্থ হয়।

এ দেশে কতদিন হইতে পানের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সুশ্রুত প্রভৃতি অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে পানের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতের মতে পান সুগন্ধি, ঈষৎ উত্তেজক, বায়ুনিঃসারক ও ধারক; ইহার ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হয়। যাঁহাদের পান ব্যবহার করা অভ্যাস, অধিকক্ষণ পান না খাইলে তাঁহারা একটু অবসন্ন ভাব বোধ করেন, পান খাইলেই ঐ অবসাদ অন্তর্হিত হয়। বৈদ্য-চিকিৎসায় বিবিধ রোগে পানের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পানে "পোকা" হইয়াছে বলিয়া একটা মিথ্যা জনরব উঠিয়াছিল, তখন কয়েক দিন পান ছাড়িতে হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু পান এরূপ উপকারী পদার্থ হইলেও ইহার অপরিমিত ব্যবহারে নানারূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায়। মুখের ভিতর সর্ব্বদা পান থাকিলে শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না, সুতরাং কথাবার্ত্তা কহিবার অথবা পাঠ আবৃত্তি করিবার বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে বেশী পান খাইলে জিভ্ মোটা হইয়া উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়, এইজন্য অল্প বয়স্ক বালক দিগকে পান খাইতে নিষেধ করা হয়। পান মুখে করিয়া কথা কহিতে গেলে অনেক সময়ে চর্ব্বিত-পান-মিশ্রিত মুখামৃত নিজের ও নিকটস্থ ব্যক্তির শরীর ও বস্ত্রাদির উপর পতিত হয়; ইহাতে লোকে যে কিরূপ বিরক্ত হয়, তাহা সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বেশী পান খাইলে সর্ব্বদা 'ছেপ্' গিলিবার বা ফেলিবার আবশ্যক হয়; এই উভয় ক্রিয়ার কোনটীই স্বাস্থ্যসম্মত নহে। অনেক লোকের যেখানে সেখানে পানের 'ছেপ্' ফেলিবার কুঅভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে ঘর, দরজা, দেওয়াল, মেঝে, উঠান প্রভৃতি সকল স্থানই অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পাঁচজনের মধ্যে বসিয়া যাঁহারা পিক্‌দানির মধ্যেও 'ছেপ্' ফেলিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয় বুঝিতে পারেন না যে এই কদভ্যাস সমবেত ব্যক্তি-বৃন্দের কিরূপ বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। পানের "পিকে" রঞ্জিত জামা চাদর বড়ই অপ্রীতিকর দৃশ্য নয়নপথে উপস্থিত করে।

অধিক পান খাইলে ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয় এবং পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে যে যাহাদের পান খাওয়া অভ্যাস, দীর্ঘ উপবাসের সময় পান খাইতে পাইলে তাহারা ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করে না, কিন্তু পান না পাইলে শীঘ্র তাহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অধিক পান খাইলে চূণ লাগিয়া মাড়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দাঁত আল্‌গা হইয়া অকালে স্খলিত হয়। চর্ব্বিত পানের অংশ অধিকক্ষণ দন্তগহ্বরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং দন্ত-শূল, মাড়ীফোলা এবং অন্যান্য দন্ত রোগ উৎপাদন করিয়া অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। দন্ত আল্‌গা বা নষ্ট হইলে ভোজন ও পরিপাকের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটে, আমি ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পানের "বিষম" কিরূপ ক্লেশদায়ক, তাহা ভুক্তভোগী

মাত্রেই অবগত আছেন। সর্ব্বদা পান মুখে থাকিলে "বিষম" লাগিবার অধিক সম্ভাবনা।

এই সকল অসুবিধার জন্য কেহ কেহ পানের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিলাতফেরৎ ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই পান খান না, কেহ কেহ পানের পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, এলাইচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সরকারী আপিসে ব আদালতে কাজকর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কাজ করিবার সময় পান ব্যবহার করেন না—এ অভ্যাসটী বড়ই সুসঙ্গত। সাহেবেরা আমাদের পান খাওয়া পছন্দ করেন না, সুতরাং সাহেবদের সহিত যাঁহাদের কাজকর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহাদের সেই সময়ে পান না খাইলেই ভাল হয়। কিন্তু সাহেবদিগের চক্ষে ইহা ভাল লাগে না বলিয়া এই প্রাচীন, নির্দ্দোষ, জাতীয় আচারটীকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই না। কাজকর্ম্ম করিবার সময় পান না খাইয়া আহারের পর বা বিশ্রামের সময় পরিমিত মাত্রায় পান খাইলে কোন দোষ হয় না; বরঞ্চ পূর্ব্বকথিত বিবিধ উপকার লাভ করা যায়। পান খাইয়া মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিলে ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব অকারণ একটী তৃপ্তিপ্রদ উপকারী, ভোগ্য-বস্তু হইতে বঞ্চিত থাকিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যাঁহাদের পানে রুচি নাই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পান আমাদের সমাজে ভদ্রতা ও সম্মান রক্ষার একটী শ্রেষ্ঠ উপকরণ। কেহ বাটীতে আসিলে তাহাকে পান না দেওয়া একটা সৌজন্যবহির্ভূত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। রাজসভায় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে পান বিতরণ বিশেষ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। হিন্দুর সামাজিক আচার মাত্রেই পান একটী মঙ্গলসূচক পদার্থ। পানের চাষ করিবার জন্য হিন্দু সমাজে একটী ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং পানের ব্যবসা করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা সংগ্রহ করিতেছে। পানের পরিমিত ব্যবহারে যখন ইষ্ট ব্যতীত কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না, তখন এই বহুপ্রাচীন জাতীয় আচারের এককালীন পরিবর্জ্জন করিবার উপদেশ সুযুক্তি বা স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করে না।

তামাক।—পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোন আকারে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহবা চুরুট বা সিগারেটের আকারে অথবা পাইপ্, হুঁকা বা গুড়গুড়ির সাহায্যে তামাকের ধূম পান করিয়া থাকে। অপর লোকে দোক্তা, গুল বা সুর্ত্তির আকারে তামাক মুখের মধ্যে রাখিয়া উহার রস গ্রহণ করে; কেহবা নস্যরূপে তামাক ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রে তাম্রকূটের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে তামাকের চাষ বিস্তৃত ভাবে হইলেও ইহা আমাদিগের স্বদেশী বস্তু নহে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেন্‌দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক আমেরিকার অন্তঃপাতী কিউবা (Cuba) প্রদেশ হইতে তামাক প্রথমতঃ ইয়ুরোপে

আনীত হয়। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজগণ দাক্ষিণাত্যে তামাক আনয়ন করেন কিন্তু মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব কালেই সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তামাকের ধূমপান বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ধূমপানার্থ তামাকের ব্যবহার আমেরিকার অসভ্য আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে জগতের সমস্ত সভ্যজাতি শিক্ষা করিয়াছে।

অনেকের ধারণা আছে যে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে বিখ্যাত সর্ ওয়াল্টার্ রালে (Sir Walter Raleigh) আমেরিকার অন্তর্গত নূতন আবিষ্কৃত ভার্জিনিয়া প্রদেশ হইতে তামাক প্রথমে ইংলণ্ডে আনয়ন করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে রালের ভার্জিনিয়া আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আমেরিকা-অভিযান ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ১৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সর্ জন্ হকিন্স্ (Sir John Hawkins) নামক একজন ইংরাজ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যে প্রথম তামাক আনয়ন করেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। তবে সর্ ওয়াল্টার্ রালের দ্বারাই ইংলণ্ডে তামাকের ধূমপান বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে রৌপ্যনির্ম্মিত তামাক খাইবার পাইপ্ বিতরণ করিতেন এবং নিজে সর্ব্বদা তামাক খাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলিতেন। এ সম্বন্ধে একটী কৌতুকপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে। একদিন সর্ ওয়াল্টার্ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া পাইপে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে প্রভুর মুখ হইতে অনর্গল ধূম নির্গত হইতেছে। সে পূর্ব্বে কাহাকেও তামাক খাইতে দেখে নাই। সে মনে করিল যে প্রভুর বস্ত্রাদি কোন রূপে অগ্নিসংযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া এক জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্র আনিয়া আগুন নিবাইবার জন্য সমস্ত শীতল জল প্রভুর মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছিল। রালে এই ব্যাপারে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনেকে হয়ত অবগত নহেন যে ইংলণ্ডে আলুর চাষ রালে কর্ত্তৃক প্রচলিত হয়। তামাক ও আলু এই উভয় দ্রব্যই আমেরিকা হইতে প্রায় এক সময়ে ইয়ুরোপে আনীত হইয়াছিল।

তামাকের ব্যবহার যখন যে দেশে প্রথম প্রচলিত হয়, তখন সর্ব্বত্রই ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূলাচরণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তবে ওহাবি (Wahabi) মুসলমান ব্যতীত অপর কোন জাতিরই বিরুদ্ধাচরণ বেশী দিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সকলেই কালে তামাকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, কেবল ওহাবিরাই আজি পর্য্যন্ত তামাক কোন আকারে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় তুরুস্কে কেহ ধূমপান করিলে তাহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে তামাকের পাইপটী গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইয়া অবমানিত করা হইত। রুসিয়ার সম্রাট পিটার্ দি গ্রেটের রাজত্ব কালে কেহ নস্য লইলে তাহার নাসিকাচ্ছেদনের সুব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিখগুরু নানক তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তামাকের ব্যবহার নিষেধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আকবরের উদারনীতি

গুণে ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহারের জন্য কাহাকেও কোন নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই।

যে কোন আকারে তামাক ব্যবহৃত হউক না কেন, উহা একটী ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ। তামাকের মধ্যে নিকোটিন্ (Nicotine) নামক একটী তরল প্রবল বিষধর্ম্মযুক্ত পদার্থ আছে। ইহার এক বিন্দুমাত্র উদরস্থ হইলে প্রাণ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতি অল্প মাত্রায় নিকোটিন্ প্রথমতঃ ঈষৎ উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে; মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা, বমন, আলস্য, নিদ্রালুতা, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা, ঘর্ম্ম, তালুর শুষ্কতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা দেশে অনেক বয়স্থা ভদ্রমহিলা পানের সহিত দোক্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দোক্তা খাইবার পর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাঁহারা ইহাকে "দোক্তালাগা" বলিয়া থাকেন। দোক্তার নিকোটিন্ অল্পমাত্রায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বিষক্রিয়া উৎপাদন করে। নিকোটিনের মাত্রা অধিক হইলে শরীরে অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঘাড় লুটাইয়া পড়ে, নাড়ীর গতি মৃদু ও ক্ষীণ হয়, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, হস্তপদ অবশ ও শীতল হয়, দৃষ্টি-শক্তি লোপ হয়, ক্রমে শরীর হিম হইয়া মূর্চ্ছা ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।

যাহারা দোক্তা বা সুর্তি ব্যবহার করে অথবা তামাকের পাতা চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখের ভিতর রাখিয়া উহার রসগ্রহণ করে, তাহাদের তামাকের বিষ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হইবার কথা। তবে যে অনেক স্থলে কোন অনিষ্ট সাধিত হইতে দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে তামাক যে কোন আকারে মুখে রাখিলে লালার স্রাব এত অধিক পরিমাণে নির্গত হয় যে সর্ব্বদাই তাহাদিগের "ছেপ্" ফেলিবার আবশ্যক হয়। "ছেপে"র সহিত অধিকাংশ নিকোটিনই বহির্গত হইয়া যায়, তজ্জন্য উপরোক্ত বিষলক্ষণ সমূহ শরীরের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় না। তবে দোক্তা প্রথম ব্যবহার করিবার সময় অথবা উহার মাত্রা অধিক হইলে অনেকেই বিশেষ অসুস্থতা অনুভব করিয়া থাকে। যে কোন আকারে তামাক মুখের মধ্যে রাখা কোন মতেই নিরাপদ নহে।

তামাকের ধূমপান করিলে তন্মধ্যস্থিত অধিকাংশ নিকোটিন্ দগ্ধ হইয়া যায়, এজন্য তামাক বিষাক্ত পদার্থ হইলেও অধিকাংশ লোকেই উহার ধূমপান করিয়া অসুস্থতা বোধ করে না। যত প্রকার মাদক দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে কেবল তামাকের ধূমপান দ্বারা অধিক অনিষ্ট সাধিত হয় না। তবে যাহারা প্রথম চুরুট বা পাইপ্ খাইতে আরম্ভ করে, তাহারা প্রথম প্রথম গা-বমি, মাথাঘোরা ও দৈহিক অবসন্নতাজনিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ নিকোটিন্ চুরুটের ধূমের সহিত দেহমধ্যে শোষিত হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করে।

তামাক যদি ব্যবহার করিতেই হয়, তাহা হইলে যে উপায়ে তন্মধ্যস্থ বিষাক্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথামত হুঁকা বা গুড়গুড়িতে ধূমপান করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না।

জলের মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় নিকোটিনের অংশ জলে দ্রব হইয়া যায়, সুতরাং চুরুট, সিগারেট্ বা পাইপ্ হইতে উদ্গত ধূমের সহিত উহা যেমন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায়, হুঁকা বা গুড়গুড়িতে তামাক খাইলে তদ্রূপ না হইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে এদেশে অনেক সাহেব ধূমপানের জন্য গুড়গুড়ি ব্যবহার করিতেন; এখন এপ্রথা সাহেবদের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে এরূপভাবে তামাক খাইলে তামাকের উত্তেজনা-শক্তি শরীরের মধ্যে মোটেই প্রকাশ পায় না, সুতরাং গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া আর না খাওয়া দুই সমান। আমরা কিন্তু এই মতের পোষকতা করি না।

পরিমিতভাবে চুরুট বা সিগারেট্ ব্যবহার করিলে অনেকেরই পক্ষে উহা অনিষ্টকর হয় না; তবে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের তামাকের ধূমপান একেবারেই সহ্য হয় না। যাঁহারা ধূমপানে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলেন যে ইহা দ্বারা শ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হইয়া শরীর পুনরায় সতেজ ও কার্য্যক্ষম হয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রমজীবিগণ তামাক না খাইয়া অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; তামাক পাইলে তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ সহ্য করিয়া থাকিতে পারে। তাহাদিগের অভ্যাস ও তামাকের উত্তেজনা-শক্তি, এই উভয় কারণই ইহার মূলে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ তামাক পরিমিত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, ততক্ষণ ইহাদ্বারা কোন বিশেষ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না; সুতরাং যাহাদের তামাক খাওয়া অভ্যাস, তাহাদিগের এরূপ সুলভ, ক্লান্তি-অপহারক, ভোগ্যবস্তু হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য যে আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তামাকের মোটেই আবশ্যক নাই এবং যাহারা তামাক খায় না, অন্য উপায়ে তাহাদের পরিশ্রমজনিত শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, তজ্জন্য তামাকের প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ যে কোনরূপ মাদকদ্রব্যের পরিবর্জ্জন যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না।

বয়স্থ লোকের পক্ষে পরিমিত মাত্রায় চুরুট বা সিগারেট্ ব্যবহার করা অনিষ্টকর না হইলেও বালক ও যুবকদিগের পক্ষে উহা নিরাপদ নহে। তাহাদিগের বৃদ্ধিশীল স্নায়ুমণ্ডলী ও শারীরিক অপরাপর যন্ত্রাদি ইহার বিষক্রিয়া দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহাদের পরিপাক-শক্তি ক্ষীণ হয়, মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল হয়, এবং ক্রমে তাহারা নিতান্ত আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়ে। অনেক যুবকের হয়ত ধারণা আছে যে চুরুট বা সিগারেট্ মুখে দিলেই তাহারা পরিণতবয়স্ক মনুষ্যোচিত সম্মান-লাভের অধিকারী হইবে; তাহারা বুঝে না যে এইরূপ আচরণ দ্বারা প্রবীণ লোকের নিকট তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আজকাল এদেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে সিগারেট্ ও "বিড়ি" খাওয়া রোগ সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকের মুখে সিগারেট্ শোভা

বার্ণনগরের ভালুক

অনেক লোক আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্যো আকৃষ্ট হইয়া সুইট্‌জারলাণ্ডের বিভিন্ন অংশে সমবেত হয়। বার্ণনগর সুইজারলাণ্ডেরই একটি নগর। এ স্থানের দৃশ্যসমূহ আদৌ চিত্তাকর্ষক নহে; এবং ইহার প্রাচীন ঐতিহ্য, কিম্ভূত কিমাকার প্রস্রবণ ও জমকাল সেতু ব্যতীত দর্শকগণের মনোরঞ্জক নয়নবিমোহন আর কোন দ্রব্যই নাই। ইহা সত্ত্বেও বার্ণনগর সদাসর্ব্বদাই অসংখ্য পর্য্যটকের কোলাহলে মুখরিত; তাহারা কেবলমাত্র ভালুক দেখিবার জন্যই এই নগরে আগমন করে।

প্রত্যেক পান্থশালার দ্বারদেশে বিশেষরূপে চিত্রিত একখানি নক্‌শা ঝুলান আছে। তাহাতে ভালুকের গহ্বরে যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, সুদূরবর্ত্তী নানা দিগ্দেশ হইতে আগত অগণ্য দর্শককে এই পথ দেখাইবার জন্য পান্থশালার কর্ম্মচারী-দিগকে প্রায় সমস্ত দিন সেই দ্বারদেশে বসিয়া থাকিতে হইত। পূর্ব্বদেশ হইতে সমাগত রাজদূত, লর্ড উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী, সুচারুরূপে সজ্জিতা উচ্চবংশোদ্ভবা ভদ্রমহিলা ও অনলঙ্কৃতা গ্রাম্য কৃষকপত্নী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া উৎসুকনেত্রে ভালুকদের হাস্যজনক অঙ্গভঙ্গী ও ক্রীড়াকৌশল দর্শন করে। মাতৃক্রোড়স্থিত শিশু হইতে অকর্ম্মণ্য রুগ্ন ব্যক্তির জন্য নির্ম্মিত বেত্রাসনে উপবিষ্ট পক্ককেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ইহাদের বিভিন্নপ্রকার কৌতুককলাপ অবলোকন করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করে। একই লোক কতবার দেখিতে আসিতেছে; তথাপি কেহই দর্শনে ক্লান্তিবোধ করিতেছে না।

এই বার্ণনগরের ভালুকের ইতিবৃত্তের উৎপত্তিস্থল সুইট্‌জারল্যাণ্ড পূর্ব্বে এক অজ্ঞাত প্রকাণ্ড বন্য প্রদেশ ছিল; এবং তাহার পার্ব্বত্য উপত্যকার এই সকল বৃহৎ বলবান, সুন্দর কোমল পিঙ্গল বর্ণ লোমে আবৃত ভালুকেরা টাউন হলে বিচরণ করিত। কিন্তু কোন সময়ে ইহারা মনুষ্যের হস্তে প্রথম বন্দীরূপে অবরুদ্ধ হয় তাহা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। বার্ণের টাউন হলে বিদ্যমান একটী মোহর হইতে কেহ কেহ ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দ ইহাদের অবরোধকালের প্রারম্ভ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বার্ণনগরের সংস্থাপকের স্মৃতিস্তম্ভে এক ভালুক শিরস্ত্রাণ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, বৃহৎ পিঙ্গলবর্ণ পার্ব্বত্য ভল্লুকের প্রতিমূর্ত্তি অতি প্রাচীনকাল হইতেই বার্ণনগরের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; এবং রাজ্যের পুরাতন আয়ব্যয় পুস্তকের আলোচনা করিলে আরও জানিতে পারা যায় যে, বিগত চারিশত বৎসর যাবৎ দ্বাদশ বা পঞ্চদশটি ভালুকের অবস্থান ও আহারের বাৎসরিক ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

ইহাদের শারীরিক গঠন অতীব মনোহর, আচার ব্যবহার সুনিয়মিত, এবং বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যখন ইহারা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকে তখন ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা কথা কহিতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে ইহারা অব্যবস্থিত চিত্তে মুখভঙ্গী করে। সকল প্রকার ভালুকই হাস্যরস-পূর্ণ; কিন্তু এই নগরের জন্তুরা বেশী আমোদপ্রিয়, সততই প্রফুল্লচিত্ত এবং অতি নম্রপ্রকৃতি। ইহাদের পারিবারিক জীবন অতীব সুখময় ও শান্তিপূর্ণ; কারণ ইহাদিগকে কখন "সার্কাসে" বা পশুশালায় কষ্টভোগ করিতে হয় না।

ইহাদের জন্য পরিষ্কার বাসস্থান এবং বৃহৎ ক্রীড়াভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থদানে এবং জনসাধারণের ইচ্ছাপত্রদ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে ইহাদের জীবন যাত্রা বেশ সুখে সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়। একজন নির্জ্জনতাপ্রিয় মুমূর্ষ ব্যক্তি তাঁহার দানপত্রে লিখিয়া গিয়াছেন,—"উহারা (ভালুকেরা) আমার বহুদিবসব্যাপী আন্তরিক বন্ধু ছিল; অতএব ইচ্ছা করি, যে, আমার প্রদত্ত অর্থ ইহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দ্ধারিত কোন উৎসবোপলক্ষে ব্যয়িত হইবে।"

ইহাদের অন্য একজন বৃদ্ধ সুহৃদ্বর মৃত্যুশয্যায় এই বলিয়া অর্থদান করিয়া গিয়াছেন যে, স্নানাগার ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় ইহাদের স্নানের বিশেষ অসুবিধা ঘটে; সেইজন্য এই অর্থের দ্বারা উহার আকার দ্বিগুণীকৃত হউক। সর্ব্বাপেক্ষা আমোদজনক দানপত্র এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রতি বৎসর "খ্রীষ্টমাসের" সময় তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে অন্ততঃ একশত পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক মূল্যের দুইটি নব-পল্লবিত "পাইন" বৃক্ষ ক্রীত হইবে; বৃক্ষদ্বয় ইহাদের আবাস গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত



ভল্লূকগহ্বরের প্রাচীর।

হইবে, যাহাতে ইহারা বৃক্ষের উপরে ও নীচে পরস্পরকে অনুধাবন করিতে পারে এবং শাখা ধরিয়া দোল খাইতে সমর্থ হয়। এক ফ্রাঙ্কের মূল্য প্রায় তের আনা।

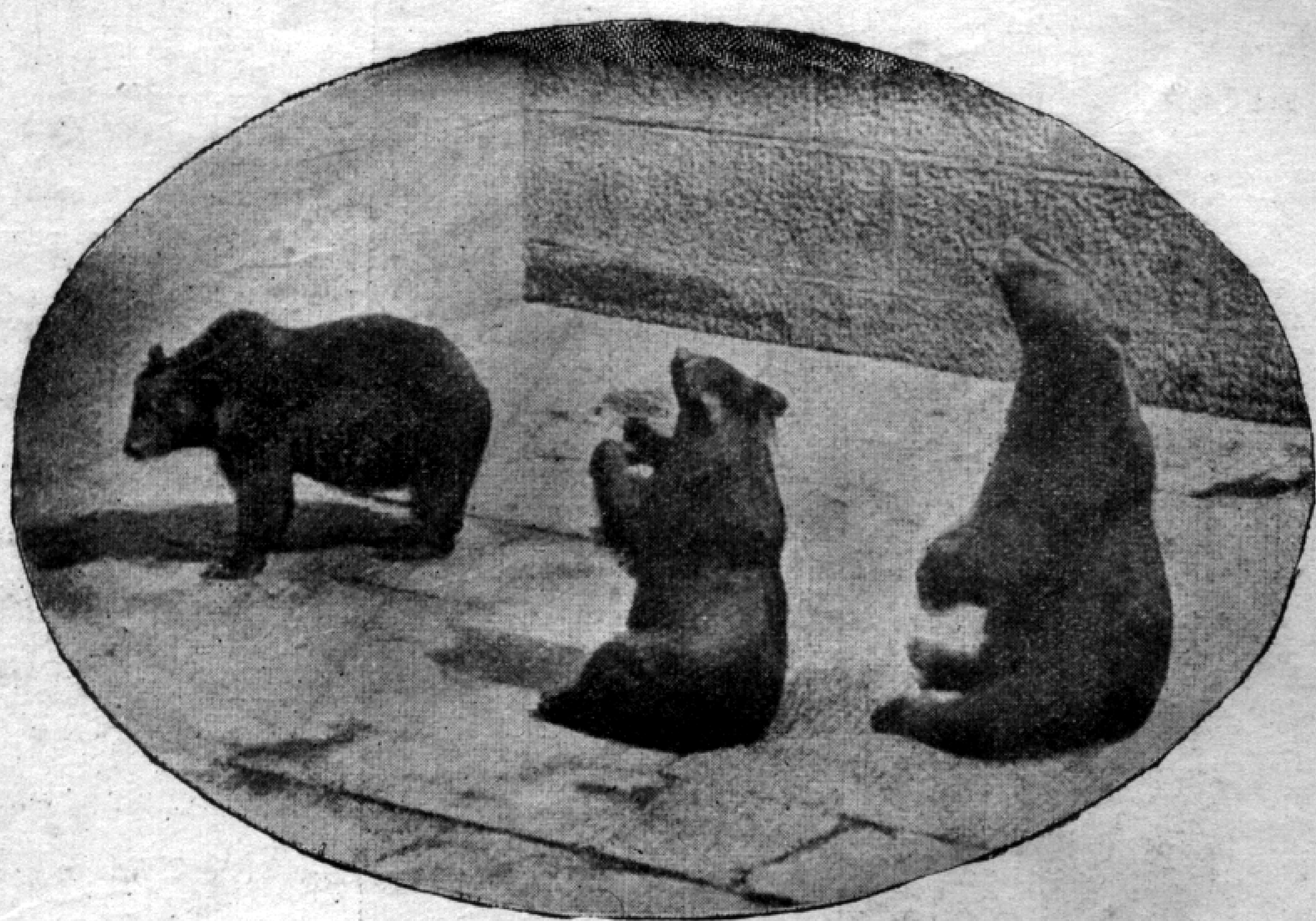
এই লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের বাসস্থান ধূসরবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল বাটী। প্রাচীরবেষ্টিত বর্ত্তুলাকার ভালুকদের গহ্বরটি বাটীর সহিত একত্র সংলগ্ন। গহ্বরের নিম্নস্থিত প্রস্তরভূমির সহিত বাটীর তলদেশ সমীকৃত; নীচের তলার উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া গহ্বরে আসিবার পথ। ইহারা বাহিরে অসংখ্য দর্শকের কোলাহলধ্বনি হইতে শান্তি পাইবার আশায় ইচ্ছামত বিশ্রামাগারে পলায়ন করিতে পারে। শয়ন-প্রকোষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে অপর দুইটি নাতিবৃহৎ কামরা আছে। সেখানে রক্ষকগণ ইহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য আহার্য্য এবং বশীভূত ও নিয়মাধীন হইতে শিক্ষাদান করে। দ্বিতলস্থ কামরায় তিনজন কর্ম্মচারী বাস করে; একজন বৃদ্ধ রক্ষক, তাহার স্ত্রী ও অপর একজন অল্পবয়স্ক সহকারী বালক ইহাদের যথাবিধি তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। ইহাদের প্রকোষ্ঠগুলি সর্ব্বদাই বিশেষরূপে পরিচ্ছন্ন থাকে এবং প্রতি রাত্রে ভালুকেরা নিদ্রিত হইলে গহ্বরটি আদ্যন্ত পরিষ্কৃত হয়।

ইহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, ভল্লুক-রোগ চিকিৎসায় পারদর্শী একজন পশুচিকিৎসক তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং বৎসরের মধ্যে একবার ইহাদের দন্ত উল্টাইয়া পরিদর্শন করা হয়। গহ্বরে সর্ব্বদাই প্রায় আটটি হইতে বারটি ভালুক থাকে। এবং প্রয়োজন হইলে বৃদ্ধ জন্তুকে নিঃশব্দে হত্যা করিয়া উহার স্থলে অল্পবয়স্ক ভল্লূকশাবক রক্ষিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ভালুকেরা অশেষ আমোদে ও বিমল শান্তিতে দিন যাপন করে; কেবল মধ্যে মধ্যে সুন্দরাকৃতি স্ত্রীজাতীয় ভালুকের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়।

গহ্বরের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর আছে। এই প্রাচীর গহ্বরটি দুই পৃথক অংশে বিভক্ত। এক অংশে বৃদ্ধ জন্তুরা, অপর অংশে ভল্লূকশিশুগুলি রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাচীরের সহিত ইংলণ্ডস্থ কোন ছাত্রের শোকান্তক জীবননাট্য মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অসমসাহসিক যুবক অবিবেচকের ন্যায় তর্ক করিয়াছিল যে, যখন গহ্বর মধ্যে জন্তুরা স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিবে, তখন সে প্রাচীরের উপর দিয়া

অনায়াসে চলিয়া যাইবে, নিম্নদেশে পতিত হইবে না। একদিন প্রাতঃকালে যুবক এই প্রাণহানিকর কার্য্যের মহল্লা দিতে উদ্যত হইলে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সেখানে কেহই উপস্থিত ছিল না। মধ্যপথে সঙ্কীর্ণ পিচ্ছল কিনারার উপর পদস্খলিত হওয়ায় একেবারে সে নিম্নে ক্রীড়াকৌতুকরত জন্তুগণের মধ্যে পতিত হইল। এবং কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই ভালুকেরা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। আর একজন কৃষকেরও এইরূপ মৃত্যুর গল্প লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু নেশার বশীভূত হইয়া সে এই প্রাচীরের উপর শয়ন করিতে গিয়াছিল। তাহারও অন্তিমকাল ইংরাজ যুবকের ন্যায় অতীব করুণরসাদ্র্ক হইয়াছিল।

ইহাদের ভাবভঙ্গী দীর্ঘকাল ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে



ভল্লুকের ভাবভঙ্গী।

দর্শন করিলে, রঙ্গালয়ের হাস্যরসপূর্ণ প্রহসনের ন্যায় অনাবিল আনন্দরস উপভোগ করিতে পারা যায়। দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে অভিলষিত খাদ্যদ্রব্য ফুসলাইয়া লইবার জন্য ইহারা নানাপ্রকার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ ইহারা সোজা ভাবে দণ্ডায়মান হয়, গর্ত্তের পার্শ্বস্থিত প্রাচীরে সম্মুখের পদদ্বয় রক্ষা করিয়া দর্শকের প্রতি কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে। তারপর ইহারা প্রাচীর হইতে সরিয়া আসিয়া পশ্চাতের পদভরে ইতস্ততঃ চলাচল করে। সেই সময় তাহাদের নাসিকা সঞ্চালন দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা কথা কহিতেছে। ইহাতে মনোরথ পূর্ণ না হইলে ইহারা বসিয়া পড়ে এবং শরীরের ভর-সামঞ্জস্য করিয়া থাবা ঊর্দ্ধে বিস্তার করিয়া দেয়। বাক্‌শক্তিহীন জন্তুর পক্ষে ইহাই একপ্রকার বাক্যালাপ! এই করুণদৃশ্যে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়; এবং দর্শকগণ ইহাদের মস্তকের উপর হইতে অভীষ্ট দ্রব্য সমূহ নিম্নে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেও ইষ্টবস্তু লাভে অকৃতকার্য্য হইলে, ঊর্দ্ধ প্রসারিত বাহুদ্বয় নীচে ফেলিয়া দেয়; এবং উভয় থাবা সংযুক্ত করিয়া গভীর নৈরাশ্যপীড়িত ভঙ্গীর সহিত দর্শকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তারপর নিশ্চলভাবে মেজের উপর সোজা হইয়া শয়ন করে! তখন দর্শকগণ উহাদের উদরের উপর খাদ্যদ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করেন। আহারান্তে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিরও যবনিকা পতন হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি ভালুকশিশু প্রত্যহই দেখিত যে, তাহার বয়োজ্যেষ্ঠগণ গহ্বরস্থিত বৃক্ষের উপরে ও নীচে অনায়াসে যাতায়াত করে, কিন্তু তাহার বৃক্ষারোহণ করিতে আদৌ সাহসে কুলাইত না। তারপর একদিন হঠাৎ বিপুল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে বৃক্ষে আরোহণ করিল, কিন্তু আর নিম্নে অবতরণ করিতে পারিল না। দুই দিন সে বৃক্ষের উপরই রহিল। কিন্তু তৃতীয় দিবস ভয়ে ও ক্ষুধার জ্বালায় তীব্র চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ রক্ষক ইহাকে নানাবিধ আহার্য্যের লোভ দেখাইয়াও নীচে অবতরণ করাইতে পারিল না। অবশেষে রজ্জু ও বাঁশের সিঁড়ির দ্বারা কোনপ্রকারে নীচে নামাইয়া আনিল। পরদিন পুনর্ব্বার বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সেইরূপ ভীষণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিন্তু দুই দিবসব্যাপী মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদের পরও তাহারা ইহাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল।



ভল্লুকের ভিক্ষা।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

ছায়া শিশু

রাত্রি প্রায় দশটার সময় "ক্লেমেন্ট ডারণফোর্ড" দরজা খুলিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যের হস্তে টুপিটা দিয়া চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ধাত্রী এসেচে কি?" ভৃত্য বলিল "আজ্ঞা হাঁ ধাত্রী এসেচে এবং সে বালিকার অভ্যর্থনার জন্য সকল রকমে প্রস্তুত হয়ে আছে। আপনি ঘণ্টা বাজালেই সে এসে সাক্ষাৎ

করবে।" ভৃত্যের হস্ত হইতে ডাকের চিঠি পত্রগুলা লইয়া ডারণফোর্ড তাহাকে বিদায় দিয়া "নির্দ্দিষ্ট" কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চিঠিপত্রগুলা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অত্যন্ত দ্রুত অস্থির ভাবে গৃহ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। আর অর্দ্ধ ঘটিকা পরেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে সময়ের জন্য এই সুদীর্ঘ এক-বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়া আছেন, যাহার প্রত্যেক মুহূর্তটীও যুগের মত বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, এখনি তাহার শেষ হইবে। মাত্র অর্দ্ধঘটিকার ব্যবধান! তাঁহার চঞ্চল দ্রুতপদক্ষেপই তাঁহার মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল, তিনি ভাবিতেছিলেন "সত্যই কি আজ তাঁহার দারুণ দুঃখের অবসান হইবে?"

এ সংগ্রামে জয়ী হইল কে? যখন দ্বাদশ মাস পূর্ব্বে "কেট্ ডারণফোর্ড" তাহার স্বামীকে ভগ্নহৃদয় ও অপমানিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল যে জীবনে এ বাটীতে আর কখনও প্রবেশ করিবে না। স্বামীর পক্ষে ইহাপেক্ষা কষ্টের ও অপমানের বিষয় কিছুই নাই। কেট্ ডারণফোর্ডের বিষয়ে এইটুকু বলা যায় যে জগতের যাবতীয় বস্তু বা মানব অপেক্ষা মেয়েটীই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। আর তাহাকে লইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে। তবে—তবে—লোকে ভিক্টর ম্যানিংএর নাম তাহার সহিত জড়িত করিতে চাহে কেন?

ঐ তিন বৎসরের বালিকাটি ডারণ-ফোর্ডেরও সুখের কেন্দ্র, ভবিষ্যতের আশা জীবনের একমাত্র আনন্দ। নিষ্ঠুরা কেট্ তাহাকে অপহরণ করিয়া তাঁহাকে সুখ-স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া গিয়াছিল। যখন ভিক্টর ম্যানিং সম্ভবতঃ কেটের চিন্তার অনেকখানি অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল—তখন—তখন কেবল ঐ বালিকার সরল সুন্দর মুখখানি আর তাহার শান্ত মধুর হাসিটুকুই ডারণফোর্ডকে শান্ত রাখিতে পারিয়াছিল। জীবনে ক্ষতিপূরণ আছে! তিনি নিজের অজ্ঞাতে কন্যার প্রতি অত্যন্তিক স্নেহে হয়ত পত্নীর গন্তব্য পথ সুগম করিয়াই দিয়াছিলেন। আর সেই অসীম স্নেহই হয়ত তাঁহার স্নেহ-পুত্তলিকে হারাইবার কারণ। যাক্! অতীত চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান উপস্থিত আর অর্দ্ধঘটিকার অপেক্ষা। ইহারই মধ্যে সেই লাঞ্ছিতা রমণী তাঁহার কন্যাকে লইয়া ফিরিয়া আসিবে। সে এখন সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার করায়ত্ত! যদিও তাঁহাদের মধ্যে একত্র বাস—চিরজীবনের জন্যেই ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন কেবল অপরাধিনী তাহার অপরাধের দণ্ডস্বরূপ স্বহস্তে তাহার বালিকা কন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। যাহাকে সে তাহার পিতার অসীম স্নেহবাহুর দৃঢ়বন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

সমস্তই প্রস্তুত! যে খেলাঘর পোষাক পরিচ্ছদ খেলানা প্রভৃতি তাহাদের ক্ষুদ্র সুকুমার প্রভুটির জন্য মৌন বেদনায় অপরিচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল আজ তাহাদের সেই পলাতক ছোট অধিকারীটির আগমন আশায় তাহারা আবার মার্জ্জিত পরিস্কৃত মূর্ত্তিতে যেন আনন্দের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। যে ছোট বিছানাটি এই দ্বাদশ মাস শূন্য পড়িয়াছিল আজ আবার তাহার পার্শ্বে গিয়া তিনি

দাঁড়াইবেন! ছোট ছোট দুখানি কোমল হাত নিবিড় ভাবে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিবে! সে কি সুখস্পর্শ! ছোট বালিশটির উপর নরম চুলে ঢাকা ছোট্ট মুখখানি রাখিয়া নিদ্রাজড়িত আধ-আধ ভাষায় তাঁহার কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে করিতে শ্রান্ত চক্ষুদুটি ঘুমে ঢলিয়া পড়িবে। যে কথা—যে সুর শুনিবার জন্য তাঁহার পিপাসিত কর্ণ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—যাহা কত সুদীর্ঘ দিন তিনি শুনিতে পান নাই! তাঁহার প্রাণাধিকা! চির-প্রিয়তমা বালিকা—আজ ফিরিয়া আসিবে! যাহার অদর্শনে এই দ্বাদশমাস দ্বাদশযুগের মতই তাঁহার ক্ষুধিত তাপিত তৃষিত চিত্তে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছিল!

কি যুদ্ধই তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল! প্রথমতঃ কেটের কোন সংবাদই ত পাওয়া যায় না। পরে উকীলের একটি ছলনাপূর্ণ বিজ্ঞাপন তাহাকে বাহির করিতে সক্ষম হয়। তারপর বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ। প্রথমে শিশুকে ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার। তারপর অনুনয় বিনয় ক্রন্দন এবং পরে পুনরায় পলায়ন। আবার উহারই পুনরভিনয়। শেষ ফল কেট্ তাহার কন্যাকে অদ্য রাত্রে স্বহস্তে ফিরাইয়া দিয়া যাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে!

বাহিরে গাড়ীর চাকার শব্দ। তারপর গাড়ীবারান্দায় গাড়ী থামার শব্দ শুনা গেল। ডারণফোর্ডের মনে হইতেছিল তাঁহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দনধ্বনি বাহিরেও হয়ত শোনা যাইতেছে। তথাপি তিনি আপনাকে সংযত করিয়া প্রথমে ঘণ্টাধ্বনি তারপর হলঘরে তাহাদের আগমন শব্দ অবশেষে তাঁহার কক্ষের দ্বার মোচনের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। "কিন্তু—বালিকা কথা কহিতেছে না কেন? ডাকিতেছে না কেন? পিতা 'কোথায়' প্রশ্ন করিতেছে না কেন?"

দরজা খুলিয়া গেলে কেট্ ডারণফোর্ড তাঁহার কার্ডের সহিত এক সময়েই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডারণফোর্ড পুনরায় দরজা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। রমণী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিলেন সে দিকে তাঁহার লক্ষ্যও ছিল না। মায়ের সহিত কন্যাকে না দেখিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে ডারণফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মেয়ে কোথা? আমার কিটি কোথা?" কেট্ শ্রান্তভাবে ক্লোকটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার স্কন্ধচ্যুত হইয়া ক্লোকটা খুলিয়া পড়িল তখন ডারণফোর্ড দেখিলেন কেটের মুখে একটু শ্রান্তভাব থাকিলেও সে এখনও তেমনি অনিন্দনীয়া সুন্দরী। পূর্ব্বের মতই তাহার লাবণ্য অটুট বরং মানসিক অবসাদে তাহা অধিক মনোহারিণী!

স্বামীর প্রশ্নে কেট্ অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর দিল "আমার আজ এই সময় এখানে আস্‌বার কথা ছিল তাই—তাই বল্‌তে এসেছি।" ডারণফোর্ড উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি—কালো-পোষাকে এসেচ কেন?" প্রশ্ন করিয়াই হঠাৎ তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। নিজের প্রশ্ন ছুরিকাঘাতের মত তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। চমকিত হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "তুমি কালো পোষাক পরেচ কেন? কিটি সঙ্গে নেই কেন?"

কেট্ অসহায় ভাবে হস্ত প্রসারণ করিল, মুখের ভাবে দারুণ বেদনা প্রকাশ করিতেছিল। বাষ্পজড়িত অবরুদ্ধ স্বরে উত্তর দিল "কিটি নাই!"

ক্লেমেণ্ট সেকথায় সন্দেহ করিবার কোন কারণই পাইলেন না। তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট! পত্নীর সেই কাতরভাব রোদনারক্ত কম্পিত ওষ্ঠ, তাহার শোকসূচক-কাল পোষাক—সমস্তই ত তাহার বাক্যের পোষকতাসূচক—তাহার সেই নিষ্ঠুর নির্ম্মম অথচ নিশ্চিত সত্যপ্রকাশের অনুকূল। ক্লেমেণ্ট গঠিতমূর্ত্তির মতই অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। "কিটি নাই" এই সহজ সত্যটিই যেন ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রথম চিন্তা অবশ্যই সেই সন্তানহীনার প্রতি সমবেদনাসূচক নয়। আপনার অসহ্য দুঃখে তাঁহার সমস্ত চিত্ত তখন অভিভূত। তিনি ভাবিতেছিলেন তাঁহার পুণ্যগৃহ শ্মশানের মত চিরশূন্যতা লইয়াই আর্ত্তভাবে হাহাকার করিতে থাকিবে। ছোট বিছানাটি কেহই আর অধিকার করিবে না। নার্শকে বিদায় দিতে হইবে। সেই ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর কিটি,—যাহার উপর তাঁহার ভবিষ্য জীবনের সমস্ত আশা ভরসা সুখশান্তি নির্ভর করিতেছিল—সে আজ তাঁহার জীবনের পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে! তাঁহার সুখস্বপ্নের এইখানেই তাহা হইলে শেষ! সে নাই! সে নাই!—কিটি নাই!

ক্লেমেণ্ট কাঁদিলেন না। কি রোগে কোথায় কিটির মৃত্যু ঘটিল জিজ্ঞাসা করিলেন না। চিন্তাশক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি সে অবস্থাতেও এইটুকু তাঁহার জ্ঞান ছিল যে তাঁহার স্ত্রী তখন সেখানে উপস্থিত আর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলাই প্রয়োজন।

অপরিসীম মানসিক বলে আপনাকে যথাসাধ্য সংযত রাখিয়া অস্বাভাবিক ঔদাস্যের সহিত তিনি কহিলেন। "আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলেম। বিশেষতঃ তোমার জন্য। কারণ তার অভাব তোমায় হয়ত খুবই আঘাত দেবে?" কেট্ ডারণফোর্ড মুখ তুলিয়া স্বামীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখের ভাব ক্রমশই কঠোর হইয়া আসিতেছিল। বহুপূর্ব্ব হইতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ডারণফোর্ডের "হৃদয়" নামক দ্রব্যটি একেবারেই নাই। আজ তাহা দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হইল। কোনও হৃদয়বান মনুষ্যই এমন শান্ত সংযত নির্ব্বিকারভাবে আপনার সন্তানের মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে না।

সুধু আপনার জেদ বজায় রাখিবার জন্য—আপনার প্রভুত্ব বিজ্ঞাপনের জন্যই তিনি পত্নীর নিকট হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! স্নেহাভিভূত পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক মমতার জন্য নয়! এই যে ভীষণ যুদ্ধ,—শরীরমনিষ্পেষণকারী আইনের কূট ব্যবস্থাজাল এ সমস্তই তাহা হইলে পত্নীকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিয়া আপনার বশে আনিবার অস্ত্রস্বরূপ! সন্তানের জন্য সে চিত্তে কোন ব্যাকুলতা নাই—ছিলও না! কেট ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্লোকটা

তুলিয়া লইয়া যথাস্থানে নিবদ্ধ করিয়া স্বামীর দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিলেন "হাঁ তাহার অভাব আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে—একমাত্র সেই আমার বেঁচে থাক্‌বার কারণ ছিল তা তুমি জান! তোমার আমাকে বল্‌বার আর তবে কিছুই নেই—তাহলে আমি এখন যেতে পারি?"

অনেক চেষ্টায় আপনার উদ্বেলিত চিত্তকে শান্ত করিয়া লইয়া ক্লেমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এখন তাহলে একাই আছ?" রমণীর সুন্দর মুখ উত্তেজনায় আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সরলভাবে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন "হাঁ—নিশ্চয়ই। তোমার বাড়ী ছেড়ে যাবার পর কিটি ছাড়া দ্বিতীয় সঙ্গী আমার কেহই ছিল না।" কথা কয়টিতে ক্লেমেণ্টের মন একটু কোমল হইয়া আসিল। তিনি মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ম্যানিং সম্বন্ধে যে কথা উঠেছিল তা'হলে সেটা কি সত্য নয়?" কেট্‌ পূর্ব্ববৎ গর্ব্বিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"এক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এই বাটীতে ছিলেম তখন ত তুমি এ সম্বন্ধে আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর নি? সত্য মিথ্যা জান্‌তে চাওনি সে সম্বন্ধে কোনদিন কোন চেষ্টাও করনি—এখন? এখন আমি কোন কথাই বল্‌ব না। বিদায়—।" দরজা খুলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গাড়ীর শব্দে ডারণফোর্ড বুঝিতে পারিলেন সে একেবারেই চলিয়া গেল। ডারণফোর্ড অর্থহীন দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল তাঁহার জীবনের গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্দেশ্যহীন নিরাশার অন্ধকার জীবনে তাঁহার আর কোনই প্রয়োজন নাই। সব ফুরাইয়া গিয়াছে! তিনি হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। তারপর আকুলকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"আমার—আমার কিটি! আমার সর্ব্বধন—আমার জীবনের আশা—ফিরে আয় ফিরে আয়!"

* * *

ক্লেমেণ্ট ডারণফোর্ড লক্ষ্যশূন্যভাবে তিন চারি মাস ক্রমশ এদেশে সেদেশে ঘুরিয়া আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সেদিন রাত্রে নিরানন্দ গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে ডারণফোর্ড শূন্য মনে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। রাত্রি যদিও শীতল তবু পরিষ্কার জ্যোৎস্নামণ্ডিত। পথিকগণ সানন্দ চিত্তে তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়াই নিজ নিজ গন্তব্যপথে চলিয়াছে। নির্ম্মল মেঘশূন্য উজ্জ্বলরাত্রি তাহাদের কোনদিকে মনোযোগ দিবার অবসর দিতেছিল না। ছুটির পর স্কুলের বালকদের মতই তাহাদের আনন্দপূর্ণ গতি। তাহাদের সেই স্বচ্ছন্দ আনন্দ উপভোগে ডারণফোর্ড কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিলেন। কি ক্ষুদ্রহৃদয় ঐ মানবেরা! কত অল্পে উহাদের সুখ! অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা একটা জনতার নিকট তাঁহার গতিরোধ হইল। সে একটা অল্প মূল্যের রঙ্গালয়। ঠেলাঠেলি করিয়া সকলে টিকিট কিনিতেছিল। পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তিনিও টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অনেক লোক। কেহ

হাসিতেছে। কেহ গল্প করিতেছে। কেহ সিগারেট টানিতেছে, সকলেই সুখী সকলেই আনন্দিত। সেই আনন্দপূর্ণ নরনারীর জনতার মধ্যে একমাত্র তিনিই কেবল নিরানন্দ। তাঁহার যে কি দুঃখ তাহা ইহারা কি বুঝিবে? নিজেরাও গোঁয়ার, ছেলেরাও তাই। দুই চারিটা মরিয়া যাক্ বা বাঁচিয়া থাক্—ক্ষতি বৃদ্ধি বিশেষ কিছুই নাই! এখানকার এই চেঁচামেচি হাস্য পরিহাস, রাসভ-স্বরনিন্দিত সংগীতশ্রবণ ইহাই তাহাদের আনন্দ! ডারণফোর্ড চক্ষু বুজিয়া আশ্চর্য্য ভাবে ভাবিতে লাগিলেন যে "তিনি কিজন্য এস্থানে আসিয়াছেন?"

যখন তিনি চোখ খুলিয়া চাহিলেন তখন স্থানটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, এবং ব্যাণ্ড বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্মুখের সাদা পর্দ্দার উপর সেদিনকার বায়স্কোপের চিত্রের তালিকা দেওয়া আছে। এই নূতন দৃশ্যকে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। গোলমাল থামিয়া গিয়াছে! ক্লান্ত চক্ষু এই অর্দ্ধ অন্ধকারে যথেষ্ট বিশ্রাম লাভের অবসর পাইবে!

নিয়মিত ভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখান হইতেছিল। কতকগুলা বৈদেশিকচিত্র কতকগুলা হাস্যরসাত্মক। তারপর সাদা জমীতে একটা দৃশ্যের নাম পড়িতেই দর্শকদের মধ্যে একটা আনন্দের চাঞ্চল্য দেখা গেল। সকলেই আপন আপন আসনে স্থির হইয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। অক্ষর কয়টিতে ডারণফোর্ডের মনেও একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। লেখাটি "শিশুর জন্যে রাস্তা দাও"! দৃশ্যটি একটি রাজপথের! রাস্তায় গাড়ী—ঠেলাগাড়ী—ও পদচারী লোকের অত্যন্ত ভীড়। একজন পুলিস প্রহরী আসিয়া হাত তুলিয়া যেন আদেশ করিল "শিশুর জন্য রাস্তা দাও। "সম্মুখের গলি হইতে চারিদিকের গাড়ী ও ভিড়ের মধ্য হইতে একখানি ঠেলাগাড়ীতে একটি শিশুকে বসাইয়া ধাত্রী গাড়ী ঠেলিয়া আসিতেছিল। শিশুটি বড়ই সুন্দর। অত্যন্ত প্রফুল্ল মুখে সম্মুখের দর্শকদের দিকে হাত নাড়িয়া সে হাসিতেছিল! ডারণফোর্ড বার বার চক্ষু মুদিতেছিলেন। দৃশ্যটি স্বপ্ন না প্রকৃত? এ শিশু যে তাঁহারি মৃত সন্তান! আর ধাত্রীও তাঁহার পরিচিতা! তিনি যখন দাঁড়াইয়া দর্শকের চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া দেখিতেছিলেন তখন তাঁহার স্পষ্টই মনে হইতেছিল শিশু তাঁহার প্রতিই চাহিয়া আছে—তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিতেছে—দর্শকদের ঠেলিয়া এখনি সে তাঁহার কোলে ঝাঁপিয়া পড়িবে। আনন্দ হাস্য ও করতালির মধ্যে দৃশ্যটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্লেমেণ্ট প্রতি রজনীতেই সেই অল্প মূল্যের আনন্দাগারে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই গভীর বেদনামিশ্রিত সুখ সপ্তাহকাল তিনি ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। সেই একটিমাত্র দৃশ্য তাঁহাকে কোন যাদুমন্ত্রে বশীভূত করিয়া রাখিয়া ছিল। হতভাগ্য নৈরাশ্যপীড়িত সন্তানহীন পিতা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া সুধু রাত্রের সেই একখানি মাত্র ছায়া চিত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। সেই হাস্যময়—আনন্দময় শিশুর ছবি খানিই একমাত্র চিন্তার ও প্রলোভনের বস্তু। ছবিখানিতেই তিনি

অতীত জীবনের সুখপূর্ণ দিবসের মধুরতার আস্বাদ উপভোগ করেন।

একরাত্রে রঙ্গালয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইয়া গেল ডারণফোর্ডের ইঙ্গিত দৃশ্যটি দেখিতে পাওয়া গেল না। সে দিন প্রোগ্রাম বদল হইয়া গিয়াছিল—সুধু বদল নহে, পূর্ব্বের দল সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ডারণফোর্ডের মনে হইল তাঁহার জীবনের সকল গ্রন্থিই আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার মৃত সন্তান-কেও আজ হারাইয়াছেন—এমনি হতভাগ্য তিনি!

অভিনয় শেষে ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিনীত প্রার্থনায় তিনি সেই পুরাতন দলের ঠিকানা জানিয়া লইলেন।

পরদিন ঊষালোকে তাঁহাকে এডিনবরার পথে দেখা গেল। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির হইয়া গিয়াছে। ভগবানের দয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ! দিনের দিন শরীরের অবস্থা মন্দ হইতেছিল। আগেকার সে রুক্ষ কঠোর স্বভাবও আর নাই। এখন সর্ব্বদাই বিনীত। উদ্দেশ্যহীন জীবন এখন কার্য্য পাইয়াছে। প্রতিরাত্রে সেই একটী মাত্র দৃশ্যই তাঁহাকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখে। ছবির দল যেখানে যতদূরেই যাক্ তাঁহাকে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেই হইবে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাইতেও তিনি প্রস্তুত!

অনেক সময় এমনও ঘটিত যে খেলার দল কোনখানে এক রাত্রি থাকিয়াই চলিয়া যাইত, ডারণ ফোর্ড তাহাদের পশ্চাতে ছায়ার মতই ফিরিতেন। তাঁহার এই আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মুখে মুখে তাঁহার বিষয় লইয়া দর্শকের মধ্যে আলোচনা চলিত। সেদিকে তাঁহার লক্ষ্যমাত্র ছিল না। শুষ্ক মুখ, উৎকণ্ঠিত উজ্জ্বল চক্ষু ক্লেমেণ্ট ভূতাবিষ্ট অসাধারণ ব্যক্তির মতই দর্শকের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কেট ডারণফোর্ড দারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসিলেও অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিল যাহাকে সে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাকে সে এখন পর্য্যন্ত ভালবাসে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কোন অজ্ঞাত প্রবল আকর্ষণ তাহাকে সেই পরিত্যক্তের প্রতিই টানিতেছিল। মনে হইতেছিল কোনখানে একটা বৃহৎ ভুল রহিয়া গিয়াছে তাহা সংশোধন করা প্রয়োজন। স্বামীর সেই নিষ্ঠুর ভাব—মৃতকন্যার বিষয়ে তেমন অবিচলিত ঔদাস্য—যাহার কারণ সে বুঝিতে চেষ্টামাত্র করে নাই হয়ত তাহারও কোন বিশেষ কারণ ছিল। যখন আইনের যুদ্ধ চলিতেছিল তখন তিনি পুরুষের আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অহঙ্কারে নিষ্ঠুর ভাব দেখাইয়াছেন কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। জেতা তাহার যুদ্ধের অস্ত্র রণক্ষেত্রেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—এখন আর তাহার বিরুদ্ধে মত পোষণের প্রয়োজন কি? রাগ করিতে গিয়া মনে রাগের ভাব আসে না। এখন কেবল আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে আলোচনা করাই কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম চিন্তা "তিনি কোথায়? দ্বিতীয়, তিনি এখন কেমন আছেন কি ভাবে দিন যাপন করিতেছেন?"

কেট একদিন তাহাদের একত্রবাসের স্মৃতিচিহ্নমণ্ডিত সুখদুঃখের নিকেতন ডারণফোর্ডের বাটিতে গিয়া খবর লইয়া জানিল তিনি এখন আর সেখানে থাকেন না দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কেট গৃহত্যাগী পলাতকের নূতন ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল।

নূতন ঠিকানায় অপরিচিত ভৃত্যের নিকট খবর লইয়া কেট্ জানিতে পারিল ডারণ ফোর্ড বাহিরে গিয়াছেন। ফিরিতে রাত্রি হইবে—ভৃত্য বলিল প্রতি রজনীতেই বাটী ফিরিতে তাঁহার অনেক রাত্রি হয়। কেটের সুন্দর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই মনে হইল এ আঘাত সহ্য করা তাহার উচিত। কারণ স্বামীর বিষয়ে সেত কখনও কোন খবর রাখে নাই—তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানে নাই—তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। পলাতকা অপরাধিনীর তাঁহার কার্য্যে দুঃখিত হইবারই বা কতটুকু অধিকার? স্বামীর মিথ্যা সন্দেহের প্রতি সে ত কোন প্রতিবাদ করে নাই। সে ত বলে নাই যে তুমি ভুল করিতেছ আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; সে শুধু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া ঘৃণা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। আর তাহাতে তাঁহার সন্দেহকে সত্য বলিয়া বুঝিবারই সুযোগ দিয়াছে। কেট স্থির করিল সে গোপনে থাকিয়া ডারণফোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

পরদিন ডারণফোর্ড যখন বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন কেট্ দূরে থাকিয়া দেখিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া কেট্ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অযত্ন পরিচিত পরিচ্ছদ, লোলচর্ম্ম, রেখাকুঞ্চিত মুখ শুভ্রকেশ সমস্তই তাঁহার ভয়ানক মানসিক বিপ্লবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। কেট না হইয়া যদি অপর কোন পরিচিত চক্ষু তাঁহাকে দেখিত কখনই চিনিতে পারিত না। সম্ভবতঃ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। নচেৎ স্থানকাল ভুলিয়া কোন দিকে না দেখিয়া পাগলের মত ছুটিবার কারণ কি?

কেট তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া একটি তৃতীয় শ্রেণীর মিউজিক হলের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডারণফোর্ড টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমটা ক্রোধ ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কেট দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল—পরে অনেকবার ইতস্তত করিয়া সেও টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ডারণফোর্ডকে খুঁজিয়া লইতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না। তিনি নীচে হলের মধ্যে বসিয়া আছেন। চক্ষু মুদ্রিত, অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় ক্রোড়ে ন্যস্ত। নিয়ম মতই দৃশ্যের পর দৃশ্য গতায়াত করিতেছিল। কেট দেখিল ডারণফোর্ড কিছুই দেখিতেছেন না। একজন কর্ম্মচারী একখানা প্রোগ্রাম দিয়া গেলে অনাবশ্যক বোধে অবজ্ঞার সহিতই তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন। কেট্ অনেকটা শান্তভাবে নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিল। যখন ছবি দেখাইবার জন্য অন্ধকার করা হইল, তখন ডারণফোর্ডকে আর দেখা যায় না, তখন অগত্যা কেট্‌কে ষ্টেজের প্রতি মন দিতে হইল।

যে নির্দ্দিষ্ট দৃশ্যটি রাত্রির পর রাত্রি নব নব মধুরতা লইয়া যাদুমন্ত্রে ডারণফোর্ডকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে ক্রমে সেই শিশুর চিত্রটি আসিয়া পড়িল। সেই একখানি মাত্র ছবি এবং নিত্য ব্যবহারে তাহা সাধারণের নিকট অত্যন্ত পরিচিত,—ঘটনাটি একমুহূর্ত্তে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কেটের আর জিজ্ঞাসার কোন প্রশ্ন নাই! তাহার দুই চোখ ছাপিয়া জলধারা ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছিল। তাহার হৃদয়াবেগের আতিশয্য দর্শনে অনেকগুলি সকৌতুক চক্ষু তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

পরদিন স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কেট্ তাঁহার দর্শন পাইল না। সেদিন এডিনবরার অপর কোন অংশে অপর একটি হলের মধ্যে তিনি সেই প্রার্থিত ছবিখানির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি যখন বাহির হইয়া আসিলেন তাঁহার কাতরতাপূর্ণ শোকবিকৃত মুখ, ভারাক্রান্ত দেহের অস্বাভাবিক কম্পিত গতি বেত্রাঘাতের মতই কেটের হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল।

বাটী ফিরিয়াও কেট্ সে মুখ ভুলিতে পারিল না! কম্পিত ওষ্ঠে দংশন করিয়া—অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে ঘর্ষণ করিয়া—নিজের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল না। ভুল—ভুল সে কিছুই বুঝে নাই—কিছুই বুঝে নাই? কেট্ আশ্চর্য্যের সহিত ভাবিতেছিল সে কত ক্ষুদ্র! আর যাঁহাকে সে হেয় ভাবিয়া ঘৃণায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল তিনি কত মহৎ! তাঁহার সেই অপার্থিব অকৃত্রিম বাৎসল্য স্নেহ, যাহার জন্য তিনি সংসার সমাজ গৃহকর্ম্ম সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার অনুসরণে যৌবনে বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়া—পাগলের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সে শুধু একখানি ছায়া—একটি প্রিয় শিশুর স্মৃতিচিহ্ন মাত্র! এই তীব্র ভালবাসার যিনি অধিকারী তাঁহাকেই সে ভাবিয়াছিল হৃদয়হীন! আর নিজের হৃদয়প্রাচুর্য্যের গর্ব্বে সে আপনাকে উচ্চ ভাবিয়া অহঙ্কারের সহিত তাঁহার প্রতি সকরুণ কটাক্ষে চাহিতেছিল—ধিক্!

দীর্ঘ সময়ব্যাপী হৃদয়যুদ্ধে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেলে কেট্ উঠিয়া দ্রুত হস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। যদিও তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল তথাপি ঘণ্টার শব্দে একজন দাসী আসিয়া দাঁড়াইল। কেট্ তাহাকে একখানা গাড়ী আনিতে বলিয়া আপনার ঘুমন্ত শিশুটিকে পোষাক পরাইয়া এবং নিজেও টুপী ও ক্লোক পরিয়া লইয়া অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। গাড়ী আসিতেই দাসী সজ্জিত বালিকাকে তাহার নিকট লইয়া আসিল। সেই ছবির শিশু! শুধু এক বৎসর বয়সের তফাৎ মাত্র! মাতা নত জানু হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিল এবং সুদীর্ঘকাল তাহাকে আপনার দুই ব্যগ্র বাহুর দৃঢ়বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিল। তারপর রুগ্ন শিশুকে যেমন করিয়া লয় তেমনি সযত্নে সন্তর্পণে তাহাকে কাপড়ে জড়াইয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে শকটে আসিয়া আরোহণ করিল। গাড়ী সোজাসুজি একেবারে ডারণফোর্ডের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "তিনি বাড়ী

নাই! আর বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরাই তাঁহার অভ্যাস।" ভৃত্যটির ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে উপরে উঠিতে বাধা দেয়। কিন্তু কেট্ লক্ষ্যমাত্র না করিয়া একেবারে সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিয়া ভিতরের একটি ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েটিকে একখানি কৌচের উপর শয়ন করাইয়া রাখিয়া বারবার তাহার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন করিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বড়ই কঠিন? বড়ই হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা? তথাপি তাহা করিতেই হইবে। ইহাই—তাহার কর্ত্তব্য ইহাই তাহার কৃতকার্য্যের—একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত"।

কেট্ দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল—ঠিক সেই সময় বাহিরের চাবী খুলিয়া গেল ডারণফোর্ড ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই আকুল উৎকণ্ঠার ক্ষণিক উজ্জ্বলতা তখন আর ছিল না, তিনি তখন ভগ্নদেহ বৃদ্ধের মতই কোন রূপে শরীরটাকে টানিয়া বহন করিয়া চলিতেছিলেন। কেটকে দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া কেটের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন—"তুমি?—" স্নেহাবেগে স্বামীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কেট্ উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ক্লেমেণ্ট আমার প্রতি নিষ্ঠুর হোয়োনা—হায় যদি তুমি বুঝ্তে পার্তে তাঁহলে কখনই নিষ্ঠুর হতে পার্তে না।" ডারণফোর্ড ঈষৎ নতশিরে একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া মৃদু ভাবে উত্তর দিলেন "না। তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হর্তে চাই না। আমরা দুজনেই ভুল বুঝেছিলেম, আর শাস্তিও ঢের পেয়েচি। আমি সে জন্য বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখিত।"

কেট্ মুহূর্ত্ত কাল ইতস্তত করিয়া বলিল, "তুমি জাননা আমি কয়দিন থেকেই তোমার অনুসরণ কর্চি, সে ছবি আমি দেখেচি"!

ডারণফোর্ড মুখ তুলিয়া পত্নীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লাবণ্যহীন মুখে আনন্দের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। "সত্যই কি এটা খুব আশ্চর্য্য নয়? তবু আমি যা পেয়েচি তুমি তা পাও নাই—সুধু কয়দিন নয় সে আজ কয়েক মাস হতেই প্রতি রজনীতে আমার! আমি তার পশ্চাতে ইংলণ্ড ঘুরেচি আর মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার অনুসরণে ক্ষান্ত হব না। সুধু তাকে দে। ছাড়া আমার জীবনের আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নেই।" তার পর ঈষৎ কম্পিত রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "তুমি তাকে দেখেচ, তাতে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুখী হয়েচি"!

পত্নীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি অন্যমনে চলিয়া যাইতেছিলেন সহসা ভিতরের ঘর হইতে একটী সুমিষ্ট আহ্বান শব্দ ধ্বনিত হইল। বালিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—অথবা ঘুমাইয়া সে এমন কোন পরিচিত স্বর শুনিয়াছিল যাহা তাহার পিপাসী কর্ণ প্রায় বৎসরের উপর কাল শুনিতে পায় নাই।

ডারণফোর্ড অর্থশূন্য দৃষ্টিতে কেটের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। পাশের ঘর হইতে শিশু কণ্ঠে আহ্বান হইতে লাগিল বাবা! বাবা!" তবুও তিনি গঠিত মূর্ত্তির মতই নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি স্বপ্ন! তিনি কি স্বপ্নে স্ত্রীর সহিত কথা কহিলেন,

আর স্বপ্নেই সেই মধুর আহ্বান তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। স্বপ্ন। স্বপ্ন! তবু কি মিষ্ট ঐ স্বপ্নের সুর? কি মধুর ঐ প্রিয় সম্বোধন।

"ক্লেমেণ্ট আমায় ক্ষমা করতে পারবে কি?—আমি তোমায়—আমি তোমায় মিথ্যা কথায় প্রতারিত করেছি, আমার ভয় হয়েছিল তুমি তাকে আমার যাদুকে জোর কোরে আমার বুক থেকে কেড়ে নেবে,—কিটি বেঁচে আছে"। কেটের বাক্যের শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই পাগলের মত ডারণফোর্ড ছুটিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহুদিনের অশ্রুত কণ্ঠ শুনিয়াও সে চিনিতে পারিয়া পিতাকে ডাকিতেছিল। মুহূর্ত্তে ডারণফোর্ড শিশুকে আপনার দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সেখান হইতে কাহারও সাধ্য নাই আর তাহাকে বিচ্যুত করে।

আনন্দের প্রথম উচ্ছাস কাটিয়া গেলে ডারণফোর্ডের মনে হইল বাহির হইতে যে চাপা ক্রন্দনের অস্ফুট শব্দ আসিতে ছিল তাহা থামিয়া গিয়াছে এবং বাহিরের দরজা খুলিয়া গিয়া আবার বন্ধ হওয়ার শব্দও বাতাসে মিলাইয়া গেল। কন্যাকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন শীতের শীতল রাত্রি বাহিরে প্রচুর পরিমাণে তুষার বর্ষণ করিতেছিল, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোকে সুপ্ত রাত্রির সুগভীর স্তব্ধতাকে জাগাইয়া ডারণফোর্ড পত্নীর নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া আসিলেন। কেহ কোথাও নাই!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

তিব্বতবাসীর বিবাহানুষ্ঠান

বিগত আষাঢ় মাসের ভারতীতে তিব্বতবাসীদের বিবাহ প্রথার পরিচয় দিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহাদের বিবাহকালীন অনুষ্ঠান গুলির কথা লিখিব।

বিবাহের দিবস অতি প্রত্যূষে কন্যার বাড়ীতে একটা সাধারণ রকমের ভোজ হইয়া থাকে। এই ভোজের সময় কুলপুরোহিত উপস্থিত থাকেন। তিনি কন্যার পিতামাতার ইচ্ছাক্রমে সেই গ্রামের সম্মান রক্ষার্থে এবং কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ কামনায় গৃহদেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া উপাসনা মন্দিরে যথা বিহিতরূপে একটী যাগের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সাধারণতঃ তিব্বতবাসীগণ লুই গিয়াল্পো (Lu-i-gyalpo) নামক দেবতার উপাসক। তাহাদের বিশ্বাস যে, এই দেবতাকে যদি সন্তুষ্ট না রাখা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের নানাপ্রকার বিপদাপদ আসিতে পারে। প্রাতঃকালীন ভোজ সমাপ্ত হইয়া গেলে একজন ধর্ম্মপ্রচারক ক'নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে কতকগুলি উপদেশ মন্ত্র শুনায়। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই; কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন পিতামাতা তাহার আপনার। কিন্তু স্বামীর বাড়ী

যাইয়া শ্বশুর শ্বাশুড়িকে পিতামাতার ন্যায় এবং স্বামীর ভ্রাতা ভগিনীদিগকে আপন ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় তাহার ভালবাসা কর্ত্তব্য। যথা সাধ্য স্বামীর সেবা করা ও তাহার সন্তোষ বিধানের জন্য চেষ্টা করা ও সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব তুমি স্বামী বাড়ী যাইয়া এইরূপ করিবে।" এই মন্ত্রগুলি কেবল যে প্রচারকই উচ্চারণ করেন তাহা নহে, ক'নের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলকেই ইহা পড়িতে হয়। এ উপদেশ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র একই রকম।

তারপর কন্যা পিতৃ-ভবন ছাড়িবামাত্র গৃহপ্রাঙ্গণে একটা ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠে, কন্যাই বিশেষভাবে কাঁদিতে থাকে। তাহাকে কোন প্রকারে ঘোড়ায় উঠান যায় না। বিবাহ সময়ে তিব্বতে বর ক'নেরা ঘোড়ায় চড়িয়াই যাতায়াত করে। অনেক কাঁদাকাটির পর কন্যার আত্মীয়েরা তাহাকে বলপূর্ব্বক ঘোড়ায় উঠাইয়া দেয়। বরপ্রদত্ত নানা বেশভূষায় ভূষিত হইয়াএইরূপে কন্যা ঘোড়ায় চড়িয়া বরের বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে। বরপক্ষীয় যতলোক ক'নের বাড়ীতে আসিয়াছিল সকলেই ঘোড়ায় চড়িয়া একত্রে শোভাযাত্রা করে। পথিমধ্যে বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় লোকসকল বরের বাড়ীর দূরত্বানুসারে এক মাইল দুই মাইল বা তিনমাইল অন্তর ছয়টি ভোজ দেয়। এ সময় কেহই অতিরিক্ত পান করে না, কারণ সকলেই বুঝিতে পারে যে তাহাদের হাতে একটা গুরুতর কাজের ভার ন্যস্ত আছে। যাহারা ধনবান্ তাহারা সাধারণতঃ স্থানে স্থানে তাঁবু খাটাইয়া ভোজের মধ্যে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। পথটা এইরূপ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া তাহারা বরের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। যখন শোভাযাত্রা বরের বাড়ীর সদর দরজায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন ভিতর হইতে দরজা সুদৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া যায়। তিব্বত দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে কন্যা দীর্ঘপথ পর্য্যটনের ফলে হয়ত তাহার সহিত নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ অথবা শয়তান প্রভৃতি ভৌতিক জীব আসিয়া থাকে। সেইজন্য একজন ওঝা দক্ষিণ হস্তে 'তোরমা' নামক একখানি তরবারি লুক্কায়িত রাখিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে। এই 'তোরমা' দ্বারাই ঐ লোক সংক্রামক রোগ এবং শয়তানকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়। এই অতিদীর্ঘ এবং ত্রিকোণাকার তরবারি ময়দা ও মাখনের সংযোগে তৈয়ারী; এবং কোন একগাছের লোহিত রসে রঞ্জিত। তদ্দেশীয় লোকেরা বলিয়া থাকে ঐ তরবারির মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান। কন্যাপক্ষীয় লোকেরা যদিও জানে যে ঐরূপ তরবারি নিক্ষিপ্ত হইবে—কিন্তু কে যে নিক্ষেপ করিবে কাহার নিকট যে উহা আছে তাহা তাহারা জানিতে পারে না। তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া তাহাদের আচার বিরুদ্ধ। যাহা হউক্ ঐ লোকটি সুযোগ বুঝিয়া তরবারিখানি কন্যার মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করে। ময়দার তৈয়ারী বলিয়া উহাতে কোনরূপ আঘাত লাগে না। তরবারির সহিত অনেক সুগন্ধী জিনিষও নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রথাটি তিব্বতবাসীদের বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ। তাহাদের বিশ্বাস যখন কন্যা বরের বাড়ীর উদ্দেশে তাহার পিতৃভবন হইতে রওয়ানা হয় তখন সে

সমস্ত ঐশ্বরিক সাহায্য হারাইয়া আসে। এই কারণে পথিমধ্যে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ এবং শয়তান তাহার অনুসরণ করে। ইহাদের হস্ত হইতে নবদম্পতিকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহারা 'তোরমা' ব্যবহার করে।

যদি কন্যার কোন বন্ধুবান্ধব তরবারি নিক্ষেপকারী ব্যক্তিকে ধরিতে পারে তবে উহাকে শাস্তি স্বরূপ বিংশতি 'টঙ্কা' দণ্ড দিতে হয়। এই জন্যই ঐ লোকটি কন্যাপক্ষীয় লোক দ্বারা ধৃত হইবার ভয়ে পলায়নপরায়ণ হয়। ইহার পর ভিতর হইতে কয়েকজন লোক বলিয়া থাকে আমাদিগকে 'সেপ্প' (Sheppa) দাও নতুবা কনেকে ভিতরে আসিতে দিব না। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর শব্দপরিপূর্ণ বর-কন্যার কল্যাণকর মন্ত্রের নাম সেপ্প। কন্যা পক্ষের একজন 'সেপ্প' উচ্চারণ করিলে তখন তাহারা দরজা খুলিয়া দেয়, দরজা খুলিলে পর বরের মাতা ময়দা, মাখন ও চিনি মিশ্রিত একপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্য লইয়া বাহিরে আগত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের হাতে একটু একটু করিয়া দিয়া যায়, তাহারাও উহা যত্নের সহিত খাইয়া ফেলে। এই কাজ শেষ হইলে বরের মাতা অগ্রগামিনী হইয়া সকলকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যান। কন্যার সম্মান রক্ষার্থে বাড়ীর মধ্যে তখন একটি ভোজের আয়োজন হয়। কুলপুরোহিতও তখন নানাপ্রকার উপাসনাদি সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। উপাসনার পর সকলে ভোজে প্রবৃত্ত হয়। সেই বিবাহ ভোজে বরের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কিছু কিছু উপঢৌকন প্রদান করে। বরের পিতার অবস্থানুযায়ী এক মাস কি দশ দিন কি তিন দিন এই ভোজ চলে। তিব্বতবাসীরা অত্যন্ত মাংসপ্রিয় কাজেই ইহাতেও মাংসের আয়োজনই অধিক থাকে। এই ভোজ শেষ হইয়া গেলে বিবাহও শেষ হইয়া যায়। তখন আত্মীয় স্বজন আপন আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অবশ্য অনেকে আরও কিছু দিবস থাকিয়া বরের পিতার গৃহপ্রাঙ্গণ উজ্জ্বল করিয়া রাখে। কন্যার পিতার অবস্থা যদি ভাল হয় তবে পিতৃগৃহাগত একজন ভৃত্য আজীবন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শরীররক্ষকের কার্য্য করে। বিবাহের এক মাসের মধ্যে অথবা এক বৎসর পরে বর সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে দ্বিরাগমন করিতে যায়। তথায় কিছুদিবস সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া বর স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। ক'নে ঐ সঙ্গে না আসিলেই কোন দোষ হয় না।

বরের যদি আরও ভাই থাকে তবে তাহাদেরও ঐ কনেকে অর্থাৎ ভ্রাতৃ-বধূকে বিবাহ করিতে হয়। এই বিবাহ বিভিন্ন প্রকারের। ঐরূপ বিবাহকালে ক'নের স্বামীকে বিদেশে পাঠান হয়, তারপর বরের মাতাই মধ্যস্থ হইয়া তাহার দ্বিতীয় পুত্রের সহিত প্রথম পুত্র-বধূর বিবাহ দিয়া থাকে। এইরূপে একে একে তাহার অন্যান্য সকল পুত্রদিগের সহিত এক কন্যার বিবাহ হইয়া যায়। এ বিবাহে আর কোন বিশেষত্ব নাই। নীরবেই ইহা সমাধা হইয়া থাকে।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতৃঋণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতন কাহিনী।

ডাক্তার রিভালের পড়িবার ঘরে উভয়ে বসিয়াছিল,—জ্যাক ও ডাক্তার রিভাল। বাতায়ন মুক্ত ছিল! তাহারই মধ্য দিয়া সুদূরবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছিল,—শরতের শান্ত উজ্জ্বলশোভায় ঝলমল করিতেছে। প্রান্তরের শেষে গ্রামের জীর্ণ কবর-ভূমির প্রাচীন দেওয়াল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝাউ গাছের উচ্চ শিরগুলা রৌদ্রকিরণে যেন রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ভগ্ন দেওয়ালের অন্তরালে দুই-চারিটা কবরের ক্রুশ-দণ্ড বিরাট গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রিভাল বলিলেন, "ঐ যে গোরস্থান দেখা যাচ্ছে, ওখানে বোধ হয়, তুমি কখনও যাওনি, জ্যাক। গেলে দেখতে, একটা গোরের উপর একখণ্ড সাদা পাথরে শুধু 'মাদেলিন' নামটি লেখা আছে। মাদেলিন আমার মেয়ে—সিসিলের মা—ওটি তারই গোর। আমাদের বংশের আর কারো গোর ওখানে নাই।"

ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "সেই কথাই তোমায় সব বলছি, শোন।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, মৃত্যুর পর তাহাকে একান্তে নিভৃতে যেন কবর দেওয়া হয়, বার বার সে কাতরভাবে এই অনুরোধ করিয়াছিল রিভাল কি, অপর কোন নামের সংস্পর্শ যেন না থাকে, শুধু লেখা থাকিবে, 'মাদেলিন'। তাহার নাম-সংযোগে তাহার বাপের বংশে যেন কালিমা লিপ্ত না হয়! অভাগিনী কন্যা আমার! তাহার আত্ম-সম্মান, তাহার নারীগর্ব্ব এ সঙ্কল্প অটল রাখিয়াছিল।

সে কি দুঃখের দিন, জ্যাক, যেদিন তাহার বিকচোন্মুখ নবীন জীবন অকালে পুষ্পের মত ঝরিয়া গেল! আমরা তাহা সহ্য করিলাম,—এই নির্জ্জনে মাটিতে শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে তথায় শয়ন করাইলাম। হৃদয় না পাষাণ—রেখাই পড়ে, বিদীর্ণ হয় না!

সে কোথায় যাইবে? আজও আমার এই শীর্ণ অস্থিগুলার মাঝে, এই জীর্ণ বুকে মাদেলিনের কোমল সুন্দর মুখটি জাগিয়া আছে—সে মুখ কি ভুলিবার?—কিন্তু সে কথা যাক্! এ নির্জ্জন বাস, মৃত্যুর পরও এ ঈপ্সিত নির্ব্বাসন, কেন? কিসের জন্য? কি অপরাধ করিয়াছিল, সে? কিছু না! যদি অপরাধ কাহারও থাকে, তবে সে আমার! এই নির্ব্বোধ, মূর্খ, বৃদ্ধ—তাহার অপরাধের শাস্তি, অভাগিনী সে আপনার শিরে বহন করিল!

একদিন,—সে আজ আঠারো বৎসরের কথা—এই নভেম্বর মাসেই, সহসা আমার ডাক পড়িল,—এখনই যাইতে হইবে! একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! একদল শিকারী আসিয়াছিল—এমন প্রায়ই আসে—তাহাদের মধ্যে একজনের বন্দুক ফাটিয়া, পায় গুলি লাগিয়াছে—বুঝি বা, প্রাণ সংশয়!

তখনই ছুটিলাম! আর্কার গৃহে একটা

শয্যার উপর লোকটি শায়িত ছিল—সুন্দর, সুশ্রী, তরুণ যুবক, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না!—বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ, তরল চক্ষু, দীর্ঘ পক্ষ্ম, নির্ভীক হৃদয়!

গুলি বাহির করিলাম। আশ্চর্য্য অকম্পিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল! আমাকে সে ধন্যবাদ দিল—বেশ পরিষ্কার বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায়! তেমন অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা যায় না, কাজেই আর্কার গৃহে সে রহিল—আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। ক্রমে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বন্ধু শিকারীগণের নিকট হইতে তাহার নাম শুনিলাম, কাউন্ত নাদিন—জাতিতে সে রুশ্, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়।

আঘাতটা কঠিন, তবে স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলিয়াই নাদিন শীঘ্র সারিয়া উঠিল। আর্কার সে কি সেবা-যত্ন! ক্রমে দুই-এক পা করিয়া সে চলাও সুরু করিল। একদিন আমি বলিলাম, 'এ নির্জ্জনে একা থাকিতে কষ্ট হয় ত, আমার ওখানে মাঝে মাঝে আসিতে পার।' সে আনন্দে ধন্যবাদ দিল।

রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় আমার গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া লইতাম। আমাদিগের সহিত একত্রই সে ভোজন করিত—যেদিন বৃষ্টি কিম্বা অতিরিক্ত কুয়াশা নামিত, সেদিন রাত্রে সে এখানেই থাকিয়া যাইত।

সত্য বলিতে কি, এই পাপিষ্ঠকে আমি ভালবাসিতাম—তাহার প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল—আন্তরিক স্নেহ। বুঝিতাম না, সে এত কথা, এত বিষয়, কি করিয়া জানিল, কোথা হইতে শিখিল! কিন্তু … সে নাবিকের

কার্য্য জানিত, সৈনিকের দলেও ছিল, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছে, ঔষধপত্রাদি লইয়া আমার স্ত্রীর সহিত তর্কও করিত—মাদেলিনকে গান শিখাইত! এত বিদ্যা! এত জ্ঞান! একটা অন্ধ মোহে সে আমাদের সকলকেই ঘিরিয়া বসিয়াছিল। আমার ত দ্বিতীয় চিন্তাই ছিল না, ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়া অন্ধকার রাত্রে যখন গৃহে ফিরিতাম, তখন পথের কষ্ট মনেই আসিত না, শুধু দীপ্ত আশায় বুক ভরিয়া উঠিত, গৃহে ফিরিয়া দেখিব, আমার সহিত গল্প করিবার জন্য, আমারই পথ চাহিয়া নাদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! দারুণ দুর্য্যোগেও আমি অশ্বের গতি বাড়াইতাম,—কখন গৃহে পৌঁছিব, সপরিবারে বসিয়া নাদিনের গল্প শুনিব! এই বিরাট মোহ ও অনুরাগ দেখিয়া স্ত্রী প্রায়ই বাধা দিতেন—একটা অপরিচিত বিদেশীকে লইয়া এত মাথামাথি করা তাঁহার বড় মনঃপূত হইত না—থাকুক না প্রণয়, তাই বলিয়া এত বাড়াবাড়িই কি করিতে হয়!—নিত্য একত্র ভোজন, এক গৃহে শয়ন! এত কেন? আমি সে কথা উড়াইয়া দিতাম, বিদ্রূপ করিয়া বলিতাম, মেয়েমানুষের এমনই ছোট মন! দুনিয়ার লোককে সন্দেহ! অবিশ্বাস! ছিঃ! স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া নীরব হইতেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি জাগিয়া যে তাঁহাকে যথেষ্ট পীড়িত করিয়া তুলিত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। বুঝিয়াও আমি সেদিকে মন দিতাম না!

ক্রমে নাদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল,—চলিতে ফিরিতে বেশ সক্ষম। কিন্তু তাহার

নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অনাড়ম্বর পল্লীগ্রাম তাহাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু শুধুই কি পল্লীগ্রাম, না আর কিছু? সে প্রশ্ন মনেও উঠে নাই!

শেষে একদিন স্ত্রী আমার চক্ষু ফুটাইলেন। স্ত্রী বলিলেন, "ওগো, শুনছ?"

আমি বলিলাম, "কি?"

স্ত্রী বলিলেন, "দেখ, নাদিনের অভিপ্রায় কি, তা সে স্পষ্ট বলুক! পাড়ার লোকে নাদিন আর মাদেলিনের নামে কাণাঘুষা আরম্ভ করেছে—এ' ত ভাল নয়!"

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম,—কহিলাম, "কেন? মাদেলিন আবার কি করেছে?"

আমার ধারণা ছিল, আমারই সঙ্গে গল্প করিবার জন্য, আমারই সাহচর্য্য উপভোগ করিবার জন্য নাদিন সুস্থ হইয়াও বিদায় লইতে পারিতেছে না, এখানে রহিয়াছে! আমরা যে সন্ধ্যার সময় একত্র খেলা করি, গল্প করি,—সেই খেলা গল্পর জন্যই শুধু! মূঢ়, আমি! আমার কন্যা মাদেলিনের দিকে কখনও চাহিয়া দেখি নাই। নাদিন আসিলে তাহার মুখ কি আনন্দে উজ্জল, রক্ত হইয়া উঠে, সরমে তাহার কথা ও গতি বাধিয়া যায়, নাদিন না আসিলে মলিন মুখে আকুল নেত্রে পথের পানে সে চাহিয়া থাকে! এ সকল লক্ষ্য করিবার আমার অবসর মিলে নাই, অথচ মাদেলিনের এ ভাবান্তর দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিত, এতটুকু গোপন রহিত না—আমি অন্ধ, তাই কিছুই দেখি নাই।

যাহা হউক, দেখিতে বিলম্ব হইল না। প্রমাণও মিলিল,—মাদেলিন তাহার মাকে বলিয়াছে, নাদিনকে সে ভালবাসে, নাদিনও তাহাকে ভালবাসে—গভীর,—সে ভালবাসা, তাহা মুছিবার নহে, ভুলিবার নহে, মিলাইবার নহে! আমি কাউন্তের নিকট ছুটিলাম—কি তাহার অভিপ্রায়, জানিতে চাই! এখনই, আর বিলম্ব নহে!

নাদিন স্বীকার করিল—তাহার স্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে, সে কথা মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। নাদিন মাদেলিনকে ভালবাসে, সে তাহার পাণিগ্রহণে অভিলাষী, এ মিলনে বাধা কি তাহাও সে খুলিয়া বলিল। অভিজাত বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, পিতা জীবিত, তাঁহার বংশাভিমান অত্যন্ত প্রবল,—তাঁহার মন পাওয়া কঠিন ব্যাপার! মত না পাইবারই আশঙ্কা! তথাপি সে বলিল,—পিতার ক্রোধের ভয়ে সে হঠিবে না! মাদেলিনকে না পাইলে, সে বাঁচিবে না—সে সাবালক, নিজেও কিছু বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছে—পিতার অর্থে বঞ্চিত হইলেও তাহার সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিবে, এমন সংস্থানও তাহার আছে! পরিপূর্ণ সচ্ছলতা না হইলেও মাদেলিনকে কোনদিন কষ্ট পাইতে হইবে না! শুধু সে আমার মতাপেক্ষী, আমার উপর শুধু তাহার নহে—দুইটি প্রাণীর সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে!"

ডাক্তার স্থির হইলেন। বাহিরে একটা বৃক্ষশাখা হইতে বায়ুতাড়নে সহসা একটা শুষ্ক পত্র চ্যুত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া পড়িতেছিল, ক্রমে সেটি মাটিতে পড়িয়া গেল—ডাক্তার সেই পত্রটার প্রতি চাহিয়া মুহূর্তের

জন্য নীরব রহিলেন! জ্যাক কহিল, "তার পর?"

ডাক্তারের যেন চমক ভাঙ্গিল। ডাক্তার কহিলেন, "হ্যাঁ,—তারপর ভবিষ্যৎ জামাতার সমস্ত গৌরব আদর লইয়া, একদিন সে আমার গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল! আমার মনে হইতেছিল, কেমন যেন চট্ করিয়া সব হইয়া যাইতেছে, অত্যন্ত ত্বরিতভাবে--কিন্তু আমার মাদেলিনের সমগ্র জীবনের সুখ ইহার উপর, এই বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছে! স্ত্রী বলিলেন, "ও যা বললে, তাই—খোঁজ খবর নেবে না? বিদেশী লোক,কিছুই জান না, তার খবরাখবর নাও! মেয়েটাকে অমনি রাস্তায় লোকের হাতে ধরে দেবে?" তাঁহার সন্দিগ্ধতায় আবার আমি হাসিলাম; লোকটির প্রতি আমার এমনই সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল,—তবু একদিন ব-বিভাগের ম্যানেজারের নিকট কথাটা পাড়িলাম। তিনি বলিলেন, কাউন্ত নাদিনের সম্বন্ধে তিনি এমন কিছুই জানেন না—তবে শুনিয়াছেন বটে, সে বড় বংশে জন্মিয়াছে এবং লেখাপড়াটাও ভাল শিখিয়াছে! তবে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে রুশ রাজদূতের অফিসে সংবাদ জানা যে বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাটাও তিনি বার বার আমাকে বলিয়া দিলেন, কারণ তাহাদিগের অফিসে বড় বংশ গুলির সকল সংবাদই পাওয়া যাইবে।

তুমি ভাবিতেছ, জ্যাক, এ কথা শুনিয়া আমি রাজদূত অফিসে সংবাদ লইয়াছিলাম! না! সেদিকে আমার কোন চেষ্টাই ছিল না—এমনই অলস আমি! সারাজীবনে মনে ভাবিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেক কাজও যদি করিতাম! স্ত্রী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, খোঁজ নাও, খবর নাও—আমি মিথ্যা বলিয়া সকল দায় এড়াইলাম। স্ত্রীকে বলিলাম, 'খোঁজ পাইয়াছি—নাদিনের কথা খাঁটি সত্য!'

স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন। হায়, সরলা, বিশ্বস্ত হৃদয়া নারী। কিন্তু একটা কথা এখন বুঝিয়াছি,—আমি পারিতে সংবাদ লইতে চলিয়াছি, ভাবিয়া পাষণ্ড কি ভয়াকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু তখন কিছু বুঝি নাই! ভবিষ্যতের সুখের কল্পনায় আমি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাদেলিন সুখে থাকিবে! আরামে থাকিবে! আর কি চাই!

শীতের শেষে কাউন্তের নিকট অসংখ্য পত্র আসিতে লাগিল—সেও পত্র লেখায় অসম্ভব মন দিল। শুনিলাম, পিতার সহিত তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিয়াছে—সে আমাকে পত্র দেখাইত, কতকগুলা চিত্র-বিচিত্র করা দুর্ব্বোধ্য বিদে। ভাষা, আমি তাহার বিন্দুও বুঝিতাম না—যত বুঝিতাম না, ততই বিশ্বাস প্রবল হইতেছিল। কতকগুলা নাম শুধু বুঝিতাম, আইভানোভিচ, নিকোলাভিচ, ষ্টীফানোভিচ—এমন কত নাম! মাদেলিন হাসিয়া কহিত, "তোমার এতগুলো নাম নাকি?" তাহার নাম শুধু মাদেলিন রিভাল! হাঁ জ্যাক—সে পাষণ্ডের সত্যই অসংখ্য নাম ছিল! শেষে একদিন শুনিলাম, নাদিনের পিতা বিবাহে মত দিয়াছে! আমি যেন বাঁচিলাম। পিতার অভিশাপ ও রোষ শিরে লইয়া নবীন জীবন আরম্ভ করিবে, এই চিন্তাটা কাঁটার মত

নাই, আঃ, আমি মনে অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম।

বিনা আড়ম্বরে একদিন এঁতিয়োতে বিবাহ হইয়া গেল। ঐ গির্জ্জাঘরে—এদিকে আসিতে, ডাহিনে ঐ যে ছোট গির্জ্জা। কি আনন্দ, কি সুখের দিন, সে। শুধু পিতার প্রাণই সে আনন্দ বুঝিতে পারে। কম্পিত হস্তে কন্যার কম্পিত কর ধরিয়া মাদেলিনের দিকে চাহিলাম। আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল! সেদিনকার গির্জ্জার অর্গিনে যে সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, তেমন সুর জীবনে আর কখনও শুনি নাই। সে যেন স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল—সে সুর এখনও আমার কানে বাজিতেছে।

তাহার পর তাহারা হাসিমুখে বিদায় লইল। বিদায়ের সময় আমার বুক কি বেদনার ভারে ভরিয়া উঠিয়াছিল—মুখে কথা ফুটিতেছিল না, চোখের কোণে শত চেষ্টাতেও জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু মাদেলিনের মুখ শে বিদায়ের ক্ষণেও একটা অপূর্ব্ব হর্ষের দীপ্তিতে পূর্ণ, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল! তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আমরা আশীর্ব্বাদ করিলাম,—সুখী হও, সুখে থাক, বাছা আমার!

তাহারা চলিয়া গেল। এমন ভাবে যাহারা যায়, তাহারা সত্যই সব হাসি, সব আনন্দটুকু সঙ্গে লইয়া যায়, রাখিয়া যায়, শুধু বিষাদ, বেদনা, স্মৃতির দুর্ব্বহ ভারের রাশি! এক্ষেত্রেও তেমনই ঘটিল। সন্ধ্যার পর আমরা স্বামী-স্ত্রীতে শূন্যগৃহে দীপ জ্বালিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তাহাদেরই কথা ভাবিতাম! গৃহের সে দারুণ নিঃসঙ্গতা, সে একান্ত অপরিহার্য্য নিঃসঙ্গতা, বিরাট লৌহের মত আমাদের বুকে বাজিত! শুধু আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত, কথা ফুটিত না! তবু আমি দিনের বেলা রোগী দেখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কতকটা অন্যমনস্ক হইতে পারিতাম, কিন্তু আমার স্ত্রী? এই ক্ষুদ্র নিরালা গৃহের প্রত্যেক কোণটি অবধি যেন অসহ্য বেদনাভার সে বেচারীর বক্ষে নিক্ষেপ করিত।

কন্যার বিরহ-দুঃখ যেন সজীব মূর্ত্তি লইয়া তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। নারীর ভাগ্যই এমন! তাহাদের সকল হর্ষ, সকল বেদনা গৃহকোণটিকেই কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে! চারিধারে অগ্নির দাহ জাগাইয়া তুলে—তাহারই মধ্যে পড়িয়া অভাগিনী নারীজাতি নিতান্ত অসহায় নিরুপায়ভাবে সে দাহের যন্ত্রণা ভোগ করে—নীরবে সহ্য করে! এই জানালা, ইহারই সম্মুখে মাদেলিন দাঁড়াইত, এই চেয়ার—ইহাতে সে বসিত—এই খেলানা, ইহা লইয় সে খেলা করিত—এই দোলা, শিশু অবস্থায় ইহারই ক্ষুদ্র ক্রোড়টিতে বসিয়া-শুইয়া মাদেলিন দোল খাইত! এই পুস্তক—সে পড়িতে ভালবাসিত—এই শয্যা, ঐ দেরাজ, এই পরদা, ঐ গাছপালাগুলি, প্রত্যেকটিতে তাহার কোমল হস্তের ললিত স্পর্শ জড়িত রহিয়াছে! মাদেলিন, মাদেলিন, কোথায় তুমি! এস, এস, এ বিরহ যে আর সহ্য হয় না।

কিন্তু এই দুর্ব্বল মানুষ অসহ্য বেদনাও সহ্য করে! করিতে হয়! আমরাও ক্রমে সান্ত্বনা

লাভের চেষ্টা করিতাম তাহারা এখন পিসায়, কাল ফ্লোরেন্সে যাইবে, তারপর—? শুধু প্রেম, শুধু প্রীতি সূর্য্যকিরণের মত তাহাদের পথ আলোকিত করিয়া রাখুক! পত্র আসিত, তাহারা কতদূর চলিয়াছে। ক্রমে তাহারা ফিরিবার সঙ্কল্প জানাইল। আমরা ঘর-দ্বার সাজাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। এক একটি দিন যাইত, আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম—তাহারা আসিতেছে।

সেদিন রাত্রে রোগী দেখিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। স্ত্রী শয়ন করিয়াছিলেন। আমি একাই ভোজন করিতেছিলাম! সহসা বাহিরে বাগানে ত্বরিত পদশব্দ শুনিলাম। উদ্‌গ্রীব ভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দ্বার খুলিয়া গেল। এ কে! মাদেলিন! এ কি মূর্ত্তি! একমাস পূর্ব্বে দেববালার মত অপূর্ব্ব কান্তিময়ী যে কন্যাকে হাসি ও অশ্রুর মধ্যে বিদায় দিয়াছি, এ কি সে-ই! বর্ণ মলিন, দেহ শীর্ণ, পাণ্ডু, উন্মাদের মত জীর্ণ বেশ, হাতে একটি ব্যাগমাত্র,—চোখের কোণে কালির রেখা পড়িয়াছে সারা দেহে শোকের একটা করুণ ছবি- মনের উপর দিয়া যেন প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে,—কি, এ মূর্ত্তি! করুণ স্বরে মাদেলিন কহিল, "বাবা, আমি এসেছি।"

আমি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, ব্যগ্র স্বরে কহিলাম, "ব্যাপার কি, মাদেলিন? নাদিন কোথায়?"

সে উত্তর না দিয়া চক্ষু মুদিল। সে কাঁপিতেছিল। কি ভীষণ কম্পন! আমি তাহার মাথায় হাত রাখিলাম। আমার দুঃখ? তখন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া বলিলাম "বল, মাদেলিন, বল, তোমার স্বামী কোথায়?"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে সে কহিল, "নেই। কখন ছিলও না।"

তাহার পর আমারই পার্শ্বে বসিয়া সে আমায় সব কথা খুলিয়া বলিল—সে এক ভীষণ, মর্ম্মভেদী কাহিনী—বিলাপের মতই তাহা গভীর, করুণ! সে কাউন্ত নহে! তাহার নামও নাদিন নহে! দক্ষিণ রুশবাসী একজন ইহুদী, সে—নাম, র‍্যাস্‌ক্ একটা হতভাগা জালিয়াত—কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া জাল জুয়াচুরি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছিল। পূর্ব্বে রিগায় একটা বিবাহ করিয়াছিল—সেণ্টপিটার্সবার্গেও একটা, —তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে! তাহার কাগজপত্র জাল—সে নিজের হাতে জাল করিয়াছিল। রুশে সে ইদানীং নোট জাল করিয়া খাইত! তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, টিউরিনে সে ধরা পড়িয়াছে। ভাব, জ্যাক, আমার কন্যার কথা,—একা, সেই বিদেশে—স্বামীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিযুক্তা, পরিত্যক্তা মাদেলিন, সহস্র কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে একটা জালিয়াতের স্ত্রী-রূপে,—স্ত্রীই বা কোথা, জ্যাক্? ধরা পড়িয়া, সব কথা নাদিন স্বীকার করিয়াছিল—একটা কথা, তখন শুধু তাহার মনে জাগিতেছিল,—জগতে তাহার যে একটি মাত্র আশ্রয় আছে, তাহার পিতার গৃহ, মাতার ক্রোড়, সেখানে সে ফিরিবে—যেমন করিয়া পারে! তাই অতি কষ্টে ষ্টেশনের একজন তরুণ কর্ম্মচারীর কৃপায় সে কোন মতে গৃহে ফিরিয়াছে। সে পাপিষ্ঠ

তাহাকে যাহা-কিছু দিয়াছিল, সব সে একটা হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছে, কিছুই লইয়া আসে নাই। বলিতে বলিতে মাদেলিনের চোখে বাণ ডাকিল, আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম, কহিলাম, "স্থির হও, মাদেলিন, চুপ কর, তোমার মাকে ডাকি।" আমার কঠিন চক্ষুতেও জল আসিয়াছিল!

পরদিন স্ত্রী সব কথা শুনিলেন। তিনি তিরস্কার করিলেন না—শুধু আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, বলিলেন, "গোড়া থেকেই আমার কেমন ভয় হয়েছিল,—এ বিয়েতে একটা কিছু অঘটন ঘটবেই।" লোকটাকে প্রথম দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে কেমন এক আতঙ্ক জাগিয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া আমরা গর্ব্ব করি? কিন্তু এই অশিক্ষিতা নারীর অন্তরে যে ভাব গুমরিয়া উঠিয়াছিল—যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিজ্ঞান,—তাহার নিকট আমাদিগের শিক্ষাগর্ব্ব লজ্জায় মাথা নত করে! আমার কন্যার প্রত্যাগমন সংবাদ পাড়ায় পরদিনই রাষ্ট্র হইয়া গেল।

সকলেই আসিয়া উঁকি দিল। ব্যাপার কি? তোমার মেয়ে ফিরিল যে! জামাই কোথা—খবর কি তার, ভাল আছে ত? জীবনে কখনও রূঢ় হই নাই—কিন্তু সেই একদিন রূঢ় স্বরে সকলকে বিদায় দিলাম। মাদেলিন ও আমার স্ত্রী কখনও বাড়ির বাহির হইতেন না—পল্লীর কৌতূহল দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিলেন।

তখনও আমি বিপদের সবটুকু জানিতে পারি নাই। মাদেলিন সে কথা আমাকে খুলিয়া বলে নাই যে, এই হেয় মিথ্যা বিবাহের অভিনয়ের ফলে মাদেলিন অন্তঃসত্ত্বা! সে কি বিষাদে আমাদিগের মন আচ্ছন্ন হইল। জারজ সন্তান প্রসব করিবে—মাদেলিন? হা ভগবান! মাদেলিন নীরবে লেপ কাঁথা সেলাই করিত, ছোট পোষাক তৈয়ার করিত, সন্তানের জন্য! হউক জারজ—তবু সে সন্তান,—মাতার আনন্দ, গর্ব্ব, সান্ত্বনা! বেচারা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল—তাহার মুখে শীর্ণ পাণ্ডুতা বাড়িয়াই চলিয়াছিল! সর্ব্বদাই সে কি ভাবিত! আমার স্ত্রী বলিলেন, "ও সারা দিনরাত মন গুমরে থাকে, কাঁদে। সে লক্ষ্মীছাড়াটাকে ও ভুলতে পারে নি, ভালও বাসে!" যথার্থই মাদেলিন সে পাষণ্ড বর্ব্বরটাকে ভালবাসিত। আমার স্ত্রী তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে, মাদেলিন নিবারণ করিত, মৃদু ভাবে, কম্পিত স্বরে শুধু বলিত, "কি হবে, আর ভেবে, মা! সব আমার অদৃষ্ট! কি করবে, তোমরা?" সে পাপিষ্ঠকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই দারুণ অনুশোচনায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, সে মরণের পথে চলিয়াছিল—এবং সিসিলকে আমাদিগের দীর্ণ বুকে তুলিয়া দিবার অল্প দিন পরেই সে একদিন আপনার দুর্ব্বহ বেদনাভার হইতে মুক্তিলাভ করিল।

তাহার মৃত্যুর পর তাহার শয্যাতল হইতে একখানি পত্র বাহির হইল—পত্রখানি শতভাঁজে মলিন, ছিন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল—সে পত্র নাদিনের—প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া মাদেলিনকে এই পত্র দ্বারাই পাপিষ্ঠ প্রলোভনের জাল পাতিয়াছিল—মাদেলিন এই পত্রখানি কেবলই পড়িত—বুকে করিয়া রাখিত! আহা, বেচারী মাদেলিন!

তুমি বিস্মিত হইতেছ, জ্যাক—একটা

ক্ষুদ্র পল্লীর এক প্রচ্ছন্ন কোণে এত বড় একটা হৃদয়ভেদী নাটকের অভিনয় হয়—ইহা কি সম্ভব! ইহাকেই বলে, অদৃষ্টের পরিহাস! লতাপাতার আড়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র কুটীরেও এ ঘটনা ঘটে! যুদ্ধের সময় হইতে ক্ষেত্রের প্রান্তে কর্ম্মরত দরিদ্র হতভাগ্য কৃষক কিম্বা স্কুল-ফিরতি নিরীহ বালকের গায় সহসা রণক্ষেত্র হইতে গোলা ছুটিয়া তাহাকে যেমন মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া দেয় - এ যেন তেমনই—তেমনই নৃশংস, বর্ব্বর!

সিসিলকে লইয়া সান্ত্বনা পাইলাম। গাঢ় অনুতাপের জ্বালায় পলে পলে জ্বলিয়াও সিসিলের মুখ দেখিয়া বাঁচিতে হইল! নহিলে মাদেলিনকে হারাইয়া আমাদিগের বাঁচিবার কথা নয়! আমাদের একমাত্র যত্ন হইল, সিসিল যেন এ সংবাদ না জানিতে পারে—এ বাজ তাহার কোমল বুকে না পড়ে—এই জন্যই সিসিলকে পথে বাহির হইতে বা কাহারও সঙ্গে মিশিতে দিতাম না। তোমার সঙ্গে মিশিতে দিতেও আমার স্ত্রীর আশঙ্কা জন্মিয়াছিল—পাছে সিসিল তার মার মত কোনদিন ভুল করিয়া বসে—কিন্তু তোমার যখন পরিচয় পাইলাম, যখন জানিলাম, তুমিও তাহারই মত দুর্ভাগা—তখন তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিতে আমারও ইচ্ছা হইল—যদি কোনদিন তোমার হাতে সিসিলকে সঁপিয়া দিতে পারি! নহিলে কাহার হাতে দিব? যদি সিসিলকে সে অশ্রদ্ধা করে, সম্মানের চক্ষে না দেখে, এমনই ভাবে পরিত্যাগ করে! এই জন্যই তোমাকে যখন উহারা কারখানায় পাঠাইতেছিল, আমি রোষে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলাম--মনে হইয়াছিল, তোমাকে উহারা আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইতেছে—আমার নিতান্ত আপনার জন তুমি—তোমার উপর উহাদিগের কি অধিকার! তুমি আমার, তুমি আমার সিসিলের!

তাহার পর হইতে বরাবর আমি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—কবে তুমি আসিয়া আমার হাত হইতে সিসিলকে চাহিয়া লইবে। সিসিল আসিয়া নতশিরে কম্পিত রুদ্ধ ভাষে বলিবে, দাদামশায়, জ্যাককে আমি ভালবাসি! সেই দিন আসিয়াছে, জ্যাক! দুইটি অভাগা একসঙ্গে মিলিয়া সুখী হও, শান্তি পাও! চুরির সংবাদে আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—কিন্তু তোমার কথায় যেদিন সে রহস্য ভেদ হইল, সেদিন যেন আবার নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিলাম! জ্যাক—এখন শোন—তুমি সিসিলকে ভালবাস সিসিলও তোমাকে ভালবাসে। তাহাকে জয় কর, বন্দী কর। এ দুইমাস তোমাকে আমি লক্ষ্য করিতেছি—এখন সুস্থ হইয়াছ, শরীরে বল পাইয়াছ। একটা মতলব আমার মাথায় আসিয়াছে। তুমি প্যারিতে যাও—চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা কর—চার বৎসর সময় লাগিবে! তারপর আমার স্থানে তোমায় বসাইব। সুখে স্বচ্ছন্দে তোমাদের দিন কাটিবে—প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এখানে আসিবে—সিসিলকে দেখিবে, শক্তি পাইবে, আশা পাইবে। দিনে কাজকর্ম্ম কর, রাত্রে পড়। চার বৎসর পরে মানুষ হইয়া উঠিবে, তখন সিসিলের ভার লইতে পারিবে। নাও জ্যাক, খাটো—কাজ কর, সিসিল তোমার এ দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার!"

জ্যাক অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যাহা শুনিল, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমই অপূর্ব্ব মধুর!

কিন্তু একটা সংশয়, একটা আশঙ্কা, তাহার মনে জাগিতেছিল। সিসিল হয়ত তাহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসে! তাহা ছাড়া চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিতে সে সম্মত হইবে কি?

রিভাল কহিলেন, "সে বিষয়ে সিসিলের সঙ্গে তুমি কথা কও। সে উপরে আছে—যাও, তাকে বলগে।"

তাহাকে বলিবে! কিন্তু এ যে বড় কঠিন কাজ! হৃদয় একটা গভীর উত্তেজনায় মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল—বুঝি, এখনই বিদীর্ণ হইবে!

উপরে কক্ষে বসিয়া সিসিল কি একটা লিখিতেছিল! জ্যাকের চক্ষে সিসিল সেদিন অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সিসিলের দেহে এত রূপ! সে রূপে এমন মোহ!—কৈ, জ্যাক অন্য কোনদিন ত ইহা লক্ষ্য করে নাই। কি এ সুমধুর পরিবর্ত্তন!

জ্যাক কম্পিত স্বরে ডাকিল, "সিসিল—

সিসিল মুখ তুলিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শান্ত স্বরে কহিল, "কেন, জ্যাক?" তাহার মুখ একটা অজানিত সরম-রাগে রক্ত হইয়া উঠিল।

জ্যাক কহিল, "আমি আবার যাচ্ছি—কাজ করতে, মানুষ হতে! কিন্তু এখন আমার জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করেছি,—অবলম্বন পেয়েছি। তোমার দাদামশায় আমায় অনুমতি দিয়েছেন—তাই, যা কোন দিন তোমাকে বলতে সাহস হয়নি, আজ তা বলতে এসেছি—"

"কি সে, জ্যাক?" লজ্জায় সিসিলের নয়নপল্লব কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

"যে, আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি, সিসিল—তোমাকে যাতে জয় করতে পারি, যাতে তোমার যোগ্য হতে পারি, তার জন্যই আমি কঠোর সাধনায় রত হতে চলেছি!"

জ্যাকের স্বর কম্পিত হইতেছিল, থমকিয়া যাইতেছিল! তবু সে সব কথা বলিল। সিসিল সব কথা সুস্পষ্ট শুনিল। সে জানিত, এ প্রেমকে, বহু প্রতীক্ষা, বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়া, গভীর দৃঢ় হইতে হইবে। জ্যাকের কথা সমাপ্ত হইলে, জ্যাকের হাত দুইটি সিসিল আবেগে আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। পরে দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে সে কহিল, "জ্যাক, আমি এ চার বৎসর তোমারই প্রতীক্ষায় থাকব। চার বৎসর কি, জ্যাক? যদি চিরকাল, সারা জীবন এমনই প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়, তা'ও থাকব—জ্যাক, প্রিয়তম আমার—এ নিশ্চয় জেনো।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শরদ্বর্ণন

(ঋতুসংহার)

পদ্মাননা সুহাসিতা কাশবস্ত্র পরিহিতা
হংস-রব-নূপুর-চরণা,
পক্বধান্য দেহযষ্টি বধূবেশে নত দৃষ্টি
সমাগতা শারদঅঙ্গনা।

কাশপুষ্পে ধরাতল, মরালে নদীর জল,
রাকা চাঁদে চারুবিভাবরী,
সপ্তচ্ছদে বনান্তর মালতীতে মনোহর
শুক্লীকৃত কাননসুন্দরী।

সফরী মেখলা-পরা, তটহংসরাজিহারা,
সৈকত-নিতম্ব-সুশোভিনী,
মদমত্তা নারী মত মৃদুমন্দ প্রবাহিত
শৈলসুতা কল্লোলনাদিনী।

সুকম্বু-মৃণাল-শুভ্র, মুক্তবারি লঘু অভ্র-
চামরেতে উপবীজ্যমান
আকাশমণ্ডল হায় অহর্নিশ শোভা পায়
অপরূপ রাজেন্দ্র সমান।

মর্দ্দিত অঞ্জননিভ মনোজ্ঞ বিশাল নভঃ
বন্ধুক-অরুণ-ধরাতল,
বপ্রভূমি পদ্মাবৃত নাহি করে আকুলিত
কোন্ হৃদি তরুণ কোমল?

মৃদুমন্দ সমীরণে কম্পিত শাখাগ্রবনে
ঘন পুষ্প গেলব পল্লব,
কার না বিদরে হিয়া কোবিদার নিরখিয়া
মধুকরে লুণ্ঠিতগৌরব?

মেঘমুক্ত বিভাবরী তারকাভূষণ পরি
জ্যোৎস্নাবাসে ঢাকি কম কায়,
বালাপ্রমদার মত মন বিমোহিয়া কত
অনুদিন সুখে বৃদ্ধি পায়।

বীচিমালা ক্ষণে ক্ষণে খণ্ডিত কারণ্ডাননে
ব্যাপ্ত তট সারসমরালে,
পদ্মরেণু গন্ধময় কলকণ্ঠে হংসচয়
পুলকিত করিছে অখিলে।

বিমণ্ডিত সিতকর নেত্রহৃদিস্নিগ্ধকর,
হিমকণবর্ষী শশধর,
পতিবিরহিতা জনে সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণে
দিবানিশি করিছে জর্জ্জর।

কুরুবক পদ্মিনীরে ঈষৎ দোলায়ে ধীরে
সুরভিত সুশীত পবন,
যুবক জনের হৃদি ভীমবেগে নিরবধি
সবলে করিছে আকর্ষণ।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গোকল-ব্রত *

এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালিকারা তিনগোছা দুর্ব্বাঘাস, সরিষার তৈল, বাটাহলুদ সিন্দূর, চন্দন, তিনটা পাকা কলা আর একখানি পাখা লইয়া গাইগরুর নিকট যায়। তারপর ঐ গাইগরুর সিঙে ঐ তৈল, ও কপালে সিন্দূর, হলুদ, চন্দন মাখাইয়া দেয়। তাহার পর নিম্ন লিখিত ছড়াটী বলিয়া গরুর চারিখানি ক্ষুর ধুইয়া দেয়ঃ—

"গোকল গোকুলের ধনী।
ব্রত করে রাজরাণী॥"

তৎপরে নীচের ছড়াটী বলিয়া দুর্ব্বাঘাসের

---

* শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত এই ব্রতের একখানি বহুবর্ণে মুদ্রিত চিত্র এই সংখ্যার মুখপত্রস্বরূপ দেওয়া

সহিত কলাটি হাতে করিয়া গরুকে খাইতে দেয় ঃ—

"গোকল গোকুলে বাস
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।"

এইরূপ তিনবার করে। তৎপরে নিম্ন লিখিত ছড়াটী বলিয়া গরুকে পাখা দিয়া বাতাস করে ঃ—

"তোমারে পূজিয়া গাভী বাতাস করি পাখা।
আমার হাতে থাকে যেন স্বর্ণের শাঁখা।"

তারপর নমস্কার করে।

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী

আমার বাল্যকথা

৫

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা)

ও বাড়ীর মেজদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তখন এ বাড়ী ও বাড়ীর কোন প্রভেদ ছিল না, আমরা তাঁকে আমাদের সহোদর ভাইয়ের মতই দেখতুম। তিনি ছিলেন মেজদাদা, আমি সেজদাদা বা সেজবাবু, আর বড়দাদা, এই তিন জনে সর্ব্বদাই আমরা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা করতুম—আমরা এই trinity তিনে এক একে তিন। মেজদাদা আমাকে বড় ভাল বাসতেন, আমিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলুম। আমরা দুটিতে তেতালার ছাতে বসে গান করতুম, গল্প করতুম, কোজাগর পূর্ণিমায় হেসে খেলে বাগানে বেড়িয়ে রাত কাটাতুম। মেজদাদা গান বাজনা বড় ভাল বাসতেন—তিনি নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন—ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ইত্যাদি।

"দীননাথ প্রেমসুধা দেহ হৃদে ঢালিয়ে" এ তাঁর গান। তিনি সবদিকে চৌকোষ ছিলেন—সামাজিকতা, লোকলৌকিকতা, বড়দাদার যে দিকটা অভাব ছিল, তিনি সেই সকল গুণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিলেন।

আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারদিন ধ'রে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হোত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতেরি যশোগান।

এদিকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা ছিল, সে সময়কার সাহিত্যিক-দের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর

প্রণীত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ এইটি উদ্ধার ক'রে সাহিত্য সমাজে প্রচার করেছেন দেখে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল—আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুঁথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন—মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে;—আক্ষেপের বিষয় যে এ সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না—'কোন খানে লেশ, নাহি অবশেষ, সে দিনের কোন চিহ্ন'।

নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের বাড়ীতে 'নবনাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত—

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য।

নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, বহুবিবাহপ্রথায় পারিবারিক দুঃখজ্বালা অশান্তি প্রকটন করা ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজে-

হয়েছিল। আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগ্রাম হতে মেজদাদাকে লিখছেন; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক—16th January 1867)

"তোমাদের নাট্য শালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"

আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন—নাট্য অভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম; পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন—তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

এই নবনাটক আর মানময়ী নামক একটি গীতিনাট্য সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেক গুলি নাটকের অভিনয় হয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'রাজা ও রাণী' এই দুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে গ'ড়ে তোলা গিয়েছিল।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এবাড়ী ওবাড়ীর

সকলে আমরা একান্নপরিবারভুক্ত ছিলুম। ক্রমে আমরা পৃথক হয়ে পড়লুম। মেজদাদা ও আমাদের মধ্যে যখন বিভাগ হল আমার মনে ভারি বেদনা লেগেছিল। আমরা তেতালার বাড়ীতে ছিলাম—দোতালায় এসে পড়লুম। এই দোতালার বাড়ীই



গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের আদিম বসতবাটী, তেতালার বাড়ী নির্ম্মাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুকুরটা বুঝি সাধারণ রইল। একদিন দেখি হাইকোর্টের একজন জজ এসে আমাদের

বাড়ী তন্নতন্ন তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জন্যে। এই ছাড়াছাড়ি আমি অনেককাল ভুলতে পারি নি। ইংলণ্ড থেকে অনেক সময় দুঃখ করে মেজদাদাকে এই ধরণে পত্র লিখতুম। "বাল্যকাল হতে আমরা একত্রে ছিলাম— তুমি ছিলে মেজদাদা আর এখনো পর্য্যন্ত আমার ছোটরা আমাকে সেজদাদা বলে ডাকে। আমাদের এক সঙ্গে ওঠাবসা, খ্যালাধুলা আমোদ প্রমোদ, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ মতান্তর উপস্থিত হইবে। কত কুলোকের মন্ত্রণায় এক এক সময় এইরূপ সুখের সংসার ছারখার হইয়া যায়। যাহারা পরিবারের ভিতরে এইরূপ অশান্তির বীজ ছড়াইবার চেষ্টা করে তাহাদের মত দুর্ম্মতি আর কে আছে? এক একবার দময়ন্তীর মত অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হয়, যখন নলরাজা তাঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—

> অপাপ চেতসং পাপো যএবং কৃতবান্ নলং
> তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবত্ব সুখজীবিকাং।

"অপাপচিত্ত নলকে যে পাপাত্মা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল, সে তদধিক দুঃখতর জীবিকা পাইয়া জীবন ধারণ করুক।"

বিলেত থেকে ফিরে এসে বোম্বাই যাবার পর মেজদাদার সঙ্গে বড় আমার দেখা শুনো হ'ত না কিন্তু আমাদের পত্র-ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। ইংলণ্ড বোম্বাই আমি যেখানেই থাকি তাঁকে চিঠি লিখতুম আর তাঁর কাছথেকেও স্নেহপূর্ণ পত্র পেতুম। ছুটিতে কলকাতায় এলে অবিশ্যি আমাদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হত। একবার আমি বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় বৎসরের ব্যামোর ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলুম। সেই বাতে অনেক দিন শয্যাগত ছিলুম, তখন মেজদাদা সর্ব্বদাই আমাকে দেখতে আসতেন, আদর যত্ন করতেন, গল্পস্বল্পে আমার মনোরঞ্জন করতেন। আমার একটি আরামের চৌকি ছিল তার চারি দিকে বন্ধু বান্ধবেরা ঘিরে বসতেন, ঠিক যেন একটি দরবার বসেছে। আমার মনে হত ব্যামোর ভিতরেও যদি এত আরাম পাওয়া যায়, তা হলে ব্যামোয় পড়াতে আপত্তি কি?

O Pain! where is thy sting?

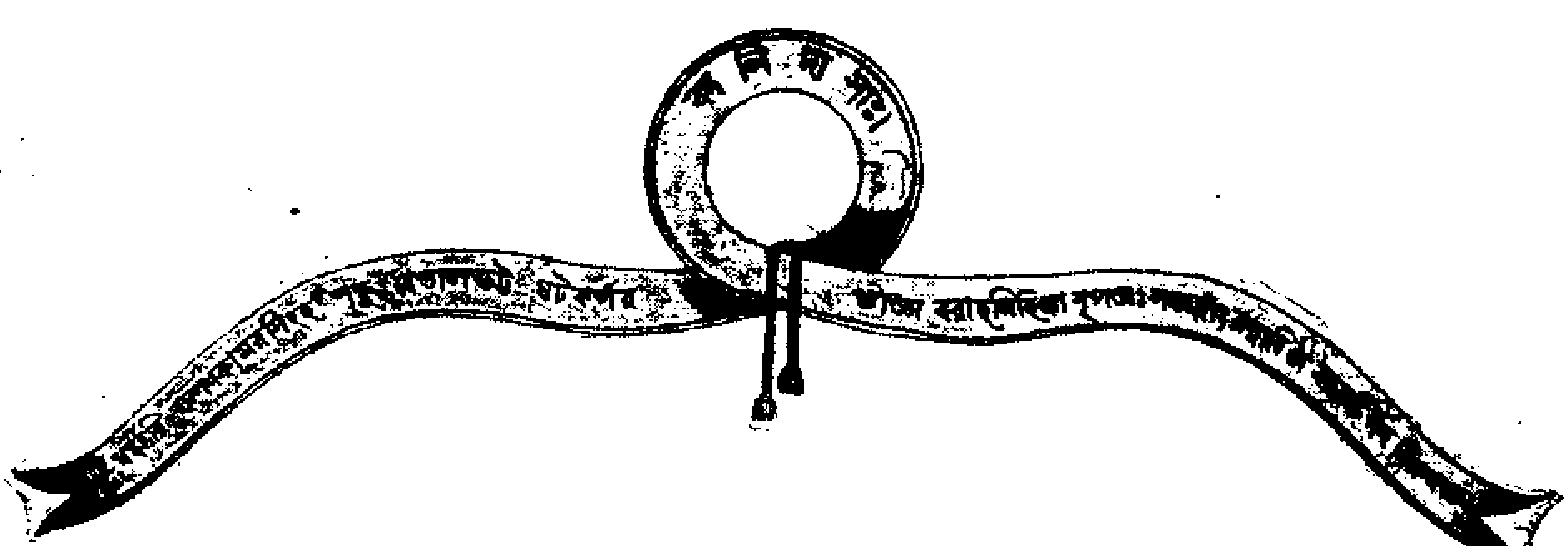
মেজদাদার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। যে তাঁকে ভাল করে জানত সেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হত, তাঁর কেমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল। অনেকে তাঁর উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপিত করেছিলেন। ছোট কাকার তাঁর উপর কিরূপ স্নেহ মমতা ছিল তা আমরা তাঁর পত্রে দেখতে পাই। মেজদাদার বিদ্যা-শিক্ষার পাছে কিছুমাত্র অযত্ন হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি একপত্রে বলছেন "মানুষের মন রত্নখনি বিশেষ। সেই রত্নটিকে নিয়ে মেজে ব'সে উজ্জ্বল করলে তবে তা মূল্যবান্ হয়—মনের উপর শিক্ষার কার্য্যও ঐরূপ।" "ভবিষ্যতে গণেন্দ্রনাথ আমাদের গৃহস্বামী হয়ে পরিবারের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকবেন" এই আশায় তিনি আশ্বস্ত ছিলেন কিন্তু হায়! তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। যাঁরা ভাল লোক দেবতারা শীঘ্রই তাঁদের আপনাদের কাছে ডেকে নিয়ে যান, তাই তাঁর পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তিনিও অকস্মাৎ আমাদের সকলকে ছেড়ে পুণ্যলোকে চলে গেলেন।

Requiescat in pace!

নবগোপাল মিত্র

উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দুস্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্ম্মী হ'লেন ; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারি চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus. তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম। 'Indian Mirror' পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হতে হস্তান্তর হল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মবিবাহ' আইন যখন বিধিবদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য সিমলার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন। আদি সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে দাঁড়াল এই যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাইরে না গেলে আর রেজিষ্ট্রী বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁরা এই আইনের শরণাপন্ন হতে চান তাঁরা আপনাদের অহিন্দু ব'লে প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে বাধ্য। এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে এখন আমরাই আর্ত্তনাদ ছাড়ছি —এই অহিন্দু Declaration উঠিয়ে দিয়ে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের হাজার চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না।

বোম্বাই থেকে আমি একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে বোম্বাই প্রদেশের আচার



বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক

নব-নাটক

[নব নাটক অভিনয়ে যে প্রোগ্রাম ছাপা হইয়াছিল

ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, তীর্থস্থান—ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলুম—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় আমি কথায় কথায় বলেছিলুম বাঙালীদের যেমন প্রধান আহার ভাত ওদেশে সেরূপ নয়, ভাতের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ রুটিই প্রচলিত, কোথাও বাজরী (বজরা), কোথাও জোয়ারী বা গমের হাত গড়া রুটি। ভাতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্য ওদেশে তেমনি রুটি। এই ভাতখোর ও রুটিখোর, দুই জাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন্ জাতি? এই প্রশ্ন উঠল। আমি বলেছিলুম ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় বাঙালী দুর্ব্বল। আবহাওয়ার গুণাগুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হতে পারে, আহারের তারতম্যও আর আর কারণের মধ্যে ধরা অসঙ্গত হয় না। যব ও গমের মত ভাত পুষ্টিকর খাদ্য নয়, সুতরাং ভাতখোর বাঙালী যে দুর্ব্বল তাতে আর বিচিত্র কি? এই কথা শুনে নবগোপাল বাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চীৎকার ক'রে আপনার অমত প্রকাশ করে বল্লেন "তা কখনই হতে পারে না। তোমরা যাই বল, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব"—এ তর্কের আর কোন উত্তর নেই। "সভা হল নিস্তব্ধ।"

তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাসনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁরি নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হল না, শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে এভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে, শাশ্বতকাল স্থায়ী হয়, তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দণ্ড্যাচার্য্য

(প্রতিবাদ)

ভারতীর গত বৈশাখ সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্ এ মহাশয় মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্য সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে দণ্ড্যাচার্য্যের কালনির্ণয় এবং প্রধান প্রধান বর্ণনীয় বিষয় গুলির নির্দ্দেশ অতি সুচারুরূপেই করা হইয়াছে। তবে ঐরূপ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতভেদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একটি অনুপেক্ষণীয় স্থলে আমাদের যে বিরুদ্ধ মত আছে, তাহারই বিবৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

পণ্ডিত শরৎবাবু মনে করেন, 'মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্য মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা নহেন। শরৎবাবু বলিতে চাহেন "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।" মৃচ্ছকটিকের এই শ্লোকার্দ্ধমাত্র কাব্যাদর্শে দৃষ্ট হয় এবং উহা উদাহরণ স্বরূপ উপন্যস্ত হইয়াছে। অলঙ্কার

শাস্ত্র লিখিতে যাইয়া অন্যের গ্রন্থ হইতে উদাহরণ দেওয়া গ্রন্থকারের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। মৃচ্ছকটিকে এবং কাব্যাদর্শে ভাষাগত বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়। দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ দণ্ড্যাচার্য্যের রচিত বলিয়াই তিনি স্বীকার করেন।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্য দশকুমারচরিত কাব্যাদর্শ এবং মৃচ্ছকটিক এই তিন গ্রন্থেরই রচয়িতা। অলঙ্কারশাস্ত্রকারগণ অন্যের রচিত শ্লোক উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মহাকবি দণ্ডী ঐ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। সমগ্র কাব্যাদর্শে তাঁহার স্বরচিত উদাহরণই দেখা যায়। কেবল মৃচ্ছকটিকের "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।" এই শ্লোকার্দ্ধ উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ স্থলে এবং "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ। অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা॥' এই সমগ্র শ্লোকটি অলঙ্কার সংসৃষ্টির উদাহরণ স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই একটি মাত্র উদাহরণ মহাকবি দণ্ডী অন্যের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলেন, ইহা আমাদের মনে হয় না। বরং ঐ একটি শ্লোক মৃচ্ছকটিকে ও কাব্যাদর্শে উভয়ত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া দণ্ড্যাচার্য্যই ঐ উভয় গ্রন্থের রচয়িতা প্রতিপন্ন হয় না কি? যে ক্ষেত্রে দণ্ডী অন্যের রচিত শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ মোটেই গ্রহণ করেন না, সে ক্ষেত্রে একটি উদাহরণই আমাদের মতের বিশেষ অনুকূল নহে কি? মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব শরৎবাবুও স্বীকার করেন। দণ্ড্যাচার্য্যও প্রাচীন কবি। তাই প্রাচীন প্রবাদ,—

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি* ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

অতএব দণ্ড্যাচার্য্যকে মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা বলিয়া মনে করায় কালগত বিরোধের সম্ভাবনাও নাই।

আমাদের মতের পরিপোষক প্রমাণ দশকুমার চরিত হইতেও দেখান যাইতে পারে। যাঁহারা দশকুমারচরিতের অপহারবর্ম্ম চরিত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন মৃচ্ছকটিকের ঘটনার অনুরূপ ঘটনা অপহারবর্ম্মচরিতে আছে। সেই জুয়া খেলা—সেই চৌর্য্যবৃত্তি—সেই গণিকাগণের কাহিনী উভয়ত্রই আছে। "গুণানুরক্তা গণিকা" রাগমঞ্জরী বসন্তসেনারই দ্বিতীয় সংস্করণ। অবশ্য কবিদ্বয়ের রচনাতেও ভাবসামঞ্জস্য থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐরূপ ভাবসামঞ্জস্য হইতে এক ব্যক্তিকেই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মনে করিতে প্রবৃত্তি হয়। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতেও এইরূপ ভাবসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে উহা স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন। মৃচ্ছকটিকে তাৎকালিক সমাজের যে চিত্র আছে, দশকুমার চরিতে অনেক স্থলে তাহার প্রতিচ্ছবি লক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থ নিপুণভাবে পাঠ করিলে সকলেই ইহা উপলব্ধি করিবেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক

---

* সুপণ্ডিত শরৎবাবু "কবীতি তু" এই পাঠ দেওয়াতে আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি। আমরা "কবী ইতি" এই পাঠই জানি এবং তাহাই ব্যাকরণসম্মত। প্রগৃহ্যহেতুক সন্ধির অভাব শরৎবাবুকে দেখাইয়া দিতে হইবে না

ম্যাক্‌ডোনেলও মৃচ্ছকটিককে দণ্ডীর রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উল্লিখিত যুক্তিমূলেই তিনি ঐরূপ মনে করেন।

ভাষাগত বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধেও আমরা শরৎবাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই। মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্যের এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বিভিন্ন রীতিতে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যে দণ্ডী বৈদর্ভী রীতিতে

"পয়োধরতটোৎসঙ্গলগ্নসন্ধ্যাতপাংশুকা।
কস্য কামাতুরং চেতো বারুণী ন করিষ্যতি॥"

এইরূপ মধুর শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তিনিই আবার গৌড়ী রীতিতে

"অস্তমস্তকপর্য্যন্তসমস্তার্কাংশুসংস্তরা।
পীনস্তনস্থিতা তাম্রকম্রবস্ত্রেব বারুণী॥"

এইরূপ উদাহরণ রচনায় আমাদিগকে হাসাইয়াছেন। ফলতঃ মৃচ্ছকটিকের ভাষা দণ্ড্যাচার্য্যের হইতে পারে না, এরূপ ধারণা আমাদের নাই। কাব্যাদর্শে নানা শ্রেণীর প্রাকৃত ভাষার যে উল্লেখমাত্র আছে, মৃচ্ছকটিকে তাহাদের উদাহরণ আমরা পাইয়াছি। ইহাতেও ঐ উভয় গ্রন্থের এককর্তৃকত্ব অনুমান হয়। আমরা মনে করি, মৃচ্ছকটিক দণ্ড্যাচার্য্য কর্তৃক রচিত হইয়া কবি-প্রতিপালক রাজা শূদ্রকের নামে প্রচারিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ঈদৃশী প্রথার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রাজা শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর প্রকৃত রচয়িতা নহেন, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। মম্মট ভট্ট বলিয়াছেন "শ্রীহর্ষাদে র্ধাবকাদীনামিব ধনম্।"

আমাদের যুক্তিগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আশা করি সকলগুলির সমষ্টি সহৃদয়-গ্রাহ্য হইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র রায়।

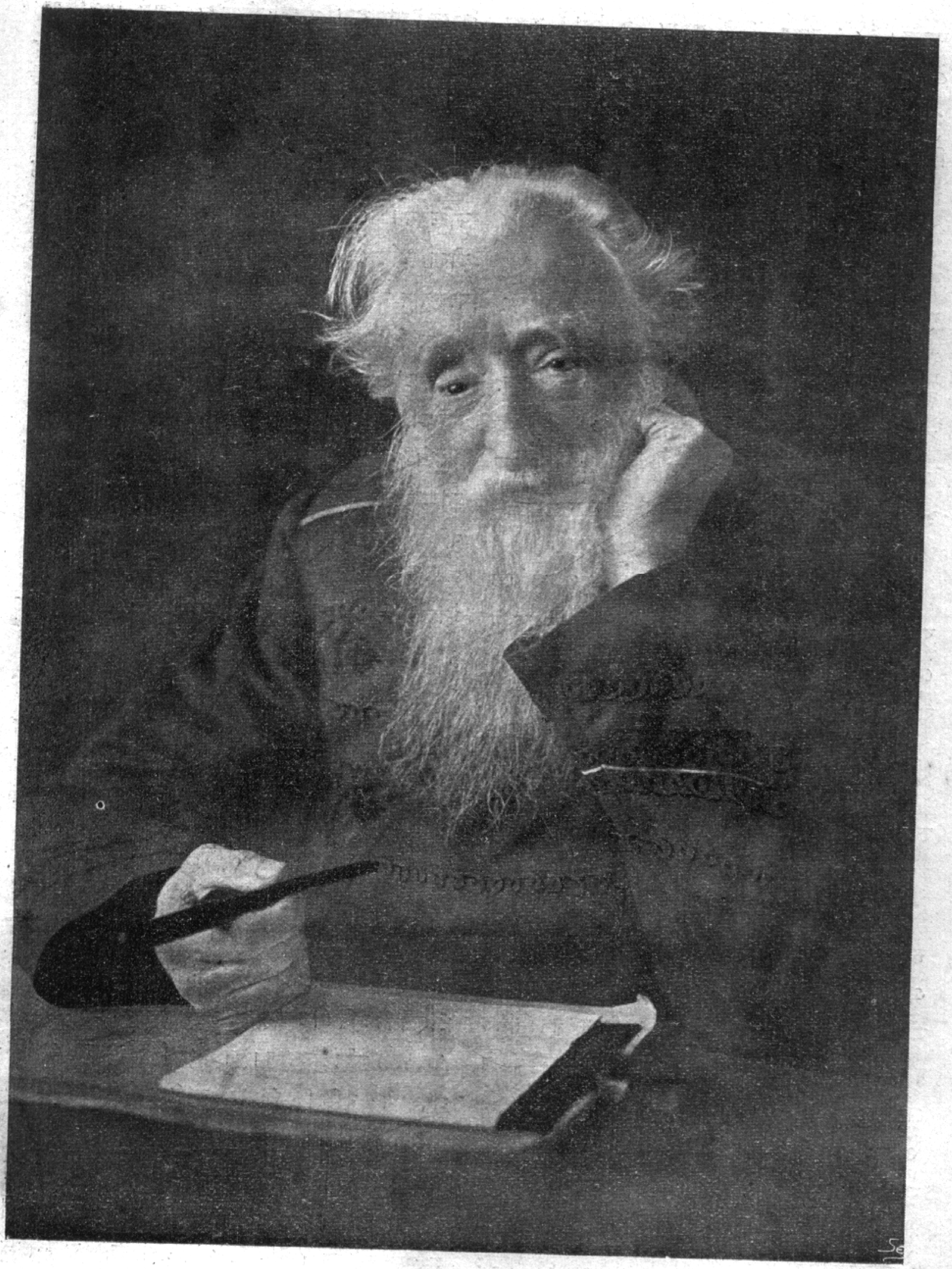
জেনারেল বুথ

যখন আমরা দেখি যে মানবের দুঃখ ও দারিদ্র্য মোচন জন্য কোন ব্যক্তি আপনার সমস্ত জীবন দান করেন তখন মহত্ত্বের একটি উজ্জ্বল চিত্র আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠে।

উইলিয়াম বুথ এইরূপ মহত্ত্বের একটি উজ্জ্বল আদর্শ। এই বর্ত্তমান যুগে একদিকে বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রদীপশিখা যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে এবং রাজনৈতিকদের কর্ম্মময় জীবন যেরূপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে অপর দিকে সেইরূপ দারিদ্র্যের করাল ছায়া পৃথিবীর চারিদিকে ছাইয়া পড়িতেছে; অসংখ্য নরনারী মিথ্যা স্বপ্নের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিন দিন পশুত্বের দিকে,—মৃত্যুর দিকে অসহায় ভাবে নামিয়া পড়িতেছে। কিন্তু কে তাহাদিগকে অন্ধকার

যায়? তাহাদের চিরদুঃখময় জীবনকে আনন্দসিক্ত করিয়া তোলে? জেনারেল বুথ অসংখ্য নরনারীর আশাহীন হৃদয়ের মধ্যে আশার উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এবং ক্ষুধিতকে নিজের করুণার দ্বারা হস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে বলিতেছে "The greatest Apostle of the age."

উইলিয়াম বুথ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিলে নটিংহাম সহরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ না করিয়া একজন পাদ্রির অধীনে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই ইংলণ্ডের প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে



জেনারেল বুথ।

Wesleyan Methodist Missionএ যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি লণ্ডনে আসিয়া নূতন প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু এই নূতন প্রণালী মিশনের কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমোদন না করায় তিনি উক্ত মিশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি কেথারিন্ মাম্‌ফোর্ড নামক এক বিদুষী নারীকে বিবাহ করেন। জেনারেল বুথের বন্ধুরা বলেন যে তাঁহার স্ত্রীর সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে তিনি এই কার্য্যে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। সস্ত্রীক তিনি কর্ণওয়াল. কার্ডিফ প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আসিলেন এবং লণ্ডনের East End নামক স্থানে তাম্বু স্থাপন করিয়া দরিদ্রদের মধ্যে সঙ্গীত ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় 'ইষ্ট এণ্ডে' ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যে দুঃখময় নিরাশ্রয়তা ও পাপের ছবি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে বদল হইয়া গেল। তাহাদের দুঃখে প্রণোদিত হইয়া তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা যে কেবল তাঁহাকে কিংবা তাঁহার দেশকে মহিমান্বিত করিয়াছে তাহা নহে; ইহা অসংখ্য নরনারীকে মানুষরূপে জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখিলেন কত নরনারী ক্ষণিক সুখ-স্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত দলে দলে পানালয়ে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এই অট্টহাসি, উন্মত্ততা যেন কেবল দুঃখধূমে নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে বিকৃতরূপে উজ্জ্বল। তিনি দেখিলেন, কত গৃহের মধ্যে জুয়াখেলা, মারামারি ও কুচক্রান্ত দিনরাত চলিতেছে, কেহ বারণ করিবার নাই, কেউ উপদেশ দিয়া সৎপথে লইয়া যাইবার নাই। পিতৃহীন অসংখ্য বালকবালিকা শিক্ষার অভাবে চরিত্রহীন হইয়া পাপের মুখে পতিত হইতেছে। কত নরনারী আহারের উপায় না দেখিয়া সন্তানের প্রতি পাশব অত্যাচার করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। তিনি দেখিলেন অসংখ্য পতিতা নারী পাপের আবর্ত্তে এমন ভাবে পতিত হইয়াছে যেন তাহাদিগকে উদ্ধার করা একেবারেই মানুষের-ক্ষমতার বাহিরে। তাহাদের পরিচ্ছদ ও হাস্যামোদ সকলেই দুঃখের বাহ্য আবরণ। তাহাদের হাসির মধ্যে দিয়া পশুত্বের ও মৃত্যুর করাল ছবি স্বতঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে!

সেই দিন তিনি একটী দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরের পুরাতন বিছানায় এমন ভীষণ দুর্গন্ধ যে মানুষ ত দূরের কথা পশুর ও সেই ঘরে বাস করিতে পারে না। সেই ঘরে এক পঙ্গু নারী সাতটী শিশু সন্তান লইয়া বাস করিতেছে। সেই ক্ষুদ্র ঘরেই তাহাকে রন্ধন করিতে হইত। ইউরোপের নবীন সভ্যতা ধনজন সম্পদময় সুসভ্য সমাজকে ক্রমেই অর্থের দ্বারা স্ফীত করিয়া দিতেছে বটে কিন্তু এই আশ্রয়হীনা নারীকে কেন যে মুষ্টিমেয় অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি ভাবিলেন ইহারাই তো জাতির মেরুদণ্ড, ইংলণ্ড যদি এই হতভাগ্য নরনারীকে নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করিতে না পারে তবে স্বদেশের এক বিরাট কর্ম্ম নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

জেনারেল বুথ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে East London Revival Society নামক এক সমিতি স্থাপন করিয়া পতিতের উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সমিতির নাম বদলাইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে East London Christian Mission এবং The Christian Mission স্থাপন করেন। এই নাম পুনরায় রূপান্তরিত করিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিশ্ব বিখ্যাত "মুক্তিফৌজ" (The Salvation Army) গঠন করেন। তিনি নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার কার্য্য চারিদিকে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন; যথা;—

(১) মুক্ত বায়ুতে সভা ও মিছিল; (২) রাত্রে পতিতা নারীদিগের গৃহে গমন করিয়া উপদেশ দ্বারা সৎপথে আনয়ন চেষ্টা; (৩) রঙ্গালয়ে, কারখানায় ও সমুদ্র তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা; (৪) সহজ ভাষায় সাধারণের ভ্রমণ স্থানে ধর্ম্মসঙ্গীত ও কনসার্ট।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুক্তিফৌজ এরূপ

ভাবে পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে ৫৬টী বিভিন্ন দেশে ২১,০০০ হাজার লোক মুক্তিফৌজের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে।

প্রথমে যখন তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তখন গভর্ণমেণ্ট এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন না। মুক্তিফৌজের কর্ম্মচারীগণকে সাধারণ সৈনিকের নিয়ম পালন করিতে হয় বলিয়া এবং তাঁহারা 'General' উপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া অনেকে মনে করিল ইহা বুঝি ছোট খাট যুদ্ধ বা সামাজিক-বিপ্লব সৃষ্টির আয়োজন। সুখের বিষয় তাঁহারা এখন এই মিথ্যা সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনারেল' বুথ সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেককালে সম্রাট কর্ত্তৃক এক ধর্ম্মসমাজের নেতা বলিয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।

তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নানা স্থানে ও বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া 'In darkest England and the way out' নামক বিখ্যাত পুস্তক লিখিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাতে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশে ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগকে প্রেরণ করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে বলেন এবং তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য নানা প্রদেশে কৃষক-আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব করেন। উপরিউক্ত কার্য্যগুলি তাঁহার মুক্তি ফৌজ সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতেছে। এই মুক্তি ফৌজের অধীনে স্থানে স্থানে পতিতা নারীর ও পানাসক্ত লোকদিগের উদ্ধারাশ্রম এবং দরিদ্রের জন্য আতুরাশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে। কারাগারে গমন করিয়া কয়েদীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান এবং কয়েদীরা মুক্ত হইলে তাহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহাদের আর একটি প্রধান কার্য্য। ইঁহারা স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে অসহায়, রুগ্ন মুমূর্ষু জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে যত্নের সহিত আনয়ন করিয়া আশ্রমে সেবা করেন।

অন্ধকার রাত্রে যেখানে পাপ অবাধে বিচরণ করিতেছে; যেখানকার ছায়া পর্য্যন্ত মানুষকে কলুষিত করিয়া দেয় সেই সব স্থানে এই 'মুক্তি ফৌজের' বিদুষী ও উচ্চ বংশের নারী সভ্যেরা গমন করিয়া পতিতাদিগকে স্নেহপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশে এবং উন্নত জীবনের আশা দেখাইয়া আশ্রমে আনয়ন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ২৫৫৯ নারী উদ্ধার করিয়া পুণ্যের পথে আনয়ন করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে ইংলণ্ডবাসীরা কিরূপ মুক্ত হস্তে দান করেন দেখিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের স্বেচ্ছাকৃত দান কেবল মাত্র ইংলণ্ডে ১০১৫৫১০ টাকা।

এই সকল সৎকার্য্য তিনি যে কেবল স্বদেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন তাহা নয়; তিনি পাঁচবার আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে তিনবার অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় দুইবার ভারতবর্ষে একবার জাপান এবং কয়েকবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া এই সব স্থানে মুক্তি ফৌজের শাখা স্থাপন করিয়াছেন।

সামাজিক সমিতি বলিয়া মুক্তিফৌজের একটা শাখা আছে; এই সমিতির সংখ্যা নয় শত এবং এই সমিতি হইতে এক বৎসরে ৬০০০,৯০০ লোককে বিছানা ও ১১,০০০,০০০ লোকের খাদ্য দান করা হইয়াছে। মুক্তি ফৌজ হইতে যে সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার লাভ মুক্তিফৌজের কার্য্যে অর্পণ করা হয়।

কমিশনার বুথ টাকার ভারতবর্ষে এই মুক্তি ফৌজের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইঁহারা এখন কয়েদীদিগের মধ্যে এবং অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে লেখাপড়া ও নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। দুঃখের বিষয় ভারতবাসীর এমন কোন নিজস্ব সমিতি নাই যাহার দ্বারা তাঁহারা স্বদেশবাসীকে উন্নতি ও পুণ্যের পথে লইয়া যাইতে পারেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের Albert হলে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যেরূপ বিরাট সম্মান প্রদান করা হইয়াছিল সেরূপ সম্মান জগতের অন্য কোন মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন—কিনা সন্দেহ।

এতদিন পরে জেনারেল বুথ কর্ম্মময় জগৎ হইতে অপসরিত হইয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুতেও তাঁহার মৃত্যু নাই। তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যপ্রভাব, পুণ্য প্রতিষ্ঠা চিরদিনই তাঁহাকে বিশ্বমাঝে অমররূপে প্রকাশিত রাখিবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

মিকাদো

প্রবল পরাক্রান্ত জাপান সম্রাট মিকাদো স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। কাচ যেমন একদিককার আলোকরশ্মি অন্যদিকে চালাইয়া লইতে সক্ষম হয়, মিকাদো পাশ্চাত্যের সভ্যতালোক শুধু জাপানে নহে সমগ্র আসিয়াখণ্ডের উপর পাতিত করিয়াছেন। প্রাতঃসূর্য্যের সে কিরণে জাপান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, নিদ্রিত চীন শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালীন সুশীতল সমীরণে মন প্রাণ জুড়াইতেছে। এমন কি সুদূর ভারত ও পারস্যদেশে পর্য্যন্ত সে আলোকের ছটা বিকাশ পাইয়াছে। যে মহাপুরুষের মহাশক্তিতে পতিত আসিয়ার পুনর্জন্ম হইয়াছে সেই ক্ষমতাশালী বাদশাহের অকাল মৃত্যুতে শুধু জাপান বলিয়া নহে সমগ্র আসিয়া আজ দুঃখিত। জাপান যে আজ কতদূর শোকে অধীর তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে জাপানীদের রাজভক্তি এবং রাজার প্রতি প্রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই অনেকটা ধারণা করিতে পারেন। আমার মনে হয় পিতৃবিয়োগে সন্তানগণ যতটা শোকাভিভূত হইয়া থাকে জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই তাহার চেয়ে কম শোকাভিভূত হয় নাই। তাহাদের বিশ্বাস, দেবতারই প্রতিনিধি মিকাদোরূপে জাপানে রাজত্ব করিয়া পুনরায় দেবলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

জাপান বলিতে আমরা নব্য জাপানকে বুঝি; এবং জাপানের ইতিহাস বলিতে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে গত অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাসই বুঝিয়া থাকি। এই দেশ এবং এই ইতিহাসের অলৌকিক এবং অদ্ভুত। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি দেশহিতকর যাবতীয় নীতিতে বিশারদ এই মহাপুরুষের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিব।

বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ জিমুতেন্নো। আজ পর্য্যন্ত জাপানে এই একই বংশ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। পরলোকগত মিকাদো মুৎসুহিতো জাপানের ১২১শ সম্রাট। ইনি ১৮৫২ খ্রীঃ ৩রা নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্রাট কোমেইর দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৬০ খ্রীঃ ১০ই জুলাই তারিখে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী হয়েন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ৩১ শে অক্টোবর তারিখে কিওতো রাজধানীতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার দুই মাস পরেই প্রথম শ্রেণীর অভিজাত নোবল ইচিজো তাদাকার তৃতীয় কন্যা প্রিন্সেস হারুকোর সহিত মিকাদোর বিবাহ হয়। এই আদর্শ-সাম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত ভারতবাসী অনেকেই অনেক বিষয় অবগত আছেন। যে মাসে জন্ম হয় বলিয়া সাম্রাজ্ঞীর নাম হারুকো (বসন্ত বালা)। সাম্রাজ্ঞী ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাটের চেয়ে ইনি বয়সে প্রায় দেড় বৎসরের বড়। সাম্রাজ্ঞীর গুণের কথার সাধারণ লোকের নিকট যে সকল উপাখ্যান শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় জাপানসাম্রাজ্ঞী হারুকো রাজ্ঞীদের আদর্শ-স্থানীয়া। গুণে মুগ্ধ হইয়াই নাকি মিকাদো উঁহার পাণিগ্রহণ করেন।



জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট।

তখন তিনি কেবল মাত্র ১৫ বৎসরের একটি বালক; এই সময় রাজ্যে রাজনীতির যে তুমুল ঝড় বহিতেছিল তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। অরাজকতা, রাষ্ট্র-বিপ্লব, মারামারি কাটাকাটি প্রভৃতির ঢেউ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সর্ব্বত্র ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। অনেকেই অবগত আছেন যে পরলোকগত মিকাদো মুৎ-সুহিতোর রাজ্যারোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কতিপয় শতাব্দী মিকাদোগণ সোগুণের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ ছিলেন, সোগুণের প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় প্রকাশ করা দুরুহ যেহেতু ঐরূপ ক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারী অন্য দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না। সোগুণ সেনাবিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ছিলেন। তিনি তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা পরিচালনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিঘ্ন না ঘটে এজন্য রাজধানী কিওতো সহর হইতে তিনশত মাইল দূরে ইয়েদো (বর্ত্তমান তোকিও) নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া একাধীশ্বররূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সাধারণ লোক যেন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ীই চলিতে ছিল। দাইমিওগণও (feudal Lords) সোগুণকেই রাজাজ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন। সোগুণ যেন একটা স্বতন্ত্র জাতীয় শক্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিওতো রাজধানীতে মিকাদো মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় ছিলেন। এই সময়ের কথায় ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান লেখকগণ বলিয়াছেন—জাপানে দুইটি রাজা রাজত্ব করেন, একটির রাজধানী ইয়েদো (তোকিও) এবং অপরটির রাজধানী কিওতো। ইয়েদোর রাজা রাজ্য শাসন করেন আর কিওতোর রাজা ধর্ম্মবিষয়ক শাসন কর্ত্তা। প্রাচীনকালে আমাদের ভারতে যেরূপ যথেষ্ট ক্ষমতাশালী রাজা মহারাজা থাকা সত্ত্বেও মুনিঋষি প্রভৃতি ধার্ম্মিক মহাত্মাদের সম্মানের লাঘব হইত না, তেমনি রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার হস্তস্খলিত হইলেও সোগুণের অপেক্ষা মিকাদোর প্রতি প্রজাদের আন্তরিক ভক্তি কম ছিল না।

সোগুণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপন ইচ্ছামত ক্ষমতার পরিচালন করিতে লাগিলেন। বিশেষ প্রতিপত্তিশালী বুদ্ধিমান দাইমিওগণ থাকা সত্ত্বেও সোগুণ নিজের অধীনস্থ পাঁচজন দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্য মনোনীত করেন। কাহারো প্রতি অযথা সন্দেহ অথবা কেহ মিকাদোর পক্ষে দু'চার কথা বলিলে সোগুণ তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেও ইতস্তত করিতেন না। সোগুণ মিকাদোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৈদেশিকের সহিত সন্ধি করিতে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিতেও দ্বিধা মনে করিতেন না। স্থূল কথা রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। দেশের লোক দুই পক্ষে বিভক্ত হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে কমোডোর পেরি জাপান উপকূলে আসিবার পর হইতেই জাপানীদের চক্ষু ফুটিতে থাকে। ঐ সময় হইতেই জাপানে বিদ্যাচর্চ্চারও বিশেষ ঘটা দেখা যায়। অনেকেই বুঝিতে পারেন যে অরাজকতার ফলে তাঁহাদের নিজেদেরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটি ঐক্য সংস্থাপক দলের গঠন করেন। শত-চেষ্টাতেও তাঁহারা রাজা ও

সোগুণ পক্ষের ভিতর ঐক্য সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। দেশে যে আগুন প্রজ্বলিত হইয়াছিল উহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেই থাকে। দুই পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোগুণপক্ষ পরাস্ত হইল। এই সময় (১৮৬৬ খ্রীঃ) ১৩শ সোগুণের মৃত্যু হয়। কাজেই দুই পক্ষে সহজে সন্ধি হইয়া যায়।

প্রিন্স কেইকি যদিও ঐক্যসংস্থাপন-কারীদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সম্রাটকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেন তথাপি বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সোগুণ হইলেন। ইনিই জাপানের শেষ সোগুণ। এই সময়ে মিঃ ইতো—যিনি শেষ জীবনে প্রিন্স আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং কোরিয়ার রেসিডেণ্ট জেনারেলের পদে অবস্থান করেন - তিনি এবং অন্য কতিপয় যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ঐক্য সংস্থাপকদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েন। মিঃ তোমা কেইকিকে সোগুণ পদ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আইজু এবং তোকুসাওয়া বংশের কতিপয় সামুরাই কিছুতেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন না। ইহাতে ওমাকা এবং জাপানের উত্তরপ্রদেশে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সোগুণের পক্ষে সুদক্ষ পরিচালক কেহই ছিলেন না। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থানে স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সোগুণ পরাস্ত হইয়া অবশেষে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সোগুণ পদ উঠিয়া গেল কয়েক শত বৎসর পরে আবার জাপান একমাত্র সম্রাটের অধীন হইল। পরলোকগত মিকাদো মুৎসুহিতো তেন্নোই এই সময়ে একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়েন।

এই সময় রুষেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে সোগুণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সোগুণ বলিয়াছিলেন—আমাদের ঘরওয়া বিবাদে তোমাদের আনন্দ হইয়াছে, তোমরা আমাদের জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। ইহা জানিও স্বদেশের বিষয়ে বিদেশীয় সাহায্য কস্মিন্‌কালেও চাহিব না। ঘরের বিবাদ ঘরেই মিটিবে; বিড়ালদ্বয় মাখন বণ্টনের নিমিত্ত বানরের নিকট যাইয়া যেরূপ প্রতারিত হইয়াছিল আমরা সেরূপ হইতে চাহি না।

সম্রাট মুৎসুহিতো যে বৎসর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন ঐ বৎসরই জাপানের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। এবং ঐ বৎসর হইতেই জাপানের নূতন অব্দের প্রবর্ত্তন হয়—উহার নাম মেইজি অব্দ। আজকাল ৪৫ মেইজি অব্দ চলিতেছে। মুৎসুহিতো তেন্নার এই ৪৫ বৎসর রাজত্বকালে জাপানের যতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে দুনিয়ার আর কুত্রাপি তেমন হয় নাই।

সম্রাট সিংহাসন অধিরোহণ করার পর কিওতো হইতে ইয়েদো নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই সময় হইতেই ইয়েদো তোকিও নামে অভিহিত হয়। সোগুণের প্রাসাদই বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ। সম্রাট সিংহাসনারোহণ করিয়া ঘোষণা পত্রে এই পাঁচটি বিষয় প্রচার করেন—(১) রাজ্যের কার্য্যাবলী দেশের গণ্যমান্য লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। (২) রাজাই কি আর প্রজাই কি সকলেই জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ

করিবে। (৩) সিবিল, মিলিটারী সকলেই দেশীয় শিল্পের সহায়তা করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য্যকারী শক্তি যেন সজীবতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়ায়। (৪) প্রাচীন অঙ্গহীন রাজনীতির সংস্কার হইবে। (৫) দেশে বিভিন্ন দেশীয় আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইবে, এই ভাবে জাতীয় শক্তির ভিত্তি দৃঢ় করা হইবে।

সম্রাট রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের তুমুল গোলমাল উপস্থিত হয়। অনেক আন্দোলনের পর সম্রাট এবং দেশস্থ যাবতীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিই শিক্ষা, সেনাবিভাগ এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প হয়েন। সোগুণ পদ উঠিয়া যাইতে না যাইতেই ঐক্যসংস্থাপক দল কর্ত্তৃক দুইটি কৌন্সিল গঠিত হয়। একটি জায়গীরদারগণ এবং কুগেবংশীয় বয়োপ্রাপ্তগণ কর্ত্তৃক এবং অপরটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সামুরাইদিগের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গঠিত হয়। সম্রাট সিংহাসনে আসীন হইয়াই একটি জাতীয় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। বলা বাহুল্য অন্যান্য দেশে প্রজাগণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াই এরূপ কাজ করিতে রাজাকে বাধ্য করেন আবার কোন কোন দেশে প্রজারা কাঁদিয়া কাটিয়াও রাজার মন ভিজাইতে পারেন না আর জাপানে প্রজারা উল্লেখ না করিতেই রাজা স্বয়ং উক্ত সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই বিষয়ে জনৈক বৈদেশিক ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন—"It is significant that their constitution was the voluntary gift of the Mekado, and not, as in the case of some European nations, one forced from the Sovereign by the people." রাজা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন। এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত নূতন আইন প্রণয়ন করিতে আদেশ প্রচার করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি গেন্‌রোইন্ অর্থাৎ সিনেট গঠিত হয়। স্বয়ং সম্রাট উহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং ঘোষণা করেন যে সিনেট কর্ত্তৃক অনুমোদিত আইনসমূহ মন্ত্রীসভার সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে। উহার কতিপয় মাস পরেই শেষ অর্থাৎ চূড়ান্ত আপিলের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই ব্যবস্থাপক সমিতি, ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালত সংস্থাপিত হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিনেট আইন করেন যে, প্রত্যেক জেলার করদাতার প্রতিনিধিগণ দ্বারা সেই সেই জেলার এক একটি স্থানীয় সমিতি গঠিত হইবে, সমিতি নিজ জেলার উন্নতিকল্পে আয়ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়ক কর্ত্তব্যই নির্দ্ধারণ করিবে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা স্থাপনের আদেশ দেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়। দেশের উপযুক্ত লোক সমূহকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিতে প্রধান মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। ১৮৯০ খ্রীঃ—২৩শ মেইজি অব্দে—সম্রাটের আদেশে প্রথম পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হয়। বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত বৎসরে একবার মাত্র পার্লিয়ামেণ্ট বসিয়া থাকে।

১৮৯০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই নব-

প্রথানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত সিনেটই এখন হাউস-অব-পিয়ার্স নাম ধারণ করে। এবং জেলা কমিটির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারাই হাউস-অব-কমন্স গঠিত হয়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়। এই সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যে ইউরোপীয় জাতির সহিত জাপানীদের ক্রমশঃ অধিকতর মেশামিশি হইতে থাকে। জাপানীরা এই সময়ই পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান জাতির সহিত অন্তর্জাতিক সন্ধিতে (International League) আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সন্ধির নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে চাহেন। কিন্তু কথানুযায়ী জাপানীরা কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে কিনা সন্দিহান হওয়ায় পাশ্চাত্যজাতি উহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু গত চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫) জাপানের রণ-পাণ্ডিত্য দর্শনে বিদেশীরা স্তম্ভিত হন এবং তখনি উঁহারা বুঝিতে পারেন কালে জাপানী-দের দ্বারা পূর্ব্ব আসিয়াস্থ উঁহাদের অধিকৃত স্থানসমূহ হস্তস্খলিত হইতে পারে। তাই পাশ্চাত্যজাতি উক্ত যুদ্ধের পরই পূর্ব্বোক্ত সন্ধি সূত্রে জাপানকে অন্যান্য প্রধান জাতির শ্রেণীভুক্ত করেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত যে যুদ্ধ হয় উহাই জাপানের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রধান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জাপানীরা চীনের নিকট হইতে ফর্ম্মোজা দ্বীপ লাভ করেন। এই যুদ্ধেই জাপানীরা বৈদেশিক জাতি বিশেষতঃ রুষের নিকট যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহা উঁহারা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। উহার ফলেই গত রুষজাপান সমর, যাহার ন্যায় সমর পৃথিবীতে অল্পই ঘটিয়াছে। এবং এই যুদ্ধের পরিণামেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তি জাপানীদের বন্ধুত্ব লাভের জন্য লালায়িত।

পরলোকগত মিকাদো স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মানের জন্য আত্মসুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতেন। চীনজাপান যুদ্ধের সময় তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ওসাকার সমীপবর্ত্তী এক সাধারণ হোটেলে অবস্থান করতঃ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধ পরিচালনের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। গত যুদ্ধের সময়ও তাঁহার অবসর ছিল না। মিকাদো এবং সাম্রাজ্ঞী উভয়েই কবিতা লিখিতে সুপটু। গত যুদ্ধের সময় সম্রাট কতকগুলি কবিতায় তাঁহার তৎকালিক মনের ভাব প্রকাশ করেন; প্রজার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আন্তরিক স্নেহ ভাব তাঁহার সেই কবিতাগুলি পড়িলে বুঝা যায়।

মিকাদো মুৎসুহিতো প্রজাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন; প্রজাগণও অন্তরের সহিত মিকাদোকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। সম্রাট যে সময়ে কোন রাস্তায় চলিতেন সে সময়ে সেই রাস্তার ধারের বাড়ীর উপরতালায় একটি ব্যক্তিকেও দেখা যাইত না। প্রাচীন কাল হইতেই জাপানে এ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে; মিকাদোর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থেই তাঁহার চলিবার পথে কেহ কখনও উচ্চস্থানে থাকেন না। রাজার আদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য। এমন কি কখনকখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে রাজার আদেশ,

বাণী প্রচার হওয়া মাত্রই সে আন্দোলন এবং সে দাঙ্গা হাঙ্গামার লেশটুকু পর্য্যন্ত থাকে না। রুষজাপান যুদ্ধের পর উভয় জাতির ভিতর যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির সর্ত্তে জাপান গবর্ণমেণ্ট রাজি হইলেও জাপানীরা রাজি হইল না। জনসাধারণ ঐ সর্ত্তে সন্ধি করার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত; অথচ গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য প্রধান জাতির কথা ঠেলিয়া সন্ধি ভঙ্গে রাজি হইতে চান না। জন সাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিল। স্থানে স্থানে সভা সমিতিতে গবর্ণমেণ্টের এরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। ক্রমে দুই পক্ষে পার্কে, রাস্তার উপর, সহরের স্থানে স্থানে ছোট খাট যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জনসাধারণ এক রাত্রির ভিতরই তোকিও সহরের আড়াই শতাধিক পুলীশ বক্স (ছোট ষ্টেশন), গবর্ণমেণ্ট পক্ষ অবলম্বনকারী সংবাদ আফিষ এবং কোন কোন উচ্চ পদধারীর বাড়ী পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া ছিল। দিনের বেলায় রাজপথের এখানে ওখানে মস্তকচ্যুত দেহ পড়িয়া থাকিতেও দেখা গেল; স্থূল কথা সে সময়ের কথা স্মরণ করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমি তখন তোকিও সহরেই ছিলাম; সে কয়েক দিবস বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে সাহসী হই নাই। পুলিশ, সৈন্যগণ এবং কর্ম্মচারীগণ শতচেষ্টা করিয়াও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হয় নাই। যখন ব্যাপারটা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে চলিল তখন রাজার আদেশ প্রচারিত হইল। রাজা স্বয়ং রুষজাপান সন্ধির সর্ত্তে অনুমোদন প্রকাশ করিলেন এবং দেশের সকলকেই সেই সর্ত্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, প্রজ্বলিত অগ্নি সহসা জল হইয়া গেল। এক দিনের ভিতরই আবার যে শান্তি সেই শান্তিই দেখা গেল। কিছুদিন পরে বিচারে এরূপ ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামার নেতাদের শাস্তি দেওয়া হইল। কাহাকেও ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে কিম্বা দীপান্তরিত হইতে দেখিলাম না। কাহারও দুই মাসের কাহারও তিন মাসের শ্রীঘর বাসের আদেশ হইল মাত্র।

শিক্ষা এবং শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে জাপান কতদূর উন্নত হইয়াছে সে বিষয়ে পাঠকগণ সবিশেষ বিদিত আছেন। নব্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য পরলোকগত মিকাদোর গবর্ণমেণ্ট অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে। জনসাধারণে শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং প্রসারণ এতদূর হইয়াছে যে দেশের লোকে (স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া) শতকরা ৯৭ জনের উপর শিক্ষিত। দেশ ক্ষুদ্র এবং অধিবাসীসংখ্যা অল্প হইলেও প্রতিবৎসর উচ্চ শিক্ষার জন্য দেড় শত ছাত্র জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্টের খরচে প্রেরিত হয়।

শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে এক কথাই যথেষ্ট যে ভারতের নিভৃত প্রদেশের সুনামগঞ্জ গ্রামনিবাসী কেরামত কারিগরের ঘর খুজিলেও কিছু না কিছু জাপানী শিল্প দ্রব্য বাহির হইবেই। অন্ততঃ পক্ষে একটা গেঞ্জি তো বাহির না হইয়াই পারে না। যখনই কোন একটা নূতন শিল্পের জিনিস জাপানে প্রথম বাহির হইত পরলোকগত মিকাদো সেই শিল্পকারকে ধন্যবাদ এবং উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেন, পুরস্কার প্রদান করিতেন, সম্রাট ভবনের কোন বিশেষ স্থানের আলমারীর ভিতর সেই জিনিসটি সজ্জিত করিয়া

রাখিতেন, এবং নূতন নূতন শিল্পের কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের আবশ্যকতা হইলে রাজসরকার হইতে মূলধন দিয়া সাহায্য করিতেন। বিনা শর্করায় কি সরবৎ হয়? শিক্ষা শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছে তাই তাহারা উন্নত, তাই তাহারা সুসভ্য, তাই তাহারা মানুষ এবং তাই তাহাদের বন্ধুত্ব প্রয়াসী অপরে।

স্বর্গগত মিকাদোর দৈনিক জীবনী সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মিকাদো প্রাতে ৬টায় শয্যাত্যাগ করিতেন, ৭টার সময় প্রাতর্ভোজন করিতেন, ৯টার সময় ডাক্তারগণ প্রতিদিন উঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেন। উহার পর মিকাদো জাপানী পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সেনা-বিভাগের জেনারলের পোষাক পরিধান করিতেন, এবং ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত বড় বড় আগন্তুকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এই দেখা সাক্ষাৎ সাধারণতঃ সিংহাসন যে ঘরে আছে সেই ঘরেই হইত। যেদিন তেমন কোন আগন্তুক না থাকিত সেদিন ১০টার সময়ই আফিষে চলিয়া যাইতেন, তার পর ১২টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন, কার্য্যগতিকে কখন কখন ১টা বা ২টার সময়ও মধ্যাহ্ন ভোজন হইত। দুটা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আফিষে রাজকার্য্য চালাইতেন; তার পর স্নান করতঃ নৈশ ভোজ সমাপ্তির পর সাম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য মহিলাপরিচারিকাদের সহিত নানারূপ গল্প প্রসঙ্গ এবং ক্রীড়া করিতেন, কখন কখন জাপানী শ্লোক রচনা করিতেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শয়ন করিতেন। শারীরিক ব্যায়ামের জন্য অশ্বারোহণ এবং ধনুর্ব্বিদ্যা অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। ৬০ বৎসর বয়স হইলেও তিনি বেশ সুস্থকায় এবং বলবান ছিলেন; যতদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি জেনারলের পোষাকে ভূষিত এক বলিষ্ঠকায় তেজস্বী সৈনিক পুরুষের মতই মনে করিয়াছি। বাহিরে যাইতে কার্জ্জন লাটের জাকজমকের এক কণিকাও তাঁহার ভিতর দেখি নাই।



বর্ত্তমান মিকাদো।

তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের মতন আড়ম্বরবিহীন হইয়া কনভোকেশন কিম্বা অন্য কোন বিশেষ সভায় উপস্থিত হইতেন। তিনি তরবারি সংগ্রহ করিতে ভাল বাসিতেন এবং কয়েক শত তরবারি সংগ্রহও করিয়া-

ছিলেন। উদ্যানরচনাও তাঁহার মনের মত একটি কাজ ছিল, নিজের হাতে প্রাসাদের বারান্দায় বৃক্ষরোপণ, জলসিঞ্চন প্রভৃতি করিতেন।

মিকাদো মুৎসুহিতো স্বর্গরাজ্য হইতে দেবতাদের প্রতিনিধিস্বরূপ জাপান রাজ্য শাসনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন; সুশাসনে জাপানকে এক সোনার রাজ্যে পরিণত করিয়া স্বর্গের দেব স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন; রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ইয়োশিহিতো, হারুণো মিয়াকে জাপান রাজ্য শাসনের জন্য। হারুণো মিয়া তরুণ যুবক; তিনি আজ সেই নব্য, তরুণ দেশের অধীশ্বর—মিকাদো। পিতার চেষ্টায় যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, পুত্র তাহার পরিপোষণে এবং পরিবর্দ্ধনে প্রয়াস পাইবেন ইহাই স্বাভাবিক।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

সমালোচনা

১। কুহু ও কেকা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১৯৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

কুহু ও কেকা নামকরণ শুধু যে বৈচিত্র্য সম্পাদনার্থ তাহা নহে—তাহার একটা সুন্দর সার্থকতা আছে। ইহাতে একদিকে যেমন বসন্তের ললিত-মধুর, লঘু অথচ পরিপূর্ণতার আনন্দস্বর, তেমনি বর্ষার বেদনাক্লান্ত অশ্রুভরা, সকাতর করুণ রাগিনী ঐক্যতানে বাজিয়া উঠিয়াছে

সত্যেন্দ্রবাবুর কবিতা তাঁহারই নিজস্ব সুরে বাঁধা;—তাহাতে আজন্ম কবি-হৃদয়ের একটা সুস্পষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। অতি পুরাতন বিষয়, অতি ক্ষুদ্র কথা, অতি তুচ্ছ সুর বিমুগ্ধ পাঠকের পুঞ্জীভূত বিস্ময় ও পুলকের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে।

কবির কাজ—বিশ্ব-হৃদয়ের গূঢ়তম ভাবটি মনোজ্ঞ-ভাবে প্রকাশ করা। উচ্চতর কবির কাজ—সেই প্রকাশ কৌশলের নৈপুণ্য প্রদর্শন;—সূক্ষ্ম শিল্পের সৃষ্টি! আবার শুধু প্রকাশেই কৃতিত্ব নাই; যিনি পাঠকের চিত্তে যত আনন্দের, বিস্ময়ের, অভিনবত্বের চিত্র গভীর-তর ভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন, তিনি ততই প্রতিভা- গূঢ় ইঙ্গিত উচ্চতর আর্টের লক্ষণ। প্রকৃত কবি, মানবের হৃদয়-বীণায় একটি মৃদুস্পর্শে অজস্র অনুরনন ধ্বনিত করিয়া তুলেন। "কুহু ও কেকার" মধ্য হইতে এমন অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা তাঁহার সূচনার প্রথম ছত্রটি উদ্ধৃত করিলাম:—

'কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি'

প্রথমে মানবের চিরপ্রিয় কোকিল, তারপর কালো কোকিল—এই 'কালো কোকিল' অনুপ্রাসের খাতিরে নহে;—যাহাকে চিত্রকরগণ ছবির জমী জমাইয়া তোলা (back ground) বলেন তাহারই আয়োজনার্থ; তারপর 'সুর' যেমন সুন্দর ও মিষ্ট, 'ফুল' তেমনি গন্ধ ও মাধুরীর সূচনা করিয়া দেয়; তারপর 'ফুলঝুরি'—স্নিগ্ধ দীপ্তি ও স্বচ্ছ অজস্রতার মধ্য দিয়া বিমল আনন্দের ছবি!—এই আলোক ও মাধুরীর ছবিখানি আঁকিলেন—কালো কোকিলের কালিমার ছায়ার উপর! ইহাতে যতটুকু ব্যক্ত আছে তদপেক্ষা অব্যক্ত ইঙ্গিতে কবি কত-না মধুর ছবি আঁকিয়া গেলেন!

"কুহু ও কেকার" ভাষা শক্তিমানের;—প্রতিভাশালীর! অতি গভীর রহস্যময় ভাবগুলি তিনি সরল সাদাসিধা কথায় সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদিও শব্দ-বৈভবে তিনি যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি তিনি যেন খাঁটি বাংলা

খাঁটি বাংলায় বাংলার কবি বাঙালির প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা, সুদূর আশা ও বিচিত্র ভাবগুলি আনন্দের সুরে গাঁথিয়া গিয়াছেন।

ছন্দ—সত্যেন্দ্রনাথের দাসী। বিদ্রোহের কথা দূরে থাক, কোথাও একটু পতন নাই, একটু ত্রুটি নাই—স্খলন নাই। বিভিন্ন ভাব তিনি বিভিন্ন ছন্দে গাহিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার ছন্দ ও ভাব নিবিড় প্রণয়ে গলাগলি করিয়া তাঁহার নির্ম্মাণ সহজ করিয়া দিয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থখানি আলোচনা করিলে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতের কাব্যসভায় জয়মাল্যখানি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে শোভা পাইবে। এবং বিশ্বাস করি এ উক্তি অত্যুক্তির সীমান্তবর্ত্তী হয় নাই।

আশা করি, বাঙালি পাঠক 'কুহু ও কেকার' নির্ম্মল সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্ম শিল্প, মধুর সুর ও বিচিত্র ভাব উপভোগে পরম পুলকিত হইবেন।

ঝাঁপি। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই। ইণ্ডিয়ান পব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ১৫৪ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পারিপাট্য মণিবাবুর গ্রন্থগুলির মনোরম বিশেষত্ব। ঝাঁপি নামটীর সহিত, বেতের মত কভারের বিচিত্র রঙটি সুন্দর মিলিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উপহার দিয়া ও পাইয়া সুখ আছে।

এই গ্রন্থের কয়েকটী গল্পে, মণিবাবু এক অভিনব পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছেন। গল্পগুলির সমগ্র সুর, কথা ও তাল এক নির্দ্দিষ্ট লয়ের দিকে—চিরন্তন একটী ভাবকেন্দ্রের অভিমুখে আসিয়া থামিয়াছে—তাহার আর অন্য দিকে গতি নাই;—যেমন পুষ্প-কেশরকে মাঝে রাখিয়া ফুলের পাপড়িগুলি তাহার চারি পার্শ্বে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। একটি কাজ, একটি ব্যথা, একটি কথা—একটী সত্যকে আশ্রয় করিয়া গল্পগুলি স্বচ্ছন্দ লীলায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্লট বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি মণিবাবুর গল্পে সেরূপ কিছু আয়োজন নাই। তাঁহার প্লট একটি কথায় প্রকাশ করা যায়। এই শ্রেণীর গল্পে ভাবই কেন্দ্র; 'প্লট' সেইটিকে, পরিধির মত, বেষ্টন করিয়া সৌন্দর্য্যটুকুকে আরো সুকুমার করিয়া তোলে। একটি উদাহরণ দ্বারা বক্তব্যটুকু প্রস্ফুটতর করিতেছি। "তুরুপ" গল্পটীর বক্তব্য কি? মাতৃত্বের-আনন্দ-হইতে-বঞ্চিতা নারীহৃদয়ে মাতৃস্নেহের বীজবপন;—এই একটি সত্য। এই চিত্র আঁকিতে, মণিবাবু ইচ্ছা করিলে, পতিতা নারীর জীবনাভিনয়ের দু-একটি কাহিনীর সন্নিবেশে গল্পটি অধিকতর দীর্ঘ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে সেগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক ও অবান্তর হইয়া পড়িত। আর একটি কথা;—চৌধুরী পরিবারের প্রতি বিনোদিনীর ঈর্ষা, অপমান ও তাচ্ছিল্যের ভাব, তীব্র অথচ প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসার কথা ততদিনই শুনিতে পাই, যতদিন তাহার হৃদয় মাতৃত্বের ভাবোদয়ে কোমল, মধুর ও নত হয় নাই। এমন সাবধানতা লেখকের চিত্রাঙ্কণ-নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই শ্রেণীর রচনা যেন সরু তুলির একটি টানে সুন্দরীর বিশাল নয়নের প্রসন্ন-হাসিটুকু ফুটাইয়া তোলা। একটু অসতর্ক, একটু বিচলিত হইলে সমস্ত ছবিটা ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই শ্রেণীর গল্প ভিন্ন আরো কয়েকটী বিচিত্র ও সুখপাঠ্য গল্পে পুস্তকখানি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। তাহার মধ্যে "প্রতিমা" ও "অক্ষয়রূপ" গল্পে একটু সুমধুর বিশেষত্ব আছে। সেগুলি গল্পের আকারে, লিরিকের মত, লঘু ও মর্ম্মস্পর্শী।

ধূপছায়া। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ রচিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা মাত্র। চারুবাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গিটি, তাঁহার আখ্যান বস্তুর সহিত সুন্দর সামঞ্জস্যে কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে। ধূপছায়ার গল্পগুলির মধ্যে, ধূপের সুগন্ধের মত, একটা-বেশ জমাট ভাবাবেশের আভাষ পাই। প্রত্যেক গল্পগুলির মধ্য দিয়া একটি স্নিগ্ধ বৈচিত্র্য ধারা বহিয়া গিয়াছে, যাহা পাঠকের চিত্তে কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের পিপাসা জাগাইয়া রাখে।

এই গ্রন্থে করুণ মধুরাদি বিচিত্র রসের আয়োজন থাকিলেও, যাহাকে "রোমান্স" বলে সেরূপ রচনায় চারুবাবুর হাত খুলিয়াছে ভাল। বিশেষত্ব এই যে রোমান্সের ভাবটুকু সুমধুর আখ্যানভাগেই নিঃশেষ

হইয়া যায় না, তাহা ললিত-মধুর, ভাবোদ্দীপক ভাষার অন্তরালে তাহার তরল ও সুমিষ্ট রসটুকু স্পৃহনীয় ও সৌন্দর্য্যটুকু বিকশিত করিয়া তোলে। "অপরাজিতা" গল্পটির "রোমান্স" যেমন সুমধুর, ইহার ভাষা, শিল্প ও চিত্রাঙ্কণ ততোধিক প্রীতিকর।

দু-একটি গল্পের উপসংহার ভাগ আমাদের ভাল না লাগিলেও, সেগুলি বৈচিত্র্য হিসাবে উপভোগ্য।

এই গ্রন্থে চারুবাবু মৌলিক গল্পের সহিত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের কয়েকটী গল্পের মনোরম অনুবাদ দিয়াছেন। বিদেশী গল্পের কোমলতা, মাধুরী ও ছবি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেগুলি যে চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে ইহা লেখকের সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ মনোরম এবং কভারের পরিকল্পনাটী লেখকের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সূচিত করিতেছে।

হানাষি। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। জাপানী গল্পের ভাবাবলম্বনে হানাষি রচিত। জাপানী গল্পের বিশেষত্ব স্বপ্নের মোহের মত, ফিন্‌ফিনে-পাতলা অস্পষ্টতার আড়ালে সৌন্দর্যের বিকাশটুকু মনোরম করা। গল্পগুলি কেমন-একটা, অতৃপ্তির মত, বেদনায় ঘেরা। সমস্তটা, যেন একটি সম্পূর্ণ সুরের মত মনে হয়। অথচ তার প্রারম্ভ ও সমাপ্তিটুকু খুঁজিয়া পাই না। সুরেশবাবু গল্পগুলি, বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন এবং তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ হয়।

শ্রীগঃ

জন্মদুঃখী। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে অনুবাদের যে চেষ্টা পড়িয়াছে ইহা সুলক্ষণ। বিদেশীয় রত্নসঙ্কলন করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের সবিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভাগ্যলক্ষ্মীর উপেক্ষিত এক দরিদ্র বালকের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে পল্লবিত, প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। উপাখ্যানে যেমন অভিনবত্ব লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতেও তেমনই বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য। বাঙ্গালা উপন্যাসের রাজ্যে লেখক একটা নূতনত্বের আভাস দিয়াছেন। একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাসে উপন্যাসখানির আরম্ভ এবং করুণ দীর্ঘনিশ্বাসেই তাহার সমাপ্তি। পাত্রপাত্রী বিদেশী বলিয়া কোথাও এতটুকু নীরস হয় নাই, সত্যেন্দ্রবাবু এমনই হৃদয় দিয়া উপন্যাসখানি লিখিয়া গিয়াছেন। গল্পের ভাষাতেও এমন একটি ছন্দ, এমন একটি সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে যে পাঠকের চিত্তে আগাগোড়া কৌতূহল জাগরূক রাখে—কোথাও বাধা পড়ে না। ললিত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এ গ্রন্থ পাঠে একটি বিচিত্রমধুর রসের আস্বাদ পাইবেন সে বিষয়ে আমাদিগের এতটুকু সন্দেহ নাই।

রেখাক্ষর বর্ণমালা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ব্রাহ্মমিসন প্রেসে মুদ্রিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। বঙ্গভাষায় শর্টহাণ্ডের প্রচলনকল্পে গ্রন্থকার বহু গবেষণা ও চিন্তার ফলে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পাঠগুলি সহজ ও সরল ছন্দে রচিত বলিয়া সেগুলি আয়ত্ত করিবার পক্ষে অধিক আয়াসের প্রয়োজন হইবে না। গ্রন্থখানি আগাগোড়া গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে লিখোর মত ছাপা;—ইহার ছত্রে ছত্রে মনোরম বৈচিত্র্য প্রকাশিত। গ্রন্থকারের এ তত্ত্ব প্রচারিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার একটী গুরুতর অভাব মোচন হইবে—সকলেরই এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বীরবার-গৌরব কথা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। ব্রাহ্মমিসন প্রেসে মুদ্রিত। এস কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। রাজস্থানের কয়েকটি গৌরবকাহিনী এই গ্রন্থে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। রচনাগুলির ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল—যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে সে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

পুরীর চিঠি। শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী, বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং কলেজ স্কোয়ার। লক্ষ্মীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা, ঝিকমিকে সংস্করণ এক টাকা। গ্রন্থখানি ভ্রমণ কাহিনীর রাজ্যে অভিনব, সুন্দর। লেখক দেশ দেখিতে জানেন, এবং যাহা দেখেন, তাহার সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আরও দশজনকে দেখাইতে জানেন। এ গ্রন্থ-পাঠে পুরীর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় লাভ করা যায়—লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গী সুললিত, ভাষায় বেশ একটি মিষ্ট ঝঙ্কার আছে,—রচনা সরস ও সরল। উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রাচীন গৌরবের চিত্র লেখক সশ্রদ্ধ হৃদয়ে লেখনীর তুলিকায় দিব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—একটি স্নিগ্ধ হাস্যরস বর্ণনার মধ্য দিয়া আগাগোড়া বহিয়া গিয়া রচনাটিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি প্রাদেশিক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে সে ত্রুটি সারিয়া লইলে রচনাটি নিখুঁত নির্ম্মল দাঁড়াইবে। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি ফটো আছে; তদ্ভিন্ন লেখক স্বহস্ত রচিত রেখাচিত্রে বর্ণনাগুলিতে মধ্যে মধ্যে দিব্য প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে বর্ণনীয় বিষয় ভাষার গণ্ডী ছাড়িয়া প্রত্যক্ষবৎ পাঠকের চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাপা বাঁধাইটিও পরিপাটি হইয়াছে।

Megasthens & Arrian.—A Bird's Eye view of their Accounts of Ancient India. Printed by N. Mukherji at the Gupta Mukherji's Press, No. 80-4 Harrison Road, Calcutta. প্রকাশক মেগাস্থিনিস ও আরিয়ানের বর্ণনা হইতে এ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের কথা সঙ্কলন করিয়াছেন। ছাপা কাগজ সুন্দর। প্রকাশকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

কাহিনী। শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক প্রণীত। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। মীরাবাই কর্ম্মদেবী, রাণী দুর্গাবতী, অহল্যাবাই, অসামান্যরাণী ভবানী প্রভৃতির কাহিনী লইয়া এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা হৃদয়গ্রাহী, কাহিনীগুলিও ফুটিয়াছে। কয়েকটি কাহিনীতে ঐতিহাসিকতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। লেখক কল্পনার তুলিতে সেগুলিতে রঙ ফলাইয়াছেন। লেখকের এই প্রথম উদ্যম। চর্চ্চা রাখিলে কালে তিনি সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধকাম হইবেন এ আশা করা যায়। গ্রন্থে তিনখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে ত্রিবর্ণে রঞ্জিত মীরাবাইয়ের চিত্রখানি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা অঙ্কিত—চিত্রখানি সুন্দর এবং বাঁধাইও পরিপাটি হইয়াছে।

দেবদূত। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ৪।১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও ভৈষজ্য ষ্টীম মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ইহা কাব্য কি নাটক, জানি না।" আমরাও স্থির করিতে পারিলাম না। নাটক হিসাবে ধরিতে গেলে, এ গ্রন্থে নাটকত্বের কোন লক্ষণ নাই। কাব্য হিসাবে দেবদূত মন্দ হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

A System of Indian Scientific Terminology (Chemistry) Part I—The Non-Metalic Elements by Babu Manindranath Banerjee—অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাসাক্লাল কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ছাত্রদের বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ইনি মৌলিক অনেক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন। এবং সেই সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন ও বিশিষ্ট সমিতির অধিবেশনেও পাঠ করিয়া থাকেন। এরূপ নানা বিষয়ে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ কাজ আছে। বিজ্ঞানের ভাষাতত্ত্ব লইয়াও তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ যে এই ছোট পুস্তিকাখানি আমরা আলোচনা করিতেছি সেখানির উৎপত্তি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে এখন প্রায়ই আমাদের ইংরাজী পরিভাষাই ব্যবহার করিতে হয়। মণীন্দ্রবাবুর মত এই

যে সেই শব্দগুলি অল্পবিস্তর রূপান্তর করিলেই সংস্কৃত শব্দ হইতে ঐরূপ অর্থজ্ঞাপক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। যখন ইংরাজীতে ওই শব্দগুলি গ্রীক ও রোমান ভাষার উপকরণ হইতেই উদ্ভূত, তখন এরূপ পরিবর্ত্তন সহজেই সম্ভব। কারণ আর্য্যজাতির আদি ভাষা হইতে এ সব ভাষাগুলি উদ্ভূত। যে যে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি এই মত দাঁড় করাইয়াছেন সেগুলি বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। নূতন কথা না গড়িয়া সেই একইরূপ কথা প্রয়োগের দ্বারা যদি এই দুইটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ভাষার শব্দসম্পদ বিজ্ঞান পরিভাষা বৃদ্ধি হয় তবে সে ব্যবহারে কত সুবিধা হইল। তবে সকল কথাকে এরূপভাবে মিল পাওয়ান সহজ মনে হয় না।

এই বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ দিই—আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় "হাইড্রোজেন" "অকসিজেন" "নাইট্রোজেন" প্রভৃতির যে নামকরণ হইয়াছে—সেগুলি বড়ই কঠোর ও কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। "কোবল্ট্ নিকেল্" ইত্যাদি নামগুলি ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করিলে আরও শ্রুতিমধুর ও সরল হয়।

এ বিষয়টি আলোচনা করিয়া ঠিক করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদই উপযুক্ত সমিতি। অন্যান্য বিষয়েও তাঁহারা এইরূপ ভাষাতত্ব সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাদের হাতেই ভার দেওয়া উচিত। এরূপ নূতন ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবনাতে আমরা সকলেই মণীন্দ্রবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

প্রতীক্ষায়

কতদিন কেটে গেল—ব'সে আছি পথ চেয়ে,
কত নিশি বয়ে গেল দুস্বপ্ন অনিদ্রা ল'য়ে;
কত ফুল গেল ঝরে,
তবু ওগো প্রীতিভরে—
তব আবাহন গান গাহিতেছি মুগ্ধ হয়ে।

পলে পলে জীবনের শেষদিন কাছে আসে,
দিন দিন ক্ষীণ আশা পরিণত অবিশ্বাসে;
নাশিয়া এ অবিশ্বাস,
হাসিয়া মধুর হাস,
ধ্রুবতারা রূপে ওগো দাঁড়াও হৃদয়াকাশে।

দূরে—দূরে মেঘশিরে চাঁদের রজত ধারা,
পড়িতেছে লুটাইয়া—যেন গো আপনহারা।
কল্লোলিনী কল কয়,
দখিনা মলয় বয়,
পাপিয়া আবেগভরে ফুকারিয়া হয় সারা।

হেন নিশি, সুপ্তসবে; ধৌত ধরা জোছনায়;
আমি শুধু কেঁদে মরি মগ্ন হ'য়ে নিরাশায়;
'আবার আসিব' বলে,
তুমি যে গিয়েছ চলে,
তাই আমি বসে আছি শুধু তব প্রতীক্ষায়।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।

হেঁয়ালির উত্তর

গত মাসে "আমার বাল্যকথা"র মধ্যে যে তিনটি হেঁয়ালি ছিল তাহার উত্তর ঃ—১। রসিক (রশি-সিক) ২। বেলকুল (বেল-কুল) ৩। নোনা (No=না)

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল এই তিনটি হেঁয়ালিরই ঠিক উত্তর দিয়াছেন। যাঁহারা মাত্র একটি কিম্বা দুটির উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।



"যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥"

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে।